# পঞ্চবিংশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী—১৩১৪।

# নব্যভারত

## পঞ্চবিংশ খণ্ড

## সম্মোহন।

তাঁহারা বলেন, যোগ্যতমের অধিষ্ঠান, বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। পিতার অধীন সন্তান, রাজার অধীন প্রজা, সবলের অধীন দুর্ব্বল, জ্ঞানীর অধীন মূর্খ, ধনীর অধীন নির্ধন, এসকল প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু সন্তান যখন আবার পিতৃত্বে,প্রজা যখন সমুত্থানত্বে,দুর্ব্বল সবলত্বে, মূর্খ জ্ঞানে, নির্ধন সম্পদে উন্নীত হয়,তখনও সেই নিয়ম? না,—প্রকৃতি তখন আর এক রূপে সেখানে সমুপস্থিত হয়। একসময়ে যাহা দুর্লঙ্ঘ্য, সময়ান্তরে তাহাই আবার লঙ্ঘ্য বিধানে পরিণত হয়। একই বিধান, জগতের চিরন্তন প্রথা নয়, কখনই নয়। শিশু, চিরকালই শিশু থাকে না, নির্ধন চিরকালই দরিদ্র থাকে না, দুর্ব্বল বা জ্ঞানহীন চিরদিনই হীনশক্তি বা মূর্খ থাকে না। যখন বিধাতা মানবকে অন্য শক্তিতে ভূষিত করেন, তখনও সে অধীন থাকিবে? তখনও সে সম্মোহিত হইবে? কখনও নয়, কখনও নও।

শক্তি, এ জগতে, কাহারও একচাটিয়া নহে; শক্তি, এক অচিন্ত্য রাজ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, জগতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রকটিত করিতেছে;—ফুটিয়া ফুটিয়া—কি জানি কি,এক মহানের অনন্ত উদ্দেশ্য বিঘোষিত করিতেছে। অগ্নির স্ফুলিঙ্গে যে শক্তি, জলের বুদ্‌বুদেও সেই শক্তি,—ইথারের কম্পনে যে শক্তি, বিদ্যুতের চকিত আস্ফালনেও সেই শক্তি। সকল বৈপরীত্য, সকল বৈষম্য, সকল অসামঞ্জস্য, সকল বিভিন্নতা ব্যাপিয়া প্রতিনিয়ত একই শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। একথা বুঝিয়াও অনেকে বুঝে না,—বুঝিয়াও উপেক্ষা করে;—বুঝিবা, সেই জন্যই পৃথিবীতে এত অশান্তি। সকলে যদি মহানের মহত্ত্ব বুঝিত, সকলের মস্তক সেই এক মহাশক্তির নিকট বিনত হইত—অহঙ্কার বা আস্ফালন—তিরোহিত হইত।

যে শক্তি দ্যুলোক, ভূলোক ব্যাপিয়া অহরহ কার্য্য করিতেছে, ঐ শক্তিই কেন্দ্রীভূত হইয়া কখনও পিতা ও সন্তান রূপে,কখনও রাজা ও প্রজা রূপে,কখনও জ্ঞানী ও মূর্খ রূপে,কখনও ধনী ও দরিদ্র রূপে শোভা পাইতেছে। অথবা, শক্তিরই কম্পনে জগতের উন্নতি এবং অবনতি,—অবনতি এবং উন্নতি হইতেছে। যে রূপেই ভাব, যে রূপেই দেখ—এক শক্তি-সমুদ্র হইতে সকল উদ্ভূত। কাহাকেও যে উপেক্ষা করে, সে সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই বুঝে না।

ভাবিতেছিলাম, বাঙ্গালায় এত অরাজকতা এবং বৈষম্য-পীড়ন কেন? ভাবিতেছিলাম, ভারতে জাতীয় একতা সুদূর-পরাহত কেন? ভাবিতেছিলাম, চির দারিদ্র্য এবং দাসত্বই কি ভারতের পরিণাম? ভাবিতেছিলাম, যে শক্তিতে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান উন্নীত, সেই শক্তি কি চির কালই ভারতে আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইবে?

লর্ড কর্জ্জন, যাহার অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র, কলিকাতার সেই অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; পলাসীতেও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে, আবার তাহার উৎকর্ষ সাধনের আয়োজন হইতেছে। লর্ডকর্জ্জন বলিতেছেন, আগামী ২৩শে জুন ১৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে, ঐ তারিখে ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। এ সকল কাজই, মুসলমান-বিজয়ের দুন্দুভিনিনাদ, কিন্তু মুসলমানগণই নাকি আজ কাল ইংরাজের অনুগত দল; মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নাকি ইংরাজ আজ ভারতে দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী। মুসলমানদিগকে হাত করিতে ইংরাজগণ আজকাল কত লালায়িত!! একদিকে লগুড়াঘাত, অন্যদিকে পদলেহন! মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ সকল কথা বুঝিয়াও সতর্ক হইতে পারিতেছেন না। কি সম্মোহন!!

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর এদেশের চিরস্মরণীয় দিন,—কর্জ্জন বঙ্গ বিভাগরূপ অসাধ্য সাধন দ্বারা ভারতের নবজীবনের কারণ হইয়াছেন। এই এক কাজে স্বদেশ জাগিয়াছে;—বিদেশী-বর্জ্জন এবং স্বদেশী-গ্রহণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া আত্ম-ত্যাগ মন্ত্রে এদেশবাসী দীক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগনীতির ভিতর দিয়াই এদেশে জাতীয় জীবন জন্মগ্রহণ করিতেছে। জাতিভেদ, ভাষাভেদ,—যত ভেদে গবর্ণমেণ্ট ইন্ধন দিলেন, কিন্তু তাহাতে জাগিয়া উঠিল—নিরাবিল স্বদেশ-প্রেম। কিন্তু এই পবিত্র স্বদেশ-প্রেমের পথে আবার দলাদলি, আত্মপ্রতিষ্ঠার মায়া উপস্থিত হইতেছে কেন? কি সম্মোহন!!

এদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, দেশের লোকের ভিতর এবং বাহির একরূপ নয়। বাহিরে যে স্বদেশ-প্রেমিক, অন্তরে সে স্বদেশ-শত্রু;—অথবা লেখা এবং বক্তৃতায় মানুষ এক-ভাবাপন্ন, কাজে অন্যরূপ। এদেশের অনেক স্বদেশভক্ত নেতার পত্রিকা বিলাতী কাগজে ও বিলাতী কালীতে ছাপা হয়, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত। "সময়" বলেন, প্রবাসী, স্বদেশ-প্রেমে দীক্ষিত, কিন্তু ছাপা হয় বিলাতী কাগজে, বিলাতী কালীতে এবং বৎসরান্তে উহার সম্পাদক, নিজ প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনা, বিলাতী অনুকরণে ছাপাইয়া, সকল সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। (১) নেতৃত্ব পদ পাইয়াও লোক অন্তর বাহেরের সমীকরণ করিতে পারিতেছেন না! প্রত্যহই এই কথার নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত হয়। বিলাতীবর্জ্জন এবং স্বদেশী-গ্রহণ-মন্ত্র, এইরূপে, সর্ব্বত্র, কার্য্যকালে পণ্ড হইয়া যাইতেছে। কথা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত যে অধিক কার্য্যকরী, এ কথা লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে কেন? কি সম্মোহন!!

স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই, এমন লোকের সংখ্যা এ দেশে কত হইবে? আমাদের মনে হয়, জনসাধারণকে বাদ দিলেও, দশ আনা লোক আজও রাজার খাতির ও উপাধির কুহকে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই। স্বজাতি, স্বদেশ, জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ নাই, এমন লোক কি পৃথিবীর আর

(১) ১৩১৩, ২৯শে চৈত্রের "সময়" দ্রষ্টব্য।

কোন দেশে পাওয়া যায়? মানুষ কেন, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের মধ্যেও "স্ব" বলিয়া একটা ধারণা বা আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশ যেন কিরূপ! শিক্ষিত-দিগের দশ আনা লোক "স্বদেশ"-সাধনার বিপক্ষে! সিটি, রিপন, ব্রজমোহন কলেজ সমূহ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে সংযুক্ত হইল না, ইহা কি কম দুঃখের কথা! এই তিনটী কলেজ বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য্য সুসিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা হইল না। এত চেষ্টাতেও লোকেরা "স্ব" পথে আইসে না! কি সম্মোহন!!

জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন জগতের কোন জাতি জাগে নাই। জাতীয় ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয়। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে এ কথার জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য কয়জন লোক চেষ্টা করিতেছে? জাতীয় ভাষা রক্ষার জন্য কয়-জন লোক অর্থ ব্যয় করিতেছে? লক্ষ লক্ষ লোক চেষ্টা করিলে, সাহায্য করিলে, তবে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সকল লাইব্রেরী অনুসন্ধান কর, দেখিবে, কেবল ইংরাজি পুস্তক, কেবল ইংরাজি, কেবল ইংরাজি; কদাচিৎ জাতীয় পুস্তক দেখিবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি স্থানের পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রচারের ইতিহাস পাঠ কর—এবং তাহার সহিত এদেশের উদীয়মান ভাষার পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারের তুলনা কর;—বুঝিবে—কত তফাৎ, যেন আকাশ এবং পাতাল, যেন চন্দ্রালোকের পার্শ্বে খদ্যোতা-লোক। এদেশের সাহিত্যসেবীগণ ঘোর-তর দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত;—ইহাতেই পরিচয় পাওয়া যায়, এদেশের লোকেরা সাহিত্য-সেবীদিগের সাহায্য করা কর্ত্তব্য মনে করেন না। নেতারা লেখেন ইংরাজি, বলেন ইংরাজি, স্বপ্ন দেখেন ইংরাজি। স্বদে-প্রেমিকদিগের [illegible] নূতন [illegible] হইতে-তেছে, তাহাও [illegible] করি-বার পূর্ব্বেই তাহা ইংরাজকে জানাইয়া দেও-য়া হইতেছে। [illegible] একটা [illegible] তো তৎপর নয় অন্য [illegible] ভাবিও; কিন্তু নেতারা তাহা বুঝেন না, তাঁহারা কেবল ইংরাজি, ইংরাজি, শুধু ইংরাজি লইয়াই মত্ত ইংরাজগণ সব কাহিনী পড়িয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসে। কংগ্রেস ভারতের ব্যাপার—সেখানকার কাজ ইংরাজিতে হইতেছে, নয় হউক, প্রাদেশিক কনফারেন্সে ইংরাজি-বক্তৃতা কেন? বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজিকৃত, সে জন্য কত আন্দোলন হইয়াছিল, আজ অতি আদরের জাতীয়-শিক্ষালয়ে ইংরাজি লইয়া এত বাড়া-বাড়ি কেন? বাঙ্গালা পুস্তক পড়া দূরে থাকুক কেহ বড় একটা সংবাদও রাখে না, বাঙ্গালা-সাহিত্য আজকাল কত সম্পদশালী। আমা-দের কত বড় লোক—আজ কাল স্বদেশ-প্রেমিক, কিন্তু তাঁহারাও, অধিকাংশই, ইংরাজের পোষা-পুত্র! ইংরাজকে ভাল মন্দ সব না জানাইলে যেন সবকীর্ত্তি অশুদ্ধ হয়। এইরূপ উপেক্ষা; হতাদর লইয়া জাতীয় ভাষা, কিরূপে জাগিবে? কি সম্মোহন!

চতুর্দ্দিকে একটা কথা উঠিয়াছে—"স্বরাজ, স্বরাজ!" কিসের "স্বরাজ"? এত দিনের চেষ্টাতেও একটা জাতির গঠন হইল না, কেন মুখে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বল? জাতি না জাগিলে, স্বরাজের অর্থ কি? জাগরিত, সম্মিলিত সন্তানশক্তিই কি "স্বরাজ" নয়? সন্তানশক্তি গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কই মাতার সন্তান-গণ আচার বিচারে, গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ না হইতে পারিতেছে? ষোল আনা গবর্ণমেণ্টের উপর

নির্ভর করিব, অথচ মুখে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিব, বিজ্ঞ লোকেরা কথাটা শুনিয়া যে হাস্য করে, তাহাও বুঝিতে পারি না !! যাহারা, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ;---অযোগ্য দলাদলি, ঝগড়া বিবাদ, পরস্পরের নিন্দা কুৎসা প্রচার করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের মুখে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার কথা ? যাহারা অন্যের টাকা আত্মসাৎ করাকে ধর্ম্ম মনে করে, যাঁহারা ইন্‌সলভেন্সি লইয়া দেনাদারদিগকে পথের ভিখারী করিয়া নিজেরা নবাবী করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না, যাহারা রিপুর উত্তেজনায় কত অসংযত কাজ করে, তাহাদের মুখে "স্বরাজ" শব্দ শোভা পায় কি ? জাতির অভ্যুত্থান ও গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষতাই স্বরাজের একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ; কিন্তু জাতি কোথায় সুষুপ্ত এবং গুপ্ত, ভাব ত ? জাতি যদি, মহাজাগরণের পথে, এক-পায়ে দাঁড়াইত, তবেই "স্বরাজ" আপনাআপনি পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইত, পুলিস ও আদালতের কাজ উঠিয়া যাইত। কিন্তু কোথায় জাতি ? কুমিল্লার অভিনয় আর কোন্ স্থানে হইতেছে ? এমন যে জয়ী বরিশাল, সেও লাট ফুলারের ভয়ে কম্পিত হইল ! এমন যে দুর্দ্ধর্ষ বরিশাল-কন্‌ফারেন্স, সেও ভয়ে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া চম্পট দিল ! এসানসোলের কাহিনী, আন্দুলের ইতিহাস, শান্তিপুর এবং কলিকাতার কথা প্রমাণ করিয়াছে, জাতির জাগরণ এখনও বহু দূরে ! গবর্ণমেণ্টের নিকট, দেশ রক্ষার জন্য সুকার্য্য করিয়াও, যাহারা ক্ষমা চাহিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চায়, বা প্রাণ বাঁচাইতে পরামর্শ দেয়, তাহাদের মুখে "স্বরাজ" শব্দ উচ্চারিত হওয়া অধর্ম্ম-বিজৃম্ভণ মাত্র। ভাই, ক্ষান্ত হও, আর চলাচলি করিও না, মুখে একটা, প্রাণে আর একটা আর সহ্য হয় না। বিজ্ঞেরা বলেন, সিপাই বিদ্রোহ যে দেশে আর একশত বৎসর পরে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, সে দেশে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার এখনও বহু সময় বাকী। রাজনীতির প্রথম কথা—জাতীয় একতা ; ধর্ম্মনীতির প্রথম কথা, সংযম। স্বাধীনতার মূল সোপান চরিত্র এবং আত্মত্যাগ, ধর্ম্ম এবং নীতি। জাতীয় একতা এবং সংযম ভিন্ন কোন দেশে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় না। কোন স্থলে পাশব বলে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়া থাকিলেও, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। আপন রিপুকে যে শাসন করিতে অক্ষম, দেশকে বা দশকে শাসনে রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সংযম নাই, চরিত্র নাই, পুণ্য নাই, সেখানকার স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। তাহা আজ আছে, কাল নাই। তাহা যেন পদ্ম পত্রের জল। মোগল, পাঠানের স্বাধীনতার ন্যায়, তাহা অকালে লোপ পায়। এ কি ছেলে খেলা ? চরিত্রহীন লোকের বৃথা "স্বরাজের" আস্ফালন, বালকের নৃত্য ভিন্ন আর কি ? যাঁহারা মন্ত্রগুপ্তি ও উন্নতির কথা ভুলিয়া "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চাৎকার করিতেছেন, ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এবং "বড়" হইবার জন্য আপন আপন কেন্দ্রে দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে ইংরাজকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং প্রকারান্তরে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠার কারণ হইতেছেন। কলিকাতার শিল্প-মেলা যেমন এবার ইংরাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, ইংরাজিতে "স্বরাজের" কথা প্রচারও, সেইরূপ, ইংরাজকে সতর্ক হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। লর্ড মিণ্টোর কথায়ও তাহা প্রতিভাত। তিনি বলেন, শাসন-

নীতি পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন। শাসন-নীতি যদি আমাদের পদলেহনের আরো অনুকূল হয়, তবে ভারত আরো কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তাহা গণনা করা যায় না। এ কথা পুণ্যশ্লোক নারোজীর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝেন না যখন, তখন বলিতেই হইবে, এক মহা নূতন সম্মোহন উপস্থিত। তিনি বা তাঁহারা, ইংরাজিতে লিখিয়া ও ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া, প্রকারান্তরে, আরো ইংরাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। বহু বৎসর পরে যাহা ঘটিবে, সে কথা আজ কেন? ইংরাজকে রক্ষা করার কি আয়োজন সম্মোহন!

যেখানে যাও, কেবল দলাদলি। সাহিত্য-সমাজে দলাদলি, ধর্ম্ম-সমাজে দলাদলি, রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি,—চতুর্দ্দিকে কেবল দলাদলি। দলাদলির অর্থ আর কি? কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য চেষ্টা। হাজার হাজার লোক চেষ্টা না করিলে সাহিত্য, ধর্ম্ম বা দেশ সমুন্নত হয় না। তুমি এত পরশ্রী-কাতর হও কেন? এত আত্মমর্য্যাদা লইয়া প্রমত্ত হও কেন? একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ফল পাকিলেই ফুটিয়া যায়; আমাদের নেতাদের মধ্যেও তাহাই দেখিতেছি, পরিপক্ক হইলেই ফাটিয়া যায়। "স্ব-স্ব"-প্রাধান্য-ঘোষণা, স্বরাজের পূর্ব্বাভাস কি? পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নেতা ভিন্ন রূপ হইবে? এ কি [illegible]-সংহার-কারী কথা শুনিতেছি? "স্ব-স্ব"-প্রাধান্য-লোলুপতাই কি এদেশের কাল হইবে? যে দিকে চাই, ইংরাজের বিভাগ-নীতিরই জয়, চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতেছে। কি সম্মোহন!!

আমরা ধীরভাবে ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, স্বদেশ-প্রেমের মধ্যেও সম্মোহন-নীতি [illegible] করিয়াছে। "আমি বড়"—"আমি [illegible]—এ শিক্ষা কড় [illegible] শিক্ষা। ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের [illegible] এই "অহং-প্রাবল্য" বদ্ধমূল হইয়াছে। [illegible] চতুর্দ্দিকে ইংরাজিকরণ!! [illegible] হইলেই স্বতন্ত্র হয়, আমরাও, বড় হইয়া, কেবল স্বতন্ত্র হইতে শিখিতেছি। আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তী-পরিবার প্রথা যে স্বার্থ-ত্যাগ ও প্রেম-মন্ত্র-সাধনের পুণ্যময় ক্ষেত্র, আমরা প্রথম হইতেই তাহা ভুলিতে শিখিয়া কেবল "স্ব-স্ব" জ্ঞানের আভিজাত্যে ভূষিত হইতেছি এবং উঠিতে, শুইতে, বসিতে, কেবল "আত্মজ্ঞান"কে সম্বল করিয়া চলিতেছি। দলাদলির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই অমনি নেতারা বলেন—"বিলাতেও দলাদলি আছে"—বিলাতের প্রতি কি অনুরাগ, দেখ ত!! সেখানে একটা জাতি আছে, সেখানে দলাদলি থাকে, থাকুক; কিন্তু আমাদের ভারতে যখন একটা জাতিরই উত্থান হয় নাই, তখন এখানে দলাদলি সাজে কি? ইংরাজগণই বলেন—

"Had our Party-leaders been of a less noble type, Party Government might have proved a failure. It is doubtful whether any nation has produced such a succession of high-minded statesmen as those who have administered the affairs of Great Britain, in office or out of office, since the days of Walpole. They may not always have been blind to the interests of their party, or insensible to the attraction of power or place, but on the whole they have steadily pursued the welfare of England, and to this consideration every other has been sabordinated."

W. H. Davenpart Adams on English Party leaders, Vol, I.

"মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া নেতারা অগ্রসর না হইলে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত

হইত না।" বিশেষতঃ ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। আমরা পরাধীন—আমরা মহৎ উদ্দেশ্য-বিহীন। দেশের সর্ব্বনাশ যখন উপস্থিত হয়, তখন ইংলণ্ডের সকল লোক, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, এক পায়ের উপর দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা? আমাদের ঢাকার হরিণ-চুরি-মোকদ্দমার হরিশ ডেপুটীর মত কত লোক, নিত্য, দেশের স্বদেশভক্ত লোককে ধরিয়া জেলে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছে! যদি জাতীয় একতা থাকিত, হরিশ-ডেপুটী ঐরূপ করার সময় কাঁপিয়া যাইত। কত দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, একজন স্বদেশভক্তের লাঞ্ছনায় শত জন হাস্য করে। জাতীয় একতা থাকিলে একের প্রতি অত্যাচার হইলে সহস্র লোক ক্ষেপিয়া উঠিত। ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আচার বিচারে, আমাদের দেশের লোকেরাই, ইংরাজের গুপ্তচর এবং দেশের শত্রু। স্বার্থপর গুপ্তচরদের নিকট একতার কোন প্রত্যাশা নাই। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আর বাকী যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলির অভিনয়! তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল দেশের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা। "সন্ধ্যার" কথাই বল, বা "বন্দে মাতরমে"র কথাই বল, "নিউইণ্ডিয়া"র কথাই বল, বা 'বেঙ্গলী'র কথাই বল, যেরূপ পরস্পরের নিন্দা ও কুৎসা চর্চ্চায় কাগজ সকল পূর্ণ হইতেছে, তাহা কি স্বদেশপ্রেমিক নেতাদের যোগ্য? যাহা ইংরাজরা চায়, লিখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, আমরা নিজেরাই তাহা সাধন করিতেছি। কি সম্মোহন!

কি একটা জাদুমন্ত্র এদেশকে গ্রাস করিয়াছে—কিছুতেই তাহার হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতেছি না। যে দিকে তাকাই, সকলেই যেন জাদুমন্ত্রে গ্রাসিত;—উঠিতে, শুইতে, যাইতে, বসিতে—আমরা কেবল ইংরাজেরই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছি। সব যেন মেস্‌মারাইজড়। কি সম্মোহন-শক্তি-লীলা! শুনিয়াছি, এক প্রকার সর্প আছে, তাহা উর্দ্ধে উড্ডান পক্ষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পক্ষী সম্মোহিত হইয়া তাহার মুখে পতিত হয়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের ন্যায় পথিকের রক্ত শোষণ নয়, আমরা ইংরাজের কৃপা-দৃষ্টি মাত্রে, স্বেচ্ছায়, স্বদেশ-হিত-চিন্তা-বর্জ্জিত হইয়া, তাহাদের পদলেহনের দিকে যাইতেছি। লাল মুখের তিক্ত বাণীও কত মিষ্ট, শ্বেত পায়ের পদাঘাত কত মধুর, আহা, শ্বেত-সম্মিলন কত তৃপ্তিকর!! "ইংরাজ" স্মরণেই আমরা গলিয়া যাই! শুধু কৃপা-দৃষ্টি মাত্রে নয়,—ইংরাজ-অধিষ্ঠান কল্পনাতেই আমরা আপনাপন ইষ্টানিষ্ট ভুলিয়া যাইতেছি। এত দূর আত্ম-মর্য্যাদা-হীন না হইলে, মুষ্টিমেয় ইংরাজ কি, এমনই করিয়া, ভারত-শাসন করিতে পারিত? কখনই নয়, কখনই নয়। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির কার্য্য চতুর্দ্দিকে চলিতেছে। যেন জুজুর ভয়ে বালক সন্ত্রস্ত! জয়দ্রথ কি অসীম শক্তিশালী ভীমের গতি কখনও বাধা দিতে পারিতেন? ভাবিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, সম্মোহন মন্ত্রের জয় হইয়াছিল, নচেৎ অভিমন্যু-বধ কখনও হইত না? কিন্তু— কিন্তু তাহার পরিণাম কি?

পৃথিবীতে, প্রতিনিয়ত আসুর শক্তির জয়, না দেব-শক্তির জয় হইতেছে? রাম রাবণ ও কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের ইতিহাস প্রতিপন্ন করিয়াছে, এ জগতে পাপ-সংগ্রাম সকলে কেবল দেব-শক্তিরই জয় হইতেছে;—আসুর শক্তি এ জগতে চিরকাল কখনও রাজত্ব করিতে পারে নাই। চীন জাপান যুদ্ধ, রুষ জাপান যুদ্ধ, সত্য ও ন্যায়ের রাজত্ব ঘোষণা করিয়াছে। বুয়র

যুদ্ধও তাহাই। বুয়রগণ যদি পাশব শক্তির নিকট পরাজিত হইত, তবে এত শীঘ্র স্বাধীনতা পাইত না ও ইংরাজ-দর্প-খর্ব্বকারী বোথা প্রধান মন্ত্রী হইত না! ইংরাজের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াও বুয়রনেতা আজ সম্মানিত! সিজর বা নেপোলিয়ন, মোগল বা পাঠান—কোথায় গিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধ, খ্রীষ্ট চৈতন্য এবং মহম্মদের শক্তি, অন্য দিকে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও টলষ্টয়ের শক্তি দিন দিন অজেয় হইয়া উঠিতেছে। যদি তাই হয়, তবে ভারতই কি শুধু, মরিবার জন্য, পাশবশক্তিবলে চির-ইংরাজ-কবলিত হইয়া থাকিবে? ইংরাজ, পাশববলে রাজ্যলাভ করিয়া, পাশববলেই রাজ্য রক্ষা করিবেন, অতি দর্পে ঘোষণা করিতেছেন। এ কিরূপ কথা? উৎকোচ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনার পথ ধরিয়া ক্লাইব পলাসী-সমর জয় করিলেন, দেশ-রক্ষার অসাধারণ কাণ্ডারী নিরস্ত্র সিরাজকে নিহত করিলেন, কেনা জানে?—আজ তাহার স্মৃতি-সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছ, কর; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, সত্য কখনও মিথ্যা হইবে না। আজ মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাহাদের মায়ায় ভুলিয়া হিন্দুর রক্তপানে উদ্যত! ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন এ কলঙ্কিত কাহিনী লিখিবে না। খ্রীষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, নির্যাতেরা ধন্য, কেন না, স্বর্গ তাহাদেরই। (১) যদি আমরা নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া থাকি—বিধাতা সাক্ষী, সত্য সাক্ষী,—এ বিধান নিশ্চয় পরিবর্ত্তিত হইবে। রক্তদানে রক্তবীজের গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইবে। সহিষ্ণুতা, তুই স্বর্গ হইতে, এ ভারতে, নামিয়া আয়। তোকে চুম্বন করিয়া [illegible] হইয়া যাক্।

নিশ্চয় জা[illegible] সম্মোহন-মন্ত্রের [illegible]রূপ সম্মোহনশক্তি [illegible] তাহাতে, অযোগ্য [illegible] চাহিয়া দেখ, এক শ্রেণীর লোক দলাদলি করিয়া আত্ম-প্রাধান্যের চেষ্টা করিয়া মরিতেছে বটে, কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, দেশে ন্যায় ও সত্য-মূলক দেব-শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। অত্যাচার, অবিচার, ঘৃণা, নিন্দা, অবহেলা—নিশ্চয় সব চলিয়া যাইবে। ইংরাজের সম্মোহন-মন্ত্র অচিরে পরাস্ত হইবে, নিশ্চয় জানিও। এক অদ্বিতীয় শক্তি, ভারত ব্যাপিয়া জীবনোৎসর্গের অনিন্দিত গীতা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, অচিরে তাহার সম্মোহন-শক্তিতে মানুষ আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিখিবে। নিশ্চয় জানিও, অচিরাৎ এই সুমুক্ত ভারত জাগিয়া উঠিবে।

এতদিন যে অত্যাচার হইতেছিল, তাহারও সীমা ছিল। মানুষ এত দিন কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারিত। পেটের জ্বালায় এদেশের লোক, না সহিয়াছে, এমন অত্যাচার নাই, ধন প্রাণ সব ইংরাজের শোষণ-নীতিতে উৎসর্গ করিয়া, নিজের দেশে ভিখারী সাজিয়াছে। তবুও অত্যাচার সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে, দুর্নীতির এখন চরম দশা উপস্থিত! এখন ইংরাজ ভারতবাসীর দ্বারা ভারতবাসীর বিনাশ-সাধনে চেষ্টা করিতেছে, স্মরণ কর। সন্তান দ্বারা পিতৃহত্যা, ভ্রাতা দ্বারা ভ্রাতৃহত্যা, সতী দ্বারা স্বামী হত্যা হইবে! সর্ব্বস্বান্ত পল্লীবাসী, আর

1 Blessed *are* they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the Kingdom of heaven.

St. Matthew, V. 10.

**সহ্য করা অসম্ভব বলিয়া, কি এক স্বর্গীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইতেছে,** যাহাতে **মরিতে আর তাহার ভয় নাই।** মাভৈঃ **মাভৈঃ রবে মফঃস্বলের লোকেরা** মরিবার **জন্য বুক পাতিয়া দিতেছে।** দেখিয়া শুনিয়া **সকলে অবাক্ এবং নিষ্পন্দ!**

এই অবতীর্ণ সহিষ্ণুতার শক্তিকে কি উপেক্ষা করা যায়? চাহিয়া দেখ, এক অত্যাশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা-সম্মোহন-শক্তি শিশু-ভারতে অবতরণ করিয়াছে। ইহার দুর্জ্জয় প্রভাবে, নিশ্চয় জানিও, কালে সকল শক্তি পরাস্ত হইবে। নিশ্চয় জানিও, কালে এই শক্তি সর্ব্বগ্রাস করিবে—সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে, সকলকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং যোগক্ষেমের প্রতিষ্ঠা হইবে।

কেহ কেহ বলেন,গোলা নাই,গুলি নাই, অস্ত্র নাই,শস্ত্র নাই,রামজীবন দারোগার আস্ফালন আছে। আমরা বলি,যদি ভারতে স্বদেশ-প্রেম, একতা, সহিষ্ণুতা,ধৈর্য্য, চরিত্র, সংযম অবতরণ করে, তবে কিছুর অভাবেই কাজ আট্‌কাইবে না। ভারতের অর্থে ক্রীত ঐ সকল গোলাগুলি কাহার, বল ত? ঐ সকল অস্ত্রাগার কাহার,বল ত? আমরা যদি আমাদের হই;—দলাদলি যদি চলিয়া যায়—সকল স্বদেশী যদি স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে আর চাই কি? ভয়টাকে যদি ডুবাইতে পারা যায়,—ইংরাজ-সম্মোহন-শক্তি যদি পরাস্ত হয়, —তবে ভারত ব্যাপিয়া জাগিয়া উঠিবে, এক দুর্জ্জয় নির্ভীক অমরজাতি;—প্রাণত্যাগ ক্ষেত্রে চলিয়া আসিবে লোকের পর লোক, বংশের পর বংশ—অসংখ্য লোক-সজ্ব। দেশের জন্য তাহারা দেহত্যাগ করিয়া অমরত্ব পাইবে। অথবা, এক-মাতৃক, এক-নৈতৃক, এক-ভাষিক,এক-ধার্ম্মিক—পবিত্র স্বাধীনতার দল জাগিয়া উঠিবে। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়—কেবল তখন সম্মিলিত-শক্তিই রাজত্ব করিবে এবং "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সাধনার যে সঙ্কটময় পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, সে পথ বড় সোজা পথ নয়। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক স্বার্থত্যাগ,অনেক কঠোর তপস্যার পর তাহা সিদ্ধি লাভ করিবে। আর এখন? আবার বলি, এখন চাই, মন্ত্রগুপ্তি, চাই সহিষ্ণুতা, চাই ধৈর্য্য,চাই চারিত্র্য-বল, চাই সংযম,চাই প্রেম, চাই একতা। ভাই,তুমি যদি বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া থাক,তবে একতার শক্তি-সাধনে কঠোর তপস্যা আরম্ভ কর। লক্ষ্মণের ন্যায় যুগান্তর-ব্যাপী কঠোর তপস্যা ভিন্ন ইন্দ্রজিত-মহাশত্রু বিনাশের দুর্জ্জয় শক্তি বা অমোঘ অস্ত্র লাভ করিতে পারিবে না। বাল্যের ক্রীড়া, যৌবনের বিলাস-মত্ততা, প্রৌঢ়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সব ভুলিয়া মহাশক্তি-সাধনায় ডুবিয়া যাও। যদি বিধাতা কৃপা করেন, অসাধ্য সাধিত হইবে। মায়ের সন্তান মায়ের পূতনামেও যদি এক হইতে না পারে, তবে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। মায়ের নামে, সকল ভাই এক-ঠাঁই, সব বাড়ী এক বাড়ী, সব প্রাণ একপ্রাণ হইবে। এক মহাপ্রাণতার রাজ্য জাগিয়া উঠিবে। সেখানে পরবোধ নাই, দলাদলি নাই,হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, পরশ্রীকাতরতা নাই। বন্ধু, যদি সেই পুণ্যময় ধামে যাইতে চাও, কুহকমন্ত্র ভুলিয়া, সংযম এবং সহিষ্ণুতার পথে অগ্রসর হও। মায়ের পুণ্য আশীর্ব্বাদে স্বাধীনতা নিশ্চয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। বল, জয় মা আনন্দ-ময়ীর জয়; জয়—মাতৃভূমির জয়।

১লা বৈশাখ, ১৩১৪।

# আদর্শ সংস্কারক দয়ান[illegible]

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মহাত্মা দয়ানন্দের সুবৃহৎ জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া হিন্দু সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করেন ; তাহা পাঠ করিয়া আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। দয়ানন্দ যে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত ; দেশী বিদেশী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,পৃথিবীর ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী আচার্য্যগণের মধ্যে দয়ানন্দকে স্থান দিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকালে দয়ানন্দ কাশীধামে উপস্থিত হয়েন ; আমরাও তখন সেইখানেই ছিলাম। সকলের মুখে এক কথা ;—পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনোদ্দেশে একজন সন্ন্যাসী পণ্ডিত আসিয়াছেন। মহা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমরা তাঁহার বাসস্থান আনন্দবাগে গিয়া দেখিলাম, শুদ্ধ মানসিক তেজে নয়,দৈহিক বল ও জ্যোতিতেও তিনি লক্ষের মধ্যে একজন। প্রথমে আমরা ইংরাজী ভাষাতে প্রশ্নাদি আরম্ভ করিলাম। একব্যক্তি দোভাষিয়া হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। ওরূপ প্রণালীতে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মাতৃভাষা কি ? উত্তরে, বাঙ্গালা, শুনিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "তাহাই ব্যবহার কর, আমি অনায়াসে বুঝিব।" সে সময় তিনি সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কহেন না, সে সংস্কৃত এত সরল যে,আমরা অনায়াসে বুঝিতে লাগিলাম। ইহা[illegible] পণ্ডিতগণের [illegible] সংগ্রাম সংঘটি[illegible] না বলিয়া কোলাহল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, কারণ তথায় পুরাণের উপর বেদের জয় সাব্যস্ত হইলেও বিপক্ষগণ জোর করিয়া উহা অস্বীকার করতঃ "মহারাজের জয় !" অর্থাৎ পৌরাণিক দলের জিত, ঘোষণা দ্বারা সভা ভঙ্গ করেন ;—কাশী-নরেশ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, যেন তাঁহার সেনাপতিত্বের অধীনে বারাণসীর "অতিরথ মহারথগণ" দয়ানন্দের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনেকবার অনেক জায়গায় দয়ানন্দের সহিত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি ঘনিষ্ট ব্যবহার হইয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের কথা থাকুক, সেই ধীর-গম্ভীর, শান্ত-সমাহিত, অটল-অচল ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ হইলে বাস্তবিকই হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক ও আশার সঞ্চার হয় যে, ভারতের দিন ফিরিবে ; আমরা যতই ঐরূপ ভাবের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইব, ততই আমাদের উন্নতি নিকটতর।

অসাধারণ বুদ্ধি, অনুপম পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার ফলে দয়ানন্দ নিজে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা নির্ভীকচিত্তে প্রচার করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। বালব্রহ্মচারী দয়ানন্দের কান্তিপুষ্টিকলেবরে যেরূপ সামর্থ্য ছিল, তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়েও তেমনি অমিত বলশালিতা প্রকাশ পাইত। দয়ানন্দ যদিও ধর্ম্মপ্রচারব্রতে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু দেশের সকল প্রকার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, এবং সেই চিন্তার ফল মুখে [illegible]

কাগজে কলমে সকলকে জানাইতে যত্ন পাইতেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের নামগন্ধও ছিল না, কিন্তু যতবার যেখানে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার কথা উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। হিন্দুদিগের সর্ব্ববিধ কল্যাণ যে তাঁহার নিরন্তর ভাবনার বিষয় ছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা খুব জোরের সহিত দিতে পারি। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে মাসাবধি প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে আট দশ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সমাজের ঐ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে নানারূপ উপায় চিন্তাতে তিনি অনবরত নিযুক্ত থাকিতেন। গোরক্ষা ও শ্রমজীবী দরিদ্রদের উন্নতি বিষয়ে বহু যত্নে বিস্তর সম্বাদ সংগ্রহ করতঃ তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা ও তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

দয়ানন্দের প্রধান কীর্ত্তি আর্য্যসমাজ সংস্থাপন। সেই আর্য্যসমাজ আজ কাল ভারতে কিরূপ একটা বিরাট শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বাঙ্গালার বহুপূর্ব্বে পঞ্জাব প্রদেশে স্বদেশী চেষ্টা আরম্ভ হয়, আর্য্যসমাজের লোকেরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী। আর্য্যসমাজীগণ যেরূপ নানাবিধ সংস্কার ও উন্নতি কল্পে কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের সহিত আমরা সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও, হৃদয়ের সহিত তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত উদ্যম প্রভৃতি গুণের বলিহারি দিতে ত্রুটি করিব না। দেশের পক্ষে যে সকল কাজ হিতকর, তাহার অনুষ্ঠান এবং যাহা অশুভ ফলপ্রদ, তাঁহার সংস্কার না করিয়া কেবল উচ্চরবে বাক্যব্যয় করিলে স্বদেশ-সেবা হয় না; পঞ্জাবের শ্রদ্ধেয় "আর্য্য" ভ্রাতৃগণ হাতে হাতে যে সমস্ত সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, ইহা যে তাঁহাদের স্বর্গগত আচার্য্যদেবের উপদেশ ও উদাহরণের ফল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা প্রকৃত মাতৃভক্ত, পতিত ভারতের কল্যাণকামনা সর্ব্বদা যাঁহাদের মনে জাগ্রত আছে, তাঁহারা মতামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যেখানে খাঁটি কাজ দেখিবেন, সেইখানেই গিয়া স্কন্ধ অর্পণ করিবেন, সুতরাং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে আর্য্যসমাজী মহোদয়গণের যে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা, তাহার সাহায্য করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা কেবলমাত্র নিজের বড়াই, খোস্‌নাম, হাততালি, বাহবা প্রভৃতি ভুশিমালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশসেবক নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সুমধুর গলাবাজীতেই মত্ত থাকুন, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ যেটুকু সুফল ফলে, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট।

উপসংহারে দেবেন্দ্রবাবুর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি আজ বিংশবর্ষাধিককাল ইনি বিশেষ যত্নসহকারে সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত আছেন; বিগত কয়েক বৎসর নানা জনপদ পর্য্যটন করতঃ দয়ানন্দ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সংগ্রহে কালাতিপাত করিতেছেন। ভারতবাসী ও বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট ঋণী। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, দেবেন্দ্রবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# লোক-শিক্ষার সনাতন আদর্শ। (২)

এই সমস্ত প্রণালীর প্রতি সাধারণের দৃষ্টিপাত তীক্ষ্ণ কঠোর হইলে চলিবে না। জ্যামিতির পরিমাপ সাহায্যে এই সমস্ত প্রণালী সৃষ্ট হয় নাই, যুগাগত চিন্তার গতি এবং বিস্তৃতির প্রকৃষ্ট পথ কুঞ্চিতকায় লতার গতির ন্যায় আপনা আপনি জল,বায়ু,আতপ শৈত্য প্রভৃতির আনুকূল্য পাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার প্রতি উপেক্ষা,আমাদের অতীতের ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষার নামান্তর মাত্র।

যদি বলি, ভারতবর্ষের ইতিহাস বহুপরিমাণে ধর্ম্মগত এবং সমাজগত, তবে আশা করি, তজ্জন্য সুদীর্ঘ ভাষ্য দিতে হইবে না। ধর্ম্ম এবং সমাজের বহির্ভূত অন্যান্য প্রশ্ন চিরকালই ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষুদ্র ছিল।

কথাটা আর একটু প্রস্ফুটভাবে বলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত স্বার্থদ্বন্দ দূর করিবার জন্য সমাজ যে সমস্ত ত্যাগ, সাধনা, বিচার, বিবেচনা আনিয়া উপস্থিত করে, ধর্ম্ম তাহার অলৌকিক প্রতিষ্ঠা দিয়া যদি সমাজ-দেহময় একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করে, তবে জীবনেতর এবং জীবনের বহুমুখী কর্ত্তব্য-পরম্পরা উহার অখণ্ড স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশের জন্য দূরের কিম্বা নিকটের কোন অতিথিশালায় গিয়া উপবাস করে না। ইংরাজ আজ খাদ্য না পাইয়া অষ্ট্রেলিয়া বা কেনেডার দিকে হা করিয়া চাহিয়া আছে,ইহাদের সামান্য অসন্তোষ আজ ইংরাজের ললাট কুঞ্চিত করিয়া দিবে, কারণ ইংলণ্ডের দেহ সীমার মাঝে ইহার সমগ্র প্রশ্ন মীমাংসিত হয় নাই। অন্যান্য দেশের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার অসন্তোষ অতিরিক্ত হাস্যের মাত্রা কিঞ্চিৎ কমাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয় হাস্যের অবারিত স্রোতঃ মন্দীভূত করিবে না।

বিলাতী বহু গ্রন্থকার ভারতের গ্রাম্য সঙ্ঘের অপূর্ব্ব গঠন কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলতা এবং কল্যাণ-মুখী প্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই রূপ আশ্চর্য্য গঠন-নৈপুণ্য যে কোন দেশের পক্ষে হিতকর এবং যথার্থ গর্ব্বের বিষয়।

আমাদের গর্ব্বের বিষয় ত রহিয়াছে—কিন্তু তবুও তজ্জন্য নৃত্য করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না, এইজন্য যে, জগতে আজ সামাজিকতার বাড়াবাড়ি বড় বেশী। আমার পরিবারের স্ত্রী পুত্রকে ভরণ পোষণ করিয়াও আমার নিস্তার নাই। কিছুকাল হইতে এক উৎকট ভ্রাতৃভাবের আবর্ত্তে জগতের নানা অদ্ভুত জাতিগুলি পরস্পরের কাঁধে চড়িয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং নৃত্য করিতে অসঙ্গত হইলেও অন্য কাহাকেও স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতা নাই। এই রূপে এসিয়ার কণ্ঠে নানা দৈত্য দানব আসিয়া জুটিয়াছে।

ষ্টীম-এঞ্জিন-রূপে,বিদ্যুৎরূপে নানা দানবী শক্তি আজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ঘোরতর বিপ্লব সৃজন করিয়াছে।

আমরা অঞ্জনা গ্রামের লোক। মধ্যগত অঞ্জনা নদীটী আমাদের গ্রামকে উর্ব্বরতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের গ্রামের সকল অভাব অভিযোগ আমরা দূর করি। গ্রামে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা সকলের

অভাব পূর্ণ হয়,কিন্তু ঐখানে যদি আমাদের ইতিহাসে পূর্ণ হইত, তবে আমাদের অপেক্ষা সুখী কে?

কিন্তু তাহা হইবার নহে। এক বৎসর সকল ধান্য রেলওয়ের লৌহ-উদরে পূর্ণ হইয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেল। আমাদিগকে আহারের জন্য পরের অতিথি হইতে হইল। এই নূতন সামাজিকতা হইতে কলহ বিবাদ, যাহা উপস্থিত হইবে, তাহা বিচার করিবার অধিকার কোন বিশেষ গ্রামের নাই,এইরূপে গ্রাম্য-সঙ্ঘ সমূহের সম্পূর্ণতাও যথেষ্ট হইল না, পল্লীর দৃষ্টি পল্লী হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কোন পল্লীর দেহসীমার মাঝে যদি উহার নৈতিক এবং আর্থিক প্রশ্নগুলির সুন্দর মীমাংসা ঘটে, তবুও এই অবস্থা উহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

এইজন্য, আমাদের গ্রামসমূহ এমন আশ্চার্য্য একটী গঠনের অধিকারী হইয়াও অলক্ষিতে দীনহীন হইয়া, আজ রিক্তহস্তে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, বহুপুরাতন একখণ্ড গৈরিক বসন পরিধান করিয়া,মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, তাহাকে আজ জগতের সকলেই অস্বীকার করিতেছে। মোটরকার (motor car) ও মুদ্রা যন্ত্রের হট্টগোলে, জুটমিল ও কো-ওপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটির ভৌতিক তাড়নায় সে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বাস করিতেছে। নৃপতি হরিশ্চন্দ্র আজ শ্মশানের উত্তাপে দেহের শৈত্য দূর করিতেছে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময় আমাদের গ্রামগুলির মাঝে এরূপ সম্পূর্ণতা আছে যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামগুলি যেন এক একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন সৃষ্টি। প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মকৃত্যের জন্য ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, সঙ্গে ব্যবসায়ী দাল চাল যোগাইতেছে—একঘর তন্তুবায় গ্রামের কাপড় যোগাইতেছে, একঘর ধোবা, হয়ত এক পরিবার নাপিত, এইরূপে সামাজিক প্রয়োজনীয় সকল জাতিই গ্রামের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়া এক আশ্চার্য্য সৃষ্টিরূপে দেখা দেয়। গ্রামকে গ্রামের অভাবের জন্য কখনও বাহিরে যাইতে হয় নাই। উহা বাহিরের দিকে তেমন ভাবে কখনও দৃক্পাত করে নাই।

এইখানেই ইহার অপরাধ। সম্পূর্ণ তৃপ্তি আমাদিগকে বহির্মুখী কর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ করিয়াছিল। পল্লীর সর্ব্বতোমুখী সম্পূর্ণের মাঝে এমন এক অনির্ব্বচনীয় রস আছে,যাহা পল্লীবাসীরই উপভোগ্য, যাহার জন্য সে বাহিরের সুখকে, বাহিরের উত্তেজনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে। পারিবারিক সর্ব্বতোমুখী আনন্দ-রসের সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যেক গ্রাম যেন এক একটা বৃহৎ পরিবার ছিল। ইহার সুখ দুঃখ, আনন্দ উৎসব, প্রেম ভক্তি জীবনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই পরার্থমুখী স্বার্থপরতার সারল্য পল্লীজীবনকে দুঃখদৈন্যের, মৃত্যুশোকের কবলতার মধ্যে এক অভিনব গৌরবে এবং স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়াছিল।

আমাদের গ্রামগুলি ইন্দ্রজালে গঠিত হয় নাই। ইহার প্রচুর ইতিহাস রহিয়াছে। ইহার শিকড়ের শোণিতরসের মাঝে বহুকালের নৈতিক শিক্ষার অণুপরমাণু চলা ফেরা করিতেছে, নচেৎ অতি সহজে মানুষের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি সোণার শৃঙ্খলে ধরা দেয় নাই।

এই নৈতিক শিক্ষা এমন বিস্ময়জনক সাফল্যের সহিত বিস্তারিত এবং প্রবাহিত হইল কিরূপে? যদি এই পরিণামকে এক-

দিনের কাণ্ড মনে না করি, তবে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি, গ্রন্থের কিম্বা পাণ্ডিত্যের উপাদান আদৃত না হইয়া, আরও গুরুতর ভাবে এবং সামাজিক ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের দেশে আক্ষরিক শিক্ষা ছিল না, একথাও বলিয়াছি, জ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষে তাহা একমাত্র পথ নহে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা প্রচীনকালেও ছিল না। সম্প্রতি দেখা যাক্, কি উপায়ে দেশে লোক-শিক্ষা বিস্তৃত হইত।

ভিন্নদেশীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় সাধারণের অদ্ভুত স্মরণশক্তি দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছে। বেদের ন্যায় প্রকাণ্ড গ্রন্থও কাহারও মতে ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণের কণ্ঠস্থ রাখা অসম্ভব ছিলনা। বৈদিকজ্ঞান কণ্ঠে কণ্ঠে প্রসারিত হইত। মুদ্রাযন্ত্রের অভাব-সত্ত্বেও মৌখিক শিক্ষা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের স্বরূপ এবং প্রণালী সকলেই গ্রহণ করিত।

এমন কি, এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও, বর্ত্তমান সময়ে কলাপ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ভারতবর্ষের একটা বিশেষত্ব। দেখা যায়, মৌক্ষিক শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতাব মেরুদণ্ড রূপে অবস্থিত ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যাক্, যে ধর্ম্মজ্ঞান ভারতের নরনারীর মজ্জাগত এবং যাহার জন্য সে আজ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকেও জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহা পল্লীময় প্রসারিত হইত কিরূপে?

কিন্তু ইহা আলোচনার পূর্ব্বে, আক্ষরিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে অপরিহার্য্য নহে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা আক্ষরিক শিক্ষা পায় নাই, অথচ যাঁহাদের বিষয় বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা এত তীক্ষ্ণ যে, সেখানে সন্দর্ভসার ও বীজগণিত কুল পায় না। এই দৃষ্টান্ত যেখানে সেখানে রহিয়াছে। এমন অনেক নারী আমাদের সমাজের মঙ্গল-ময়ী মূর্ত্তিরূপে গৃহকোণ আলোকিত করিয়া আছেন, যাঁহারা ক-খ-গ জানেন না, অথচ রামায়ণ মহাভারতের সমগ্র উপাখ্যান পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জানেন এবং যে কোন পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক আলোচনা করিতে পারেন। কৃষকদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন, মামলা মোকদ্দমার সমগ্র পন্থা, স্বত্ব, দখল-নীলাম প্রভৃতি আধুনিক কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর রাখে।

রাষ্ট্রনৈতিক যে কোন প্রশ্ন তাহাদিগের নিকট উত্থাপন কর, অতি সহজে উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবে। যদি ইহাদিগকে লিখা পড়ার ভিতর দিয়া কোন বিষয় জানাইতে চাও, তবে আরও পঞ্চাশ বৎসর প্রয়োজন, কিন্তু মুখে মুখে সে যে কোন দুরূহ জটিল তত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি করিবে। উহাদের মন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তৈয়ার হইয়াছে, তোমার কেবল খাদ্য জোগাইলেই হইল।

আক্ষরিক শিক্ষার অভাব মাত্রই লজ্জাজনক, এটা একটী অত্যন্ত আধুনিক চর্চ্চিত বিলাতী ভাব, আক্ষরিক শিক্ষার অভাবই গণ্ডমূর্খতা, এটাও ইউরোপ হইতে চুরি করা মূর্খতার দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ শিক্ষার প্রণালীভেদ রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতির পক্ষে তাহা এক রূপ নহে।

এই জন্য, অনুপাতে আমাদের দেশে স্কুল-শিক্ষা বা আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃত না হইলেও, হঠাৎ হতাশ হইয়া যাওয়া ঠিক নহে—দেশকে অধ্যয়ন করিতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে।

দেশে যথেষ্ট বারুদ রহিয়াছে—উহাকে ধূলি-জ্ঞান করিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে বিরত হওয়া, বিলাতী হিপনটিজেমের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে অক্ষর সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে এবং এমন কি, পরেও যে মৌখিক শিক্ষার আদর এবং সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য তাহার প্রমাণ।

শুধু ভারতে কেন, ইউরোপেও পুঁথিপত্র উল্টাইয়া যে জ্ঞান হয় না, শেরিডান্ বা ফক্স কিম্বা নব্য রাজমন্ত্রীগণের বক্তৃতার চোটে তদপেক্ষা বেশী হয়। প্লেটোর কেতাবে যতটা হইয়াছে, সক্রেতিসের বাজারের কথাবার্ত্তায় তদপেক্ষা কম হয় নাই।

কারণ,মৌখিক শিক্ষাটা একেবারে প্রত্যক্ষ এবং শরীরী শিক্ষা। জীবন জীবনের উপর, মানুষ মানুষের উপর, প্রত্যক্ষভাবে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যাহা বিকশিত করিয়া তুলিবে, কৃষ্ণবর্ণ মসীর কয়েকটা বঙ্কিম রেখা-পুঞ্জ তাহার ভগ্নাংশও করিয়া তুলিতে পারে না, এজন্য, এত অভিধান-ডিক্সনারী, ভাষ্য-ব্যাখ্যা সত্ত্বেও পৃথিবীতে গুরুগিরি এবং শিক্ষকতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই, এবং কোরাণ বাইবেল, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি যথেষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ থাকিলেও, অবতার বা মহাপুরুষ কিম্বা স্বামী বা সন্ন্যাসী প্রভৃতির দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে না।

সংস্কৃত সাহিত্যের আকৃতিটা একান্ত অনুধাবনার বিষয়। স্পেন্সার, দার্বিন যেরূপ রীতিমত কোন একটা বিষয় লইয়া আলোচনার গ্রন্থিগুলি অক্ষরে সংযোগ করিয়াছেন, বেদ-গীতা কিম্বা মহাভারত প্রভৃতি সেভাবে রচিত হয় নাই। মহাভারতে "বৈশম্পায়ন কহিলেন" "জনমেজয় কহিলেন" প্রভৃতি ভূমিকার পরে আখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। গীতাতেও "অর্জ্জুন উবাচ" "শ্রীকৃষ্ণ উবাচ" প্রভৃতিতে আরম্ভ করিয়া উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষে সব কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রূপ ছাঁচে প্রায় সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছে।

ইহা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহার ভিতর দিয়া জাতীয় প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা প্রয়োজন। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয়,আক্ষরিক যুগের পূর্ব্বে কথোপকথনমূলক শিক্ষা এদেশে বিশেষভাবে আদৃত হইত। এজন্য বৈদিক ঋষিগণের স্তবগান, আলোক বায়ুর ভিতর দিয়া প্রশান্ত সুনীল ব্যোম-মন্দির-চূড়ায় ঝঙ্কৃত হইত, এবং লোকালয়ের আখ্যান সমূহ নৃপতির উজ্জ্বল-গম্ভীর সভামণ্ডপের চতুষ্কের চারিপাশে, তপোবনের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল কুটীরের হোম-বেদীর কম্পিত বহ্নিশিখার আবর্ত্তে, সমীরিত হইত। কথাবার্ত্তা,আখ্যান-গল্প এবং অন্যান্য নানা উপায়ে মৌখিক শিক্ষা বিস্তৃত হইত।

আক্ষরিক যুগের পরেও এ প্রণালী আদৃত হইয়া আসিতেছে। কারণ হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে দেশের জ্ঞান বড় একটা বিস্তৃত হইতে পারিত না। সাধারণ লোক-শিক্ষার রাজপথ বরাবরই মৌখিক শিক্ষা বিস্তৃত করিয়া আসিয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে,আক্ষরিক শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য্য, এ কথা বলা যায় না।

সম্প্রতি নৈতিক এবং ধর্ম্মগত শিক্ষা বিস্তৃতির প্রাচীন পথগুলি আলোচনা করা যাক্। কারণ, এই পথই আমাদের সনাতন এবং স্বাভাবিক পথ—অন্য আদর্শে রচিত নূতন পথ গঠনের কল্পনা সফল হইতে এখনও শত বর্ষের প্রয়োজন,—বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক

জীবনে এতদিনের বৃহৎ শূন্যতা একান্ত মারাত্মক। পারলৌকিক মোক্ষের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা চলে, কিন্তু ইহকালের জন্য এতটা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভাব প্রচারে অক্ষমতা, জাতীয় বিনাশের সূচনা করিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায়গত বৈষম্যে সময়ের অনেক তারতম্য উপস্থিত করিবে—কোন বিশেষ পথে আমাদের পাঁচ বৎসরে কার্য্য যে পরিমাণ অগ্রসর হইবে, অন্য পথে হয়ত পাঁচ শত বৎসরেও ততদূর হইবে না।

আমাদের দেশে নানা উপায়ে ধর্ম্মগত ভাব বিস্তার হইত। তখনকার দিনে ধর্ম্ম জিনিসটার এত সঙ্কীর্ণ অর্থ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিশেষ দিকে নানা শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ লোক দ্বারা অধীত হয়, এজন্য ধর্ম্ম শিক্ষা নীতি প্রভৃতি ব্যাপার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে তখন পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক সমগ্র বিচার বিবেচনাকে অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইত। তাহা জীবনে ধ্রুব কেন্দ্রের ন্যায় সকলের ব্যক্তিগত সর্ব্বতোমুখী প্রবৃত্তি সমূহের পরিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিত। এবং বর্ত্তমান সময়ের নেহাৎ সংসার হইতে অসংলগ্ন একদিন কি দুই দিনের তামাসায় পর্য্যবসিত হইত না।

হিন্দুদের পূজার সংখ্যা নেহাৎ কম নহে। প্রায় প্রতি মাসেই কোন উৎসব, কোন ব্রত রহিয়াছে। ইহাদের সামাজিক দিকে আলোচ্য বিষয় কৌতুহল আকর্ষণ করিবার যোগ্য। চণ্ডীপাঠ, এবং পূজা শেষে নানা পুঁথি পাঠ সম্প্রতি শুধু নামমাত্র চলিতেছে, কিন্তু এক সময় তাহা পরিবারের এবং সমগ্র গ্রামের আবাল বৃদ্ধের কর্ণগোচর হইত। এবং এই সমস্ত পুঁথি শ্রবণ করাই একটী মহান্ উৎসবের স্থান অধিকার করিত। শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে গীতা পাঠ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। এইরূপে নরনারীর মাঝে মৌখিক শিক্ষা বিস্তৃত হইত।

ইহা দ্বারা আরও বহু পথে লোক-শিক্ষা প্রসারিত হইত। সময় বিশেষে এবং ঋতু বিশেষে পূজা প্রভৃতি ছাড়াও নানা পুঁথি পঠিত হইত। এখনও বঙ্গের নানাস্থানে শ্রাবণ মাসে "মনসার ভাসান" সুরসংযোগে গ্রামে গ্রামে পঠিত হয়। এক সময়ে যাহা আনন্দধ্বনিতে সমগ্র গ্রামকে মুখরিত করিত, আজ তাহার উত্তেজনা হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

ইহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশে আর এক শ্রেণীর লোক ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছে—তাহা হচ্ছে কবির দল।

ইহাদের ইতিহাস অতি বিচিত্র। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশে সাধারণ লোকশিক্ষা-বিস্তৃতির জন্য কবির গান যতটা সাহায্য করিয়াছে, এমন আর কিছুই নহে। বাঙ্গালা দেশে ইহার আকর্ষণ একেবারে বিস্ময়জনক, দিবা রাত্র অনবরত তিন চার দিন ধরিয়া লড়াই দেখিয়াও বাঙ্গালী কৃষক ক্লান্ত হয় নাই। ঝগড়া দেখিবার একটা প্রাকৃতিক ইচ্ছা বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে আশ্চর্য্যজনক কিছুই নহে—কিন্তু ইহা ছন্দোবন্দে আবদ্ধ হইয়া সাধারণ কলহের গণ্ডী-নির্ম্মুক্ত হইয়া যখন প্রাচীন কাব্য কাহিনীতে একেবারে কৃষকের আসরে হাজির হয়, তখন ইহার মোহিনী শক্তিকে বাঙ্গালী মুটে মুজুর, কৃষক জোলা প্রভৃতি অবহেলা করিতে পারে নাই। আনন্দের বিষয় নানাস্থানে এই কবির গানের

ভিতর দিয়া স্বদেশী ভাব বিস্তৃত করিবার চেষ্টা অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হইয়াছে।

এই কবিগানের শত শত দল বাঙ্গালা দেশের প্রতি পল্লীতে বিবরণ করিয়া মৌখিক ভাবে লোক শিক্ষা বিস্তৃতি সাধন করিত।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশ কেন, ভারতবর্ষেও যত মহান্ এবং বিরাট্ ধর্ম্মগত আন্দোলন হইয়াছে, আক্ষরিক শিক্ষার ভিতর দিয়া হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের এসিয়াব্যাপী প্রসার কি কেবল আক্ষরিক শিক্ষা দ্বারা হইয়াছিল? তখন কি ভারতবর্ষের জনসাধারণ লিখাপড়া জানিত? তবে এইরূপ বিরাট্ এবং বিপুল বিপ্লব হইল কিরূপে? উত্তর হচ্ছে, মৌখিক শিক্ষা দ্বারা।

যদি বহু কোটি লোক অধ্যুষিত বিরাট্ এসিয়া মহাদেশে আক্ষরিক শিক্ষা ছাড়া ধর্ম্মজগতের গুরুত্বপূর্ণ এমন ভয়ানক ভাববিপ্লব সম্ভব হয়, তবে কয়েক কোটি লোকের মধ্যে তীব্রভাবে প্রবাহিত কোন ভাব-বিপ্লব আনিতে দুই তিন শত বৎসর বসিয়া ক-খ-গ কিম্বা এ-বি-সি পড়াইতে হইবে কেন?

শঙ্করাচার্য্য যে সমগ্র ভারতবর্ষময় তাঁহার আধ্যাত্মিক মতচর্চ্চায় সফল হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে হীনজ্যোতিঃ করিয়া নিতান্ত অল্পবয়সে দেহত্যাগ করিলেন, তাহা সম্ভব হইল কিরূপে? তাঁহাকেও জেলায় জেলায় প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিতে হয় নাই এবং পশুপক্ষীর হস্তপদের সংখ্যা গণনামূলক পাঠ্য পুস্তক পরীক্ষায় কোর্শরূপে নির্ব্বাচিত করিতে হয় নাই। তিনি, দেশে ভাব প্রচারের যে সমস্ত প্রচলিত পন্থা রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া সমাজদেহময় ভাববিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে চৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রভাব এবং বৈষ্ণবী নেশায় মাতোয়ারা জনসাধারণ আক্ষরিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে নাই। উহা মৃদঙ্গ-করতালের ভিতর আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশময় সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে এক বিপুল প্রেম-বিপ্লব আনিয়াছিল—তাহা জাতিভেদ-সম্প্রদায়-ভেদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এক বারে কুটীরে কুটীরে প্রবাহিত হয়। এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাব এখনও অমর রহিয়াছে—এখনও প্রতি গ্রামে ইহা ভাব-প্রচারের এক প্রধান এবং জীবন্ত পথ। এখনও আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইহার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়—জমিদার ও কৃষক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করে না।

বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সামাজিকতা এবং সম্মিলন-প্রবণতা ঘটাইবার পথ নিতান্ত কম। মুসলমানদের সুবিধা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট—প্রতি গ্রামেরই সকল মুসলমানকে উপাসনার জন্য একত্রিত হইতে হয়—হিন্দুরা নির্জ্জনে স্বতন্ত্র ভাবে উপাসনা করার পক্ষপাতী—তাহাদের সামাজিক উপাসনার সুবিধা তেমন একটা নাই। অথচ বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সামাজিকতার ফল যথেষ্ট এবং তাহা জাতিগত জীবন হিসাবে এক রূপ অপরিহার্য্য। এইজন্য সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি যে কয়টা সমগ্র দেশব্যাপী অনুষ্ঠান আছে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। বলা আবশ্যক, চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রভাব কৃষকদের সামাজিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে নাই।

চৈতন্যের প্রভাবের ফলে দেশে এক দল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সৃষ্টি হয়—তাহারাও সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে সমগ্র বৈষ্ণবগণ ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি

গান গাহিয়া বেড়ায়। এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী একটী একেবারে প্রস্তুত অনুষ্ঠান দেশের মধ্যে রহিয়াছে—তাহাদের কাজকর্ম্ম বেশী কিছু নাই—কিন্তু দেশ আনন্দে তাহাদের আহার যোগাইতেছে। ইহারা ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী, ইহাদিগকে আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তব্যের প্রচারকরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিলে অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশ একটী বার একেবারে সজীব থাকিবে, সন্দেহ নাই।

তখনকার দিনে জনসাধারণের মাঝে আক্ষরিক শিক্ষা না থাকায় মৌখিক শিক্ষাকে সকলেই হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ আক্ষরিক শিক্ষাটা নিতান্ত পরিশ্রম, সাধনা এবং অবকাশ সাপেক্ষ কিন্তু কোন কথা বা কাহিনী শোনাটা কেবল অনুগ্রহ সাপেক্ষ মাত্র, তাহাতে বিশেষ পরিশ্রম নাই। লাঙ্গল পরিচালনের পথে উহা কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় না।

দেশে আক্ষরিক শিক্ষা ছাড়াও গুরুতর বিপ্লব অসম্ভব নহে, সিপাহী বিদ্রোহ তাহার প্রমাণ—সে বিদ্রোহ সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া হয় নাই, অথচ চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত তাড়িতের ন্যায় উহা ঝটিতি বিস্তৃত হইয়াছিল। রুটির টুকরার অর্থ-জ্ঞান সে বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। রোমের কিম্বা রুষের ইতিহাস-জ্ঞান পর্য্যন্ত সে বিপ্লবের পক্ষে দরকার হয় নাই। ইহাতে দেখা যায়, গুরুতর দেশ-বিপ্লবেও ক-খ-গ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

আর এক দল লোক বাঙ্গালাদেশে এখনও ভাব-প্রচারের জন্য তৈয়ার আছে। পূর্ব্ব বঙ্গের ভট্টদিগকে এখনও রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন-সমূহ আন্দোলনে তেমন একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে অঙ্গীভূত করা হয় নাই। ইহাদের প্রত্যেক গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া পারিবারিক সুখ দুঃখের অবারিত এবং উন্মুক্ত স্রোতের মাঝে সহজভাবে দেশের যাবতীয় প্রশ্নসমূহ উপস্থিত করাই কার্য্য। বলা আবশ্যক, উৎসাহ না পাইয়া এবং স্বদেশের পরিবর্ত্তিত ভাব এবং চিন্তা রাজ্যে স্থান না পাইয়া জীর্ণ পত্রপুঞ্জের ন্যায় ইহারা সমাজ-বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। কেহ একবার উহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। অথচ ইহারাই এক সময় সংবাদপত্রের স্থান অধিকার করিত।

এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের নানা আয়ুধ, নানা অস্ত্র শস্ত্র শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—আমরা দৃক্‌পাত করিতেছি না। আমরা দেশকে দুষ্পাচ্য এবং দেশের পক্ষে হজমের অনুপযোগী খাদ্য যোগাইতেছি। এই নব্যতন্ত্রের চপ-কাট্‌লেট গরীব কৃষকদের এবং পল্লীবাসীদের কুটীরের সঞ্চিত খাদ্যের সহিত কিছুতেই মেশে না।

আমাদের দেশে মৌখিক শিক্ষা প্রচারের কতকগুলি স্থান আছে, সে গুলির প্রতিও আমাদের নজর রাখা উচিত। আমাদের তীর্থ স্থানগুলির সর্ব্বাগ্রে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত স্থান যেখানেই থাকুক না কেন, দলে দলে শিক্ষিত লোকদের সেখানে যাইয়া প্রচার করা প্রয়োজন। এইখানেই ভারতবাসীর হৃদয়-অর্গল একেবারেই উন্মুক্ত থাকে, ধনী দরিদ্র সকলেই একত্রিত হয়।

বাঙ্গালা দেশের যাত্রা গানের বিষয়গুলিকেও সামাজিক করা যায়। পৌরাণিক বিষয় ছাড়িয়া বর্ত্তমান সামাজিক প্রশ্নাদির অভিনয় হইলে দেশের জনসাধারণ অতি সহজে অনেক গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

মুসলমানদেরও গাজির গান নামক এক রকম, যাত্রার ন্যায়, সঙ্গীতের দল আছে, তাহাও উপরোক্তভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়।

ইহা ছাড়া নানারূপ বারমাস, ছড়া, গল্প, গানের ভিতর দিয়া দেশে মৌখিক শিক্ষা বিস্তৃত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের কথকতাও মৌখিক শিক্ষা বিস্তার করিত।

এইরূপে গ্রামে গ্রামে এখন পর্য্যন্ত শিক্ষার বিস্তারে সমর্থ নানা পথ রহিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে চতুর্দ্দিকে আদর্শ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বিলাতী আদর্শ ছাড়া অন্য আদর্শে কাজ করা অসম্ভব, এটা যেন একটা দৈব বাণীর ন্যায় সকলে বিশ্বাস করিতেছে। যে দেশের পক্ষে জল-বায়ু এবং প্রাচীন সভ্যতাগুণে যে আদর্শ এবং প্রণালী আদৃত হইয়া আসিতেছে, সে দেশে সে প্রণালী মতে কার্য্য করিতে থাকিলে সফলতার জন্য শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের জনসাধারণ বর্ত্তমান পোলিটিক্যাল দাবা ক্রীড়া সম্বন্ধে অজ্ঞ, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহারা নির্ব্বোধ কখনও ছিল না। আমরা দেশে ভাব বিস্তারের সনাতন আদর্শ তুচ্ছ করিয়াছি—আমরা মৌখিক শিক্ষার ভিতর দিয়া জনসাধারণকে উন্নীত করি নাই।

সম্প্রতি কোন কোন গ্রামে মৌখিক শিক্ষায় যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

অবশ্য আমি এ কথা বলিতেছিনা যে, আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই—কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক এবং সমাজনৈতিক প্রশ্ন সমূহ, সমগ্র দেশময় আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃতি পর্য্যন্ত অজ্ঞাতভাবে অপেক্ষা করিতে পারে না—তাহা মৌখিক উপায়ে দিতেই হইবে। এবং এই জন্য যথাসম্ভব প্রাচীন পথগুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

আক্ষরিক শিক্ষার ভিতর দিয়া যে শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহা স্থায়ী এবং স্থির হয়। এজন্য নানা জাতির মাঝে ইহার বিস্তৃতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হইতেছে। আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃত হইলেই সংবাদপত্র সমূহ দেশে এক মহান্ শক্তিরূপে দাঁড়াইবে—এবং এই সংবাদপত্রই সহজভাষায় লিখিত হইয়া বহু পরিমাণে জ্ঞান প্রচারেরও সহায়তা করিবে। তখন পুস্তক হ্যাণ্ডবিল্ প্রভৃতি বেশ কার্য্যকরী হইবে।

আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা নাই, এই জন্য আক্ষরিক শিক্ষার সত্বর বিস্তৃতির পক্ষে আমাদের অনেক অসুবিধা। সমগ্র দেশের শক্তিকে সংহত করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হইবে, তদ্দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার কাজ দুই এক দিনের নহে, বরং শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যই সমগ্র শক্তিকে সংহত করা এবং দেশের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের জন্য অর্থাভাব দূর করা। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে মৌখিক উপায়ে ভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাই আমাদের দেশের সনাতন পন্থা!

মুদ্রাযন্ত্র দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহারও ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা আছে—কিন্তু ইহার প্রভাবের বাহিরে মৌখিক শিক্ষার সনাতন সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই পথে আমরা সহজে এবং সহসা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব।

মেলা, বাজার, হাট প্রভৃতিকে আমা-

দিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্র করিতে হইবে। বিয়ালিটি-স্কোপ, সিনেমেটোগ্রাফ, ম্যাজিক ল্যাণ্টারণ, ভোজবাজী ও ভেল্‌কি, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেশের ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস, মহাপুরুষ প্রভৃতির সহিত দেশের লোকের পরিচয় সাধন করাইতে হইবে। এই সমস্ত উপায় যদি সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অবলম্বন করা যায়, তবে দেশে অতি স্বল্পকালে যুগান্তর উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

আক্ষরিক বিদ্যালয় ছাড়া মৌখিক শিক্ষার বিদ্যালয়েরও সূচনা করিতে হইবে। সেখানে দেশের নানা কথাবার্ত্তা প্রচারিত হইবে — এইরূপ নৈশবিদ্যালয়ে কৃষক শ্রেণীর লোক অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারে।

বলা আবশ্যক, এই সব কার্য্য চারিদিক হইতে যথাসম্ভব সমবায়ে করা প্রয়োজন— সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সহানুভূতি দ্বারা পুষ্ট না হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টায় কার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হইবার পক্ষে বাধা আছে। এইজন্য সংবাদপত্রের করতালি পরিত্যাগ করিয়া যদি পল্লীর দিকে—পল্লীই যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র— সকলে দৃক্‌পাত করেন, তবে পৃষ্ঠের উপর বহুকালের তথা-কথিত কন্‌ষ্টিটুশানেল এজিটেশনের সুফলে সঞ্চিত হতাশার গুরুভার লঘু হইয়া যাইবে। শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

---

# স্বরাজের পূর্ব্বাভাস।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম?  
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম?  
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,  
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—  
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম। হেমচন্দ্র।

High walls and huge the body may confine,  
And iron gates obstruct the prisoner's gaze,  
And massive bolts may baffle his design,  
And vigilant keepers watch his devious ways,  
But scorns the immortal mind such base control,  
No chains can bind it and no cell inclose.  
William Lloyd Garrison.

এ দেশে প্রচলিত একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ গরুড়ের রথে চড়িয়া পৃথিবী পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, এক বাড়ীতে বহুলোক তিন দলে বিভক্ত হইয়া ভীষণ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। গৃহস্থের কন্যা বিবাহ যোগ্যা, কিন্তু পিতা, মাতা ও ভ্রাতা, তিন জনে তিন বর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। কোন্ বরের সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহাই বিতণ্ডার বিষয়। আজই বিবাহের দিন। লক্ষ্মী স্ত্রীজন-সুলভ কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে? নারায়ণ উত্তর করিলেন, ও তিনজনের কাহারও সঙ্গে নহে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষের নিম্নস্থ এক রাখাল বালকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আজই রাত্রে ঠিক সময়ে, ঐ বালকের সঙ্গে বিবাহ হইবে। লক্ষ্মীর মনে কোনও

সন্দেহ আসিল না, কিন্তু গরুড়ের এ ব্যবস্থাটা নিতান্তই অপছন্দ হইল, তাহার মনে একটা মস্ত খট্‌কা লাগিল। এ কি আশ্চর্য্য, তিনি বর বাড়ীতে উপস্থিত, তাদের কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইবে না, বিবাহ হইবে কি না এক অজ্ঞাত কুলশীল রাখাল বালকের সঙ্গে? অসম্ভব! তাহা হইতেই পারে না, উহা মানুষের কল্পনার অতীত। আমি এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পণ্ড করিব, এই ভাবিয়া গরুড় লক্ষ্মী-নারায়ণকে তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে পৌছাইয়া দিয়া, এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক ছোঁতে রাখাল বালককে শূন্য মার্গে লইয়া এক পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে রাখিয়া দিলেন, সঙ্কল্প এই যে, বিবাহের 'ঠিক সময়' চলিয়া গেলে বালককে পর্ব্বত হইতে নামাইবেন। গরুড় ব্রাহ্মণের বাড়ী ছাড়িলেন না, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কখন সময়টা উত্তীর্ণ হয় বা অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয়! কিন্তু তা আর হয় না। তখন গরুড়ের মনে হইল, যে বালকটাকে পর্ব্বতের উপর রাখিয়া আসিলাম, উহার কিঞ্চিৎ খাদ্যের সংস্থান প্রয়োজন। বিবাহ-বাড়ীতে খাদ্যের অভাব কি? দেখিলেন, একজন ভীমকায় লোক প্রকাণ্ড এক ঝুড়ী খাবার লইয়া কোথায় চলিয়াছে, গরুড় সটান সেটী তাহার মস্তক হইতে উত্তোলন করিয়া পর্ব্বত-শিখরে বালকের সম্মুখে রাখিয়া আসিলেন। এ দিকে বিতণ্ডা আর থামে না। অনেক কষ্টে স্থির হইল, পিতার মনোনীত বরেই কন্যা সমর্পিত হইবে। কিন্তু কন্যা কোথায়? এ দিকে সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গরুড় স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ জানিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে পর্ব্বত শিখরে যাইয়া উপস্থিত, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির; দেখিলেন, কন্যা বালকের গলায় বরমাল্য দিয়া তাহার পার্শ্বে আসীনা! কিন্তু হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে ইহা সম্ভব হইল। হায় গরুড়, ভ্রান্ত তুমি, পশু-বল-গর্ব্বিত তুমি বুঝিলে না, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়! তুমি নারায়ণের ব্যবস্থা উল্টাইতে যাইয়া যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার প্রতি পাদক্ষেপে তুমি তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। তোমার ঐ বিরুদ্ধ সঙ্কল্পের দ্বারাই ভগবান স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। কন্যার মাতা যখন দেখিলেন, এ বিপদে তাহার জয়ের আশা নাই, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কন্যাকে স্বীয় মনোনীত বরের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, সেখানে যে বালককে দেখিবে, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবে। কিন্তু যে চুবরিতে করিয়া খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে লুকাইয়া মানুষের মাথায় তিনি কন্যাকে বরের গৃহে পাঠাইয়াছিলে, পরে তাহা গরুড় কর্ত্তৃক অপহৃত হইল এবং লোকটিও ভয়ে পলায়ন করিল। পশুবল-মদগর্ব্বিত পক্ষীরাজ প্রতি পাদক্ষেপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিস্তৃতাকারে এই রূপ অভিনয় চলিতেছে। বিধাতার স্বরাজ বিধান ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, গরুড় স্থানীয় ফিরিঙ্গীরাজ আজ মদগর্ব্বে স্বীয় পশুবলে তাহাকে বাধা জন্মাইতে অগ্রসর। কিন্তু তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে কেবল স্বরাজের মুখই খুলিয়া যাইতেছে। মানুষ জলে পতিত হইলে যেমন যা পায়, তাই ধরে, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া কেবল

ছট্‌ফট্‌ করে এবং আপনাকে আরও জলে নিমগ্ন করে,ভারতে ফিরিঙ্গীরাজের রাজতক্তেরও আজ সেই দশা! ঐ বুঝি ডুবে! Times যতই অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শুনান না কেন, ভারত রাজ্য অস্ত্রবলে শাসিত হয় না, সম্মোহন বলে শাসিত হয়। ভারতের জনমণ্ডলীর মনে যে সুশাসনের একটা বিকট কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহাই ফিরিঙ্গী-রাজের সম্মোহন অস্ত্র। সকল কুসংস্কারের ন্যায় এ কুসংস্কারও প্রত্যক্ষকে অগ্রাহ্য করিতেছে; অন্য কুসংস্কারের প্রকৃতি ইহাতে ষোল আনা বিদ্যমান, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও ছাড়িতে চাহে না। এই যে কুসংস্কার আমাদিগকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না, ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির একটা গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান। কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, এতদিন অজ্ঞানতার অধীন ছিলাম, মানবসহজে তাহা স্বীকার করিতে রাজী নহে। তাই কুসংস্কার সরিয়াও সরে না, ঘুম ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। কিন্তু এবার সম্মোহন ছুটিয়াছে, শক্ত আঘাতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং ফিরিঙ্গী তাহা বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের মত অভিনয় করিতেছে, বুঝিতেছে না কি করিলে ভাল। যাহা করিতেছে,তাহতেই উল্টা ফল ফলিতেছে। এই যে দেশব্যাপী আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা নিবাইতে যাইয়া কোথাও বা আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছে, কোথাও বা আগুন উস্কাইয়া দিতেছে, সর্ব্বত্রই কিন্তু স্বপদে কুঠারাঘাত। এ আগুন নিবাইতে সকল চেষ্টাই তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। কারণ যাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহা বিধাতার বিধান, তাই কোন ঔষধই ধরিতেছে না। মহাকাল যাহার বক্ষে চাপিয়া বসে, ঔষধ তাহার কি করিবে। এক দিন ধন্বন্তরি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গর্ব্বের সঙ্গে বলিলেন, এমন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা সেবন করিলে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিও জীবনলাভ করিবে। মহাদেব তখন বলিলেন, আমি যখন বুকে চাপিয়া বসি, তখন ঔষধ সেবন করিবার শক্তি থাকে কি? থাকিলেও তখন অমৃত বিষ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গীর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত, তাহাকে কে রক্ষা করিবে? তাই স্বরাজের বিরুদ্ধে তাহার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহার সকল চেষ্টা স্বরাজেরই ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। বঙ্গভঙ্গের দিন হইতে গণনা করিলে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না, শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। কিন্তু কুমিল্লার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে। কুমিল্লায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া এ দেশে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বর্ত্তমান অবস্থা দেখাইয়া দিতেছে। যাহারা ভাবিতেছেন, কুমিল্লার ঘটনা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ, তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। হিন্দুমুসলমানে এদেশে কোনও বিবাদ নাই, থাকিতে পারে না, জন কতক মুসলমান কেবল রাজশক্তির হাতের ক্রীড়া-পুত্তলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে মাত্র। উহা ব্যর্থ রাজশক্তি ও জাগ্রত প্রজাশক্তির মহা সংগ্রাম—স্বরাজের প্রথম গাঁথুনি। সহর-কোটাল মাজিষ্ট্রেট নগরবাসীর আবেদনের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম কি? বিপিন পালের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া তিনি কি প্রমাণ করিয়াছেন? তিনি হয়তো ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্যই বলিয়াছেন,

কিন্তু এই ঠাট্টার পশ্চাতে যে একটা প্রকাণ্ড সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সত্যটী এই যে, ফিরিঙ্গী-রাজ আজ আমাদের স্বরাজের দাবী-দমনে অসমর্থ, জাতীয় জীবনের যে মহাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারক। তাই অপারকের রাগে তাহার শরীর গর্জ্জন করিতেছিল। এমন সময় প্রতিহিংসার সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বরাজের জন্য গণ্ডগোলকারী হিন্দুকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন। কিন্তু "উল্টা বুঝলি রে রাম!" তিনি বড়ে দিয়ে বড়ে মারিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এদিকে স্বয়ং 'কিস্তি-মাৎ।' স্বরাজের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গী-রাজের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ মাত্র, হিন্দু মরিল না, স্বরাজ গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গী মনে করিয়াছিল যে,এ অস্ত্রে নিশ্চয়ই হিন্দুর স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হইবে। কিন্তু হরি! হরি!! হিন্দু প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে অরাজকতা নিবারণ করিয়া আত্মরক্ষা ও রাজ্য-রক্ষায় সমর্থ। ফিরিঙ্গী এবার ভারতে রাজত্ব করিবার শেষ ওজুহাতটীও খোয়াইয়াছে। ইহারই নাম কেঁচো খুড়িতে সাপ উঠা। ফিরিঙ্গী এবার ভাবিতেছে,"কি কর্‌লাম কি হ'ল, ছাতু মাখলাম কিন্তু এ যে কি হয়ে গেল" !!!

রাজশক্তি তো প্রজাশক্তির প্রতিনিধি মাত্র। প্রজা স্বীয় ধন প্রাণ রক্ষার ভার রাজাকে দিয়াছে, তাই রাজশক্তির আবির্ভাব। রাজশক্তির কোনও স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যেখানে রাজশক্তি প্রজা-রক্ষণে অসমর্থ, সেখানে অরাজকতা। অরাজকতার অর্থ প্রজা আত্মরক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ধরিতে হইবে, রাজশক্তি লোপ পাইয়াছে। কুমিল্লার মাজিষ্ট্রেট আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদিগকে "বিপিন পালে"র নিকট যাইতে বলিয়া রাজশক্তির তিরোভাব ঘোষণা করিয়াছেন এবং হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া স্বরাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটের কথার ইহাই অর্থ। কেহ হয়তো বলিবেন, যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক,দেশে প্রজাশক্তির বিচ্ছিন্নতাই প্রকাশ পাইতেছে, এখন স্বরাজের কথা বলা নিতান্তই অস্বাভাবিক! ইহার উত্তর ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি, এ বিবাদ প্রকৃত-পক্ষে হিন্দুমুসলমানের বিবাদ নহে, প্রজা-শক্তির এক অংশ রাজার হাতের যন্ত্র মাত্র। আসল উত্তর এই, এ স্বরাজ হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে, কিন্তু ভারতের! কে সাহায্য করিল, কে বিপক্ষতাচরণ করিল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মুসলমান ভ্রাতাদের কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিয়া তাঁহারা স্বরাজে বাধা জন্মাইবেন, তবে তাহাদিগকে বলি যে তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারা বিড়ম্বিত। এ স্রোত কেহ ফিরাইতে পারিবে না। প্রলয়ের বাতাস যখন বহিয়া যায়, তখন কি সে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে? প্রলয়াগ্নির ন্যায় স্বরাজাগ্নি ভারতের সকল অত্যাচার অবিচার ভস্মীভূত করিবার জন্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। কেবল ভারতেই বা বলি কেন? পৃথিবী বেষ্টন করিয়া স্বরাজের বিজয় ভেরি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, কাহার সাধ্য বধির হইয়া থাকে। ঐ শুন স্বরাজের দুন্দুভি-

নিনাদ চীন হইতে রুষিয়াতে, পারস্য হইতে মিসরে দিগঙ্গনাগণকে বিকম্পিত করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিতেছে, কাহার সাধ্য আর ঘুমাইয়া থাকে। ভাই মুসলমান, তুমি যদি ঘুমাইয়া থাক, তাহাতে স্বরাজ আট্‌কাইবে না। স্বরাজের বিরুদ্ধে কুরাজকে ধরিয়া রাখিতে তুমি যতই চেষ্টা করনা কেন, তোমার বিপক্ষতাচরণ সত্বেও, তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেবল তুমিই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইবে তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। স্বরাজে তোমার স্থান কোথায় থাকিবে? ভারতের জাতি সকলের নিকট এক মহা সমস্যা উপস্থিত। আজ যিনি স্বরাজকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছেন, স্বরাজে তাহার স্থান সেই ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইচ্ছা প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেন, নিয়ম তাহাকে নিষ্পেষিত করিবেই, কাহারও কাতর ক্রন্দন শুনিবে না। তাই বলি, ভাই, হিন্দু হও, মুসলমান হও, বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিতে যাইয়া নিষ্পেষিত হইও না।

একটা সাধারণ প্রচলিত কথা আছে যে, দেবতারা যাহাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, আগে তাহার বুদ্ধি হরণ করেন। ফিরিঙ্গিরাজের মস্তকে দেবতার অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তাই মুসলমান গুণ্ডাদিগ-কর্ত্তৃক মগরা বাজার লুণ্ঠনের সংবাদ পাইয়াও কর্ত্তারা নিশ্চেষ্ট, উৎপীড়িতদিগের জন্য সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে এক কর্ত্তা বলিয়াছেন, "No, you think that I should send armed police to all parts of the country." ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি যে, এদেশে ফিরিঙ্গির রাজত্ব হাওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত, একটু জোরে বাতাস বহাইতে পারিলেই উড়িয়া কোথায় দিগ্‌দিগন্তে পতিত হইবে। এত বড় দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরিঙ্গির নাই। একটা গ্রামে গুণ্ডার উৎপাত নিবারণ করিতে যে অক্ষম, সে কি শক্তিবলে এই রাজ্য চালাইতেছে? কখনই না। সম্মোহন, কেবল সম্মোহন অস্ত্রবলে! ঘুম ভাঙ্গিলেই সব ফক্কিকার! সহরের লোক গুলো "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা" দেখিয়া একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে। পল্লীবাসীদিগকে সে 'ধান্ধা' এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, ত্রিশ কোটী লোকের দেশে সে ধান্দা লাগান সম্ভব নহে। লক্ষ লক্ষ পল্লী আছে, যেখানে কখনও কোন শ্বেতপুরুষ যায় নাই, কখনও যাইতে পারিবে না। অথচ তাহারাও শ্বেতের অধীন। ঐ সম্মোহন! ঘুম ভাঙ্গুক, এক দিনেই অধীনতা পাশ ছিন্ন হইবে। মগরার মত সব গ্রামে যদি গুণ্ডামি আরম্ভ হয়, তবে কি হইবে? একগ্রাম রক্ষা করিতেই যাহাকে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হইল, দশ গ্রামের কথা সে ভাবিবে কিরূপে? সে দিন আর ফিরিঙ্গিকে ভারতের রাজত্ব ভাবিতে হইবে না। যে কয় জন শ্বেত প্রহরী পাহারা আছে, কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, এ দেশের ফিরিঙ্গি পুরুষরমণীকে নিরাপদে জাহাজে তুলিয়া দিতেই তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইবে, আর কিছু করিবার তাহাদের সময় থাকিবে না। আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কুমিল্লায় একটা খুন হ'তে না হ'তেই সাহেব মেমদের এমন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা একজন কমিশনারের সম্মুখে যে, মিলিটারী পুলীশ আনিয়া সে কাঁপুনি থামাইতে হইয়াছে, সুতরাং পুলীশ আর হাঙ্গামা থামাইতে মনোনিবেশ করিতে পারে

নাই। এই তো অবস্থা, এরূপ স্থলে যে আমরা অত্যাচারিত হই,সে কেবল আমাদের মূর্খতা। হা মূর্খ! তুমি বাক্যের স্বাধীনতার (Free-dom of speech)গর্ব্ব কর,যে রাজ্যে আত্মরক্ষার স্বাধীনতা নাই,যে অধিকার কীট পতঙ্গেরও আছে, সেই রাজ্যে বাক্যের স্বাধীনতা! এ রাজ্য রক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে তোমার জীবনের মূল্য এক কড়া কাণা কড়িও নয়, মূর্খ! তাহা বুঝিলে না। তবুও, বাক্যের স্বাধীনতার গর্ব্ব! এখন আর নয়, উঠ, চক্ষু মেলিয়া দেখ, এবং জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এবারে ফিরিঙ্গি রাজতন্ত্রের শেষ ওজুহাতও চলিয়া গিয়াছে। কতগুলি ভাল মানুষ (অমানুষ) দেশে আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর শান্তির সঙ্গে মনুষ্যত্বের শান্তির কোনও পার্থক্য ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা সকল প্রকারকৃত পবিবর্ত্তনকেই শান্তির বিরোধী মনে করেন। কুমিল্লা তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিবে কি? তাঁহারা এবারে নিশ্চয়ই পণ্ডিত প্রবর স্পেন্সারের,"The agency which maintains order may cause miseries greater than the miseries caused by disorder" এই উক্তিটীর চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তাঁহাদের চোক্ না ফোটে,তবে বলিতে হইবে, ইহারা ফিরিঙ্গির গুপ্তচর। সুতরাং দেশের প্রথম ব্যবস্থা ইহাদেরই জন্য করিতে হইবে।

কুমিল্লার ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, গোলমালের সময় দেশরক্ষার ভার নিজ হস্তে লইতে ফিরিঙ্গিরাজ কেবল যে অসম্মত,তাহা নহে,দেশের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা দৃষ্টে, একেবারে অসমর্থ। সুতরাং আত্মরক্ষার ভার দেশের নিজহাতেই আসিয়া পড়িতেছে। কাজেই, আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাজ শক্তি যখন দেশ রক্ষায় অসমর্থ, তখন যে সমস্ত রাজ আইন আত্মরক্ষার পরিপন্থী, তাহা আর দেশ মানিতে বাধ্য নহে। সেই জন্য অস্ত্র আইন ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ আর আমাদের উপর খাটিতেছে না। আমাদিগকে অস্ত্র আইন অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এতদিন অস্ত্র আইনের একটা ওজর ছিল,কুমিল্লার ঘটনায় সে ওজর চলিয়া গিয়াছে। এখন যে ব্যক্তি জননী ও ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত না থাকিবে, সে ধর্ম্মের নিকট দায়ী। এত দিন অস্ত্র আইন তুলিয়া লইবার জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, আজ আর প্রার্থনা নাই, অস্ত্র আইন পদদলিত কর, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক। যে রাজা প্রজার ধন প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ, তাহার রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে, ও কাঠাম বিসর্জ্জন দিতে আর অধিক সময় লাগিবে না।

যাহা হউক, কুমিল্লার ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, রাজশক্তি প্রজাশক্তির জাগরণে ভীত হইয়াছে এবং হঠাৎ সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। কেন না, বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাশক্তির বলাবল যথাযথ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব এবং বলাবল নির্ণয় না করিয়া হঠাৎ সম্মুখ সমরে সমূহ বিপদের আশঙ্কা, তাই রাজশক্তি কুমিল্লায় প্রজামণ্ডলীর এক কোণে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কপট যুদ্ধে প্রজাশক্তির,সম্মুখীন হইয়াছিল। জাগ্রত প্রজাশক্তি কপট রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। প্রজাশক্তি এখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে আত্মরক্ষার ও বিপক্ষদলনে সমর্থ। ইহাই স্বরাজের পূর্ব্ব-

ভাস। যাহা কুমিল্লায় হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র হইলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই দিকেই এখন সকলকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। মুখে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিযুক্ত হও। স্বরাজ উপার্জ্জন করিতে হইবে, ভিক্ষালব্ধ স্বরাজে আমাদের প্রয়োজন নাই। অনুগ্রহ-লব্ধ স্বাধীনতায় কৃতদাসগণের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদের একজন রক্ষক ছিল, আজ তারা অসহায়। কুকুর বিড়ালের ন্যায় শ্বেতকায়গণ আজ তাহাদিগকে হত্যা (lynch) করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে না। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার দুর্দ্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না। তাই বলি, ভাই ভারতবাসী, দলবদ্ধ হও, আত্মরক্ষার আয়োজন কর, অত্যাচারীকে দমন করিবার জন্য কটিবদ্ধ হও, দেখিবে, তোমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ওঁ বন্দেমাতরম্।　শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# রাণী বিলাসমণি।

সে দুর্দ্দিন নাহি আর,　অবিচার অত্যাচার,
প্রাণভরা হাহাকার, বুকভরা গ্লানি,
নাহি আর যথা তথা,　সে দুঃখ-কাহিনী কথা,
নাহি আর দেশে দেশে লোকে কাণাকাণি!
প্রজার সে মহারোষ,　অবরুদ্ধ অসন্তোষ—
ধূমায়িত দাবদাহ, মনে মনে জানি,
ভাওয়ালের বনভূমি,　আনন্দে উজলি তুমি,
দেখা দিলে শক্তিরূপা মঙ্গলা কল্যাণী
বাঁধি দৈত্য নাগ পাশে,　(আনন্দে জগত হাসে,)
পদতলে বাঘে মহিষে করে টানাটানি!
ঊর্দ্ধে তব শিরোভাগে,　প্রেমে পতি নিত্য জাগে,
দুহিতা দক্ষিণে বামে লক্ষ্মী বীণাপাণি,
কুমার কুমারগণ,　দেশহিতে প্রাণপণ,
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন গণপতি জ্ঞানী;
অভয় বরদে হস্তে,　আশ্বাসিলা ভয়ত্রস্তে,
শুনাইলে স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ বাণী,
ভাওয়াল করিল পূজা,　এ মূর্ত্তি এ দশভুজা,
রাখি হৃদি-সিংহাসনে চরণ দুখানি!
যুগ যুগান্তের পরে,　হাসিল ভকতি ভরে,
সীমাশূন্য ভাওয়ালের মহা অরণ্যানী,
নাহি আর হাহাকার বুকভরা গ্লানি!

উল্লসিত ভাওয়ালের বন-রাজধানী,
উল্লসিত দেবপুর,　আশঙ্কা হইল দূর
সশঙ্কে পলায় যত ক্রূর অভিমানী!
তুমি গো মা জয়ে যশে,　অতুলন স্নেহ বশে,
দশ হাতে সুখ শান্তি দিলে যেন আনি,
স্নেহেতে পালিলে রাজ্য,　স্নেহে করি রাজকার্য্য,
আমরা তোমার প্রজা তাই সবে জানি,
জননী বিলাসমণি ভাওয়ালের রাণী!

৩

কিন্তু একি অকস্মাৎ হায় হায় হায়,
দু'দিন না যেতে আজ,　ভাওয়ালে হানিয়া বাজ,
অকালে আনন্দময়ী লইলে বিদায়!
বল মা কি অপরাধে,　এত বাদ এত সাধে,
বঞ্চিলে করুণাময়ী স্নেহ করুণায়,
এ অজস্র অশ্রুজলে,　পাহাড় পর্ব্বত গলে,
সন্তানের আঁখি জলে নাহি গলে মায়?
ভাওয়ালের বনে বনে,　বিষাদে বিষণ্ণ মনে
তোমারি শোকের গীত পাখীগণ গায়,
প্রভাময় শশী রবি,　শোকেতে মলিন ছবি,
প্রকৃতি ঢাকিছে মুখ ঘন কোয়াসায়!

তোমার শোকেতে অন্ধ, সমীরণ শ্লথ মন্দ,
বিষাদে ফোটেনা ফুল তরু লতিকায়,
অকালে আনন্দময়ি! লইলে বিদায়!

৪

তবে কি মা—তবে কি মা, ফিরি পুনর্ব্বার,
অসুরে করিল সুর স্বর্গ অধিকার?
দানব দেবতাগণে, পরাজিয়ে মহারণে,
লুটে নিল ধনরত্ন যত ছিল যার,
সুরভোগ্য সুধা যাহা, অসুরে খেয়েছে তাহা,
অমর ক্ষুধায় মরে করি হাহাকার?
কল্পতরু সঙ্কফলে, বঞ্চিয়া অমর দলে,
গৌরবে গর্জ্জিছে দৈত্য করি মার মার,
দানবের পদ ভরে, ত্রিদিব কাঁপিছে ডরে,
নন্দনে আনন্দ নাই, ফোটেনা মন্দার?
অসুরে করিল নাকি স্বর্গ অধিকার?

৫

তাই মা তোমারে বুঝি স্বর্গে দেবগণ,
সকালে পুজিছে করি অকালে বোধন।
উদ্ধারিতে স্বর্গরাজ্য, সাধিতে দেবের কার্য্য,
ঘুচাইতে দেবতার যত জ্বালাতন,
গেলে কি দেবের দেশে, পাপ সংহারিণী বেশে,
দুরন্ত দানব কুল করিতে নিধন?
যেখানে অধর্ম্ম পাপ, শোক দুঃখ পরিতাপ,
প্রবলে দুর্ব্বলে করে সদা নিপীড়ন,
যেখানে যে মোহে মত্ত, পায় দলে ন্যায় সত্য,
কলে বলে নানা ছলে হরে পরধন,
শক্তিরূপে অবতরি, তুমি সে দুর্দ্দশা হরি,
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন।
তাই তোমা স্বর্গে আজ পূজে দেবগণ।

৬

যাও গো জননী তবে যথা প্রয়োজন,
যেখানে অধর্ম্মে পাপে, দীন দুঃখী দিন যাপে,
যাও তথা শক্তি রূপে কর মা গমন!
নিবারিয়ে ভয় ত্রাস, হাহাকার হা হুতাশ,
দশ হাতে সুখ শান্তি কর বিতরণ!
উদ্ধারি ভাওয়াল ভূমি যাও আজ স্বর্গে তুমি,
আনন্দে বন্দনা করি তব শ্রীচরণ,
যাও গো জননী তব যথা প্রয়োজন!

৭

ভাওয়ালের দুঃখ ভয় হইয়াছে দূর,
কুমারেরা তিন জনে, পালিবেন প্রজাগণে,
কি সাধ্য উৎপাত আর করিবে অসুর?
স্থিরমতি তিন ভাই, এক-প্রাণ—ভিন্ন নাই,
একান্ত প্রজার প্রিয় স্বভাব মধুর,
ভাওয়ালের হিতে রত, স্বদেশ-মঙ্গল-ব্রত
আনন্দে ভাসিছে আজ তাই দেবপুর!
ভাওয়ালের বনে বনে, বসন্তের সমীরণে,
কীর্ত্তির কোমল কণ্ঠে শুনা যায় সুর,
হাসে তরু হাসে লতা, ভুলিয়া সে গত কথা—
সুগন্ধ মুকুলে পুষ্পে—প্রসন্ন প্রচুর!
ভাওয়ালের দুঃখ ভয় হইয়াছে দূর!
পাইয়া অমরাবতী, কিন্তু গো ভুলনা সতী,
তব আদরের এই প্রিয় দেবপুর,
করিও মা আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন সব সাধ;
তোমার স্নেহের স্মৃতি বড় সুমধুর,
তোমারি প্রসাদে দুঃখ হইয়াছে দূর!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

# খনার বচন ও প্রজাপতি দাস।

আমরা এ স্থলে যে প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, তদ্দ্বারা খনার বচন হইতে বাঙ্গালা পদ্যের সৃষ্টিকাল, প্রজাপতি দাশ নামীয় বৈদ্যবংশজ এক ব্যক্তির জ্যোতিষ সংগ্রহ-তত্ত্ব হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

প্রায় পাঁচ শত বৎসরাধিক হইল, প্রজাপতি দাশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র, যথা অরবিন্দ, জয় ও তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশধরগণ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে কুলীন বলিয়া পরিগণিত। মধ্যম

জয় দাস কুলহীন। বহু মহামহোপাধ্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই মহৎ বংশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। নরহরি কবীন্দ্র, তৎ পুত্র রমানাথ সার্ব্বভৌম, মথুরানাথ কর্ণ পুর, রামচন্দ্র শিরোমণি ও সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা-প্রণেতা ৺ রামকান্ত কবিকণ্ঠহার অরবিন্দ বংশের, এবং রামভদ্র কর্ণপুর, বলভদ্র কবি চন্দ্র, রামকৃষ্ণ কবিকঙ্কণ ও উত্তর রাঘবপাণ্ডব-গ্রন্থ-প্রণেতা বিষ্ণুরাম কবিচন্দ্র প্রভৃতি সুধীগণ বিষ্ণুদাশ বংশের বিজ্ঞতম সন্তানগণ, বিদ্যাবত্তায় আজিও স্মরণীয় আছেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি ও অনারেবল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় প্রজাপতি বংশের এই উজ্জ্বলতম সুযোগ্য বংশধরদ্বয়কে অধুনা অনেকেই অবগত আছেন। জয় বংশে তেওতা-বাসী জমীদারগণ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে রাজা শ্যামাশঙ্কর, শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতীশঙ্কর, শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত বাহাদুর ও তদীয় কনিষ্ঠ বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতি-তনয় বিষ্ণুদাস বংশীয় শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রজাপতি দাশ মহাশয়ের পঞ্চস্বরা বা গ্রন্থ সংগ্রহ গ্রন্থের তত্ত্বানুসন্ধান পাইয়াছি। জানিলাম, মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধানে অনেকগুলি প্রজাপতির সংগ্রহ গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।

আমরা যে সকল পুস্তক অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে একখানি ১৫৬৪ শকে এবং অপর একখানি ১৫৯২ শকে লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে ২৬৫ বৎসর অতীত হইল, প্রথম পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। প্রজাপতির গ্রন্থারম্ভের কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ইষ্টদেবং নমস্কৃত্য গোপালং কুলদৈবতম্।
শ্রীপ্রজাপতিদাশেন ক্রিয়তে গ্রন্থ সংগ্রহঃ ॥
নবগ্রহান্নমস্কৃত্য দেবীং সরস্বতীং তথা।
প্রণিপত্য গুরুং কিঞ্চিজ্জ্যোতিগ্রর্ন্থো নিগদ্যতে ॥
সদ্বৈদ্যোঽহংকুলেজাতঃ পরিহারঃ কৃতোময়া।
জ্যোতির্বিৎসু চ সর্ব্বেষু ব্রাহ্মণেষু বিশেষতঃ ॥
বরাহকৃতসূত্রেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তেময়া।
জ্যোতির্বিদঃ প্রপশ্যন্তু গ্রহাণাং সুবিচারকাঃ।
পঞ্চস্বরাভিধানঞ্চ গ্রন্থং নিদানসংশ্রয়ম্।
কিঞ্চিচ্ছন্দোগম্যঞ্চ স্বল্পং বক্ষ্যামি শাশ্বতম্ ॥
জ্যোতির্বিদ্ভিঃ পুরাসর্ব্বৈঃ কৃতোনির্ণয়বিস্তরঃ।
তন্বাদিব্যয়পর্য্যন্তং রাশিচক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥
ধর্ম্মং কর্ম্ম সুখং খঃদুং মৃত্যাদি সুতবান্ধবম্।
তন্নবুদ্ধা কুমতয়ো বল্গয়ন্তি যথাতথা ॥
অপায়ে মরণং জীবঃ চাহয়ন্তি শুভাশুভম্।
মরিষ্যতি যদা দৈবাৎকেভক্ষ্যতি শুভাশুভম্ ॥"

সুখের বিষয় যে, এই বাঙ্গালী গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থখানির বৃত্তি ও টিপ্পনী পশ্চিমাঞ্চলবাসী সুপ্রসিদ্ধ অপ্পয় দীক্ষিত ও গৌড় ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। উহা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বলিয়া ঐ দুই মহাত্মাকে আমরা পশ্চিমাঞ্চলবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

মূলগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় মাত্র পরম মুখোপাধ্যায় নামীয় কোন ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্রজাপতি প্রণীত গ্রন্থে যেরূপ খনার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, পরম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও খনার ঐ সকল বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে কিঞ্চিৎ মাত্র পাঠান্তর আছে। আমরা উভয় গ্রন্থ হইতেই তত্তৎ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রজাপতির সংগ্রহে।

"রবিমন্দকুজে বর্ষে রাহুর্কা স্থানদ্বিত্রিকে।
সপ্তশূন্যং ভবেদ্বাপি মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা॥"

অত্র খনা বাক্যম্।

সাত শূন্য বহুতর পাপ।
তাতে এড়ান নাঞিরে বাপ॥
হাসে খেলে না করে ভিন্না।
অবশ্য হংস্যা করে পয়ানা॥

অথবা পাপ সংযোগে দশশূন্যং ভবেদ্যদি।
তদামৃত্যুং ব্রজেদেব দেবরাজসমো যদি।

অত্র খনা বাক্যম্।

তিন বুধ দুই মঙ্গল বইসে।
লিখিয়া দশ শূন্য যবে আইসে॥
শনিরবি মঙ্গল বৎসর গণনা।
সেই বৎসর মরণ বলে খনা॥

পরম মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহে

"রবিমন্দকুজে বর্ষে রাহুশ্চেৎ স্থানদ্বিত্রিকে।
সপ্তশূন্যং ভবেচ্চাপি মৃত্যুং ভবতি নান্যথা॥

খনা বাক্যম

সাত শূন্য বহুতর পাপ।
তেহা রক্ষা নহীরে বাপ।
হাসে খেলে না করে ভিন্না।
অবশ্য করে পয়ানা॥

অথবা পাপ সংযুক্তে দশশূন্যং ভবেদ্যদি।
তদামৃত্যু ব্রজেদেব দেবরাজসমো যদি॥

খনা বাক্যম্—

তীন বুধ দুই মঙ্গল আবসে।
দেখিয়া শূন্যদশ জহার আইসে॥
শনি মঙ্গল বৎসর গণনা।
সেই বৎসর মরণ বলে খনা॥

প্রজাপতির উদ্ধৃত খনার বচন দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি, তদীয় গ্রন্থ বিরচনেরও বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলা পদ্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ২৫ বৎসর হিসাবে পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, উহা অভ্রান্ত না হইলেও, আমরাও তদনুসারেই গণনা করিয়া লইলাম। তাহাতে দেখিতে পাই, প্রজাপতি হইতে প্রায় বিংশ পুরুষ অতীত হইয়াছে, এইরূপ বংশধরগণ, তদ্বংশে বর্ত্তমান আছেন।

আজকাল পুরুষ গণনার হিসাবে বড়ই গোলযোগ চলিতেছে। একই বংশে যে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এক সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে কোনও কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আমরা এই প্রবন্ধে তাহাও প্রতিপন্ন করিব। নিম্নে প্রজাপতি তনয় বিষ্ণুবংশের একটী হিসাব এ স্থলে প্রদত্ত হইল। তাহাতেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতে পারে

লেখকের স্বীয়বংশ মধ্যেও ছয় পুরুষ এক ক্ষেত্রে অবস্থান দেখা যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রজাপতির বিরচিত গ্রন্থখানা দেশ দেশান্তরে প্রচারিত থাকায়, বোধ হয়, উহার গুণ গরিমা কম নহে। গ্রন্থকার যে একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূচনায় তৎকৃত কবিতা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতে পারে।

এস্থলে প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রাহক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে ও লেখক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি কবিরাজ মহাশয়কে, এতদ্ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য, ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী

## পরমহংসোপনিষদ্।

### ওঁ পরমাত্মনে নমঃ॥

নারদ—

যাঁহাদের চিত্ত (১) বৃত্তি হইয়াছে রোধ,
ব্রহ্মতত্ত্ব যাঁহাদের(২) হইয়াছে বোধ,
তাঁহাদের কিবা পথ? স্থিতি কি প্রকার?
কহ, ভগবন্, সেই গূঢ় সমাচার।

ভগবান—

তত্ত্ব-জ্ঞান যাঁর মনে হয়েছে উদয়
তাঁর পন্থা ইহলোকে সুদুর্লভ হয়।
কিন্তু তাহে ভীত নাহি হও কদাচন;
অসংখ্য মানব মাঝে যদি একজন
লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাও সার্থক,
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা অন্য সব নিরর্থক।
সেই ভাগ্যবান জন পরমাত্মা মাঝে,
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি, নিয়ত বিরাজে।
বেদে এই ব্রহ্ম বস্তু আছেন কীর্ত্তিত,
সেই ব্রহ্মরূপে তিনি হন প্রতিষ্ঠিত।
আমাতেই অবস্থিত চিত্ত যাঁহাদের,
তাঁহারাই মহাপুরুষ এই জগতের।
আমি সদা করি বাস তাঁহাদের হৃদে,
সৌরভ যেমতি নিত্য ফুল্ল কোকনদে।
পুত্র মিত্র কি কলত্র, ভৃত্য, পশু কিবা ক্ষেত্র
শিখা কিম্বা যজ্ঞ উপবীত,
অধ্যয়ন কিবা যাগ, সর্ব্ব কর্ম্মে অনুরাগ
ত্যাগ করি হও আত্মস্থিত।
ত্যাগ কর ব্রহ্মাণ্ড; (১) ধরহ কৌপিন দণ্ড,
আচ্ছাদন (২) দেহ রক্ষা তরে,
এক কর্ম্ম সার কর, লোকহিত ব্রত ধর,
ব্রহ্ম সম প্রশান্ত অন্তরে। (৩)

(১) অর্থাৎ যোগী।

(২) অর্থাৎ পরমহংস।

এতদুভয়ে প্রভেদ আছে। যোগী হইলেই যে তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, এমত নহে, এস্থলে যিনি যোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানী, সেই পরমহংসের কথাই হইতেছে।

(১) সুতরাং ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত উপাসনাদি।

(২) কৌপীন, দণ্ড এবং আচ্ছাদন, এই তিনের কথা বলিতেছেন।

(৩) আত্মোপনিষদে ব্রহ্মকে নিত্য কর্ম্মী, অনলস ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ। তিনি কর্ম্মী, কিন্তু কর্ম্মে রাগহীন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরমহংস ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সুতরাং যিনি তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস, তিনিও রাগ শূন্যরূপে কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু

ব্রহ্মবিদ্ যোগী যেবা, তাঁর পক্ষে মুখ্য(১) কিবা?
মুখ্য কিছু নহেক তাঁহার,
দণ্ড শিখা উপবীত, কিবা গ্রীষ্ম কিবা শীত,
আচ্ছাদন, সকলই অসার।
লোকহিত তরে তিনি, ভ্রমণ করেন জ্ঞানী,
সুখ দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করি;
নাহি মান অপমান, শব্দ স্পর্শ আদি(২) জ্ঞান
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি পরিহরি।(৩)
নিন্দা আদি অষ্টাদশ, (৪) নহেক কিছুর বশ
তিনিই পরমহংস হন;
নিজ দেহ শব (৫) সম হেরেন সে নির্ম্মম
দেহ অভিমানী তিনি নন।(৬)
এ দেহ আপন বলি নাহি তাঁর জ্ঞান,
তাই তাঁর দেহ যেন শবের সমান।
আত্মা কর্ত্তা, কি অকর্ত্তা, এ বৃথা সংশয়
সে পরমহংসের নিরাকৃত হয়;
দারাপুত্র ধনক্ষেত্র, অর্থ উপার্জ্জন
তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ বলি ভাবেন সে জন;
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব ভাব সব চলি যায়
মিথ্যা জ্ঞান চিরদিন তরে নষ্ট হয়।
অজ্ঞান, বাসনা, দুই বন্ধের কারণ,
দুইই নষ্ট হয় তাঁর, শুন তপোধন।(১)
যোগীগণ আত্ম মাঝে পরমাত্ম ধ্যানে
নিত্য মগ্ন হয়ে রন, (২) নিত্যানন্দ জ্ঞানে।
পরমহংস জানেন, পরমাত্মা স্থির
অচল, অদ্বয়, শান্ত, অনন্ত ও ধীর।
ব্রহ্মবস্তু এক রস। তিনিও (৩) তাহাই,
ব্রহ্মই তাঁহার ধাম, অন্য ধাম নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানই তাঁর শিখা, যজ্ঞ উপবীত,
তিনি নিত্য-পূত, ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত।
জীবাত্মা ও পরমাত্মা অপ্রভেদ জ্ঞান,
দুই এর একত্ব বোধ, সন্ধ্যার (৪) সমান।
কামনা করিয়া ত্যাগ অদ্বৈতে আশ্রয়,
সে হেতু পরমহংস হন নিরাময়।(৫)
জ্ঞান দণ্ড ধরে যিনি এক-দণ্ডী সেই,
জ্ঞান না হইলে কাষ্ঠ দণ্ডে কাজ নাই।
খাদ্য ও অখাদ্য বোধ ছাড়িলে কি হয়?
কাষ্ঠ দণ্ডে কিবা ফল? জ্ঞানই সর্ব্বময়।
জ্ঞান না হইলে শুধু কাষ্ঠ দণ্ড ধরে,
সর্ব্বভুক্, খাদ্যাখাদ্য ভেদ শুধু ছাড়ে;
রৌরব নরক ঘোর, তাহে তাঁর স্থান;
প্রকৃত পরমহংস বুঝে জ্ঞানাজ্ঞান।
জ্ঞানদণ্ড কাষ্ঠদণ্ড ভেদ জানে যিনি,

কিরূপ কর্ম্ম? ব্রহ্ম যেরূপ কর্ম্ম করেন, তদ্রূপ। ব্রহ্মের কর্ম্মলীলা নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়; অমঙ্গলের লেশ মাত্র নাই; কেবল লোক হিত, কেবল লোক রক্ষা। পরমহংসের কর্ম্মও কেবল তাহাই হইবে। তিনি শান্ত, রাগহীন হইয়া কেবল লোক হিত স্বরূপ কর্ম্ম করিবেন; তাঁহার অন্য কর্ম্ম নাই।

(১) অত্যাবশ্যকীয়।

(২) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

(৩) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মরণ।

(৪) নিন্দা, গর্ব্ব, মৎসর, (বিদ্যা ধনাদিতে অন্যের ন্যায় হইব, এইরূপ বুদ্ধি) দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, রোষ, লোভ, মোহ, মদ, হর্ষ, অসূয়া (পরের গুণকেও দোষ বলা), অহঙ্কার।

(৫) লোকে যেমন দূর হইতে শব দেখে, কিন্তু স্পর্শ করে না; এবং উহাকে নিজের দ্রব্যও জ্ঞান করে না; তদ্রূপ পরমহংস আপন দেহকে শবের ন্যায় জ্ঞান করেন।

(৬) নহেন।

(১) নারদ।

(২) রহেন।

(৩) পরমহংসও।

(৪) সন্ধ্যা বন্দনা।

(৫) নিষ্পাপ। অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দনা না করার নিমিত্ত তাঁহার পাপ হয় না।

তিনিই পরমহংস, তিনি তত্ত্ব জ্ঞানী।
দিগম্বর হন তিনি ; নাহি নমস্কার,
নাহি স্বধা উচ্চারণ, বষট্‌কার (৩) তাঁর ;
নাহি নিন্দা নাহি স্তুতি, নাহিক নিয়ম,
যেই মত ইচ্ছা হয় সেই আচরণ।
আবাহন, বিসর্জ্জন, নাহি মন্ত্র, ধ্যান, (৪)
নাহি উপাসনা, (৫) লক্ষ্য অলক্ষ্য সমান।
জড় ও চৈতন্য, দুই-এ ভেদাভেদ নাই,
নাহি আত্ম পর বোধ, সমান সবাই।
নাহি গৃহ, নাহি মঠ, নাহি কোন বাস,
ভিক্ষা পাত্র নাহি তাঁর, একান্ত নিরাশ।
পরমহংসের দৃষ্টি বিঘ্ন বিনশন
দৃষ্টি মাত্র বিঘ্ন কভু না রহে কখন।
লোভ বশে স্বর্ণে (১) দৃষ্টি করে যদি তিনি,
ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইবে তখনি।
লোভে স্বর্ণ ছুইলেই চণ্ডাল (২) হইবে,
লইলেই আত্মহত্যা পাপেতে ডুবিবে।
যোগিগণ লোভে বশে স্বর্ণে কখন
না করে দর্শন, স্পর্শ, না করে গ্রহণ।
স্বর্ণ ত্যাগ করে যিনি, তাঁহার সকল
বাসনা সম্পন্ন হয়, তিনিই সকল।
দুঃখে না পীড়িত হন, সুখ-ইচ্ছা-হীন,
ত্যাগ-শীল, যিনি নহে বাসনা-অধীন,
শুভাশুভ তুচ্ছ যাঁর, প্রমোদ কি দ্বেষ
সর্ব্ব বিষয়েতে যাঁর নাহি মাত্র লেশ ;
সকল ইন্দ্রিয় গতি নিবৃত্ত করিয়া
জ্ঞানে যিনি স্থির হ'ন একাগ্র হইয়া,
আত্মাতেই অবস্থিত যেই ভাগ্যধর ;
তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
পূর্ণানন্দ, নিত্যানন্দ লভেন যে জন
"আমি ব্রহ্ম" বলি তিনি কৃতকৃত্য হন।
তিনি কৃতকৃত্য হন॥

ইতি পরমহংসোপনিষদ্ সমাপ্ত।

শ্রীশশধর রায়।

# বেতালে বহু রহস্য। *

যে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আজ বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের কথা লইয়া, সেই সন্ধিস্থল নির্দ্দেশ করিয়া, অতি সূক্ষ্মদর্শী, প্রকৃত অন্তর্দ্দর্শী গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বেতালে বহু রহস্য' নামক পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করিয়া বঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুর নামে বিনয় সহকারে উৎসর্গ করিয়াছেন। আজ তাঁহার স্বজাতি, আজ তাঁহার প্রাণসমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, শিয়রে কৃতান্ত দণ্ডায়মান, যাঁহাদের জ্ঞান নাই, তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু রুন্মীলনের জন্য বড় দুঃখে, বড়ই মর্ম্মবেদনায় পুস্তিকাখানি তাঁহাদের উপহার দিয়াছেন। স্বজাতির দুঃখে যাঁহারা কাতর, স্বজাতির ভাবনা যাঁহারা ভাবেন, এই পুস্তিকাখানি পড়িলে তাঁহাদের বেদনা শতগুণ বৃদ্ধি হইবে, তাঁহাদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার পরিসীমা থাকিবে না। সুতীব্র ঘ্রাণশক্তি ও অমানুষিক স্পর্শ-শক্তির পরিচায়ক 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র যে

(৩) বষট্‌কার=দেবোদ্দেশে হবিঃপ্রয়োগ মন্ত্র।
(৪) ভগবানকে স্মরণ করা।
(৫) ভগবানকে পরিচর্য্যা করা।
(১) ধন সম্পত্তি মাত্রেই এই শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে।
(২) মূলে পৌল্কস শব্দ আছে। তাহার অর্থ, নিষাদের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত ব্যক্তি।
* শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল প্রণীত।

গল্পটী উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালীর দুর্দ্দিনের সংবাদ সভয়ে জ্ঞাপন করিয়াছেন, বাঙ্গালীর বিষম শোচনীয় পরিণামের কথা বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন,প্রত্যেক বাঙ্গালী সে সংবাদে শিহরিয়া উঠিবেন,তাঁহাদের স্পন্দহীন দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে বলিয়া আমাদের আশা হইতেছে।

ঘ্রাণ-শক্তি ও স্পর্শ-শক্তি উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালী যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি ও ভোজন-শক্তির অভাবনীয় হ্রাসের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, এদেশের ছাত্রবর্গের মধ্যে শত করা প্রায় ৬৬ জন কোন না কোন প্রকার চক্ষু রোগগ্রস্ত। * * ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কথা আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা বিনা চস্‌মায় ভাল দেখিতে পায়না, ইহাও সম্প্রতি জানিয়াছি।" ভোজন-শক্তির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা ভোজের নামে নাচিয়া উঠি, কিন্তু ভোজ পাইলে ভোজন করিতে পারি না। * * অম্ল রোগের আধিক্যে মিষ্টান্ন বিভীষিকাবং হইয়া উঠিয়াছে। * * এখনকার ভোজনে ভোক্তাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মুখ বদ্‌লাইতে দেখা যায়। * * ভোজে ভোক্তার প্রকৃত ভক্তি, সত্য আসক্তি না থাকিলেই ভোগী ভোজন-বিলাসী ও আড়ম্বরান্বেষী হইয়া পড়েন। * আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বের মত শক্তি, সামর্থ্য ও তীক্ষ্নতা নাই * * সকলকেই তখন মহা আনন্দে গণ্ডা গণ্ডা, কখন কখন দিস্তা দিস্তা লুচি উদরস্থ করিতে দেখিতাম। * * এখন প্রায় সকলেই তখনকার অপেক্ষা কম খান।"

দৃষ্টিশক্তি ও ভোজনশক্তির স্বল্পতার সম্বন্ধে তীক্ষ্নদর্শী গ্রন্থকার অনেক সার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার কথার প্রমাণ সকলে অহর্নিশি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; নিতান্ত অর্ব্বাচীন ব্যতীত সে সব কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই ভোজন শক্তির অভাব যত বাড়িতেছে, ততই যে আমাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যাইতেছে,সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও অবনতি—এবং ইন্দ্রিয়গুলির অবনতিতে সমস্ত দেহের অবনতি হইতেছে, গ্রন্থকারের এই মহা উক্তিও প্রমাণ করিতে হইবে না। তিনি অধুনা শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের কোন না কোন চক্ষু রোগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সকলে যে বয়সে চস্‌মা লইতেন, এখন শতের মধ্যে শতজনকেই বোধ হয় তদপেক্ষা কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে চস্‌মা লইতে হয়। সাময়িক ভোজের কথা ছাড়িয়া দিন; আমার পিতামহ প্রতিদিন যে পরিমাণে ভোজন করিতেন, এবং যেরূপ গুরুতর সামগ্রী আহার করিয়া পরিপাক করিতে পারিতেন, আমার পিতা তাহা পারেন নাই; এবং আমার পিতা যাহা পারিতেন, আমি তাহা পারি না, অধিক কি, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর যাহা পারিতেন, আমি সেরূপ পরিমাণে আহার করিতে পারি না; এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। পরমায়ুও তেমনই ছিল; পিতামহের সময় সচরাচর ৮০।৯০, কেহ কেহ বা শত বৎসর বাঁচিতেন; পিতার সমকালে ৭০।৮০তে নামিল, কেহ কেহ বা ৯০ বৎসর বাঁচিতেন; এখন ৬০ বৎসর জীবিত থাকিলে আমরা ধন্য জ্ঞান করি; এবং কাহাকে ৯০ বা ১০০ বৎসর বাঁচিতে দেখিলে বিস্মিত বা পুলকিত হই; মনে হয়, না জানি ইনি কতই পুণ্যবান্, কত সুনিয়মে, কত সদাচারে, জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেইজন্য এমন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন।

আমাদের জীবনী শক্তি হ্রাসের অন্যতম প্রমাণ, আমাদের নিত্য রোগ এবং নূতন নূতন রোগ। বোধ হয়, বৃদ্ধেরা বালক ও যুবকগণ অপেক্ষা অনেক সুস্থ ও শীতাতপ-সহিষ্ণু এবং এই সকল রোগের নিকট সম্পূর্ণ-রূপ অপরিচিত। আমাদের অপেক্ষা চিকিৎসকগণ অনায়াসে বলিতে পারিবেন, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আলোকহীন, বায়ুহীন, এক-তালার জলময় বা স্যাঁতসেঁতে গৃহে প্রসূত হইয়াও সদ্যপ্রসূত শিশুগণের এখনকার মত এত রোগ ও এত নূতন রোগ হইত কি না। ইদানীং ফুসফুসের কত নূতন প্রকার পীড়া জন্মিতেছে; কত নূতন প্রকারের চর্ম্মরোগ দেখা দিতেছে; এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, শিশু সন্তানদিগের এক প্রকার শিরঃপীড়াও হইয়া থাকে। শিশু সন্তানগণের মৃত্যু সংখ্যা তখনকার অপেক্ষা যে এখন অনেক অধিক, তাহা চিকিৎসকগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। তবু ত এখন উচ্চ শিক্ষার গুণে, উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারগণের পরামর্শে প্রসূতি-গণ স্যাঁতসেঁতে গৃহে আর সন্তান প্রসব করেন না; এখন অনেকে বায়ু-সঞ্চালিত, আলোকবিশিষ্ট গৃহে সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন; প্রভেদের মধ্যে এই, সেই স্যাঁৎ-সেঁতে গৃহে, সেই আলোকহীন বায়ুহীন গৃহে প্রসূতি প্রত্যহ প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ-ভোগ করিতেন এবং তাঁহাকে ঝাল খাইতে হইত। এখন চা সেই ঝালের স্থান অধিকার করি-য়াছে, এবং ফ্লানেল জ্যাকেট জামা মোজা এবং ডাক্তারী ঔষধ অগ্নির স্থল পূরণ করি-তেছে। কিন্তু প্রসূতিগণের দেহাভ্যন্তরস্থ নিদারুণ শ্লেষ্মা বিদূরিত করিতে, সর্ব্বাঙ্গের পরিপূর্ণ রস শুষ্ক করিতে পূর্ব্বে যে অগ্ন্যুত্তাপ দিবার সমীচিন ব্যবস্থা ছিল, হয় ত জীবনী-শক্তি-হীন, ক্ষীণ ইন্দ্রিয়যুক্ত বর্ত্তমান প্রসূতি-গণ তাহার তেজ সহ্য করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে ঝাল ও তাপ ছাড়াইয়া ডাক্তারগণ যে চা ঔষধ, পোর্টওয়াইন বা ওয়াইন অফ কড্‌লিভার অয়েল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ছেন, তাহার বিষময় ফল প্রসূতি ও সন্তান-গণ হাতে হাতে পাইতেছেন। নানা কারণে পূর্ব্বে এত সূতিকা-রোগও ছিল না, সূতিকা-রোগে অকালমৃত্যু ছিল না, সদ্যপ্রসূত সন্তান-গণও অবিরাম করালগ্রাসে পতিত হইত না। আমরা ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছি, আমা-দের একান্ত দুঃসময় উপস্থিত।

এই ত গেল, সদ্যপ্রসূত সন্তানগণের কথা। এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকগণের সাংঘাতিক যকৃত পীড়া ও জ্বরে পিতা মাতার আশা ভরসা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া অভিনয়ারম্ভেই যবনিকা-পতনের মুহুর্মুহ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কয়টী পাওয়া যাইত? যাহারা যকৃত পীড়া ও জ্বরের হস্ত অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া উঠিতেছে, সমগ্র বঙ্গদেশে গত ৩০।৪০ বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে তাহারা জীবন্মৃত হইতেছে, বৎসরে বৎসরে জীবনী-শক্তি হারাইতেছে এবং প্রতি-বৎসরে কত সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। "গোদের উপর বিষফোঁড়া" বর্ত্তমান ইংরাজি উচ্চশিক্ষা এবং সেই উচ্চ-শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চ-শিক্ষা দিবার প্রণালী। বর্ত্তমান উচ্চ-শিক্ষা বলিবার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে যখন শিক্ষা দিবার জন্য সিনিয়ার ও জুনিয়ার স্কলারসিপ প্রথা ছিল, যখন রুচি, প্রকৃতি ও শক্তিভেদে ইংরাজরাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহার সাহিত্যে প্রবণতা ছিল, তিনি সাহিত্যে পারদর্শিতা-লাভ করিতে পাইতেন, যাঁহার বুদ্ধি এবং

শক্তি গণিত শাস্ত্রের অনুকূল ছিল, তিনি গণিত শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন এবং ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জনে সেই বিদ্যাই যথেষ্ট সাহায্য করিত; অথচ তখন সকল ছাত্রই শারীরিক ব্যায়ামে প্রচুর অবসর পাইতেন। বিদ্যালাভ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে গিয়া শরীরপাত করিতে হইত না; ক্রমশঃ জীবনীশক্তি হারাইতে হইত না। তথাপি সে সময়ে যাঁহাদের শরীরপাত হইয়াছিল বা জীবনীশক্তির অপচয় হইতেছিল, তাহা অন্য কারণে ঘটিয়াছিল; সে কথা পরে বলিব।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যায়ামের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রগণকে অনর্থক এত বিষয় অধ্যয়ন এবং তজ্জন্য এত অধিক পুস্তক পাঠ করিতে হয় যে, তাহাদের ব্যায়ামের আদৌ অবসর থাকে না। যে সকল বিষয় ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগিবে না, যে সকল বিষয় অধ্যয়ন না করিলে ইহকাল বা পরকালের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না, অকারণ অনর্থক ছাত্রগণের দেহপাত করাইয়া, মানসিক শক্তির অপরিমিত অপব্যয় করাইয়া কেন সে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়? গবর্ণমেণ্ট আফিসের কোন কার্য্য পরিচালনের জন্য সে সকল বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না; তবে কি জন্য বঙ্গবাসীর ভবিষ্যজ্জীবনের আশা-ভরসা, দরিদ্রের অবলম্বন যুবকগণ শিরঃরোগ, চক্ষুরোগ, অম্লরোগে অভিভূত হইতেছে, দেহ জর জর হইতেছে, পরমায়ু হারাইতেছে? জিজ্ঞাসা করি, কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহামতি মেট্‌কাফ্-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যক্ত হইল, জুনিয়ার সিনিয়ার স্কলারসিপ প্রথার লোপ করা হইল? লোপই যদি হইল, তবে কেম্‌ব্রীজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে, রুচি অনুযায়ী, শক্তি অনুযায়ী গণিত ও সাহিত্য শিক্ষা কেন প্রচলিত হইল না? গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিচারকের কার্য্য হইতে সামান্য কেরাণীর কার্য্য পর্য্যন্ত যত প্রকার কার্য্য আছে, সে সমস্ত সম্পাদনের জন্য কি বর্ত্তমান এণ্ট্রান্স, এফ্-এ, বি-এ পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্টবলদ বা গর্দ্দভের দুগ্ধ ভার বহনের আদৌ প্রয়োজন হয়? তবে প্রকারান্তরে ছাত্রকুলের বিনাশ সাধন কেন? ইউনিভার্সিটি কমিশনের বিরুদ্ধে দেশে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তখন এই মূল আপত্তির কথা কেহই তুলেন নাই; কেবল ৩৩ নম্বরের স্থলে ৪০ নম্বর কেন করা হইবে, এই ইতিহাস বা ভূগোল না পড়াইয়া অমুক ইতিহাস বা ভূগোল কেন পড়ান হইবে, বিজ্ঞানের অমুক অমুক বিষয় কেন প্রবর্ত্তিত হইবে, ইত্যাদি অবান্তর কথারই আলোচনা ও আন্দোলন হইল। আরও বিস্ময় ও পরিতাপের কথা, বিষম ভয় ও সন্দেহের বিষয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণী হইতে এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইত, এখন পাঠ্য পুস্তক তদপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে, বোধ হয়। অথচ তখনকার বি-এ, এ-মের ইংরাজি সাহিত্য বা গণিত শাস্ত্রে বিচক্ষণতার সহিত, বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি বা আইনজ্ঞতার সহিত অধুনাতন ছাত্রবর্গের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে যদি যুবকগণের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, শরীর ব্যাধিমন্দির হয়, অকাল মৃত্যু ঘটে, তবে কোন্ সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষাকে তাহার অন্যতম কারণ না বলিয়া থাকিতে পারিবেন?

এই উষ্ণপ্রধান দেশে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে বিদ্যাশিক্ষা, রাজকার্য্য, ব্যবসা বাণিজ্য, সমস্তই পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সম্পন্ন হইত। এখনও দেশীয় রাজগণের রাজ্যে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; এবং মধ্যাহ্ন কালে আহার ও বিশ্রাম করিতে অবকাশ দেওয়া হয়। আমাদের দেশ কখনই মধ্যাহ্ন পরিশ্রমোপযোগী নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এক্ষণে সব কার্য্যই মধ্যাহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে দেশে সাত আট মাস গ্রীষ্ম কাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সে দেশে ছাত্রবর্গের এক মাস দেড় মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রচুর নহে। ইংরাজ রাজ্যে মধ্যাহ্নে কার্য্যের ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যের সমূহ হানি হইতেছে; এবং আমাদের আপেক্ষা ইংরাজ জাতির বহুগুণ অনিষ্ট হইতেছে। বড় লাট, ছোট লাট, সেক্রেটারিগণ এবং এবং কয় শত কেরাণী শৈল-শিখরে গমন করেন বই ত নয়। যে সময়ে অনাবৃত দেহে, নিজ বাস-গৃহে বিশ্রাম করা বা সামান্য কার্য্য করা ভারতবাসীর চিরন্তন প্রথা ছিল, সেই ভারত-বাসীর কি স্বাধীন ব্যবসায়ী কি পরকার্য্যোপ-জীবী সকলকেই ইংরাজ আমলে মধ্যাহ্নকালে জামাযোড়া আঁটিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে। ইহাতে শরীরের কতটা ক্লান্তি, কি পরিমাণে অবসন্নতা ঘটে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী প্রতিদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। প্রত্যহ বিন্দু বিন্দু করিয়া আমাদের বলক্ষয়, জীবনীশক্তির হ্রাস হইতেছে। নিদারুণ গ্রীষ্মে, উৎকট পরিশ্রমে, আহারের প্রবৃত্তি ও শক্তির অপচয় হইতেছে। মধ্যাহ্নে কার্য্য এবং অপরিমিত পরিশ্রম এবং সেই পরিশ্রমের তুলনায় স্বল্পনিদ্রা আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও রসনেন্দ্রিয়ের অপচয়ের অন্যতম কারণ, ইহা বড়ই ভাবনার কথা, বড়ই ভয়ের কথা। এরূপ ভাবে চলিলে আমাদের ধ্বংসের বড় অধিক বিলম্ব নাই।

অন্তর্দর্শী গ্রন্থকার আমাদের জীবনী শক্তি হ্রাসের আর একটী গুরুতর কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে দেহনাশক মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে; আমরা স্ত্রী পুরুষ মুটে মজুর শিশু পর্য্যন্ত চা চুরুটে মজিয়া উঠিতেছি। শুনিয়াছি, চা বেশী পান করিলে স্নায়ু দুর্ব্বল হয়, বড় বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইতে হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক চা-পায়ীর লিখিতে হাত কাঁপে, লেখা তেড়া বাঁকা হইয়া যায়।" চা-চুরুটের অপকারিতার কথা বলাতে চা-চুরুট-সেবীগণ হয় ত গ্রন্থ-কারের প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন; হয় ত বলি-বেন যে, চা-চুরুট মহাপ্রতাপশালী ইংরাজ জাতির পেয়, তাহা কখনই অনিষ্টকারী হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না, শীত-প্রধানবাসীর পক্ষে যে আহার্য্য ও পেয় স্বাস্থ্য-কর, গ্রীষ্মপ্রধানবাসীর পক্ষেই তাহা অস্বাস্থ্য-কর। যে চা ইংরাজের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে, সে চা বাঙ্গালীর স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতা প্রভৃতির সৃষ্টি করে। হয় ত মদ্য-মাংসোপ-জীবীগণের শরীরে চা কোন রাসায়নিক সুক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে; কিন্তু অন্ন, মৎস্য ও ফলমূলাহারীগণের পক্ষে সে রাসায়-নিক ক্রিয়া সাধিত না হইবার সম্ভাবনা। তারপর, ভবিষ্য বৈজ্ঞানিক কোন্ দিন শীত-প্রধান দেশের পক্ষে চার অপকারিতা আবি-ষ্কার করিবেন। এতকাল ত দেশে চা ছিল না, এতকাল কি দেশের লোকের অবসাদ ক্লান্তি দূর হইবার উপায় ছিল না। চার অভাবে সর্দ্দি কাশী কি করিয়া আরোগ্য হইত?

কিসের সাহায্যে শরীরে স্ফূর্ত্তি ও বলাধান হইত? সকলেই জানেন, এই সকলের সহস্র সুলভ উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। জানি না, কোন্ পাপ কর্ম্মফলে এই দরিদ্রের দেশে এই বড় মানুষের আসবাব, এই অকারণ বিলাসিতা প্রবেশ করিল।

মাদক দ্রব্য মাত্রই দেহনাশক। কিন্তু এদেশে যে যে মাদক দ্রব্য প্রচলিত, তৎসমস্তই ইউরোপীয় সুরা প্রভৃতি অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকারক। তামাকের ধূম হুঁকার মধ্য দিয়া জলের মধ্যে অনেকটা হতবীর্য্য হইয়া আমাদের গলাধঃকরণ হয়, কিন্তু চুরুট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রসনা সংযুক্ত হইয়া উদরে প্রবেশ করে; সুতবাং মাদকতার পক্ষে ইহা তীব্রতর ও আশুফলদায়ক। তথাপি উৎকৃষ্ট উপকরণে প্রস্তুত চুরুট দেশে যে অনিষ্ট করিয়াছে, অতি নিকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত সিগারেট তদপেক্ষা সহস্রগুণ সর্ব্বনাশ করিতেছে। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাস, অধুনা ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা, নিত্য ফুস্‌ফুস যন্ত্রের বিকৃতি সাধনের এক প্রধান কারণ সিগারেট।

কিন্তু বিলাতী সুরার কাছে কেহ নহে! প্রতি বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ লোক এই রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ করিতেছে, কত রাজা পথের ভিখারী হইয়াছেন, কত বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে, কত অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে, কত সুখের সংসার শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভারতবর্ষে এত নেশা বা মাদকদ্রব্য ত প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণে কেহ মারে নাই ত; মানবকুল কেহ ধ্বংস করে না ত; রাজাকে কেহ পথের ভিখারী করিতে পারে নাইত, সুরা সে সব পারিয়াছে, সুরা সে সমস্ত করিতেছে। সুরার এই সর্ব্বসংহারিণী শক্তি আছে বুঝিয়া হিন্দু শাস্ত্রে ও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে সুরা সেবন মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা ভারতবাসীর পক্ষে মহাপাপ, তাহা ইউরোপবাসীর পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য, শরীর রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন; অধিক কি, এলোপ্যাথী চিকিৎসামতে সুরা একটী প্রধান, বোধ হয় সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। যাহা ইউরোপে স্বাস্থ্যকর, বলকারক ঔষধ, এ দেশীর পক্ষে তাহা বিষ। বহুদিন পূর্ব্বে সাহেবরা এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু যাহা তাঁহাদের এক প্রধান আয়ের উপায়, যাহার বাণিজ্যে তাঁহাদের সমৃদ্ধি বাড়িতেছে, বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইলেও তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বরং ইংরাজ বনিকগণ আফিমের প্রচলনে মদের কাট্‌তি কম হইতেছে বিশ্বাসে, পরদুঃখকাতরতার ভাণ করিয়া অহিফেন সেবনের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সমরে বিজয়ী হইবার আশা দিন্ দিন্ ক্ষীণ হইতেছে। সুরা বঙ্গবাসীকে এতদূর জীবনীশক্তি-হীন করিয়া ফেলিয়াছে যে, সুরাপানের শক্তিও তাঁহাদের হ্রাস হইয়াছে; মহাবীর জাতির মহাতেজস্কর পেয় পান করিতে তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের সাহসে কুলাইতেছে না। বিলাতের Philanthropistগণ যতই আন্দোলন করুন, আইন করুন, ক্রমশঃ বলবীর্য্যহীন, জীবনীশক্তিবিহীন বঙ্গবাসী বীরভোগ্যা সুরা সেবনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। অধুনা দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের কারণ কেবল ইংরাজি উচ্চ শিক্ষা-প্রভাব ও ব্যায়ামের অভাব নহে, বর্ত্তমান বাঙ্গালীর কত শত জনের পিতা পিতামহের মদ্যপায়িতা তাহার মূল। ইদানীং শিশুদিগের অধিকাংশের যকৃতের পীড়ার কারণ কেবল দূষিত গোদুগ্ধ বা

ঘৃত নহে, বিকৃত জকৃতগ্রস্ত পিতার ঔরসে জন্ম, তাহার অন্যতম কারণ। অপরিমিত সুরাপানে যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তৎসন্তানগণের নিত্য শিরঃরোগ দেখিয়া আক্ষেপ করা মূর্খতার কার্য্য। আমাদের বিশ্বাস, এত যে নিউমোনিয়া, ব্রন্‌কাইটিস বদ্ধমূল হইতেছে, তাহারও নানা কারণের মধ্যে সুরা পান বা সুরাপায়ীর বংশধর হওয়া অন্যতম কারণ।

কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনীশক্তিহীনতার এতদপেক্ষাও প্রবলতর কারণ ঘটিতেছে। শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ঋষিগণের বিধি ব্যবস্থা কুসংস্কার বলিয়া তুচ্ছ করিয়া অপরিমিত ইন্দ্রিয়-পরিতোষই আমাদের জীবন শক্তি হ্রাসের, আমাদের বিনাশের সর্ব্বপ্রধান কারণ। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে সকল কার্য্যে সংযম রক্ষা করিবার জন্য যে জাতি জীবনের চতুর্থাংশকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতেন, গুরুগৃহে বাস করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ স্বরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, সংযম-সাধনের যে সহস্র উপায় শাস্ত্রে লিখিত আছে, জ্ঞানে ও আচরণে সে সমস্ত সম্যকরূপে অভ্যাস করিতেন। দেশের স্বাধীনতার সহিত যে জাতির চিত্তেরও স্বাধীনতা ছিল, আজ সাত আট শত বৎসর দেশের স্বাধীনতা হারাইয়া সে জাতির অন্তরেরও স্বাধীনতা বিনষ্টপ্রায়। আজ বাঙ্গালী বাহিরেও ক্রীতদাস, অন্তরেও কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার, বৃথাভিমানেরও হীন ক্রীতদাস—অসার, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, হেয়। যে যে জাতির অধীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহারা বাস করিতেছেন, তাহাদের কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্রে "মাতৃবৎ পরদারেষু"র বিধি নাই, পতিব্রতার সহমরণ তাহাদের নিকট বর্ব্বরতা, বিধবার চিরব্রহ্মচর্য্য তাহাদের নিকট নিদারুণ নির্য্যাতন, পুরুষজাতির পক্ষপাতিতা, অত্যাচার ও অবিচার। তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন স্থলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" বিধি নাই; পক্ষান্তরে পত্নী সহবাস যখন ইচ্ছা, যেরূপে ইচ্ছা করণীয়, তাই আমাদের বিশেষ বিশেষ তিথি, নক্ষত্র, বাররতে সহবাস-নিষেধ এত উপহাসের বিষয় হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজের বিলাসিতার অনুকরণে, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবায় এবং তদুপযোগী রাজসিক ও তামসিক আহার প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া, সাত্বিক আহার ও সাত্বিক আচরণ ত্যাগ করিয়া আমাদের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। এই অধঃপতনের আরম্ভ বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছে। যদি আমাদের রাত্রিজাগরণ করিয়া লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত বীর্য্যক্ষয় না ঘটিত, তবে অল্প বয়সে আমাদের দৃষ্টি শক্তির এত হ্রাস হইত না, এত সার্ব্বজনিক শিরঃপীড়া প্রবল হইত না। এস্থলে বলিয়া রাখি, বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে এই যে দৃষ্টিহীনতা, এই যে শিরঃপীড়া, এবং বিষম অজীর্ণ রোগ ( dyspepsia ) তাহার প্রধান কারণ, তরুণ বয়স হইতে ঘৃণিত, পৈশাচিক উপায়ে বীর্য্যক্ষয় বা আত্মনাশ। চিকিৎসকগণেরা বলেন, স্ত্রী সহবাসাপেক্ষা ইহার অনিষ্টকারিতা অনেক অধিক। এখন যত বেশী পাশ করিয়া, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, যুবকগণের এই মহাপাপ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে, সর্ব্ববিষয়ে অতুল দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন, "আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের অবস্থাও অতি শোচনীয় ও ভীতিজনক—আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বের মত শক্তি সামর্থ্য ও তীক্ষ্ণতা নাই" তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ অপরিমিত ও অনুচিত বীর্য-

ক্ষয়; ইহা ভোজন-শক্তির সহিত ভোজন-স্পৃহা পর্যন্ত লাঘব করে। যতই ফুটবল, ক্রিকেট খেল, স্যাণ্ডো কর, অথবা সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামের শীর্ষ স্থানীয় ভারতবর্ষীয় ব্যায়ামের অনুষ্ঠান কর, ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত, ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া বীর্য্যরক্ষা ব্যতীত, সমস্তই বিফল হইবে।

বঙ্গবাসীর বীর্য্যহীনতার, জীবনীশক্তি হ্রাসের এবং চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির ক্রমশঃ ক্রিয়াশক্তিলোপের সমগ্র কারণ আছে। সিদ্ধহস্ত এবং এই বিশাল, বিরাট সমাজের গূঢ় রহস্যজ্ঞ গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠা মাত্র পুস্তিকায় যেরূপে আমাদের শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণগুলির আলোচনা করিয়াছেন, এবং আরও বহুকারণের আভাস দিয়াছেন, ভাবিবার এবং প্রতিকার করিবার সূত্র ধরিয়া দিয়াছেন, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অন্যান্য গ্রন্থকারগণ এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে হয় ত ৪০০ পৃষ্ঠায় বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেন। বাস্তবিক আমাদের বর্ত্তমান অনিবার্য্য মানসিক ও নৈতিক অবনতিজনিত উৎসাহহীন, অধ্যবসায়হীন, সাহসহীন, উন্নতি করিবার শক্তি-সামর্থ্যহীন, পরস্পর অবিশ্বাসী, সমবেত ক্রিয়াশক্তিশূন্য, প্রকৃত স্বার্থজ্ঞান রহিত বাঙ্গালী জাতির পরিণাম সম্যক আলোচনা করিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরই প্রয়োজন।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সভা-সমিতিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "আমরা ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত; তৃষ্ণায় আমরা জলপান না করিয়া বিষপান করি; আমরা বিকৃত অবিশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করি; দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরই শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে; আমরা ভাত পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। অথচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত; দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের মধ্যে দেহ-নাশক মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে; আমরা স্ত্রী পুরুষ মুটে মজুর শিশু পর্য্যন্ত চা চুরুটে মজিয়া উঠিতেছি। * * আমরা এখনও জানিনা, আমরা এখনও বুঝি না, আমাদের প্রকৃত অভাব কি, আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা কি জন্য, আমাদের কষ্ট যন্ত্রণার মূল কোথায়।" এই ২১ বৎসরে কংগ্রেস আমাদের প্রধান অভাবগুলি, সর্ব্বাগ্রে শোচনীয় অভাব সকল বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলেন না; তাই কয় সহস্র ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবাসী ব্যতীত ত্রিশকোটী ভারতবাসী কংগ্রেসের সহিত প্রাণ মিশাইতে পারিতেছে না; কংগ্রেসের কার্য্য তাহাদের বুদ্ধির অগম্য—প্রীতি ও বিদ্বেষ উভয়েরই অতীত। কংগ্রেসের বক্তৃতাদি প্রজা সাধারণের হৃদয়-বেদনার অভিব্যক্তি হইলে, তাহাদের করুণ রোদন হইলে, ভারত-সচিব মরলে সাহেব সেদিন কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না, "কংগ্রেসকে আমাদের ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।" পক্ষান্তরে দেখুন, এই স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র দেশ—পণ্ডিত, মূর্খ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধবণিতার হৃদয়-তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়াছে বলিয়া আজ ইংরাজ জাতি শশব্যস্ত, সন্ত্রস্ত, আকুলিত।

আমাদের সমালোচনা ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তকের শেষে গ্রন্থকারের মহতী উক্তির কয়েক অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:—"বড় দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সাহিত্যে এখন উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার বাড়িতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই সকল লক্ষ-

ণের যেন অতি প্রাবল্য হইতেছে * * বোধ হয় যে, আমরা বিশ্বনাথকে ভুলিতেছি বলিয়া বিশ্বের কারণ-রহস্য ও বস্তু-রহস্যের বিশালতা ও দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি আর লক্ষ্য করি না বলিয়া আমাদের সাহিত্য ও সমাজ দুইই বিপন্ন। আমাদের সাহিত্য পরিস্কৃত ও উন্নত করিতে হইবে; আমাদের সমাজ বা হিন্দু জাতিকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। * * কিন্তু বিশ্বনাথের ভক্ত হইয়া তাঁহার বিশাল বিশ্ব-রহস্যে মুগ্ধ হইলে আমাদের অহঙ্কার ও আত্মাভিমান এবং তজ্জনিত কলহ-প্রিয়তা, বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চলিয়া যাইবে এবং উভয় কাজেই আমাদের মতি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিবে।”　　শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

# আহ্বান।

আয় তোরা—কে আসিবি ভাই!
একবার মা’র কোলে যাই;
　সে যে আমাদেরি ঘর,
　নাহি অন্য নাহি পর,
নাহি সেথা রাঙা আঁখি আপদ বালাই,
　কেহ নাহি দিবে গালি,
　বিদ্রূপ ব্যঙ্গের ডালি,
কৃপাণ খুলিয়া কেহ মাথা লবে নাই,
　আয়! মোরা মা’র কোলে যাই।

২

মা’র ঘরে গোলা ভরা ধান,
গোহালে গাভীর অবস্থান;
　তুলসী বেদীর কাছে,
　আঙ্গিনায় শিশু নাচে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ছোটে অমৃত তুফান!
　যুবার বিনীত বাণী,
　বধূরা স্বরগ রাণী,
প্রবীণ শুনায় গীতা, পবিত্র পুরাণ।

৩

সরোবরে নিরমল জল,
পুলকে খেলিছে মীন দল,
　মৃদুল হিল্লোলে বা’য়
　লহরী নাচায়ে যায়,
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে সোণার কমল!
　শাখি শাখে পাখিগণে,
　কূজনে আনন্দ মনে,
তরু লতা ভরা কত চারু ফুল ফল।

৪

মা’র অন্ন—সে মহা প্রসাদ,
মাখা তাহে সুধার আস্বাদ,
　কি আশে প্রবাসে র’ব,
　কাহার “গোলাম” হব,
শস্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা—মাতৃ আশীর্ব্বাদ,
　মায়ের কুটীর খানি,
　অলকা অমরা মানি,
শত তুচ্ছ তার কাছে পরের প্রাসাদ।

৫

মণি ত্যজি কাচের আশায়,
এতদিন ছিলাম কোথায়?—
　ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন,
　বিফলে কেটেছি দিন,
একটী স্নেহের কথা মিলেনি ধরায়!
　অদৃষ্টের উপহাস,
　পরিতে যুটেনি বাস,
মিলেনিকো এক মুঠা—দারুণ ক্ষুধায়।

তনু যে কঙ্কাল সার,
পারিনা পারিনা আর
বহিতে সাহেবী সাজ গোলামীর দায়!
হৃদয়ের যা' মহত্ত্ব—
শুভ বুদ্ধি—মনুষ্যত্ব,
ছি ছি ছি কিসের লোভে করিনু বিদায়!
আয় ভাই, লুকাবিতো আয়!

৬

ওগো তোরা মা'র কোলে আয়,
হারাধন পাবি পুনরায়;
কি হবে দাসত্বে খাটি,
আয় পুনঃ মাটি কাটি,
উদর পূরিবে তাহে বিধির কৃপায়,
পত্নী, পুত্র কন্যাগণে
কাঁদিবে না অনশনে,
স্থবিরা মা' মরিবে না পেটের জ্বালায়,
রবে না কো মনস্তাপ,
হবে না সে মহাপাপ,
টানিতে গলায় ফাঁসি, বকুল-শাখায়।

৭

আর তাঁতী, কাঁসারি, শাঁখারি,
কর্ম্মকার, হবেনা ভিখারী;
স্মরি পুনঃ ইষ্ট মন্ত্র,
হাতে লহ ত্যক্ত যন্ত্র.
এস, পুরাতন ব্যথা যাতনা পাসরি;
স্বদেশের ছেলে মেয়ে,
দাঁড়ায়েছে মুখ চেয়ে,
দাও বস্ত্র, রত্ন, অস্ত্র, বসন, বাঁশরী;
আজি যে মায়ের পূজা,
অই যে মা দশভূজা,
দিতেছেন বরাভয় অমৃত-লহরী।

৮

কে কোথায় আছ এস ভাই,
মা'র কোলে—স্নেহধামে যাই,
কোটী শির লুটাইয়া,
পাদপদ্মে প্রণমিয়া,
"বন্দে মাতরম্" গীতি কোটী কণ্ঠে গাই;
আমাদেরি মা'র ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
আমরা দেখিনা চেয়ে ভিক্ষা মেগে খাই;
সব ভাই বোন মিলে,
শ্রীচরণে পূজা দিলে,
সিন্ধুপারে যাবে সব আপদ বালাই,
চল চল বেলা গেল মা'র কোলে যাই।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

# নব-সাধনা।

ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ভারত মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিল, সহসা কি এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা উদ্বোধিত হওয়ায়, ঘুমের ঘোর ঘুচিয়াছে। ভারতে যেন নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বিধাতার কি এক ইঙ্গিতে ভারত আজ মাতোয়ারা।

ভারতের এই নব-জীবনের সময়ে ইহাকে প্রত্যেক কার্য্যেই নবোদ্যমে, নবোৎসাহে প্রোৎসাহিত হইতে হইবে। প্রাচীন ভারতে যে বিধি,যে ব্যবস্থা, যে নীতি, যে রীতি ছিল, ও অদ্যাবধি যাহা প্রচলিত আছে, তাহার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতে যে চারিযুগের বিবরণ অর্থাৎ সত্য,

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে যুগ-চতুষ্টয় আর নাই। ভারতে বহু দিবস হইতে রাক্ষসী যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সাধনা বিস্মৃত হইয়া, এক্ষণ নব্যভারতের নব-সাধনায় প্রত্যেক নর নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে। নব-সাধনা কঠোর হইলেও, দুঃসাধ্য হইলেও, এই সাধনাই সিদ্ধি লাভের এক মাত্র উপায় মনে করিয়া, নব-ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। এ পথে বাধা অনেক, বিঘ্ন বহু, বিভীষিকা অসংখ্য।

একবার মনে করা যাউক, প্রাচীন ভারতের কথা। প্রাচীন ভারতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ অতি পবিত্র, অতি গুরুতর ছিল। রাজাকে প্রকৃতিপুঞ্জ ভগবানের অংশ জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত; ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী দ্বারা অর্চ্চনা করিত। বর্ত্তমান সময়ে রাজা প্রজায় যেমন খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, এমন রাক্ষসী ভাব প্রাচীন ভারতে পরিদৃষ্ট হইত না। প্রজার সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি, অভাব, অভিযোগ সকলই রাজার প্রতি সমর্পণ করিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিত। রাজাই প্রজার সর্ব্ববিধ কার্য্যের পরিচালক ছিলেন। ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান, উভয় শ্রেণীর রাজাগণই প্রকৃতিরঞ্জক ছিলেন। সর্ব্ব প্রকার সুখ শান্তি, সুবিধা অসুবিধা, রাজা সন্দর্শন করিতেন বলিয়াই, আজন্ম ভারতীয় প্রজাগণ রাজশক্তির নিকট অবনত-মস্তক। আবহমানকাল হইতেই এদেশে রাজা প্রজার সম্বন্ধ এক অপূর্ব্ব ভাবময় ছিল। হিন্দুগণের মধ্যে ভগবান রামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজা হরিশ্চন্দ্র, মুসলমানগণের মধ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মুসলমানগণের ভিতর যে সমস্ত রাজা বাদসাহ বিশেষ অত্যাচারী ছিলেন; প্রকৃতি-পুঞ্জের অশান্তির কারণ ছিলেন বলিয়া ভারতীয় ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, সেরূপ অত্যাচারীগণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য জাতীয় রাজাগণের ভিতর এরূপ একটী লোক প্রাপ্ত হওয়াও দুর্ঘট। মহারাজ জরাসিন্ধু, মহারাজ দুর্য্যোধন, মহারাজ কংস, রাবণ, আরঙ্গীব প্রভৃতি ব্যক্তিগণের রাজত্ব কালেও বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণের রাজত্বের ন্যায় নিত্য দুর্ভিক্ষ ও তজ্জন্য কোটী কোটী লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের রাজা বণিক। সকল কার্য্যেই বণিক্য নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাজাকে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া, প্রজার স্বার্থ সন্দর্শন করিতে হয়। মানুষ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না। রাজা হাজার হইলেও রক্তমাংসের শরীর লইয়া বাস করেন; তাঁহার প্রবৃত্তি আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। রক্ত মাংসের শরীর মানুষ যেমন প্রবৃত্তির দাস, স্বার্থের উপাসক, বর্ত্তমান সময়ের রাজাতে তাহা ষোল আনা বিদ্যমান।

ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থ-পরতা সন্দর্শন করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্রাট, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ইহাঁদিগকে বাজারের কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। কুকুরগুলি আহারীয় দ্রব্য লইয়া যেমন পরস্পরে কলহ বিবাদ, কামড়াকামড়ি করে, ইউরোপের রাজাগণও রাজ্য লইয়া, দেশ লইয়া, তেমনই মারামারি কাটাকাটি করে।

প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ ছিলেন পারর্থপর, নবীন ভারতের রাজাগণ স্বার্থপর।

ভারতের রাজাগণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, তাই এদেশের প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন, অনুসন্ধান লইতেন। আর ভারতের নবীন রাজা বিদেশী, প্রজার সুখ স্বার্থ, অভাব অভিযোগ তাহার দেখিবার আবশ্যক হয় না, দেখিবার প্রবৃত্তিও নাই। তাই ভারতবাসীকে পদে পদে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অন্ন বিনা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইতেছে। প্রাচীন ভারতে প্রজার আত্মরক্ষার ভার রাজার উপর সমর্পিত ছিল; তিনি বন্ধুর ন্যায়, আত্মীয়ের ন্যায় প্রজার সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তি-সুবিধার ব্যবস্থা করিতেন, প্রজাপালন তখন রাজার ধর্ম্ম ছিল, আত্মরক্ষা, স্বজন-রক্ষা যেমন ধর্ম্ম, স্বদেশ-রক্ষাও তেমনই ধর্ম্ম মনে করিতেন। এক্ষণে রাজ-ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। এক্ষণে বৈদেশিক রাজা স্বার্থপর। কিসে প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিবেন, কিসে নিজের ভাণ্ডার ধন-ধান্যে পরিপূরিত হইবে, কেবল দিবানিশি এই চিন্তা এবং পরিচেষ্টা। এই চিন্তা ও চেষ্টার ফলে রাজ-ধর্ম্ম এক্ষণে লুণ্ঠন-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। প্রজার যথা সর্ব্বস্ব রাজ-শক্তিরূপ হুতাশন মুখে নিরন্তর নিপতিত হইতেছে।

ভারতে লুণ্ঠন-কার্য্য দুই এক দিবস হইতে আরম্ভ হয় নাই। সেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল অবিরত লুঠ-তরাজ হইতেছে, ইহাতে বাধা নাই, বিঘ্ন নাই। নির্ব্বিবাদে ও নিরাপত্তিতে এ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে যাইয়া স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা সিরাজ উদ্দৌলা, মীর কাসিম্, মহারাজা নন্দ কুমার, রাজা সীতারাম রায় প্রভৃতি জ্বলন্ত-অনলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছেন। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ধারাবাহিক অত্যাচার-বিবরণ কোন সহৃদয় ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত না হইলেও, যাহা আছে, তাহাতেই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, ইংরাজ এদেশে লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে, যতদূর সাধ্য লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবে। ইংরাজ বিশ্বাস করে, তাহার লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে বা বাধা দিতে পারে, ভারতে এমন শক্তি-সম্পন্ন মানব নাই।

ভারতের কিছুই নাই। ধন-ধান্য, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, সকলই যাদুকরের যাদুমন্ত্র বলে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারত-ভূমি এক্ষণ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, ইন্দ্র-প্রস্থ, অযোধ্যাপুরী, পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ-সমূহ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর প্রভৃতি স্থান-সমূহ ভারতের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর শত সহস্র চিত্র প্রদর্শন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর পূজনীয় ও বরণীয় হইয়াছিল। আজ সেই সমৃদ্ধিশালী জনপদ-সমূহ শ্মশান সম বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভারতের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় কেবল যে ভারতবাসীর অদৃষ্ট-দোষে হইয়াছে, তাহা নহে। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, দানবকে মানব বলিয়া বিশ্বাস করায়, তাহার এ দুঃখ দুর্গতির উদ্ভব হইয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে এ-কাল পর্য্যন্ত ভারতের যে দুরবস্থা হইয়াছে, এমন হীনাবস্থা, এমন অমানুষিক অত্যাচার কোন দেশের কোন ইতিহাসে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ভারতের নাই বলিতে কিছুই নাই।—ভারতবাসীর রক্ত মাংস বিদেশী বণিকের উদরে অবস্থিত; অস্থি চর্ব্বণের সূত্রপাতে ভারতবাসীর ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। নিমীলিত-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। এক্ষণ

সকলকেই শিরে হাত দিয়া ক্রন্দন করিতে হইতেছে।

বিদেশী বণিক রাজার হস্তে ধন, মান প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়া ভারতবাসী যে দীন হীন কাঙ্গালেরও অধম হইয়াছে, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? যদি পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস করিয়া জড়-পদার্থের ন্যায় অবস্থান করে, তাহা হইলে এ জাতির অস্তিত্ব যে অতি অল্প সময়ের ভিতরই বিলুপ্ত হইবে, এ কথা নিতান্ত অনভিজ্ঞও দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারে। আত্ম-রক্ষা, স্বজন-রক্ষা, স্বদেশ-রক্ষা করিতে হইলে ভারতবাসীকে পুরাতন পাঠ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পাঠ অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাহাদিগকে নূতন পথের পথিক হইতে হইবে।

বর্ত্তমান দুঃখ,দুরবস্থা অপনোদনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—আত্ম-শক্তির জাগরণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপন। আত্ম-শক্তি জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপন করিতে হইলে ভারতবাসীকে নব-মন্ত্রে অভিষেক করিতে হইবে। ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব ভাবকে জাগরিত করিতে হইবে।

জাতীয় ভাব-জাগরণের সর্ব্বপ্রধান উপায় জাতীয় শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা দ্বারাই প্রত্যেক দেশের মানুষ জাতীয়-জীবন প্রাপ্ত হয়, এই শিক্ষা দ্বারাই জাতীয়-শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়। বৈদেশিক শিক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইলেও,তাহাতে জাতীয় ভাবের বিকাশ না করিয়া বরং সঙ্কুচিতই করে। জাতীয় শিক্ষা দ্বারাই জাতীয় জীবন সংগঠন, পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এই শিক্ষা যাহাতে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়, এই শিক্ষার প্রসার যাহাতে দেশমধ্যে সুবিস্তৃত হয়,সর্ব্বাগ্রে আমাদের সেই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা বলিলেই, যে শিক্ষায় স্বদেশের ও সমাজের উন্নতি হয়,তাহাকেই বুঝায়। বর্ত্তমান কালে আমরা বৈদেশিক বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। তাহার ফলে আমরা স্বদেশী না হইয়া সকলেই বিদেশী ভাবে অভিভূত। আমাদের বাহিরের আচরণটা যদিও স্বদেশী, কিন্তু ভিতরটা ষোল আনাই বিদেশী। ভিতর বিদেশী বলিয়া,আমরা মুখে "স্বদেশী" "স্বদেশী" বলি; কিন্তু অন্তরে ঐ বিদেশীর উপর কেমন এক বিজাতীয় টান। যিনি ইংরাজীতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, তিনিও যেমন, যিনি কেবল বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেছেন, তিনিও তেমনই। এখন স্কুল পাঠশালায় যে বাঙ্গালা শিক্ষা করা যায়, তাহা ইংরাজিরই অনুবাদ। ফলে কি ইংরাজী-নবিশ, আর কি বাঙ্গালা-নবিশ, সকলেই বিদেশী প্রেমে মাতোয়ারা (১)। এই বিজাতীয় শিক্ষা বলেই ইংরেজ এ দেশে সুধা-বৃক্ষের মূল শিকড় প্রোথিত করিয়াছে, সুধা-ফল বস্তা বস্তা বোঝাই করিয়া দেশে লইয়া যাইতেছে, তোমরা দেখিয়া দেখিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পার না, বলিবার শক্তিও নাই। ইংরেজ একদিকে তোমাকে শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা তোমার মনোবৃত্তির বল, উৎকর্ষতা বিনষ্ট করিয়াছে,অন্য দিকে শাসন বিচার রূপ শাণিত অস্ত্র তোমার মস্তকোপরি দোদুল্যমান, তুমি নাগ পাশে বিবদ্ধ হইয়া কেবল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছ?

মাকড়সার জালের ভিতর কোন ক্ষুদ্র কীট বা পতঙ্গ পতিত হইলে, মাকড়সা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাহার উপর পতিত হয়, এবং

(১) এমন এক সময় গিয়াছে, যে সময়ে কেহ ইংরাজী না জানিলে তাহাকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করিত না।

ক্রমান্বয়ে নিজের শরীরস্থ সূত্র দ্বারা ঐ নিরীহ প্রাণীকে জড়াইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ এই-রূপ জড়াইতে জড়াইতে, প্রাণীটা যখন অসাড় হইয়া পড়ে, তখন মাকড়সা মনের আনন্দে ঐ নির্দ্দোষ জীবকে উদরস্থ করে। ভারতবাসী নির্দ্দোষ প্রাণী, ইংরেজরূপ মাকড়সার ইন্দ্র-জালে সে পতিত হইয়া বুদ্ধি বিবেচনা, শক্তি, সামর্থ্য সকলই হারাইয়াছে। এক্ষণ উদরস্থ হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতীয় শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শক্তি সংঘটনের মূল। সে জাতীয় শিক্ষা কি, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শিক্ষা বলিলেই আমাদের ত্রিবিধ বিষয়ের শিক্ষার কথা মনোমধ্যে উদিত হয়, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি নৈকট্য। শরীর সবল ও সুস্থ না থাকিলে, মনের স্বাস্থ্য অথবা বল থাকে না। মন সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্মালোচনাও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে শরীরের সুস্থতা যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাই অন্যেদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সে কার্য্য সাধন করিতে হইলে স্বাস্থ্যতত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই এইগুলি আমাদের কর্ত্তব্য,—

প্রথম

(ক) ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান।

(খ) মল মূত্র পরিত্যাগ।

(গ) ব্যায়াম (প্রাতর্ভ্রমণ আদি)

(ঘ) স্নান।

(ঙ) উপাসনা।

(চ) আহার।

(ছ) কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সম্পাদন।

প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণ শরীর রক্ষা এবং স্বাস্থ্যকেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন বলিয়াই শতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আধি ব্যাধিতে জর্জ্জরিত ছিলেন না। শারীরিক শিক্ষায় আমাদিগের প্রথম মনোযোগ দিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই যাহাতে শারীরিক সুস্থতা লাভের নিয়মগুলি আমাদের অভ্যস্ত হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, মানসিক শিক্ষা। শরীর রক্ষার জন্য যেমন স্নান আহার নিদ্রার বিধি মান্য করিতে হইবে, মনের শিক্ষার জন্যও তেমনই নীতি-বান, চরিত্রবান হইতে হইবে। মহৎ লোকের জীবনী পাঠ ও আলোচনা একান্ত আবশ্যক। মহত্বের পূজা, মহত্ত্বের আদর, চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের সর্ব্ব প্রধান উপায়। কি স্বদেশ কি বিদেশ, সকল দেশের মহৎ লোকের চরিত্র আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয়, আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে। ধর্ম্ম, মানবের ভূষণ স্বরূপ। ধর্ম্ম-হীন মানুষ পশুর সহিত সমতুলিত হওয়ার উপযুক্ত। ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান না হইলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্ম, দুর্ব্বলকে সবল, মৃতকে সঞ্জীবিত করে। মানুষ, শত সহস্র চেষ্টায় যাহা সাধন করিতে না পারে, ধর্ম্ম-বলের এক ফুৎকারে তাহা সহজে সুসম্পন্ন হয়। ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরই মানব জীবন গঠিত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত। পৃথিবীর মহা মহা পণ্ডিতগণ ধর্ম্মবলের প্রাধান্য, ধর্ম্মবলের অলৌকিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে গমন করিতে হইবে। সদাচার, সদালাপ, সৎ-সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা

করিবে। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম-তত্ব, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। ধর্ম্মের মোহিনী প্রতি-মূর্ত্তি যাহাতে হৃদয়-ক্ষেত্রে পরিচিত্রিত হয়, তাহার উপায় করিবে।

প্রাচীন ভারতে,যৌবনের উষাকালে,এই ত্রিবিধ শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে যুবকগণ সংসার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন। তাঁহাদের সুস্থ ও সবল দেহ,ধর্ম্ম-বিভূষিত মন সকল কার্য্যেই সুফলপ্রাপ্তি পক্ষে সহায়তা করিত। আধুনিক বৈদেশিক শিক্ষায় আমরা যেমন দুর্ব্বল-দেহ, দুর্ব্বল-মন,বিকৃত-মতি-গতি লইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করি, প্রাচীন ভারতে এরূপ বিড়ম্বন ছিল না। প্রাচীন ভারতে, নব্যভারতের ন্যায় দুঃখ দুর্গতি, অধোগতি, অবনতিও ছিল না।

জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া স্বদেশ-ভক্ত শিক্ষিতগণ দ্বারা অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া, পঠনা কার্য্যের সুবিধা করিতে হইবে। পঠনীয় বিষয় প্রধানতঃ এই এই গুলি হইবে,—

১। জাতীয় সাহিত্য। ২। বিজ্ঞান। ৩। দর্শন। ৪। ভূগোল ও খগোল। ৫। পুরাবৃত্ত। (জাতীয়) ৬। ধর্ম্মতত্ব (জাতীয়) ৭। গণিত। ৮। স্বাস্থ্যতত্ব (জাতীয়)।

প্রথমতঃ জাতীয়ভাবে জাতীয় সাহিত্য, পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মতত্ব, স্বাস্থ্যতত্ব প্রভৃতি অবগত হইতে হইবে। জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, পরে অন্য দেশের ভাষা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য শিক্ষণীয়।

জাতীয় শিক্ষায় লোক গঠিত হইলে, তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশ রক্ষা ও স্বদেশোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা সমস্ত সভ্য দেশেই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতেই এরূপ দলের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন জাতির আগমনে, বৈদেশিক ব্যক্তিবর্গের শোষণ ও পেষণে ভারত যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে, তাহাতে আত্ম-রক্ষার জন্য এইরূপ দল-গঠন করিতেই হইবে। এইরূপ দল নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইবে,—

১। প্রচারকের দল।

২। প্রচার কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত ও বিপক্ষ শত্রু কর্তৃক বিনাশিত না হইতে পারে,তদ্বিষয়ে বলবীর্য্যসম্পন্ন একদল।

৩। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কার্য্য পরিচালন জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষার নিমিত্ত এক দল।

৪। পূর্ব্বোক্ত দলত্রয়ের ও সাধারণের রক্ষার জন্য সেবা-ব্রতধারী একদল।

উল্লিখিত দল চতুষ্টয় সংগঠন জন্য প্রত্যেক সহর, নগর, উপবিভাগ ও পল্লীর সহৃদয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির পরিচেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

কিরূপ প্রকৃতির লোক কোন্ দলে প্রয়োজন, কোন্ প্রকৃতির লোক দ্বারা প্রত্যেক দলের কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, যাঁহাদের উপর দল গঠনের ভার অর্পিত হইবে, সে ব্যবস্থা তাঁহারাই করিবেন।

রাজ-শক্তি অন্যথাভাবে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে,প্রজা শক্তি তাহাকে ন্যায্যভাবে সুপরিচালিত করিবার ব্যবস্থা,পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা-আলোকিত প্রত্যেক দেশেই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতে ঐরূপ দলের প্রয়োজন কখনও হয় নাই। কারণ, ভারতবাসী চিরদিনই সাত্বিকভাব-প্রধান। এস্থলে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিরই অনুগমন অধিকাংশে করিয়াছে। তাই, প্রবৃত্তি-প্রধান জাতির সহিত জীবন-আহবে নিবৃত্তি-প্রধান ভারতবাসী জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। আত্মরক্ষা,স্বদেশ-রক্ষায় দল-গঠন অপরিহার্য্য, অবশ্যম্ভাবী।

ভাই ভারতবাসি! আর মোহ নিদ্রায় অচেতন থাকিও না। উঠ, জাগ, দেখ, তোমার অবস্থা কি ছিল, কি হইয়াছে। এক সময় তোমরা পৃথিবীর সম্রাট ছিলে, আজ দীন ভিখারী হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছ। তোমাদের সবই ছিল,—শিক্ষা ছিল, সভ্যতা ছিল, জ্ঞান ছিল, গবেষণা ছিল, শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, ধন ছিল, রত্ন ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, সম্পদ ছিল।—আজ তোমাদের কিছুই নাই। কে এমন ঐশ্বর্য্য, বৈভব-পরিপূর্ণ সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিল? যে দেশের অন্নে পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের অন্নাভাব বিদূরীত হইত, সেই দেশের নরনারী আজ অন্নাভাবে প্রপীড়িত, মৃত্যুমুখে নিপতিত! যদি তুমি সহৃদয় হও, দেশের প্রতি যদি তোমার মায়া মমতা থাকে, তবে পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা স্মরণ করিয়া তোমার বিষাদাশ্রু বর্ষণ অবশ্যই হইবে। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। মায়ের সুসন্তান যাহারা, তাহারা এই দুর্দ্দিনে নব-সাধনায় বদ্ধপরিকর হও। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে তোমাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সাধনা-পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল, তাহা জানি। এ পথ স্বার্থ-পর কাপুরুষগণের যে অগম্য, তাহাও বুঝি। কিন্তু আত্ম-রক্ষা, স্বজন-রক্ষা, দেশ-রক্ষা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও ভুলিতে পারি না। ঐ শুন, কবি বলিতেছেন,—

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার,
আত্ম-নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।

কবির ঐ উক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত কর। রিপুদলন জন্য, শত্রু-সংহার নিমিত্ত প্রাণপণ কর। সাধনা করিলে, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীগোপালনারায়ণ মজুমদার।

# মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

হে মহা সাধনাশীল বঙ্গের সন্তান,
স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতী হে বীর যোগেন্দ্র!
বঙ্গের লেখক-কুলে তুমি মহাপ্রাণ;
কি তব প্রাণের জ্বালা! কি তেজ জ্বলন্ত!!
যেই সঞ্জীবনী ভাষা, যে স্বাধীন ভাব
ফুটাইয়া তুলেছিলে তুমি বাঙ্গালায়,
প্রতি লেখনীতে তারি সুক্ষীণ প্রভাব,
অনুভূত হইতেছে স্বদেশী-বন্যায়।
স্বাধীনতা-উপাসক মহা বীরগণ,
তারাই তোমার ছিল একমাত্র ধ্যান;
বীরের হুঙ্কার আর কামান গর্জ্জন,
উন্মত্ত করিয়াছিল তব মহাপ্রাণ!
ওয়ালেস্, গ্যারীবল্ডী, ম্যাট্‌সিনী আদি,
ইঁহাদের জীবনের অদম্য প্রভাব,
প্রবাহিত করেছিল মহা শক্তি-নদী
তোমার লেখনী-মুখে। ছিল না অভাব
বীর্য্যের উচ্ছ্বাস কিছু, তোমার কল্পনা
জাগায় পাঠক-হৃদে মহা উদ্দীপনা।
তব গ্রন্থ পাঠে কভু হয় নাই মনে
পড়িতেছি বঙ্গভাষা দীনা-তেজহীনা,
তোমার "হৃদয়োচ্ছ্বাসে" হৃদয়ের কোণে
জাগাইত ভারতের উদ্ধার-কামনা।
"তোমার আত্মোৎসর্গ" কবির পরাণে
ঢেলেছিল জীবনের প্রভাত সময়ে,
যেই মহা উন্মাদনা—প্রবল প্লাবনে
এখন বহিছে তাহা সমগ্র হৃদয়ে।

তোমার অভাবে দেব! যে দামামা-ধ্বনি
থেমেছে এ বঙ্গভূমে, উঠিল না আর,
আছে কি এ বঙ্গে কেহ তোমার লেখনী
পরশি,—করিতে বঙ্গে তেজের সঞ্চার?
ফাটে এ হৃদয় দেব! করিলে স্মরণ
অভিশপ্ত বাঙ্গালীর কৃতঘ্নতা ঘোর,
তোমার অভাবে হায়! কোন গৌড় জন,
ফেলিল না একবিন্দু নয়নের লোর!!
হায়রে! বাঙ্গালী জাতি এমন অধম,
বারেকও করিল না তোমারে স্মরণ!

সিরাজী।

# ক্লাইবের স্মৃতি

যে পাপিষ্ঠ নরাধম নাশিতে আপন স্মৃতি
আপনারে করিল সংহার,
তার পাপময় স্মৃতি তার সে পাপের ছবি
সংস্থাপনে কি হইবে আর!
আসিয়া যখন পান্থ জিজ্ঞাসিবে জগতেরে
কোন্ গুণে খ্যাত এ ধরায়?
বলিবে কি, জাল করি পরের সর্ব্বস্ব হরি
রাজা প্রজা নাশিল মায়ায়।
কোমল সিরাজ বুকে হানিয়া বিষম শেল
হতপ্রাণ নাশিল আবার।
পলাসীর যুদ্ধস্থলে ঘুমাইল আম্রতলে
ঘুষ দিয়া মন্ত্রী দুরাচার।
নাশিল সিরাজ-বংশে ধরায় পঞ্চম অংশে
স্বাধীনতা করিল বিনাশ।
বিনা যুদ্ধে বিনা রণে প্রতারিয়া নরগণে
ভারতের করে সর্ব্বনাশ!
কল্পনা-তুলিতে আঁকি জগতে দিলেন ফাঁকি
অন্ধকূপ অন্ধকূপ বলি;
যে ঘরে ধরে না তত সাহেবের বুটজুতো,
সে ঘরে কেমনে দিল ঠেলি!
নিজে উমিচাঁদে ছলে প্রতারিয়া জাল বলে
যে জন করিল সর্ব্বনাশ,
পুনঃ সেই জাল বলি নন্দরাজে দিল বলি
সে জাতির ঘৃণ্য ইতিহাস!

কেন তার স্মৃতি রাখ কালী চুণ দিয়া মাখ
হৃদপিণ্ড বেরিয়া তাহার।
সহস্র বৃশ্চিক আঁক, সধূম বন্দুক রাখ,
প্রাণনাশে প্রস্তুত দুর্ব্বার।
হায় রাজা বাঙ্গালার যে করিল ছারখার
সত্বহীন ধর্ম্মহীন ভাবে,
চুরী দস্যু-বৃত্তি করি যে লয় পরস্ব হরি
তাহারেও রাখ তথা তবে।
কিংবা গুণ্ডা নরহন্তা ঘিরি তায় চারিধারে
কর তারে তাদের নায়ক।
বোম্বেটিয়া দলে দলে আরব সাগর মাঝে
যাত্রীগণে হানিল শায়ক।
লুণ্ঠিয়া শিল্পীজ দলে যেই দিল রসাতলে
এ দেশের বাণিজ্য বিভব,
দেও তার পাপ ছবি বিজয়-নিশান হাতে,
কলিকালে ইহাই সম্ভব!
আর ভুলাইও না মন্ত্রে নাশিও না নব্য তন্ত্রে,
যথা নাশিছিলে উনবিংশে
ভাবিত গোরার যাহা সকলই জগতে ভাল,
কিন্তু আজি বুঝিয়াছে বিংশে,
ধর্ম্মনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় নরহত্যা-বীতরাগী
তাহাদের নিকটে আসিয়া,
নরহন্তা সুরাপায়ী জগতে না পেয়ে ঠাঞী,
এই দেশ লইবে লুঠিয়া।

নহে বিস্তারের তরে সাম্য মৈত্রী ধর্ম্মবিদ্যা,
যেমন বলিছ এ সময়,
শিক্ষা করেছিলে বন্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মে নাহি দিলে
পশিবারে ভারত-আলয়।
যখন দেখিলে পরে শিক্ষিতেরা তোমাদের
সহায়তা করিল বিপদে।
তার পরে দিলে শিক্ষা, শিক্ষা নয় সেত ভিক্ষা
করিবার, শৃঙ্খলটী পদে।

ছেড়ে দাও বাহাদুরী বুঝিয়াছি জুয়াচুরী,
সভ্য সমাজের দূরে থাক;
পাপীকে ক'রনা সাধু দস্যুকে বলনা যোগী,
মিথ্যা কথা প্রাণে বড় বাজে।
ঈশ্বর আছেন ভবে কে তাঁরে পেরেছে কবে
ঠকাইতে বাক্যে কিম্বা কাজে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

## বস্তু ও অ-বস্তু।

বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা। নিত্য-সত্তা। বস্তু তড়িৎশক্তির বিকাশ। বস্তু ঘূর্ণিত ইথার। তড়িৎ ইথারের ভাবান্তর। বস্তু প্রকৃত পক্ষে শক্তিই, সুতরাং অবস্তু। অবস্তুতে বস্তু ভ্রম কেন? উদাহরণ। বস্তু ধর্ম্ম তাড়িতের নিয়মাবলী হইতে নিষ্পন্ন। বস্তু = শক্তি। উহা জ্ঞানময়, আনন্দময়, অদ্বিতীয়।

মানব এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কত টুকু জানিতে পারে? আর যে টুকু জানিতে পারে,তাহার মধ্যে কত টুকুই বা বুঝিতে পারে? সে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপরে একটী ক্ষুদ্র জীব মাত্র, ব্রহ্মাণ্ডে কত অসংখ্য পৃথিবী, কত অসংখ্য মণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ রহিয়াছে, সে তাহা জানিতেই পায় না। সে সকলের কত প্রকার অধিবাসী আছে,সে তাহা বুঝিতেই পায় না। আছে, এই মাত্র জানে; কিন্তু তাহা-দিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বুঝে না। সে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর জীব, কিন্তু ইহারই বা কতটুকু সে জানিতে ও বুঝিতে পায়? কেবল ধরাপৃষ্ঠের কিঞ্চিন্মাত্র স্থান তাহার আয়ত্ত; কেবল গ্রহ উপগ্রহের কয়েকটী মাত্র তাহার পর্য্যবেক্ষণের অধীন। তাহাও সে ভাল করিয়া জানিতে বিম্বা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে এটুকু ঠিক করিয়া লইয়াছে যে, জগতের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। সে যে টুকু দেখিয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মই লক্ষ্য করিয়াছে। তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মের অধীন; অথবা একই নিয়মের অধীন। এক প্রকাণ্ড বাড়ীর ক্ষুদ্র একটী গৃহকোণে যে পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে, সে ঐ বাড়ীর অতি অল্পাংশই দেখিতেছে। কিন্তু তাহা হইতেই সে যদি মনে করে যে, সমস্ত বাড়ীটাই ঐ গৃহকোণের ন্যায় এবং ঐ গৃহকোণ যেরূপ নিয়মাধীন, সমস্ত বাড়ীও তদ্রূপই, তাহা হইলে যেরূপ হয়, মানবও সমস্ত জগতের সম্বন্ধে কোন সাধারণ অবস্থা কি নিয়ম অনুমান করিলে,তেমনই হাস্যাস্পদ হয়, সন্দেহ নাই। জগতের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র দেখিয়া সর্ব্বাংশের সম্বন্ধে কোনই অনু-মান হইতে পারে না।

তাহার পর আর এক কথা। মানব এই ক্ষুদ্র ধরার যে অংশটুকু দেখিতেছে, সে টুকুই বা কতদিন হইল দেখিতেছে? কত-দিন হইলই বা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি-তেছে? নিশ্চয়ই, অন্তহীন কালের তুলনায়,

অতি অল্প সময়। মানব নিজেই, বোধ হয়, তিন লক্ষ বৎসরের অধিক কাল জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহা জগতের ইতিহাসে তো কিছুই নহে, পৃথিবীর ইতিহাসেও অতি অল্প সময়। এই কালের মধ্যেও কত অল্প সময় হইল মানব জগতের নিয়মাবলী বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে! এই অত্যল্প কাল মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি কোন সাধারণ সার্ব্বকালিক নিয়ম অবধারণ করা যায়? মুহূর্ত্ত মাত্র পরমায়ু লইয়া যে মশক জন্ম গ্রহণ করে, সে যদি তখন সূর্য্য দেবকে চক্রবাল রেখার নিকটবর্ত্তী এবং লোহিত বর্ণ দেখিয়া অনুমান করে যে সূর্য্য ঐ স্থানে থাকাই নিয়ম, এবং সূর্য্যের বর্ণ লোহিত, তবে কি তাহা ঠিক হইবে? যে স্থান ও যে পরিমাণ কাল সে দেখিল, তাহাতে ঐরূপই সত্য বটে; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব অথবা পরের সম্বন্ধে কোনই নিয়ম উহা হইতে অনুমিত হইতে পারে না।

এই সকল বিবেচনা করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, মানব এমন কিছুই বলিতে পারে না, এমন কিছুই জানিতে পারে না, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সত্য, এমন নিয়ম মানব স্ব-চেষ্টায় কখনই জ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু তাহার এতই স্পর্দ্ধা যে, সে জগদ্ব্যাপারের অলঙ্ঘ্য নিত্য-সত্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বদাই আস্ফালন করে। আর সেই গর্ব্ববশতঃ "এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব; ইহা হইতে পারে, উহা হইতে পারে না",—বলিয়া অনর্থক চীৎকার করে। সে জানে না যে, সে জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, তিলার্দ্ধ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল নিয়ম সত্য বলিয়া আবিষ্কার করিতেছে, যাহা কিছু সম্ভব, যাহা কিছু অসম্ভব বলিয়া স্থির করিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা তদ্রূপ নাও হইতে পারে। (১) সে বুঝেনা যে নিত্য-সত্য, দেশকালের অতীত সত্য, সে স্ব-চেষ্টায় জানিতেই পারে না। উহা তাহার সসীম জ্ঞানের অতীত।

কিন্তু দেশ কালের অতীত সত্য কি? উহা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে পারে না। যাহা ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহা নিত্য-সত্য কখনই নহে। যাহা রূপের অধীন, তাহা আজি একরূপ, কালি অন্যরূপ। যাহা ভাবের অধীন, তাহা আজি একভাব, কালি অন্য ভাব। এ সকল কখনই চিরন্তন সত্য নহে। জগতের যে অংশ মানব দেখিতেছে কিম্বা বুঝিতেছে, তাহা সকলই ঐরূপ। সুতরাং উহা কখনই নিত্য সত্য হইতে পারে না। তবে উহা কি?

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, উহা বস্তু-পদার্থের সমষ্টি মাত্র। বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—কঠিন, তরল অথবা বায়বা, যে রূপই হউক,—সেই রূপেরই বস্তু পদার্থের সমষ্টি লইয়া (পরিদৃশ্যমান) জগৎ। বস্তু-পদার্থ রূপ-বিশিষ্ট। যাহা বস্তু, তাহার রূপ স্বীকার করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, রূপ কল্পনা না করিয়া মানব থাকিতে পারে না। কিন্তু রূপ তো নিশ্চয়ই অনিত্য; সুতরাং রূপ নিত্য সত্য হইতে পারে না। কাজেই রূপকে উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বস্তু পদার্থের রূপ গেলে আর থাকে কি? থাকে কেবল শক্তি। যে শক্তির বশে রূপ নিয়তই

(১) Lodge—Modern views of Electricity, p p 387-388.

পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রূপ গেলে থাকে কেবল সেই শক্তি। সে শক্তি যে কি, তাহা মানব এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যতদূর বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে সে জগদ্ব্যাপারের বহুত্বের মধ্যে একটা একত্ব অনুভব করিতেছে। অসংখ্য বস্তু যে এক শক্তিরই ভাবান্তর মাত্র, ইহা সে উপলব্ধি করিতেছে। তড়িৎ বলিতে যে শক্তি বুঝা যায়, পণ্ডিতগণ এখন যেন সেই শক্তিকেই একমাত্র সত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। যেন তড়িৎ-শক্তিই একমাত্র শক্তি; বস্তু-পদার্থ যেন তাহারই বিকাশ মাত্র। যাহাকে বস্তুর অণু বলা হইত, তাহা তড়িতেরই অণু; বস্তুও প্রকৃত পক্ষে তড়িৎ-ই। (১) এই একত্ব-প্রতিপাদক মত এক্ষণে ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

বস্তু পদার্থের মৌলিক অবস্থা অতীন্দ্রিয়(২)। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা মৌলিক নহে। এ সংস্কার ধীরে ধীরে মানবকে বস্তু ছাড়াইয়া অ-বস্তুতে লইয়া যাইতেছে। মানবীয় চিন্তার পরিণামে, এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপ্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সত্তা অঙ্গীকার করা অনিবার্য্য হইয়াছে। উহা অব্যক্ত এবং সাম্যাবস্থা।

এই সত্ত্বাকে পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইথার বলিতেছেন। ইথার সর্ব্বব্যাপ্ত কিন্তু অব্যক্ত। উহার মৌলিক ভাব সাম্যাবস্থা; উহা শান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়। এই দুর্ব্বোধ্য সত্তার সাম্যাবস্থা কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সর্ব্বত্র পরিরক্ষিত হয় নাই। মানব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অনন্ত-বিস্তৃত ইথার-সমুদ্র স্থানে স্থানে চক্রবৎ গতিযুক্ত; যেন ইহার স্থানে স্থানে ঘূর্ণ-পাকের ন্যায় চক্রোৎপন্ন হইয়া কল্পনাতীত কাল হইতে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই চক্র (১) সকলই বস্তু-পদার্থরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। যখন এই সর্ব্বব্যাপ্ত ইথার সাম্যাবস্থ, তখন উহা অব্যক্ত। যে মুহূর্ত্তে যে স্থান ঘূর্ণিত গতি-যুক্ত, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতেছে; আর তখনই উহা বস্তু পদার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বস্তু পদার্থ, অব্যক্ত শান্ত ইথারেরই স্থান বিশেষের ঘূর্ণিত অবস্থা; এই মাত্র। ব্যক্তরূপ অব্যক্তেরই বিকাশ। এ সিদ্ধান্ত মানব এক্ষণে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। (২) বস্তু মূলতঃ অবস্তু। কিন্তু অ-বস্তু কি? উহা শক্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বস্তু মূলতঃ শক্তি। মানব এ পর্য্যন্ত যত প্রকার শক্তির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছে, তাহাদিগের সমন্বয় করতঃ এক্ষণে একমাত্রে উপনীত হইতেছে। আর, সেই একমাত্র শক্তি যে তড়িৎ শক্তি, তাহাও অঙ্গীকার না করিয়া গত্যন্তর দেখিতেছি না।

এ শক্তি বিরাট, অচিন্ত্য। ইহাকে সমষ্টিভাবে কল্পনা করা অসাধ্য। এ নিমিত্ত ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। মানব যখন বস্তু পদার্থের পৃথক সত্তা স্বীকার করিত, তখনও তাহার অণু

(১) We may, on the contrary, from now on add that instead of considering electricity as matter, we are led to the exactly opposite hypothesis that the atoms of various bodies are systems of Electrons. Righi—Modern theory of Physical phenomena, p 6.

(২) From the perceptible into the imperceptible. First Principles, p 280.

(১) Vertex motion.

(২) One universal substance * * extending to the furthest limits of space * * existing equally every where; some portions either at rest or in simple ir-rotational motion; * * other portions in rotational motion, in vortices. * * * One continuous substance filling all space; which in whirls constitutes matter; and which transmits every action and reaction of which matter is capable.—
Modern views of Electricity, p. 416.

সকলই কল্পনা করিয়া লইয়াছে; এক্ষণে একমাত্র তড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে গিয়াও তাহার ক্ষুদ্রতম অংশকেই অণুরূপে কল্পনা করিতেছে; আর ইহার নাম দিতেছে তড়িদণু (Electron)।

আমরা বলিয়াছি যে, বস্তু পদার্থ তড়িতেরই বিকাশ মাত্র; এক্ষণে বলিতেছি যে, বস্তু পদার্থ ইথারেরই ঘূর্ণিত অবস্থা। সুতরাং ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইথারের এই অবস্থাই তড়িৎশক্তিরূপে অনুভূত হইতেছে (৪)। বস্তু কেবল তড়িদণুরই সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তড়িৎ তো অ-বস্তু অর্থাৎ শক্তি। সুতরাং বস্তুও শক্তি মাত্র, আর কিছুই নহে। (১)

কিন্তু তাহাই যদি হইল, তবে শক্তি, বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় কেমন করিয়া? শক্তিতো বস্তু নহে। যাহা অ-বস্তু, তাহা বস্তু বলিয়া ভ্রম জন্মায় কেন? ব্রহ্মাণ্ড কি ভ্রম মাত্র? বিষয়টী অন্যরূপে দেখিতে হইতেছে। একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে বুঝিবার সাহায্য হইতে পারে। একটা রাবারের চোঙ্গা অতি নরম; তাহার এক দিক বন্ধ করিয়া অপর দিক খোলা রাখিয়া, যদি খোলা দিকের মধ্য দিয়া জল-স্রোত প্রবাহিত করিতে থাকি, তাহা হইলে বদ্ধদিকের মধ্য দিয়া জল বাহির হইতে পারিবে না। বাধা পাইয়াই জল-স্রোত ঘুরিবে। এদিকে খোলা দিক দিয়া আরও জল-স্রোত আসিতেছে। ক্ষণকাল এইরূপ করিলেই চোঙ্গার মধ্যে জলের ভিতর কতকগুলি ঘূর্ণপাক উৎপন্ন হইবে; এবং ঐ পাক সকল চোঙ্গার পার্শ্বে আঘাত করিবে। তখন যদি চোঙ্গার গায়ে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তন্মধ্য দিয়া ঘূর্ণগতিতে জল নির্গত হইতেছে। কাচের চোঙ্গা লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিলে জলের ঘূর্ণপাক সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, ঐ রাবারের চোঙ্গার মধ্যে ক্রমে জল প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারিতেছে না; ইহাতেই ঐ সকল ঘূর্ণ-পাক উৎপন্ন হইতেছে। তাহার ফলে ক্রমশঃ সেই নরম রাবার-চোঙ্গা শক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে। শেষে যদি ফাটিয়া না যায়, তবে উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে। ঐ চোঙ্গার মধ্যে জলের পরিবর্ত্তে কোনরূপ বায়ু অর্থাৎ গ্যাস্ প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলেও রাবার-চোঙ্গার পূর্ব্ববৎ কাঠিন্য অনুভূত হইবে। ইহার কারণ কি? রাবারের চোঙ্গাও নরম, জলতো নরমই। কঠিন পদার্থতো কোনটাই নহে। তবে কাঠিন্য অনুভূত হয় কেন? ইহা ঐ ঘূর্ণগতিরই ফল। উপরের উদাহরণে যদি খোলাদিকের জলস্রোত বন্ধ করিয়া ঐ দিকও বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষণকাল পরেই চোঙ্গার মধ্যস্থিত জল-রাশির কিম্বা গ্যাসের ঘূর্ণগতি নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু চোঙ্গাটী পূর্ব্ববৎ কঠিনই বোধ হইবে। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, জল রাশির ঘূর্ণগতি নিবৃত্ত হইল বটে; কিন্তু সে গতির কি নাশ হইল? তাহা হইতে পারে

---

(৪) An electron may be simply a special localised condition of the universal ether.

Modern theory of Physical Phenomena. p. 6.

Of these two electricities (positive and negative) we imagine the ether to be composed.

Modern views. p. 247-8.

(১) According to the modern hypothesis, matter is built up of electrons; * * Electrons are not matter, in the ordinary sense of the word.

Modern theory of physical Phenomena. p. 150.

**তবেই দেখিতেছেন, বস্তু পদার্থ অবস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে।**

না। জলরাশির যে গতি ছিল, তাহা ঐ জলের প্রত্যেক অণুকে আশ্রয় করিল; তাহাতে ঐ জলের প্রত্যেক অণুই ঘূর্ণগতি প্রাপ্ত হইল এবং সেই গতি চোঙ্গার পার্শ্বে আঘাত করতঃ চাপ উৎপন্ন করিল। তাহাতেই চোঙ্গা কঠিনবৎ প্রতীয়মান হইল। তরল ও বায়ব্য বস্তু ঘূর্ণ-গতি-যুক্ত হইলেই কঠিনবৎ প্রতীয়মান হয়; ঘূর্ণগতিই কাঠিন্যের ভ্রম উৎপাদন করে। ইথার কি বস্তু, তাহা সম্যক বোধগম্য না হইলেও, তড়িৎ কি, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, তাহার স্থান বিশেষ ঘূর্ণিত গতিযুক্ত হইয়া ক্রমে কাঠিন্যের ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে,—এ কথা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। ইথার অথবা তড়িতের(১) আণুবিক ঘূর্ণগতিই বস্তু পদার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। এই একমাত্র সত্তার ঘূর্ণ-গতির নামই বস্তু-পদার্থ।

এক্ষণে বস্তু-ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। ঘনত্ব, গুরুত্ব, জড়তা ইত্যাদি বস্তু-ধর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে! পূর্ব্বে যেমন বস্তু পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া জড়ের জড়ধর্ম্ম সকল বুঝিবার চেষ্টা করা হইত, এখন তড়িৎকেই একমাত্র সত্তা কল্পনা করিয়া,তড়িদণু(Elctron)হইতেই বস্তু-ধর্ম্ম নিষ্পন্ন করা হইতেছে(১)। তড়িদণুর দুই প্রকার ব্যবহার; অসম শ্রেণীর তড়িৎকে আকর্ষণ এবং সম শ্রেণীকে বিপ্রকর্ষণ করে। এই দ্বিবিধ ব্যবহার হইতেই এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার বস্তু-ধর্ম্ম নিষ্পন্ন করা হইতেছে(২)। এমন কি, মাধ্যাকর্ষণও তড়িৎ শক্তিরই ফল স্বরূপ বিবেচিত হইতেছে(৩)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিস্তীর্ণ ইথার সমুদ্র সাম্যাবস্থ; তাহার কোন কোন স্থান বিশেষ ঘূর্ণগতি বিশিষ্ট হইয়া ভাবান্তর উপস্থিত হয়। উহাই তড়িৎ-শক্তি, উহাই বস্তু। সাম্যাবস্থ ইথার ও ভাবান্তরিত ইথার (অর্থাৎ তড়িৎ), এতদুভয়ের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে। তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মূল। বস্তু-ধর্ম্ম এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই ফল মাত্র। মানব তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা হইতেই জড়ত্ব রূপ ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তু-জ্ঞান এই ভ্রমেরই নামান্তর(১)। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড কেবলই শক্তি, আর কিছুই নহে।

---

(১) তড়িৎ ইথারেরই ভাবান্তর মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(১) Which formerly, starting with the existence of sismic ether and that of ponderable matter, characterised by its principle attribute, inertia,the attempt was made to give a mechanical explanation for all phenomena; now, on the contrary, starting with the ether and the electrons, the attempt is made to construct, so to speak, ponderable matter out of these and to take account of the phenomena which it prevents.—Righi—Modern Theory of Physical Phenomena, p, 143-4.

(২) অসম তড়িদণু সকলের পরস্পর আকর্ষণেই বস্তু-পদার্থের স্থায় ঘনত্ব। আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ ন্যূনাধিক ঘনত্ব উৎপন্ন হয়। বায়ব্য অবস্থা বিপ্রকর্ষণের আধিক্যের ফল।

জড়তা। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড তড়িৎ-চক্র; তদুপরিস্থ অপর কোন বস্তু একটা ক্ষুদ্র তড়িৎ-চক্র। উভয়ের অসম বৈদ্যুতিক আকর্ষণে যে শক্তিতে ঐ বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তত্তুল্য বিপরীত শক্তি দ্বারা উহার গতিরোধ করিলেই ভারত্ব বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জড়তাও ইহারই ভাবান্তর।

(৩) Material atom is nothing but a system consisting of a certain number of positive and an equal number of negative electrons * * *

Molecular and atomic forces wouold then be nothing but the manifestations of the Electro-magnetic forces of the electrons and gravitation itself might be explained with these concepts as a basis.

I bid p. 151.

Lodge—Modern Views, p. p. 396,397, 410.

(১) Matter consists of aggregations or, systems of electrons, since the electrons which may be considered as simply elec-

এই মীমাংসা এক্ষণে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু মানবের অনুভূত অথবা মীমাংসিত, তাহাকেই মানব এক্ষণে শক্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। এতদ্দেশে এ তথ্য স্মরণাতীত কাল হইতে পরিজ্ঞাত আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত দিনে তাহা সপ্রমান করিতে বসিয়াছে।

এই শক্তি কি অন্ধ-শক্তি? ইহা কি উদ্দেশ্যহীন? না চৈতন্যযুক্ত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ? এ শক্তি অজ্ঞান অথবা জ্ঞানময়? আমরা এতক্ষণ এ শক্তিকে তড়িৎ নামে অভিহিত করিতেছিলাম। কিন্তু নামে কিছুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র শক্তির বিকাশ, এবং সে শক্তি জ্ঞানময়। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্ম-ক্ষেত্র। কর্ম্ম যাহার অভিব্যক্তি, সে শক্তি উদ্দেশ্যহীন হইতেই পারে না; সুতরাং তাহাকে জ্ঞানময় অঙ্গীকার না করিয়া গত্যান্তর নাই। সমস্ত জগৎ চৈতন্যময়(১), সুতরাং জ্ঞানময়, সুতরাং আনন্দময়। জ্ঞানের লক্ষণ আনন্দ, তদ্বিপরীত কখনই লক্ষ্য হইতে পারে না। এ নিমিত্ত যে শক্তি জ্ঞানময়, তাহাকে আনন্দময় স্বীকার করিতেই হইবে। জগৎ তাহারই বিকাশ, এবং তাহাতেই জগতের পরিণতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।"

শ্রীশশধর রায়।

tric charges devoid of matter or as consisting in a modification of the ether symmetrically distributed about a point, perfectly simulate inertia by reason of the laws of the electro magnetic field and thus show the fundamental property of matter.
Modern Phenomena p. 151.

(১) The modern conception of matter tends to make the whole world alive,
Prof. J. A. Thomson.

# থিয়লজিক্যাল্ কলেজ।

এই বঙ্গদেশে এক সময় ছিল, যখন নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বঙ্গবাসী ভীত, কম্পিত ও বিপর্য্যস্ত হইত। একজন মাত্র ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সমগ্র মহকুমা বা জেলার লোক আপনাদের গতিবিধি নিয়মিত করিত। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ ও সে প্রভাব নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাৎকালীন ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা চরিত্র-বিষয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সেই সচ্চরিত্রতা-সম্ভূত প্রভাব সমাজের অকল্যাণ অপেক্ষা প্রভূত কল্যাণই সাধন করিয়াছিল। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণকুল নিজেদের চরিত্র-গৌরব জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া, শুধু মন্ত্র-তন্ত্র লইয়া, ঘণ্টা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব হইতে লাগিল। ইঁহাদের পিতা পিতামহ নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর চরিত্র-বলে যে প্রভাব খাটাইয়া গিয়াছিলেন, সেই প্রভাব অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সমাজের উপর বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকট-শাসন প্রণালীর বিবিধ উপসর্গ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, লোকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিতে শিখিল। তারপর ইংরাজ-রাজত্বে শিক্ষিত, নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সমস্ত ব্রাহ্মণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। লোকের চক্ষু ফুটিল।

তাহারা বুঝিতে শিখিল, ব্রাহ্মণও মানুষ, আমরাও মানুষ, আমরা খাটি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করি, ব্রাহ্মণ আসিয়া শুধু ঘণ্টা নাড়িয়া ও অনুস্বর বিসর্গ ছিটাইয়া আমদের অর্জ্জিত ধনের অংশে দাবী করিয়া বসে। তাহারা পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-জীবনের অনেক গুপ্ত রহস্য দেখিতে শিখিল। দেখিল, ইহারা অলস, পরনিন্দুক, পরপ্রত্যাশী, আত্মসম্মান-বিহীন, অহঙ্কারী ইত্যাদি। বুঝিল, ইহাদের আত্মসম্মান-বোধ শুধু দক্ষিণার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবার বেলা। সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ এই অন্তর্দৃষ্টির ফলে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য কার্য্যতঃ একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি হিন্দু-সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোকও জ্ঞানে, ধর্ম্মে, আচার আচরণে আপনাকে উন্নত করিয়া উচ্চতর শ্রেণীর আদর ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতেছে না। এ কথার প্রতিবাদ নাই। ইহাই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রকৃত অবস্থা।

ব্রাহ্মণের একনায়কত্ব ও প্রাধান্য যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকের কথা উল্লেখ-যোগ্য। ব্রাহ্ম-সমাজ শুধু শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া কত লোক স্বাধীনতার উন্মুক্ত বাতাসে নব-জীবন প্রাপ্ত হইল। যে সকল লোক হিন্দু-সমাজে হীন ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিল, তাহাদের জীবনে ও চরিত্রে এমন অমূল্য বস্তু ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখা গেল যে, লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। হিন্দু-সমাজের লোকও ব্রাহ্ম-সমাজকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ইহারা সত্যে অনুরাগী, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সৎসাহসে দুর্জ্জয়, প্রেমে গভীর, স্বার্থত্যাগে অতুলনীয়। ব্রাহ্ম-সমাজের এই স্বাধীনতার ভাব ও এই নূতন উদ্দীপনা দেখিয়া লোকে কত আশা করিতে লাগিল। তাহারা ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ত্তা (mission) উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাধু প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, রাজনারায়ণ, কালীনারায়ণ প্রভৃতির জীবনে তাহারা দেবত্বের আস্বাদ পাইল। আর তাহারা দেখিল যে, এত ধর্ম্মভাব, এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সত্ত্বেও ইঁহারা পৌরোহিত্য স্বীকার করেন না—মানুষের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ইঁহাদের জীবনে সম্ভব দেখিয়া, তাহারা এই সত্যে আস্থা স্থাপন করিতে শিখিল।

তারপর বর্ত্তমান সময়ের কথা বলি। যখন প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের দিন চলিয়া যাইতে আরম্ভ হইল এবং পূজাবশিষ্ট ফুলের ন্যায়, দুই একটী স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত আর কাহারও জীবন-সৌরভ পাওয়া যায় না, তখন পুরোহিত সৃষ্টি করিবার কল্পনা হইতে লাগিল। এখন আর ম্যাঞ্চেষ্টার বা মিড্ভিলে না গেলে ধর্ম্মজীবনলাভ হয় না। পাঠক-পাঠিকা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ লতা-গুল্ম ভক্ষণ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা বহন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতবার ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়াছিলেন? যাঁহারা ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ কিম্বা অঘোরনাথ অপেক্ষা অধিক

উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। নিজেকে ও অন্যকে মিথ্যা প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কল্পিত ও অসার যুক্তি উদ্ভাবন করা কঠিন নহে। তারপর ব্রাহ্মসমাজ, বর্ত্তমান অবস্থায়, এইরূপ কতকগুলি কলে তৈয়ারী পুরোহিত আনিয়া ধর্ম্মপ্রচারের ঘানিতে জুড়িয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ চাহেন, লোক নিষ্কাম, নিস্পৃহ হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের নিমিত্ত 'জীবন উৎসর্গ" করিবে। "জীবন উৎসর্গ" করার কথাটা আজকাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কথাটা যে কত গভীর ও দায়িত্বপূর্ণ, তাহা কেহই অনুভব করেন না। ব্রাহ্মসমাজ একটী লোককে, জীবন উৎসর্গ করিবার কবুলিয়ত লইয়া, ম্যাঞ্চেষ্টার বা মিডভিলে উঠাইয়া দিলেন—কিন্তু সে ব্যক্তি আসিয়া খাইবে কি, তাহার ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্ম সমাজের নামে এইরূপ অবিবেকী কথা শুনিলে ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়। একজন লোককে কাজের জন্য আহ্বান করিতেছ, আর সে কি খাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবে না। এই অতি বিশ্বাস (বা দুর্ব্বলতা. কারণ মানুষ বা সমাজের দুর্ব্বলতার ফলে অবসাদগ্রস্ত একপ্রকার অকর্ম্মণ্যতার ভাব আসে, কেহ কেহ উহাকে বিশ্বাস বলিয়া ভ্রম করেন) কখনই মানব সমাজের উপযুক্ত নহে। ঈশ্বর মানুষের নিকট যাহা চাহেন, সমাজ তাহা দাবী করিতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে নিষ্কামভাবে কাজ করিতে দেখিতে চাহেন, কিন্তু মানুষকে অনাহারে রাখিবার অধিকার সমাজের হস্তে অর্পণ করেন নাই। আর সমাজের লোকেরা যদি চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় আহারে উদরকে পরিতৃপ্ত করিয়া প্রচারকদিগকে বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে উপদেশ দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণে মানবীয় ভাব অপেক্ষা পশুভাবেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, এজন্য ম্যাঞ্চেষ্টার বা মিডভিল্ যাওয়াও অন্যায় নহে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মানুষ গড়া অপেক্ষা ঘৃণার্হ বস্তু আর কিছুই নাই। ধর্ম্মজীবন আপনিই গড়িয়া উঠে। ম্যাঞ্চেষ্টার বা মিডভিল ধর্ম্মজীবন গঠনে অল্প সহায়তা করিতে পারে। থিয়লজিক্যাল কলেজেরও প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রচারকদিগকে অর্দ্ধাশনে রাখিয়া, গঠিতচরিত্র, জ্ঞান ও ধর্ম্মজীবনবিশিষ্ট প্রচারেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি দিয়া প্রচারক পদে বরণ না করিয়া, কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু যুবককে সহসা প্রচারক পদে বরণ করিবার সঙ্কল্প যাঁহারা স্থির করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের উদ্দাম কল্পনা শক্তির প্রশংসা করিতে পারি না। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার আক্ষরিক অনুকরণ না করিলে এ দেশে ধর্ম্মপ্রচার হইবে না, এ কথা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। আমরা এই অন্ধ অনুকরণ-প্রয়াসী বলিয়াই "ভূতলে বাঙ্গালী অধমজাতি।" সেক্সপীয়র এ্যানি হাথাওয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন; —এ্যানি, সেক্সপীয়ার অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। ডাঃ জন্‌সন্ যে মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি জন্‌সন্ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ স্থির করিলেন, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বড় না হইলে সমাজসংস্কারই হইল না! স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বেশী

ছোট হওয়া অন্যায়,এই প্রথা উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাদের যুক্তি হইল, যখন চল্লিশ বৎসরের পুরুষের সহিত ষোল বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতে পারে,তখন ত্রিশ বৎসরের যুবকের সহিত পঞ্চাশ বৎসরের রমণীর বিবাহ না হইবে কেন? ঠিক কথা। লজিকেও (Logic) এই রকমের একটা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। হায়রে পুঁথিগত বিদ্যা!

এই যে অন্ধতা, ইহা ধর্ম্মপ্রচার বিভাগেও প্রবেশ করিয়াছে। একদিকে বিশ্বাসী ব্রাহ্মদল সমাজের সভ্যপদ ত্যাগ করিতেছেন, অপরদিকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রচারেচ্ছু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌.এ, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় অর্থাভাবে প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না—আর কলিকাতায় বসিয়া দুই চারি জন খুব মাথা ঘামাইয়া, কল্পনা শক্তির বলে থিয়লজিক্যাল্‌ কলেজ করিতেছেন। যে সকল লোক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই সকল লোকই এই কার্য্যের উদ্যোগী। স্বেচ্ছাচার আর কাহাকে বলে? অপরিণামদর্শী লোকের অসঙ্গত ব্যবহারই যদি স্বেচ্ছাচার হয়, তবে ইহা অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর খুঁজিয়া পাই না। ব্রাহ্মসমাজের ঘরের লোক পর হইয়া যাইতেছে, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির বাহিরের লোকে পূর্ণ—সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কিন্তু যাহাতে আবাদ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছিয়ানব্বই গণ্ডা প্রচারক জন্মাইতে পারা যায়, সেজন্য সকলে বদ্ধপরিকর। দৃশ্য সুন্দর বটে!

রীতিমত কলেজ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার দিন ব্রাহ্মসমাজে এখনও আইসে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী করিয়া এখনও বহুদিন ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার কার্য্য চলিতে পারে। রাজা মহারাজার কল্পনায় অনেক খেয়াল আসিয়া থাকে, তাহার সবই কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, এক মোসাহেবের দল সৃষ্টি করিতে হয়। আমরা ব্রাহ্মসমাজে মোসাহেবের দল দেখিতে প্রস্তুত নাই। কেশবচন্দ্র একদিন মহারাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যদি মোসাহেবির চলন হয়,তাহা হইলে ইহা হইতে নূতন অসাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইবে। জ্ঞান ও ধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় যেমন ধনীর নিকট আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দলও তেমনি ধনীর "ধামা ধরিতে" অভ্যাস করিতেছেন। আশু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হউক। তবে আমরা অপ্রামাণিক কথা বলিতেছি না, বিগত থিস্‌টিক কনফারেন্স হইতেই ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সমাধান।

"The only banner I recognise is the banner of the nation, of unity."

Joseph Mazzini.

অত্যাচারী কালাপাহাড়ের ন্যায় হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষ্টা ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। তাহাকে এক ব্যক্তি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তুমি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলে, এখন মুসলমান হইয়াছ, তুমি হিন্দু দেব দেবীর প্রতি এরূপ বিদ্বেষী হইলে কেন?" এ কথার উত্তরে কালাপাহাড় বলিয়াছিল—"আমি দেখিতেছি, হিন্দু-সমাজ একেবারে বিশ্বাসহীন হইয়া যাইতেছে;—দেব দেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্য এই, দেখি, তাহাতে হিন্দুসমাজ জাগে কিনা; কিন্তু এমনই শোচনীয় অবস্থা, হিন্দুসমাজ যেন মরিয়া গিয়াছে, কাহারও শরীরে এক বিন্দু উষ্ণরক্ত দেখা যাইতেছে না। যাহা ভাবিয়া এই কাজে হাত দিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হইল না দেখিয়া মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছি।"

জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বক্‌সিগঞ্জ, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে দেব দেবীর প্রতি ইংরাজ দ্বারা উত্তেজিত গুণ্ডার অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি, দেশের হইল কি?—হিন্দুর রক্ত কি একেবারে জল হইয়া গিয়াছে? ধর্ম্ম রক্ষার জন্যও হিন্দুর মরিতে এত ভয়? এক মহা পরীক্ষা উপস্থিত।

পাঠকগণ সকলেই জানেন, আমরা মুসলমান-বিদ্বেষী নহি।—জানেন, হিন্দু ও মুসলমানকে আমরা মায়ের দুই সন্তান মনে করি; জানেন,—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সংস্থাপিত না হইলে এ দেশের মঙ্গল নাই, ইহাই আমাদের মত। কিন্তু তাই বলিয়া, এ কথা আদৌ স্বীকার করি না যে, আততায়ীরা আমার পূজ্য দেবমূর্ত্তির লাঞ্ছনা করিবে, এবং আমি নীরবে তাহা সহ্য করিব, ইহা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। দস্যুরা আমার মা ভগ্নী পত্নীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিবে, আর আমরা নীরবে তাহা সহ্য করিব, ইহা কোন ধর্ম্মের অনুমোদিত নয়। গুণ্ডার সহিত গুণ্ডামি না করিতে পারিলে এদেশের মঙ্গল নাই। প্রতিশোধের ভয় থাকিলে, ইংরাজ উস্কাইয়া দিলেও, গুণ্ডারা কখনও দৌরাত্ম্য করিতে পারিত না। খ্রীষ্টের উপদেশ, এক গণ্ডে আঘাত করিলে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিতে হইবে, এ নীতি, মা, ভগ্নী, পত্নীর লাঞ্ছনার সময় যে বলিতে চায়, সে উন্মাদ, সে কাপুরুষ। তাহা দ্বারা এদেশের কোন মঙ্গল হইবে না। মুসলমানের মসজিদ ভাঙ্গিলে বা মুসলমান-মহিলার ইজ্জত নষ্ট করিলে দলে দলে লোক প্রাণ দিত। হিন্দুকে রক্ষা করিতে মুসলমান প্রাণ দিল, কিন্তু হিন্দু প্রাণ দিতে পারিলেন না! এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না!

একদিকে এইরূপ অত্যাচার, অন্যদিকে—গবর্ণমেণ্ট ছাত্র-দলন, সভা-সমিতি-দলন এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পচা ৩ নং কঠোর রেগুলেসন বলে পঞ্জাব-দলন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ এদেশের এবং সে দেশের সকল ইংরাজ সম্পাদকই মিণ্টো বা মর্লীর ধৃষ্টতার পোষকতা করিতেছে। কেবল অজিত

সিংহ, লালা লাজপত রায় (১) নহেন - বহু লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের সূত্রপাত হইয়াছে! এখনও এহেন ইংরাজের পদলেহনের জন্য লোকেরা ব্যস্ত!! কতজনে কত রূপ প্রবন্ধ লিখিতেছে।(২) টাকার খাতিরে চাকরী ছাড়া দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু অনাহারী পদগুলি এই সময়ে পরিত্যাগ করিয়া একতা ও সহানুভূতি দেখাইতে পারিলেও কিছু কাজ হইত; কিন্তু কেহই তাহা পারিলেন না। ইহা কি রাজভক্তির লক্ষণ, না কাপুরুষতা? ইংরাজ-মহল ভারত-দলনে আজ একমত, আমরা এখনও সন্দেহে দোদুল্যমান! মর্লী ভয় দেখাইয়াছেন, আমরা আন্দোলন করিলে তিনি আমাদিগকে স্বর্গে তুলিবেন না! কি দয়া গো!! ধর্ম্ম, নীতি, আজ কোথায়? সকল ইংরাজ সম্পাদক এবং সকল মহারথীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও নাকি কটন, ওয়েডারবরণ, হিউম অবশিষ্ট আছেন! কি সম্মোহনে আজ তাহাদিগকে এদেশের লোকেরা চিনিতে পারিল না গো?

আমরা ভীরু, দুর্ব্বল, দরিদ্র, অসহায়—মরমে মরিয়া রহিয়াছি; তাই কি চতুর্দ্দিকে এইরূপ নীরবতা দেখিতেছি? গবর্ণমেণ্টের গোলামী পরিত্যাগ করিলে অনাহারে মরিবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু অনাহারী কাজগুলি কি পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হয় নাই? এদেশের লোকেরা তাহাও যদি করিতে পারিত, গবর্ণমেণ্ট একটু সহানুভূতি-শক্তির পরিচয় পাইতেন! হায় রে হায়, প্রাণ দেওয়া ত অতি দূরের কথা, এদেশের লোকেরা সামান্য সম্মান টুকুও ছাড়িতে রাজি নয়! কি সম্মোহন!

মহাপরীক্ষার দিনে একদিকে এই সকল কথা ভাবিতেছি, অন্যদিকে ভাবিতেছি, ইংরাজ এত ভীরু ও কাপুরুষ এবং বুদ্ধিহীন হইল কিরূপে? একটী বালকের কথা জানি, সে বড়ই কাঁদিত। তাহাকে, সময়ান্তরে, ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত যে, কাঁদিয়া সকলকে ভয় দেখাই, না কাঁদিলে যে কেহ কথা শুনে না। সত্যই ক্রন্দনের ভয়ে সকলে তাহার আব্দার রক্ষা করিত। আজ আমাদের ইংরাজের বোকামির কথাই মনে জাগিতেছে। শুনিতাম, ইংরাজ বড় বুদ্ধিমান, বড় চতুর, বড় প্রতিভাশালী। কোন্ মূর্খ বালক ভয় দেখাইবার জন্য রাষ্ট্র করিয়াছিল, ১০ই মে সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চাশত সাম্বৎসরিক দিনে এদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, অমনি বিবেকহীন ইংরাজ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন! লাজপত রায় গুপ্তস্থানে লক্ষ জাঠ সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন!! রাউলপিণ্ডি কাঁপিল, সীমলার আহার নিদ্রা গেল, ইংলণ্ড সন্ত্রস্ত হইল! কোথাও কিছু নাই, লাজপত রায়কে ধরিয়া বিনা বিচারে মাণ্ডালার দুর্গে এবং পরে স্বারাজ্যে নির্ব্বাসিত করা হইল!! ম্যাট্‌সিনির ভয়ে যেরূপ অষ্ট্রীয়া একদিন সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, আজ ইংরাজ তদপেক্ষাও ভীতির পরিচয় দিলেন। কেন এরূপ মতিভ্রম; কেন এরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম, কেন এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা?—ভারত ও ইতালী কি এক প্রকার? তাহা নয়। তবে এরূপ বোকামী কেন? কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজ নানা অপকর্ম্ম করিয়া

(১) ১৯০৭—৯ই মে, বিনা বিচারে লালা লাজপত রায়কে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

(২) নমুনা স্বরূপ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, স্বদেশীস্থ ইত্যাদি প্রবন্ধ, এডুকেশন গেজেট, নেসন, ইউনিটি মিনিষ্টার ও মেসেঞ্জার দ্রষ্টব্য।

সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আগুনের ভয় করিতেছেন। কোথায় ম্যাটসিনি ও ইতালী, আর কোথায় অন্ধকার ভারতবর্ষ! বোকামীর কারণ আছে, ক্রমে ক্রমে সব ভাঙ্গিয়া লিখিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইতালীর একটু বিবরণ দিতেছি। বালক ম্যাট্‌সিনির প্রথম কারারুদ্ধের কারণ জানিবার জন্য তাঁহার পিতা গবর্ণরের নিকট যাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সন্তানের কি অপরাধ হইয়াছে, তদুত্তরে গবর্ণর বলিয়াছিলেন ;—

"He was a young man of talent, very fond of solitary walks by night, and habitually silent as to the subject of his meditations, and that the government was not fond of young men of talent the subject of whose musings was unknown to it."

লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনে মন্ত্রীর উত্তরে ইহাপেক্ষা কোন গুরুতর কারণ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

নির্ব্বাসনের সময় ম্যাট্‌সিনি কি দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইবে।

"I bade a long, sad farewell to all individual hopes for me on earth. I dug, with my own hands, the grave, not of my affections,—God is my witness, that now, greyheaded, I feel them yet as in the days of my earliest youth—but of all the desires, exigencies, and ineffable comforts of affection ; and I covered the earth over that grave, so that none might ever know the Ego buried beneath."

"The moral crisis I had undergone in Switzerland was succeeded—partly in consequence of obligations I had contracted for Italian matters to which I had devoted the money sent to me by my parents for my personal use, and partly of expenses incurred for others—by a crisis of absolute poverty, which lasted during the whole of 1837 and half of 1838. I might have extricated myself from it by making known my condition to my father and mother, who would have made light of every sacrifice endured for my sake ; but they had already sacrificed too much on my account, and I therefore thought it a duty to conceal it from them."

"I struggled on in silence. I pledged, without the possibility of redeeming them, the few dear souvenirs, either of my mother or others, which I possessed ; then things of less value ; until one Saturday I found myself obliged to carry an old coat and a pair of boots to one of the pawnbroker's shops, crowded on Saturday evenings by the poor and fallen, in order to obtain food for the Sunday."

"I passed, one by one, through all those trials and experiences, bitter enough at any time, but doubly so when they have to be encountered by one living solitary, uncounselled, and lost amid the immense multitude of men unknown to him, in a country where poverty—especially in a foreigner—is an argument for a distrust often unjust, sometimes cruel. I, however, did not suffer from these things more than they were worth, nor did I feel either degraded or cast down by them. I should not even allude to trials of this nature, were it not that others, condemned to endure such, and disposed to feel humbled by them, may, perhaps, be helped by my example. I could wish that mothers would bear in mind that in the actual state of Europe, none of us is certain of remaining the arbitrator of his own destiny, or that of those dearest to him, and could be convinced that by giving their children a sterner education, fitting them for any position in life, they would provide better for their future welfare, for their true happiness and for their soul's good, than by surrounding them with every luxury and comfort, and thereby enervating the character that should be inured to fatigue and privation in early years. I have seen young Italians, tempered by nature for nobleness of life, sink miserably into crime, or save themselves by suicide from trials which I have undergone with a smile ; and I have mentally cast the responsibility upon their mothers. My own mother—blessed be her memory!—with the earnest, deep-sighted love that looks forward to the future, had prepared me to stand unshaken in the midst of every misfortune."

"He (Judas) has known of my journeys in the days when I was condemned to death," he would say, "and yet I have always passed in safety ; therefore, so long as the danger is only my own, I may run the risk."

১০ই মে (১৯০৭) সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চাশৎ বার্ষিক দিনে, এদেশে, রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, ইহাপেক্ষা মূর্খের জল্পনা কল্পনা আর কি হইতে পারে? যে দেশের লোকেরা একটা অনাহারী পদ ছাড়িতে কুণ্ঠিত,

সেই দেশে এত শীঘ্রই রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে! যে দেশে লোকেরা মাতা, ভগ্নী, স্ত্রীকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও নিস্পন্দ থাকে, কেবল আবেদন করে, সেই দেশে রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে? যে দেশে দেব-দেবীর মূর্ত্তির প্রতি অমানুষিক অবমাননা ও লাঞ্ছনা লোকেরা নীরবে সহ্য করে, সেই দেশ আজই বিদ্রোহ হইবে! বলিতে কি, যে দেশের শিক্ষিত শ্রেণী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলেন, সেই দেশে আজ রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে! দেখিয়া শুনিয়াও ইংরাজ বুঝিলেন না, মহা ভ্রান্তিতে ডুবিলেন। কাহার আদেশ বশত?

সরব-আন্দোলনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এখন নীরব আন্দোলনের পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য ভলন্টিয়ারের রাজত্ব পরিসমাপ্ত হইল, এখন গুপ্ত-সমিতি ও নিহি-লিষ্টের রাজত্ব আরম্ভ হইল। তুমি ভয়কেও বাঁচাইয়া রাখিবে এবং স্বদেশও জাগিবে, কখনও সম্ভব কি? তুমি পৈতৃক প্রাণটা এবং সকল স্বার্থকে সংরক্ষিত করিবে, অথচ দেশটা জাগিয়া উঠিবে? অসম্ভব তাহা। বিধাতা দেখিলেন, এরূপ বিধানে তিনি সুপ্ত রিয়ে-ঞ্জিকে জাগাইতে পারেন নাই; প্রেমাবতার ম্যাট্‌সিনিকে উত্তেজিত করিতে পারেন নাই; দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকেও প্রমত্ত করিতে পারেন নাই। তাই আজ দুষ্ট বুদ্ধি রূপে ইংরাজের স্কন্ধে চাপিয়াছেন। তাই আজ ইংরাজ পাশব শাসন ও গুণ্ডার দ্বারা মহা আঘাত করিয়া সুপ্ত ভারতকে জাগাইতেছে। আজ সকলে ভক্তির সহিত বল, জয় পুণ্য-বিধানের জয়।

লালা লাজপত রায়ের জন্য, বন্ধু, তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে কি! ভাই, সতীর অশ্রুজলে তোমার প্রাণ সিক্ত হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, ভ্রাতার রক্তপাতে যেরূপ রিয়েঞ্জির উত্থান হইয়াছিল, এই ভারতে কি সেইরূপ, ঐ সব ঘটনায় বহু রিয়েঞ্জির অভ্যুত্থান হইবে না? তুমি ভাবিতেছ কি? সুখে খেলিবে, অথচ দেশের উদ্ধার হইয়া যাইবে? অসম্ভব তাহা। তোমরা যদি দুঃখিত হইয়া থাক, তবে রক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নীরব হইয়া যাও।

বন্ধু, লাজপত রায় কি তোমাদের ভাই? যদি ভাই বলিয়া মনে কর, তবে শুধু চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছ? মৈমনসিংহের দেব দেবী কি তোমার বিশ্বাসের বস্তু নন? তবে রহিয়া? কি ভাবিতেছ? ঐ মা ভগ্নীরা কি তোমার মা ভগ্নী নহেন? তবে পা চাটি-বার এত কি মন্ত্রণা করিতেছ? কাহার ইঙ্গিতে ঐ সব ঘটিয়াছে, তাহা কি বুঝিতে বাকী আছে? চাকরীর খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর করিবে, মানের বা ক্ষমতার খাতিরে অনাহারী পদ সকলের জন্য সম্মোহিত হইবে, —ইংরাজের পা চাটিতে সদা উৎফুল্ল রহিবে, কেবল মধ্যে মধ্যে একটা বিষাদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিবে, কাপুরুষ, তুমি দূরে সরিয়া দাঁড়াও, আর "স্বদেশী স্বদেশী" শব্দ মুখে বলিও না। এত দেব দেবীর অবমাননা, সতীত্বনাশ, প্রজার বাড়ী ও কাছারী লুণ্ঠন, এত সকল ঘটনাতেও একটা লোকের রক্তপাত হইল না;—তবুও তুমি নাকি জাগরিত! কালা-পাহাড়দের সকল অত্যাচার ব্যর্থ হইয়াছে; হিন্দু জাগিল না। মিথ্যা কুহক আর ভাল লাগে না। নীরব হও, নীরব হও।

**আমরা সুদীর্ঘ কাল কেবল মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আর কিছু নয়, কেবল স্বদেশের জন্য মরিতে চাই। এক একবার** মনে হয়, এই বুঝি মৃত্যুর সময় আসিয়াছে! কিন্তু পরক্ষণে দেখি, সব ফাঁকি। মৃত্যুর অপেক্ষা আর সুখের কি আছে?

ম্যাট্‌সিনির পূত জীবনকাহিনী বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর পাঠ করা উচিত। ক্রুসে একদিন দেহত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, ম্যাটসিনি বহু বার ক্রুসে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। কোথায় ইতালীর নেতা এবং কোথায় ভারতবর্ষ!

ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা জীবনে যত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, ইতালীবাসীই তাহার কারণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও সেই দৃষ্টান্ত এখন অভিনীত হইতেছে। ইংরাজের উত্তেজনায় বা মায়ায় ভ্রাতারাই ভ্রাতাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। কিন্তু এখনও মন্ত্রগুপ্তির আধিপত্য বিস্তৃত হইল না। মন্ত্রগুপ্তির আবশ্যকতা এখনও সকলে স্বীকার করেন না। যাহা কর্ত্তব্য, প্রকাশ্যে তাহা সকলে প্রচার করেন। গবর্ণমেণ্ট গুণ্ডাদিগকে উস্কাইয়া দিয়া কত দেবতার লাঞ্ছনা, কত মহিলা সতীত্ব নাশ, কত কাছারী লুণ্ঠন করাইলেন; অন্যদিকে রুল জারী করিয়া সভাবন্ধ করিতেছেন, ছাত্রদিগের হাত পা বাঁধিতেছেন "সঞ্জীবনী," "নবশক্তি" প্রচার করিতেছেন, বাবু মাসের তের পার্ব্বণে, যাত্রার সময়, নিমন্ত্রণের সময় স্বদেশী আন্দোলন করিবেন। এ কথা, গোপনে রাখিলে চলিত না কি?

এতদিনে স্বদেশী-আন্দোলনের এক পরিচ্ছেদ **পরিসমাপ্ত হইল**। এখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ **আরম্ভ হইল**। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য **বুঝিতে পারিতেছিলাম না**। কাঁদিয়া কাঁদিয়া **চক্ষু** রক্তিম করিতেছিলাম, বক্তৃতা দ্বারা ইংরাজকে ভয় দেখাইতেছিলাম। বুঝিতে পারিয়াছিলাম না যে, ইংরাজ ইহাতে ভয় পাইয়া কঠোর শাসন করিয়া ভারতকে জাগাইবে। ব্যাকুল ভাবে এক পরিচ্ছেদ রচনাতেই তৎপর ছিলাম;—কেবল কথা কাটাকাটি, লেখালিখি, বক্তৃতা আব্দার, কেবল সভা-সমিতি;—সকলই প্রকাশ্যে, প্রকাশ্যে, প্রকাশ্যে বিধাতা দেখিলেন, এইরূপ ভাবে চলিলে এদেশের মঙ্গল নাই। তিনি রূপান্তর ধারণ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি রূপে গবর্ণমেণ্টের স্কন্দে চাপিলেন। ফুলারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নীতি নির্ব্বাপিত হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া, তিনি হেয়ার, মিণ্টো, মর্লীর স্কন্দে চাপিলেন। চাপিলেন, এমপায়ার ও ষ্টেট্‌সটানের স্কন্দে, সলিমুল্লার স্কন্দে। ইংরাজ উহার দ্বারা মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া নিজপায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিলেন। ফরাসীর ইতিহাস, আমেরিকার ইতিহাস পুরাতন হইয়াছে; কিন্তু ইতালীর ইতিহাস সে দিনের কথা, বুয়র ও জাপানের ইতিহাস ত কল্যকার কথা। অত্যাচারের পরিণাম তুমি আমি জানি, আর যে জাতি বুদ্ধি ও প্রতিভার বড়াই করে, সে জাতি জানে না? সোসিয়ালিষ্ট, কমুনিষ্ট, নিহিলিষ্টের দৌরাত্ম্যে নানা দেশের রাজসিংহাসন টলটলায়মান, আমরা জানি, আর ইংরাজেরা জানে না? ভেদনীতির পাশব শাসনে প্রজার ভালবাসা পাওয়া যায় না, আমরা জানি, আর তাহারা জানে না? তাহারা সকলই জানে, কিন্তু বিধাতার আদেশ **অন্যরূপ**; তাহারা কি করিবে? হনুমানের লাঙ্গুলে তুলা জড়াইয়া অগ্নি প্রদান করিলে সোনার **লঙ্কা** ছারখার হইবে, **লঙ্কাবাসী** বুঝিতে পারিয়াও **ক্ষান্ত** থাকিতে পারে নাই কেন? **অভিমন্যুর** বিনাশের মূলে কুরুকুল-ধ্বংশের বীজ নিহিত ছিল, কুরুবংশীয়েরা বুঝিয়াও তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল কেন? দুর্দ্দান্ত রাবণ সীতাহরণ করিলে **সর্ব্বনাশ** হইবে, বুঝিতে পারিয়াও

কেন মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল ? এ সব কথার একই উত্তর—বিধাতার বিধান। বিধাতা দেখিলেন, ভারতে যে আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহা কেবল কথার কাটাকাটি, ইহাতে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত নাই, ইহাতে কর্ম্মযোগ প্রতিষ্টার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণের চেষ্টা নাই, ইহাতে মন্ত্রগুপ্তি আবির্ভাবের আশা নাই, ইহাতে দুর্জ্জয় সাহসের বা সমর-নিপুণতার সম্ভাবনা নাই। তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে, অচিন্ত্যরূপে, সকল চিত্রকে তিনি রূপান্তরিত করিলেন। যে মর্লী নাটু-ভ্রাতাদয়ের নির্ব্বাসনের সময় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনিই লাজপত-রায়ের-নির্ব্বাসন সমর্থন করিলেন। লোকে বলে,নির্বুদ্ধিতার খেলা ; আমরা বলি, বিধাতার নূতন আদেশের অবতরণ। এরূপ বিধান না হইলে এই খোসামুদে জাতির উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না ; কিছুতেই পোষ্যপুত্রের দল মাতৃ নামে এক পায়ে দাঁড়াইত না।

স্বেচ্ছা-সৈনিকগণ কুমিল্লায় এক স্বর্গীয় জীবনের আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু সে চিত্র রূপান্তরিত হইল—মৈমনসিংহে !! দুঃখে ও বিষাদে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

লালা লাজপত রায়, তোমার নিঃস্বার্থ পূত জীবন-ইতিহাস কি এই দেশের নরনারীর হৃদয়ে অনল প্রজ্জ্বলিত করিতে সক্ষম হইবে ? তোমার স্বদেশানুরাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত কি এদেশকে জাগাইতে পারিবে ? যদি পার, তোমার নাম এদেশে অক্ষয় হইবে। তাহা হইলে, মৈমনসিংহের সকল কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত হইবে এবং ইংরাজের কুটীল ভেদনীতির মূলে কুঠার পড়িবে।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে এদেশে দুটী দলের অভ্যুদয় হইতেছিল ; মডারেটস্ এবং ইক্স্‌ট্রিমিষ্ট। কাহাদের নীতি সত্য, একথা ব্যক্ত করিতে হইবে না ; উভয় দলের উদ্দেশ্যই ভারতের মঙ্গল ; কিন্তু একদল রাজার সাহায্যে দেশোদ্ধার করিতে চাহেন, অন্য দল সর্ব্ব বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার প্রয়াসী। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি,যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। যে আত্মরক্ষায় সক্ষম, বিধাতা তাহাকে নৈতিক বল প্রদান করেন না। জগতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরাজ মস্‌জিদ ভাঙ্গিতে সাহস পায় না, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা নিজেরা কিছু করিব না, কেবল ভিক্ষা, কেবল ভিক্ষা করিব !! ভিক্ষুকদিগকে কেহই সম্মান করে না। আমাদের ভিক্ষানীতি এত দিন আমাদের মরণের পথকে উন্মুক্ত করিতেছিল। শয়নে, স্বপনে কেবল ইংরাজের দয়াকে উত্তেজিত করিয়া নেতারা দিন কাটাইতেছিলেন। যে ইংরাজ শুধু ভারতের মঙ্গলের জন্য কিছুই করে নাই, সেই ইংরাজের পদলেহন করাই আমাদের ব্রত হইয়াছিল। যে ইংরাজ চিরকাল জাল জুয়াচুরি করিয়া রাজ্য লাভ এবং রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, সেই ইংরাজের দয়া পাইবার কুহক-মন্ত্রে নেতারা ভুলিতেছিলেন। ভুলিয়া নিম্নশ্রেণীকে চিরকাল উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়াছেন এবং নানা অত্যাচারে অবসন্ন করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীকে ভালবাসিলে আজ তাহারা ইংরাজের উত্তেজনায় গুণ্ডাগিরি করিতে পারিত না ! তাহারা আমাদের মুখের দিকে না চাহিয়া, ইংরাজের দিকে কেন চাহিল ইহার গভীর কারণ আছে। আমাদের অনাদর ও অত্যাচার

তাহার কারণ। ইংরাজের কথা আর কি বলিব? কেবল ক্লাইভ ও সেরাজের পতনের সময় নয়—আর কত সময় কত যে জঘন্য কাজ ইংরাজেরা করিয়াছে, তাহা লিখিতে অক্ষম। ইতালীর বাদিরা ভ্রাতাদের হত্যা তাহার একটী উদাহরণ। * নির্ব্বাসন, নির্য্যাতন, প্রবঞ্চনা, বঞ্চনা, লুণ্ঠন অস্ত্রে যাহারা ভারতকে ভীরু, দুর্ব্বল, দরিদ্র এবং সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, ভারত তাহাদিগের পা চাটিবার জন্যই লালায়িত ছিলেন! বঙ্গ বিভাগ-রূপ বিধাতার আদেশের পরও, ভারতবাসী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদলেহনের দিকেই ছুটিতেছিল। একতা ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব, ইহা ভুলিয়া, নেতারা পুনঃ পুনঃ দল বাঁধিতেছিলেন। বিধাতা দেখিলেন, আর এক মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত; তাই—১৩১৪ সালের প্রারম্ভেই আর এক লীলা প্রকটিত করিলেন;—লাট মিণ্টো ছাত্রদলন, সভাদলন ও পঞ্জাবশাসনে মনোযোগী হইলেন। এতদিন পর সকলেই আপন আপন মহাভ্রান্তি বুঝিলেন। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে উত্তেজিত করিয়া যে পরীক্ষা উপস্থিত করিয়াছিলেন, এই মহা পরীক্ষায়ও ভারত উত্তীর্ণ হইবে; আশা হইতেছে। ভারতবাসী ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধেই উত্তেজিত হইবে। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই এক মহা একতা ভারতে অবতরণ করিবে, আশা হইতেছে। জয় বিধাতার শুভ ইচ্ছার জয়।

সকল কথা লেখার স্থান নাই ইংরাজ চিরদিনই কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। আয়রলণ্ডকে দমন করিবার জন্য মানষ্টারের সকল কুমারীর সতীত্ব নাশ করিয়াছিল। * চিনের বক্সার দলনও এই ভাবে হইয়াছিল। ভূরি ভূরি উদাহরণ বিদ্যমান থাকিতেও লোকেরা সম্মোহিত হইয়া এত কাল তাহা বুঝে নাই। কেবল অশিক্ষিত মুসলমানদিগের নিন্দা করিলে হইবে কেন! এদেশের বড় বড় নেতারাও তাহা এতদিন বুঝেন নাই। কুমিল্লা এবং মৈমনসিংহের ঘটনারাশি—সকলের অন্ধ চক্ষু ফুটাইয়াছে। এইরূপে, অচিরাৎ, মুসলমানের চক্ষুও ফুটাইবেন। নেতাদের অন্ধতা ঘুচান কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহাই যখন সম্ভব হইতেছে, তখন অশিক্ষিত মুসলমানদিগের চক্ষু ফুটান বড় কঠিন কার্য্য নয়। একটু ভালবাসা, একটু সদয় ব্যবহার, একটু আদর পাইলেই তাহারা বশ হইবে। না হয়, গুণ্ডার দ্বারাই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। এতদিন পর জাতীয় একতা, এ ভারতে সম্ভব হইয়া আসিয়াছে।

তবুও লোকেরা বলে, এক-ধর্ম্ম, এক-ভাষা কোথায়? তবুও লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, রাজা হইবে কে? রাজা তুমি, বা আমি, বা সে হইবে না রাজা হইবে, সমবেত একতার জাগ্রত দুর্জ্জয় মহাশক্তি;—যেমন আমেরিকায় সম্ভব হইয়াছে, যেমন ফরাসী দেশে সম্ভব হইয়াছে। এক ধর্ম্ম—ভারতে আসিয়াছে;—সে স্বর্গীয় ধর্ম্ম—স্বদেশানুরাগ। "স্বদেশপ্রেম"—স্বধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। সম-স্বার্থক ভারত-সন্তান একতায়

* The leaders of the proposed insurrection ( the brothers Baduiera ) were Austrian subjects, and it was at the request of the Austrian and Neapolitan governments, that English Statemen "practising the arts of Tallyrand and Fouche," had contrived covertly to open Mazzini's letters and transmit their contents to the despots abroad. The revelations thus made ended in the execution of the patriots cencerned, and as Mazzini truly observes, "English ministers had made themselves accomplices in that murder. Joseph Mazzini—a Memoir, p. 65

(১) ১৩১৪—১৪ই জ্যৈষ্ঠের ত্রিপুরাহিতৈষী—দেখ।

মাতিবে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলার এক-মাতৃক সন্তানগণ আর দীর্ঘকাল পর-পর হইয়া থাকিবে না। একধর্ম্ম যখন আসিয়াছে, তখন সংস্কৃত-মাতৃক বহু ভাষা মিলিয়া একাকার হইবে, তাহারও আভাস পাইতেছি। ভারতের অধিকাংশ ভাষাই সংস্কৃত-মাতৃক। যাহা সংস্কৃত-মাতৃক নয়, তাহাও এখন সকলের আয়ত্বের মধ্যে আসিয়াছে। সাধু বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া দেখিয়াছি,—ভারতের অনেক লোকই ক্রমে ক্রমে তাহা বুঝিতে অভ্যস্ত হইতেছে। যাহা বাকী আছে, আর ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে তাহাও সংসিদ্ধ হইবে। নিশ্চয় জানিও,পরাধীনতা-রূপ-সম-স্বার্থ-নিগড় অচিরে ভগ্ন হইবে।

কোন দেশই, দুই দশ বৎসরে সব বিষয়ে স্বাধীন হয় নাই। সাত শত বৎসরের দাসত্ব-প্রপীড়িত ভারত রাতারাতি স্বাধীন হইবে,যাঁহারা মনে করেন,তাঁহারা মহাভ্রান্ত। স্ব-অধীনতার কেবল সূত্রপাত হইয়াছে—এখনও অনেক আয়োজন বাকী। নিম্ন-শ্রেণীর সম্মিলন এখনও বহুদূরে। তাহারা এখনও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহারা পর-পর-পর হইয়া রহিয়াছে। যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে; যাহারা একতার বিরোধী, তাহাদিগকে একতায় মাতাইতে হইবে; যাহারা ইংরাজের পোষ্যপুত্র এবং ভারতের কুসন্তান এবং এখনও যাহারা ইংরাজের কুহক-মন্ত্রে এবং মর্লীর আশ্বাসবাণীতে ভুলিতে চায়, তাহাদিগকে আবার ভারতের সুসন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। সব লোক মিলিয়া যখন একাকার হইবে—জাতিভেদ যখন উঠিয়া যাইবে, তখন সকলে এক-স্বার্থক, এক-ধর্ম্মক,এক-প্রাণ, এক-জ্ঞান হইবে,তখন ভারতে "স্বরাজ"আপনা আপনি বিনা রক্তপাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই যে এখন কত মামলা মকদ্দমা দেখিতেছ,—ঐ সকল ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিবে। এই যে এত সাহেবী-অনুকরণ দেখিতেছ—ঐ সকল ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এই যে এত ইংরাজি-শিক্ষা, ইংরাজি দীক্ষা দেখিতেছ, ক্রমে ক্রমে এ সকল বিলীন হইয়া যাইবে;—এ সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, —এই পুণ্যময় ভারতভূমিতে জাগিয়া উঠিবে "স্বজাতি স্বজাতিদের প্রতিষ্ঠাও যাহা, "স্বরাজ"ও তাহাই। কিন্তু জানিয়া রাখিও, এখনও তাহার অনেক সময় বাকী।

ইংরাজ মহামূর্খ যে, সে বুঝিয়াও, নানা কঠোর বিধানের দ্বারা স্বজাতিপ্রতিষ্ঠার মহা আয়োজনে আজ বদ্ধপরিকর। মহা মূর্খই বা বলি কেন?—বিধাতার আদেশেই সে এখন রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া মহা অত্যাচারের কুটার অবারিত-দ্বার করিয়াছে। এতদিনে আমাদের ত্রিশ বৎসরব্যাপী মহা তপস্যার ফল ফলিয়াছে। তবে আয় অত্যাচার,আয়, —তোকে চুম্বন করিয়া "স্বজাতি" প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া আমরা স্বর্গে চলিয়া যাই। মরিতে না দেখিলে মরণের ভয় যাইত না; নির্ব্বাসিত হইতে না দেখিলে নির্ব্বাসনের ভয় যাইত না, নির্য্যাতিত না হইলে আমাদের মহা সম্মোহন-কুহক ভাঙ্গিত না। বিধাতার বিধানে—এ ভারতে ইংরাজ-অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে মহা একতার রাজ্য আসিতেছে, অসম্ভব সম্ভব হইয়া আসিতেছে; সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায়, স্বদেশ-প্রেমোদয়ে সকল ভেদাভেদ তিরোহিত হইতেছে। এখন মাতৃভূমির পূত ধূলিকণা শিরোধার্য্য করিয়া, সন্তানবৃন্দ, গগন কাঁপাইয়া বল—মাভৈঃ মাভৈঃ। প্রতিজ্ঞা কর—কিছুতেই ভ্রাতৃবিরোধ করিবে না,—স্বজাতিপ্রতিষ্ঠার জন্য দেহপাত করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। মায়ের শুভাশীর্ব্বাদ তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক, মরিয়া তোমরা অমর হও।

# কবিওয়ালা। (৯)

## সাতুরায়

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বৈচিগ্রামে, অনুমান বঙ্গাব্দ ১২০৯ সালে, ব্রাহ্মণবংশে সাতুরায়ের জন্ম হয়। তাঁহার আসল নাম সাতকড়ি রায়, লোকে সংক্ষেপে সাতুরায় বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। সাতুরায় ব্যবসায়ী কবিওয়ালা ছিলেন না, তাঁহার পেশা ছিল—চাকুরী ;—অবসর সময় কাব্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। সে সময় কবিওয়ালাদের নামে সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত, সামান্য গৃহস্থের কুটীর হইতে রাজাধিরাজ রাজ চক্রবর্ত্তীর সৌধ অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পূজা পার্ব্বণ, বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতি উৎসব ও ব্যাপারাদিতে তাহাদের সাদর আমন্ত্রণ হইত। রাম-যাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারীগীত, কুস্তিখেলা, পুতুলনাচ, নৌকাবাইচ্, ঘোড়-দৌড় ইত্যাদিই তৎকালের সাধারণ আমোদ প্রমোদ ছিল। ধনী নির্ধনী সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্ব জাতি তাহাতে যোগদান করিতে পারিত। (১) কাজেই ব্যবসায়ী ভিন্ন অপর সাধারণেও—যাহাদের সামান্য মাত্র কবিত্ব শক্তির উন্মেষ দেখা যাইত, তাহারাও অবসর মত দুই চারিটা কবিগান রচনা করিয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আনন্দানুভব করিত। এইভাবে, কতজন যে কত কবিগান রচনা করিয়াছেন, কত জনের অলৌকিক যত্ন-প্রসূত সংগীত-রত্ন-রাজিতে যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রদীপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ইয়ত্বা করিবার উপায় নাই। আমরা সামান্য যে কয়েক জনের বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা অনাবিষ্কৃত কবিদের তুলনায় সাগরে বারিবিন্দু নিক্ষেপের ন্যায় নগণ্য বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

সাতুরায় বাল্যকালে কিছুদিন স্বগ্রামের পাঠশালায় ও তৎপর কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শান্তিপুরের গোস্বামী ও অপর জমীদারদিগের ভবনে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও এই জমীদারদিগের তরফে কার্য্য করিতেন। এই জমীদারী কার্য্যে লিপ্ত হইবার পর হইতে সাতুরায়ের কাব্য জীবনের সূচনারম্ভ হয়। তিনি প্রথমতঃ স্বরচিত সংগীত বিনামূল্যে কবিওয়ালা ভোলা ময়রাকে গাওনা করিতে দিতেন। শান্তিপুরেই ভোলার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। ভোলা শান্তিপুরের জমীদার ভবনে গাওনা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর শিবচন্দ্র সরকারের সখের কবির দল জাগিয়া উঠে। কলিকাতার গরাণহাটায় সরকার মহাশয়ের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; সংগীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয়। সাতুরায় সরকার মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার দলে অবৈতনিক বাঁধনদারের কার্য্য করিতে

(১) "কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জারীগীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রামযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারীগীত, কুস্তিখেলা, পুতুলনাচ, নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান রাখিত।"—সঙ্গীত-রত্নাকর।

আরম্ভ করেন। অবশ্য তিনি সরকারের দলে অবস্থান করিতেন না, শান্তিপুর হইতেই গান রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। সরকারের দলে গীত 'কলঙ্ক ভঞ্জন' পালার সাতুরায়ের রচিত একটী গীতের কিয়দ্দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখিগো সই ?
যদি ত্যজিগো কুল, তবে হাসে গোকুল ॥
যদি রাখিগো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।
হাঁ গো বৃন্দে! শ্রীগোবিন্দের পায়,
করে' প্রাণ সমর্পণ।
হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকুল।
অনুকূল কেবল শ্যামধন ;
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন।
সই,চারিদিকে গঞ্জনা, পাপলোকে তা বুঝে না।
কৃষ্ণধন কি ধন !
আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ,
দেয় কালার পরিবাদ
আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই ?
অপরূপ একি রূপ, কৃষ্ণের রূপ
লিখেছ গো রাই !
যে চরণ দেবের পূজ্যধন,
গতি নাই সে চরণ বই,
সে চরণ কই গো কই, রাই রাই গো !
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই ;
কি ভাব সুধাংশুমুখী তাই সুধাই।
বল কি ভাবে এ ভাবের হ'ল উদয় ॥
ইত্যাদি।

এইরূপে কবিওয়ালা-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাতুরায় অন্যান্য কবিওয়ালার দলেও বাঁধনদারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিতেন,—"বাপু, আমার তো কবি-গাওনা ব্যবসা নয়, আমি চাকুরী ব্যবসায়ী। তবে কেন আমায় বিদ্যা বেচিতে অনুরোধ কর ? আমা হইতে তাহা হইবে না,—অর্থাৎ আমি পারিশ্রমিক লইব না।" সাতুরায় নিজের রচনাকেই ঠিক সরস্বতী দেবীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। মূল্য লইয়া সঙ্গীত দেওয়াকে তিনি সেই সরস্বতী (বিদ্যা) বিক্রয় করা বলিতেন ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি নিজে কখনও কবির দল সংগঠন করেন নাই বা পেশাদারী কোন দলে গাওনা বা চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তিনি আজীবন জমিদারের সেরেস্তার হিসাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে নদীয়ার রাণাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারদিগের পক্ষের বারাসত মহকুমার মোক্তারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহাই তাহার শেষ চাকুরী ; আমরাও তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই জানি। এখন তাঁহার সখীসম্বাদের একটী গান রসজ্ঞ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি :—

বল উদ্ধব ! তোমার মনে আবার কি আছে ?
একবার এসে অক্রূরমুনি, কল্লে কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্তমণি, হ'রে ল'য়ে গিয়েছে।
উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে,
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায় পথ মধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব ! কও কিমর্থে আগমন ?
আসা সুলক্ষণ কিহে বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে গোকুলে আসি কল্লে পদার্পণ ?
দেখে মথুরানিবাসী ভয় হয় ;
এক জন এসে ছদ্মবেশে,
প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে ;
সাধু হও যদ্যপি তথাপি সন্দ হতেছে !
যেমন সেই অক্রূর দেখতে সুধার্ম্মিক ;—
তোমায় ততোধিক দেখ্‌ছি শতাধিক,

সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্বিক।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয়,
ধর্ম্ম-রহিত তাদের চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে ॥

গোপীগণের হৃদয়-নিহিত আশঙ্কা ও উদ্বেগ কেমন সাধারণ ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে ও তৎসঙ্গে আগন্তুকের প্রতি তাহাদের দ্বেষ ও শ্লেষ কেমন স্বাভাবিক ও সরল। সাতু রায়ের অধিকাংশ সঙ্গীতই পৌরাণিক ছায়াবলম্বনে এইরূপ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে রচিত।

বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—১২৭৩ সালের সমসম কালে সাতু রায়ের নশ্বর জীবনের লীলা খেলা পরিসমাপ্ত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়,তাহার অপর দুইটী সহোদর ছিল এবং তাহাদের বংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

## ভোলা ময়রা।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এই যে উন্নতি, ইহার মূল ভিত্তি গঠন করিতে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর, সমস্ত জাতির এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরই সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল। কোনও এক ব্যক্তি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের দ্বারা এই মহা গৌরবান্বিত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের—তিলি, মালি, ধোবা, বেণে, নাপিত, নমশূদ্র হইতে যেমন মুচি জাতীয় ব্যক্তিও বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন আহরণ করিয়া গিয়াছে, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের—মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিরাও এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য এবং বঙ্গভাষাকে সালঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সম্প্রতি গ্রাম, পল্লীর আশেপাশে আমরা যতই অন্বেষণ করিতেছি, ততই দেখা যাইতেছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেক বর্ণজ্ঞান-বিহীন নিরক্ষর কৃষকও অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তিতে মণ্ডিত হইয়া,নিঃস্বার্থভাবে,যশমানের কুহকে না ভুলিয়া, নিজের প্রাণে,নিজের মনে মুখে মুখে সংগীত বা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছে। ইহারা নগর-কোলাহল হইতে বহুদূরে থাকিয়া নীরবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আত্মত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন পাইয়া, বহুদিনপর সহরবাসী আমরা বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদের জয় ঘোষণা করিতেছি। এই প্রস্তাবে আমরা যে ব্যক্তির আলোচনা করিব, সেও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি প্রভাবে যে সুযশ ও সুনাম অর্জ্জন এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, তাহা উচ্চশ্রেণীর অনেক কবির ভাগ্যেই ঘটিতে পারে নাই। তাহার নাম ভোলা ময়রা,কেহ কেহ ভোলা গায়কও বলিয়া অভিহিত করিতেন।

ভোলার জন্মস্থান ও পারিবারিক বিবরণ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত পরিলক্ষিত হয়। তাহার স্বরচিত গানে পাওয়া যায় যে,—সে জাতিতে ময়রা বা মোদক এবং কলিকাতার বাগবাজারে তাহার বাসস্থান ছিল। যথা,—

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা
সন্দি গর্ম্মি নাহি মানি (ওগো)
ফুরাইলে বারো মাস, ষড় ঋতুর হয় নাশ,
কেবল এই কথাটা জানি (ওগো) ॥
শীত এলে লেপ লই, গর্ম্মি এলে ঘোল মই
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়'
দিই ঢালি।
কালোমেঘে বর্ষাকালে, বক উড়ে দলে দলে,
ময়ূরের প্যাখমে বাহার ॥
নহি কবি কালিদাস, (বাগবাজারে করি বাস)
পূজা এলে পুরী মিঠাই ভাজি।

বসন্তের কুহু শুনে, ভক্তির চন্দন-সনে,
মন-ফুল রামচরণে করি রাজি।
শরতে হেমন্তে, বৈশাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নাহি খালি।
ষড়ঋতু বারো মাসে, মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার॥
তবে যদি কবি পাই, হ'টে কভু নাহি যাই,
হোক্ ব্যাটা যতই মন্দ॥
জাহাজ, ডোঙ্গা, সোলা, নাও,
যাহাতে মিলাইয়া দাও
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, ভোলা বাগবাজারে বাস করিত এবং স্বব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া পুরী মিঠাই ভাজিতে ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু 'কবি' ( কবিওয়ালা ) দেখিতে পাইলে তাহার সহিত 'লড়াই' করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। ভোলা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিল,—শ্রীরামচরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। বহুদিন পর্য্যন্ত স্বব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পর, কবিওয়ালাদের মধ্যে যখন তাহার প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে কবির দল লইয়াই গাওনা করিয়া বেড়াইত। এই সময়েও তাহার পিতা জীবিত ছিল; সে এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র (ভোলার কনিষ্ঠ সহোদর ) হৃদয়ই এসময় বাগবাজারের দোকান চালাইত। শুনিতে পাওয়া যায়, পিতার মৃত্যুর পর হৃদয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভোলার সহিত পৃথক্ হইয়া তালতলা বাজারে স্বতন্ত্র এক দোকান করে। ভোলার মিঠায়ের দোকানও এই সময় হইতে প্রায় একরূপ বন্ধই থাকিত।

ভোলা বাগবাজারে বাস করিলেও অনেকে তাহার জন্ম স্থান অন্যত্র বলিয়া মনে করেন। কেহ বলেন,—গুপ্তীপাড়ায় তাহার জন্ম হয় এবং ত্রিবেণীতে বিবাহ করে। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গান' নামক পুস্তকে প্রকাশ,—কলিকাতার সিমুলিয়া ইহার বাসস্থান ছিল। অপর কেহ কেহ বলেন যে, বাগবাজারের বসুপাড়ায় ইহার বাসস্থান ছিল। বাগবাজারে যে ইহার বাসস্থান ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কারণ কবি স্বয়ংই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গানটী ভিন্ন অপর দুই একটী গানেও ভোলার বাগবাজারে অবস্থানের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।

কিন্তু কথা এই, বাগবাজারই তাহার জন্মস্থান কি, উহা তাহার কর্ম্মস্থান মাত্র। এ সন্দেহ নিরসনের তো কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে এক লেখক হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে অবগত হইয়া লিখেন,—"ভোলা ময়রার জন্মস্থান গুপ্তীপাড়া, ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম; এই ব্যক্তি কিপু ময়রা নামে বিখ্যাত ছিল। মাতার নাম গঙ্গামণি। ভোলার বাস্তবিক বাগবাজারে দোকান ছিল; তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও জীবিত। ভোলার কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয় নাথ মোদক তালতলায় দোকান করিত, তাহার বংশ এখনও আছে। ভোলানাথ মোদক বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়াছিল; সামান্য হিসাব, তালপাতায় খরিদদারের নাম লিখা এবং বড় বড় বানান শিখিয়াই সে পাঠশালা পরিত্যাগ করে। ভোলা সতত রামায়ণ ও মহা-

ভারত পড়িত ও শুনিত, সংকীর্ত্তনে প্রায়ই যোগ দিত; বড় কৃষ্ণভক্ত পুরুষ ছিল; নিত্য গঙ্গাস্নান করিত এবং চরিত্র ভাল ছিল বলিয়া বিশ্বাস। ভোলা বড় রসিক পুরুষ; কণ্ঠস্বরও মন্দ ছিল না।”

ঈশান বাবু কি সূত্রে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, প্রবন্ধে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইঁহার প্রতিবাদ হইতে আমরা দেখি নাই। সুতরাং আমরা ভোলার গুপ্তীপাড়া জন্মস্থান প্রভৃতি বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। অন্যান্য বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগবাজারে দোকানের কথা এবং স্বব্যবসায়েতে থাকিবার কথা, তাহা ভোলার নিজের রচনা হইতেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই
　　　　বারোমাস।
জাতি পাতি নাহিমানি (ওগো)কৃষ্ণপদে বাস॥

ভোলার স্বরচনাতে পূর্ব্ব বিবরণের এইরূপ প্রমাণ বিস্তর আছে।

ভোলা একেবারে নিরক্ষর কবি ছিল না। পাঠশালায় অল্প দিন সামান্য লিখা পড়া শিক্ষা করিলেও, গুরু মহাশয়ের কঠোর হস্তের পাঁচনীর মধুর আস্বাদ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য বেশি দিন তাহার অদৃষ্ট না জুটিলেও, গৃহে বসিয়া সে যে কিছু শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা আমরা তদীয় রচনা হইতে বুঝিতে পারি। পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। হোসেন খাঁ, আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, জগন্নাথ বেণে প্রভৃতির সহিত ‘লড়ায়ে” এবং তাহার অপরাপর সংগীত হইতে তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘ভারতী’তে প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ভোলার, কবিওয়ালারূপে প্রসার প্রতিপত্তি লাভের পূর্ব্বের রচিত কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভোলা যে নিরক্ষর—বর্ণজ্ঞান-বিহীন কবি ছিল না, তাহার প্রমাণ উহাতেই পর্য্যাপ্ত রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাণকে তাম্বুল বলে ‘পর্ণ’ সাধু ভাষা।
বুরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা॥
বুড়ো বুড়ি　*　*　*　যুবক যুবতী।
পাণ পেলে সকলের বাড়ায় পিরীতি॥
মোষের মত মুন্সী বাবু মসির ন্যায় কালো।
পাণ খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা খানা ভালো॥
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে পাণ খেতে পাই।
লক্ষীছাড়া, বাসী মড়া, যার পাণের কড়ি নাই॥

শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাই ভোলার সর্ব্ব প্রথম রচনা, ইহাতেই কবির সুন্দর রসিকতা করিবার ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিতায় উল্লিখিত এই ‘মুন্সী বাবু’ কে? অপর কবিতাটী এইরূপ,—

বামুণ বলে ‘আমি বড়,’ কায়েৎ বলে ‘দাস’।
বদ্দি বলে ‘ক্ষত্রি আমি’ (ঢাকা জেলায় বাস)॥
যুগী বলে ‘যোগী আমি’ চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য॥
বলে ‘উগ্র’, নাহি শূদ্র, রাখি তলোয়ার।
হোলে রাত্রি, উগ্র ক্ষত্রি, ভয়ে পগার পার।
আমি ময়রা ভোলা,ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই
　　　　বারোমাস।
জাতি পাতি নাহি মানি (ওগো),
　　　　কৃষ্ণপদে বাস॥

এই কবিতাটী একটী সামাজিক বিবাদ বিতণ্ডার পূর্ব্বাভাস সূচনা করিতেছে। বর্ত্তমান কালে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে জাত্যোৎকর্ষের

যে তীব্র প্রতিযোগীতা এবং নমশূদ্র, যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা যে বর্ত্তমান কালেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। পূর্ব্বেও এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ ও গালাগালি চলিত। নতুবা ভোলার এ কবিতাটীর কোন সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় না। তাৎকালীন সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে।

ভোলার সামান্য যেকয়টী গান উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক বর্ণনায় সে বড় নিপুণ ছিল। পাণের কবিতাটীতে গৃহস্থালীর কেমন ছোট একটু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও দুর্জ্ঞেয় রচনা হইতে, এইরূপ সরল, স্বাভাবিক ও সংসারাশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাই তাহার রচনার প্রধান উপাদান ছিল। এই সকল বিষয় বর্ণনকালে সে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কি সমাজ বিশেষের প্রতি অপ্রিয় সত্য কথা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—"বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুমপেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলাময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।" (১) শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ভোলার গানের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন,—'Bhola' sexodus.*

আমরা এস্থলে ভোলার স্পষ্টবাদীত্বের ও সৎসাহসিকতার একটী ক্ষুদ্র পরিচয় প্রদান করিতেছি। মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল সবডিবিসনের অধীন জাড়াগ্রাম নামক একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম আছে। তথায় 'রায়' উপাধিধারী এক প্রাচীন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ জমীদার বংশ বাস করিতেন। জাড়াগ্রামের নিকটবর্ত্তী মাণিক কুণ্ড গ্রাম বৃহৎ মূলার জন্য বিখ্যাত, এখানকার মূলা ৩।৪ হাত লম্বা ও ওজনে ১০।১২ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নানা স্থানে এই মূলা রপ্তানী হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। একদা ভোলা এই রায় বাবুদের আবাসে গাওনা করিতে উপস্থিত হয়; সেই সময় তাহার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী জগা বেণেও তথায় গাওনা করিতে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করে। জগা বা জগন্নাথ বড় খোসামোদে লোক ছিল, সে এক গানে "জাড়াগ্রামটা ঠিক গোলক বৃন্দাবন, আর রায় বাবুরা যেন পূর্ণব্রহ্ম "শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপে বর্ণন করে। কিন্তু স্বাধীন-চেতা ভোলার নিকট ইহা বড়ই অসহ্য বোধ হয়। তাই সে প্রচুর পুরস্কারের আশা,—ধনরত্ন লাভের সম্ভাবনা বিস্মৃত হইয়া সেই লোক-সমুদ্র মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বাবুদের সাক্ষাতেই গাহিল,—

কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
এখানে বামুণ রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন!!
কেমন ক'রে বললি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
জগা! কোথারে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথারে তোর রাধাকুণ্ড;
সাম্‌নে আছে মাণিককুণ্ড,
করগে মূলা দরশন!
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
এখানে বামুণ রাজা, চাষা প্রজা,

* ভারতী, ১৩০৪ বৈশাখ।

চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন !!
'কৃষ্ণচন্দ্র' কি সহজ কথা ? কৃষ্ণ বলি কারে ?
সংসার-সাগরে যিনি (জগা !) তরাইতে পারে ॥
বাবুতো বাবু লালা বাবু,
কোল্‌কাতাতে বাড়ী।
বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না,
সে ব্যাটাতো হাড়ী !!
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়,
মুকুতের মধু অলি।
মাপ করগো রায় বাবু,
দুটো সত্যি কথা বলি ॥
জগাবেণে খোসামুদে,
অধিক বল্‌বো কি ?
তপ্তভাতে বেগুণ পোড়া,
পান্তাভাতে ঘি ॥

কেমন চতুরতার সহিত গুহ্য কথা প্রকাশ করিল! 'এখানে বামুণ রাজা, চাষা প্রজা'র অর্থ—বাবুরা গ্রামের জমীদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষা প্রজা এবং তথায় বিস্তর বাঁশের ঝাড় আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, উক্ত বাবুরা অতিশয় কৃপণ ছিলেন, তন্নিমিত্ত ভোলা 'পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়' প্রয়োগ করিয়াছে। এবং ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, গাওনা করিতে দলবল সহ ভোলা বাবুদের আলয়ে উপনীত হইলে, দলের লোকদের আহারের নিমিত্ত যে 'সিধা' দেওয়া হইত, তাহাতে প্রায়ই লবণ থাকিত না,—বাবুরা বিনা লবণেই 'সিধা' পাঠাইতেন। এই ঘটনা হইতেই ভোলা—'বেগুণ পোড়ায় লবণ দেয় না' ইত্যাদি পদ গাহিয়াছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন, কবির লড়াইয়ে যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে, তাহা কবিওয়ালারা উপস্থিত মত আসরে দাঁড়াইয়া রচনা করিত। বাড়ী হইতে অবসর মত ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করিবার অবসর তাহাদের ঘটিয়া উঠিত না। ইহাতে রচনা অপকৃষ্ট হইবারই কথা। কবিওয়ালাদের ব্যবসায়ের এইরূপ রীতি না থাকিলে তাহাদের দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য অধিকতর উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাহারা 'কবি-লড়াই' সময়ে যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার জিনিষ নহে। আমরা উপরে যে গীতটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও উপস্থিত সময়ে আসরে মুখে মুখে রচিত হয়, কিন্তু তাহা 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি ? কবিওয়ালাদের ইহাই এক সবিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার বিষয়।

ভোলা যেমন অন্যের অযথা প্রশংসাবাদ করিতে পারিত না, বা তাহার সমক্ষে কেহ তদ্রূপ করিলে নীরবে সহ্য করিত না, তেমনি তাহাকে যদি তেমনি কেহ খোসামোদ বা প্রশংসা করিত, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকিত না। একদা কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস ও তাহার 'কবির লড়াই' আরম্ভ হয়। সংগ্রামে যজ্ঞেশ্বরের পরাজয় হইবার উপক্রম হইলে, সে লড়াই বন্ধ করিবার আশায় ভোলার খোসামোদ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং একটী গীতে তাহাকে আলাভোলা সদাশিব মহাদেবের (ভোলানাথের) সহিত তুলনা করে, কিন্তু উচিত বক্তা, সুরসিক ভোলা তদ্দণ্ডেই তাহার পাল্‌টা গায়,—

আমি সে ভোলা নই, আমি সে
ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা
বাগবাজারে রই ॥

শুনিতে পাওয়া যায়, ভোলা অন্য কবি-ওয়ালার সহিত লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আসরের মধ্যে একছড়া কলা এবং বস্ত্র খণ্ডে একটী টাকা বাধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। লড়াইয়ে যে জয়লাভ করিত, সে ঐ টাকা এবং যে পরাজিত হইত, তাহার ভাগ্যে ঐ মর্ত্তমান কদলী লাভ হইত। ভোলা নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয় লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তবে একদিনও যে পরাজয় স্বীকার করে নাই, তাহা বলা যায় না।

এইবার পাঠক মহোদয়গণকে আমরা ভোলার দলে গীত একটী সখী-সম্বাদ উপহার দিব।

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিত এত দিনের পর। (চিতেন)
অন্তর জুড়াও ওগো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতর নিরন্তর,
সেই চিকণ কালো হৃদে উদয় হলো,
এখন সুশীতল করগো অন্তর।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ,
উদয় হলে রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিব্‌লো রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল;
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ,
অন্তরের পূরাও সাধ,
অন্তর ক'রো না আর নীলকমল।
এ সময়ে পরশিতে বলোনা,
হয় পাছে অমঙ্গল।
এই করুন্, ঘুচুক শ্যাম-বিচ্ছেদ
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখি, কৃষ্ণ সুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার।
রাধে তোমার দুখ আর,
নাহি সহে গোপীকার,
করিলেন মাধব আজি বিরহানল বুঝি সুশীতল॥

এই গানটী অনেকের মতে ভোলা ময়রার রচিত, কিন্তু কোন কোন পুস্তকে গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ভোলার দলে গীত নিম্নলিখিত গীতটী সম্বন্ধেও ঐরূপ নানা মুনির নানা মত দেখা যায়।

একভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই;
পেয়েছ যে নূতন নারী,
এখন মন তারি ঠাঁই। (চিতেন।)
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ,
প্রাণ তোমার প্রেমামোদ হবে,
সে করিবে ক্রোধ,
দ্বেষাদ্বেষী দ্বন্দ্ব করে কি—দেশান্তরী করিবে?
বল বঁধুহে, কার কখন মন রাখিবে?
তোমার এক জ্বালা নয়,
দুদিক্ রাখা বল ইথে আর কিসে প্রাণ বাঁচিবে।
সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?
সবে তোমার একটী মন,
তায় করেছ প্রেমাধীন দুঠাঁয়ে দুজন;
কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ,
আমায় কতবার আর কাঁদাবে?

কেমন সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা! দুই স্থানে প্রেম করিয়া প্রত্যেক প্রণয়িনীর নিকটই ভালবাসা জানাইলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, কবি সেই স্বাভাবিক অবস্থাই তুলিকা-সম্পাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একবার দুর্গোৎসবের সময় শোভাবাজারের রাজবাটীর পূজা উপলক্ষ করিয়া ভোলা গান বাঁধে,—

লাগ্‌লো ধূম, গুড়ুম গুড়ুম,
শোভাবাজারের পূজা।

বড় ব্যয় (লোকে কয়)
কর্ক্কে শোভাবাজারের রাজা॥

এই দুই ছত্রেও কবি একটু শ্লেষ করিতে ছাড়েন নাই। পূজায় 'বড় ব্যয়' হইবে, তাহা কিন্তু কেবল 'লোকেই কয়', তিনি নিজে তাহার কোন পরিচয় পান নাই।

'কবি-গুরু' হরুঠাকুরের দলে ভোলা প্রথমতঃ শিক্ষানবিশি করে। পরে নিজে পৃথক্ দল করিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত হরুঠাকুর, ভোলাকে নূতন নূতন সুরের নূতন নূতন গান যোগাইতেন; ইহাতে হরুর অপরাপর শিষ্যেরা ভোলার উপর বড়ই চটিয়া যায়। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত সাতুরায়, ভোলার দলে অবৈতনিক গীত রচক ছিলেন এবং গদাধর, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণ ইহার দলে স্থায়ী বেতনভোগী বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। এই সকল প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের রচিত সংগীতাবলী গাওনা করিয়াই ভোলা দেশ বিদেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করে। বিরহ, সখীসম্বাদ, মান, মাথুর প্রভৃতি গীতাবলী পূর্ব্বোক্ত বাঁধনদারগণ ইহাকে যোগাইতেন, আর কবি-লড়ায়ের গানগুলির অধিকাংশই ভোলা উপস্থিত মত আসরে রচনা করিয়াছে। 'বিরহমিলন" 'বিরহ-বিষাদ' প্রভৃতি কয়েকটী কবির পালাও তাহার রচিত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন

ভোলা বেশ দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন; ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়। মৃত্যু সময়ে তাহার কোন সন্তান সন্ততি থাকার কথা শুনা যায় না।

"ভোলা কবিওয়ালা যে একজন সুরসিক পুরুষ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। সঙ্গীত বিদ্যা কখনও ভাল করিয়া ভোলা শিখে নাই বটে, কিন্তু নূতন গানের রাগ রাগিণী একবার শুনিলেই তাহা এমন সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া লইত যে অভ্যস্ত গায়কেরা চমৎকৃত হইয়া যাইত। কথায় কথায় গান বাঁধা, ছড়া তৈয়ার করা, ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভোলার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পাঁচজন লোক একত্রে পাইলে তাহাদিগকে না হাসাইয়া ভোলা যাইত না; প্রবাদ আছে, "ভোলার মুখে সদাই হাসি"। বাস্তবিক, বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যকালে ভোলা ময়রা এদেশে একজন গণ্য মান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বারোয়াড়ি, পূজার বাটী, বিবাহ ইত্যাদি স্থানে ভোলার দল না আসিলে সে স্থানের "চয়ণ" থাকিত না! পল্লীগ্রামের রাখালের মুখে, বাবুদের কুলবধূর মুখে, পাঠশালার ছেলেদের মুখে এবং বাজারে ও দোকানে এক সময়ে ভোলা ময়রার কবি ও ছড়া

যাই　ভোলার মৃত্যুর পরে অনেক কবিওয়ালার অভ্যুদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বাগবাজারের ভোলা ময়রাকে কেহই জিতিতে পারে নাই। বাঙ্গালা দেশে এখন আর "কবির লড়াই" অধিক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ভোলা ময়রার যে একটী সুদৃঢ় আসন আছে, ইহাতে সন্দেহ কি?" *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* ভারতী, ১৩১৪ সাল।

# কাঁদিয়া কি ফল?

( ১ )

আর কাঁদিয়া হবে কিবা বল?
কাঁদিয়া ফুলিল আঁখি, আর কি রহিল বাকী,
চরণে লুটায়ে এত হ'ল কিবা ফল?
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারে, কেঁদে কেঁদে দ্বারে দ্বারে
করিলে মিনতি এত কে শুনিল বল?
পড়িয়া শার্দ্দূল ফাঁদে, মৃগশিশু যদি কাঁদে,
পায় কি সে পরিত্রাণ বিনা আত্মবল?
হ'লে এত অপদস্থ, না ছাড়িলে এ মনস্থ,
দাসত্বে নরত্ব লুপ্ত আত্ম-জ্ঞান-বল!
ভুলেছিস আত্মমান, না করিস হেয় জ্ঞান,
আকণ্ঠ যাচিতে তাই—যাচকের দল!
পাষাণ স্থিরাংশ যাহা, কাঁদিলে গলে কি তাহা,
"পাষাণে নাস্তি কর্দ্দম" ঢাল যত জল!
পাষাণে পাষাণৌষধি জানিবে কেবল!

( ২ )

কাঁদিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় কি কখন?
কাঁদিয়া হইলে ফল, কাঁদিতাম অবিরল,
"ইপ্সিলান্তী"(১) রিয়েন্টসী(২) কেঁদেছে যেমন!
কাঁদ কেন বৃথা তবে, কাঁদিলে কি ফল হবে,
যতদিন না করিবে শক্তি উপার্জ্জন,
প্রকৃতি নিয়ম যাহা, নয় ব্যতিক্রম তাহা,
প্রকৃতির চিররীতি শক্তির পোষণ!
কি ফল হইবে তবে করিলে ক্রন্দন!

( ৩ )

বাহুবলে কার্য্যসিদ্ধি যদি না হইত?
হেষ্টিংসে হেরোল্ডে'নাশি,'ডিউক'কভু কি আসি
বৃটনের রাজপাটে বসিতে পারিত?
কভু কি "ব্যারন" গণে, মাথা কুটী প্রাণপণে,
পার্লিমেণ্ট মহাসভা স্থাপিতে পারিত?
'চার্লসের' কাটি শির, 'ক্রমোয়েল' মহাবীর,
স্বেচ্ছাচারে শ্বেতদ্বীপ শাসিতে পারিত?
মার্কিনের অভ্যুদয়, ফ্রান্সে সাম্য ভাবোদয়,
লুইয়ের বংশোচ্ছেদ কভু কি হইত?
'গিরীশের' অন্ধকার ঘুচিত কি কভু আর,
পিতদ্বীপে নবসূর্য্য উজলি উদিত?
বাহুবলে কার্য্যসিদ্ধি যদি না হইত?

( ৪ )

প্রাণপণে কর সবে শক্তি উপার্জ্জন।
বাহুতে হইলে বল, নতশিরে ধরাতল
সচন্দন পুষ্পভরে পূজিবে চরণ!
মেদিনী হইবে বশ, চৌদিক বহিবে যশ,
শ্মশান হইবে দিব্য দেব-নিকেতন!
যখন চাহিবে যাহা, অকাতরে দিবে তাহা,
বসুধা কামদারূপে থাকি অনুক্ষণ!
কুবের ভাণ্ডার করে, বীণাপ্লুত মধুস্বরে,
রমাবাণী একাধারে তোষিবে দু'জন!
ধরা হবে পরিণত অদ্ভুত স্বপন!

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর ইনি একজন গ্রীশদেশীয় বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক।

(২) ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন ইটালিক প্রিয় বিখ্যাত পুরুষ।

# জগন্নাথদেবের মন্দির। (৩)

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ভারতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অত্রত্য ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর যে সেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ সরোবর, ইহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণে এই ক্ষেত্রের উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও, মহাভারত, স্মৃতি ও পুরাণ গুলিতে ইহার নাম উল্লেখ হওয়ায় ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল, খণ্ডগিরি ধবলগিরি প্রভৃতি বৌদ্ধ কীর্ত্তিচয় অদ্যাবধি তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাতে বোধ হয়, সেই সময় জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই স্থানে প্রখ্যাত জাতিভেদাভাব বৌদ্ধমতের দ্বিতীয় পোষক যুক্তি। তৃতীয় যুক্তি পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ যে সূতিকা যন্ত্রের পূজা করিতেন, তদনুসারে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। উক্ত যন্ত্রের প্রতিকৃতি ডাক্তার ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "Antiquities of Orissa" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কাল্পনিক যুক্তিও প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার পর, মন্দির হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য বলভদ্র, সুভদ্রাদি মূর্ত্তি গঠন করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তির সহিত যোগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মৌলিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে গেলে ইহা বৌদ্ধগণের উপাসনা স্থান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই কপোল-কল্পিত যুক্তি কোমল বালকদিগের নিকট অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না; বরং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু এ যুক্তি অসার বলিয়া আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। প্রমাণ অভাবে কেবল যুক্তিই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে; কিন্তু প্রমাণ বিদ্যমান স্থলে কেবল যুক্তিই একমাত্র আশ্রয় হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে দেখা যাউক্, এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি আছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবাসী সমস্ত হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, বেদব্যাস বুদ্ধদেবের বহুদিন পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। একজন অষ্টাদশ পুরাণের রচক হইতে পারে না, অতএব কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিয়া ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন; কারণ এই গ্রন্থগুলির ভাষা ও বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যাইবে যে, এ সমস্ত পুরাণগুলি নূতন। ইহাদিগের সমস্ত শিক্ষিত শিরোমণিগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও এক সহস্র বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু এই অনুমানও যুক্তিযুক্ত নহে। যাহা হউক্, Skakespeare বহুসংখ্যক নাটকের রচয়িতা এবং ২৭৪ খান গ্রন্থ পূজপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এবং ১০৯ খান গ্রন্থ শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যের লেখনী নিঃসৃত বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। তবে ঐশী বা অনন্যসাধারণ শক্তির নিকট কোনও বিষয় অসম্ভাব্য নহে। সেই হেতু ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, ইহা কদাচ বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। অতএব ব্যাস-বিরচিত, পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থগুলিতে এই ক্ষেত্রের উল্লেখ হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি একমাত্র স্থির করেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে

মহাভারতের সৃষ্টি এবং পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তবেই প্রিয় পাঠক-বৃন্দ, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্যাস বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এই পুস্তকগুলি লিখিয়াছিলেন। সেই হেতু উল্লিখিত বিষয়-গুলি উক্ত সময়ে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণাদির যে-যে সময় নির্দ্দেশ করা হই-য়াছে, সেই সেই বিষয়ে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন নাই। তবে সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে কি? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এক সহস্রের মধ্যে দশ পঞ্চাশবর্ষ প্রভেদ। কিন্তু সহস্র বর্ষের প্রভেদ নহে। তবে সে গ্রন্থ বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়া কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? এ আপত্তি অসঙ্গত বোধ হয় না, কারণ প্রশস্ত জ্ঞান-সম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে এতাদৃশ মত-ভেদ দৃষ্ট হওয়া স্থলে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগের মত যে ভ্রমাত্মক না হইবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং যাঁহাদের ভ্রম পরস্পর মধ্যে লক্ষিত হয়, তাঁহা-দের এক সহস্র বৎসরে যে ভ্রম হইবে না, ইহা বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন যে, কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যের বিষয় বলেন যে, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই দুই সময়ের মধ্যে সহস্র বৎস-রের অধিক প্রভেদ নাই কি? অধিকন্তু ভারতে পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অভাব নাই। যদি বেদব্যাসের নামে উৎসর্গ করিলে গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়, তবে অষ্টা-দশ পুরাণ ভিন্ন অন্যান্য পুরাণগুলি কেন কেহ তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন? এ কারণ বেদব্যাস যে অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, এই প্রচলিত জনশ্রুতি অমূলক নহে।

৮ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিকে যে কেহ কেহ বুদ্ধদিগের স্তিকা-মন্ত্র-মূলক বলিয়া থাকেন, ইহা আমাদিগের সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে ইহাঁদের বহু-দিন পূর্ব্ব হইতে (অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে) মন্ত্র পূজা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদিগের মতে তন্ত্র মত প্রবেশ করা, বুদ্ধদেবের জন্মের পরে বলিতে হইবে। ভারত যে অতি প্রাচীন ও নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত দেশ, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে বুদ্ধ-দেবের জন্মের পূর্ব্বে যে ভাস্কর বিদ্যা প্রচলিত ছিল না, ইহা বোধ হয়, কেহ স্বীকার করি-বেন না। বুদ্ধ-গয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। সেস্থানে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, সে সকল শিল্প-বিদ্যার পরা-কাষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। স্তিকা-মন্ত্র-নির্ম্মিত মূর্ত্তির অর্চনা কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তবে এরূপ মতকে কাল্পনিক মত না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? বরং ভারতের প্রাচীন পিঠ সকলে শিল্প-বিদ্যার শৈশবস্থার পরিচায়ক কর চরণ-বিহীন ভূরি ভূরি দারুময় ও প্রস্তর-ময় মূর্ত্তি দেখা যায়। তবে জগন্নাথদেব যে স্তিকা-মন্ত্রের অনুকরণ মূর্ত্তি, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় কি? ইহাকে আমরা মধুর কল্পনা-বিলাস বিনা আর কি বলিতে পারি? এক্ষণে হিন্দুরা কাহার অবলম্বনে এ মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, তাহার বিচার হউক। বেদে ওঁকার মূল-মন্ত্রকে দেবতারূপে আবাহন করিয়াছিলেন। ওঁকার ব্রহ্ম। ভাষাকর্ত্তারা উহাকে, আকার উকার-মকার যোগ দ্বারা, যথাক্রমে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই ওঁকারকে যন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ

করিয়া হিন্দুরা অর্চ্চনা করেন। ইহাও বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়। বেদোক্ত যজ্ঞ-বিদ্যা হইতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভব। তাহা না হইলে কুণ্ড-মণ্ডপশালার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইত। সেই বিদ্যায় যন্ত্র সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ

# অগ্নিকন্যা।

মনে করি, এত প্রেম ভেটিব কাহায়,
শাসিয়া রাখিতে নারি আপন হিয়ায়।
কে বুঝিবে আদি অন্ত! রসিক সুজনে
আমার প্রেমের মান রাখিবে গোপনে!

রসে পূরিয়াছে বিশ্ব! কে হেন রসিক
ডুবিয়া করিবে পান আনন্দে নির্ভীক!
পিপাসা মিটাতে চাও গোষ্পদের জলে,
ভীত হও, শুনি সুধা-সাগর কল্লোলে!

কে করিবে প্রেমযাগ, দিয়ে আত্মবলি
—অনলে পূরিবে নিজ অভিমান ঝুলি!
অতন্দ্র সাগ্নিক হয়ে রবে অপেক্ষিয়া
উঠিব মোহিনী বেশে মূরতি ধরিয়া!

সুধা-নিস্যন্দিনী, রূপে অনল জমাট
খুলিব এ চিররুদ্ধ বিশ্বের কবাট!
কোটীরূপে বিশ্ব হতে হইয়া বাহির
বরমাল্যে সাজাইব প্রিয়তম শির।

সাগরে ভূধরে মেঘে আকাশে অনিলে,
বসুধার শ্যামাঙ্গনে বিস্তৃত নিখিলে,
কোটী কোটীরূপ বর্ণিব কেবল
প্রিয়তমে ভেটিবারে সৌন্দর্য্যে উছল।

হাসিব বিদ্যুৎমাঝে ছুটিব ঝঞ্ঝায়,
কাঁদিব বাদল ধারে উতলা বর্ষায়,
উত্তাল সমুদ্র-মাঝে উর্ম্মি শিরে শিরে
নাচিব রঙ্গিল নৃত্যে তারি প্রীতি তরে।

অলস মেঘের পরে করিব শয়ন;
ফুলে ফুলে ফুলশয্যা করিব রচন,
আকাশের ঘননীল অন্তর ভেদিয়া
প্রিয়তমে গুপ্ত বেশ দিব দেখাইয়া।

পিরীতির ছলাকলা কত মত আছে—
চিরদিন দূরে দূরে, রব কাছে কাছে;
নিশিদিন, নিশিদিন তাহার আমার
জাগ্রত বিশ্বের মাঝে গুপ্ত অভিসার।

## সুন্দরী সকাশে।

বহিছে হৃদয়ে মম প্রেমের জোয়ার!
সুন্দরী এসেছে আজি নিকটে আমার;
আসিয়াছে করিবারে আত্ম-সমর্পণ,
এতকাল করিয়াছি যার অন্বেষণ।

মুখে তার সোণা হাসি নেত্র প্রীতিময়;
হৃদয়ে পূর্ণতা শুধু; সঙ্কেত অভয়;
আসিয়াছে রিণিঝিণি অলস বরণা
আপন সৌন্দর্য্য ভারে সম্পূর্ণ যৌবনা।

আসিয়াছে ভাবে রসে ভুবনমোহিনী,
কটাক্ষে কাঙ্গাল যার হয়ে গেছে ধনী!
সংসার যাহার হাতে ভুঞ্জিয়ে গরল
উল্লাসে ভাবিবে উহা অমৃত শীতল।

মুখে তার সেই হাসি, বিষাদের মত!
হৃদয়ে পূর্ণতা সেও অশ্রুভরা মত!
উন্মত্ত হৃদয় মম পাইলে যাহায়
শত বাহু পসারিয়া আলিঙ্গিতে চায়!

মনে হয় থাকি শুধু ঘুমাইয়া থাকি,
ওই হৃদয়েতে মুখ লুকাইয়া রাখি ;
শুনি শুধু আঁখি মুদি আজ নিরন্তর
বিশ্বের উজ্জ্বল অঙ্গে পূর্ণতার স্বর।

যেই কাছে এসেছিল অতর্কিত পায়,
বলেদিল গন্ধামোদে পুলকিত বায় ;
চকিত রোমাঞ্চ আসি কহিল কেবল,
সেজন এসেছে যাহে পরাণ পাগল।

হে বঁধু এ ভুবনের হিয়া-বিলাসিনি
মধুময় রূপবান পরাণ-ভাবিনি !
এ হৃদয় দিব কিগো চরণে তোমার
অথবা ধরিব বক্ষে উপায়ন ভার !

কিবা বিধি, কিবা তার ব্যাভার বিধান,
তৃষিত যে পায় যদি পানীয় সন্ধান !
তাপতপ্ত মীন দেখে সলিল অতল,
অলি দেখে বিকশিত পূর্ণ শতদল !

এত রূপ এত সুখ এত পূর্ণতায়
আজি এ পরাণ শুধু মরিবারে চায়,
পরম নিবৃত্তি আজি, বিশ্ব ভরপুর ;
মরণ হয়েছে আজি জীবন মধুর।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

# নব জাগরণ

নিদ্রার পর জাগরণ, জাগরণের পর নিদ্রা। দিবসের প্রখর আলোক এবং কর্ম্ম-কোলাহলের পরে রাত্রির আঁধার এবং গভীর নিষ্টব্ধতা, শীতের জড়তার পরে বসন্তের নব স্ফূর্ত্তি ও শ্যামলা মূর্ত্তি। তৎপরে নিদাঘের রুদ্রদীপ্ত ভীষণ দৃশ্য ও বর্ষার জল-কল্লোল-মুখর বারিপাতসিক্তা মেঘদামকিরীটিনী-গম্ভীরা প্রকৃতির শ্যামস্নিগ্ধ ছবি ভাসিয়া উঠে। অনন্ত গগনের ঘননালিমা এবং সরসীর নানা জাতীয় পদ্মের অপূর্ব্ব সুষমা লইয়া মনোহর শরৎকাল উপস্থিত হয় ; শরতের পরে ধীরে ধীরে হেমন্তানিল প্রবাহিত হয়। প্রকৃতি সহাস আস্য ক্রমে যেন মলিন হইয়া আইসে। অতঃপর নিরানন্দ শীতকাল সমাগমে প্রকৃতি যেন নীরব নিরানন্দ এবং দীনা মলিনা মূর্ত্তি ধারণ করে। পুষ্পোদ্যান পুষ্পশূন্য, বনস্থলী নীরব, বৃক্ষলতা শোভাহীনা, চন্দ্রমা কুয়াসাবৃত। শীতের শৈত্যাধিক্য এবং নিরানন্দ ভাব দেখিয়া তখন মনে হয় যে, এ নিদারুণ শীত কাল বুঝি আর গত হয় না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে শীতের জড়তা ভেদিয়া, বসন্ত তাহার সঞ্জীবনী নিশ্বাসে সমস্ত প্রকৃতিকে সঞ্জীবিত এবং নব সৌন্দর্য্যের বর্ণরাগে স্বভাবকে রঞ্জিত করিয়া দেয়। বৃক্ষলতায়, পুষ্পপাতায় ললিত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। ভূতলে নব দূর্ব্বাদলে কি অমল তরল শ্যামল সুষমা প্রকাশিত হয় ; নভোনীলিমায় তারকার কি মধুর স্নিগ্ধ ছবি বিভাসিত হয়। কাননে উদ্যানে, ফুল্লফুলদামে, বিহঙ্গের কণ্ঠে মধুর কূজনের অব্যক্ত সুরতানে কি অমৃত সৌন্দর্য্য-রসের পুণ্য-প্রবাহ প্রবাহিত হয়! শীতের জড়তা স্থলে সজীবতা, নিরানন্দ স্থলে পরমানন্দ, দৈন্য নীরবতা স্থলে ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ কোলাহল স্থান লাভ করে। প্রকৃতি যেমন জড় জগতে পর্য্যায় ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দৃশ্যের এবং ভাবের সমাবেশ করে ; তেমনি, মানবের জাতীয় জীবনেও এক এক সময়ে এক এক ভাবের স্রোত প্রবাহিত ও দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। নদীর একপার ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অনবরত জল গর্ভে

বিলীন হইতেছে; আর অন্য পার ক্রমাগত জমাট বাঁধিয়া চর জমিতেছে। চর ক্রমশঃ গ্রাম ও পল্লীতে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল দিগন্ত-প্রসারী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনাদের অক্ষয় রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। নদী বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নেও আর কেহ চিন্তা করে নাই যে, নদীর স্রোত গতি ফিরাইয়া এই সমস্ত প্রাচীন গ্রাম পল্লী জলসাৎ করিতে পারে। কিন্তু মানুষ চিন্তা করুক বা না করুক, সহসা একদিন কি এক জ্ঞানাতীত কারণে নদীর স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল। দেখিতে না দেখিতেই গ্রাম পল্লী এবং তরুবল্লী ভাঙ্গিয়া প্রাচীন জনপদ জলপ্রবাহে ডুবাইয়া দিল। আবার ভিন্ন পারে ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া চর পড়িয়া গেল। তেমনি, মানবের জাতীয় জীবন-প্রবাহে কখন্ কোন্ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত এবং কোন্ শক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনন্তলীলা ও অনন্ত শক্তিময় পরমেশ্বরের লীলা ও শক্তি বুঝিয়া উঠা মানবের সাধ্য নহে। তাই মানুষ ভাবে এক, আর ঘটে আর কিছু। ধন্য সেই বিশ্বেশ্বরের শক্তি! ধন্য তাঁহার মহিমা!!

ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে একদিন শান্ত-তিমির-পঠল দূরীভূত করিয়া শতসূর্য্যের ময়ূখ মালায় যে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া নব জীবনের মন্দাকিনীধারায় আরবের ঊষর মরুভূমি প্রসিক্ত ও গোলাপকুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন; যাঁহার সঞ্জীবনী বাণীতে বহুধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অজ্ঞানান্ধ কোটি কোটি নরনারী, নব জীবনের নবীন উদ্দীপনায় এবং নূতন আশার তরুণ অরুণ রাগ-প্রদীপ্ত বদনে এক মহা একতাসূত্রে আবদ্ধ হওত এক অপরাজেয় মহাশক্তির উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই মহাশক্তির উৎসের অমৃত প্রবাহে জগতে নব সভ্যতা নবজীবন এবং নবপ্রতিভা ষোল-কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সহস্র বৎসর এই শক্তি-উৎসের বিমল ধারায়, সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের তরু পল্লবিত, এবং শিল্প-ললিত-কলা লতিকাদাম অপূর্ব্ব লালিত্য এবং মোহন সৌন্দর্য্য-ভঙ্গিমায় সুসৌভাগ্যের প্রসূনপুঞ্জে শোভিত হইয়াছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে সে মহাশক্তির উৎস প্রবাহশূন্য হইয়া পড়িল। জলরাশি নিতান্ত কমিয়া গেল। অনেকে আলোচনা করিতে লাগিল, এইবারে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভস্ম হইয়া যাইবে। শত্রুকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ইস্‌লাম-জগৎ আপনাদের আসন্ন ধ্বংসের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে আতঙ্কিত এবং মূর্চ্ছিত-প্রায় হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে লীলাময়ের কি এক অপূর্ব্ব লীলা খেলা ব্যক্ত হইল। বহু শত বৎসরের অজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত ক্ষুদ্র জাপান, সহসা কোথা হইতে কি এক স্বর্গীয় দীপ্তি ললাটে মাখিয়া, নব পৌরুষ-দর্পে বিশ্ব-জগতকে চমকিত এবং বলদৃপ্ত ও অহঙ্কৃত ইউরোপকে কম্পান্বিত করিয়া জগতের বিস্ময় কোলাহলের মধ্যে আপনার বালারুণ-খচিত বিজয়ী পতাকা আকাশে উড়াইয়া দিল। সমস্ত প্রাচ্য জগতের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। নব আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নবজীবনের প্রথম উচ্ছ্বাস এশিয়ার পর্ব্বত শৃঙ্গ এবং নিবিড় অরণ্য এবং নীরস মরুভূমি প্লাবিত করিয়া আফ্রিকাকে সিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইল। সে প্লাবনের উচ্চণ্ড তরঙ্গাঘাতে গিরিবন গ্রাম পল্লী কাঁপিয়া উঠিল, শৈলে শৈলে, দিক-দিগন্তে তরঙ্গভঙ্গের ভৈরব ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমস্ত জগতে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল।

বল-গৌরবদৃপ্ত আভিজাত্যাভিমানী ইউরোপ, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রাচ্য জগতের নব জাগরণ দর্শনে সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। ইউরোপের এই ভীতি-সঞ্চারে প্রাচ্যবাসী. আরও আশান্বিত হইয়া পড়িল। যে ইউরোপের লোক-চমকিত সৌভাগ্য, বিজ্ঞান-কৌশল, ও রণোন্মাদ দর্শনে প্রাচ্য জগৎ হতবুদ্ধি এবং মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সহসা সেই ইউরোপকে এশিয়ার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য জাপানের অভ্যুত্থানে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইতে দেখিয়া তাহার অতিমানুষিক শক্তিতে সন্দিগ্ধ এবং স্বশক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে ভীতির শৃঙ্খল ছিন্ন এবং আত্ম বিশ্বাসের অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায়, সমগ্র প্রাচ্য জগতে এক মহা অভ্যুত্থানের তুমুল কোলাহল ও সোৎসাহ উদ্যম পরিদৃষ্ট হইতেছে!

বৌদ্ধ জাপের অদ্ভুত কৃতিত্বে এবং অভাবনীয় উন্নতি সন্দর্শনে চির-পৌরুষ-সম্পন্ন মুসলমান,আলস্য,অবসাদ এবং মোহ জড়তা পরিহার পূর্ব্বক আপনাদের অতীত মহিমার রাজ-সিংহাসন এবং অতুল গৌরবের বিজয় কেতন পুনরুড্ডীয়ন মানসে আকুল প্রাণে জাতীয় জীবনের সুষুপ্তিতে মহাসঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রাচীন মন্দিরের অন্ধ কক্ষ হইতে পুরাতন পৃথিবীর মানচিত্রের সহিত আধুনিক জগতের মানচিত্র মিলাইয়া দেখিয়া প্রাণের গভীর তমস্তর হইতে যন্ত্রণার হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। হায়! এস্‌লাম্, হায়! মুসলমান? লক্ষ কোটি কোহিনূর অপেক্ষা মূল্যবান, পূর্ব্ব পুরুষদিগের হৃদয় রক্তে উপার্জ্জিত এবং বিপুল শ্রম ও অবিরত সাধনার সৌভাগ্য-চন্দ্রমার শুভ্র-কৌমুদী-বিধৌত, ললিত কলার মন্দারদাম শোভিত, সুখ শান্তির-মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত মর্ত্ত্যের অমরাবতী কোথায় সেই স্পেন পর্ত্তুগীজ? কোথায় সেই আল্‌জিরিয়া, তুলিন ও মিসর? কোথায় আজ সেই অতি সাধের, অতি যত্নের বিরাট ও বিশাল ভারতবর্ষ? আজি সেই মোগল কীর্ত্তি ঐস্লামিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বীর প্রতাপ গর্ব্বিত তুরাণ কোথায়? আজ কোথায় সেই মুসলমানের আশাপ্রতাপ-সম্পন্ন সাগর-মন্থনকারী রণতরী-শ্রেণী? ভারত ও প্রশান্ত সাগরের বোর্ণিয়ো, জাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপাবলীতে কাহারা মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে! হায়! আজ কোথায় সেই মুসলমানের সুযশঃ গৌরব এবং মর্য্যাদাবৈভব? কাহাদের চরণ তলে ইসলামের মরকত আসন দলিত হইতেছে? জগৎ-বিজয়ী মুসলমানের এ হেন দুর্দ্দশা কে ঘটাইল? ধরিত্রীর ভাগ্যবিধাতার বংশধরগণ আজ কাহার দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় পরিচালিত হইতেছে? মুসলমান নেত্রোন্মীলন করিয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত বিষয় বুঝিয়া উঠিল। বুঝিল তাহার কর্ত্তব্য কি? বুঝিয়াছে মুসলমান, তাহার অধঃপতনের কারণ কি? বুঝিতে পারিয়াছে, প্রভাত সূর্য্য নীলকাশ রঙ্গিয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

পাঠক, একবার প্রাচীমূলে, ভাবিয়া দেখুন, কি নবশক্তি মহাসূর্য্য সমস্ত জগতকে নবজীবনের রক্তকিরণে রঙ্গিয়া দিতেছে। আজ সমস্ত এশিয়া আফ্রিকায় এক এক নব জীবনের স্বাস্থ্যশক্তিপ্রদ নব সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে।

অহিফেন মত্ত কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য বিরাট দেহ চান সহসা অহিফেনের গুলি ফেলিয়া বন্দুকে গুলি পূরিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিরস্থ দীর্ঘ বেণীর পরিমার্জ্জন ত্যাগ করিয়া জীর্ণ তরবারী শাণিত করিতেছে। ক্ষুদ্র শ্যাম

রণতরী নির্ম্মাণে এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছে।

আপনাকে মিসর তাহার মরকত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে শক্তিসাধনায় লিপ্ত হইয়াছে। পারশ্য, তাহার বিলাস-বিশ্রাম-শয্যার প্রাচীন কবিদিগের প্রেম গাথার আলোচনা এবং বন্দনা বন্ধ করিয়া প্রজাসভা গঠনে এবং শক্তি অর্জ্জনে একান্ত নিরত হইয়াছে। ক্ষুদ্র আফগান, তাহার ক্ষুদ্র শৈলব্যূহের ভিতরে সুপক্ক আঙ্গুরের রস সেবন করিতে করিতে সহসা চকিত এবং পরমুহূর্ত্তে সতর্ক হইয়া এক মহা উত্থানের কঠোর সাধনায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছে। পাঠানের পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি তাহাকে ভাবী এক মহা সৌভাগ্যশালী মহারাজ্য এবং মহাশক্তির কল্পনায় মাতাইয়া তুলিতেছে।

জগতের প্রাচীন সভ্যতার আদিম সূতিকা-ক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতের পতিত এবং দলিত জীবনেও নব জীবনের নব স্ফূর্ত্তির স্ফুরণ দেখা দিয়াছে। সহস্র বৎসরের আর্য্যত্ব-ভ্রষ্ট,জাতীয়-জীবন-শূন্য, শত কুসংস্কারে জড়িত জীর্ণ হিন্দুজাতি,আজি জীর্ণ কুটীর হইতে নব জীবনের আহ্বান-বাণীতে এক পতাকার তলে আসিয়া সমবেত হইতেছে। বাঙ্গালার গঙ্গাতীর এবং তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ উদ্যান, শৈলমালা, বনরাজি, পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ-তট এবং গঙ্গাযমুনার অববাহিকা, গোদাবরী তাপ্তী তীরভূমে, বঙ্গসাগর এবং আরব সাগরের সৈকত হইতে নব আশার মহামন্ত্রবাণীর "বন্দেমাতরম্ ধ্বনি" দিঙ্মণ্ডল এবং আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে মুখরিত এবং কম্পান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী, তেজস্বী পাঞ্জাবী, রণোন্মত্ত শিখ, বলদর্পিত জাঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মারাঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় কি এক স্বর্গীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র ভারতে নব জীবনের চঞ্চল তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছে। ভাগ্যাকাশচ্যুত পদদলিত ভারতীয় মুসলমানও নব প্রতিভায় জাগিয়া উঠিয়াছে। কাপুরুষ ও অক্ষম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হিন্দু যদি নূতন আশায় নবউদ্দীপনায় মহাশক্তি সাধনায় প্রমত্ত হইতে পারে; তবে সহসা পতিত এবং নিদ্রিত মুসলমান কি আর জাগিতে পারে না? ফলতঃ মুসলমানও তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ ও আধুনিক ইস্‌লাম-জগতের চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া আশায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া আঁখি মুছিয়া উঠিতেছে। নব্য-যুবকদিগের রাজনৈতিক চিন্তায়, মুসলমান জগতের মহা অভ্যুত্থানে, জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের মস্তক সৌভাগ্যের দীপ্ত কিরীটে সুশোভিত করিবার আয়োজন হইতেছে। সাম্য এবং ফুল্ল আশা, পারিজাতের মধুর সুরভি প্রাণ আকুলিত করিয়াছে।

নিশার প্রভাতে চতুর্দ্দিকে যেমন কলকণ্ঠ-বিহগকূজনে শব্দিত হইয়া উঠে, তেমনি, নব্যযুবকমণ্ডলীর বিজয় ধ্বনিতে ভারতবর্ষ আজ শব্দায়মানা হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভারতের অম রজনীর তমিস্র দূর করিয়া নব-ভানূদয়ের আর বিলম্ব নাই।

রাজপুরুষগণ নানাপ্রকার কূটকৌশলে ভেদনীতি এবং প্রলোভন-জালে এই নব জীবন স্রোত রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ——— পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি

"বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে,সে রোধে তার গতি।"

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বিসম্বাদ আমাদিগকে এই মঙ্গল রাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। বহুদিনের নির্ব্বাসিত বাহুবল এবং অস্ত্র চর্চ্চা ও

বীর্য্যানুরাগ নবভাবে উদ্দীপিত এবং আকুল কণ্ঠে আহুত হইতেছে। মহাজাতি সংগঠনে যে সমস্ত অন্তরায় এবং বাধা বিপত্তি আছে, সেই সমস্ত অন্তরায় ও বিঘ্ন বিদূরণ জন্যই নানা স্থানে সঙ্ঘর্ষ,মনোমালিন্য ও গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে'। ফলতঃ মহা একতা ও মহাজাতি সংগঠনেরই মহাসূচনা হইতেছে। তাই মুসলমান শিক্ষায়, হিন্দু সমাজ-সংস্কারে এবং ব্যায়াম চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসী হউক, কাপুরুষ ও ভীরুগণ সাহসী হউক—চরিত্রহীন চরিত্রবান হউক, শরীর বীর্য্যবান হউক, জাতিভেদ উৎপাটিত হউক, নিম্নশ্রেণী উন্নত ও সম্মান-স্পৃহ হউক। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত হইয়া মঙ্গলময় বিধাতা'র আশীর্ব্বাদ-বারিতে সৌভাগ্য সিংহাসনে অভিসিক্ত হইয়া এই নববর্ষে নবজাগরণের পতাকা উড়াইয়া দিক্। চতুর্দ্দিক হইতে বিজয়ধ্বনি সমুত্থিত হউক। আমিন্।

শ্রীসৈয়দ সিরাজী।

# জনসাধারণ শিক্ষা। *

শ্রমজীবিগণকে কি প্রণালীতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর এবং নূতন। সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। আমাদের দেশের সমাজ তন্ত্র, পূর্ব্বকালোপযোগী একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ব্যবসায়গুলি জাতিগত হওয়াতে,সকলেই একটা না একটা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিতে পারিত। ইংরেজ আমাদের সে সুবিধা নষ্ট করিয়া দিয়া, আমাদিগকে কেরাণী ও কৃষকে পরিণত করিয়াছে। তাই আমরা শিক্ষা বলিলেই কলম চালনার জন্য প্রস্তুত হওয়া বুঝিয়া থাকি। আবশ্যক দ্রব্য শিল্প উৎপন্নের ক্ষমতা ও ধর্ম্মানুমোদিত জীবন যাপন জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, আমরা তাহা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা এখন ইংরেজের স্কুল কলেজে পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াই শিক্ষা কার্য্য শেষ করিতে যত্নবান হইয়াছি। এ শিক্ষা আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে সক্ষম না করিয়া বরং অক্ষম করিয়া তুলে, এবং পরানুগ্রহজীবী করিয়া আমাদিগকে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতাহীন করিয়া দেয়। জাতিগত ব্যবসায় দ্বারা জীবনে যে একটা স্থিরতা ও শান্তি পাওয়া যায়, আমাদের পক্ষে সে শান্তি অনেকটা দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রতিযোগিতা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া যে সুখী হওয়া যায়, তাহাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে সাম্যবাদ যদিও যথেষ্ট প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি তদ্দেশবাসীদের সকলের জীবনেই এক আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ভাবনা ও সাধনা একই

* বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন সাধারণ-শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০১ পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ মহোদয় প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধের জন্য ৩০১ ও অন্য একটি প্রবন্ধে ২৫১ প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বস্তুমুখীন হইয়া সমাজকে অদম্য চেষ্টার স্রোতে ভাসাইয়া ফেলিয়াছে। কালে যে এই স্রোতে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রকে একবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া না ফেলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সাম্যবাদ ইউরোপের পরিবারে, সমাজে ও শাসন ব্যাপারে ঘোরতর আবর্ত্ত উত্থাপিত করিয়াছে এবং শ্রমজীবিগণ সর্ব্বত্রই আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার লাভ করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। আমরা নিজেদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও জাতিগত ব্যবসায় হারাইয়াছি, এবং তজ্জন্য দুঃখ করি সত্য, কিন্তু ইহাদের স্থল অধিকার করিয়া আমাদিগকে জীবনযুদ্ধে সক্ষম করিতে পারে, এমন কোন জিনিষ আমরা পায় নাই। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীস্থ ভদ্রলোকেরা সকলেই চাকরীজীবী হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হলচালনা দ্বারা কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া অদ্ধাশনে ও অনশনে অকালে শান্তিময়ীর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেছে। আমাদের সমাজতন্ত্রের এই অরাজকতা নিবারণ করিতে হইলে "স্বরাজ" স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কেন না "স্বরাজ" স্থাপন ভিন্ন অন্য উপায় দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট হইবে না। ক্ষণিক উপশম মাত্র হইতে পারে, রোগ সমূলে উৎপাটিত হইবে না। আমরা যতদিন আমাদের শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের অভাব অভিযোগ সমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকার হইবে না। অতএব আমরা অগ্য আমাদের শ্রমজীবী ভ্রাতাদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিব, তাহা কিছুতেই সন্তোষজনক হইবে না; কেবল পরাধীন ও অরাজক দেশের উপযোগী হইতে পারে, এই মাত্র আশা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি আমার দুই একটা কথা কার্য্যকরী হইয়া আমার নিরক্ষর শ্রমজীবী ভ্রাতাদের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বর্ত্তমান "স্বদেশী আন্দোলন" যে অন্ধকার প্রশ্নের কতকটা মীমাংসা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা স্বদেশী বস্তুজাতের আদর করিলে, আমাদের শিল্পিকুল স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবে ও করিতেছে। আমাদের এখন কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধুনাতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে ইউরোপীয় শিল্পিকুলের সমকক্ষ করিয়া তোলা, নতুবা তাহারা প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, বোধ হয় না। শিল্প ও কৃষি বিষয়ক নবউদ্ভাবিত প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষকের ও অর্থের প্রয়োজন। শ্রমজীবিগণ অসহায় ছিল বলিয়াই বৈদেশিকদের হস্তে তাহারা নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর শক্তিশালী লোক সমূহ তাহাদের পশ্চাতে থাকিলে তাহারা ইউরোপ বণিক্‌দের হস্তে শার্দ্দুলের নিকট ছাগশিশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত না। বিধাতার কৃপায় দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো পরিবর্ত্তিত হইবে। শ্রমজীবিগণ যে কেবল আমাদের শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের যন্ত্র হইবে, তাহা নহে। তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণ সমূহের অধিকারী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকের জীবনকেই সুখ ও সম্মানের আকর করিতে হইবে, কেন না, প্রত্যেকেই সমাজের অঙ্গ। সমাজের পূর্ণোন্নতি বাঞ্ছিত হইলে, সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকেই তাহার কার্য্যোপযোগী করিতে

হইবে ও সমস্তের সহিত তাহার যোগ রাখিয়া চলিতে হইবে। সমাজ-অঙ্গের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটী সবল ও সতেজ করিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া স্ব স্ব কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। সমাজের বা দেশের লোকের মধ্যে যে এরূপ একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যে জানিতেন না, তাহা নহে। তাঁহারা জানিতেন বলিয়াই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার মুখজাত, ক্ষত্রিয়কে বাহুজাত, বৈশ্যকে উরুজাত এবং শূদ্রকে পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মূর্খতাবশতঃই হউক বা দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক, আমরা তাঁহাদিগের এই শিক্ষার মূল ভুলিয়া সমাজে বৃথা গৌরবের সৃষ্টি করিয়া অশান্তি ও বিদ্বেষের প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইংরাজ বলিল, শূদ্রগণ অনার্য্য, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া মনে করিলাম, শূদ্রগণ অনার্য্য, অতএব আমাদের হইতে পৃথক্। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এরূপ নীচাশয় ও সংকীর্ণমনা ছিলেন না, তাঁহারা শূদ্রকে একসমাজ অঙ্গে স্থান দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেন নাই। ইংরাজ বরাবরই ভেদ ও কুটীল নীতির শিক্ষক ও প্রবর্ত্তক। সে পরকে আপনা করিতে জানে না; স্বার্থসিদ্ধির জন্য গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে সে সর্ব্বদাই সিদ্ধহস্ত, দেখা গিয়াছে। মণিপুরের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলে আবাল বৃদ্ধ-বনিতার নিকট ইংরাজের ধূর্ত্ততার পরিচয় দিতেছে।

## শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ।

কৃষি ও শিল্প বিষয়ক জ্ঞান, নানারূপ জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী বাণিজ্য ও অর্থ নীতি বিষয়ক স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, পৃথিবীর মোটামোটি ভৌগোলিক বিবরণ, ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান, কথিত ভাষা ও পাটীগণিতের সাহায্যে হিসাব, নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ, সম্প্রতি এই কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ দিলেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্ত নাই এবং শিক্ষারও শেষ নাই, তথাপি "স্বল্পশ্চ কালঃ বহু বেদিতব্যং" এই কথা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। পশুপালন, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলে উপকারের সম্ভাবনা আছে। পানীয় জলের অভাব ও তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

## শিক্ষা-প্রণালী।

আমাদের বর্ত্তমান কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীগুলি কেবল বারএয়ারি পূজার ন্যায় আমোদের সামগ্রী; একটু মার্জ্জিত রকমের বাই খেমটা নাচের ন্যায় বলিয়া আমার বোধ হয়। লোকদিগকে আমোদ আহ্লাদ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভিজিট লইয়া প্রলুব্ধ করিয়া তথায় লইয়া যাওয়া হয়। যাহারা এই সব প্রদর্শনী দেখিতে যায়, তাহারা তামাসা দেখিতেই যায়। কৃষক ও শিল্পিগণ এই সব প্রদর্শনীর খোঁজও রাখে না, রাখিলেও তথায় যায় না গেলেও কিছু শিখে না, তামাসা দেখিয়া চলিয়া আইসে। তাহারা গ্রামে বাস করে, সহরে বড় একটা আসে না! আসিলেও মামলা মোকদ্দমা করিতে বা হাট বাজারে জিনিস পত্র খরিদ করিতে আসে, বাবুদের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ খুঁজিয়া বেড়াইবার সময় তাহাদের নাই। গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক নিয়োজিত শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণ সময় সময় এইরূপ মেলাতে বক্তৃতা দিয়া কৃষকদিগকে নানা কথা বুঝাইতে চেষ্টা

করেন। কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন কৃষকই তাহাদের কথা শোনে না, দুই এক জন শুনিলেও এটা একটা আমোদের জিনিষ বলিয়া মনে করে। গবর্ণমেণ্ট ত ঢের টাকার অপব্যয় করিয়া demonstrative farm সমূহ খুলিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ কেবল আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার একটা উপায়— কৃষকদিগকে এ সকল ফার্ম্মে ডাকিয়া আনা হয় না ও কিরূপে কোন ফল উৎপন্ন করিতে হয়, বলিয়া দেওয়া হয় না। তাহারা ভয়ে এই সমস্তের দূরেই থাকে; না থাকিবেই বা কেন? হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী অথবা সাহেব সদৃশ দেশী কর্ম্মচারিগণকে গরীব প্রজাদের শিক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। গ্রাম্য লোক সহরে এই সব কার্য্য দেখিতে আসে না, ইহার বিষয় জানে না, জানিলেও ভয়ে দূরে থাকাই সঙ্গত মনে করে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যেরূপ যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করেন, তাহারা ত সেইরূপ অর্থব্যয় করিতে পারিবে না, কাজেই দূরে থাকাই শ্রেয়।

গবর্ণমেণ্টের agricultural demonstrative farm গুলিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে সাহায্য দিয়া জমিদারদিগের দ্বারা বড় বড় গ্রামে দেশী লোকের তত্ত্বাবধানে farm খুলিতে হইবে এবং কিরূপে সামান্য ব্যয়ে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি করা যায়, তদ্বিষয়ে কৃষকদিগকে উদাহরণ দেখাইয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইলে পশুর বংশ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। জমিদারগণকে বাধ্য না করিতে পারিলেও সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিলে কিছু ফল হওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট পুলিশ ভিন্ন অন্য ভাবে লোকের নিকট পরিচিত নহেন। কাজেই সামান্য লোকের গবর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থা নাই। মেলা ও প্রদর্শনী গুলি বিপুল আকারে করিয়া বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া করিবার প্রয়োজন নাই। কল ও অন্যান্য যন্ত্রাদি দেখাইতে হইলে, বিনা পয়সায় স্থায়ী ঘর ভাড়া বা প্রস্তুত করিয়া, তথায় রাখিয়া দেখান উচিত। সেখানে কল চালনার জন্য শিক্ষক থাকিবে ও শিক্ষানবীশ ছাত্র থাকিবে ও লোকে মনোযোগের সহিত কলের কার্য্য দেখিতে অবসর পাইবে। এখন শিল্প মেলায় পয়সা দিয়া লোক যায়, কিন্তু তামাসা দেখিবার জন্য ব্যস্ত থাকে, কল কারখানায় অনুধাবন করিয়া দেখার সময় ও ইচ্ছা থাকে না। শিল্পপ্রদর্শনী ও demonstrative farm এর সমালোচনা করিয়া আমি এই বলিতে চাই যে, এই গুলি দ্বারা অর্থনাশ ও তামসা দেখা ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন সংসাধিত হইতেছে না। যে প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া এই অর্থরাশি ব্যয় করা হয়, সে প্রয়োজন এই ভাবে এদেশের কৃষক ও শিল্পিগণের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে না। এ প্রণালী শিক্ষিত লোকের কথঞ্চিৎ উপকারে আসিতে পারে। নিরক্ষর লোকের কোন উপকার হইবে না।

### কিরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র করা উচিত।

স্থানীয় জমিদার ও তালুকদারগণ যদি গ্রামে গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন, এবং প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া তত্তৎ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ান, তবে উপকারের সম্ভাবনা আছে। জমিদারগণ এইসব কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষিত লোকদিগকে নিযুক্ত ও নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবেন এবং সভা করিয়া কৃষকদিগকে তাহাদিগের দ্বারা উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়াইবেন। ইহাতে জমিদারগণের লাভ

হওয়ার আশা আছে, কেননা, জমির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইবে ও খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ইংরেজ রাজের অধীনে জমিদারগণ প্রজাদের এতটুকু মঙ্গল সাধন করিতে অনুমতি পাইবেন কিনা, ঘোরতর সন্দেহ আছে। কেননা, দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শিক্ষিত লোকেরা যদি চাকুরীর প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে যাইয়া মধ্যে মধ্যে এইরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন, এবং গরীব গ্রাম্য কৃষকদের সহিত মেলা মেশা করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উন্নত করেন ও বৈজ্ঞানিক কৃষি তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তবেই কিঞ্চিৎ ফল হইতে পারে, নতুবা আর কোন উপায় আছে, বোধ হয় না। শ্রমজীবিগণের শিক্ষার সময় এত অল্প যে, বিনা পয়সায় শিক্ষা দিলেও, তাহারা সময়াভাবে কিছু শিখিতে পারে না। বাল্যকাল হইতেই জীবিকার জন্য জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, প্রায় লোককেই খাটিতে হয়। শারীরিক শ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে আর কিছু করিতে ইচ্ছা করে না। তথাপি উপযুক্ত প্ররোচনা পাইলে কিছু কিছু শিখিতে পারে। আমার বোধ হয়, ইউরোপে যেমন Friarগণ কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, আমাদের দেশেও তদ্রূপ শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হইলে, কৃষক ও শিল্পিগণের শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। এই পরিব্রাজক শিক্ষকগণ গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন এবং নানা বিষয়ে মৌখিক উপদেশ দিবেন। কৃষি বিষয়ে উপদেশ ক্ষেত্রে যাইয়া দিতে হইবে; শিল্প বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য কারখানা স্থাপন করিতে হইবে এবং তথায় যুবকগণকে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। আর্টিজেন ক্লাস খুলিতে পারিলে বোধ হয় লাভও হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে trade unions ছিল, এবং দক্ষ শিল্পিগণ এই সব সম্মিলনীর সভ্য থাকিতেন ও এপ্রেণ্টিস বা শিক্ষা-নবীশ রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। ভদ্রলোকেরা যদি এইরূপ কারখানা খোলেন এবং সম্মিলনী স্থাপন করিয়া গ্রাম্য যুবকগণকে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করেন, তবে নিজেদের দু পয়সা লাভও হইতে পারে এবং লোকশিক্ষারও উপায় হয়। চাকরীর প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভদ্রলোকেরা স্বাবলম্বনের মন্ত্র গ্রহণ করিলে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা অনেকটা হইয়া যায়।

স্বদেশী-আন্দোলনের সূত্রপাতের পর হইতে দেখিতেছি, অনেক ভদ্রলোক নিজ ব্যয়ে তাঁতীদিগকে তাঁতচালনা শিক্ষা দিতেছেন। ইহা নিতান্ত আশাপ্রদ; দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা যদি লৌহ, কাঁশা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ভদ্রলোকেরা আর বি-এ পাশের পক্ষপাতী না হইয়া, যদি শিল্প-শিক্ষা করিয়া ছোট ছোট মফঃস্বল সহরে ও বড় বড় গ্রামে এবং বন্দরে নানা প্রকারের কারখানা স্থাপন করেন এবং স্থানীয় যুবকদিগকে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করেন, তবে অর্থাগমের পথও পরিষ্কার হইয়া পড়ে, এবং লোকশিক্ষার বন্দোবস্তও অনায়াস-সিদ্ধ হইয়া যায়। এই সমস্ত যুবকগণ, পুনর্ব্বার রাত্রে, দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মৌখিক উপদেশ পাইয়া, অনেক ভাল

ভাল বিষয় অনায়াসে শিখিতে পারে।"ক্ষেতে গেলে কৃষাণের বুদ্ধি," অতএব শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন,কোন্ কোন্ বিষয় উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা যে লোকের উপকার করিতে প্রস্তুত, তাহা কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।

কথিত ভাষা শিক্ষা ও পাটীগণিতের সাহায্যে হিসাব-শিক্ষা দেওয়ার জন্য সহজ সহজ পুস্তক পড়াইতে হইবে। ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত করাই শ্রেয়। নৈতিক-শিক্ষার ভার ভাল সাধু লোকের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। অশিক্ষিত লোক আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, লোকের চরিত্র বোঝে। তাহারা তোমার পাণ্ডিত্য না বুঝিতে পারে, কিন্তু তোমার চরিত্র কেমন, তাহা বুঝিতে অপারগ নহে।

উপরি-বর্ণিত শিক্ষা দান প্রণালীতে দেখিতেছি যে, তিন শ্রেণীর শিক্ষকের প্রয়োজন (১) যাহারা আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র ও কারখানা স্থাপন করিবেন; (২) যাহারা পরিব্রাজকের ন্যায় এ গ্রামে কিছুকাল ও গ্রামে কিছুকাল থাকিয়া মৌখিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিবেন; (৩) যাহারা নৈশ-বিদ্যালয় খুলিয়া কথিত ভাষা, পাটীগণিত, ও যৎকিঞ্চিৎ স্বদেশের ইতিহাস ও পৃথিবীর ভূগোল শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষাকার্য্যকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করিলে, বিষয়টা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকগণকে কেবল সাহস অবলম্বন করিলেই চলিবে। স্বদেশের কাজ করিয়া তাহারা লাভবান্ই হইবেন। তবে চাই সাহস এবং চাকুরীর প্রতি ঘৃণা। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণের উন্নত চরিত্রের লোক হওয়া আবশ্যক। তাঁহারাও বিনা বেতনে খাটিলেই ভাল হয়। সেন্‌সন্-প্রাপ্ত স্বদেশ-হিতৈষী প্রচারকগণ এই সব কাজের জন্য বিশেষ উপযুক্ত। অনেক ব্রাহ্মপ্রচারক যদি এইরূপে স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন, আমার বোধ হয়,তাহাদের পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে। স্থল বিশেষে জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া বৃত্তিভোগী উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা "স্বরাজমণ্ডলীর" কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে। যে সমস্ত "স্বদেশী-মণ্ডলী" গঠিত হইতেছে,তাহাদিগকে এইরূপ ভ্রমণকারী উপদেষ্টা ও লোকশিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, কেবল কংগ্রেস-মণ্ডপে বক্তৃতা করিলে দেশ জাগিবে না। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণ বৃত্তিভোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রামে গ্রামে জাতীয়-বিদ্যালয় ও নৈশ পাঠাগার স্থাপন করিয়া বা ধর্ম্মশালা ঘরে রাত্রিতে এই শ্রেণীর শিক্ষক বয়স্থগণকে শিক্ষা দিবেন এবং দিনের বেলায় বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দিবেন। বঙ্গীয়-শিক্ষা পরিষদের এই বিষয় মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এইরূপে যদি গ্রামে গ্রামে "স্বদেশী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই সকল মণ্ডলী "মুষ্টি-ভিক্ষা" সংগ্রহ বা অন্য কোন উপায়ে, কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহের উপায়বিধান করেন,তবে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। শ্রমজীবিগণের শিক্ষা বা অন্য যে কোন সামাজিক এবং সার্ব্বজনিক প্রশ্নের সমাধান বৈদেশিক অর্থলোলুপ রাজশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যতদিন আমাদের দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য চাপাইয়া বসিয়া থাকিবে, ততদিন আমাদের কোন বিষয়েই সুবিধা বা সুযোগ হইবে না। মধ্যবিত্ত ভদ্র-শ্রেণীর দু' চারি জন কিঞ্চিৎ ইংরেজী শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকুরী প্রাপ্ত হইবে, এবং এই রাজশক্তির সাহায্য ভিন্ন

জীবন ধারণ করা যায়, ইহা বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। অনেক পণ্ডিতমূর্খেরা বলিয়া থাকেন যে, গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত শিক্ষাই যথেষ্ট, জাতীয় চেষ্টা দ্বারা আর বৃথা অর্থের অপচয় কেন? এই সব মূর্খের এতটুকু জ্ঞান নাই যে, আমাদের দেশের প্রকৃত সন্তান কৃষকগণ শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, এবং কালে তাহারা পূর্ব্বোক্ত মূর্খগণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিক রাজশক্তির ক্রীড়া-পুত্তল হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশের উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকেরা যদি নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের জন্য ভাবিত ও তাহাদের সহিত সমবেদনা বোধ করিত, তবে আর যখন তাহারা অনশনে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না মরিয়া যায়, তখন কেবল খবরের কাগজে তাহাদের মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হইত না, অর্দ্ধাশনে ও অনশনে মৃতগণ তাহা হইলে প্রকৃতিপ্রদত্ত মঙ্গলময় নিয়মের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনকারীর হস্ত হইতে নিজের গ্রাস কাড়িয়া লইত। বিধাতা কি ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের খাদ্য সৃষ্টি করেন না? তিনি কি ভারতবর্ষের লোকের প্রতি এত নির্দ্দয় যে, তাহাদের লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনাহারে মরিবে? কখনই নয়। বিধাতাকে এরূপ যাহারা কল্পনা করে, তাহারা নিতান্তই অজ্ঞ বা বঞ্চক। বিদেশী লোক বঞ্চনা করিতেই আসিয়াছে, সুতরাং তাহারা যখন যুক্তি-জালের কৌশলে বিধাতার বঞ্চকতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা স্বাভাবিক বোধ হয়, কিন্তু যখন স্বদেশী দেশদ্রোহীর দল সেই বৈদেশিক বঞ্চকগণের প্রতারণা বুঝিয়াও আত্মবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয় বা এই দেশ-ব্যাপী ঘোর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করে, তখন রোষে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। দুর্ভিক্ষের করালবদন ক্রমে আয়ত হইয়া আসিতেছে, ছোট বড় সকলকেই গ্রাস করিবে। দেশের লোকের অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতা-জনিত দুর্ব্বলতা যে এই দুর্ভিক্ষের ও অন্যান্য অমঙ্গলের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামাজিক সংস্কার, ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রভৃতি কোন চেষ্টাই সফল হইতেছে না। মৌলিক রোগের উপশম না হইলে, ঘা ভিতরে থাকিয়া গেল, উপরে ঔষধের প্রলেপ দিলে কোন উপকার হইবে না। দরিদ্রতা দোষে সব কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে এবং শিল্প ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষার দ্বারা এই দরিদ্রতা দূর না করিতে পারিলে সমাজ অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

একদেশবাসীদের ও এক রাজতন্ত্রের অধীনস্থ লোক সমূহের স্বার্থ এত জড়িত যে, যদি সকল শ্রেণীর উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দীক্ষা সংসাধিত না হয়, তবে কোন শ্রেণীরই ভাবনা বা সাধনা ফলবর্ত্তী হইতে পারে না। শরীরের সর্ব্বাংসের পরিণতি ও উন্নতি না হইলে শরীরের উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব। নিম্ন-শ্রেণীর শ্রমজীবিগণের শিক্ষার বিধান চিন্তাশীল ও অর্থবান্ উচ্চশ্রেণীরই করিতে হইবে। "স্বদেশী-মণ্ডলী" গঠন করিবার উদ্দেশ্যই দেশের লোকদিগকে জীবন সংগ্রামের জন্য তৈয়ার করা; এ সংগ্রামে সুস্থ ও বলবান্-দেহ, দক্ষ-হস্ত-মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রয়োজন। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে যে আমাদের দেশের মিতাচারী ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান আধুনিক জগতে আত্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন এদেশের শ্রমজীবিগণ নিশ্চয়ই প্রখরতা লাভ করিবে এবং সমস্ত দেশ একতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া বলবান হইয়া উঠিবে। "একতা" স্বর্গ

হইতে বৃষ্টি হয় না ; এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ ও প্রীতি জন্মে, একে অন্যের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল দেখে, দেশের উন্নতিতে আত্মোন্নতির প্রসাদ ভোগ করে—ইহারই নাম একতা। সকলে ক্ষুদ্র স্বকীয় স্বার্থের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যখন সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতে থাকে ও তাহা লাভ করিবার জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর পার্থক্য ও শক্রতা থাকে না। স্বার্থ-পরতা সকল অনর্থের মূল এবং চরমে আত্মঘাতী করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়।

# বস্তু ও অবস্তু।(২)

বস্তু=শক্তি। ঐ শক্তি তড়িৎ। তড়িৎ ইথারের ভাবান্তর। পরমাণু বিভাজ্য। রেডিয়াম্, হিলিয়াম্। ইথারচক্র। স্পন্দন। ব্রহ্মাণ্ড স্পন্দনরাশি। স্পন্দন=চৈতন্য। জ্ঞানময়, আনন্দময়, তত্ত্বমসি, সোহং।

বস্তু এক, শক্তি আর ;—আমরা চিরদিন এইরূপ পৃথকভাবে বুঝিয়া আসিতেছি। সুতরাং এক্ষণে এতদুভয়কে একভাবে চিন্তা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু বলিতেই রূপ মনে হয় ; শক্তি বলিতেই অ-রূপ মনে হয়। শক্তির ভাবান্তর উপস্থিত হইলে যে রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, একথা বুদ্ধি-বলে প্রতিপন্ন করিতে পারিলেও, মনে ধারণা করিতে পারি না। মানব দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে তাহার মন ইহা ধারণা করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু যাহা মনে ধারণা হয় না, তাহাই যে অসত্য, এরূপ কোন কথা নাই। গণিতজ্ঞ বুদ্ধি-বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দুইটী রেখা এরূপ হইতে পারে যে, উভয়কে অনন্তকাল বর্দ্ধিত করিলেও উহারা মিলিত হইবে না, কিন্তু ক্রমেই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহা কি মনে ধারণা হয় ? দুইটী রেখা, যে কোন প্রকারেরই হউক, ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে, কিন্তু অনন্তকালেও মিলিবে না, ইহা মনেই ধারণা হয় না। কিন্তু এ কথা সত্য। মনে ধারণা হউক আর না হউক, বস্তু-পদার্থ প্রকৃতপক্ষে শক্তিই। পণ্ডিতগণ জগতের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল শক্তির পরিচয় পাইতেছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে দেখা আর সম্ভবপর হইতেছে না। ঐ সকল শক্তি পরিণামে এক তড়িৎ-শক্তিরই ভাবান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তাপ, তড়িতেরই ফল ; আলোক, তড়িতেরই বিকাশ অথবা বিকীরণ (radiation); চৌম্বক শক্তি (magnetism) তড়িতের সহিত অপ্রভেদ ; এমন কি, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি জড়-ধর্ম্মও এক্ষণে তড়িৎ-ধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইতেছে। মানব সকল শক্তির সমন্বয় করতঃ একমাত্র তড়িৎ শক্তিকেই মৌলিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার গতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া মানব এক সর্ব্বব্যাপ্ত সূক্ষ্ম ইথার নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না। তাপ এবং আলোকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার

সময় এইরূপ অত্যতিসূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। পরে তড়িতের ব্যবহার দৃষ্টে এই কল্পনা ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। তাপ ইথারের কম্পন-জনিত গতি বিশেষ, তরঙ্গ বিশেষ, আলোকও তাহাই: তড়িৎও ইথারের চক্রবৎ গতি বিশেষ (vortex motion)। এই সকল সিদ্ধান্ত এক্ষণে পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হইয়াছে। মানব সকল শক্তিকে তড়িতের ভাবান্তর প্রতিপন্ন করিয়া তড়িৎকেও ইথারেরই ভাবান্তর বিবেচনা করিতেছে। তড়িতের ব্যবহার দৃষ্টে তাহাকে দ্বিবিধ বলিয়া বোধ হয়। অসম-শ্রেণীর তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে; সম-শ্রেণীর তড়িৎ পরস্পরকে দূরে বিক্ষিপ্ত করে। এই দ্বিবিধ তড়িতের সংযোগে ইথার। পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইথারকে এই দ্বিবিধ তড়িতের রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় বিবেচনা করিতেছেন। (১) তড়িৎ যখন শক্তি, তখন ইথারও শক্তি মাত্রই হইতেছে। এই ইথারকে শক্তি বলা যাউক আর বস্তুই বলা যাউক, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্ত্বা। সকলই ইহার ভাবান্তর মাত্র। ইথার শান্ত, অব্যক্ত এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। ইহার স্থানে স্থানে কোন অপরিজ্ঞাত কারণবশতঃ ঘূর্ণপাকের ন্যায় চক্র (২) উৎপন্ন হইয়াই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তু এই ইথারেরই ঘূর্ণিত অবস্থা মাত্র। ইথার অথবা তড়িৎ অথবা বস্তু প্রকৃত পক্ষে এক-ই। ইহাদিগকে বস্তু বল, ভালই, শক্তি বল, ভালই। কথা লইয়া গোলযোগ করা নিষ্প্রয়োজন। যদি বস্তু বলা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুই মূলতঃ অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, পরে ভাবান্তরিত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুই একমাত্র সত্ত্বা। আর যদি শক্তি বল, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শক্তি মূলতঃ অব্যক্ত, পরে ভাবান্তরিত হইয়া বস্তু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শক্তিই একমাত্র সত্ত্বা। বস্তু শক্তিরই বিকাশ মাত্র। ইহা মনে ধারণা হউক, আর না হউক, মানব ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না। তবে, বস্তুকে বস্তুই বল, আর শক্তিই বল, উহাকে চৈতন্যময়, জ্ঞানময় স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ জগতে চৈতন্যের অথবা জ্ঞানের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। ফলতঃ জগতে এক মাত্র সত্ত্বা ভিন্ন দ্বিতীয় সত্ত্বা নাই; উহারই অবস্থা বিশেষের নাম বস্তু-পদার্থ।

বস্তুর অণু ইথারেরই অণু, অথবা তড়িতেরই অণু। সুতরাং বস্তু তড়িদণুর সমষ্টি-ফল। (১) কিন্তু তড়িৎকে শক্তিরূপে ব্যতীত বস্তুরূপে কল্পনা করা যায় না। এ নিমিত্ত বস্তুকে শক্তিরূপেই কল্পনা করা উচিত। শক্তিই একমাত্র সত্ত্বা; সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র, আর কিছুই নহে।

বস্তু অথবা তড়িৎ অথবা ইথার, যেরূপেই মৌলিক সত্ত্বাকে ধারণা করি, তাহার অণু পরমাণু কল্পনা করিতেই হইবে। যাহা

(১) Though atoms of matter are composed of them (positive and negative electricity), * * * these make their appearance when the original substances (ether) is decomposed.
Nature, 1907. p. 521.

(২) কাহারও কাহারও মতে, এই ঘূর্ণপাক (vortex motion) অনাদি কাল হইতে আছে। ইহা নূতন করিয়া কোন স্থানে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই মত সকলে স্বীকার করেন না।

(১) According to the modern hypothesis, matter is built up of electrons, (But) Electrons are not matter in the ordinary sense of the word. Righi Modern Theory. p. 150.

অনন্ত বিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপ্ত, তাহার ধারণা হয় না। সুতরাং তাহাকে অংশতঃ বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপে, অতীব ক্ষুদ্রাংশের নাম হয় পরমাণু। এক্ষণে, এই পরমাণুর বিষয় বিবেচনা করিতে সর্ব্বাগ্রেই বুঝিতে হইবে যে, উহা কেবল কল্পনা-মাত্র নহে। যখন দুই অমিশ্র বস্তুর সংমিশ্রণে এক সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম্মবিশিষ্ট যৌগিক বস্তু জাত হয়, তখন ঐ দুই বস্তুর চিহ্নমাত্রও থাকে না। দুই-এ মিশিয়া এক হইয়া যায়। এই সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ বলে। এস্থলে ঐ দুই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম অংশও আর পৃথক থাকে না। উভয়ের পরমাণু মিলিত হইয়া ঐ যৌগিক বস্তুর অণু গঠিত হয়। বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে। পণ্ডিতগণ এ সকলের আয়তন ও গুরুত্ব গণনা করিয়াছেন, উদযানের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু; তাহারই তুলনায় অন্যান্য অমিশ্র বস্তুর পরমাণু সকলের আয়তন ও গুরুত্ব গণনা করা হইয়াছে। পরমাণু, সকল রাসায়নিক সংযোগের মূল। এতদিন মনে করা হইত যে, পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু সম্প্রতি রেডিয়াম্ নামক পদার্থ আবিষ্কৃত হইবার পর এই সংস্কার ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে। পণ্ডিতগণ পরমাণুকে আর চিরস্থির মনে করিতে পারিতেছেন না। (২) উহাকেও ধ্বংসশীল মনে করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক প্রকার পরমাণু খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া ক্রমে অন্য প্রকারে পরিণত হইতে পারে; ইহা রেডিয়ামের ব্যবহার হইতে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি এক বস্তুর পরমাণু অন্য বস্তুর পরমাণুতে পরিণত হওয়া সম্ভব হইল, (১) তবে বস্তু সকলও আর পৃথক পৃথক গণ্য হইতে পারে না। সকলই এক হইয়া যায়। এক মৌলিক বস্তুর পরমাণু ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতের বিভিন্ন অমিশ্র বস্তু উৎপন্ন হওয়া, এবং তাহাদিগের সংযোগে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা হইতেই বস্তু এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই এক বস্তু না শক্তি? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন। উত্তর—যাহা বল, তাহাই। কথায় কিছু আসে যায় না। তথাপি শক্তি বলাই সঙ্গত। কারণ তাহাতে যখন আদি হইতেই জ্ঞানের আরোপ না করিয়া উপায় নাই, তখন বস্তু বলিলে ধারণা হইবে না। বরং শক্তি বলিতে অভ্যস্ত হইলে জ্ঞানের আরোপ করিবার সময় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। যাহা হউক, যিনি যে ভাবে বুঝেন, তাহাই ভাল। এই আদি সত্ত্বাকে এক এবং জ্ঞানময় মনে করিলেই যথেষ্ঠ হইল। সকলই তাহার পরিণতি। কিন্তু পরমাণুর কথা বলিতেছিলাম। একটু রেডিয়াম্‌কে এক কাচের নলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমেই ঐ নল এক প্রকার বায়বা পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায়। উহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা রেডিয়াম্ হইতে পৃথক বস্তু। উহা বায়ু আকারের রেডিয়াম্ নহে। হিলিয়াম্ বলিতে যে পদার্থ বুঝা যায়,

(২) No comtemporary physicist believes that such a thing as an absolutely stable atom exists.

Saleeby, Evolution, p. 91.

(১) The atoms of the different "elements" vary only in the arrangement of their electrons. * * * Thomson's theory clearly explains how atoms of one element by losing their outer ring or ring of electrons, may be transformed into those of another. ibid p, 91.

উহা তাহারই সহিত এক ভাবাপন্ন। শূন্য নলে রেডিয়াম্ রাখিয়া তাহারই বিকৃত অবস্থায় হিলিয়াম্ পাওয়া যাইতেছে। রেডিয়াম্ প্রকৃতই হিলিয়ামে পরিণত হইল। রেডিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২২৫; অর্থাৎ উদ্‌যানের তুলনায় রেডিয়াম্ ২২৫ গুণ ভারী। কিন্তু ঐ নলের মধ্যে যে হিলিয়াম্ পাওয়া গেল, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২১/২। উহা উদ্‌যান অপেক্ষা ২১/২ গুণ ভারী। এই কথার প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ এই যে—রেডিয়ামের পরমাণু উদযানের ২২৫ গুণ ভারী; আর হিলিয়ামের পরমাণু উদযানের পরমাণু অপেক্ষা কেবল ২১/২ গুণ ভারী। কিন্তু যখন রেডিয়াম্ হিলিয়ামে পরিণত হইল, তখন অবশ্যই তাহার পরমাণু প্রায় একশত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এত সূক্ষ্ম পরমাণু, তাহাও কত সূক্ষ্মতর অংশের সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! পরমাণুর এই সূক্ষ্মাংশ সকলকে পরম-পরমাণু (ion) বলিলে, বহুসংখ্যক পরম্-পরমাণুতে একটী পরমাণু গঠিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহারাও তড়িতেরই সূক্ষ্মতম অংশ; দ্বিবিধ তড়িতের রাসায়নিক সংযোগের ফল; অথবা ইথার পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশের ঘূর্ণিত গতির পরিণাম। এ দুইই এক কথা। তাহা হইলে পরমাণু (এবং পরম্-পরমাণুও) জন্য-পদার্থ, মৌলিক নহে।

ঘূর্ণিত গতি কি? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা কেন্দ্রাভিমুখ ও বহির্মুখ —এই দ্বিবিধ গতির ফল। ইহাকে আকর্ষণ ও বিক্ষেপ বলা যায়; কুঞ্চন প্রসারণও বলা যাইতে পারে। এই দুই বিপরীত গতিকে এক কথায় স্পন্দন বলিলে, ইথার-সমুদ্রের ঘূর্ণিত গতিও তাহাই। সুতরাং পরমাণু এবং বস্তু পদার্থও স্পন্দন অথচ তরঙ্গ মাত্র হইতেছে। বস্তুর এই প্রকার ধারণা করিলে, জগতের সকল শক্তির সমন্বয় হইতেছে। তাপ আলোক, চৌম্বক-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সকলই ইথারীয় তরঙ্গ মাত্র; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কেবল তরঙ্গে পরিণত হইতেছে। জগৎ=শক্তি; উহা অবিশ্রান্ত, নিত্য তরঙ্গে স্পন্দিত। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মহান্ স্পন্দন্ মাত্রে পরিণত হইতেছে। চেতন অচেতন সকলই স্পন্দন মাত্র (১)। প্রকৃত পক্ষে চেতন অচেতন ভেদ কিছুই থাকিতেছে না। সকলই পরম-পরমাণু সমষ্টির খেলা; উহারা নিত্য-স্পন্দিত জীবন্ত(২) তরঙ্গ চক্রের অভিব্যক্তি মাত্র। এই চক্রকে ইথার-চক্র অথবা তড়িৎ বলা হইয়াছে। ইহাই একমাত্র সত্তা। চেতন এবং অচেতন, ইহারই অভিব্যক্তি। যে তড়িৎশক্তিকে মৌলিক বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই এক্ষণে জড় ও চেতন; উভয়েরই কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন (৩)। উহারা একের দুই শাখা মাত্র বিবেচিত হইতেছে। উহাদিগের মৌলিক ভেদ তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। জড় ও চেতন মূলতঃ একই প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

(১) The rhythm in the structure of the elements applies to that of the * * cells too * * * * Rhythmic laws prevail in the aggregates of the elements (জড়) and in the formation of the cell (চেতন). Burke, Origin of life p. 150,

(২) We maintain that the movement that exits in the universe without begining is life. Ibid. p. 177.

(৩) Life and matter are merely different phenomena of electricity * *The three states of eleotrons may be (I) The purely electrical (2) The living or biogenic state * * (3) The material state. Ibid. p. 192—193.

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে সকলই চেতন, আর অচেতন কিছুই থাকিতেছে না (৪)।

যাহাকে লৌকিক ব্যবহারে জড় বলে, তাহরে সূক্ষ্ম অংশ অণু, উহা পরমাণু দ্বারা গঠিত। আর, যাহাকে লোকে চেতন বলে, তাহার ক্ষুদ্র অংশের নাম কোষ, উহা জীবাণু দ্বারা গঠিত। এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ কিছুই নাই। অণুর কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া পরমাণু সকল অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের সংখ্যা, অবস্থান ও গতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। একরূপ হইবে জড়-অণু, অন্যরূপ হইলে জীব-অণু। জড় ও জীব উভয়ই এক শক্তির বিকাশ মাত্র (৫)। যাহাকে জড় বলা হয়, তাহা শক্তি-পুঞ্জ, চৈতন্য সমষ্টি; আর কিছুই নহে। আমরা বলিয়াছি, সকল শক্তিই মূলতঃ তড়িৎ-শক্তি। এই শক্তিই জীব ও জড় রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। জড়ের জড় ধর্ম্ম তাড়িতেরই ক্রিয়া। তড়িদণুর সেই চক্রগতি কিরূপে জড়স্বরূপ ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছি (৬)। চেতন পদার্থও তড়িতেরই ভাবান্তর। এ সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে মানবকে বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বে লইয়া যাইতেছে। পরমাণু আশ্চর্য্য পদার্থ। ইহা স্বতঃ কম্পিত চক্রাবর্ত্ত; এই স্পন্দনই চৈতন্য। অণুসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময়।

কিছু কাল হইল একটা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, অচেতন হইতে চেতন উদ্ভব সম্ভব কিনা? ইহার অনুকূলে প্রতিকূলে বিবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। অঙ্গার, অম্লযান, উদযান, যবক্ষারযান ইত্যাদি কতিপয় বস্তুর সংযোগে জীব-বস্তু(proto-plasm) জাত হয়। ইহারা জলের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া জীব-কোষ গঠিত করে। এই জীববস্তু অতীব ক্ষণস্থায়ী। ইহা সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে; এবং উপাদান পদার্থে পরিণত হইতেছে। আর বাহ্যজগৎ হইতে পোষক পদার্থ গ্রহণ করত পুনরায় গঠিত হইতেছে। এই পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। এখনও উহা প্রস্তুত হয় নাই। কখনও যে হইবে, সে সম্ভাবনাও অতীব বিরল। পরমাণু সকল যে প্রকারে সজ্জিত ও স্পন্দিত হইয়া যে ভাবে জীব-বস্তু গঠিত করিয়াছে,তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে, চিরাতীত কাল হইতে উহারা নানা ভাবে সজ্জিত ও স্পন্দিত হইতে হইতে অবশেষে জীববস্তু-ভাবে গঠিত হইয়াছে,এই মাত্র বলা যায়। জীব-বস্তু একদিনে গঠিত হয় নাই। যে গঠনের ফলে তথাকথিত জড়-অণু জাত হইয়াছে, তাহা হইতে কত পৃথক ভাবে পরমাণু সকল সজ্জিত হইয়া আংশিক-জড় অংশিক-জীব-রূপী কোষ উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অবশেষে পূর্ণ-জীব-বস্তু বহু বিবর্ত্তনের পরিণাম ফল। ইহার উপদান পদার্থের মূলে চৈতন্য না থাকিলে পরিণামে চৈতন্য উদ্ভূত হওয়া সম্ভব হইত না।

(৪) The barrier, apparently insuperable, ** between living and so called dead matter would thus pass away as a false distinction, and all nature appear as a manifestation of life. Ibid p. 74--75

(৫) Both the physical and the psychical must be regarded as manifestations of some thing fundamental than either. Nature 1903 p. 77.

(৬) The electrons which may be considered as ** consisting in a modification of the ether perfectly *Simulate* inertia by reason of the laws of the electro magnetic field, and thus *show* the fundamental properties of matter. Righi Modern Theory. p. 151.

এই চৈতন্যই অণু পরমাণু রূপে ব্যক্ত হইয়া কোষ নির্ম্মিত করিয়াছে (১)। যাঁহারা জড় হইতে চেতনের উদ্ভব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে চিরাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও ঐ রূপে জীবোৎপত্তি জগতের সর্ব্বত্রই হইতেছে। বস্তু পদার্থের সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীব-বস্তুর উৎপত্তি হওয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন (২)। কিন্তু এই তর্ক অনাবশ্যক। মৌলিক শক্তিকে চৈতন্যময় স্বীকার করিলে জড় বলিয়া কোন কাজেই কিছু থাকিতেছে না। সুতরাং জড় হইতে জীবোৎপত্তির তর্ক উঠিতেই পারে না। সকলই চৈতন্যময়, জড় কোথায়? জড় হইতে জীবোৎপত্তির কথাই বা উঠিবে কি প্রকারে? চৈতন্যকেই একমাত্র মৌলিক সত্তা অঙ্গীকার করিলে, অণু, পরমাণু, পরম্-পরমাণু সকলেই তাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এ কথা আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হয় (৩)। ইহাকেই আদি, মধ্য ও শেষ সত্তা স্বীকার করিলে অণু, পরমাণু, পরম্-পরমাণু, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ঘনীভূত চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ঘনীভূত শব্দ পণ্ডিতবর বার্কের। আমি ইহার এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছি যে, যিনি আদি-চৈতন্য, যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি কখনও পূর্ণ-বিকশিত, কখনও অল্পাধিক আচ্ছন্ন; যেন মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন। যখন তিনি মেঘ-মুক্ত তখন পূর্ণ, যখন মেঘাবৃত তখন মলিন, পূর্ণ প্রকাশ নহে। সেই মৌলিক শক্তি যখন অব্যক্ত, তখন পূর্ণ, আর যখন চক্রাবর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকটিত, তখন নানা ভাবে অল্পাধিক আচ্ছন্ন। এই অল্পাধিক আচ্ছন্নতা বশতই জড় ও জীবের প্রভেদ; নচেৎ এ ভেদ মৌলিক হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্তাই শক্তি, এবং তাহা চেতন। যাহাকে বস্তু, অণু, পরমাণু, পরম-পরমাণু বলিলাম (তাহা জড়াণুই হউক বা জীবাণুই হউক) তাহা ঘনীভূত চৈতন্য মাত্র। ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই লীলা, ইঁনি যে ভাবে যখন ব্যক্ত হইতেছেন, তাহা তখন সেই ভাবেই হইতেছে। ইনি জ্ঞানময়। এই আদি শক্তিই জগতে কর্ম্ম রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মমাত্রই কামমূলক সুতরাং জ্ঞানমূলক। এ নিমিত্ত এই শক্তিকে জ্ঞানময় স্বীকার করিতেই হইবে। এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই পণ্ডিতগণ পরমাণুকে জ্ঞান-তন্মাত্র বলিতেছেন (১০)। বৈদান্তিকেরা জ্ঞানরূপ একমাত্র পদার্থ স্বীকার করেন। ইঁনি মনোময় ইনি জ্ঞানময়। সুতরাং আপনাকে আপনি জানেন, এবং আপনাতেই আপনি অবস্থিত। জ্ঞানের লক্ষ্য কি? আনন্দ অর্থাৎ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা। দুঃখ না থাকিলে সুখ উপলব্ধি হয় না। সুখ বুঝিতে হইলেই দুঃখ চাই, কিন্তু দুঃখ বোধ ত চৈত-

(১) We regard the biogen (জীবাণু) as a sort of nebula of electrons in the process of formation into atoms of elements.
Burke—Origin p. 223.

(২) Living things * * have been the immediate products of ever acting material properties or natural laws. Bastian-studies in Heterogenesis, appendix p. VI.

(৩) The vital substance or biogen we regard as * * the substance from which the molecules and atoms by condensation are evolved.--Burke Origin p. 223.

(১০) Atoms * * in a sense possess consciousness in some dim remote degree. For that reason we regard matter, or the electrons of which matter is composed, as Mind stuff. Ibid p. 338.

ন্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না। দুঃখং মে মাভূয়াৎ, ইহাই লক্ষ্য। সুতরাং সুখও চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য সুখ দুঃখের অতীত। এই অবস্থাই পরমানন্দ, সুতরাং যিনি জ্ঞানময়, তিনিই আনন্দময়, তিনি একমাত্র সত্তা। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি আমি, সকলই সেই এক মাত্র,—নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। তত্ত্বমসি, সোহং,—এই মহাবাক্যদ্বয়ের প্রকৃত রহস্য ইহাই। তুমিও তাহাই, আমিও তাহাই।

অণু হ'তে সূক্ষ্ম আমি, আমিই বৃহৎ।
আমি বিশ্ব, আমি নিত্য, আমিই জগৎ। (১)

ওঁ তৎসৎ॥

শ্রীশশধর রায়।

পরিভাষা।

অণু—molecule.
তড়িদণু—Electron.
পরমাণু—Atom.
পরম পরমাণু—ion.
জড়ত্ব—inertia.

(১) উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১০৮ পৃষ্ঠা।

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ;

## শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে; সেই সঙ্গে প্রভাতীরাগে রসুন চৌকি বাজিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে দেবদেবীর মূর্ত্তি যে সকল পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারাণ্ডায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গত রাত্রে আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দ দিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে। বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা বাজিয়াছে। গাড়ী নহবতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরকে লইয়া যাইবে, চতুর্দ্দিকে ফুল গাছ, সম্মুখে ভাগীরথী; দিক সকল প্রসন্ন; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কাণঢাকা টুপি ও মসলার

সঙ্গে সঙ্গে লইয়াছেন, কেননা শীতকাল সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্য-বদন ;—সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা হইল, গাড়ী কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়াবাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ী জানিত। চৌমাথায় গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন।

ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্য বদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীশ এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। শ্রীশ Entrance ও F. A. পরীক্ষায় Universityর ফার্ষ্ট হইয়াছিলেন অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে। আবার যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। শ্রীশ ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক কখন দেখি নাই।

[ কর্ম্ম বন্ধনের মহৌষধ পাপ কর্ম্ম ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শ্রীশের প্রতি )। তুমি কি কর গা?

শ্রীশ। আজ্ঞে আমি, আলিপুরে বেরুচ্চি; ওকালতি করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ( মণির প্রতি. ) এমন লোক ওকালতি? ( শ্রীশের প্রতি ) আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে? সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকা; কেমন!

শ্রীশ। কিন্তু কাজের গতিকে সংসার অন্যায় কত করতে হয়।

"কেউ পাপ-কর্ম্ম করছে, কেউ পুণ্য-কর্ম্ম করছে। এসব কি আগেকার কর্ম্মের ফল? তাই করতেই হবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হলে সব যায়। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে যায়।

"ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য।"

"সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাঞ্চ আর চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর-লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি লাভের লক্ষণ।

"তাঁকে জান্‌লে পাপপুণ্যের পার হয়।"

"প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালি ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব
ছেড়েছি।

"তাঁর দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দেবেন। গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্তা হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। যখন দশ মাস হয়, তখন একবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটীকে নিয়েই নাড়া চাড়া, সেইটীকে নিয়েই আনন্দ।

শ্রীশ। সংসারে থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

[ অভ্যাসযোগ। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? অভ্যাস-যোগ। ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিড়ে বেচে। তারা কতদিক সাম্‌লে কাজ করে শোনো। ঢেঁকির

পাট পড়ছে, এক হাতে ধান গুলি ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে। ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, তাহলে তুমি যে ক পয়সা ধার আছে, সে ক পয়সা দিয়ে যেও; আর জিনিষ নিয়ে যেও।

"দেখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে ধান ঠেলে দেওয়া, ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাস-যোগ। কিন্তু তার পনর আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্ব্বনাশ—কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম্ম কর।

"জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান-লাভ করতে হবে। সংসার রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জ্জনে মন্থন করে মাখম তুলে সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

"তা হলেই হলো একটু সাধনের দরকার, প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে থাকা বড় দরকার, অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমন কি, হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

"তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যেতে হয়। তাই সাধনের দরকার। তুমি ভাত খাবে; বসে বসে বলছো, কাঠে অগ্নি আছে, ঐ আগুনে ভাত রাঁধা হয়। তা বললে কি ভাত তৈয়ের হয়? আর এক খানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘসতে হয়; তবে আগুন বেরোয়।

"সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আর আনন্দ হয়। তুমি খেলে না, কিছু করলে না। বসে বসে বলছো 'সিদ্ধি সিদ্ধি' তাহলে কি নেশা হয়, আর আনন্দ হয়।

[ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ধ্রুব খাওয়া ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেখা পড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে—সব মিছে। শুধু পণ্ডিত বিবেক বৈরাগ্য নাই—তার কেবল কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা; আর সব মিছে।

(শ্রীশের প্রতি)—আচ্ছা তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা?

শ্রীশ। আজ্ঞে, এইটুকু বোধ হয়েছে,—একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন; তাঁর সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি,—শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। যত ঠাণ্ডা পড়ে, তত জলের আয়তনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য জল বরফ হবার একটু আগে থেকে আয়তন বৃদ্ধি হয়; পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপরিভাগ সমস্ত বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু নীচে যেমন জল তেমনি জল! যদি খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, সে হাওয়া বরফের উপরে লাগে। নীচের জল গরম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি আছেন জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ, করা আর এক, কেউ দুধের কথা শুনেছে। কেউ দুধ দেখেছে, আবার কেউবা দুধ খেয়েছে। দুধ দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, দুধ খেলে তবে ত বল হবে,—তবে লোক হৃষ্ট পুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবেই ত আনন্দ লাভ হবে, আর শক্তি বাড়বে।

[ মুমুক্ষত্ব সময় সাপক্ষ ]

শ্রীশ। তাঁকে [illegible] যায় না ... [illegible] ঘরে লইয়া গেলেন ... ডাকবার অবসর পাওয়া সঙ্গে আসন ...

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্য )। তা বটে ; সময় না হলে কিছু হয় না। একটী ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা,—আমার যখন হাগা পাবে, আমাকে তুলিও। মা বল্লেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমার তুলতে হবে না।

"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। শাশুড়ী বৌদের সরার মাপে ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। এক দিন সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল, তখন শাশুড়ী বল্লেন, নাচ কোঁদ বৌমা আমার হাতের আটকেল ( আন্দাজ ) আছে।

[ আম্মোক্তারী বা বকলমা। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ( শ্রীশের প্রতি ) কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর ; তাঁকে আম্মোক্তারী দেও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড় লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখন মন্দ করবে না।

সাধনার প্রয়োজন বটে ; কিন্তু দুরকম সাধক আছে ;—এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়।

...রামকৃষ্ণ। ...

...লাভ করা ন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না, সে পড়ে, কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে, মা কখন বিছানার উপর ... রেখে দিচ্ছে, কখন হেঁসেলে ... রেখে দিচ্ছে, কখন ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে, মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে নিয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব কোরে কোন সাধন করতে পারে না,—এত জপ করবো এত ধ্যান করবো ইত্যাদি, সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেবল কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না। এসে দেখা দেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা হইয়াছে, গৃহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যস্ত তিনি ভিতর বাড়ীতে গিয়াছেন ; খাবার উদ্যোগ ও তত্বাবধান করিতেছেন।

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর একটু ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর একটু পাদচারণ করিতেছেন। কিন্তু সহাস্য বদন। কেশব কীর্ত্তনিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[ ঈশ্বর কর্ত্তা ; অথচ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব। ]
( Responsibility )

কেশব কীর্ত্তনিয়া।—তা তিনিই 'করণ' তিনিই 'কারণ'। দুর্য্যোধন বলেছিলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ তিনিই সব করাচ্ছেন বটে ; তিনিই কর্ত্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ। অবশ্য এও ঠিক যে কর্ম্ম ফল আছেই আছে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে। তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটী পেতে হবে!

"যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা মাই এসে পড়ে।

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ভিতর বাড়ীতে গেলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণের বাড়ী ব্যঞ্জনাদি অনেক রকম হইয়াছিল, আর নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি আয়োজন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বৈঠকখানায় আবার আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্রীশের প্রতি) তোমার কি ভাব? সোহং, না সেব্য সেবক?•

[ গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ ]

"সংসারীর পক্ষে সেব্য সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে অবস্থায় আমিই সেই ; এ ভাব কেমন করে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ। তার নিজের দেহ মনও স্বপ্নবৎ, তার আমিটা পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবক ভাব, দাস-ভাব খুব ভাল

"হনুমানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন 'রাম কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস ; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

তত্ত্বজ্ঞানের সময় সোঽহং হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।

শ্রীশ। আজ্ঞে হাঁ দাস-ভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। প্রভুর উপর সকলই নির্ভর ; যেমন কুকুর ভারি প্রভুভক্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে?

কি জান যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন, যেমন অনন্ত জলরাশি, মহাসমুদ্র ; কুল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে ; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয় ; ঠিক সেইরূপ ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য্য উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমনি জল—ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ দিয়ে গেলে সাকাররূপ আর দেখা যায় না ; আবার সব নিরাকার জ্ঞানসূর্য্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

কিন্তু দেখ যারই নিরাকার, তারই সাকার।

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়াছেন ; এইবার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করি-

বেন।

( নাম মাহাত্ম্য)।

বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে যে রক আছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজন বলিতেছিলেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সব সমন্ধে ফল হবে, এমনত দেখা যায় না।

ঈশান বলিলেন, সেকি! অশ্বত্থের বীজ অত ক্ষুদ্র বটে,কিন্তু উহারই ভিতরে বড় বড় গাছ আছে। দেবীতেও সে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁহাঁ দেবীতে ভুল হয়।

(নির্লিপ্ত সংসারী ও পরমহংস)।

বাড়ী ঈশানের শ্বশুর ৺ক্ষেত্র চাটুর্য্যের বাড়ীর পশ্চিমাংশে, দুই বাড়ীর মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। এই বাড়ীর ফটকে ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবান্ধবে ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পুকুরের পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে; পরমহংস কাকে বলি? হাসের মত দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটী ছেড়ে দুধটি নিতে পারবেন? আবার পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালী ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।

## সমন্বয় ও নিষ্ঠা ভক্তি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র দত্তের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখান হইয়া তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন।

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। মহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোস্বামীর বাড়ী ঐ পাড়াতেই। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসেন। তিনি রামের বাড়ীতে এলেই গোস্বামী আসিয়া প্রায় দেখা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)। বৈষ্ণব শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক, তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা করে না!

গোস্বামী (সহাস্যে)। হরপার্ব্বতী আমাদের বাপ মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। 'বাপ মা' Thank you.

গোস্বামী। তা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করায়, অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে; বৈষ্ণবাপরাধের মাফ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অপরাধ সকলের হয় না। ঈশ্বর কোটির অপরাধ হয় না। যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

"ছেলে যদি বাপকে ধরে আলের উপর দিয়ে চলে,তাহলে বরং খানায় পড়তে পারে; কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখন পড়ে না।

"শোনো; আমি মার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নেও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য,আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

গোস্বামী। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটী আছে নিষ্ঠা ভক্তি। সববাইকে

প্রণাম করবে বটে; কিন্তু একটীর উপরে প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

রামরূপ বই আর কোনরূপ হনুমানের ভাল লাগেতো না।

গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

পত্নী দেওর ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোবার জল আসন ইত্যাদির দ্বারা সেবা করে। কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।

রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাত ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কাণ ঢাকা টুপি। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে তুলিয়া দিতেছেন। মণিও গাড়ীতে উঠিলেন। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।

# বিরাটের মেলা।

রংপুর জেলায় গাইবান্ধা মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে বিরাট নামে একটী ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলার সহিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এবং কিয়ৎপরিমাণ হিন্দুধর্ম্মের একটু সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য ইহার একটী ক্ষুদ্র বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

ই, বি, এস্, রেলওয়ের মহিমাগঞ্জ নামে একটী ষ্টেশন আছে। শিয়ালদহ হইতে অপরাহ্ন ৫টার গাড়ীতে দার্জ্জিলিং মেলে উঠিলে পদ্মা পার হইয়া সারাঘাট দিয়া পরদিন প্রাতে ৬টা, ৬৷৷০টার সময় মহিমাগঞ্জ পৌছান যায়। মহিমাগঞ্জের পর দুটী ষ্টেশন পরে গাইবান্ধা। মহিমাগঞ্জ হইতে হাটাপথে বিরাট ৯৷১০ ক্রোশ হইবে। গরুরগাড়ী সর্ব্বদা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিলে পাল্কীও পাওয়া যাইতে পারে।

১লা বৈশাখের কিছু পূর্ব্ব হইতেই দোকান পসার আসিতে আরম্ভ করে। রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় দোকান আইসে। কখন কখন কলিকাতা হইতে দু একজন দোকানদার আসিয়া মনোহারী জিনিসের দোকান খুলে। নানা রকম তামাসা, দেশী সার্কাস, জুয়াখেলা, ভেল্কীবাজী প্রভৃতিও আসিয়া জুটে। পিতল, কাঁসা, তাঁবা, পাথর, কাঠ প্রভৃতি নির্ম্মিত নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়। নানাদেশের কাপড়, খাদ্য দ্রব্য সময়োচিত ফল মূলাদিও পাওয়া যায়। চাউলের মহাজনেরা এখানে এই সময় যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ক্রয় বিক্রয় করে।

মেলা অর্থাৎ জিনিস ক্রয় বিক্রয় এবং লোকসমাগম এখানে বৈশাখের প্রায় প্রতিদিনই হইয়া থাকে। তবে প্রতি রবিবারই যাত্রিদের বিশেষ মেলা এবং সেইজন্য অসংখ্য লোকসমাগম হয়। বৈশাখের প্রতি রবিবারই বহুদূর দূরান্তর হইতে ভদ্র অভদ্র নানা প্রকার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এদেশের হাট-বাজারে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বড় একটা যায় না। কিন্তু এই মেলায় স্ত্রী-

লোকেরা অবাধে এবং অগণিত সংখ্যায় যাতায়াত করে। কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বিষয় কখন শোনা যায় না। এদেশে অনেক গ্রামে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারী এক একদল গুণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রায়ই সুবিধা পাইলে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় এইরূপ অত্যাচার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চেষ্টায় এই অত্যাচার অনেক দমন হইয়াছে। তথাপি ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনো কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। এখানকার ফৌজদারী মকদ্দমার শতকরা ৯০টী এইরূপ স্ত্রীলোক বাহির করার জন্য অথবা অন্যপ্রকারে স্ত্রীলোকঘটিত। নিকা করিবার জন্য স্ত্রীলোক জোর করিয়া লইয়া গিয়া অনেক গুণ্ডা শেষে খুনাখুনী পর্য্যন্ত করিয়াছে এবং পাপের উপযুক্ত সাজা পাইয়াছে। এদেশে এইরূপ একটা ভয়ের কারণ আছে বলিয়া অতি গরীবের ঘরের স্ত্রীলোকেরাও হাটে বাজারে বড় একটা বাহির হয় না। কিন্তু কোন বড়মেলার সময় তাহারা এনিয়ম রাখিতে পারে না। এই বিরাটের মেলায় স্ত্রী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। বিরাটে হিন্দুর মেলা। এইজন্য হিন্দুজাতীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেই এখানে বেশী আসিয়া থাকে। ভদ্র স্ত্রীলোকেরাও গরুরগাড়ীতে থাকিয়া অথবা সুবিধাজনক জায়গায় বাসা করিয়া থাকিয়া তীর্থ করিয়া থাকেন।

কথিত আছে,এই বিরাটগ্রামই মহাভারতোক্ত বিখ্যাত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজধানী। এইখানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, ব্রহ্মবাদিনী প্রিয়তমা-পত্নী দ্রৌপদীর সহিত সম্বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা যেরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা-ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতজ্ঞ প্রত্যেক হিন্দুই বিশেষরূপে অবগত আছেন। অমিতবীর্য্য অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া ক্লীব হইয়া এক বৎসর নারীমহলে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় এক বৎসর রাজার মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। নকুল অশ্ববৈদ্য এবং সহদেব গো-বৈদ্য হইয়াছিলেন; আর কৃষ্ণপরায়ণা দ্রৌপদীর ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সীমা ছিল না। অনার্য্য-স্বভাবা রাজমহিষী সুদেষ্ণার অনার্য্য ভ্রাতা কীচকের হস্তে তাঁহার অবমাননার একশেষ হইয়াছিল; কেবল দুষ্টের দমনকারী কৃষ্ণের কৃপায় পাপীর সমুচিত দণ্ড হইয়াছিল। এই মহতী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণার্থ এখানে এই বৃহতী মেলা হইয়া থাকে।

কতকাল হইতে এই মেলা চলিয়া আসিতেছে, বলা যায় না। পাণ্ডবদের মহাকষ্ট স্মরণ করিয়া, যাত্রীরা এখানে একদিন বা ততোধিক দিন বাস করিয়া করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া যান। পূর্ব্বে, বোধ হয়,এই স্থানমাহাত্ম্য বেশীলোকের জানা ছিল না। বোধ হয় ৪০।৫০ বৎসর হইতে এইরূপ মেলার পত্তন চলিয়া আসিতেছে। মেলার মধ্যস্থলে স্বচ্ছবারিপূর্ণ একটী পুষ্করিণী আছে; ইহাতে স্নান করিয়া যাত্রীদের নূতন হাঁড়িতে ভাত রাঁধিয়া খাইতে হয়। ব্যঞ্জন কেবল তিক্ত করলা সিদ্ধ। এইরূপ করলাভাতে ভাত খাইয়া যাত্রীরা সমস্ত দিন ও একরাত্রি এখানে যাপন করেন। এখানে চাউলও যেমন

প্রচুর, এই সময়ে করলাও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এইরূপ কষ্টে আহার ও রাত্রিপ্রবাস করিয়া যাত্রিগণ একটী মহতী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ করিয়া থাকেন।

এখানে সচরাচর লোকে একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রত্যহ বহুসহস্র নূতন হাঁড়ি ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং যাত্রিদের আহারের পর এই হাঁড়িগুলি পরিত্যক্ত এবং দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভগ্নহাঁড়িগুলির বিশেষ কোন চিহ্ন পরদিন বা কয়েক দিন পরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে বলিয়া থাকে, পরে একটী ভাঙ্গা "খোলামকুচি" ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাঙ্গা হাঁড়ি ও "খোলামকুচি" যে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহা নহে; তবে চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে মনে মনে একটা প্রশ্ন হইতে পারে, এত হাঁড়ি প্রতিদিন ব্যবহার হইতেছে, সেগুলি কোথায় গেল? আর প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে যখন মেলা হইতেছে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের কতক ভাঙ্গা হাঁড়ি বা খোলামকুচি কিছু কিছু পড়িয়া থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটা উত্তর এই হইতে পারে যে, এদেশে বর্ষা খুব প্রবল হয়, বর্ষার জলে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও মেলার সময় একমাসের মধ্যে যত হাঁড়ি ব্যবহার হয়, তাহার ভগ্নাবশেষগুলি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেন যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। পুরীধামে যেমন রাস্তায় রাস্তায় সহরের চারিদিকে খোলামকুচি বিছান থাকে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার হয়ত অন্য কোন রকম কারণ থাকিতে পারে; সাধারণ লোকে তাহার কিছুই জানে না। এখানে আর একটী অলৌকিকত্বের কথা প্রচলিত আছে। তাহা এই, এখানে শৈবাল পরিপূর্ণ অর্দ্ধপঙ্কিল জলময় দুতিনটী পুষ্করিণী আছে। লোকে বলে এই কোন একটীতে অবগাহন করিলে অবগাহনকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। প্রাণ-ভীরু বাঙ্গালী কখন ইহার কোন রকম experiment করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। তবে দুএকজন ভদ্রলোক বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে না জানিয়া অবগাহন করায় দুতিনটী লোক মারা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই পুষ্করগুলির জল অতি কদর্য্য এবং কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত এবং কেহ বলিলেন, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র একজাতীয় বিষাক্ত সর্প আছে। কিয়দ্দূর একটী পুকুরে কুম্ভীর আছে। কুম্ভীরের ভয়ে জলে কেহ নামে না। এখানকার বাস্তবিক কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য থাকুক আর না থাকুক, এস্থান যে অতি রমণীয় এবং পুণ্যময়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ ভূভাগ; লোকের বাস বড় একটা নাই। ঘনসন্নিবিষ্ট ছোট বড় নানাবিধ বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র অরণ্যের শোভাধারণ করিয়াছে। মধ্যে পরিখাময় একটী প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; তাহাতে কচিৎ উদ্যানবৃক্ষের সুন্দর শ্যামল শোভা, কচিৎ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেকগুলি অযত্নরক্ষিত সরোবর প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মনে হয় যেন কোন প্রাচীনকালের রমণীয় তপোবনে আসিয়াছি। এখানে একপ্রকার নূতন সুমিষ্ট ফল বৃক্ষ দেখিলাম। নামে ক্ষীর বৃক্ষ বা ক্ষীরি-বৃক্ষ। ফলের নামও ক্ষীরফল। ফল সুমিষ্ট ও খুব সুস্বাদু, দেখিতে কতকটা দেশী খর্জ্জুরের ন্যায়। পাকিলে কতকটা

হরিদ্রাভ হয় এবং একটু শাদাটে থাকে; অতি কোমল, ভিতর শাঁসে পূর্ণ এবং তাহাতে খেজুরের মতন আঁঠি নাই। পারিলে বোঁটায় একটু দুধের মতন আঠা বাহির হয়। জলে খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে খাইতে হয়; দুগ্ধের সহিতও খাওয়া যাইতে পারে। সেকালের মুনি ঋষিরা স্বচ্ছন্দে এইরূপ সুমিষ্ট ফল খাইয়া তপোবনে বাস করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ এই ফল প্রাচীনকালের মুনিদিগের আশ্রমে পাওয়া যাইত। অভিজ্ঞানশকুন্তলোক্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ক্ষীর-বৃক্ষ থাকার উল্লেখ আছে, শকুন্তলা,আশ্রম হইতে পতিগৃহে যাইতেছেন, সঙ্গে আছেন মহর্ষি কণ্ব ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়, গৌতমী এবং দুটী প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা। সকলে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর শিষ্যদ্বয় মহর্ষিকে বলিলেন, "ভগবন্, বন্ধুজনের উদকান্ত পর্য্যন্তই যাওয়া উচিত, এইরূপ শাস্ত্রে আছে; অতএব আপনারা এই সরসীতীরে আমাদের সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হউন। মহর্ষি বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক; আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই"। আমার মনে হয়,এই শকুন্তলোক্ত ক্ষীরবৃক্ষ এবং এই বিরাটের মেলায় যে ক্ষীরবৃক্ষ দেখিলাম, উভয় একই বৃক্ষ। কোন কোন টীকাকার ক্ষীরবৃক্ষের অর্থ বটবৃক্ষ কিম্বা ক্ষীরস্রাবী অন্যান্য বৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ক্ষীরবৃক্ষ" এই পাঠান্তর করিয়া "ক্ষীর"র বটাদি অর্থ করিয়াছেন। তাহার কারণ অভিদানে আছে, ন্যগ্রোধো-ডুম্বরাশ্বত্থপারিশপ্লক্ষপাদপা। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চলক্ষণম্। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আরো সহজ ব্যাখ্যা হইতে পারে। ক্ষীরবৃক্ষ নামে স্বতন্ত্র বৃক্ষ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তপোবনাদিতে এইবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস যদি বট অথবা অশ্বত্থাদির কথা বলিতেন, তাহা হইলে সহজ ভাষায় সেই সহজ নামই করিতেন, একটা কঠিন শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ভাষার প্রাঞ্জলতাও কালিদাসের অদ্বিতীয় প্রতিভার একটী পরিচয়। যেমন ইঙ্গুদীবৃক্ষের কথা বলিয়াছেন,তেমনি ক্ষীরবৃক্ষেরও উল্লেখ করিয়াছেন,গ্রীষ্মকালে বটচ্ছায়া সেবনীয় হইলেও এই ক্ষীরবৃক্ষ ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষ বলিয়া সেবিতব্য। মহর্ষি কণ্ব দুহিতা লইয়া এইরূপ বৃক্ষেরই ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বিরাটের মেলায় অনেকগুলি ক্ষীরবৃক্ষ আছে। গাছগুলি দূর হইতে প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের ন্যায় দেখায়। পাতাগুলি বড় বড় কতকটা গাব পাতার ন্যায় এবং আরো বড় এবং ঘনসন্নিবিষ্ট এবং বৃক্ষগুলিও বৃহৎশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় ইহার ফল সুপক্ক হয় এবং অতি সুস্বাদু বলিয়া অনেকে ইহার ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষও চারিদিকে আছে; অরণ্যবৃক্ষ এবং উদ্যানবৃক্ষের বিচিত্র সমাবেশ। কোন স্থান মনোরম কুঞ্জবনের ন্যায়, কোন স্থান বা পবিত্র আশ্রমের ন্যায় রমণীয়। শুনা যায়, কখন কখন দুচারজন সন্ন্যাসী তপস্যার জন্য এখানে আসিতেন। রাজাহার নামক গ্রামের নিকটস্থ একজন বিশিষ্ঠ ভদ্রলোক বলিলেন, একবার একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন,তিনি সমাধির জন্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নানারূপ বিভীষিকা দেখিয়া তিনি এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না।

মেলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। একঘর দরিদ্র বৈষ্ণবজাতীয় গৃহস্থের এই ঠাকুর; বৈষ্ণবেই পূজা করিয়া থাকে। সম্প্রতি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বন্দোবস্ত হইতেছে; পূজার বিশেষ কিছু আড়ম্বর নাই, পূজার জন্য বিশেষ কিছু আয়ও নাই; যাত্রীরা কেহ কেহ অতি সামান্য পূজা দিয়া থাকে, এই পূজা যাত্রিদের তত লক্ষ্য নহে। কষ্টে দিনযাপন ও রাত্রিবাস করাই এই মেলায় আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

ঠিক এইখানেই যে বিরাটরাজার পুরী ছিল, এবিষয়ে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু এখানে যে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই! কতকগুলি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরাদির প্রস্তরখণ্ড, প্রস্তরনির্ম্মিত বহু দেবদেবী-মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে! খুব বড় বড় বাড়ীর ইষ্টক স্তূপ, ভূগর্ভনিহিত পুরাতন ইটের প্রাচীর এবং ভিত্তির ভগ্নাংশ নানাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিখার চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান আছে এবং প্রাসাদগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে ৩।৪টী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। একটী পুকুর বুজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার একদিকে সোপানগুলি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয়, রাজাপুঃপুরচারিণীদের জন্য এই সরোবরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত ভূভাগ পরিদর্শন করিয়া সহজেই অনুমিত হয়, এখানে বহুকাল পূর্ব্বে এক বিশাল রাজপুরী ছিল। যে দুএকখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত দুএকখানি গৃহ বা দেবমন্দির এখানে বর্ত্তমান ছিল। নিকটে পাহাড় নাই। কিছুদূরে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের অপর পার হইতে পাথর আনিতে হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এখানে কোন কালে এক সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। প্রাসাদগুলির ইষ্টকের আকার দেখিয়া অবশ্য মনে হয় না যে, মহাভারতের সময়ে এই সৌধগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে ইহা হইতে পারে, কোন কোন রাজা বা রাজাবলী, বংশ পরম্পরায়, মহাভারতের বিরাটপুরী এইখানে ছিল, মনে করিয়া, মধ্যে মধ্যে অট্টালিকাগুলির জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান গ্রামের নাম কিরূপে বিরাট হইল, ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়। শুধু বিরাট নয়, পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামের নাম কীচক। এই নামগুলি আজকালকার নয়, বহু বৎসরের; বহু শত বৎসরের, অশীতিপর বৃদ্ধেরা বলেন। তাঁহারা এই সকল নাম পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। নিকটে একটী মাটীর স্তূপের নিকট "বাণলিঙ্গ" নামে শিব আছেন। এখানে একটি বড় মন্দির আছে। এই শিববিগ্রহ বিরাটপুরীর শিবলিঙ্গ বলিয়া কথিত। নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে। লোকে বলে এগুলি শমীবৃক্ষ। অর্জ্জুন এক বিশাল শমীবৃক্ষে গাণ্ডীবাদি ধনুঃ ও অন্যান্য অস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে অবশ্য আরো শমীবৃক্ষ ছিল। কিন্তু সেই শমীবৃক্ষের বন আজও যে যথাস্থানে আছে, তাহা বিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ অর্জ্জুন একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতস্থ শমীবৃক্ষে অস্ত্ররক্ষা করিয়াছিলেন। নিকটে কোন পাহাড় নাই। তবে ক্ষুদ্র পাহাড় রাজ-রাজড়ারা বহুসহস্র বৎসরে কাটিয়া লোপ করিতে পারেন। কালে পাহাড়ও লোপ হয় এবং সমুদ্রের অবস্থিতি স্থানেও পর্ব্বতের স্থান

হয়। গ্রামগুলির এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থানকে লোকে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। মহাভারতের যেরূপ ভৌগোলিক বিবরণ লিখিত আছে, তাহা হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রংপুর জেলায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন মৎস্যজনপদ বর্ত্তমান ছিল। হয়ত সমগ্র উত্তর বাঙ্গালাই সেকালের বিস্তীর্ণ মৎস্য দেশ, সে কথা পরে বলিতেছি।

উপরে বলিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি আজও পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক সুন্দর হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী ভগবতী মূর্ত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূর্ত্তিটী কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নাবস্থায় আছে; এইজন্যই বোধ হয় অনাদৃত ভাবে রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, এদেশে পূর্ব্বে শক্তিপূজাই প্রচলিত ছিল এবং যাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন, তাঁহাদের দেবমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অসুর-বিনাশিনী বিজয়দায়িনী এই দুর্গামূর্ত্তি। অদ্যাপি রক্ষিত এই বৃহৎ বাণলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি এবং এই ভগ্ন শিবমন্দিরও তাহার আর এক বলবৎ প্রমাণ। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে আছে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসের জন্য রমণীয় বিরাটনগরে প্রবেশ করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবে দুটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা আছে, একটী কংস স্বীয় ভগিনীর দুহিতা বলিয়া শিশু দুর্গাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন; আর একটী দেবী ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, মহাভারতে মাঝে মাঝে ভগবান্ কৃষ্ণের সাধারণ-প্রচলিত বাল্যলীলার প্রসঙ্গ আছে এবং মহাভারতের সময়েও মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভগবতীমূর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যুধিষ্ঠির তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন, দেবী, যশোদানন্দিনী, নারায়ণপ্রণয়িনী, কংসধ্বংস-কারিণী, অসুরবিনাশিনী, দিব্যবস্ত্রমাল্যবিভূষিণী এবং খড়্গখেটকধারিণী। তিনি বালার্কসদৃশা, চতুর্ভুজা, চতুর্ব্বক্ত্রা, ময়ূরপিচ্ছবলয়া, কেয়ূরধারিণী, বিপুলবাহুযুগলা এবং নানায়ুধধারিণী। যুধিষ্ঠির স্তব শেষে বলিতেছেন—"হে দুর্গে, আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলনিমগ্ন, দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে ভক্তবৎসলে শরণাগত-পালিকে দুর্গে, আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। অযত্নরক্ষিত বর্ত্তমান কালের এই দুর্গামূর্ত্তিও এই স্থানের অতি প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এ অঞ্চলে আজ কাল আর শক্তিপূজা নাই। বুঝি বা শক্তি-উপাসনা হারাইয়া বিশাল বিরাট-পুরীর আজ এই ঘোর দুর্দ্দশা! এত বড় বিশাল্ রাজ্য কি কারণে একেবারে অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই!

স্বচক্ষে এইস্থান দেখিলে এবং প্রাচীন কথা ভাবিলে বাস্তবিক চক্ষে জল আসে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষের

বিষয় অতি অল্প লোকেই জানিত। মেলাও পূর্ব্বে প্রবল ছিল না। দু এক জন সন্ন্যাসী দণ্ডী মাত্র এখানে আসিত। স্থানীয় লোকেরা ক্রমে বিশেষ তত্ত্ব জানিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া পথ পরিষ্কার করাইয়া দুচার ঘর লোকের বাস বসাইয়াছে এবং এস্থানকে মনুষ্য সমাগমের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এখনো কেবল বৈশাখ মাসেই এখানে লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বৎসরের অন্যান্য সময় কেবল রাত্রিতে নয়, দিবাভাগেও কেহ বড় একটা এদিকে আসে না। রাত্রে কেবল বন্য জন্তুরই কোলাহল শ্রুত হইয়া থাকে। এখনো ভগ্ন পুরীর স্থানে স্থানে রাজপথ এবং কোন সরোবর প্রভৃতির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কালের কুটিল গতি। ক্রমশঃ সব লোপ পাইতেছে। রাজধানীর রাজপথ আজকাল "বাস্তুতে শিবাডিঃ"। যে দীর্ঘিকায় সুন্দরীরা জলক্রীড়া করিত, আজ মহিষগণ বিষাণাঘাতে তাহার আবদ্ধ সলিল স্থত্র সংক্ষুব্ধ করিতেছে। যে সোপানাবলীতে সুন্দরীগণের লাক্ষারসাদ্রচরণচিহ্ন অঙ্কিত হইত, আজ সেখানে ব্যাঘ্র-হতবন্য-জন্তুর শোণিত চিহ্ন রাগ। যে উদ্যানলতার পেলব পল্লবগুলি আস্তে আস্তে নোয়াইয়া কোমল অঙ্গুলিচয় পুষ্পচয়ন করিত, আজ বানরে তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। রত্নমণিভাস্বর গবাক্ষতল আজ কৃমিতন্তুজালে অচ্ছোদিত। আর বেশী বলিলে কি হইবে। অতীত আর ফেরে না। সম্মুখে নূতন ভবিষ্যৎ যদি কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ হয়, তাহাই যথেষ্ট। ভগবানের ইচ্ছায় পুরাতন পৃথিবী নবীন জগতে পরিণত হয়। আমরা পুরাতনের জন্য শোক করিয়া কি করিব? অপরিহার্য্য নূতনকে আমাদের আদর করিতেই হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা যেন নূতন শক্তি পাইয়া নূতনকে ভালবাসিতে শিখি।

বিরাটের নিকটবর্ত্তী রাজাহার গ্রামে অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠন দেবমূর্ত্তি আছে। ঐগুলি কোথাও কোথাও বট অথবা অশ্বত্থমূলে গ্রাম্য দেবতা হইয়া গ্রামবাসিদের পূজাই হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী বড় সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলাম। হঠাৎ দেখিলে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী হিন্দু দেবমূর্ত্তি, সম্ভবতঃ বাসুদেবমূর্ত্তি। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু পার্শ্বে অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি আছে। এমন হইতে পারে, বুদ্ধমূর্ত্তির অনুকরণে এইরূপ মূর্ত্তিগুলি গঠিত। প্রস্তরমূর্ত্তির নিম্নদেশে পাঁচটা অক্ষরে কিছু লেখা আছে। ঠিক পড়িতে পারিলাম না। সংস্কৃত অক্ষরই বোধ হয়, কিয়ৎ পরিমাণে অস্পষ্ট। ভবিষ্যতে ঠিক পাঠ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। এই প্রস্তরাঙ্কিত লিপি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ প্রাচীনতার নানা চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এখানে কোন এক সমৃদ্ধ রাজবংশের রাজধানী ছিল এবং এমনও হইতে পারে, প্রাচীন নগরী এইখানে কিম্বা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল।

এক্ষণে মহাভারতের বিরাটপুরীর যেরূপ ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে, তৎসম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, মৎস্যদেশ অথবা বিরাটাধিকৃত রাজ্য অতি বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং বিরাট রাজা ও শ্যালক সেনাপতি কীচকের সাহায্যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেনাপতি কীচকই বারম্বার ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কীচক বধের পর এই ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাই বিরাট রাজাকে নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ মনে করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতিকে মৎস্যদেশ জয় করিতে মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায় বড় বড় রথী মহারথী বিরাট রাজার গরু চুরী করিবার জন্য বাহিনী যোজনা করিয়া রণসাজে বাহির হইয়াছিলেন। দূরদূরান্তে নানা স্থানে বিরাটের সহস্র সহস্র গোধন ছিল। তাঁহার সহস্র সহস্র অশ্বমাতঙ্গাদিও ছিল। বিরাট জনপদ অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়াই কুরু মহাশয়েরা লোভ পরবশ হইয়া বিরাটকে অনুগৃহীত করিতে গিয়াছিলেন। রাজ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায়, বিরাটরাজ্য সেকালে খুব বিস্তৃত ছিল। বিরাটপুরী হস্তিনাপুর হইতে অনেকদূর, কিন্তু রাজরাজারা যুদ্ধ করিবার জন্য দূরদেশেই রণপ্রয়াণ করিতেন। সেকালে চারিদিকে বিস্তৃত অরণ্যানী ছিল। এই সকল অরণ্যের ভিতর দিয়া যুদ্ধাভিযান চলিত। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সময়ও রাজারা বহুদূরদেশে মৃগয়া করিতেন এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। তিনি ত স্বয়ং ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপার হইয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে এই বিরাটপর্ব্বে বিস্তৃত মৎস্য জনপদের কিরূপ ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে, দেখা যাউক। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্বাদশবৎসর অরণ্যবাস করিয়া প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কোন্ স্থান অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত হইবে। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে কয়েকটী বাসোপযোগী রমণীয় গূঢ়তম স্থানের উল্লেখ করিলেন। তিনি কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল বেদি, মৎস্য শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল, যুগন্ধর, বিশাল, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী এই কয়েকটী জনপদের উল্লেখ করিলেন। এই জনপদগুলি যে ঠিক কুরুমণ্ডলের অতি সন্নিহিত, তাহা নয়, অনেকগুলি জনপদ বহু দূরে। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দেশই পছন্দ করিলেন। ইহাই অতি সম্ভবপর যে, যে দেশ বহুদূরবর্ত্তী এবং অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত, যুধিষ্ঠির তাহাই ঠিক করিলেন। বিরাটরাজ্য যে বেশ দূরবর্ত্তী, তাহা এই বিরাটপর্ব্ব হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। কারণ পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট গমনের পথ সংক্ষেপে বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

বিরাটপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে এই পথের বৃত্তান্ত আছে। বর্ণনা এইরূপ, "যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ধনুঃ খড়্গ আয়ুধ তূণ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গ, কখন বা বনদুর্গে অবস্থান করিয়া মৃগয়া করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালদেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূর সেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন।" এই বর্ণনা অতি পরিষ্কার ; কোন ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। মৎস্যদেশের প্রান্তভাগ হইতে বিরাটের রাজধানীও বহুদূর। দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "নানাবিধ ক্ষেত্র ও পথ সমুদয়ের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি দূরবর্ত্তী হইবে। আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব এই রাত্রি এইস্থানেই অবস্থান করুন"। তার পর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, উপরিধৃত বর্ণনায় যে সকল জনপদের নাম আছে সেগুলি কোথায়, আর একটী কথা বলা আবশ্যক। যুধিষ্ঠিরাদি প্রথমে দ্বৈতবন কামকবন প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা বনাভ্যন্তর দিয়াই চলিতেছিলেন, কারণ তাঁহাদিগকে যেন কেহ দেখিতে না পায়। এই জন্য তাঁহাদের 'গিরি-দুর্গে' অথবা 'বনদুর্গে' বাস করিতে হইয়াছিল। এই জন্য ইহা বুঝা উচিত নয় যে, মৎস্যদেশের প্রান্তভাগ ঠিক উপরিউক্ত চারি জনপদের একটীর অতি সন্নিহিত। তাহারা অনেক অরণ্য এবং হয়ত অন্যান্য জনপদের প্রান্তভাগ দিয়া গিয়াছিলেন; প্রধান কয়েকটী জনপদ মাত্র উল্লেখ আছে। প্রথমে তাহারা কালিন্দীর তীরে উপনীত হইলেন। কালিন্দী যে যমুনা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার পর দশার্ণদেশের উত্তর দিক দিয়া তাঁহারা চলিলেন। এই দশার্ণদেশ মেঘদূতের "শ্যামজম্বু বনান্তা দশার্ণাঃ"। ইহাও এক বিস্তৃত জনপদ এবং বিদিশা ইহার রাজধানী। মেঘদূতেও আছে "বিদিশালক্ষণা রাজধানী" এবং বেত্রবতীর তীরে এই বিদিশা। ইহা হইতে বুঝা যায়, যুধিষ্ঠিরেরা বর্ত্তমান এলাহাবাদে কোন স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর পাঞ্চালদেশের দক্ষিণ দিক্ দিয়া তাহারা চলিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে চলিয়াছেন, অথবা দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ দিকে যাইতেছেন, একথার প্রমাণ পরে আছে। এই পাঞ্চালও এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ। মহাভারতে পাঞ্চাল দেশের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, পাঞ্চালদেশের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিত এবং উত্তর পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল নামে ইহার দুই অংশ আছে। বর্ত্তমান কালের গোরখপুর পর্য্যন্ত পাঞ্চালদেশ বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলেও বিশেষ বুঝা যায় না। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বদিকে বা দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, ইহা মনে করিলে, বুঝিতে হইবে, তাঁহারা এলাহাবাদের অনেক পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশ। যকৃল্লোমের বিশেষ বিবরণ পাওয়া কঠিন, তারপর শূরসেন দেশ লইয়া বিশেষ গোল। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনায় শূরসেন দেশের উল্লেখ আছে। "পুংবৎপ্রগল্‌ভা প্রতীহাররক্ষী" সুনন্দা ইন্দুমতীর কাছে শূরসেনাধিপতি সুষেণের গুণ বর্ণনা করিলেন। তাহার এক জায়গায় আছে "কলিঙ্গ-কন্যা মথুরাং গতাপি, গঙ্গোর্ম্মিসংসক্ত জলেব ভাতি।" তাহা হইলে শূরসেন জনপদের রাজধানী হইহইতেছে মথুরা। এই মথুরা নগরী লবণাসুর বধের পর শত্রুঘ্ন-নির্ম্মিত পুরী। মল্লিনাথ একটু Inachronism দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন, হয়ত এ অন্য মথুরা। বাস্তবিক অনেক সময় এক নামের দুই দোষ থাকাতে বড় গোলমাল হয়। কালিদাসোক্ত শূরসেন দেশ বোধ হয় বিরাটপর্ব্বের শূরসেন দেশ নয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাদিগকে পূর্ব্বদেশে যাইতে যাইতে আবার পশ্চিমে ফিরিয়া হস্তিনার দিকে যাইতে হয়। তাহা সম্ভবপর নয়। এই শূরসেন দেশ মগধের কোন অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। বরাবর পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া চারিটি বিস্তৃত জনপদ অতিক্রম করিলে মগধের ন্যায় কোনস্থানে আসিয়া পড়িতে হয়। মগধও অতি বিস্তৃত রাজ্য। ইহার পূর্ব্বে উত্তরবাঙ্গালা। জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিলে এই উত্তর-বাঙ্গালায় পঁহুছিতে পারা যায়। পাণ্ডবেরা যে দক্ষিণ পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ, বিরাট পর্ব্বের ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যা-

য়ের এক জায়গায় আছে "অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতীসেনা-সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরনির্য্যাতন মানসে কৃষ্ণ পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্নিকোণ পূর্ব্বদক্ষিণ-কোণ। যদিও জনপদগুলির ঠিক তৎকালীয় স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন, তথাপি এই দিঙনির্দ্দেশের দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, মৎস্তদেশে কুরুমণ্ডলের বহুদূরবর্ত্তী এবং অগ্নিকোণে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত মহাভারতের আর এক জায়গায় আছে যে, মৎস্তদেশ কুরুরাজ্য হইতে বহু দূরস্থিত একটী পূর্ব্বদেশ। রাজস্য়যজ্ঞের পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বদিকের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তিনি দশার্ণ, চেদি, কোশল ও কাশীরাজকে নির্জিত করিয়াছিলেন এবং পরে মৎস্ত এবং পণ্ডভূমি জয় করিয়াছিলেন। তিনি বিদেহ, গিরিব্রজ, কর্ণের অঙ্গদেশ পুণ্ড্রদেশ এবং কৌশিকীকচ্ছ জয় করিয়াছিলেন। এ সমস্তই বর্ত্তমান বাঙ্গালায় অবস্থিত। ভীমসেন আরো পূর্ব্বে গিয়াছিলেন; তিনি তাম্রলিপ্ত (তমলুক) এবং অন্যান্য বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং মহাসাগরকুল-বাসী ম্লেচ্ছগণকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, মৎস্তদেশ মগধসন্নিহিত কোন একটী পূর্ব্বদেশ, বোধ হয়, পূর্ব্বে মৎস্ত নামে অনেকগুলি জনপদ ছিল। যেখানে ধীবর জাতীয় লোকেরা বাস করিত, তাহাদের রাজাকেও মৎস্তরাজ বলা হইত। কুরুমণ্ডলের দক্ষিণেও এইরূপ এক মৎস্তরাজ্য ছিল। কিন্তু যাহার কন্যার সহিত অভিমন্যুর পরিণয় হয়, সেই মৎস্তরাজ পূর্ব্বদেশবাসী ছিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত মৎস্তরাজের বহু যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ত্রিগর্ত্তদেশ কোথায়, ইহার একটা মীমাংসা হইলেও বুঝা যাইত, মৎস্যদেশ ইহার কোন্ দিকে? কিন্তু তাহারও নির্দ্দেশ করা কঠিন। ১৩১০ সালের "প্রবাসী ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায়" "ত্রিগর্ত্তদেশ" নামে একটী প্রবন্ধ আছে। মনে করিয়াছিলাম, ইহাতে বুঝি কোন কোন ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম ইহাতে কতকগুলি অর্থহীন বাজে গল্প এবং কাংড়া নামক স্থানের কথা আছে; ভৌগোলিক কথা কিছুই নাই। লেখক বলেন "ভারতোক্ত ত্রিগর্ত্তরাজ শূরসেনের রাজ্য বর্ত্তমান কাংড়া জেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ; এ সকল কথা লেখক কোথা হইতে পাইলেন, তিনিই জানেন। তিনি ত্রিগর্ত্ত দেশটাকে কেন কামস্কটকায় লইয়া যান নাই, বলিতে পারি না। বরং যাঁহারা ত্রিগর্ত্তদেশকে "তিব্বত" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের কথায় কতকটা যুক্তি আছে; গঙ্গা, সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র, এই তিনটী নদ নদীর উৎপত্তি স্থান যেখানে আছে, তাহাকে বরং ত্রিগর্ত্তদেশ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভুটান, সিকিম বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন জনপদ ও প্রাচীন ত্রিগর্ত্ত এক, ইহা বলিলেও কতকটা সামঞ্জস্য থাকে। স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয় বর্ত্তমান পাতিয়ালাকে ত্রিগর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইহাও যে ঠিক, তাহা বলা যায় না। কুরুজনপদের বহুদূর পূর্ব্বে বাস করিয়া মৎস্যগণ কুরুমণ্ডলের উত্তর-পশ্চিম-দেশবাসী ত্রিগর্ত্তগণের সহিত সদাসর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, একথা বড় বিশ্বাস্য নহে। মহাভারতের আর এক জায়গায় ত্রিগর্ত্তগণের একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা হইতে কতকটা বলা যায়, ত্রিগর্ত্তদেশ মৎস্যদেশের বড় বেশী দূর নয় এবং ত্রিগর্ত্তদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের

একটা মীমাংসা করা যায়। ত্রিগর্ত্তদেশ আদৌ কুরুপ্রদেশের পশ্চিমে বা উত্তর-পশ্চিমে নহে। আশ্বমেধিক পর্ব্বে আছে, মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন স্বেচ্ছাচারী অশ্বের অনুগমন করিয়া নানাদেশে উপনীত হইলেন এবং তত্তৎদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বের উদ্ধার সাধন করিলেন। আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৭১ অধ্যায়ে আছে "যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে কত শত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এইরূপ সাধারণ বর্ণনার পর অর্জ্জুনে কয়েকটি বিশেষ দেশ জয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রথমেই ত্রিগর্ত্ত দেশীয় রাজাদের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৭৪ অধ্যায়ে এই যুদ্ধের বর্ণনা। তাৎকালীন ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মা এবং তাঁহার ভ্রাতারা অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহারই অব্যবহিত পরে স্বকীয় অশ্ব প্রাগজ্যোতিষদেশে উপস্থিত হয় এবং সেখানে অর্জ্জুনের সহিত ভগদত্ত পুত্র মহাবীর বজ্রদত্তের যুদ্ধ হয়। এই প্রাগজ্যোতিষপুর বর্ত্তমান আসাম দেশ। ভগদত্তের হস্তী ছিল। বজ্রদত্তও হস্তিপৃষ্ঠে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। এই আসাম প্রদেশই হস্তি-সঙ্কুল। এক্ষণে বেশ প্রমাণ হইতেছে, আসামের অব্যবহিত পশ্চিম প্রদেশেই ত্রিগর্ত্তদেশ। যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমে উত্তরে পরে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিল। আসামই সর্ব্ব পূর্ব্বদেশ। তাহার পশ্চিমেই ত্রিগর্ত্তদেশ। তাহা হইলেই ত্রিগর্ত্তদেশ কতকটা উত্তর বাংলার অংশ এবং বাংলা এবং হিমাচলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। হয়ত মগধের উত্তরপূর্ব্বাংশও এই ত্রিগর্ত্তদেশের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণ বেশ সহজে বুঝা যাইতে পারে যে, ত্রিগর্ত্তদের সহিত মৎস্যদেশবাসিদের সদাসর্ব্বদা সংগ্রাম হইত। এতকাল পরে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের অতীত ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত প্রমাণের সহিত অনেকাংশ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল এই হয়, একটী মত হইতে আর একটী মত আকাশ পাতাল বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। মৎস্যদেশের ও ত্রিগর্ত্তদেশের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। কিন্তু এই সকল দেশ যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে অনেক দূরে ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। অঙ্গাধিপতি কর্ণবীর যেমন বহুদূর হইতে দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত থাকিতেন, মৎস্যরাজ, ত্রিগর্ত্তরাজ প্রভৃতিও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইতেন।

এই বিরাটের মেলাস্থানে প্রাচীন বিরাট রাজধানী ছিল কিনা, ঠিক করিয়া বলা বড় দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণ প্রমাণ এবং নিজেদের অনুমান এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এইস্থানে বিরাটের স্মৃতিরক্ষার্থ মেলা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যে বড় ভুল করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় না। বহুসহস্র বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রমাণ চিহ্নগুলিও সব বিলুপ্ত প্রায়। তথাপি মহাভারতের ব[illegible]র নির্ভর করিলে অনেকটা প্রমা[illegible]প। একটী স্বেচ্ছাকৃত ঈশ্বর-প্রদত্ত [illegible] উত্তর বাংলায় এবং ইহার [illegible] অবস্থানে মৎস্যজনপদ

এবং বিরাট রাজধানী ছিল। এই মেলাটী কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য মেলার সহিত এই বিরাট মেলার বিশেষ প্রভেদ এই, এখানে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে অথবা দেবতার লীলা স্মরণ করিয়া এমেলা হয় না; একটী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জন্যই এই মেলার সৃষ্টি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

# থিওলজিক্যাল কলেজ।

## (প্রতিবাদ)

এক সময় এমন ছিল, যখন লোকে অন্যায় অসত্য অধর্ম্মের কথা বলিলে আদৌ সহ্য হইত না। প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। এখন যখন দেখি, লোকে অন্যায় করিয়া আপনার মত বা খেয়াল বজায় রাখিবার জন্য অন্যের উক্তির কদর্থ করিয়া জনসমাজে তাহাদিগকে অপদস্থ বা হেয় করিতে চাহে, তখন দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময় বন্ধু বিগড়াইয়া যায়, ইহাতে মনকষ্ট হইলেও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া একটা বিমল শান্তি পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া, লোকের সহিত কেবলমাত্র কথা কাটাকাটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া, নিম্নলিখিত দুই একটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আদি প্রবন্ধ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে, প্রতিবাদের নিয়মানুসারে প্রতিবাদও সেই পত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেই জন্য এই প্রবন্ধটী নব্যভা[illegible] শার্থ পাঠাইতেছি; আশ[illegible] ...হত মৎস্যরাজের [illegible] তর" ন্যায়- ত্রিগর্ত্তদেশ কো[illegible] নিষ্ঠ সম্পাদক মহ[illegible] ম অনুরোধে, প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিয়া সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সাধনে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কবীন্দ্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোনও উদীয়মান উদ্দাম প্রকৃতি যুবক লেখকের অসংযত লেখনী সঞ্চালন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন "ইনি লিখিলে, পরে একজন সুলেখক হইতে পারিবেন, তবে দুঃখের বিষয়, ইঁহার এখনই কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে।" কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম বলিয়া মনে হয় না; রবীন্দ্র বাবু ক্ষমা করিবেন। ইন্দুপ্রকাশ বাবু লিখিতেছেন। তাঁহাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা আনন্দিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-জগতে একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক। তাঁহাদের বংশ-পরম্পরাক্রমে সাহিত্য-চর্চ্চা দেখিলে কার না আনন্দ হয়; তবে ইন্দুপ্রকাশ বাবুর কবিবর রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় "কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে।"

ইন্দুপ্রকাশ বাবুর এখন এমন বয়স হয়

নাই যে তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অজাতশ্মশ্রু বলিয়া উপহাস করিতে পারেন; যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছু হইয়া মাঞ্চেষ্টারে শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ইন্দু বাবু অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ বা জ্ঞান-কনিষ্ঠ নহে, অথচ তিনি তাঁহাদিগকে অভদ্র-ভাবে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই যাহাদের পদতলে বলিয়া অনেক শিক্ষা করিবার রহি-য়াছে—অন্ততঃ ধর্ম্মার্থে এই স্বার্থত্যাগ—তাঁহা-দিগকে বিদ্রূপ করা জ্যাঠামী ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা লইয়া চিরদিনই জগতের জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতেছেন, সেই ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে অজাতশ্মশ্রু ইন্দুপ্রকাশ বাবুর হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র; কলি-কাতায় বসিয়া খুব মাথা ঘামাইয়া, কল্পনা-শক্তির বলে যাঁহারা থিয়লজিক্যাল কলেজ করিতেছেন, তাঁহাদের পদধূলি লইবার ইন্দু বাবু কোনও দিন উপযুক্ত হইবেন কিনা, জানি না। ইন্দু বাবুর এখন বাল-সুলভ প্রেম-কবিতা লিখিবার সময়। তাঁহার পক্ষে এখন তাহাই শোভা পায়!

ইন্দু বাবু প্রবন্ধারম্ভে ব্রাহ্মণদিগের অধঃ-পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি চিরপ্রথাগত চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়াছেন! যাহা বাপ দাদা হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখস্থপটু ছাত্রের ন্যায় বমন করিয়াছেন! ইন্দু বাবুর এখনও ছাত্র-জীবন ঘোচে নাই, সেইজন্য অর্থপুস্তক-লিখিত ব্যাখ্যার ন্যায় কতকগুলি কথা আওড়াইয়া ফেলিয়া-ছেন!

যাঁহারা মানব সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি-য়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন "একনায়-কত্ব" মানবীর ধর্ম্ম নয়। ঈশ্বর মানুষকে কতকগুলি নৈসর্গিক সত্ত্ব প্রদান করিয়া এ জগতে পাঠাইয়াছেন ঈশ্বর প্রদত্ত এই অধিকার হইতে মানুষকে অধিক দিন বঞ্চিত রাখা যায় না। প্রকৃতি তাহার আপন সত্ত্ব আদায় করিয়া লইবেই লইবে। (Nature will re assert herself) জ্ঞানোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার সত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে। ইচ্ছা আছে "মানবের নৈসর্গিক সত্ত্ব ও সামাজিক অধিকার" প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইন্দুবাবু যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা সহস্র কারণের মধ্যে একটী কারণ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সমাজ অধঃপতিত হইলেও এখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অতীব পূজনীয়, জ্ঞানে গুণে চরিত্রে উন্নত পুরুষ। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে কেন? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে তাঁহাদের প্রতিপত্তি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কেবল মাত্র পাশব বলের উপর নির্ভর করিয়া এত-দিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অন্য জাতিকে জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়া একটা অসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাতি সব বুঝিতে পারিতেছেন। জ্ঞানাধিকার, শাস্ত্রালোচন, ঈশ্বর সেবা, ধর্ম্ম সাধন ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়া ধন নহে। ইহা মানব মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, ইহা মানব জাতির জনম-সত্ত্ব (Birth-right)

ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান চর্চ্চা লইয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। এই অসঙ্গত অপ্রাকৃতিক অন্যায় জাত আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে দেখিতে পাইয়াছেন যে মানুষকে একটী স্বেচ্ছাকৃত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা পাপ। ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা অধর্ম্ম। দুঃখের বিষয় দিন

দিন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চা কমিয়া যাই-তেছে। ইহার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। এখন একদল "সাধন" শীল ব্রাহ্ম হইয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানকে বড়ই উপেক্ষা চক্ষে দেখেন। তাঁহারা একটা ভূয়া প্রেমের ঢেউ তুলিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোক ভুলিয়া যান, জ্ঞান ছাড়া ভক্তি অন্ধ-ভক্তি, আর জ্ঞান ছাড়া যে প্রেম, তাহা প্রেম নামের উপযুক্ত নয়, তাহা কাম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, জ্ঞানবিহীন হইয়া ভাই নিতাইএর 'মেরেছ বলে কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" এই উদারনৈতিক উচ্চ অঙ্গের প্রেমের ধর্ম্ম কিরূপ কদর্য্য জিনিষে পরিণত হইয়াছে! শ্রীহট্ট বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে "কিশোরী ভজন" বা "প্রকৃতি সাধন" বৈষ্ণবদিগের বিবরণ শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে "জাত কুল হারালে বৈষ্ণব" দিন দিন এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে, ইহার পরিণাম কোথায় শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এমন একদিন ছিল, যখন ব্রাহ্মসমাজ বলিলে লোকে "পবিত্রতার দল" বলিয়া উপহাস করিত, কোনও ব্রাহ্মের নিকট অসাধু কথা উঠিলে বা অশ্লীল গান হইলে "অপবিত্র" "অপবিত্র" "কুরুচি" "কুরুচি" বলিয়া বিদ্রূপ করিত। ব্রাহ্ম মানে puritan বুঝা যাইত। হায়! জানিনা কি পাপে ব্রাহ্ম-সমাজ এ অমূল্য জিনিষ হারাইয়া ফেলিলেন! পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ব্যভিচারী লোকের সহিত আলাপ করিতে ব্রাহ্মদিগের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত, তাঁহারা পাপকে যেন জীবন্ত যমের ন্যায় ঘৃণা করিতেন। এখন একদল বৃদ্ধ ব্রাহ্ম— বার্দ্ধক্যই যেন সকল পাপের মোচক হইয়াছেন—যাঁহারা 'পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করিও না' প্রচার করিতে গিয়া পাপকেও ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছেন। পাপীদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া পাপীর দল বাড়াইতে-ছেন। যাহাদিগকে হিন্দু সমাজ অমার্জ্জনীয় পাপ বশতঃ ঘৃণার চক্ষে দেখেন উদার প্রেমিক "সাধুশীল" ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন না; বিশেষতঃ তাঁহারা যদি অর্থবান লোক হন। ইঁহাদের প্রেম এতই উদার হইয়া পড়িয়াছে যে, ইঁহারা পাপ পুণ্যে প্রভেদ দেখিতে পান না বা চান না। মদ্যপায়ী ব্যভিচারী বারবণিতা-সেবী লোকদিগের সহিত একত্র আহার বিহার আমোদ প্রমোদ করিতে ইঁহারা বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠিত হন না। একবার খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, আমেরিকার কোনও অভিনেত্রী ধর্ম্মমন্দিরে কয়েক সহস্র ডলার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, ধর্ম্ম-সমাজের পরিচালকগণ অসদ উপায়ে অর্জ্জিত বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। উপরোক্ত উদার প্রেমিক দল বলেন, অর্থ কোথা হইতে আসিল, তাহার সংবাদ লইবার দরকার কি! কাজ ত হাঁসিল হইল! বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, এক সময় পতিত উদ্ধার করিতে গিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ কয়েকটী মহামূল্য রত্ন হারাইয়াছিলেন, সে কথা ব্রাহ্ম-সমাজ এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন!

ইন্দুবাবু কয়েকটী ধর্ম্মাত্মা পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজে এখন এরূপ লোক নাই। আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। এখন ব্রাহ্ম-সমাজে এমন লোক আছেন, যাঁহারা উপরোক্ত মহাত্মাদের অপেক্ষা কোনও বিষয়ে কম নন। তবে ব্রাহ্ম-সমাজ কেন যে দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতেছেন,

তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে,ব্রাহ্ম-সমাজ এখন আপনার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। লোকপ্রিয়তা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহারা দিন দিন আপনাদের আদর্শকে খর্ব্ব করিতেছেন। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মগণ লোকরঞ্জনের জন্য কোনও দিন আপনার আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই। আপনাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্ম তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। এখন নানা খেয়ালের লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন,কেহ সামাজিক আদর্শ লইয়া,কেহবা বিদেশ হইতে আসিয়া কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীন সমাজে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া,কেহবা হিন্দু সমাজে স্থান না পাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারা ধর্ম্মের ধার ধারেনা। তাহাতে আবার বর্ত্তমান শতাব্দীর ধর্ম্ম-বিহীন কেবল মাত্র অর্থকরী শিক্ষা প্রভাবে জন সাধারণ মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়"অর্থ" "অর্থ" করিয়া চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণও এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। আগেকার ব্রাহ্মগণ যেমন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া ছিলেন, এখন অনেকেই সেইরূপ অর্থের জন্য ক্ষেপিয়াছেন। অন্য সমাজের লোকগণ যেমন ন্যায় ধর্ম্ম সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত, ব্রাহ্ম-সমাজেও সেইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অর্থবান পুরুষ পাইলে ব্রাহ্মগণ,তাহার চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া, তাহার সহিত সপরিবারে অসংকোচে মিশিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক নীতি দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। দৈনিক উপাসনা না থাকায় অনেক পরিবার ম্লান হইয়া যাইতেছে। বিদেশ-প্রত্যাগত যুবকগণ বিভিন্নদেশীয় সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের নৈতিক আদর্শকে প্রতিদিন হীন করিতেছেন, তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন না পাইলে তাহারা পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে ক্ষুদ্রচেতা অনুদার বলিয়া উপহাস করেন। তাহাতে আবার ব্রাহ্ম-সমাজ স্বাধীনতা-প্রিয়। এখানে এক প্রকার সামাজিক শাসন নাই বলিলেই চলে। এরূপ অবস্থায় বিশেষরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা ভিন্ন এ সমাজের গতি কি হইবে,ভগবানই জানেন। ইহা উদ্দাম প্রকৃতি বালকের উপহাসের বিষয় নয়, চিন্তাশীল ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণেচ্ছু মহাত্মাদিগের ভাবিবার বিষয়।

ইন্দুবাবু "জীবন উৎসর্গ" কথাটা লইয়া অনেক নাড়া চাড়া করিয়াছেন। বোধ হয় নিজ গৃহে ধর্ম্মার্থে "দায়িত্ব বিহীন" "জীবন উৎসর্গের" প্রভাব দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আসল জিনিষটা বুঝিতে তাহার ভুল হইয়াছে। যাঁহারা কোনও কাজে আপনাকে বিকাইয়া দেন,তাঁহারা সেই কাজেই "তন্ময়" হইয়া যান। কি খাব, কি পরিব, কি করিয়া আমার সংসার চলিবে—এ সামান্য কথা ভাবিবার তাঁহাদের সময় থাকে না। তাঁহারা যাঁহার দ্বারা তাঁহার কাজে অনুপ্রাণিত হন, তিনি তাঁহাদের সকল ভার গ্রহণ করেন। তবে কি সমাজের তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য নাই? এমন কথা কে বলিবে? যাঁহারা আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব, সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিবেন,তাঁহাদের প্রতি উদাসীন থাকা কেবল অকৃতজ্ঞতা নহে, অধর্ম্ম, পাপ। ব্রাহ্ম-সমাজ তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা প্রার্থনার সহিত বুঝুন। আমরা বেশ বুঝিতেছি,আমাদিগের প্রচারকগণ দারিদ্র্য-জাঁতায়

নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা দরিদ্রতা বশতঃ আমাদিগকে উন্নত করিতে পারিতেছেন না। "বেগুন ভাতে ভাত" খাইয়া তাঁহারা আমাদিগকে উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, এরূপ আশা করাই ভুল। অর্থাভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বার্ত্তা দেশ বিদেশে প্রচার হইতে পারিতেছে না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারার্থী ধর্ম্ম। প্রচার বিভাগের অর্থাভাব দূর করিবার জন্য আমরা দুইটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম;—প্রথম, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচার-বিভাগে অন্ততঃ মাসিক এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। দ্বিতীয়, তিন বৎসর অন্তর এক মাসের মাহিনা বা আয় প্রচার-ফণ্ডে অর্পণ করিবেন। আমাদিগের প্রস্তাব দুইটী গুরুতর নয়। ইচ্ছা করিলে সকলেই অনায়াসে মাসে এক আনা চাঁদা দিতে পারেন। অনেকে আপত্তি করেন, ব্রাহ্ম-সমাজ দরিদ্র। আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না, বরং আমাদের নিকট এ কথা অসত্য বলিয়া মনে হয়। লোক-সংখ্যা গণনায় (census) দেখা গিয়াছে, ব্রাহ্মদিগের সংখ্যানুসারে তুলনায় ব্রাহ্মগণ দরিদ্র নয়। তবে সাহেবীয়ানা করিতে গিয়া সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিলে কাহার দোষ? দেড় হাজার দুই হাজার টাকার আয়ের লোকের যদি মাসের শেষে ধার করিতে হয়, তাহা হইলে কি আয়ের অপরাধ! দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রস্তাব দরিদ্র নয়, ধনী ব্রাহ্মগণ উড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের এখন বিশ্বাস, এ প্রস্তাব আবার উত্থাপন করিলে তাঁহারাই উড়াইয়া দিবেন। ঈশ্বর অনুগ্রহে যাঁহাদের যথেষ্ট আছে, তাঁহাদের বোধ হয় ঈশ্বরে প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্মের প্রতি একটা ঐকান্তিক টান থাকিলে এরূপ হইত না।

ইন্দু বাবু "ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি" কেন, তাহার একটা সমস্যা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, অকালপক্কতা। সকল দেশের লোক শিখিবার জন্য ব্যস্ত, আমাদের দেশের লোক শিখাইবার জন্য ব্যস্ত। ইন্দু বাবুর মতন অজাতশ্মশ্রু বালকের কি গুরুগিরি করিবার বয়স বা জ্ঞান লাভ হইয়াছে ইন্দু বাবুকে অজাতশ্মশ্রু বলাতে তাঁহার দুঃখ করিবার কোনও কারণ দেখি নাই, কারণ প্রকৃত পক্ষে তিনি অজাতশ্মশ্রু।

সেক্ষপীর আপন বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সের মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ডাক্তার জন্‌সনের পত্নী তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ন্যায়-চঞ্চু ইন্দু বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন "সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজ স্থির করিলেন, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বড় না হইলে সমাজ-সংস্কারই হইল না" বাহবা কি যুক্তিরে! কবিবর হেমচন্দ্রের কথাটা মনে হইতেছে:—

"বেঁচে থাক মুখুর্য্যের পো"—তবে এখানে বাঁড়ুর্য্যের পো!

ইন্দু বাবু মিলের ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। আজ মিল ধন্য! বেহার ন্যাশন্যাল কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপকও ধন্য যে তিনি এরূপ ন্যায়রত্ন তৈয়ার করিতে পারিয়াছেন! কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ধন্য যে তাঁহাদের ন্যায় পড়ান সার্থক হইয়াছে, নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিত কি ইন্দু বাবুকে ন্যায়ের একটা উপাধি দিতে পারেন না?

ইন্দু বাবুর কল্পনা-শক্তির দৌড় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। তিনি যে ব্যক্তি বিশেষের বিবাহের উল্লেখ করিয়া গাত্রদাহ শীতল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ের কোনও বিশেষ উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্ম-সমাজ এ প্রকার বিবাহের অনু-

মোদন করা দূরে থাকুক, এরূপ বিবাহ সঙ্গত মনে করেন না। ব্রাহ্ম-সমাজের ভক্তিভাজন নেতারা উপরোক্ত বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা গোপনীয় বন্ধু-পত্রে জানিয়াছি। এরূপ বিবাহ কোনও সমাজের কল্যাণপ্রদ নহে। এমন কি,যে য়ুরোপ-বাসীদের"অন্ধ-অনুকরণ-প্রয়াসী বলিয়াই ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি" সেই য়ুরোপ-বাসীদিগের জাতীয় সাহিত্য পাঠে জানা যায়,তাঁহারাও এই প্রকার বিবাহের বিশেষরূপ অনুমোদন করেন না। চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, একটী বালিকা ১৭।১৮ বৎসরেই পূর্ণাবয়স্কা হইতে পারেন। কিন্তু একটী বালকের পূর্ণতা লাভ করিতে ২৭।২৮ বৎসর লাগে। আর দেখা যায়,মহিলাদিগের মাতৃত্বশক্তি (৫০) পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হয়, কিন্তু একটী পুরুষের (৬০) ষাট বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানের পিতা হইবার শক্তি থাকে। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়,পুরুষ অপেক্ষা নারী অন্ততঃ দশ বৎসরের ছোট হওয়া আবশ্যক। ইহা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সঙ্গত। যাঁহারা এ সব সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া,ঘটনাচক্রে পড়িয়া,ঐরূপ অসঙ্গত যুক্তি হীন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সর্ব্বদাই লোকচক্ষে হীন হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা কৃপার পাত্র।

আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুকে চিনি। ইন্দু বাবুর মতন অন্তরঙ্গ বন্ধু না হইলেও তাঁহার সহিত সবিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার সহিত অনেক সময় অনেক বিষয় লইয়া আলাপ হইয়াছে; কিন্তু কোনও দিনই তাঁহার মুখে অর্থাভাব বশতঃ প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া বলিতে শুনি নাই।

ইন্দু বাবু প্রকারান্তরে কুচবিহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী মিস ফ্রন্সিস পাওয়ার কব মহোদয়ার পত্র প্রকাশের পর ইহা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার দুইটী ভক্ত বিশ্বাসী Kesub chandra Sen, correct statement of some disputed facts of his life নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। "Kesub Chandra Sen—a Study" নামক প্রবন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ও নানা প্রকার অন্যান্য কারণে এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি নাই। মল্লিখিত কেশব-চরিতে ইহার সম্যক সমালোচনা করিব।

এখন শেষ কথা। ইন্দু বাবু বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সমাজে রীতিমত কলেজ করিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার দিন আসে নাই, আমরা বলি, অনেকদিন দিন আইসে না বলিয়া বৃথা অতিবাহিত করা, আর বিলম্ব করা চলে না। কলেজ করিয়া যে কেবল প্রচারক তৈয়ার করিতে হইবে,তাহা নহে, তবে ইন্দু বাবুর ন্যায় উদ্ধত অসংযতবাক্ ব্রাহ্ম-সন্তানদিগকে ধর্ম্মপিপাসু সংযমী চরিত্রবান্ যুবকে পরিণত করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের সন্তান গুলি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপযুক্ত হইলে তাহাদের চরিত্রের ধর্ম্মপিপাসার দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। উপাসনা-বিহীন পিতা মাতাদিগের সন্তান-গুলিকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। মনে হয়, ব্রাহ্ম-সমাজ সকল প্রকার কাজ ফেলিয়া ব্রাহ্ম পরিবার গঠনে প্রবৃত্ত হউন। নূতন লোক না আনিয়া,যাঁহারা আছেন,তাঁহাদিগকে গড়িয়া তুলুন। তাহা হইলে ইন্দুবাবুর মতন অজাতশ্মশ্রু বালকদিগের জেঠামী দেখিতে

হইবে না। তাহা হইলে তিনি এই বয়সেই "অসাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ" সৃষ্টি করিবার ভয় দেখাইতেন না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই এক কথা বলিতে হইল। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আর ন্যায়নিষ্ঠ দেবীপ্রসন্ন বাবুর নিকট আমাদের এই একান্ত অনুরোধ, তিনি যেন অকালপক্ক অপরিণামদর্শী উদ্দাম প্রকৃতি বালকদিগের খেয়ালে "নব্যভারতের" পৃষ্ঠা কলঙ্কিত না করেন। "নব্যভারতে" আমরা অনেক মূল্যবান জিনিষের আশা করিয়া থাকি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

# বাবুর মহাপ্রস্থান ও শ্রীযুক্তের পুনরুত্থান।

উপাধি মহাশয় কতকাল যাবত ভূমণ্ডলে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ সহজসাধ্য নয়। দেবভাষা মন্থনে আমার সময় ও সুবিধা হয় নাই, অতএব অবধারণ করিতে পারি নাই,বেদ-প্রবর্ত্তিত কালে তিনি মূর্ত্তিমন্ত ছিলেন কিনা ; তবে মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজা, নরপতি রূপে তত্তৎ সময়েও তিনি মর্ত্ত্য ধামে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে ত্রুটী করেন নাই, এটী নিশ্চিত কথা। সেইকালে জাতিগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন উপাধি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা, তাহাও দুর্ণিণেয়। আমরা বাঙ্গালী, অতএব আমাদের বিবরণ হইতে ঐ সকল কথার আলোচনা এবং এই সমাজে কোন্‌কালে কোন্ উপাধির প্রধান্য লাভ ঘটিয়াছে,তাহাই নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। তবে বিদ্যাবত্তা জন্য বেদব্যাস,উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধির বিবরণ বহুকাল যাবত শ্রুত হওয়া যায়। আমরা পাণ্ডিত্যের আলোচনা না করিয়া বিষয়ীর উপাধি সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব।

পাল ও সেন রাজগণ হইতে আমরা ঐ দুই উপাধির বিবরণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। উহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। পরে বল্লাল রাজার সময়ে মুখোপাধ্যায়,চট্টোপাধ্যায়, সেন, দাস, ঘোষ, বসু প্রভৃতি উপাধির মাত্রা জাগিয়া উঠে। সম্ভবতঃ এই সময়েই "মহাশয়" আসিয়া তাহাদের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়া "অত্যাগ সহনো বন্ধুঃ" ভাবে দৃঢ়ালিঙ্গনে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরেন। আমাদের বিবেচনায় মহাশয় সম্বোধনটী বাঙ্গালীগণের সর্ব্ব প্রথম সাগর ছেঁচা ধন। মুখোর্য্যা মহাশয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সেন মহাশয়, বসু মহাশয় ভাবেই এতকাল বিরাজিত ছিলেন, তবে গল্পচ্ছলে কখন কখন, বঙ্গের স্থল বিশেষে পরামাণিক মহাশয় রূপেও ব্যবহৃত হইত। মহাশয় শব্দ যে নামের সহিত সংযুক্ত হইত, তাহাই ইতিপূর্ব্বে উৎকর্ষ-বোধক ছিল। এহেন "মহাশয়" কিন্তু কখনও নামের অগ্রে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি চিরদিন পিছনে পিছনেই বসিয়া আসিয়াছেন, তবু কিন্তু তাহার ইজ্জত কম ছিল না।

মুসলমান রাজার আমলে বহু হিন্দু সন্তান রাজপ্রসাদ লাভ বা ছলে বলে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া,'রায়''চৌধুরী'' বাহাদুর''মজুম-

দার প্রভৃতি হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু "মহাশয়" মহোদয়, নাছোরবন্দ, তখনও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই, পূর্ব্ববৎ পশ্চাৎই লাগা আছেন। কৌলিক উপাধি, বাড়ুর্য্যে,চাটুর্য্যে সেন, দাস প্রভৃতির স্থানে মানের রায়, চৌধুরী প্রভৃতির যেমন অভ্যুদয়, "মহাশয়" তখনই তাহাদের কাছা আটিয়া ধরিতে প্রস্তুত, কাজেই রায় মহাশয়, চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি রূপেই তাহার নূতন পত্তন হইল। তাই সকল,তোমরা যত কেন উপাধির উলট পালট না দেখ, আমাদের "মহাশয়" কিন্তু সর্ব্বদাই অচল ও অটল, তাহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। এদিকে কিন্তু "শ্রীযুক্ত" চিরকালই শ্রীসম্পন্ন, সর্ব্বাগ্রে তাহারই আসন।

কালে মুসলমান রাজশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া ইংরেজ বাহাদুরের প্রতাপ দেশব্যাপী হইলে, দেশের আইন, আদালত, রীতি, নীতি,ভাষা, সবই উলটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত ও মহাশয়ের অষ্টম মঙ্গল বা রন্ধ্রগত শনির কোপাক্রান্ত। ঠিক এই সময়ে "বাবু" ভায়ার শুভাগমন; ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চল হইতে "লালা" উপাধির একটা আমদানী উপস্থিত হইয়াছিল। রাজসাহীর জমিদার উদয় নারায়ণ ও সুপ্রসিদ্ধ রাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস রায় গৌরদাস প্রভৃতি সসম্ভ্রমে এই "লালা"কে আপন আপনাদের পৃষ্ঠে স্থান দান করিয়া ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, কাঁদির "লালা বাবুর" নামত এখনও বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই রূপ বড় ও ছোট বহুরূপ কর্ম্মচারী ও বিত্তসম্পন্ন লোক সকল এই উপাধিটাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "লালা" মহাত্মা কিন্তু বেশী দিন টেঁকেন নাই, নবাবী আমলের অন্তিমে তাহার বঙ্গদেশে আগমন, শ্বেতাঙ্গের প্রাদুর্ভাবে তাঁহার মহাপ্রস্থান। তবে যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার জন্ম, তথায় তিনি আজিও সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন। বাবুভায়া তথায় পরাস্ত। এ পর্য্যন্ত আগন্তুক সকল উপাধিই, "মহাশয়কে" সহকারী ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু "বাবু" তাহাতে বড় নারজ; তিনি "জী" ও "সাহেব" এই দুটীকে সহকারী করিয়া লইলেন 'বাবুজী' ও "বাবু সাহেব" শুনিলে তিনি যতদূর সন্তুষ্ট হইতেন,বাবু মহাশয় বলিলে ততটা হন নাই। মহাশয় তৎসন্নিহিত হইলেই তিনি চটিয়া যাইতেন, বেচারা ভয়ে ভয়ে, অন্যের আশ্রয়ে কোনরূপে দিনপাত করিত।

সর্ব্বপ্রথম "বাবু" বড় লোকের সহিতই আত্মীয়তা সংস্থাপন করিয়া প্রতিপত্তি বাড়াইয়াছিলেন। চলিতেন গুরুগম্ভীর ভাবে,সেবা করিতেন বড় লোকের! ছোটর পানে তাকাইতেও ঘৃণা বোধ হইত। তবে মহাশয় যেমন গল্পের বেলায় জুয়াচোর প্রভৃতির সহিত সংযোগ লাভ করিতেন, তদ্রূপ 'বাবুও' কখন কখন ব্যক্তি বিশেষের ঘাড়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে "হঠাৎ বাবু" নামে পরিচিত করিয়া লোকের হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত।

ক্রমে সর্ব্ব সমাজেই বাবু ভায়ার শুভসংযোগ ঘটিল, তিনি যেন নানাবিধ উপায়ে তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, অমায়িকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। তাহার স্থানাস্থান জ্ঞান নাই, জাতি বিচার নাই, দৃঢ় ভ্রাতৃভাবে সকলকেই প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতে প্রস্তুত। নিত্যানন্দ, কেশবানন্দ, দেবেন্দ্র, প্রভৃতি মহাত্মা সকলও তাহার নিকট অমায়িকতায় পরাস্ত মানিলেন, কারণ তাঁহারাত আর সর্ব্বজ্ঞাত নন; বাবু ভায়ার কিন্তু সেই গুণটুকু

বিলক্ষণ ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজের, হরিমন্দির ও ব্রহ্মমন্দির হইতে কত কত অপদেবতার আশ্রমে পর্য্যন্ত তাহার শুভাগমন হইতে লাগিল। সকলেই এহেন মহাত্মাকে ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। মোটের উপর হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেই ভক্তিভরে বাবু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমের বা তান্ত্রিক পূর্ণাভিষেকের আনন্দোপাধি লাভের ন্যায়, বাবু উপাধি ধারণ করিয়া বসিলেন। গঞ্জিকা-ক্রয়ের অর্থ চিন্তায় যে জন নিরানন্দ,তিনিও বাহিরে আনন্দ ; যাহার হাঁড়িতে চাল চড়ে না,এদিনে তিনিও বাবু।

এস্থলে শ্রীযুক্তের কথা একটুকু বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত,শ্রীমান প্রভৃতি একাত্মা বিশিষ্ট ; তবে স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন মাত্র। শ্রীযুত এত দিন রাজাধিরাজের পূর্ব্বেও অবস্থান করিতেন, কিন্তু কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন, কারণ নব রাজভাষার সম্প্রসারণ সহ তাহার স্থান ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। বাবু ক্রমে জাঁকিয়া উঠিলেন। লেখার বেলায় "বাবু" নামের পূর্ব্বে ও কথার বেলায় বাবু নামের পশ্চাৎ ব্যবহৃত হইয়া, শ্রীযুত ও মহাশয়ের দফারফা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া পৌত্রিক ভাষার ভাঙ্গা বাজারে কুঁড়ে বাঁধিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত ও মহাশয় বুনেদিবংশ-সম্ভূত,শাস্ত্রালোচনায় তাঁহাদের প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বাবু কি কুহকে দেশীয়দিগকে ভুলাইয়া যে আপন পসার বাড়াইয়া উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিলেন, তদ্দিকে কয়জনে লক্ষ্য রাখিয়াছেন ?

যখন তিনি বাঙ্গলায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন কেহই ভাবে নাই যে,তিনি একটা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবেন। পরে কিন্তু তাহার গুণ গ্রামের পরিচয় পাইতে কাহারও বাকী রহিল না, তিনি ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় করিলেন,বিলাসিতার স্রোতে দেশ মজাইয়া বিদেশী আমদানীর প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিলেন, যাহারা চাকচিক্যে বাহিরে বড় মানুষ,হা অন্ন,যো অন্ন বলিয়া তাহাদের পরিবারগণ কিন্তু দিশাহারা ! বাবু ভায়ার এই সকল কৌশল এত সন্তর্পণে সংসাধিত হইয়াছে যে,কেহ উহার প্রসারণের ভাবাভাব,কাষ্ঠপাদুকার পদ-চিহ্ন ধারণের ন্যায় প্রথম প্রথম অনুভব করিয়াই উঠিতে পারেন নাই। এহেন বাবু ভায়ার জন্ম কর্ম্ম নির্ণয় করিতে যাওয়া একেবারে অসঙ্গত নয় ; কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে বাবা শব্দ হইতে বাবুর আবির্ভাব, কিন্তু আমার নিকট সেটী ভাল বোধ হয় না। কারণ মাতুল শব্দ হইতে মামার উদ্ভব, এজন্য মায়ের ভ্রাতাকেই মামা বলা হয়। কিন্তু বাবুর বেলায় তাহা নয়, দাদাবাবু, পিসেবাবু, মামাবাবু, সর্ব্বদাইত শুনা যায়, বাবু বাবা স্থানীয় হইলে অন্ততঃ মামাবাবু কখনই বলা হইত না। অতএব বাবু শয়ম্ভু। আমার বিবেচনায় টেমস্-বিহারী শ্বেতাবতারে মুখ-বিবর হইতে এই বাবু পদ্মযোনীর আবির্ভাব হইয়া বঙ্গ সিন্ধবাদের স্কন্ধে সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাবু যখন গুরুগম্ভীর ভাবে বড় ঘরে বিচরণ করিতেন, তখন কিন্তু তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। বহু উপাধি-সমন্বিত বড় লোক কেহবা অবনতিতে,কেহবা উন্নতিতে তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আবার তৎসময়ে কতকগুলি নব ভাগ্যধর বাবুত্ব লাভ জন্য,দেবতার নিকট নানারূপ মানস ও বাড়ীর সদ্যজাত খোকাকে

নরসিংহ বাবু বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিতেন। তৎকালে বাবু বলিলে একটা জাঁকজমক-বিশিষ্ট ধনধান্য পূর্ণ ব্যয়শীল বহু লোক-প্রতিপালক ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করিত। কিন্তু সিকি শতাব্দী অতীত না হইতেই ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিল। বাবুর বাজার ঘাটে মাঠে, হাটে,—দাড়িমাঝি বাবু, রাখালবাবু, মুটেবাবু ইত্যাদি, আবার গাড়ী, হাতী চড়িয়া যাহারা বেড়ান, তাঁহারাও বাবু। হাল আইন অনুসারে যে অর্থশালী মানব, দুইজন আত্মীয় বা দরিদ্রের এক সন্ধ্যা আহার যোগাইনে কুণ্ঠিত, তিনি হলেন বড় বাবু। বাস্তবিক অতি পূর্ব্বে বাবুর আদর ও সম্মান যে কত বড় ছিল, তাহা এখন অনুমান করাও সহজসাধ্য নয়। অধুনা আমরা ভাবি, রাজাবাবুও যেমন, ব্যক্তি বিশেষের সন্তান দুঃখিরামবাবুও তেমন।

বাবুর পসার যখন ক্রমে বাড়িয়া পড়িবার সূত্রপাত, কলিকাতা অতিক্রম করিয়া সুদূর পল্লীতে প্রবেশ লাভ করে নাই, ঠিক সেই সময়ে আমাদের কবীন্দ্র মহাশয় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একবার কলিকাতা আগমন করেন। ত বাল্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে কলিকাতা বাস করিতেন, একদা কবীন্দ্র তাহার সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। প্রথম সন্দর্শনের পরই, মুখোপাধ্যায়, "কি হে কাশীবাবু, কবে এলে" বলিয়া কবীন্দ্রকে সম্বর্দ্ধন করিলেন, কিন্তু তিনিও অস্থির ও অবাক্, কারণ ভ্রাতৃস্থানীয় বিশু মুখুর্য্যে তাহাকে এইরূপ পরিহাস করিবেন, তাহাত ভাবনাতীত ব্যাপার; করেন কি, হতবুদ্ধি হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি গুঁজিয়া দিলেন ও জিব কাটিয়া রথের পুতুলবৎ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ এই যে, কবীন্দ্র যাঁহার কন্যার পাণি পীড়ন করিয়াছিলেন, তৎকালে দেশমধ্যে তাহার বা তৎবংশীয়েদেরই বাবুর মৌরস পাট্টা পর্য্যন্ত ছিল। শ্বশুর বাবুর কথা স্মরণ করিয়া কালীকবীন্দ্রের এই আকৃতির বিকৃতি। "বাবু" আহ্বানে উত্তর প্রদান করিলে প্রত্যবায় আছে, এইটী তাঁহার প্রথম বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ বাবু হইতে হইলে যেরূপ জাঁকজমক থাকা কর্ত্তব্য, তাহাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই সকল ভাবিয়া তিনি আড়ষ্ট, এদিকে কিন্তু বিশ্বম্ভর মুখুর্য্যে কালীবাবুকে কোনমতে নিষ্কৃতি দিতেছেন না; নির্ব্বাক কবীন্দ্র কিঞ্চিৎ পরেই এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিলেন, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া "কিহে বাড়ুর্য্যে ভায়া, ভাল আছত" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিশুর শ্বশুরের উপাধি তাহার জানা ছিল, তাই এ যাত্রায় কবীন্দ্র পরিত্রাণ পাইলেন। বিশ্বম্ভর পল্লীর লোক, তাহার একথা বুঝিতে বাকী থাকিল না, তিনিও হাসিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিলেন, কবীন্দ্রকে আর বাবু বলিতে সাহসী হইলেন না।

তৎপর হইতে সুদূর পল্লীতে বাবুর ছড়াছড়ি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, পশার বৃদ্ধির সহিত বাবু ভায়াত আট থানা। এই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ নাটককার মৃত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়, কুমারী বাব্বীর সহিত বাবুর শুভ পরিণয়ের প্রস্তাব করেন, ভায়া কিন্তু তাহাতে নাক সিট্কাইয়া কার্য্যটা পণ্ড করিয়াছেন। তখন চতুর্দ্দিকে রব উঠিল 'বাবু' চির কুমার ব্রত গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত, শ্রীমান ও মহাশয় কিন্তু এত সুরুচি বা সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই; তাহারা যথাক্রমে শ্রীযুক্তা, শ্রীমতী ও মহাশয়ার পাণি গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতে কি, এই সুনামের জন্য বাবুর মহা সম্মান বর্দ্ধিত

হইল। তিনি ব্রহ্ম-কল্পিত মহাত্মা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল। দেশ মধ্যে তাহার জয়জয়কারের আর পরিসীমা নাই। এদিকে যে সকল বড় লোক বা বড় বংশ আশ্রয় করিয়া বাবুর এত প্রতিপত্তি প্রসার আরম্ভ, তাহারা কিন্তু বাবুর যত্র তত্র বিচরণ ও সর্ব্বজীবে সম দয়া দেখিয়া হাড়ে হাড়ে তাহার উপর ও তদীয় নূতন ভক্তদলের উপর বিরক্ত হইলেন ও চটিয়া গেলেন।

সংসারে সকলের দিন সমান যায় না, আদুরে নন্দলালও একবার যশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুবদ্ধ হইয়াছিলেন। বাবু (পুরুষ) দরবারে আপনার গুণাধিকর অবলোকনে,পরে প্রকৃতি (মেয়ে) মহালে আধিপত্য বিস্তার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া, ঝি ডাকিনীগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চাঁপা ঝি প্রায়ই তাহার ভর্তৃদারিকাকে 'দিদিবাবু' এবং শ্যামা ঝি মেজে বাবুর সিমন্তিনীকে প্রায়ই "দেখ" ভাই বৌদিদি বাবু" বলিয়া মনোরঞ্জন করিত। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিত।" আমরা তখনই বুঝিয়াছি, বাবু ভায়া আর টেকেন না। তিনি এত পবিত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াও যখন 'কামিনী কাঞ্চনের' সহিত সম্পর্ক ঘুচাইতে পারিলেন না, তখন নিশ্চয় তাহাকে পটল তুলিতে হইবে।

সত্য সত্যই জাতীয় উচ্ছ্বাসে আমাদের সেই অনুমান অনেকটা সত্য হইবার উপাক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি 'বাবু' কাবুর মধ্যে পড়িয়াছেন। যে রাজত্বে, যে উদ্দেশ্যে তাহার উৎপত্তি, তাহাদের সেইকার্য্য তিনি অনেকটা গুছাইয়া দিয়াছেন, বিলাতী সাজ সজ্জায় দেশ প্লাবিত, আয় অপেক্ষা ব্যয়ের তালিকা ঘরে ঘরে অধিক পরিদৃষ্ট হইতে বাকী নাই। চাকচিকে বাবু হইলেও আর বিংশ শতাব্দীতে এখন বাবুর কথা সাহেব মহালে বিকায় না, "হা অন্ন হা অন্ন" রব ঘুচে না। নানাদিক দেখিয়া শুনিয়া শ্বেতকায়ের সর্ব্ববিধ সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বাঙ্গালীর মনে স্থান লাভ করিয়াছে। বাবু উপাধিই যে উহার আর একটা ব্যাধি, তাহাও বুঝিতে বুদ্ধিমানের বাকী নাই, এজন্য বিদেশী আমদানী শরীরী সূত্র, বস্ত্র, দেয়াশলাই, লবণ প্রভৃতির ন্যায় অশরীরী "বাবুটীকে"ও দেশবাসী নির্ব্বাসন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাবু নামে সকলেই বিরূপ, বাবু বৃন্দাবনবিহারী কাল শশী হইয়া অধুনা বাঙ্গালী রাইকিশোরীর কর্ণ ও চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে পুনর্ব্বার আমাদের "শ্রীযুক্ত" শ্রীসম্পন্ন হইবার পন্থা পাইয়াছেন। এপর্য্যন্ত বাবু তাহাকে ফেরার করিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল, ইজ্জৎ নষ্ট করিয়াছিল, তথাপি বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বা শ্রীমান্ তাহাতে অবিচলিত ভাবে নিজভাগ্য গণনা করিতেছিলেন; ধৈর্য্যগুণে এখন তাহার পুনঃ প্রভাব বৃদ্ধির সূচনা দেখা যায়। বিশেষ বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রাজুয়েট নামধারী নরপুঙ্গবেরা পর্য্যন্ত এবার তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, এতকাল তাহাকে রাজাক্ষরে যোজনা কেহ করিতে সাহস পান নাই, সম্প্রতি সেই দিব্যাক্ষরেও তাঁহার দেহ মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যরথীরা তাহাকে "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে সাহস প্রদান করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বা শ্রীমান্ মহাশয় দশরথাত্মজ বা পাণ্ডুপুত্রগণের ন্যায় প্রণষ্ট-গৌরব উদ্ধার পূর্ব্বক স্বীয় সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুনিয়াছি, কার্য্য সফল হইলে শ্রীযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। এই সূত্রে বহু বৈরী ইতি

মধ্যেই তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছে, শ্রীযুক্তের নাম শুনিলেই তাহাদের মস্তিষ্কে জলাতঙ্ক-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত মহাশয় যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে এত-কাল কর্ত্তন করিয়া স্বীয়সত্ব পুনঃলাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভাই সকল, তোমরাও সেইরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর, অবশ্য কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইবে। ভগবতী জগন্মাতা অবশ্যই তোমাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বা শ্রীমানের উদ্ধার পর্ব্ব সমাপন জন্য তোমরা সকলে আমাদের সেই জাতীয় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া হিমালয় হইতে কুমা-রিকা পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া তোল, বল শ্রীযুক্তের জয়! বল মহাশয়ের জয়! বল ভারতমাতার জয়!!

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

# উপনিষদের আখ্যায়িকা। (১)

## (তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে গৃহীত।)

### বরুণ ও ভৃগুর উপাখ্যান।

পুরাকালে একদিন বালক ভৃগু, পিতা বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম-বিদ্যাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" মহর্ষি বরুণ পুত্রের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া, বলিতে লাগিলেন:—

"এই শরীর, তদন্তবর্ত্তী যাবতীয় ক্রিয়া-নির্ব্বাহক প্রাণ-শক্তি, এবং চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য প্রভৃতি জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয়-বর্গ,—ইহারা সকলেই আত্মোপলব্ধির দ্বার। সমুদয় ভূত, ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে; সেই ব্রহ্মচৈতন্যেই সমস্ত ভূত (পদার্থ-নিবহ) স্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়-কালে ভূতবর্গ, সেই ব্রহ্মচৈতন্যেই শক্তিমাত্ররূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে। উৎ-পত্তি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই ভূতবর্গ,—যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহে, যাঁহাকে ছাড়িয়া উহাদের অবস্থান সম্ভব হয় না, তিনিই ব্রহ্ম। শরীর (অন্ন), প্রাণ এবং চক্ষুরাদি দ্বারা সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে জানিতে পারা যায়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা পুত্র! তুমি সেই ব্রহ্মপদার্থকে জানিতে সচেষ্ট হও।"

পুত্র ভৃগু, পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিল যে, "পিতা ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন না; অন্ন-প্রাণাদি দ্বার-যোগে পিতা ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। সুতরাং তপশ্চর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, ইহাই পিতার হৃদগত অভিপ্রায়।" ভৃগু, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, ইন্দ্রিয়-নিবহের একাগ্রতা সাধন পূর্ব্বক, নিরন্তর ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন এইরূপে তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে, ভৃগু অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই, এই স্থূল দেহের কারণ। সমষ্টি-ভাবে এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চস্থূলভূতকেই 'অন্ন' বলা যায়। এই অন্নের অপর নাম 'বিরাট'। ভৃগু, এই বিরাটকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল। কেন না, তাহার

পিতার উপদিষ্ট লক্ষণগুলি এই বিরাটে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভূতবর্গ এই অন্ন হইতেই (স্থূল ভূতোপাদান হইতে) উদ্ভূত হইয়াছে; এই অন্নেই তাহারা অবস্থান করিতেছে এবং ধ্বংসের সময়ে এই অন্নেই প্রবেশ করিবে বা বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুকাল পরে ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল। ভৃগু ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিল যে, এই অন্ন বা বিরাটেরও ত উৎপত্তি-বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল ভূতমাত্রই ত সূক্ষ্মশক্তি হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যাহা ব্যক্ত, স্থূল অবস্থা, তাহাত অব্যক্ত, সূক্ষ্মাবস্থারই পরিণতি মাত্র। ভৃগু পিতার নিকটে পুনরায় উপস্থিত হইল এবং আপন সংশয়ের কথা নিবেদন করিল। পিতা উপদেশ করিলেন যে, "পুত্র, তুমি পুনরায় ইন্দ্রিয়বর্গকে একাগ্র করতঃ ধ্যান-যোগে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও; তবেই ব্রহ্মপদার্থকে জানিতে পারিবে।" পুত্র, তাহাই করিল, এবং কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিল যে, "প্রাণশক্তিই" ব্রহ্মপদার্থ। ভৃগু বুঝিল যে, যাহাকে স্থূলভূতোপাদান (অন্ন) বলা যায়, তাহা শক্তির আধার মাত্র। এই আধারই ত হইয়া, প্রথমে জলীয় ও পরে পার্থিব রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই অন্ন বা জড়ীয় আধার,—প্রাণশক্তিরই ঘনীভবনের ফল। যতই প্রাণশক্তি,—তেজ ও আলোকাদির আকারে ক্ষয়িত হইতে থাকে, ততই উহার আধারও ঘনীভূত হইতে থাকে। অতএব সূক্ষ্ম-শক্তিই, স্থূলাকারে পরিদৃশ্যমান হয় (১)। এই সূক্ষ্মশক্তি সমূহের সমষ্টির নাম 'প্রাণশক্তি'। সমষ্টিভাবে ইহাকে 'হিরণ্যগর্ভও' বলা যায়। এই প্রাণশক্তি হইতেই ভূতবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রাণশক্তির আশ্রয়েই উহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই প্রাণশক্তিতেই উহারা প্রলয়ে পরিণত হইয়া যাইবে। ভৃগু, ধ্যানযোগে এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করিল। ব্যষ্টি ভাবে এই দেহে,—প্রাণশক্তিই সমুদয় ইন্দ্রিয়বর্গের চালক। এই প্রাণশক্তি দেহে সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্ত হয় এবং ইহাই রসরক্তাদির চালনা করতঃ, দেহ ও দেহাবয়বগুলির গঠন করিয়া তোলে।

কিন্তু কিছুকাল পরে, পুনরায় ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল। মন—সঙ্কল্প না করিলে ত, ইন্দ্রিয়াদি কেহই দেহে কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। আবার মনের এই সংকল্প, বুদ্ধির স্থির-নিশ্চয়তার উপরেই ত নির্ভর করে। ভৃগু, পিতাকে নিজের এই সংশয়ের কথা নিবেদন করিলেন, পিতা উঁহাকে একাগ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে নিয়ত মননশীল ভৃগুর অন্তঃকরণে উদিত হইল যে, দৈহিক চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় ক্রিয়া, মনেরই সংকল্পের বশবর্ত্তী এবং মনের সঙ্কল্প আবার, বুদ্ধির উপরেই একান্ত নির্ভর করে। অতএব মন ও বিজ্ঞানশক্তিকেই ভৃগু, ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল (১)। কিন্তু পুনরায় তাহার চিত্ত

(১) এই প্রাণশক্তি ও অন্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের 'অবতরণিকা' এবং 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের টীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সে স্থলে এই 'প্রাণ' ও 'অন্ন' সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতও উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

(১) সমষ্টি ভাবে, এই মন ও বিজ্ঞানশক্তিকে—ব্রহ্মের "সঙ্কল্প" বা ইচ্ছাশক্তি (will) বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জ্ঞানকৃত সঙ্কল্প হইতেই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই ঐশী সংকল্পই,—বাক্‌রূপে, অনুকম্পনরূপে, প্রাণশক্তিরূপে, অভিব্যক্ত হইয়া সমুদয় পদার্থ গড়াইয়াছে। অতএব প্রাণশক্তি,—আনন্দময় ব্রহ্মেরই সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সন্দেহ-দোলায় চপল হইলে লাগিল। পিতার আদেশে, পুনরায় তপশ্চর্য্যা দ্বারা ভৃগু, আনন্দকেই মুখ্য ব্রহ্মরূপে ধারণা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, সংকল্প ও অধ্যবসায়,—উভয়ই এই আনন্দেরই উপরে নির্ভর করে। অতএব আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ-ব্রহ্ম হইতেই ভূতবর্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে; এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই ভূতবর্গ অবস্থান করিতেছে এবং এই আনন্দ-ব্রহ্মেই প্রলয়কালে উহারা বিলীন লইয়া যাইবে। এইরূপে ভৃগু, ক্রম-সূক্ষ্ম প্রণালীতে মুখ্যব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল।

ইহাই শ্রুতিতে "ভার্গবী বারুণী-বিদ্যা" নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই বিদ্যা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, সেই ব্যক্তির নিকটে, "অন্ন" এবং "অন্নাদের" তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে না। যে যাহার পোষণ করে, তাহাই তাহার অন্ন এবং যে সেই অন্ন দ্বারা পুষ্ট হয়, যে সেই অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়—তাহাই সেই অন্নের ভক্ষক বা 'অন্নাদ'। এই অন্ন, অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদও, অন্নে প্রতিষ্ঠিত। আমরা আধার (Matter) ব্যতীত, শক্তির (Force) কল্পনা করিতে পারি না; একটী অন্যটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। শক্তির ক্রিয়া হইতে হইলেই, তাহার জড়ীয় আশ্রয় আবশ্যক; আবার এই জড়ীয় আশ্রয়ও,—শক্তিরই পরিণতি, শক্তিরই ঘনীভবনের পরিণাম। অতএব দেহকে অন্ন এবং দৈহিক প্রাণশক্তিকে অন্নাদ বলা যায়। আবার জড়, শক্তিরই রূপান্তর বলিয়া (১) দেহকে অন্নাদ এবং প্রাণকে অন্ন বলাও যাইতে পারে। ফলতঃ, প্রাণশক্তি এবং প্রাণশক্তির আধার জড়াংশ, এ উভয়ই পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। কাহাকেও ছাড়িয়া দিয়া, কাহাকেও কল্পনা করা যায় না। এইরূপ, জলকে অন্ন এবং তেজকে অন্নাদ বলা যায়। শক্তি যখনই তেজের আকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া ক্ষয়িত হইতে আরম্ভ করে; ততই উহার জড়ীয় অংশও প্রথমে জলীয়ভাবে সংহত হয়। অতএব জল এবং তেজ, উভয়ই উভয়কে অপেক্ষা করে; কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারই ক্রিয়া সম্ভব হয় না। এইরূপ পৃথিবীতে অন্ন এবং আকাশকে অন্নাদ বলা যায়। অর্থাৎ, যতই শক্তি তেজাদির আকারে ক্রিয়া করিতে থাকে, ততই উহার আশ্রয় জড়াংশও ঘনীভূত হইতে থাকে; এবং এই-ঘনীভূত হইতে হইতে ক্রমে কঠিন পার্থিবভাবে ঘনীভূত বা সংহত হয়। অতএব শক্তি এবং অন্ন (জড়াংশ), উভয়ই উভয়ের অপেক্ষা রাখে। একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী থাকিতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইল যে, অন্ন অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদ অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্নাংশই—দেহ দেহের অবয়বগুলিকে গড়াইয়া তোলে; এবং প্রাণাংশই—সেই দেহের আশ্রয় থাকিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে ক্রিয়া করে।

শ্রুতির এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নিতান্ত অনুগত। (২)

এ সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক বলিবার আছে, তাহা বারান্তরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

(১) এসম্বন্ধে "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) Herbert Spencer এর সিদ্ধান্ত এবং শ্রুতির সিদ্ধান্ত অবিকল একরূপ।

# বিবাহের উপদেশ।

( কাঁথি, ৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩১৪ )

বাবা * *, মা * *—তোমরা, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর ও সমাগত আত্মীয় আত্মীয়াগণকে সাক্ষী করিয়া, আজ অতি পবিত্র এবং জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ করিলে। তোমরা উভয়েই কুলে কুলে মিলনের কথা শুনিয়াছ, এতদিন পর সেই মহামিলন তোমাদের জীবনে সংঘটিত হইল। তোমরা এতদিন, কত বিভিন্ন পথে, কত দূরে দূরে বিচরণ করিতেছিলে—পরস্পর অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত,—কত বিভিন্ন চিন্তা লইয়া, কত বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ধরিয়া ছুটিতেছিলে,—এতদিন পর তোমাদিগকে বিশ্বপতি এক পথের পথিক, এক চিন্তার চিন্তক, এক ভাবের ভাবুক, এক স্বার্থের স্বার্থক, এক ধর্ম্মের ধার্ম্মিক করিবার জন্য এই সুমহান বিশ্বে মধুর মিলনে সম্মিলিত করিলেন। রক্তে রক্ত, দেহে দেহ, মনে মন, হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়া একাকার হইয়া গেল। যাঁহার বিধানে এই অপূর্ব্ব মিলন হইল, আজ তোমরা একাত্মক হইয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রণাম কর।

আমি কুলে কুলে মিলনের কথা বলিতেছিলাম,—আজ শেষবার উভয়ে উভয় কুলের বিশেষত্ব চিন্তা কর। তোমরা উভয়ে মাতৃ-পিতৃ-কুল হইতে স্খলিত হইয়া নূতন কুল রচনা করিবার পথে আজ দণ্ডায়মান। তোমাদের পিতৃ-মাতৃ কুলের কত গৌরব, কত স্মৃতি, কত ভক্তি, কত বিশ্বাস, কত সাধন, কত ভজন, কত নিষ্ঠা, কত অনুরক্তি তোমাদের শোণিত বিন্দুতে বিন্দুতে সঞ্চিত ও মিলিয়া মিশিয়া আছে, আজ তাহা একবার স্মরণ কর। তোমাদের বাহিরের বেশ-ভূষা, চাকচিক্য, পারিপাট্য আজ ভুলিয়া গিয়া কেবল আত্মিক জগতের অমূল্য সঞ্চিত সম্পত্তির কথা স্মরণ কর। উভয়ে এতদিন উভয় কুলের পবিত্র যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছ, আজ এই পবিত্র মুহূর্ত্তে পবিত্র দেবতার চরণে ভক্তির অঞ্জলি-রূপে তাহা অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিকট বরমাল্য এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, অক্ষয় প্রেম-মন্ত্রে আজ চিরদিনের জন্য দীক্ষিত হও। ব্যক্তিত্ব, পার্থক্য, বিভিন্নত্ব আজ ঘুচাইয়া, একাত্মক, সমস্বার্থক, এবং সমধর্ম্মক হও। উভয় কুলের সঞ্চিত সকল পুণ্য পবিত্রতা আজ মহা প্রেম-যজ্ঞের ইন্ধনে আরো পূত, আরো মধুর, আরো সুন্দর হইয়া যাক্ এবং উভয় কুলের পাপ-মলিনতা আজ ভস্মীভূত হইয়া যাক্। মুক্ত আকাশ তলে আজ তোমরা পূতদেহ, পূত-চিত্ত, পূত-হৃদয় হইয়া মিলিয়া যাও।

হিন্দু-সমাজ নারীকে পতিকুলে ধ্রুব হইতে আদেশ করেন, ব্রাহ্ম-সমাজ আদেশ করিতেছেন, তোমরা উভয়ে উভয়-কুলে ধ্রুব ও অটল হও,—অথবা উভয় কুলের বিশেষত্বের দ্বারা নূতন কুল রচনা কর। ব্রাহ্ম-সমাজ নারী ও পুরুষের সমাধিকার চিরকাল ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন, একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য আমরা স্বীকার করি না। আপন আপন বিশেষত্বেই জগতের সৃষ্ট সকল জীব জন্তু প্রধান। কেহ বড়, কেহ ছোট, এ বিচার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট নাই। যাহারা সে বিচার করে, তাহারা মিলন-শাস্ত্রে অনধিকারী। প্রাধান্য ও বিশেষত্ব স্বীকার করাই মিলন-শাস্ত্রের মূল। পরস্পর

পরস্পরের নিকট কিছু পাইবেন, এ বিশ্বাস না থাকিলে মিলনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। নারী কেবল পুরুষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন, পুরুষ চিরকাল নারীকে হেয়-জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন, এ চিন্তা ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। আজ এই মহা পুণ্য-ক্ষেত্রে তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রাধান্য স্বীকার কর—এবং উভয়ের বিশেষত্বে উভয়ে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণত্ব-লাভ কর। অর্দ্ধাঙ্গ আজ পূর্ণাঙ্গ হইয়া যাক্।

আর একটী কথা আমি বরাবর প্রচার করিয়া আসিয়াছি, অসবর্ণ ও আন্তর্জাতিক মিলন ভিন্ন এ ভারতে কখনও একতা আসিবে না। বর্ত্তমান স্বদেশ-আন্দোলনের বিশেষ দিনে, তোমাদের পুণ্যময় জীবনে, আন্তর্জাতিক মিলন সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষরূপে আনন্দিত। এইরূপ মিলনেরও অন্তরায়—এক জাতির প্রতি অন্য জাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ। রাজা প্রচার করিতেছেন, উৎকল উড়িয়ার জন্য, বেহার বেহারীর জন্য, বঙ্গ বাঙ্গালীর জন্য, পূর্ব্ব-বঙ্গ পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকের জন্য। বিধাতার রচিত প্রেম-শাস্ত্র এ কথা অস্বীকার করে, বিধাতা কূট-বিভাগ-শাসন-নীতির তীব্র প্রতিবাদের জন্য আজ উৎকল ও বঙ্গকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার সুশীতল বায়ু যেমন অবিভেদে সকলকে আলিঙ্গন করে, তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের মাধুর্য্য যেমন সকলকেই উজ্জ্বল করে, তাঁহার সুস্নিগ্ধ জল যেমন সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি, তাঁহার বিধান সকলকে অবিভেদে রক্ষা করে এবং সকলকে একতায় আবদ্ধ করে। ধর্ম্ম-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে বসিয়া কেহ যেন কখনও জাতিভেদ বিচার না করে। জাতিভেদ বিনাশ করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের মহাকীর্ত্তি পুরুষোত্তমে আজও সংরক্ষিত ও সমাদৃত হইতেছে, আর পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র আজ নব-তেজে প্রদীপ্ত হইয়া অহেতুকী প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া দিতেছেন। রাজা এবং ঈশ্বরের মধ্যে কে বড়, ভারতে তাহার মহা পরীক্ষা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বড়, না ঈশ্বর বড়—ভারতে তাহার মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ তোমরা জাতি-ভেদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ঘৃণা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া—বাঙ্গালী এবং উৎকলীয় জাতির সঞ্চিত মহা কীর্ত্তিময় পুণ্যরাশিতে ভূষিত হও। তোমাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই, তোমরা উভয়ে কখনও উভয়ের প্রতি এবং কোন জাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করিও না। মনে রাখিও, তোমাদের উভয়ের পিতৃ মাতৃ কুলও যেমন বিশেষত্বে পূর্ণ, তোমাদের পিতৃ মাতৃ জাতিও তেমনি নানা বিশেষত্ব ও মহত্বে পূর্ণ। আজ দুই জাতি মিলিয়া একাকার হইয়া যাক্। তোমরা স্মরণ কর,—ঐ মহাসাগর সমভাবে বঙ্গ ও উৎকলের পদধৌত করিয়া চিরকাল যেমন মিলন-সঙ্গীত ঘোষণা করিতেছে,—চিরকাল ঐ মলয় যেমন উভয় দেশকে সুশীতল করিয়াছে, এবং বহুকাল প্রেমাবতার চৈতন্যদেব যেমন উভয় দেশকে মধুর প্রেমে মাতোয়ারা করিয়াছেন, তেমনি, আজ মহান্ ঈশ্বর দুই দেশকে মহা প্রেমে বাঁধিয়া দিতেছেন। জয় পুণ্যময়ের কৃপার জয়। আজ তোমরা মুক্ত-হৃদয়, উদার-প্রাণ এবং বিশ্বগ্রাসী প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মিলন-সঙ্গীতের তান করিয়া বল—বন্দে মাতরম্।

বড় সুসময়ে এই আন্তর্জাতিক মিলন হইতেছে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে;—এবং স্মরণ

রাখিবে, তোমাদের জীবনের আদর্শে দুই মহানজাতি চিরকাল একতার পথে চলিতে সমর্থ হইবে। তোমরা অনাবিল ঈশ্বর-ভক্তিতে প্রমত্ত এবং জন্মভূমির অহেতুকী প্রেমে সিক্ত হও।

বাবা * *,—তোমার ভক্ত পিতার বহু-দিনের মনোবাঞ্ছা আজ পূর্ণ হইল! উৎকলকে বঙ্গের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে মিলিত করিবার জন্য কতদিন পূর্ব্বে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাঁহার সে ইচ্ছা এতদিন পূর্ণ করেন নাই। আজ তোমার দাদা স্বর্গ হইতে এই মধুর মিলনে তোমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইতে-ছেন। তোমার পিতার কত তপস্যার ফলে আজ বিধাতার বিধান পূর্ণ হইল। বাবা, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, বড় গুরুতর ব্রত তুমি গ্রহণ করিতেছ। ভলন্টিয়ারী করিবার জন্য আজ কত যুবক জীবন-মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন; —তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভলন্টিয়ার, কেন না, তুমি একতাগঙ্গাকে এই পতিত দেশে আনয়ন করিবার জন্য আজ ভগীরথের ন্যায় কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতেছ। দেখিও, কখনও যেন এই মিলনের অন্তরায় উপস্থিত না হয়;—সর্ব্বদা সশঙ্কিত এবং সঙ্কুচিত থাকিবে, কেন না, ব্রত বড় গুরুতর। এই ব্রত পালনে সর্ব্বদা প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া চলিবে। সংক্ষেপে বৈবাহিক জীবনের সকল বাধা বিঘ্নের কথা বলিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়,—তবে কথা এই—প্রেমের পথে ব্যক্তিত্বকে এবং জাতিভেদকে কখনও প্রাধান্য দিও না। বাবা, নারীর আদর এবং সকল জাতির আদর না বাড়িলে এদেশের মঙ্গল নাই, সর্ব্বদা একথা স্মরণ রাখিয়া, * * কে আদর করিবে, যত্ন করিবে, ভালবাসিবে। পিতৃহীনা আজ তোমাকে পাইয়া সকল শোক ভুলিতেছে, ইহার ভিতরে এবং এ যে কুল হইতে আসিতেছে, সে কুলে নিরাকা-রের চিন্ময়-বিভূতি দেখিয়া বিমোহিত হইবে। এই মিলন অনন্তকালের—ইহা স্মরণ রাখিয়া সকল অন্তরায়, সকল বাধা বিঘ্নকে ব্রহ্ম-কৃপাবলে বিদূরিত করিবে। স্মরণ রাখিও, তোমাদের সম্বল কেবল ব্রহ্মকৃপা, স্মরণ রাখিও, তোমাদের পিতৃকুলের তপস্যার অর্জ্জিত ফল কেবল ব্রহ্মকৃপা। ঐ কৃপায় সকল সাধন সিদ্ধ হইবে, সকল বাধা চলিয়া যাইবে,—তোমাদের জীবন আদর্শ হইবে। তুমি পত্নীকুলে চির-ধ্রুব হও।

মা * *, আজ তোমার পিতার পুণ্যময় জীবন-কাহিনী স্মরণ কর। তিনি ব্রহ্ম-পিপাসু সাধক গৃহস্থ ছিলেন, আসক্তি এবং বৈরাগ্য একাধারে সাধন করিয়া শিবত্ব পাইয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার জীবনের শিবত্বকে সম্বল করিয়া তুমি মহা সাধনার পথে অগ্রসর হও। তুমি হরগৌরীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ—শিবত্ব সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া এদেশে গৌরী নারীর আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। তুমিও শিবত্ব-সাধনে গৌরীকে আদর করিয়া চলিবে। হরগৌরীর যুগল-মূর্ত্তি কখনও দেখিয়াছ কি? আসক্তি এবং বৈরাগ্য, সংসার এবং শ্মশান, জীবন এবং নির্ব্বাণ—ঐ মধুর মূর্ত্তিতে সুচিন্তিত। তোমার পিতা তোমার নাম রাখিয়াছেন "ছায়া"—তাহার অর্থ কি? তুমি শিবত্ব-সাধনে নিজত্ব নির্ব্বাণ করিয়া কেবল "ছায়া"র ন্যায় স্বামী-অঙ্গে মিলিয়া থাকিবে। এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, এক-রস-সুধা-পানে কেবল বিভোর হইয়া থাকিবে। তিনি নিরাকার এবং তিনি

সাকার। তিনি নিরাকার চিন্ময় রাজ্যে, এবং তিনি সাকার এই সংসার লীলা-ধামে। তাঁহার সাকার-মূর্ত্তি দেখিতে চাও কি? ব্রহ্ম-বিশ্বাস-অঞ্জন চক্ষে লেপন করিয়া আজ পূর্ণের চক্ষের অপূর্ব্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ কর,—তোমার শুভ-দর্শন, মহাদর্শন হইবে। যদি পিতার বিশ্বাস ধনে অলঙ্কৃতা হইতে পারিয়া থাক, তবে আমার কথা বুঝিতে পারিবে এবং স্বামীর ভিতরে নিত্য নূতন ভাবে চিন্ময়ের সাকার রূপ দেখিয়া মোহিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন-পথ ভুলিয়া এক পথ ধর,—বিভিন্ন জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া এক জ্ঞান অবলম্বন কর,—মিলিয়া, মিলিয়া, মিলিয়া—ঘনীভূত মিলনের পথে চলিয়া যাও; অনন্তকাল পতিকুলে অটল এবং অচল হও। শয়নে, স্বপনে—কেবল মঙ্গল-ময়ের মঙ্গলভাব নিরীক্ষণ করিবে;—কেবল সাধন করিবে—"শিবম"। তোমাদের সাধন-পথে, যোগ-পথে অগ্রসর হইবার সময় পিতৃ-মাতৃ-কুল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, সকল সাধু সাধ্বীর শুভ-কামনা অবতীর্ণ হউক;—সর্ব্বোপরি ব্রহ্ম-কৃপা বর্ষিত হউক। পৃথিবী আজ মধুময় হইয়া যাউক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

# বিষম সমস্যা।

"If recent events in India do not awaken serious thought in this country we shall have only ourselves to blame, for these events have been sufficiently significant. If on the contrary, they only awaken resentment and lead to contemptuous talk about sedition and the repression of it, the strong probability is that we shall have to bitterly regret it."—J.P. Hopes.

(Daily Chronicle, London 18 May, 07.)

ইউরোপীয় মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা একটু ভদ্র ও শিক্ষিত, তাঁহারা এক বাক্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ মোটাবুদ্ধি ও স্থূল-দৃষ্টি। বাস্তবিক উহাই তাঁহাদের বিপুল ধন সম্পদের কারণ। কথাটা হঠাৎ শুনিতে যেন কিরূপ বোধ হয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, উহা অসঙ্গত নহে। শশক ও কচ্ছপের গল্পের উঁহারা কচ্ছপ, কেবলমাত্র পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে সাংসারিক উন্নতি সাধনে সফলকাম হইয়াছেন। প্রখরধী প্রতিভাশালী পুরুষ যেমন গড্ডালিকাপ্রবাহের সাধারণ নিয়মে চলিতে চাহেন না, নিজের জন্য স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কার করতঃ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট-চিত্তে মানব সমাজের উপর একটা ছাপ বসাইয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন, পার্থিব স্বার্থ সর্ব্বদা তাঁহার দ্বারা পদদলিত, স্থূলবুদ্ধি মানুষ তেমনি দুনিয়াদারীর নশ্বর স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারে না, সংকীর্ণ দৃষ্টিহেতু আশু সুবিধাজনক সাংসারিক সমৃদ্ধির বাহিরে কোন বিষয়ে নজর দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং কলুর বলদের মত ঐ সকল স্বার্থান্ধ লোকের শক্তি সমষ্টি ক্ষুদ্র

গণ্ডীর মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া বিশেষরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করে। এস্থলে বুদ্ধি অর্থে সদ্বুদ্ধি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে বুদ্ধি দ্বারা মানুষকে পাশব অবস্থা হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নয়ন করে; সংসারের দোকানদারী বুদ্ধি নহে। দুর্বুদ্ধি ইংরাজ জাতির বিলক্ষণ আছে বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে উহা খুব বিকশিত বলিতে হইবে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ।" অর্থাৎ ভাল মন্দ যে কোন বিষয় হউক না কেন, অহোরাত্র তাহার জপ করিলে নিশ্চয় আয়ত্তাধীনে আসিবে। ইংরাজ বহুকাল ধরিয়া দিবানিশি ধনের জপ করিয়া সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন। অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লোকে টাকা টাকা করিয়া থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যেমন আর সকল কথা একদম বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি সুবর্ণের উপাসনা করেন, এমনটী অন্য কোথাও দৃষ্টি-গোচর হয় না, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জন্‌বুল "এল্-এস্-ডি" মহামন্ত্র জপে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত। জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, একধ্যানে, একজ্ঞানে গিনি ভাবিয়া ভাবিয়া যোগাচার্য্য পতঞ্জলীর নির্দ্দেশ মত ইংরাজের মন প্রাণ গিনিময় হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের অবগতিক যিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে তথায়

গিনি ব্রহ্মা, গিনি বিষ্ণু, গিনি মহেশ্বর।
গিনি ভিন্ন নাহি জানে স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

এবপ্রকার অবস্থায় নিশ্চয় জানিতে হইবে, টাকার জন্য ইংরাজ করেন নাই, এমন কাজ নাই, করিতে পারেন না, এমন কাজ নাই। সুতরাং নানাবিধ সদসদুপায়ে তাঁহারা এখন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জড় সুবর্ণের ধ্যান দ্বারা বুদ্ধি ত জড়ত্ব পাইবেই, লালসার বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী; এবং ধনাধিকারের সহচর কতক-গুলি পাশব শক্তি লাভের সঙ্গে বিস্তর গুরুতর পাপ আসিয়া ধনীকে ঘিরিয়া ফেলে। ধন সঞ্চয়ের নানা দোষ জানিয়াও ধনী ধনের লোভ ছাড়িতে পারেন না, উহা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। প্রথমে মানুষ জীবনের প্রয়োজন সাধন জন্যই ধন সঞ্চয় করিয়া থাকে; পরে অভ্যাস বশতঃ উপায়টা উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অন্যান্য সকল ভাবনা ত্যাগ করতঃ কেবল মাত্র ধন চিন্তা করিলে মানুষের মতি গতি ক্রমে এতই হীন হইয়া পড়ে যে, শৌর্য্য বীর্য্যাদি ত দূরের কথা, সাধারণ সৌজন্যের লক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে দৃষ্ট হয় না; এবং হৃদয় এত লঘুতা প্রাপ্ত হয় যে, লোকের সঙ্গে ব্যব-হারের সময় এক হাত গলায় এক হাত পায়ে দিয়া কার্য্যারম্ভের প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। এইরূপ ধনা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দুর্ব্বলের গলা টিপিয়া ও সবলের পদলেহন দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধারে সর্ব্ব-দাই তৎপর থাকে। জন্‌বুল এই ধাতুর লোক। আজ যে নূতন এরূপ নিম্নভূমি আশ্রয় করিয়াছেন, এমত নহে, আমরা উঁহাকে যতদিন দেখিতেছি, ততদিন ত ঐ একই ভাব। তবে কথা এই যে, আমরা নিজেরা যখন উঁহার অপেক্ষাও মোটাবুদ্ধি ছিলাম, তখন মোহ বশতঃ দেবতাবোধে উঁহাকে পূজা করিয়াছি; সে আজ শতাধিক বর্ষের কথা। ক্রমে যেমন আমাদের সংকীর্ণ মতি অপনীত হইয়া চক্ষু ফুটিতেছে, তেমনি আমরা তারতম্য বুঝিতেছি। অধুনা ত বেশ কোলাকুলি আরম্ভ হইয়াছে।

ভায়ার গুণের কথা কত বলিব? গুণের

ঘা'ট নাই। বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন নরপতি বেশ্যার উপার্জ্জনে ভাগ বসাইতে যান নাই, ভায়া আমার তাহাও ছাড়েন না, শরীর বিক্রয়ের মূল্যের অংশ গ্রহণে লজ্জা বোধ করায় গণিকাদিগকে নর্ত্তকী নাম দিয়া তাহাদের মাংস কাটিতেছেন। যাহা হউক, ভায়া ত চিরকালই দারুণ লোভী, কিন্তু আজ কাল লোভের মাত্রাটা যেন কিছু ভাল রকম চড়িয়াছে। যাহারা ডাক-টিকিট বেচিত, তাহারা যৎসামান্য কিছু দস্তরী পাইত, পঞ্চাশ বৎসরের উপর, কোম্পানির আমল হইতে উক্ত নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল; ইদানীং ভায়ার তাহাতে নজর পড়ায় চক্ষু টাটাইয়াছে, অমনি উহা রহিত। ভায়া আমার প্রকৃতই মিঞা রওশন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম-উপাধিধারী মহাত্মা ফেরেদুঁজার রওশন নামে একটী সখের চাকর ছিল, সে কেবল বাজারের কাজ করিত, এবং যখন যাহা কিছু খরিদ করিয়া আনিত, তাহাতেই নিজের দু পয়সা হাতে রাখিতে ছাড়িত না। ক্রমে নবাব তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া মোসাহেবগণের সহিত পরামর্শান্তে একদিন রওশনকে এক কড়া কড়ি দিয়া ঐ মূল্যের গুড় আনিতে আদেশ করিলেন; ঐরূপ সামান্য সওদা হইতে কিরূপে চুরি করে, এইটী পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। রওশনের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য দুইজন লোক তাহার পশ্চাতে প্রেরিত হইল। নবাব বাড়ীতে এক কড়ির গুড় প্রয়োজন শুনিয়া প্রথমে মুদী বিদ্রূপ মনে করিল, পরে তাহার কথায় একখানা শাল পাতার উপরে গুড়ের কাঠিটা লইয়া একটা আঁচড় দিয়া দিল। রওশন উহা হাতে করিয়া আসিতেছে, আর ভাবিতেছে, কি প্রকারে উহা হইতে কিছু চুরি করে। অতঃপর চারি দিক তাকাইয়া পাতাখানা একটু চাটিয়া লইল। প্রহরী দু'জন অমনি রওশনের আগে আসিয়া নবাবকে তাহার বেমালুম চুরির সংবাদ দিল। রওশন গুড়ে দাগ দেওয়া পাতা হাতে করিয়া পঁহুছিলে সহাস্যবদনে নবাব বলিলেন,—

"মিঞা রওশন!

"এক কড়ির গুড়েতেও এক চোষণ!"

আবার বলি, আমাদের জন্‌বুল ভায়া প্রকৃতই দ্বিতীয় মিঞা রওশন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। উনি আমাদের মাস খাইতেছেন, ক্রমে হাড় খাইবেন; অবশেষে চাম্‌ড়াখানা লইয়া ডুগ্‌ডুগী বাজাইতে বাজাইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কাহারও মনে শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং তিনি যদি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন;—কেবলমাত্র প্রাণটা থাকিতে থাকিতে ভায়ার হাত হইতে এড়াইবার কি কোন উপায় নাই? তাঁহাকে সাফ বাঙ্গলা কথায় জবাব দিতে হয়,—না! না! না!

উক্তরূপ নিরাশার একমাত্র কারণ;—নামে বাইবেল-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইংরাজ ইহসর্ব্বস্ববাদী। স্থূল বুদ্ধি-বশতঃ দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা হইতে শত যোজন দূরে যাঁহার অবস্থিতি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় সমূহের অস্তিত্ব তিনি কখন কল্পনাতেও আনিতে পারেন না, জন্ম-জন্মান্তর ত তাঁহার পক্ষে অবোধ্য ব্যাপার হইবেই, পরলোক সম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধানেও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম; এবং ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁহার নিকট আকাশকুসুমবৎ একটা কথার কথা মাত্র। যদিও যীশুখ্রীষ্ট ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্যাপেক্ষা পরলোকের বিমলানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভূয়োভূয়ঃ

উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহার শিষ্যেরা সে কথায় বড় কর্ণপাত করেন না; "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" "জোর যা'র মল্লুক তা'র" প্রভৃতি ঐহিক-সুখপ্রদ নীতি-সমূহ অবলম্বন করিয়া সংসারে সদর্পে দিন কাটাইয়া থাকেন। আজ যদি সেই প্রেমাবতার গ্রীষ্ট স্বয়ং আসিয়া লণ্ডনের পথে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় তাঁহাকে সমাজদ্রোহী বা বাতুল বলিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইবে। "Nothing for nothing and little for six pence" যে দেশের লোকের বীজমন্ত্র, "To do good, disinterested good is not our trade" যাঁহাদের একজন প্রধান কবির উক্তি, প্রতিহিংসাবৃত্তি যে জাতির মধ্যে ভয়ানক প্রবল, তথায় পরোপকারের ধর্ম্ম, দয়ার ধর্ম্ম, ক্ষমার ধর্ম্ম, ত্যাগস্বীকারের ধর্ম্ম অস্বাভাবিক অপ্রাকৃতিক ক্ষতিকর বলিয়া পরিত্যজ্য হইবেই হইবে। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে এক ঈশ্বরের সন্তান বোধে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করা গ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশ হইলেও, তাহার যাজকগণ জাতিগত স্বার্থের অনুরোধে এতই মোহাচ্ছন্ন যে, বর্ণভেদে বিষম ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। নতুবা বাল্যাবধি গির্জ্জায় ভজনা ও গৃহে বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াও পরস্বাপহরণে এরূপ প্রবৃত্তি কেন? দুর্ব্বল অসহায়ের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা কেন? আমাদের ভাগ্যদোষে ইহাকে বিধির এক নূতন ধরণের বিড়ম্বনা বলিতে হয়।

ভগবানের বিচিত্র লীলা! এবম্প্রকার জড়বুদ্ধি, স্বার্থপর, দুনিয়াদার জাতির মধ্যেও সেক্ষপীর, নিউটনের মত তীক্ষ্ণধী মহাপুরুষের জন্ম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হাবার্ট স্পেন্সরের মত চিন্তাশীল দার্শনিকের আবির্ভাব, এডমণ্ড বার্ক, জন ব্রাইটের মত সহৃদয় রাজনীতি-বিশারদের উদয়, হাওয়ার্ড নাইটিঙ্গেলের মত পরদুঃখকাতর জীবের অভ্যুত্থান এবং আধুনিক হাইণ্ডমান ক্লিফোর্ডের মত নিরপেক্ষ নির্ভীক পুরুষের সত্য, ন্যায় ও প্রেমের জন্য হুঙ্কারধ্বনি বাস্তবিক এই শ্রেণীর মহোদয়গণের পুণ্য-প্রতাপেই আজও বৃটিশ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের সাধু-চিন্তা ও সাধুচেষ্টা দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের পাপরাশি হজম হইতেছে।

এবংবিধ ইংরাজজাতির অধীনে আমরা শতাধিক বর্ষ অতিবাহিত করিলাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন অনৈসর্গিক কারণে ইঁহাদের প্রেমে অযথাভাবে মুগ্ধ ছিলেন বলিয়া সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে ইঁহাদের আশ্রয় মঙ্গলপ্রদ বিবেচনা করতঃ এযাবত বিশেষ কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের ঐপ্রকার নিশ্চিন্তভাবের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শাসকের লোলজিহ্বা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া অধুনা চারিদিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে, হঠাৎ মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখা যাইতেছে, যেন আমরা ধীরে ধীরে নাশের দিকে গমনোন্মুখ। কাজেই জীবের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, ধ্বংসাভিমুখে গতি যাহাতে রোধ করা যায়, তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকাল পরে হঠাৎ এরূপ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইল এবং আমাদেরইবা এতদূর উৎসাহ উদ্যম কোথা হইতে আইল, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দুর্জ্জন কর্জ্জনের নিদারুণ কষাঘাতে আমরা জর্জ্জরিত হইয়া হাপুস্নয়নে কাঁদিতেছিলাম, এমন সময়ে বিলাতের উদারনৈতিক দলের জয় হওয়ায়

আমাদের মনে অকস্মাৎ একটা আশার সঞ্চার হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধু মর্‌লের মত সহৃদয় পণ্ডিতের হস্তে আমাদের ভার ন্যস্ত হওয়াতে আমরা যেন আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম, আহ্লাদে আটখানা হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলাম। আবার ক্রমে যখন দেখা গেল যে, আমাদের ভাগ্য-বিধাতারূপে মর্‌লের সর্ব্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বলতা ভাসিয়া উঠিল, ছাঁকা জনবুলের স্বরূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন, তখন উৎকট হর্ষে সুতীব্র বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মর্‌লে এতদিন সুবাতাসে পা'ল তুলিয়া অনুকূল স্রোতে যেরূপ মাঝিগিরি দেখাইয়া বাহাদুরী লইতেছিলেন, সেটা তাঁহার নাবিকত্বের গুণে নয়, পড়তার জোরে, কাজেই তুমুল তুফানে উজান-নদীতে তাহা আজ তিরোহিত, এখন হা'লের কাছেই তিনি ঘেঁসিতে পারিতেছেন না, অপদার্থ দাঁড়ীদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ; সুতরাং নৌকা এখন ঘাটে পঁহুছে কি বান্‌চাল হইয়া মাঝগাঙ্গে জলসই হয়, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে। আহা ! মর্‌লের দুঃখে আজ শেয়াল কুকুর কাঁদিতেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল অন্যান্য স্থানে ক্রমাগত যশের পুঁটুলি বাঁধিয়া আসিয়াছেন, কেবলমাত্র বিপুল মস্তিষ্কের জোরে সস্তায় সহৃদয় উদারতার সুখ্যাতি লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার স্বার্থপর সংকীর্ণ কঠোর হৃদয় বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল ; যাহা এযাবত খাঁটি সোণা বলিয়া বাজারে উচ্চদরে বিকাইতেছিল, তাহা কিনা শেষকালে ভারতকষ্টিতে একেবারে রাং বলিয়া ধরা পড়িল, ইহা কি কম আপশোষের কথা! মর্‌লে ভায়া মুখে যতই কেন আস্ফালন করুন না, তাঁহার অন্তরে যে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা তিনিই জানেন, আর ধর্ম্ম জানেন।

কেহ যদি মনে করেন যে, বাহাত্তুরে ধরিলে মানুষের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, মর্‌লের তাহাই হইয়াছে। সে কথা খাটে না, কারণ জন্‌বুলের স্বাভাবিক স্বজাতি-বাৎসল্য ত উহাতে বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত, বরং মাত্রাটা কিছু অত্যধিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। জাতীয় স্বার্থ ও বৃটিশ ইজ্জৎ রক্ষার্থ ত প্রভু যুবার ন্যায় মজবুত। এরূপ ক্ষেত্রে বার্দ্ধক্যের দোষ দেওয়া যায় কি প্রকারে ? তবে যে মতিচ্ছন্নের মত কাজ করিতেছেন, সেটা জাতিগত মূঢ়তার ফল বই আর কিছুই নয়।

নিরপেক্ষ লোকের চক্ষে মর্‌লে যে অতি হীন অপদার্থ সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা শুধু আমরা বলিতেছি না, সেদিন তাঁহার স্বদেশস্থ একজন খ্যাত-নামা ইংরাজ পত্র দ্বারা তাঁহার কুকার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া অবশেষে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

"* * * allow me to convey to you the assurance of my profound contempt."

বঙ্গবিভাগের পর কোন দেশীয় লোক এখান হইতে মর্‌লেকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতেও স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল যে "আপনি নামে খ্রীষ্টান হইতে পারেন, আগনষ্টিক হইতে পারেন, কিম্বা একদম্ নাস্তিক হইতে পারেন কিন্তু কিছুতেই বিশ্বের নৈতিক শাসন অস্বীকার করিতে পারেন না। আপনাকে লোকে চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে আপনার সত্যের প্রতি বিশেষ সম্মান থাকা উচিত, কারণ তদ্ব্যতীত চরিত্র-গঠন অসম্ভব। অবশ্য আপনি নিজে আসিয়া এই হতভাগা দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা

করিতে পারেন না, কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের রিপোর্টের প্রতি নির্ভর করা অতীব অন্যায়।" —

"You may be a nominal Christian, you may be an agnostic, you may be a declared atheist, but still you cannot afford to disbelieve in a moral government of the Universe. You are said to be a "man of character" as such you ought always to have a strong regard for the truth, ardent love of truth being considered by all moralists. in every age and clime, essential to the upbuilding of character. From your exalted position you can hardly come down to personally inquire into the real state of things in our poor, helpless, down-trodden country; yet it is simply preposterous on your part to fully believe and depend upon the "highest authority in India" and entirely disbelieve the respectable children of the soil with regard to all manner of necessary information concerning your sacred trust."

যদি যথোচিত অনুসন্ধানের দ্বারা সত্য নির্ণয় করতঃ প্রজার ভয়ঙ্কর অপ্রীতির কারণ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সামান্য অধিকারও প্রদত্ত হইত বা তৎসম্বন্ধে আশা মাত্র পাওয়া যাইত, জোর করিয়া বলা যায় যে, সমগ্র রাজ্য মধ্যে এরূপ অগ্নিকাণ্ড কখনই উপস্থিত হইত না। দুটা মিষ্ট কথায় যে জাতি সব ভুলিয়া যায়, তাহাকে যাহারা বশে রাখিতে না পারে, তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন মদমত্ত বর্ব্বর বই আর কি বলা যায়? মিথ্যা স্তোক বাক্যেই ত এতকাল বেশ স্থিরভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বারম্বার প্রতারিত হইলে নিরীহ মেষশাবকও বাঁকিয়া দাঁড়ায়, আমরা ত নরাকৃতি জীব।

এখন কথা এই যে সাতান্ন সালে যেমন "ভূতে পশুন্তি বর্ব্বরাঃ" ঘটিয়াছিল—হাত-পা ছড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "ভাগ্যে ভাগ্যে রহল পরাণ"—তেমনটী আবার না হয়। দলন নীতি দ্বারা যে কুফল সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ফলিয়া আসিতেছে, তাহা এবার এখানে সুস্পষ্টভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। তবু ত কর্ত্তাদের সংজ্ঞা নাই, এখনও দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা। বহুপূর্ব্বে কটন সাহেব যে ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়াছিলেন, তাহার আর বাকী কি? তাঁহার কথাগুলি শুনিলে এরূপ বিভ্রাট কখনই ঘটিত না। তিনি বলিয়াছিলেন:—

"Repress educated natives, distrust them, let them see that the policy of India for the Indians and training them to administer their own country is a fiction, and you weld them all into one solid phalanx, united by common bond of despair and hatred towards Europeans."

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে, তখনও কেহ কর্ণপাত করেন নাই, এখন যেন সবাই আরও বধির হইয়া পড়িয়াছেন। পরন্তু সহস্র বধিরতাতেও ত নৈসর্গিক নিয়ম খণ্ডিত হইবার নয়; দশে ধর্ম্মে দেখুক তাঁহার কথা ফলিতে বসিয়াছে কি না। রাজপুরুষগণ যে তাহা একেবারেই বুঝিতেছেন না, এমন নহে, তবে এখনও মুখ-সাপটে কাজ সারিবার আশা রাখেন, এই জন্যই মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতেছেন। তবু মহাপ্রভু মরলে পার্লামেন্টের মত সভার মাঝখানে অজ্ঞাতসারে সভয়ে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, প্রকাশ্যভাবে সমস্ত কথা আলোচনা করিতে তিনি শঙ্কাযুক্ত, পাছে সুদূরবর্ত্তী শত্রুগণ সমস্ত জানিতে পারে। ইহা কি কম দুর্ব্বলতার পরিচয়? মনে পাপ থাকিলেই মানুষ এতই ভীরু হইয়া পড়ে। যাহা হউক, উহার উক্তিতে আমাদের গৌরবান্বিত বোধ করা উচিত যে, এতকাল যাহারা শৃগাল কুক্কুরের মত হেয় ছিল, আজ তাহারা বৃটিশসিংহের শত্রুপদবাচ্য হইবার যোগ্য হইয়াছে।

ভারতের ইংরাজ মহলে এবং বিলাতের ভারত-ফেরতদলে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যময়-অশান্তি

সম্বন্ধে যে আলোচনা হইতেছে, তাহার ফলে এই সংবাদ প্রচারিত যে ভারতবাসীর ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সংক্ষেপতঃ কোন প্রকার বোধাবোধ নাই, উহারা এক প্রকার জড়পিণ্ডবৎ নরাকার জানোয়ার বলিলেও চলে; পশুর মত হুকুমের অধীনে খাটিতে পারে মাত্র, মানুষের মত কোন গুণ উহাদিগেতে পরিলক্ষিত হয় না, যুগযুগান্তর হইতে উহারা কত রকম রাজার কত প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে, কখন মুখ ফুটিয়া একটী কথা বাহির করে নাই; আধুনিক চীৎকার কেবল মাত্র আমাদের অপরিসীম উদারতা ও কোমলতার দরুণ শুনা যাইতেছে; উহা ঠাণ্ডা করিবার এক ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই, তাহা কঠোর শাসন। উহারা কুকুরের জাতি, লাই দিলেই মাথায় উঠে। দয়ার মর্ম্ম যে না বুঝে, তাহাকে দয়া করা পাপ। উহারা দয়াকে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া দয়ালু ব্যক্তিকে ঘৃণা করে। কেবল মাত্র পাশব শক্তিকে উহারা বড় ডরায়, পাশব শক্তিকে আবহমানকাল ঈশ্বরাপেক্ষা বড় জানিয়া নতশিরে তাহার পূজা করিয়া থাকে। অতএব পাশব শক্তি প্রয়োগ করিলেই তিন দিনে রাজ্য মধ্যে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইবে। কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমরা ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা থাকিব, অত্র সন্দেহ নাস্তি !!

এবম্প্রকারে রোগের প্রকৃত কারণ সমূহের অনুসন্ধান না করিয়া হাতুড়ের মত চিকিৎসা চলুক, ভিতরে ভিতরে রোগও বাড়ুক; অনন্তর কোথাকার জল কোথায় মরে, বিশ্বসংসার দেখিবে। রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা এই প্রকার ভাবের ভাবুক হইয়া আপন আনন্দে আপনি ভাসিতেছেন। আমাদের মধ্যে কতকগুলি, তাঁহারাই অধিকাংশ, ভাবিতেছেন যে, রাজার সুমতি হউক, আমাদের দুঃখ অভাব মোচনে যত্নবান হউন, বৃটিশ পতাকার অধীনে আমরা সুখে চিরকাল বাস করি। অধুনা যে প্রকৃতিবর্গের নানারূপ ক্লেশ হইয়াছে, রাজপুরুষগণ যে বহুবিধ অত্যাচার করিতেছেন, তাহা সম্যক বুঝিয়াও তাঁহারা ইংরাজ জাতীর ন্যায়পরতায় সন্দিহান নহেন। এভাবে চলিলে কতদিন যে তাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া রাখিতে পারিবেন, বলা যায় না, কারণ পেট বড় বালাই, এদিকে যে ক্রমে উদরান্নের অসংস্থান হইয়া উঠিতেছে। চেষ্টা চরিত্র উপায়াদি বিস্তর দীক্ষিত হইয়া কোনই ফল পাওয়া গেল না বলিয়া একদল মরিয়া হইয়াছেন, ইঁহারা চা'ন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, বেশ কথা, স্বাধীনতা চায় না কে? ত্রিভুবনে এমন কি সজীব পদার্থ আছে যে

সর্ব্বংপরবশং দুঃখং।
সর্ব্বমাত্মবশং সুখং॥

মহাবাক্যের মর্ম্ম বুঝেনা। পরন্তু স্বাধীনতা পাই কি প্রকারে? দেয়ই বা কে? বিনাক্লেশে কোন জিনিস পাইলে তাহার আদর হয় না, উহা শীঘ্র হস্তচ্যুত হয়। হাতে তুলিয়া যদি কেহ আমাদিগকে স্বাধীনতা দেয়, আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না, সুতরাং অচিরাৎ তাহা হারাইব। পক্ষান্তরে বহু কষ্টে যাহা অর্জ্জিত, তাহা চিরকালের সম্পত্তি হইয়া থাকে। আমরা যদি অনেক বেগ পাইয়া স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, আমরা তাহা ভোগ করিবার যোগ্য হইব। বিষম সমস্যা উপস্থিত, উভয়েরই বিপদ দেখিতেছি। রাজপুরুষগণ হয়ত বলিবেন—প্রকা-

স্নান্তরে বলিতে আরম্ভও করিয়াছেন—"ভারত ত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এখানে আমরা বাস করিতেও আসি নাই; যত দিন নির্ব্বিবাদে মনের মত শোষণ কার্য্য চলে, ততদিন বেশ, তারপর না হয় নাদিরশাহের মত চলিয়া যাইব। যখন দেখিব, কিছুতেই আর দাবাইয়া রাখা যাইতেছেনা, তখন যাহারা চিরকাল আমাদের পদানত থাকিবে, তাহাদিগকে বাদ দিয়া বাকী সকলকে কামান-বন্দুকের সাহায্যে যমের বাড়ী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইব। যাহারা থাকিবে, তাহাদিগকে খাটাইয়া শোষণ কার্য্য চলে, পেট ভরে, ভালই, নচেৎ ভারতে এখনও যাহা কিছু ধনরত্ন আছে, জাহাজে বোঝাই করিয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব।" সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে নিতান্ত মন্দ কথা নয়, যে ভাবে গোঁজামিলন দিয়া হাড় কয়খানা বাঁচাইয়া ক্লমি-কীটের ন্যায় লোকের পদতলে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি, তাহাতে মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়। আত্মহত্যা একটা মহাপাপ, তাহাতে পরলোকে বিষম যন্ত্রণা পাইতে হয়, এ জ্ঞান না থাকিলে আজ বিস্তর ভারতবাসী গলায় দড়ি দিয়া মরিত। পরন্তু ঐ রূপে ধ্বংস হওয়া কি আমাদের পরিণাম? আমরা কি ঈশ্বরের সন্তান নই? আমরা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছি? বিধাতার রাজ্য কি সত্য সত্যই লোপ পাইয়াছে? বিদেশী বণিকের অদম্য লালসা কি বাস্তবিকই আমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে? ভবিষ্যত এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে, আমরা এখন কিছু বলিতে পারি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# নূতন সঙ্গীত।

ভৈরব—একতালা।

কোন্ বীণা স্বরে মধুরে মধুরে
উঠিছে সঙ্গীত মনোহর?
জাগিল জীবন, মরিল মরণ,
কাঁপিল নিখিল থর থর।
বেজেছিল বীণা প্রথম প্রভাতে,
আনন্দ-লহরী ধরেনি ধরাতে,
আজো সেই বীণা থামে না থামে না,
ভাসায় নিখিল অন্তর।

* * * *

নূতন আলোকে করিতে বন্দন
দিশি দিশি ফুটে নূতন স্বজন,
নব নব ফুল হাসিয়া আকুল,
হাসিয়া উঠিল চরাচর;—
এ আনন্দ ধামে শুনে বীণা গান
কার প্রাণ আজি রবে ম্রিয়মাণ?
নিদ্রা ত্যজিয়া উঠগো গাহিয়া
জয় জয় হরি সুন্দর।

---

ভৈরব—একতালা।

ধীর সমীরে বিশ্ব-মন্দিরে
উঠিছে কার গভীর স্বর?
জয় হে বিধাতা, কর্ম্ম-ফলদাতা,
জয় সত্য শিব সুন্দর।
ডাকেন শ্রীহরি "কে লবে ফল?"
কর্ম্ম-তীর্থে তাই মহা কোলাহল;
(ক'রে) সর্ব্বস্ব পণ শোণিত তর্পণ,
মাগে জীব কত কত বর।

কত আয়োজন, কত প্রাণপণ,
নিখিল মন্দিরে কর্ম্ম-আরাধন ;
মন্ত্রের সাধন, কি দেহ পতন,
কি সংগ্রাম নিরন্তর ;
পাতি কর্ম্মজাল হরি বিশ্বম্ভর
টানিছেন জীবে তাঁহারি ভিতর ;
কে যাবে যাত্রী পোহাইল রাত্রি,
(হরি) হরি বলে হও অগ্রসর।

---

মুলতান—একতালা।
একি রহস্যময় !
ব্রহ্মাণ্ড-ভরা ও কার হৃদয় !
ধূলা চাপা ওই পরশমণি,
নরকের মাঝে অমৃতধ্বনি,
ঘোর দুঃখের পাশে স্বর্গ-সুখ ভাসে
দেখিতে জানিলে হয়।

* * * * *

এত পেয়ে পেয়েও বিশ্ব আত্মহারা,
ভক্তের নয়নে ঝরে অশ্রু-ধারা ;
অতৃপ্তি-সূত্রে দেখ পিতা-পুত্রে
কি মিলন মধুময় !
কাঁদিছে নিখিল "দাও, আরো দাও,"
কে দেয় উত্তর "চাও, আরো চাও ;"
চেয়ে চেয়ে চেয়ে, দিয়ে দিয়ে দিয়ে
কারো সাধ পূর্ণ নয়।

মুলতান—একতালা :
চ'লে আয়, চ'লে আয়।
বিশ্রামের স্থান নাই এ ধরায়।
বহু দূর পথ হবে রে যাইতে,
পদে পদে জয় করিতে করিতে ;
শ্রান্ত চরণ, অবসন্ন মন,
এখনি যে অবসর চায় !

* * * * *

যোগ্যতা যাহার ধরা যে তাহার,
আদর আশীষ তারি পুরস্কার ;
(আমি অযোগ্য জনার সহিনারে ভার,
(তারে) সরায়ে দিই ত্বরায় ;
এলি রিপুদলে দলিতে সমরে,
কর্ম্মকুরু-ক্ষেত্রে কাঁপিবি কি ডরে ?
যে রাখে আমারে আমি রাখি তারে,
তুলে ধরি তারে সবার মাথায়।

* * * * *

এত যে সংগ্রাম, এত চক্ষে জল,
মনোব্যথা গলা এত মুক্তাফল ;
(আমি) যতন করিয়ে রেখেছি গাঁথিয়ে
অমূল্য মুকুট তায় ;
সে মুকুট শোভায় স্বর্গ ভেসে যায়,
পরাব সন্তানে আসিলে হেথায় ;
(করবে) জয় কোলাহল দেব দেবী দল,
(আমি) আনন্দে ভাসাব সবায়।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

# আকবর ও অশোক

আকবরের সময় এক দিকে ভারতের হিন্দু রাজত্ব, নাট্যশালার দীপাবলীর ন্যায় নিবিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্য রূপ একটা মহা অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অশোকের রাজত্বে দেখি, ভারতবাসী আর্য্যগণের সভ্যতা, শীলতা, শক্তি, ধর্ম্ম, সম্রাটে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সমুদয় ভারত আলোকিত করিয়াছিল।

আকবর ও অশোক উভয়ই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি মুসলমান বংশে জন্মিয়াও, কাফের-বধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, কাফের হিন্দুর নিকটই সমদর্শিতা ও "টলারেশন" শিখিয়াছিলেন! অশোকের গুণ, তিনি সিংহাসনারূঢ় ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াও, অন্যকে নিজধর্ম্মে আনিবার জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করেন নাই; এমন কি, কোন বৌদ্ধ অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা না করে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আকবর ও অশোক দুই জনই বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কাহারও একাধিকার সম্পত্তি নহে।

আকবর "দিন-ই-ইলাহি" নামক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মহম্মদের ন্যায় তিনিও এই নূতন ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর এক, একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি ( আকবর ) তাঁহার প্রতিনিধি ও প্রকাশক। মহম্মদের ধর্ম্মে কতক খ্রীষ্টের একমেবাদ্বিতীয়ং এবং মূসার প্রতিমা-পূজা-বিদ্বেষ দেখা যায়। ধর্ম্মের সহিত তরবারি সংযোগ করা মহম্মদের ধর্ম্মের মৌলিকতা। এই তরবারি দ্বারা মহম্মদ নরক এবং স্বর্গের মধ্যে একটা সেতু প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক তরবারি দ্বারা জড় ভৌতিক তরবারিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবার জন্য, দেহের উপর আত্মার পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া জন্য, প্রেম দ্বারা স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবার জন্য খ্রীষ্ট জগতে আসিয়াছিলেন। মহম্মদ আসিয়াছিলেন, জড় তরবারি দ্বারা আধ্যাত্মিক তরবারির স্থান করিবার জন্য, বাহুবল দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য। মহম্মদ ধর্ম্মের অগম্য উত্তেজনা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহার সৈন্যগণকে এমন এক শক্তি দিয়াছিলেন, যাহা এসিয়া এবং ইউরোপকে অবলীলা ক্রমে জয় করিয়াছিল। খ্রীষ্টের এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম বিবাদ ও যুদ্ধকে সংসার হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট। মহম্মদের ধর্ম্ম বিবাদে ও যুদ্ধে জয়ী হইবার শক্তিশালী।

আকবর এই মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত। কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্ম্মের বিশাল উদারতা দ্বারা বিজিত হইয়াছিলেন। যেমন রোমকগণ গ্রীস জয় করিয়া গ্রীসের সভ্যতার নিকট নতশির হইয়াছিল, আকবরও হিন্দুগণকে জয় করিয়া তাহাদের সভ্যতা, সমদর্শিতা, উদারতা, শিষ্যের ন্যায়, শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দুসন্ন্যাসী ও সাধুগণের নিকট হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় পাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি, তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মে হিন্দুদিগের ক্রিয়াকলাপ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের উপনিষদ্-বর্ণিত সূর্য্যে যে বিরাট পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু আকবর যে ধর্ম্মের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুর সহিতই লোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধদেবের বা ঈশার, বা মহম্মদের, বা চৈতন্যদেবের যেরূপ শিষ্য হইয়াছিল, আকবরের সেরূপ শিষ্য হয় নাই কেন? রাজসিংহাসনে বসিয়া কোন নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন হয় না। তবে মহম্মদ কিরূপে সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন? তবে কি আকবরের সময়ের লোক এত অজ্ঞ ছিল যে, আকবরের ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই? আকবর যদি কেবল নিতান্ত অসভ্য, নিতান্ত বর্ব্বর জাতির মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতেন,

তাহা হইলে এ কথা স্বীকার করিতে পারা যাইত। তখনকার হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে আকবরের ধর্ম্ম বুঝিতে পারে, এমন কোন উপযুক্ত লোক ছিল না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে আকবরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কেন তাহার মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়াছিল? তাহার উত্তর বোধ হয় এই যে, আকবরের প্রচারিত মত যত উত্তম হউক না কেন, নূতন ধর্ম্ম-সংস্থাপকের স্বার্থত্যাগ, উন্মাদনা, বিশ্বাস তাঁহার জীবনে ছিল না। তাঁহার ধর্ম্ম যেন বিবেকের বা বুদ্ধিশক্তির, ক্ষতি-লাভগণনার ধর্ম্ম। তাহা যেন হৃদয়ের বেগ-চালিত ধর্ম্ম নহে।

কোন হিন্দুরাজাই আকবরকে আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ব্বক কন্যাদান করেন নাই। তবে যে তিনি হিন্দু-রাজকন্যা বিবাহ করিতেন, তাঁহার রাজশক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য, ইহাতে ধর্ম্মের জ্যোতি দেখা যায় না; চতুর শাসকের দূরদর্শিতা প্রতীয়মান হয়। তিনি মহম্মদের ন্যায় হিন্দু বা কাফের বিরোধী ছিলেন না, তথাপি একে একে হিন্দু রাজগণের স্বাধীনতা হরণ করেন। ইহাতে স্বার্থত্যাগের গৌরব দেখা যায় না; অদমনীয় জিগীষা, পার্থিব গৌরব-লালসায়ই দেখা যায়। তাঁহার সখের বাজারের অন্তরালে তিনি গুপ্ত ব্যভিচার নাট্যের অভিনয় করিতেন, ইতিহাসের এই কথা যদি ভ্রমমূলক না হয়, তাহা হইলে সহজে বুঝা যায়, তাঁহার নবধর্ম্ম-সংস্থাপন চেষ্টা কেন বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহম্মদের ইন্দ্রিয়-সেবা ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিত। মৈশরী ক্রীতাদাসী মেরীর সহিত তাঁহার অভিসার যেরূপ ভাবে গিবন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এবং তাহা যদি সত্য হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্য না হইয়া, পরদার-ঘটিত সহজ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারীর অসাধারণ গুণরাশি থাকিলে সে নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা কেন্দ্র হইতে পারে, অগত্যা এই কথা বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু কেবল মাত্র ব্যভিচারই আকবর চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল, এমন নহে। তাঁহার প্রধান সেনাপতি, বিশ্বস্ত বন্ধু, নিত্য সহচর মান সিংহকে বিষ প্রয়োগে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই যে গুপ্ত হত্যার কথা টডের রাজস্থা[নে] পাওয়া যায়, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হই[লে] তুলাতে তাঁহার অসাধারণ গুণরাশি একদি[কে] রাখিলে এবং অপর দিকে পাপপুঞ্জ স্থাপি[ত] করিলে, তাঁহাকে কোন নবধর্ম্মের সংস্থাপক হই[বার] উপযুক্ত লোক বলিয়া মনে করা যায় না।

এখন দেখা যাউক, অশোকের ধর্ম্ম কি প্রকার। তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রব[র্ত্তন] করিবার জন্য প্রয়াসী হন নাই। তবে তি[নি] ধর্ম্মরাজ্যে একটা নূতন কাণ্ড দেখাইয়া গিয়া[ছেন]। তিনি রাজা অথচ সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি প্রথমে একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্র ছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি ভিক্ষু হন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন। সম্রাট ধর্ম্মপ্রচারক, সন্ন্যাসী, ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহা অশ্রুত। সুতরাং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই এই ঘটনা বিশ্বাস করিতে চান না। তবে ইহা যে প্র[স্তর] স্তম্ভে খোদিত রহিয়াছে। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, সম্ভবতঃ তিনি ভিক্ষুব্রত [কোন] নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গ্রহণ করিতেন। [ভারতে] এবং অন্যান্য দেশে দুই প্রকার ভিক্ষু আ[ছেন]

স্থায়ী ও অস্থায়ী। অশোক সম্ভবতঃ অস্থায়ী ভিক্ষু ছিলেন। যখন তিনি ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার অমাত্যগণ সম্ভবতঃ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। বর্ত্তমান কালে আমরা দেখিতে পাই, বরদার গাইকবার মধ্যে মধ্যে বিলাতে যান, তাহাতে রাজকার্য্যের কোন বিঘ্ন হয় না। কিন্তু অশোকের সেই বিশাল সাম্রাজ্য, যাহা ইংরাজদিগের ভারত সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ ছিল—সেই বিশাল রাজ্য যে সম্রাট-বিহীনে উত্তমরূপে চলিতে পারিত, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। বিখ্যাত পঞ্চম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়; কিন্তু ভিক্ষু বৃত্তি অবলম্বন এবং সম্রাটের কার্য্য-পরিচালনা এ দুই এক সঙ্গে—এটা যেন অতি নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব, অননুমেয় বিচিত্র ব্যাপার। আবার অশোক নাম মাত্রে রাজা ছিলেন, এমন নহে। রাজ কার্য্যে তিনি অধিকতর পরিশ্রম করিতেন, প্রস্তরলিপি অদ্যাপি তাহা সাক্ষ্য দিতেছে। অশোক ভোগী ও ত্যাগী, রাজর্ষি জনক। যদি কোন দেশে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতাপরায়ণ ভারতবাসীতে তাহা সম্ভব। এইরূপ দৃষ্টান্ত ভারতে আর একটী পাওয়া যায়। কুমারপাল নামক একজন জৈন রাজা সিংহাসনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আকবর কিন্তু অশোকের ন্যায় ভোগী ও ত্যাগী ছিলেন, সম্রাট-ভিক্ষু ছিলেন না। কলিঙ্গ জয় করিয়া অশোক উল্লাসিত হওয়া দূরে থাকুক, গভীর বিষাদে মগ্ন হইয়াছিলেন। যুদ্ধে ভীষণ নরহত্যা, হত ব্যক্তিদিগের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের শোক, সাধু ধার্ম্মিকগণের উপর অত্যাচার প্রভৃতি নানাবিধ ঘোর অনিবার্য্য লোমহর্ষণ ব্যাপার তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হৃদয়কে এমন আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি জয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় আর কখন কোন দেশ আক্রমণ করেন নাই। ধর্ম্ম দ্বারা হৃদয়ের উপর জয়লাভ করাই প্রধান জয়লাভ, ইহাই, অশোক, কলিঙ্গ জয় করার পর হইতে প্রচার করিতেন।

যেমন এক দিকে আকবরের শাসনপ্রণালী ও উদারতার সহিত আধুনিক বিদেশীয় সুসভ্য শাসন-কর্ত্তাগণের শাসন প্রণালী তুলনা করিলে, অনেক বিষয়ে আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়, তেমনি অন্যদিকে, অশোকের গুণগ্রামের সহিত আকবরের গুণাবলী সমালোচনা করিলে অশোককে বহুধা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হয়।

আকবরের রাজত্বে, সমরাগ্নি হিন্দু বীরত্বকে অবিরাম দগ্ধ করিয়া হিন্দুকে অশান্তিতে, শোকে, ক্ষোভে নিমজ্জিত করিয়াছিল। মানসিংহ, ভগবান দাস, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুকে তিনি যে প্রভূত ক্ষমতা ও অত্যুচ্চ পদ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে অবিরাম হিন্দু-শোণিতপাত-পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। সেদিন বিলাতি মন্ত্রিসভায় ভারত সচিব মর্লি বলিয়াছিলেন, ইংরাজ শাসন-কর্ত্তাদিগের অতি কর্ম্মপটুতা ভারতবাসীকে অনেক সময়ে অসুখী করে। আকবরের অতি কর্ম্মপটুতাও ভারতবাসীকে অসুখী করিয়াছিল। যেখানে শাসনকর্ত্তা অতিশয় প্রবল, পটু, তীক্ষ্ণদর্শী, ক্ষমতালোলুপ, প্রজাদিগের ক্ষমতা, স্বত্ব, স্বাধীনতা আপনার বজ্র হস্তে কেন্দ্রীভূত ও রজ্জুলগ্ন করিয়া প্রজাপুঞ্জকে পরিচালনা করে,—সেখানেই প্রজার মনুষ্যত্ব, শক্তি, সন্তোষ, বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ বিনষ্ট হয়। প্রজা যখনই আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া মস্তক তুলিতে চাহে, অমনি রাজার বজ্রদণ্ড

তাহার মস্তক চূর্ণ করে। এই জন্যই মহা-পরাক্রান্ত রাজারা অনেক সময়ে মানব জাতির হিতকর বন্ধু না হইয়া, ফলে অশেষ ক্ষতিজনক শত্রু রূপে পরিণত হয় এবং তাহার মৃত্যুপরে তৎকৃত কার্য্যের কোন বিশেষ মঙ্গল-ময় ফল পরিলক্ষিত হয় না এবং এই জন্য আকবর-চরিতের একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন যে, আকবরের নানাবিধ গুণ ও ক্ষমতা স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা ভারত-বর্ষের কোন ভাবী মঙ্গল হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। এই জন্য আমরা বলি যে, প্রিয়দর্শী অশোক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, ধর্ম্মের জয়ই প্রকৃত জয়। শোণিত-স্রোত অবনতির দিকে নিত্য গড়াইয়া যায়, স্থায়ী উন্নতির ঊর্দ্ধশিখায় আরোহণ করিতে পারে না।

তবে প্রবল রাজাদিগের জিগীষা ও জয় পরম্পরা আলোচনা করিয়া এই একটী বিশেষ শিক্ষা লাভ হয় যে, প্রত্যেক জাতির আত্ম-রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে শক্তি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

# স্পর্শদোষ-প্রথা উঠাইয়া দাও।

জাতিভেদ ও স্পর্শ-দোষ-প্রথা বেদানু-মোদিত নহে। সুতরাং উহা উঠাইয়া দিলে হিন্দু-ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় না। এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা না করিয়া এবং কি প্রকারে এই অশাস্ত্রীয় ব্যবহার উঠাইয়া দিতে পারা যায়, তদ্বিষয় কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না করিয়া, আমাদের নেতৃগণের পক্ষে স্বদেশী-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া অন্যায় হইয়াছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ বলিলে যে স্থানটুকু বুঝায়, তাহা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অধিক স্ব-দেশ। এজন্য তথায় হিন্দু মুসলমানে প্রগাঢ় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, যেরূপে এক্ষণে স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্যতার আশা দূরাশা মাত্র।

শুনিয়াছ অবশ্যই এ উক্তি বিশেষ।
পাড়াবাসী প্রতি প্রেম, শত্রুপতি দ্বেষ॥
কিন্তু মম বাক্য শুন, কর না এমন।
শত্রুকেও কর গিয়া প্রেম-আলিঙ্গন॥
মৎকৃত খ্রীষ্টপুরাণ (যন্ত্রস্থ, মথি ৫।৪৩-৪৪)

দূরে থাকুক মুসলমানকে প্রেমালিঙ্গন করা, স্পর্শ-দোষ-প্রথা থাকা-সত্বে, হিন্দুর যে বিভিন্ন জাতি গুলি আছে, তাহাদের মধ্যেও কি পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হয়? হে শিক্ষিতা-ভিমানী কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ! তুমি কি প্রকৃত প্রস্তাবে নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) গণের সহিত প্রেমা-লিঙ্গন কর? তুমি কি মুসলমানকে যবন-জ্ঞানে নিতান্তই ঘৃণা কর না? অথচ এই মুসলমানগণ তোমাদের পাড়াবাসী, তোমা-দের রক্তমাংস-জাত, কেবল তোমাদের অত্যা-চারে বেদ পরিত্যাগ করিয়া কোরাণ আশ্রয় করিয়াছে। তোমরা যদি এতাদৃশ অনাচর-নীয় ও কোরাণিক হিন্দুদিগকে প্রাণের সহিত স্বদেশ-বাসী ও স্বজাতি মনে করিতে না পার, তবে তাহাদিগকে এই স্বদেশী-আন্দোলনে, এই জাতীয়-পতাকার তলে আসিতে আহ্বান করিতেছ কেন?

ইহা হইতেই যত অনর্থ উৎপাদিত হই-য়াছে। ইহা হইতেই এই দ্বেষাদ্বেষী, রক্তা-রক্তি ও খুনাখুনি আরম্ভ হইয়াছে। তুমি বলিতেছ, স্বদেশ-সেবায়, জাতীয় উন্নতিতে

হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপকার আছে। মানিলাম আছে। কিন্তু তোমার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কি মুসলমানকে স্বজাতির ন্যায় বিবেচনা কর? মুসলমানেরা প্রকাশ্য ভাবে বলিতেছেন, কুকুর স্পর্শেও যে দোষ ও ঘৃণার উদয় না হয়, হিন্দুর মুসলমান-স্পর্শে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণার উদ্রেক হয়। একথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? ঠিক্ অনাচরণীয় নমঃশূদ্রাদি হিন্দুর মনের ভাবও এইরূপ। তাই বলিতেছি, অগ্রে স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইয়া দাও; তার পরে স্বদেশীর আন্দোলন কর।

তুমি হয়ত বলিবে যে, স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইলে, জল-চল করিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কথাটা সত্য নয়। স্পর্শ-দোষ প্রথা থাকাতেই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, কেন না উহা বেদানুমোদিত নহে। সে যাহা হউক, মানিয়া লইলাম, লোকাচারই তোমার ধর্ম্ম এবং স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দিলে সে ধর্ম্ম থাকে কই? কিন্তু ধর্ম্মটা কি কেবল তোমার? অনাচরণীয় হিন্দুর কি এই হিন্দুধর্ম্ম নহে? তাহার পক্ষে স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া স্বার্থ ও ধর্ম্ম। সুতরাং তোমার যাহা অধর্ম্ম, তাহার তাহা ধর্ম্ম। সুতরাং তুমি অনাচরণীয় হিন্দুকে কি প্রকারে প্রেমালিঙ্গন দিবে? সেই বা কেন তোমার জন্য রক্তপাত করিতে আসিবে? আমি অবগত আছি, ১৮৯১ সনের সেন্‌সাসের পূর্ব্বে কোন একটী মহকুমার উকীল ও মোক্তারগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেল না যে, চণ্ডালগণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানি আবেদন-পত্রের মোসোবিদা করিয়া দেন। টাকা দিয়াও চণ্ডালগণ উক্ত ঘৃণিত নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নমঃশূদ্র বা শূদ্র নামে সরকারী সেরেস্তায় লিখিত হইবার জন্য ২০ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এক জনের হস্তও ক্রয় করিতে পারিল না! তাঁহারা বলিলেন, চণ্ডাল শূদ্র বা নমঃশূদ্র হইবে, ইহার দরখাস্ত লিখিতে যাইবে কে? তাঁহাদের এই বিরুদ্ধতায় চণ্ডালগণের কোন ক্ষতি হয় নাই; তাঁহারা সেই সেন্‌সাস হইতেই নমঃশূদ্র বলিয়া সরকারী কাগজ-পত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারা উচ্চ-শ্রেণী হিন্দুর মনের ভাব তাহাদের নিকট সম্যক উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে নিম্নশ্রেণীর প্রতি সদ্ব্যবহারে কুণ্ঠিত, ইহা আর বুঝিতে বাকী নাই। আমরা যে এক্ষণে তাহাদিগকে স্বদেশী ও স্বজাতি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি, ইহা যে আমাদের অন্তরের কথা নহে, প্রবঞ্চনা বাক্য, তাহা নিম্নশ্রেণী হিন্দুরা ক্রমশঃ বুঝিয়া উঠিতেছে।

এই যদি নিম্নশ্রেণী হিন্দুর সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক ভাব, মুসলমানগণের সম্বন্ধে যে আমাদের আন্তরিক ভাব তদপেক্ষা অধিক প্রবঞ্চনা-পূর্ণ, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি, অথচ বলিতে চাই, করি না; তাহাদের জলস্পর্শ করি না, গৃহে আসিতে দেই না; এমন হিন্দু আছেন, মুসলমান স্পর্শ করিলে স্নান করেন। ইহা যে ঘৃণাসূচক ব্যবহার, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? তুমি প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া, কেবল লোকাচারের দোহাই দিয়া, পাড়াবাসীর প্রতি নিয়ত দুর্ব্ব্যবহার করিতেছ, সে যদি তাহার প্রকৃত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তোমার প্রতি একদিন দুর্ব্যবহার করে, তুমি দুঃখিত হইবে কেন? ইহা তোমার কর্ম্মফল। শুন, তাহার শাস্ত্রে কি বলিতেছে,—

'Permission is granted unto those who take arms against the unbelievers, for that they have been unjustly persecuted by them. Sale's Koran, Chap XXII, page 154.

কোরাণানুবাদক উক্ত সেল সাহেব কোরাণ সম্বন্ধে যে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার এক স্থানে আছে —

"But this great passiveness and moderation seems entirely owing to his (Mahammad's) want of power and the surperiority of his opposers, for the first twelve years of his mission; for no sooner was he enabled by the assistance of those of Medina to make wad against his enemies than he gave out that God had allowed him and his followers to defend themselves against the infidels and at length as his forces increased he pretended to have the divine leave even to attack them and desitroy idolatry and set up the true faith by sword

Sales discourse on Koran, chap II page 38.

আমরা যদি একটা লোকাচারের দোহাই দিয়া পাড়াবাসীকে ঘৃণা করি, তাহারা তাহাদের প্রকৃত ধর্ম্মের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ঘৃণাতেই ঘৃণা উৎপাদন করে। ইহা আমাদের শাস্ত্রেও আছে।

তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি। ১
তোমার জ্বালায়ে তারে কর জ্বালাতন;
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি। ২
অথর্ব্ববেদ ২।১৯

এজন্য বলিতেছি "পাড়াবাসী প্রতি প্রেম" এই মহামন্ত্র যদি গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে নিম্নশ্রেণী হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও; তৎপরে কোরাণিক হিন্দুগণের সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার কর। প্রকৃত জাতীয়তার বীজ বপন কর। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম যাইবে না, প্রোজ্জ্বল হইবে। মুসলমান ভ্রাতৃগণও তাঁহাদের রক্ত মাংস চিনিতে পারিবেন। রাজা সন্তুষ্ট থাকিবেন। রাজার কার্য্যে দোষারোপ করা রাজার প্রতি অভক্তি উৎপাদন করা, হিন্দুনীতি নহে।

"মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

মনু বলিয়াছেন, রাজা মহতী দেবতা। সুতরাং এই নীতি শিরোধার্য্য করিয়া আভ্যন্তরিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হও। রাজার নিন্দা করিও না।

আমি দেখিতেছি, কোন কোন স্বদেশহিতৈষী হিন্দু, সন্তানদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। এই আত্মরক্ষা করিবে কি স্কুলের ছাত্র গুলিকে বলিদান দিয়া? প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় নাই। হিন্দু মুসলমান বিবাদ ঘনীভূত ও স্থায়ীভাব ধারণ করিলে, কোন হিন্দু কোন হিন্দুর প্রকৃত সহায়তা করিবে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু করিবে না-ই। আমি অবগত আছি, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের চেষ্টায় বরিশাল জেলার স্থানে স্থানে নমঃশূদ্রদিগকে তাহাদের ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এতাদৃশ একজন ব্রাহ্মণের সহিত আমার ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি বলেন, আমার যজমান নমঃশূদ্রেরা বলে, স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যোগ দিয়া ফল কি? আমাদের সহিত উচ্চশ্রেণী হিন্দুর কথনইত মিলন হইবে না! আমরা অস্পৃশ্য থাকিব, ফাটকে গেলে মেথরের কাজ করিব, ইহার কোন প্রতিবিধান করা হইবে না, অনর্থক রাজার সহিত কলহ করিতে যাইব কেন? তারপর বিদেশী বস্ত্র খরিদ না করিয়া দেশী বস্ত্র খরিদে সম্প্রতি অর্থ ব্যয় বেশী। বর্ণবিপ্র মহাশয় যখন এই কথা গুলি বলিলেন, আমি দেখিলাম, আমাদের শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এই অশিক্ষিত নমঃশূদ্রগণ

রাজনীতি ও সমাজনীতি ভাল বুঝে। নমঃ-শূদ্রের যদি জল চল করিয়া লওয়া যায়, তবে কি তাহাদিগকে ফাটকে গিয়া মেথরের কাজ করিতে হয়? আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি, গবর্ণমেণ্টও সেই জন্য তাহাদিগকে এরূপ ঘৃণিত-কার্য্য করিতে বাধ্য করেন। যাঁহারা ভাবেন, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু প্রস্তুত হইলে, ভীষ্মের ন্যায় সহস্র সহস্র মুসলমানকে ফুৎ-কারে উড়াইয়া দিবেন, তাহাদিগকে একটুকু স্থিরভাবে এই সকল কথা গুলি চিন্তা করিতে বলি। হিন্দু-মুসলমান বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে নিম্নশ্রেণী হিন্দু, মুসলমানের সঙ্গে একযোগে চলিবে, হয়ত তাহাদের বহুসংখ্যক এই উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ের স্বদেশীয় আন্দোলনের ইহাই পরিণাম। বরি-শালের নমঃশূদ্রের কথাত বলিলাম। তাহা-দের মনের ভাব পাঠক জানিতে পারিলেন। এক্ষণে ফরিদপুরের নমঃশূদ্রের কথা বলি। ফরিদপুরে মোট জন সংখ্যা ৫,৭০,০০০, তন্মধ্যে নমঃশূদ্র সংখ্যা ৩,২০,০০০। গত দুর্ভিক্ষের সময় শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত-সম্পাদক এই নমঃশূদ্র-প্রধান জেলায় অনেক স্থানে রিলিফ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন (নব্যভারত, গত পৌষ মাঘ সংখ্যা) নমঃশূদ্রের মধ্যে যাহারা রাজদ্বারে চাকরী বা ব্যবসায় করিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "বয়কট" করিতেছেন এবং নানা রকমে তাঁহাদের উন্নতির ব্যাঘাত করিতে-ছেন। সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ের বিস্তা-রিত নোট প্রকাশ করিলে ভাল হইত। কি উপায়ে "বয়কট" করা হয়, কি উপায়ে উন্ন-তির ব্যাঘাত জন্মান হয়, তাহা স্পষ্ট লেখা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, ইহা সত্য, ফরিদপুরের এই "মেরুদণ্ড" স্বরূপ হিন্দু জন সংখ্যার সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সদ্ভাব নাই। ফরিদপুরে আমার একজন বাল্যবন্ধু কংগ্রেসী মোড়ল আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই,ফরিদপুরে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হইলে, এই ৩২০০০০ হিন্দু সংখ্যা কোন দিকে দাঁড়াইবে? এইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল জিলার কথা।

তোমরা ভাবিতেছ, ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড জাতীয়তার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাহার নাকি ভিত্তি-প্রস্তরও স্থাপিত হই-য়াছে। জাপানে কতকটা এরূপ আছে বলিয়া তোমাদের ধারণা। এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে, ইহা ভুল। জাপান ঠিক্ হিন্দুস্থানের মত নহে। সেখানে সমাজে কোন বিভিন্নতা নাই। কেহ বৌদ্ধ, কেহ খ্রীষ্টান হইতে পারে, কিন্তু খায় দায় একত্রে। তাঁহাদের স্পর্শ-দোষ-প্রথা নাই। তাই বলি, যদি স্বদেশীয়তা রক্ষা করিতে চাও, স্পর্শদোষ প্রথা উঠাইয়া দাও। একজন নমঃশূদ্র বা কোরাণিক হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহার করিলে সহস্রখানি বিলাতী-বস্ত্র পরিবর্জ্জনের ফল আছে।

একটা মোটা কথা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কথাটা এই "গায় যদি তেল হইয়া থাকে,তবে মাদার গাছে গা ঘস।" আমাদের নেতৃ-গণের প্রতি আবার নিবেদন এই যে, এক্ষণ একটুকু মাদার গাছে গা ঘসুন। এই গন্ধ-শূন্য অথচ সুন্দর পুষ্পবিশিষ্ট কণ্টকময় মাদার গাছের তুল্য হিন্দুসমাজ-বৃক্ষে একবার গা ঘসুন। এই ঘসাতেই তেল কমিয়া যাইবে, তারপর যাহা হয় করিবেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

# অবলাবান্ধব, কর্ম্মযোগী উমেশচন্দ্র দত্ত।

যাহা ভাবি নাই এবং যাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, অকস্মাৎ সেই ঘটনা ঘটিয়াছে,—সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আর মর্ত্ত্যধামে নাই। প্রকটলীলায় যিনি আজীবন নিষ্কামব্রত পালন করিতেছিলেন, সেই দেবপ্রতিম সাধু মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কর্ম্মযোগক্ষেত্রে হাহাকার উঠিয়াছে—সকলে হায় হায় করিতেছে,—লীলাময়ের কঠোর বিধানে বঙ্গমহিলা কুলে নিদারুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়াছে,—হায়, হায়, হায়!!

বাঙ্গালী চিরদিন বাক্যবাগীশ—কথা বলে অনেক, কাজ করে অতি অল্প;—হাসে, খেলে, যায়; নাচে, মাতে, গায়;—সারত্ব বা ভারত্ব বাঙ্গালী জীবনে বড় অধিক দেখিতে পাইবে না;—যদি কখন পাও, তবে তাহাও ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র;—জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনা অতি অল্প বাঙ্গালীই করিতে পারেন। উমেশচন্দ্র দত্ত এ কথার জীবন্ত প্রতিবাদের জন্য যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—কথার বাজারে তিনি মূক, কথা ফোটে, ফোটে, ফোটে না, কিন্তু কার্য্যের বাজারে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবিচলিত বীর। দেখিয়াছি—কার্য্য করিতে করিতে তিনি ক্ষুধা ভুলিয়াছেন, তৃষ্ণা ভুলিয়াছেন, নিদ্রা ভুলিয়াছেন, তন্দ্রা ভুলিয়াছেন, সুখ ভুলিয়াছেন, সম্পদ ভুলিয়াছেন। ৪০ বৎসরের বঙ্গ-সামাজিক সংস্কার-রাজ্যের এমন কোন কার্য্যের উল্লেখ করিতে পারিবে না, যাহার মূলে উমেশচন্দ্র ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাকে চিনিত বা জানিত, অতি অল্প লোকে। নীরবে থাকিয়া, মরমে মরিয়া, আড়ম্বর ভুলিয়া—তিনি সমস্ত দিন কেবল খাটিতেন;—খাটিতে খাটিতেই তাঁহার জীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ বঙ্গে আর দ্বিতীয় দেখাইতে পারিবে না। তিনি কেবল তাঁহারই যোগ্য ছিলেন।

এদেশের লোকেরা আপন আপন প্রাধান্য ঘোষণার জন্য সদা যেন লালায়িত, কিন্তু উমেশচন্দ্র আত্মগোপনের জন্যই সদা চেষ্টিত থাকিতেন। কাজের সময়ে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি সদা লজ্জিত, সদা সঙ্কুচিত এবং সদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। আত্মঘোষণার বিরোধী জীবন যাপন করিবার জন্যই তিনি এই বঙ্গে যেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন;—করিয়াছিলেন বহুকাজ;—কিন্তু চাক ঢোল কোন কাজের নাই,—বিনা আড়ম্বরে মহা কর্ম্মযোগী কত কত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা কখনও ছাড়িতেন না, যে ব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না;—এ কথার সাক্ষ্য দিবার জন্য সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ, সিটী কলেজ, বোবা ও কালা-স্কুল এবং বামাবোধিনী বিদ্যমান। অশ্রান্ত,—অক্লান্ত, অম্লান উমেশচন্দ্র আজীবন কর্ম্মযোগ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নৈরাশ্যের ভ্রুকুটী, বা দারিদ্র্যের নির্য্যাতন, বা সামাজিক পীড়নের কষাঘাত, বা যশ মান ভালবাসার কুহক কখনও তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত, কর্ত্তব্য-চ্যুত, ব্রতচ্যুত করিতে পারে নাই। একদিকে সামাজিক অত্যাচার, দারিদ্র্যের কষাঘাত, অন্যদিকে বাহাড়ম্বরের উত্তেজনা, আত্ম-

ঘোষণার বিষম তরঙ্গাঘাত—উমেশচন্দ্র কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া,নীরব-সাধনার পথে ছুটিতেছেন। ধন্য জীবন,ধন্য ব্রত, ধন্য নিষ্কাম সাধনা।

এদেশ,কত কাল, মহিলা-নির্য্যাতন-সাধন করিয়া আসিতেছেন। তিনি মনু হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে দেশে নারী পূজিত হয়, সেই দেশেই দেবতারা বাস করেন ;--ঘোষণা করিলেন, নারীকেও যত্নের সহিত পালন করিতে এবং শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি এই মন্ত্রবলে চত্বারিংশৎ বৎসর বামাবোধিনী সম্পাদন করিয়া মহিলা-কুলের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এদেশে তাহা তুলনা-রহিত। বামারচনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত,মহিলা-কুলের রচনাকে সাদরে পোষণ এবং ধারণ করিয়া গিয়াছেন ;—তিনি যেন মহিলাকুলের মা বাপ ছিলেন। আমরা তাঁহার ন্যায় মহিলা-কুলের অকৃত্রিম বন্ধু আর দেখি নাই। তিনি সাধন করিয়াছিলেন—সকল মহিলা যেন তাহার কন্যা-স্থানীয়া,—এই মহাসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি নিষ্কলঙ্ক অমর জীবনের যে স্ফুট চরিত্রাভাস এই বঙ্গে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিবার জিনিস,হৃদয়ে ধারণার জিনিস, জীবনে সাধনার জিনিস। তিনি—বুঝিবা এরাজ্যেও তিনি অতুলিত মহিমা-মণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন।

ভক্ত কেশবচন্দ্রের দুহিতার পরিণয় ব্যাপার লইয়া এ দেশের ব্রাহ্ম-সমাজে যখন তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল, আমরা সেই সময়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তিনিও প্রতিবাদকারী দলের অন্যতর নেতা ছিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ আন্দোলনের দিনেও, তাঁহাতে উচ্ছ্বাস বা অসংযত ব্যবহার দেখি নাই,তাহার মুখে পরনিন্দার কথা শুনি নাই। তিনি এ সকলের সম্পূর্ণ অতীত ছিলেন। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি কখনও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, শুনি নাই। বামাবোধিনীর গ্রন্থ সমালোচনায় তাহার যে সংযত প্রশংসাবাদের পরিচয় পাইয়াছি—তাঁহার জীবনে সর্ব্বদা তাহারই ছায়া দেখিয়াছি। তিনি আপন ভুলিয়া অন্যকে আদর করিতেন,কাহারও উপকার করিবার সময়ে তাহার দোষ স্মরণ করিতেন না,যাহাকে সকলে নিন্দা বা তুচ্ছজ্ঞান করে, তিনি তাহাকেও বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। তিনি কাহাকেও পর মনে করিতেন না, তিনি ভাবিতেন— তিনি সকলের, সকলে তাঁহার। কেবল ভাবা নয়—এই ব্রত সাধনে তিনি চিরকাল ব্যাপৃত ছিলেন। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব-ঘৃণার যে অদম্য পরাক্রম পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সাধু উমেশচন্দ্র সেই মানব-ঘৃণাকে তদীয় প্রশান্ত হৃদয়ের ত্রিসীমায় পৌছিতে দেন নাই, অকপটে চিরকাল মানব-সেবা করিয়াছেন,কিন্তু একদিনও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই। যাঁহারা কর্ম্মযোগ সাধনে অসন্তুষ্টি, বিরক্তি বা ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত হন, তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনায় চিরকাল অসিদ্ধ। উমেশচন্দ্রের জীবন আদর্শ জীবন, তিনি কখনও, এক দিনের জন্যও, নিরাশার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েন নাই। তিনি কর্ম্মযোগে সিদ্ধ যোগী।

কর্ম্মযোগ সাধন ভিন্ন রিপু জয়ে কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন কিনা, জানি না। কর্ম্মযোগ ভিন্ন দেহধারী মানবের সকল বৃত্তির স্ফুরণ হয় কিনা, জানি না। জানি না, কর্ম্মযোগ ভিন্ন মানব জীবনের সকল অনুশীলন প্রস্ফুট হয় কিনা। উমেশচন্দ্র বুঝি

বা বুঝিয়াছিলেন যে, কর্ম্মযোগ ভিন্ন মানব-জীবনের লক্ষ্য বা কর্ত্তব্যসিদ্ধির আর উপায়ান্তর নাই; তাই তিনি কর্ম্মযোগকে জীবনের সার করিয়াছিলেন। তিনি খাটিতেন, কিন্তু আত্মসুখের জন্য খাটিতেন না;—তিনি কর্ম্মে ডুবিয়া যাইতেন, কিন্তু একদিনও সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বা সম্মান ও প্রশংসা লাভের জন্য খাটেন নাই। এমন পূতচরিত্র নিষ্কাম ব্রতপরায়ণ সাধুর দৃষ্টান্ত এযুগে আর দেখিতে পাইবে না। তিনি পরকে আপনার বক্ষে পূরিয়া কেবল পরের মঙ্গল সাধনেই অমূল্যজীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরকে পর বলিয়া বুঝিতেন না—পরকে বিশ্বেশ্বরের প্রকটলীলার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের সেবায় তৎপর থাকিতেন। তিনি এই ব্রত-সাধন-বলেই অনাবিল বিশ্ববিজয়ী প্রেম-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার্পণ করিয়া তিনি সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। একজনের নির্দ্দেশে খাটিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলন,—তাঁহার নির্দ্দেশেই অম্লানচিত্তে খাটিয়া গিয়াছেন। একের প্রভুত্ব, একের স্বামীত্ব, একের অধীনতা—সর্ব্বদা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তিনি খাটিয়া, খাটিয়া, খাটিয়া, ব্রহ্মসাধনে ব্রহ্মত্ব বা সিদ্ধি লাভ করিয়া পরা ধর্ম্মের বিজয় নিশান এই বঙ্গে উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি কি ছিলেন, কি ছিলেন না, শুনিবে? তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন, কিন্তু স্বার্থযোগী নহেন; তিনি মানব-প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু মানব-বিদ্বেষী নহেন; তিনি ভক্তিপিপাসু ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধনে তৎপর ছিলেন না,—তিনি স্বদেশভক্ত ছিলেন, কিন্তু আত্মান্বেষী নহেন!; তিনি অবিচলিত ও অটল ছিলেন, কিন্তু পরাবমাননাকারী ছিলেন না; তিনি মহিলাবন্ধু ছিলেন, কিন্তু মহিলাচিন্তনে অসংযত-চরিত্র ছিলেন না; তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু ঋষীপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার বিরোধী নহেন; তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, উহার পুতিগন্ধময় পথ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া উদার 'ধর্ম্মব্রত পালন করিতেন; তিনি চরিত্রে দিগ্বিজয়ী ব্যক্তি ছিলেন—কিন্তু আত্ম-ঘোষক নহেন, তাঁহার প্রতিভা সদা আত্ম-গোপনকারী আত্মত্যাগ-মন্ত্র শিক্ষা দিত; তিনি পরোপকারী ছিলেন, কিন্তু পরপ্রত্যাশী বা পরদ্রোহী ছিলেন না। এক কথায় বলিতে গেলে—তাঁহার ন্যায় পূজ্য, আদর্শ, শত্রু-মিত্রে-সমভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি এ যুগে এদেশে আর অধিক দেখি নাই। সাধু উমেশচন্দ্র দত্তকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন—তিনি তন্ময় থাকিতেন; তাঁহার অপেক্ষা সকলেই শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের শিষ্য;—এই সাধনাই তাঁহার পরম সাধনা ছিল। যত সাধু, যত ভক্ত—সাকলের স্বীকৃতি ও সাদর অভ্যর্থনা তাঁহাতে দেখিবে;—সকল স্বদেশভক্তের স্মৃতি সংরক্ষণে তিনি সদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি অন্যের কথা কহিবার সময় এমন সংযত মন্তব্য প্রকাশ করিতেন,—বোধ হইত যেন, তিনি ব্রহ্মের প্রকটলীলা তাঁহাতে দেখিয়া প্রমুগ্ধ হইয়াছেন। সকলে শিবধামের যাত্রী, —সকল ঘটনায় শিবম্ মন্ত্রের জয়—জলস্থল ব্যাপিয়া কেবল চিন্ময় শক্তি প্রকটিত;—তিনি বুঝিতেন, মজিতেন, ভাবে বিভোর হইতেন, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত না—গভীরে, অটলে, অচলে তিনি ডুবিয়া যাইতেন। তিনি-ময়ত্ব সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া, নীরবে, তিনি কর্ম্মযোগ পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। অথবা পুরুষে পিতৃভাব, রমণীতে মাতৃভাব

—চিন্ময়ের দুই প্রকটলীলা সাধনাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং পরিণতি। তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি এজগতে পরিসমাপ্ত হইয়াছেন; -কিন্তু তাঁহার যে স্মৃতি, যে জীবন-ছায়া, যে চরিত্রের স্ফুলিঙ্গ রহিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কখনও বিস্মৃত হইবে না; —তাহা অসমাপ্ত, চিরদিন অতুলিত থাকিবে। ইহা কর্ম্মযোগীর স্বর্গারোহণ নয়--ইহা মর্ত্ত্য-বাসীর স্বর্গারোহণ। বুঝিবা, উমেশচন্দ্র বঙ্গের আপামর সাধারণকে জীবনাদর্শে স্বর্গের উপযোগী করিয়া স্বর্গে তুলিয়া লইয়াছেন। এই বঙ্গ ধন্য যে, এই মহাত্মার পুণ্যময় জীবনাদর্শে স্বর্গের আভাস পাইয়াছে।

তবে যাও, নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র উমেশচন্দ্র, —তুমি সেই ধামে যাও, যেখানে অসুরের অত্যাচার নাই,—সাধু-সজ্জনের নিন্দা নাই, নারীর অবমাননা নাই;—যাও সেই ধামে, যেখানে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র,যোগক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, আরো প্রসারিত, আরো মহিমান্বিত হইতেছে। আর আমরা?—আমাদিগকে তুমি ডাকিয়া গিয়াছ—আমরা তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে, তোমার পদরেণু বহিতে বহিতে, তোমার আদর্শে মজিতে মজিতে,—তোমার অসমাপ্ত কর্ম্মযোগ ধরিতে ধরিতে—আমরাও, বিধাতার কৃপায়, তোমার অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। তুমি নেতা—আমরা নীত, তুমি গুরু, আমরা শিষ্য, তুমি আদর্শ, আমরা অনুসৃত। তোমার স্বর্গারোহণ আমাদের স্বর্গারোহণের কারণ হউক,—বিধাতার শ্রীপাদপদ্মে নিয়ত কেবল ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

চলিলে কোথায়?
দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
তোমারে বিদায় দিতে
প্রাণ যে ফাটিছে খেদে,
অশনি ভাঙ্গিয়া আসি পড়িছে মাথায়,
দেব! তুমি চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
তুমি সমাজের প্রাণ,
তুমি এ দেশের মান,
কোন্ প্রাণে হেন জনে দিব গো বিদায়,
দেব! তুমি চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
শিশু সন্তানের দল,
করিতেছে কোলাহল,
সতত খাটিতে তুমি যাদের মায়ায়,
আজি দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
জন্ম-ভূমি তব তরে,
কাঁদিছে করুণা করে,
এমন অসহ্য শোক সহা নাকি যায়?
দেব! তুমি চলিলে কোথায়?

চলিলে কোথায়?
ওহে দেব! দয়াময়
এই কি উচিত হয়?
কোন্ থানে যাও বল কোন্ অভিপ্রায়?
দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
ওই দেখ সুকুমার,

করিতেছে হাহাকার,
সন্তোষ আনন্দ মণি ধূলায় লুটায়,
বল তুমি! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
ওই যে কাঁদিছে ঊষা,
ফুরাইল সব আশা,
আদরের কন্যাগণ করে হায়, হায়!
তুমি দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
ওই 'বামাবোধিনী'র
হৃদয় হইল চীর,
আর কে তুলিবে বল ধরিয়া তাহায়?
যে 'বামাবোধিনী' বলে
দেহ রক্ত দিয়েছিলে,
আজ নিরাশার নীরে ডুবাইয়া তায়
তুমি দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
পরহিতে নীজ প্রাণ,
তুমি করেছিলে দান,
সকলে নিজের মত দেখিত তোমায়,
হায়! দেব! চলিলে কোথায়

দেব তুমি চলিলে কোথায়?
সাধু সন্ন্যাসীর মত,
সৎকর্ম্মে ছিলে রত,
দীন হীন দুঃখী অন্ধ খুঁজিত তোমায়,
দেব! তুমি চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
পরের বিপদ হলে,
ভাবিতে নিজেরি বলে,
আপন ভুলিতে তুমি পরেরি মায়ায়,
আজি দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
জানিতে বিভুর তত্ত্ব,
বিভু-প্রেমে ছিলে মত্ত,
প্রেমময়ে একেবারে সঁপেছিলে কায়,
দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
স্বরগের লোক তুমি,
পবিত্র করিলে ভূমি,
সার্থক হইল ধরা লভিয়া তোমায়,
আজ দেব! চলিলে কোথায়?

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
অগাধ তোমার পুণ্য,
ধন্য দেব! তুমি ধন্য,
সানন্দে স্বরগবাসী ডাকিছে তোমায়
তাই বুঝি চলিলে তথায়।

দেব! তুমি চলিলে কোথায়?
ওহে দেব! পুণ্যবান্!
তব যোগ্য স্বর্গধাম,
তোমারে করিবে সুখী শত দেবতায়,
তাই দেব! চলিলে তথায়!

যাও তবে যাও স্নেহময়,
পবিত্র রজনী-যোগে
বায়ু বয় থেকে থেকে,
কুসুম নাচিয়া উঠে ধীরে গন্ধ বয়,
গমনের এই সুসময়।

যাত্রার তো এই সুসময়
নিদাঘের খর তাপে,
কারো না শরীর কাঁপে,
মুক্তা সম ঝলসিছে তারকা নিচয়
দেব! যাত্রার তো এই সুসময়।

যাও দেব! এই সুসময়
ওই যে স্বর্গের রথ,

আলো করি আসে পথ,
শত রবি, শত শশী হয়েছে উদয়,
যাও দেব! এই সুসময়
যাও যথা সাধুগণ যায়,
অসংখ্য দেবতা বর্গ,
গড়েছে অক্ষয় স্বর্গ,
সেখানে জ্যোতিরাসনে বসাবে তোমায়,
যাও যথা সাধুগণ যায়।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

## *** বরণোপহার।

(১৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩১৪।)

*, অনেক আশায় প্রলুব্ধ হইয়া। আজ আমরা সপুষ্পে ও সচন্দনে তোমাকে বধূ-মাতৃত্বে বরণ করিতে আসিয়াছি; তুমি প্রসন্ন-চিত্তে আজ আমাদিগের প্রতি মধুর দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর, আমরা ধন্য হইয়া যাই।

খনির তিমিরে এবং সাগরের অতলে যেমন অনেক রত্ন লুক্কায়িত থাকে, তোমার হৃদয়-কন্দরেও, তেমনি, পিতৃ এবং মাতৃ-কুল-প্রদত্ত অনেক উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত আছে, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার পিতা সাধু এবং মাতা সাধ্বী;—তাঁহাদের কমনীয় জীবন-চরিতের পূত-শক্তি-কণা-সকল তোমাতে সঞ্চিত এবং পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, আমরা আভাস পাইয়াছি। আভাস পাইয়া—আমাদের দারিদ্র্য-পূর্ণ ঘরের ভাঙ্গাপাত্রে মহত্ত্বের-খনি-রূপিণী সুধাংশু-অমিয়া তুলিয়া লইতে আসিয়াছি। মা, আমরা তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে আজ ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি,—তুমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমাদিগের মস্তকে বর্ষণ কর। সাধু-সাধ্বীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়া যাই।

বড় ভয়ে ভয়ে, আমরা, সলজ্জ-ভাবে আজ বরণ-ডালি লইয়া আসিয়াছি; কিসে কি হয়, জানি না, কোন্ পথ দিয়া কোন্ বিপদ আগমন করে, তাহাও বুঝি না। বুঝি না বলিয়াই, তোমাকে একটু সতর্ক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি কি দেখিয়া রায়-কুলে মিলিত হইতে চলিয়াছ? জান কি যে, সেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অনেক বাস করে,—জান কি যে, সেখানে পরসেবার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পিত হয়,—জান কি যে,সেখানে অন্যের উপকার সাধনের পথ ধরিয়া, উপকৃত-জনের নিকট হইতে, অনেক বিপদ এবং কলঙ্ক-কর্দ্দম উপস্থিত হয়? সেখানে চক্ষের জল অনেক আছে, কিন্তু সম্পদের স্ফুট-উল্লাস নাই;—সেখানে হৃদয়-বেদনার মর্ম্মদাহ অনেক আছে, কিন্তু সুখ-শান্তির স্ফুলিঙ্গ নাই। সেখানকার নর-নারীরা অন্যের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া ম্রিয়মাণ। তবুও কেন তুমি অগ্রসর হইয়াছ? আজ আমরা তোমাকে বরণ করিবার দিনে সতর্ক করিয়া দিতেছি, মা, একটু ভাব, একটু চিন্তা কর। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ইচ্ছা হইলে ব্রত গ্রহণ কর।

যদি একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে আজ অভাগাদের মাতৃত্ব-ব্রত তুমি গ্রহণ কর, তোমাকে সাদরে বরণ করিতেছি। সাধু হরিদাসের হৃদয়ে অনেক প্রেম, অনেক পবিত্রতা, অনেক বিশ্বাস ছিল,

কিন্তু তিনি আজ স্বর্গে,—তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বর্গ হইতে বর্ষিত হইতেছে, দেখ। দেখ,—কত কত সাধু ভক্তের পূত আশীর্ব্বাদ আজ তোমার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। কুসুম আমাদের অতি যত্নের, অতি আদরের,—কাঙ্গালদের সাতরাজার মাণিকচাঁদ। সে অনেক কাঙ্গালের অতি প্রিয়,অতি আদরের; তাহাকে যাঁহারা ভালবাসে, তাঁহারা সকলেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন;—কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই আজ স্বর্গে। আজ তুমি স্বর্গের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বর্গাধিপের আধিপত্য স্বীকার কর। স্বীকার কর—আমরা কিছুই নই,—এ সংসার কিছুই নয়, কেবল তিনিই সর্ব্ব-মূলাধার, তিনিই সর্ব্ব-সারাৎসার। বিশ্বপতি আজ এই বরণ-মণ্ডপে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন;—তাঁহার এবং সকল সাধুভক্তের আশীর্ব্বাদ আজ তোমার মস্তকে বর্ষিত হউক।

মা,তোমার নিকট সবিনয়ে আমার একটী মিনতি জানাইতেছি—তুমি তোমার সঙ্গে আনিও কেবল ভক্তি, কেবল বিশ্বাস, কেবল শুভ্র পুণ্য এবং কেবল অনাবিল সেবা। আমরা বসন-ভূষণ,শোভা-সৌন্দর্য্য,কিছুই চাই না,—চাই কেবল ভক্তি, বিশ্বাস, পুণ্য এবং সেবা। মা, এক হাতে ভক্তি, এক হাতে সেবা, অন্তরে পুণ্য এবং সর্ব্বাঙ্গে ভক্তি-বিশ্বাসের পূত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া তুমি আসিও;—আমরা প্রাণের সিংহাসনে বসাইয়া, ভালবাসার ফুলে তোমাকে সাজাইব। সর্ব্বমঙ্গলা মা আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

## * * * সাদর আবাহন ও গ্রহণ।

(২৩শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩১৪।)

এস বাবা, এস মা,আজ আনন্দ-আশ্রমের কাঙ্গালগণ তোমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। তোমরা আমাদের বড় আদরের ধন, সাত রাজার মাণিক—তোমরা আজ নির্ভয়ে এই কুটীরে পদার্পণ কর। তোমাদের আগমনে আমরা সকল অশান্তি এবং সকল অপ্রেম ভুলিয়া যাই।

বড় সাধ করিয়া সাধু হরিদাস এই দরিদ্র-কুটীরকে প্রেম-মন্ত্রে পূত করিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন;—কত লোক কত স্থানে আছে, কিন্তু তিনি সকল পরিত্যাগ করিয়া, কি জানি কেন, কত আদরে, প্রাণ ভরিয়া আমাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। সংসারের লোকেরা বলে,রক্ত মাংসের সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ—আমি সে কথার প্রতিবাদের জন্য জীবন ধারণ করিতেছি,—আমার মা বলেন, তাঁহার সম্বন্ধই এ জগতে একমাত্র সম্বন্ধ,—যাহা স্বার্থে মলিন হয় না,যাহা বিপদে ছিন্ন হয় না, যাহা মৃত্যুতেও ভঙ্গ হয় না। আজ সাধু হরিদাসের "দাদা"সম্বোধন তোমরা স্মরণ কর। আমি শুনিতেছি, আকাশ কাঁপাইয়া, বাড়ী কাঁপাইয়া, অন্তর কাঁপাইয়া ঐ মধুর ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে। তোমরা আজ তাহা স্মরণ কর।

তাঁহার এই বাড়ী তোমাদেরও বাড়ী;—তিনি যে আনন্দ-আশ্রমে শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করিতেন, তোমরা সে বাড়ীর মমতা কখনও ভুলিও না। জানিও, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ইহকালে পরকালে, আমরা একাত্মক। জানিও, অনন্তকালেও

এ সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে না, কেননা অনন্ত দেবতা এই সম্বন্ধের মূলে। যেখানে থাক, যে দেশে যাও, এই আনন্দ-আশ্রম যে তোমাদের,একথা কখনও ভুলিও না। ভুলিও না, এখানে সাধু-অসাধু সেবা,ক্ষুদিতের জ্বালা-নিবারণ,এবং বিশ্বেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। মায়ের অযাচিত কৃপায় এখানে কেবল ভেদাভেদ-রহিত আত্মীয়তা এবং সদ্ভাব বাস করে। যেখানে যাও, এবং যেখানে থাক,—সর্ব্বদা আনন্দ-আশ্রমের কথা স্মরণ রাখিও।

বাবা * *, তুমি কখনও আনন্দ-আশ্রমকে তুচ্ছ করিতে পার না ;—কেননা,তোমার জীবনের অনেক দুঃখ বিষাদময় দিন এখানে অতীত হইয়াছে ;—আনন্দ-আশ্রম তোমাকে পেট ভরিয়া অন্ন দিয়া তৃপ্ত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সাধুভক্তি, পবিত্রতা এবং ভক্তির অন্নে বরাবর তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। আনন্দ-আশ্রমে যত সাধুভক্ত ছিলেন, সকলেই তোমাকে দয়া এবং স্নেহ করিতেন ; আজ তাঁহাদের কথা বিশেষরূপে চিন্তা কর। জানিও,তোমার জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট অংশ এখানে অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে থাকিয়া শরীরে এবং মনে যাহা সঞ্চয় করিয়াছ, চিরকাল উহা দ্বারা আনন্দ-আশ্রমকে রক্ষা করিও।

দুঃখ, দারিদ্র্য এবং বিপদে জর্জ্জরিত—আমি ত চলিয়াছি ;—আর কতদিন তোমাদের মধ্যে দেহধারীরূপে থাকিতে পারিব, জানি না। কিন্তু ইচ্ছা এই—চিরকাল তোমাদের মধ্যে আত্মিকরূপে জীবিত থাকি। অথবা ইচ্ছা এই—পাপ-ময়লা-বিবর্জ্জিত কেবল গুণরূপে জীবিত থাকি। আমার সকল দোষ ত্রুটী, অপরাধ পাপ ভুলিয়া, আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল দেখিয়া থাক, তবে তাহাই স্মরণে রাখিও; শুধু স্মরণ নয়, সম্বল করিও। যদি সম্বল করিতে পার, আমি উহার ভিতর দিয়া তোমাদের মধ্য চিরকাল অবতরণ করিব। শুধু অবতরণ নয়—চিরকাল তোমাদের মধ্যে, বংশ পরম্পরায়, জীবিত থাকিব। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আবার বলি, আমি ত জীবন-সংগ্রাম শেষ করিয়া চলিয়াছি—তোমরা দুটী ভাই—প্রভাত এবং তুমি, একাত্মক হইয়া, চিরকাল, অটল সেনানীরূপে, আনন্দ-আশ্রমের বিশেষত্ব রক্ষা করিও। দেখিও, এখানে যেন চিরকাল ক্ষুধিত জন অন্ন, ভক্তি-পিপাসু ভক্তি এবং পবিত্রতা পায়। দেখিও, বিলাসিতা-দস্যু প্রবেশ করিয়া আনন্দ-আশ্রমের বিশেষত্বকে যেন কখনও বিনাশ না করে। মা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার আদরিণী মা * * *,—এস মা, আজ তোমাকে কাঙ্গালিনীর বেশে ভূষিত করিয়া দেই। * * * আমার ভাবে ভোলা, আমার গুণে মাতোয়ারা ছেলে,—বিলাসিতা তাহাতে নাই,অপবিত্রতা তাহাতে মোটেই নাই, তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরোপকারের বিভূতি মাখা, তুমি তাহাকে যখন গ্রহণ করিয়াছ,তখন আমাদের ভাবে, আমাদের গুণে তোমাকে দীক্ষিতা হইতেই হইবে। তুমি পিতৃকুল হইতে সাধুভক্তি লইয়া আসিয়াছ, আজ তোমাকে দরিদ্র-সেবার কঙ্কণ পরাইয়া দেই। দেখ মা, এইবাড়ীর সর্ব্বঘটে, সর্ব্বস্থলে মা সর্ব্বমঙ্গলা বিরাজিতা—তাঁহার চিন্ময় বিভূতিতে সকলে সংরক্ষিত ;—দেখ এবং তাঁহাতে মজিয়া যাও। মজিয়া মজিয়া, তাঁহার হাতের পুত্তলিকা হইয়া, তাঁহার জীবের জন্য, তাঁহার সংসারের জন্য খাটিয়া খাটিয়া চলিয়া

যাও। আর ব্রত নাই—আর কথা নাই—আর উপদেশ নাই; সার কথা এই,—মানব-ঘৃণাকে কখনও অন্তরে পোষণ করিবে না, অবিভেদে, অম্লান চিত্তে, মায়ের ন্যায়, পাপী পুণ্যাত্মা, সাধু অসাধুর জন্য খাটিতে থাকিবে। মা পুণ্যময়ী সর্ব্বমঙ্গলা আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন; তোমার হস্তে কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীদিগের ভার দিয়া তোমাকে কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীদিগের সহিত একাত্মক করিয়া দিন। তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক।

# ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত লোকদিগের উপর প্রভাব হারাইতেছেন কেন?

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনে, গত ২৭শে ডিসেম্বরে, "ব্রাহ্মসমাজ কি শিক্ষিত লোকদিগের উপর প্রভাব হারাইয়াছেন?" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, গত ১৬ই মাঘের (১৩১৩) তত্ত্বকৌমুদীতে তাহার সারাংশ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম। ইহা পড়িয়া মনে হইল, ব্রাহ্মসমাজ যেন একটা গলিত মানব-শব, কন্‌ফারেন্সের টেবিলে ফেলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই শবচ্ছেদ করিতে করিতে যেন লেক্‌চার দিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ গলিত শব না হউক, জীবন্মৃত যে হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বোধ হইতেছে, নতুবা আজ পর্য্যন্ত উহার একটা ন্যায় ও সত্য-সঙ্গত প্রতিবাদ বাহির করিতে কেহই সাহসী হইলেন না কেন? * ব্রাহ্মসমাজ-গাত্র যে অক্ষত ও অব্রণ, এমন কথা আমরা কেহই বলি না; আমাদের জীবন যে আদর্শানুরূপ হইতেছে না, সে বিষয়ে আত্মসমর্থনের কিছুই নাই; বরং ক্ষোভ করিবার যথেষ্ঠ কারণ আছে। আমাদের হীনতাই যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের পথে প্রধানতম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতেছি ও জানিতেছি; কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ আপত্তিজনক ভাষায় ও ভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতে কবুল-ডিক্রী দিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এদেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যে কিরূপ ধর্ম্মপিপাসু ও সত্যান্বেষী, তাহা আমরাও যে কিছু কিছু না জানি, এমন নয়। দান বলিলেই দাতা ও গৃহীতা চাই, প্রেম বলিলেই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ চাই; তেমনি, প্রচারক বলিলেই প্রচারক ও সহৃদয় সত্যগ্রাহী চাই। বড়ই ক্ষোভ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত লোক, না জানি কোন্ অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া, এই এক-তরফা প্রবন্ধ এই ধর্ম্ম-মহাসভায় উপস্থিত করিলেন? ইহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম

* বিগত ২০শে মাঘ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, আমরা আমাদের এই প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীতে বাহির হইয়ার জন্য তত্ত্বকৌমুদীর শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ জ্যৈষ্ঠ অতীত হইতে চলিল, তথাপি তাহা সম্পাদক মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন, বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না।—লেখক।

প্রচারের একটা সাজ্ঘাতিক মজির হইয়া রহিল কিনা, শাস্ত্রী মহাশয়ই তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ নানাবিধ পাপের ও দুর্নীতির আকর হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্যই প্রধানতঃ বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজ ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় ব্রাহ্ম-সমাজের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন। জানি না, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ উদ্দেশে, কি অভিপ্রায়ে ব্রাহ্ম বেচারাদিগকে নরকের নিম্নে নামাইয়াছেন; কিন্তু সদাশয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে,শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মদিগের গাত্রে যেরূপ কলঙ্ককালিমা লেপিত দেখিতেছেন, বাস্তবিক ব্রাহ্ম-সমাজ তাদৃশ অপরাধে অপরাধী কি না? বলিতে গেলে, ব্রাহ্ম-সমাজের এক্ষণে নিতান্ত শৈশবাবস্থা; সুতরাং ইহাতে যে নানাবিধ ত্রুটি, নানাবিধ দুর্ব্বলতা ও বিবিধ প্রকারের অভাব দৃষ্ট হইবে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না; কিন্তু সে গুলি বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত না হইয়া বন্ধুভাবে সংযত ভাষাতে প্রদর্শন করাই প্রচারকের পক্ষে উচিত ছিল।

প্রবন্ধের প্রথমেই শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন;—

"প্রতি বৎসর আমাকে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আমাদের শিক্ষিত স্বদেশবাসীদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে হয়; তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, সেই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে দুই তিন সহস্র লোক উপস্থিত হইত দেখিয়াছি,এখন সেখানে চারি পাঁচ শতের বেশী লোক দেখিতে পাই না।"

আমরা বলি, ইহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, (অন্য কথা যাউক) আমাদিগের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে কয়েক জন প্রচারক ছিলেন ও এক্ষণে যাঁহারা সশরীরে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধরিতে পারেন নাই ও পারিতেছেন না। বলিতে কি,তাঁহাদের মধ্য অনেকেরই মন ও মেজাজের স্থিরতা নাই, মত ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই। কাল যিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার পোষকতা এবং অভ্রান্ত গুরুবাদের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থিওসফিষ্ট, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক,বামাচারী, এমন কি কর্ত্তাভজা হইতেও দেখা যাইতেছে। কাল যাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারতা ও সার্ব্বভৌমিকতা প্রচারে বদ্ধপরিকর দেখা গেল, আজ তাঁহাকে দেশের লোকের নিকট বিশেষতঃ 'পুনরুত্থানকারী' হিন্দু মহাশয়গণের 'বাহবা পাইবার প্রত্যাশায়'আর্য্যামীর' অতিরিক্ত গোঁড়ামী করিতে দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান প্রচারক মহাশয়গণের মধ্যে কেহ কেহ সত্যস্বরূপ মহান্ পরমেশ্বরের মহিমার কথা প্রচার করিবার তত আবশ্যকতা বিবেচনা করেন না, যত আর্য্য ঋষিগণের অযথা গুণকীর্ত্তন ও প্রচলিত হিঁদুয়ানীর অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিঁদুয়ানীর গণ্ডীর ভিতরে পুরিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সুতরাং যাঁহাদের এইরূপ মন মেজাজের স্থিরতা নাই, মতের দৃঢ়তা নাই, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কিম্বা বিন্দুমাত্র মমতা নাই, কেবল লোকের নিকট 'বাহবা' পাওয়াই যাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য—যাঁহারা সর্ব্ববিধ জ্ঞানচর্চ্চা হইতে বিমুখ, ভক্তি বিশ্বাস ও

ধর্ম্মের সাধনে বিরত, তাঁহাদের কথায় লোকে কি আর সহজে কাণ দিতে চায় ? এইরূপ অব্যবস্থচিত্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচারে কি কাহারও "আত্মার মুখ ফিরিয়া থাকে" ? গভীর পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এতাদৃশ প্রভুত্ব-প্রিয়তা ও অযথা আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাদের প্রভুত্বের পথে কিঞ্চিন্মাত্র বাধা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা অমনি আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া, বৎসরের মধ্যে তের বার প্রচারকের পদ ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হন। ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি ইহাদের কিরূপ প্রাণের টান! যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন না, কেবল প্রভুত্বপ্রিয়তা ও লোকের নিকট বাহবা পাওয়াই যাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য, তাঁহাদের দ্বারা কি কখনও লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ?

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, শুধু যে ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটিতেই বর্ত্তমান-সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছেন না, তাহা নহে। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ-প্রমুখ মহাত্মাগণ কি কোনও প্রচারকের প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, না ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ ও মতের বিশুদ্ধতা দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ? না, তাহা নহে। তাঁহাদের প্রাণ ভগবৎ-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। এক্ষাণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে অতি মাত্রায় 'শেয়ানা' হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মের কোনই ধার ধারেন না। তাঁহাদের মনের ভাব ও বাহিরের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ। পরিহাস-রসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "Reformed Hindus" শীর্ষক গীতিকাতে তাঁহাদের নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। এই শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছেন,—"আমরা বেশ মনের সাধে মজা উড়াইয়া বেড়াইতেছি, যাহা আমাদের খুসী, তাহাই করিতেছি। আমরা কাহারও কথা গ্রাহ্য করি না, কেহ আমাদিগকে কোনও কথা বলিতে সাহসও করে না; অথচ হিন্দুসমাজে আমাদের যশমানের ত্রুটি নাই, বরং অধিক। তবে, আমরা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইব কেন ? আমাদের এই স্বৈরাচার-জনিত সুখ ও আমোদের বিনিময়ে এমন কি লাভ করিব, যাহাতে আমাদের ইহার ক্ষতিপূরণ হইবে ? যদি বলেন,—ব্রহ্মোপাসনা ? কিন্তু সে কেমন আমাদের চক্ষে 'ধোঁয়া' ধোঁয়া' ঠেকে !"

তবেই দেখুন, এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, প্রচারকের প্রচারে, কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গধামে পরিণত হইতে পারিলেও, কখনই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারিবেন না। তবে ভগবানের বিধানে সবই সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই গাহিয়াছেন,—

"করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে ?"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রথমকার উচ্চশিক্ষিতগণ বোধ হয় এতাদৃশ 'শেয়ানা' ছিলেন না, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের মনের ভাব ও বাহিরের ব্যবহার একরূপ ছিল বলিয়াই শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন-প্রভৃথ তদানীন্তন কালের

বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ছাত্রগণ প্রাণের আবেগে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তবে এখনও কি উচ্চশিক্ষিতগণ একেবারেই ব্রাহ্মসমাজে আসিতেছেন না? হাঁ আসিতেছেন বই কি। আমরা এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত সাধুচরিত্র উৎসাহী যুবার নাম করিতে পারি, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের ব্রাহ্মসমাজে প্রিয়তম ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য উচ্চশিক্ষিতগণকে চাহিনা, সাধুচরিত্র, জ্ঞানী, প্রেমিক ও ভক্তগণের সমাগম দেখিয়া কৃতার্থ হইতে চাই।

ব্রাহ্মগণ যদি পৌত্তলিকতার প্রতিবাদে একটু শিথিল-প্রযত্ন হন, জাত্যভিমানের বেশ পোষকতা করেন, বিকৃত অদ্বৈত-বাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদ ব্রাহ্মসমাজে খুব সমর্থিত হয় এবং জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে স্বীকার করিয়া লন, ঐ সঙ্গে একজন গুরু বা মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজে যদি মস্তকোত্তলন করিয়া উঠেন, সর্ব্বোপরি মেয়েদিগের হস্ত হইতে পুস্তকাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে যদি ঠেঁটি পরাইয়া অবরোধে পূরিয়া রাখা হয়, এবং অতি শিশুকালে যেমন করিয়াই হউক "গৌরীদানের ফল-কামনায়" তাহাদিগকে পাত্রস্থ করিতে ব্রাহ্মগণ যদি কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে সকলে দেখিতে পাইবেন, দলে দলে নানা শ্রেণীর শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস প্রচার করিতেন, তখন বড় একটা কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁষিত না, কিন্তু যাই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া তিলক মালা ধরিলেন, গৈরিক বহির্ব্বাস ও আল্‌খেল্লা পরিলেন, জটাজুটে উত্তমাঙ্গ সুশোভিত করিলেন, রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রেমে প্রমত্ত হইলেন, অমনি শিক্ষিত অশিক্ষিত দলে দলে আসিয়া, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও প্রচারক মহাশয় অবধি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া, প্রণামী দিয়া, তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া, ভক্তিগদ্‌গদ্‌ চিত্তে গোস্বামী প্রভুজীউর শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক পরলোকের পথ প্রমুক্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকে অবতার অবধি বানাইয়া তবে ছাড়িলেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, রামানন্দ স্বামিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, কি তদ্রূপ যশোমান এবং সম্পত্তি লাভ করেন নাই? এক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও যদি সেইরূপ লোকপ্রিয় হইবার বাসনা বলবতী হইয়া থাকে, তবেত তাঁহারও পক্ষে সে পথ পরিস্কৃত ও প্রশস্ত রহিয়াছে।

তাহার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, প্রবন্ধের এক স্থলে (১৬ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদীর ২৩৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষাংশে) বলিয়া ফেলিয়াছেন,—

"একদিকে দরিদ্রতার কশাঘাতে নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ অনেক হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধারণের চক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে হীন করিয়াছেন; অপরদিকে সম্পত্তিশালী যে কয়েকজন আছেন, তাঁহারা অনেক পাশ্চাত্য পাপের হস্তে পতিত হইয়াছেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নিরীহ নরনারীর প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন, অপর দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধীগণের নিকট

খুব 'বাহবা' পাইয়াছেন। এক্ষণে আমরা সানুনয় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে কাহাদিগকে তিনি নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়াছেন ? বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের জাত্যভিমানে স্ফীতবক্ষঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ মহাশয়গণ, হাড়ী ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি নিরীহ নিরপরাধদিগকে ইতর বা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া, তাহাদিগকে অভিশপ্ত জ্ঞানে তাহাদিগের ছায়া অবধি স্পর্শ করিলে আপনাদিগকে নিতান্ত অশুচি মনে করেন, অথচ গীতা প্রভৃতি হইতে "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" ইত্যাকার উচ্চ উচ্চ কথা তুলিয়া মুখে কত বড়াই করিতে থাকেন, তিনিও কি, সেইরূপে, ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন ? অর্থাৎ বামুণ-ব্রাহ্ম (বিশেষতঃ বৈদিক শ্রেণীর) উচ্চশ্রেণীর, বৈদ্যকায়স্থ প্রভৃতি মধ্য শ্রেণীর, তদিতর জাতীয় ব্রাহ্মগণ কি নিম্নশ্রেণীর ? কিন্তু তাঁহার "জাতিভেদের" প্রকাণ্ড বক্তৃতাটা যে এখনও আমা[illegible]ণে বাজিতেছে! হায় ! হায় ! ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ন্যায় এবিষয়েও কি এত শীঘ্র তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল ! অথবা তবে কি ব্রাহ্মসমাজের গরীব বেচারাদিগকেই তিনি নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়াছেন ? আচ্ছা, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবস্থা মতে যদি দরিদ্রগণই "নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্ম" হয়, তাহা হইলে ঠক বাছিতে যে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে ; কেন না, ব্রাহ্মসমাজের শতকরা ৯৯জন যে দরিদ্র ! অধিক কি, স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ও যে একজন দরিদ্র ! তাহা তিনি নিজ মুখে অনেকবার স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু কই, এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে "দরিদ্রতার কশাঘাতে হীনপন্থা" অবলম্বন করিতে ত দেখা যায় নাই। যদিও শ্রদ্ধাস্পদ ৺ব আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের মত দরিদ্র ব্রাহ্মগণের খোঁজ খবর লইতে নানা কারণে অবসর পান না, কিন্তু তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে, বিবিধ উৎপীড়নে, নানা নির্য্যাতনে, লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনায়, তাহার উপর আত্মীয়গণের সহানুভূতি-বিহীনতায় সদা সর্ব্বদা মুহ্যমান্ হইতেছেন, তথাপি এমন কত দরিদ্রতম নরনারী, ব্রাহ্মসমাজে অচল ও অটলভাবে থাকিয়া, একমাত্র ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া, জীবন্ত ও জ্বলন্ত চরিত্র ও জাগ্রত ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সতত সমর্থ হইতেছেন। আমরা এবম্বিধ কত দরিদ্রতম ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার নামের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর পবিত্র করিতে পারি, যাঁহারা ভক্তি অশ্রুকণ্ঠে গাহিয়া থাকেন,—

"দুঃখে প'ড়ে জেনেছি ভাই,
দয়াল নামের তুলনা নাই।"

বাস্তবিক, এই শ্রেণীর ভগবদ্বিশ্বাসী দুঃখিগণই ব্রাহ্মসমাজের শিরোভূষণস্বরূপ। হইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয় এমন কতিপয় দরিদ্রকে ব্রাহ্মসমাজে দেখিয়া থাকিবেন, যাঁহারা হয়ত দরিদ্রতার কশাঘাতে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সর্ব্বোপরি জগতে তাঁহাদিগের "আহা" ! বলিবার লোক না দেখিয়া, 'উদর-তাড়নে' দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যাবস্থায় "হীন-পন্থাবলম্বী" হইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত দরিদ্রকেই "[illegible] না কেন ? কিন্তু ইংরাজ ঐতিফেলা [illegible]কগণ রাজা রামমোহন রায়ের যেরূপ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের শ[illegible] লোক এখনও সেরূপ সমর্থ হয়েন নাই—যখন সে দিন আসিবে, তখন রাজা রামমোহন রায়ের অমূল্য গ্রন্থাবলী অর্দ্ধ মূল্যে

ব্রাহ্মগণের কথা। তার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, সম্পত্তিশালী উচ্চ-শিক্ষিত যে কয়েকজন ব্রাহ্ম-সমাজে আছেন, তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই; তাঁহাদিগকেও "পাশ্চাত্য পাপের হস্তে পতিত হইতে" দেখিয়াছেন। তাঁহারা এবম্বিধ কোনও পাপের হস্তে পড়িয়াছেন কি না, তাহা যেমন শাস্ত্রী মহাশয় জানিতে পারিবেন, অন্যের সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, তিনি এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণের সর্ব্বদাই সংস্রবে আসিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার এইরূপ মন্তব্য, সর্ব্বসাধারণে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মহাশয়গণ, বেদবাক্যের মত মানিয়া লইবেন। কিন্তু ডাক্তার জে, সি, বসু, ডাক্তার পি, সি, রায়, লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ডাক্তার ডি, ডি, বসু, ডাক্তার জে, এন্, মিত্র, শ্রীযুক্ত পি, এন্, দত্ত, ডি, এন্, মুখুর্জ্যে, ডাক্তার পি, সি, চাটার্জ্জি প্রমুখ পবিত্রচরিত্র মনস্বিগণ যে কোনও প্রকার পাপের হস্তে পড়িয়াছেন, এ কথা কেহই বলিবেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ের এবম্বিধ তীব্র মন্তব্যে আমরা সায় দিতে কোন মতেই সম্মত নহি।

—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক নিম্ন-শ্রেণীর মেম্বর

১০০

# ঐতিহাসিক বিচিত্রতা।

যে ইংরাজ বুদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্য-বলে দেশ দেশান্তরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে ইংরাজের কতকগুলি গুণ বাঙ্গালীর নাই বলিয়া বাঙ্গালী "অধম-জাতি," সেই ইংরাজের চরিত্রগতহীনতা ও শঠতা দেখিলে ঘৃণায় মুখ লুকাইতে ইচ্ছা করে। আর আমরা যখন ইতিহাসের পত্রে পত্রে ইংরাজের উৎকট স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা ও ধর্ম্ম-হীনতার নিদর্শন দেখিতে পাই, তখন স্বতঃই হৃদয়মধ্যে এই প্রশ্ন উঠে—যে জাতির রাজত্ব শুধু প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জাতি কতদিন ভারতবর্ষে ন্যায় ও সত্যের তুলাদণ্ড ধরিয়া রাখিবে?

পণ্ডিত-সমাজের বরণীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নিখিলনাথ রায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের গ্রন্থে ইংরাজের চরিত্র-চিত্রের যে আভাস দিয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ স্বহস্তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি শুধু তাহাই পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, শুধু প্রবঞ্চনার দ্বারা কোন জাতি আর এত অধিক শক্তির অধিকারী হয় নাই। রোম বা গ্রীস-রাজ্য যেদিন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিস্মৃতি-অন্ধকারে বাস করিতেছিল, সে দিনও রোমক বা গ্রীকগণ ভারতবাসীর মত প্রবঞ্চিত হয়েন নাই। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী ও সিরাজ-উদ্দৌলা নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইংরাজ-কথিত অনেক ঘটনাই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের কাব্য-কাননের একটী ফুল (শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ) সহসা সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। "পলাশীর যুদ্ধ মধু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারি না, তবে উহার সৌরভ যে গিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য দুঃখ হয়, কিন্তু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে হইলে যদি আমাদের সমগ্র কাব্যভাণ্ডারকে জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তথাপি আমরা সত্য

গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলে নূতন জাতীয় দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করিব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একটী কথা বলা এ প্রসঙ্গে বলা অসঙ্গত হইবে না। মুসলমান-সমাজে আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইঁহারা যে ইতিহাসের সংবাদ না রাখেন, এমনও নহে। কিন্তু যখন দেখি, আমাদের শিক্ষিত ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট মুসলমান-ভ্রাতা ইংরাজের কুহকজালে মুগ্ধ, তখন বড় ক্ষোভ হয়। ইংরাজ ইতিহাসের পত্রে পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পদার্পণের প্রথম দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বার্থসাধনের অভিসন্ধি ব্যতীত মুসলমানের কোন কল্যাণ-সাধন করেন নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢাকার প্রখ্যাতনামা নবাব শ্রীযুক্ত সলিমুল্লা সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বশেষ সম্রাট বাহাদুর সাহের কবর-সংস্কারার্থ গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবেন কিনা? হায়,হায়, মুসলমানের সে আত্মাভিমান, সে তীব্র আত্মসম্মান-বোধ কি অতীতের গর্ভে চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গিয়াছে? যে বাহাদুর সাহ ইংরাজের নিকট শতবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—যিনি জীবনের শেষ দশায় ইংরাজের হস্তে ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন,সেই বাহাদুর সাহের কবর-সংস্কারের নিমিত্ত ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কি মৃত-সম্রাটের কবরের উপর গাঢ়তম কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা হয় না? বাহাদুর সাহের সমাধি-সংস্কারে ইংরাজের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? উহা আমাদের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মিলিত চেষ্টায় যেরূপ গৌরবে, যেরূপ কল্যাণে সংসাধিত হইতে পারে, অপর কাহারও দ্বারা সেরূপ সম্ভব নহে। যে যে কারণে বাহাদুর সাহের সমাধি সংস্কারের নিমিত্ত ইংরাজ হইতে একটী কপর্দ্দকও গ্রহণ করা অন্যায় মনে হয়, সে সকলি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক John William Kaye সাহেবের সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, লর্ড ডালহাউসি বৃদ্ধ বাহাদুর সাহকে সম্রাট্ নাম হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত ও তাঁহাকে (দিল্লি-প্রাসাদ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণস্থিত) কুতব-প্রাসাদে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে নিষ্ঠুরতার একশেষ হইয়াছিল।

ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে একদিকে যেমন তাঁহাদের প্রবঞ্চনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে আবার তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। অনেক সময়ে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকগণ রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব স্বীকার করিতে একটু কৃপণতা করেন। ইহার গোপন-তত্ত্বটুকু এই যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; সুতরাং উক্ত মহাত্মাকে বেশী বড় বলিলে হয়ত লোকে মনে করিবে, গ্রন্থকারটা একেবারে "ব্রহ্মজ্ঞানী"—অথবা হয়ত এরূপ ভয়ও করেন যে, রাজার প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব করিলে লোকে বলিবে, যদি সত্যই গুণগ্রাহী হও, তবে সেই মহাত্মার পথাবলম্বী হও না কেন? কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ রাজা রামমোহন রায়ের যেরূপ মহত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের লোক এখনও সেরূপ সমর্থ হয়েন নাই—যখন সে দিন আসিবে, তখন রাজা রামমোহন রায়ের অমূল্য গ্রন্থাবলী অর্দ্ধ মূল্যে

বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন জাতীয়-দুর্গতির তাপযন্ত্র-রূপে সংবাদ-পত্রের কলেবর পুষ্ট করিবে না।

আজ ইংরাজ-লিখিত ভারতীয় ইতিহাসের দুইটী বিচিত্রতার উদাহরণ দিলাম, ভবিষ্যতে আরও দিবার ইচ্ছা রহিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Kaye যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একটু কৌতুহলোদ্দীপক, সুতরাং উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি;

"Akbar Shah had employed as his representative the celebrated Brahmin, Ram Mohun Roy, and ever still regarding himself as the fountain of honour had conferred on his envoy the title of Rajah. English society recognized it * * * but the authorities refused their official recognition to the Rajahship though they paid becoming respect to the character of the man."

আমাদের দেশে এখনও এমন লোক আছেন, যাঁহারা উক্ত মহাত্মার Character কে খর্ব্ব করিতে পারিলেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। গুণগ্রাহিতা বিষয়ে ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে পার্থক্য এইখানে। ইহা ঐতিহাসিক বিচিত্রতা নহে,—তবে ইহাকে জাতীয় চরিত্র-বৈষম্য বলা অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সহরে নেতা ও গাঁয়ে চাষা।

"Nation dwells in a cottage."

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে দেশ-সংস্কারের সঙ্গে পল্লী-সংস্কার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বরিশালের অশ্বিনী বাবু বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে তীব্র-কঠোর উপহাস-ভোগ করিয়াছিলেন। সেই একদিন গিয়াছে—যে দিন, কর্ত্তৃপক্ষ, সমস্ত যত্ন চেষ্টা সহরের উন্নতিতে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া, বখতিয়ার খিলিজীর নবদ্বীপ-বিজয়ের ন্যায়, বিনা ঘর্ম্মপাতে, সমগ্র দেশটাকে জাগাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। এখনো একদল অভিভাবক আছেন, যাঁহারা সহরের বাহিরে কোনরূপ শিক্ষা, সংস্কার প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেন না। কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় আশৈশব সহরাবাসে অভ্যস্ত থাকায়, একমাত্র সহরের কোলাহল তাঁহাদের কাণে, প্রতি মুহূর্ত্তে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিপুল-বিজয়-নির্ঘোষ প্রতিধ্বনি করিতেছে। সুখের বিষয়, আত্ম-বিড়ম্বনার এহেন অন্ধবিশ্বাসে মুগ্ধ না রহিয়া, বঙ্গদেশ এত দিনে প্রকৃত পন্থা চিনিতে পারিয়াছে। দেশ বুঝিয়াছে—বুঝি অই ভৈরব-তাণ্ডব-নর্ত্তন-মঞ্জীর-ধ্বনি-মুখরিত কোটিকণ্ঠ-কোলাহল অপেক্ষা পাদপচ্ছায়োপবিষ্ট লাঙ্গল-বাহী কৃষক-শিশুর একটানা স্বর-লহরী প্রকৃত শান্তির আরামদায়িনী আহ্বান-বাণী! তাই আজ দেখিবে, পাঠক, বরিশালের গ্রামে, গ্রামে, পল্লীতে, পল্লীতে, গৃহে গৃহে, এমন কি, অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত, দেশপ্রাণ প্রচারকের নিয়োগ ব্যবস্থা।

'ইংলিশ্‌ম্যান' কাগজের সম্পাদক যেমন ভিতরের তথ্য অবগত না হইয়াই, কুমিল্লার অরাজকতা সম্বন্ধে যথ-তথা মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তেমনি, সহুরে নেতার মধ্যে এমন অনেক অনভিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা পল্লীর অবস্থা না দেখিয়া, না বুঝিয়াই,

তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু একটা তাচ্ছিল্যকর ধারণা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে যামিনী বাবু রাষ্টতন্ত্রে পল্লীর অবস্থা বিষয়ে কয়েকটী চিন্তাপূর্ণ গূঢ় সত্য নব্যভারতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল বাক্যেরই আংশিক প্রতিধ্বনি স্বরূপ, সহুরে নেতার সম্বন্ধে এ অক্ষম লেখকও দুচারিটী অকিঞ্চিৎকর বাক্যের অবতারণা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না। আশা আছে, ইহাতে দেশ-হিতৈষীর বিরক্তি বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিবে না।

দেশের অবস্থা কি, এবং দেশ-সংস্কারে কি কি আবশ্যক রহিয়াছে—এ কথা ভাবিতে গেলে প্রথমতঃ সকলের দৃষ্টি স্বতঃই জন্মভূমির শস্য-সঞ্চিত গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্‌স নির্দ্ধারণেই হউক,কিম্বা হেয়ার্ লাটের সদস্যগিরির উমেদারীতেই হোক্, সকল অর্থনীতি, সম্মান-নীতি,শৌর্য্য,বীর্য্য খ্যাতির তলেই—ঐ জননী-কলত্র-সন্তান-বেষ্টিত তোমার কুঁড়েখানি। কথায় বলে, 'নিজে বাঁচ্‌লে বাপের নাম।' দু মুঠা অন্নের জন্য যে দেশে দৈনিক লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিতেছে, "অন্ন-সংরক্ষণী" মন্ত্র ব্যতীত সে দেশের ধ্যেয় আর কি শক্তিমন্ত্র থাকিতে পারে? বলা বাহুল্য, বয়কটের মৌলিকতাও ঐ স্থানে—যে স্থানে, দুটী পয়সার সংস্থান রাখিতে, বৃদ্ধজনক-জননী-যোগ্য তনয়ের পথপানে, অবলা হেমাঙ্গিনী প্রিয়তমের উদ্দেশে ও অপোগণ্ড শিশু সন্তান পিতৃলক্ষে চাহিয়া আছেন! কে না এ কথা স্বীকার করিবে যে, এই যে তোমার মুখে দুবেলা অন্ন পড়িতেছে, তাহা ঐ পল্লীর সঞ্জাত ধান্যরাশির উপর পূর্ণ নির্ভর করে। কে না বলিবে যে, স্বর্ণপ্রসূ ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আজ যে ক্ষুধার জ্বালায় হাহাকার করিতেছে, তাহা শুধু হলধারী দীন কৃষকের ক্ষেতভরা সোণার ফসলের অভাবে? ভাবুন দেখি সকলে একবার, এহেন সমস্ত বিষয়ের ভিত্তি কি ঐ বনজঙ্গলসমাকীর্ণ আপনার পল্লীগ্রাম খানি নহে? হায়, যাহারা শত শত ধনকুবেরের অন্নগ্রাস, তাহারাই নাকি আজ ভারতে—(ভারতে কেন বলিব? শুধু এই বঙ্গদেশে) কুটীরবাসী "চাষা!" দেশের কাজে তাহাদের স্থান নাই,দেশের মাঝে তাহাদের নাম নাই; বঙ্গের নেতা তাহাকে চিনিতে পারেন না, এবং চিনিতেও চাহেন না।

ভাল কথা মনে পড়িয়া গেল। গেল সনের চিরস্মরণীয় কন্‌ফারেন্সে, বিলাঞ্চলের তিন চারি খানি গ্রামের নমঃশূদ্র জাতির একমাত্র মণ্ডল বা প্রতিনিধি হইয়া, ভগবান্ হালদার নামক জনৈক "চাষা," বরিশালে গমন করে। এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, লোকটীর স্কন্ধে উত্তরীয় স্থলাভি-ষিক্ত একখানা নামাবলী এবং সর্ব্বাঙ্গে অশ্বিনী বাবুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধো-চিত "অশ্বিনী দাস" "অশ্বিনী ভক্ত" ইত্যাদি বাক্যাবলীর ছাপ ছিল। ভদ্র প্রতিনিধির মত "জামাই ভোগে" আত্মতৃপ্তি লাভের আশা করা—"চাষা"র পক্ষে সে তো 'প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্ধাহরিব বামনঃ' অর্থাৎ সরল কথায় বলিতে একটা অতি অসম্ভব অতীন্দ্রিয় পরীরাজ্যের কল্পিত সুখভোগের প্রয়াসমাত্র। যাহা হউক্, আহার-বিহার-শয়ন কোন রূপে হোটেলে সারিয়া, প্রতি-নিধির টিকেট সংগ্রহে, ততোধিক সভামণ্ডপে আসনলাভে, তাহার দীন অদৃষ্ট যে কতদূর নির্য্যাতনের কষাঘাত ভোগ করিয়াছিল,

তাহা ভদ্র-সমাজে উল্লেখ-যোগ্য নহে। মোট কথা, কতিপয় মহাত্মার প্রসাদাৎ বেচারী সে যাত্রা অবশেষে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাতেই কিন্তু ভাগ্যবানের তুল্য কত আনন্দ এবং অনুগৃহীতের ন্যায় কত কৃতজ্ঞতা তাহার! বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে সে একজন স্বদেশীর গোঁড়া পাণ্ডা। তাহাকে সম্মুখীন করিয়া আমরা নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে অনেক-স্থলে স্বদেশী-প্রচার কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছি।

এইতো গেল "চাষা"র কথা। ভদ্রলোক একবার মাত্র 'ভাইটী' বলিলে যে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া দেশের জন্য আত্মশক্তি বিলাইতে প্রস্তুত হয়, তাহার প্রতি আমাদের এত ঔদাসীন্য কেন, তাহা কে বলিবে?

অনেকেই বলেন—"আঃ ছাই, রেখে দাও তোমার বিশ্বপ্রেম! গাঁয়ে চাষা তো—নিরেট মূর্খ। তারা কিইবা বুঝবে, আর কিইবা করবে। ভদ্র-সমাজ জাগাও, মূর্খ-সমাজ তালে নেচে উঠবে।" কথাটা অবস্থা বিশেষে আংশিক সত্য হইলেও, ইহার পৌনে ষোল আনা আমাদের অনভিজ্ঞতার ফল। এ প্রসঙ্গে স্বদেশীয়তা-অবলম্বনে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, প্রবন্ধের কলেবর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণ করিতে হইল।

বরিশালের সুযোগ্য নেতা বাবু অশ্বিনী-কুমার দত্ত প্রকৃতই নিঃস্বার্থ দেশ-হিতৈষী। কেবলমাত্র সহরের উপর আপনার শক্তি-সামর্থ্যের কেন্দ্রবিন্দু রক্ষা না করিয়া তিনি বহুদিন হইতেই পল্লীসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে অনেক সময়েই তাঁহাকে "গাঁয়ে চাষা"র সঙ্গে মিলিতে মিশিতে এবং দেশের কথার আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। এই সকল ভূঁয়ো চাষার সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ত সৌহৃদ্যের বিনিময়-ভাব প্রত্যক্ষ করিলে অনেকেই অবাক্ হইবেন। রামের মত "চণ্ডালে-বিলায়-প্রেম"—অশ্বিনী বাবু ঐ সব গাঁয়ে চাষাকেই বদ্ধ আলিঙ্গনে সাপুটিয়া ধরিতে ইতস্ততঃ করেন না। বক্তা-রূপে তিনি, সুশিক্ষিত জমাট ভদ্র-সমিতির বাহিরে, বাখরগঞ্জী "বাঙ্গাল" ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করেন; এবং অনেক সময়ে ভদ্রসমাজেও সাধারণের অধিগম্য এহেন জন্মভূমির কথিত ভাষায়ই স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, কাণ্ডজ্ঞান-হীন নিরেট মূর্খকেও মনের কথা এত সরলভাবে বুঝাইবার কায়দা এবং এত সহজে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণে সাফল্য আর কোনও বক্তার মধ্যে আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। ইহারই পরিণামে বহুদিন হইতে বাখরগঞ্জ এক-নেতৃত্বে আস্থাবান্; ইহারই পরিণামে আজ বাখরগঞ্জ স্বদেশীয়তার পুণ্যতীর্থ। একথা সকলেরই গর্ব্ব করিয়া বলিতে হইবে যে, একমাত্র অশ্বিনী বাবুর নিঃস্বার্থ পল্লী-সেবার অনুবলেই বরিশালের কৃষক-সম্প্রদায়ও আজ বয়কটের কঠোর প্রতিজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হইতেছে। স্বীকার করি,—গাঁয়ে চাষা নিরেট মূর্খ; স্বীকার করি,—তাহারা দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তি বুঝে না। কিন্তু বুকে হাত দিয়া বলতো সহুরে নেতা, তুমি কি জীবনে কখনো সহর ছাড়িয়া কোন পল্লীগ্রামে পদা-র্পণ করিয়াছ?—কখনও চাষাকে বুঝাইয়া দেখিয়াছ—তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, তোমার দেশের কথা তাহার বোধগম্য হয় কিনা? ভাল কথা, এইত পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষে শত শত উপবাসী প্রাণত্যাগ করিল; তুমিত দেশের অভিভাবক, বলত, ঐ সময়ে

তুমি তাদের অবস্থাটা একবার চক্ষে দেখিতে, দূর হোক্ সাহায্য করা—একবার সহর ছাড়িয়া একটা পল্লীগ্রামে গিয়াছিলে কি ?—নিশ্চয় জানি, ভুলেও না। তবেই ত হইল, সর্ব্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকিবে, আর বলিবে জগৎটা অন্ধকারময়। চাষারও যে বুদ্ধি আছে, চাষাও যে মানুষ—দেশের একজন—শোন, তারই দুইটা ঘটনা বলি।

স্থানান্তরে ভ্রমণের পথে, অনেকক্ষণ ধরিয়া জনৈক খ্রীষ্টান মাঝির সঙ্গে আমার দেশের বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। আমরা বুঝি, দর্শন, বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্ক ; কিন্তু এ ব্যক্তি সেদিন আমাকে সোজা সরলভাবে যে দু-চারিটা কথা বুঝাইয়া দিল, তাহার প্রণালী অতি প্রশংসার্হ। সে বলে, স্বদেশী-প্রযত্নের পরেও তাহার স্ত্রী বিলাতী ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্তা ছিল। প্রায়ই তাহাদের মধ্যে লব ও করকচ লইয়া তুমুল ঝঞ্ঝাট বাধিয়া যাইত অবশেষে সে একদিন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহার স্ত্রীকে বলিল—"ত্থাখ্, ঐ লবণটা শীগ্‌গীর ফেলে দে। সহরে আমি বিচিত্র কাণ্ড দেখিলাম, এক ষ্টীমার লবণের মধ্য হইতে রাশি রাশি মলমূত্র, গলিত পশু পক্ষী সরীসৃপ ইত্যাদি বহুবিধ অস্পৃশ্য জিনিস বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; লবণ নাকি উহা দিয়াই সাফ করা হয়। ঐ ষ্টীমারের লবণ ব্যতীত সহরে আর লবণ মোটেই নাই। সুতরাং উহা শীঘ্রই এদিকে চালান হইবে, আর আমরা ছত্রিশ জাতির মলমূত্র উদরসাৎ করিতে থাকিব।" স্বামীর কথায় সুলভ-চপলা স্ত্রী সহজে গলিয়া পড়িল ; এবং তদবধি শপথ করিয়া তাহারা বিলাতী লবণের চির-নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিয়াছে। চাষা ভূষাও যে সত্য আবিষ্কারে অপটু নহে ; বরঞ্চ অর্থনীতির ধার না ধরিয়া যে, যে ভাবে বুঝে, তদনুরূপ সরল সত্যে দেশের অবস্থা বুঝিয়া, আরো দশজনকে, তাহার ভাবে দলে টানিয়া আনিতে পারে, এ দৃষ্টান্তটী তাহারই প্রমাণ।

ভিন্ন অবস্থার আবার আর এক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন বঙ্কোপলক্ষে জনৈক সাহেব জমিদারের বিলাতী দ্রব্য পরিপূর্ণ একটা হাটে আমরা স্বদেশী প্রচারে বাহির হই। সাহেব জমিদারের হাট বলিয়াই আমাদের অভিমানটী একটু জাঁকাল রকমের করিয়া লইয়াছিলাম। এতদবস্থায় হাটের সম্মুখীন হইলে তত্রত্য ৩০০।৪০০ নমঃশূদ্র ও মুসলমান লাঠি হস্তে আমাদিগকে তাড়া করিয়া আসে এবং হাটের দিকে অগ্রসর হইতে নিবারণ করে। ব্যাপার হইয়াছে এই যে, অনেক সময়ে অবিবেচক প্রচারকগণ উত্তেজনাত্মক কার্য্য পরম্পরায় দরিদ্র দোকানীর কষ্টলব্ধ মালপত্র জোর জবরদস্তি সহকারে নষ্ট করায়, এক্ষেত্রে তাহারা আপন আপন দোকানের প্রতি অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া, সময়ে, আমাদের গতি প্রতিহত করা আবশ্যক মনে করিয়াছিল। যাহা হউক, নানারূপ কাকুতি মিনতির পর, হাটে প্রবেশের অধিকার পাইয়া যখন আমরা তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় শুনিতে এবং ক্ষমতানুযায়ী যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলাম, তখন তাহাদের অনেকেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পাইয়া "হা হতোহস্মি" করিতে লাগিল। বস্তুতঃ উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে এই সকল গাঁয়ে চাষা অনেক সময়ে নিজের স্বার্থ বিষয়ে বিবেকবান্ হইতে পারে না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, ক্ষমতাশালী অভিভাবকগণ মাঝে মাঝে পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া এই

সকল গাঁয়ে চাষার সঙ্গে যদি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদিক-দিয়াই দেশের শক্তি জাগাইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ভদ্রসমাজ নিজের স্বার্থ বুঝিতে সদা সক্ষম ; অন্ততঃ, সুসংসর্গের গুণে, তাঁহাদের অধিকাংশই একটা বিষয় তিনবারের বেশী শিক্ষা পাইতে অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু যাহাদের উপর দেশের প্রকৃত স্বার্থ নির্ভর করিতেছে—যাহারা একটীবার হাত গুটাইলে, বঙ্গদেশেরই চাউল-গোলাজাতকারী বিদেশী বণিক সম্প্রদায় নিঃশ্বাস ফেলিবার উপায় খুজিয়া পায়না, সেই সকল চাষা ভূষাকে দেশের অবস্থা বুঝাইতে একটী নেতা উদ্যোগী নহেন, ইহা কি সামান্য দুরদৃষ্টের কথা! এই উপেক্ষায় দেশ সর্ব্ব-নাশের পথে বসিয়াছে ; এখনো সাবধান না হইলে অমঙ্গলের অবধি থাকিবে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে সকলকে একথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, হলবাহী যে চাষাকে আজ আমরা এত অনাদরে, অবিচারে ও উপেক্ষায় চরণ-নিম্নে সরাইয়া রাখিয়াছি, পুণ্য-ভূমি আর্য্যাবর্ত্তে, প্রাচীন সময়ে, তাহারই স্থান মিথিলার নৃপতিকুলবন্দিত গৌরাবাত্মক রাজসিংহাসনে নিবদ্ধ ছিল। বীরপ্রসূ পঞ্জাব প্রদেশে আজও যে সকল গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কৃষিজীবী। বিগত ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ভূমি-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে "চাষা" পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না করায়, তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। চারিদিকের ভদ্রসমাজ আবেদন করিয়া "চাষা"-দলভুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষিত ; আর আমরা চাষাকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া নিভৃতে প্রান্তে ঠেলিয়া রাখিতেছি—এই তো দেশের অবস্থা !! আমাদের এই উপেক্ষার ফলেই প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বঙ্গবাসীর ধন ধান্যের, শৌর্য্যবীর্য্যের এত ব্যবধান।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

## সুকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

হে কবি!
কল্পনা কবিত্ব রাজ্যে বহালে যে মন্দাকিনী,
বিমল প্রবাহে তার পুণ্যময়ী বঙ্গভাষা ;
তোমার কবিতাবলী গোলাপ বেলা কামিনী,
মধুর সৌন্দর্য্যে সৃজে কি এক ভাবের নেশা!
সৌরভে মোহিত বঙ্গ, সুপবিত্র ভাব-সুধা,
প্রেমিকের ভাবুকের মিটায় প্রাণের ক্ষুধা।
কি অমৃত-নিস্যন্দিনী, হে কবি, তোমার বাণী,
কি প্রেমে ছিল গো পূর্ণ তোমার হৃদয়খানি,
সংসার চরণে দলি ভোগসুখ পরিহরি,
বিভু-প্রেম-সুরা-পানে মত্ত ছিলে দিবানিশি।
কবিত্বের সুমোহিনী বীণাটী ঝঙ্কৃত করি,
ঢালিলে বঙ্গের প্রাণে মরি! কি পীযূষ রাশি।
পবিত্রতা প্রেমাকাশে তুমি কবিকুল ইন্দু,
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র দীনতার দিব্য ফুল ;
এ পতিত দেশে হায়! তোমার সম্মান বিন্দু
হয় নাই, তাই আজি ভক্ত তব বেয়াকুল।
বঙ্গের হাফেজ তুমি প্রেমামৃত নির্ঝরিণী,
ভাবের মালঞ্চে তুমি স্বরগের বুলবুল ;
তোমার অভাবে আজি থামিল যে বীণাধ্বনি,
আর কি বাজিবে তাহা ফুটাইয়া চিত্তফুল।
সদ্ভাব-সরোজরাজি কোথা দেব! পাব আর,
তোমার অভাবে হেরি জন্মভূমি অন্ধকার।

সিরাজী।

## প্রিয় জন বিচ্ছেদে।

আবার বসন্ত ঋতু　　আইল ধরণী মাঝে
　　চ্যুত মুকুল হল ফুল্ল।
আবার কোকিল-কুল　　মুকুলিত কাননে
　　ধ্বনিল মধুর ধ্বনি-তুল্য।
আবার কুসুম-ফুল　　মনোমোহন রাগে
　　কুসুম-কানন করে স্মিত।
আবার ভ্রমর-কুল　　ফুল্ল মকরন্দ লোভে
　　গুণ গুণ করি গায় গীত।
আবার আকাশ পরে　　পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ
　　ঝলসিছে নয়ন-পুত্তলি।
আবার গগন-পটে　　অগ্নি-কণিকার মত
　　তারকারা উদিল উজলি।
অস্তাচল গিরিপরে　　নিদ্রিত ভানুকর
　　আবার উজলি দশদিশি।
নিদ্রা ভুলিয়া পুনঃ　　চন্দ্র তারক লয়ে
　　আগমন করিতেছে নিশি।
গলিত পত্রিকাদল　　ছাইল ধরাতল
　　আবার উদিল পাতা-বৃক্ষে।
গলিত পলিত শির　　শ্যামল রঙ্গেতে হাসি
　　শোভিল বিটপি অন্তরীক্ষে।
শিশুর ক্রীড়ন-ধ্বনি　　শ্মশান-গৃহের মাঝে
　　আবার মোহিছে মনপ্রাণ।
যুবার আমোদময়　　তান লয় শোভিত,
　　উঠিল গগনে শত তান।
তুমি কি প্রেয়সী শুধু　　ঘোরঘুম তেয়াগিয়া
　　আসিবে না জুড়াতে এ হৃদি ;
তোর কি নিদ্রার ঘোর　ভাঙ্গিবে না এ ধরায়
　　কোথা আজি তুই গুণনিধি ?
কোকিল কোকিলা সনে　　ভ্রমর ভ্রমরীগণে
　　একত্রে করিছে প্রেমালাপ।
আমি যে একাকী নয়　　গণি অদৃষ্টের লীলা
　　চির-দাহকারী পরিতাপ।

আয় প্রিয়ে আয়, পুন আর হেলিব না তোরে
　　আর না বলিব রূঢ় ভাষা।
চিরদিন বঞ্চিনু　　কত নিশা-যামিনী
　　না মিটিল পরাণে পিয়াসা।
কত কত যামিনী　　আনন্দে কাটাইনু
　　কোথা হায় ! সেই পরিতৃপ্তি।
কত শুভ রজনী　　হাসিয়া বিদায় দিনু
　　হায়রে কোথায় সেই দীপ্তি !
কতই রজনী হায় !　　সলিলে ভিজাইনু
　　না ঘুচিল পরাণে বিষাদ।
সকল চলিয়া যায়　　বিজলি চমকপ্রায়
　　রাখি মনে চির-অবসাদ।
দেখিছ কি সুরলোকে　　বসি যেই যাতনা
　　ভুঞ্জিছে তব প্রাণকান্ত।
বিধির সহিত মিলি　　ভজনের অবসানে
　　আসিয়া করহ প্রাণ শান্ত।
দু'জনের কাজ আজি একাকী পারিনে আমি,
　　সংসার কি ভীষণ-ক্ষেত্র।
আয়রে প্রেয়সী আয়　সঁপি তোর করে সব
　　আমি-ই মুদিব দুই নেত্র।
তুমি না স্বপন মাঝে　দেখিতে কোথায় আমি
　　খুঁজিতে ত যথা সে কুরঙ্গী,
যুথ বিরহিত হয়ে　　খুঁজিছে ধরণীতল
　　কোথা তার জীবনের সঙ্গী।
আজি এ করমভূমে　　ভ্রমি আমি জাগরণে
　　কোথা তুমি শুধু কিগো মায়া।
হায় স্বপনের মত　　এও কি স্বপন হায়
　　নহ তুমি অভাগার জায়া ?
যাও তবে যেতে যদি　　এতই ভালবাস
　　যাও যথা পাইবে বিরাম।
প্রাণময় পদতলে　　আবার মিলিব দোঁহে
　　সেইদিন পরে শান্তিধাম।
আমিও তোমার মত　　আর না পশিব ঘরে
　　ভুলে যাব ক্ষুদ্রতম গণ্ডী।

অনন্ত করম ক্ষেত্রে সঁপিব এ দেহ প্রাণ
জাগাইব প্রাণে রণচণ্ডী।
ধোয়াব নয়নজলে অথবা শোণিতধারে
জননীর কালিমা কলঙ্ক।
ভুলে যাব প্রাণ ভয় ভুলিব স্বার্থের মায়া
ভুলে যাব মরণ আতঙ্ক।
তোমার সঙ্কীর্ণ প্রেম জগতে বিলাইব
নর নারী নাহি করি ভেদ।

সেবিব তুষিব সবে যথা তোমা তুষিতাম
নিবারিয়া জগতের খেদ।
উড়াইব সেই প্রেম আবদ্ধ আছিল যাহা
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ কন্দরে।
যিনি জগতের পতি যিনি জগতের সতী
তাঁহারই বিস্তীর্ণ অন্দরে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব—শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, মূল্য ৵০। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কাব্যের অভিব্যক্তি"—প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের পোষকতার জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। গুণের আদর দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? পুস্তিকা খানি সুচিন্তিত।

২। রাজা রামমোহন রায়। শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত, মূল্য ॥০। আদর্শ সংস্কারক রামমোহন রায়ের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের জীবনী বিস্তৃত—তাহার মূল্য অত্যধিক, সকলে তাহা কিনিতে পারে না; এই পুস্তক খানি অনেকেই ক্রয় করিতে পারিবেন। পুস্তকখানির ভাষা মার্জ্জিত এবং সরল। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

৩। গল্প শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা প্রণীত, মূল্য ১৲। রত্নমালা, বলেন্দ্র ও বলবতী, জল ও হাওয়া, অপমৃত্যু, গিরি কানন, সুরবালার মা, অদ্ভুত আতিথ্য, আদর্শ রমণী, বর্ণিয়া, পাঁচ মিনিট, ফুলওয়ালী, অদ্ভুত আখ্যায়িকা, কাশীবাসিনী, দৈব বিড়ম্বনা, ও সাক্ষী গোপাল—নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাহিত্য, বামাবোধিনী ও অন্তঃপুরে গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অম্বুজাসুন্দরী গদ্য ও পদ্য—উভয় বিভাগেই দক্ষতা সহ লেখনী সঞ্চালন করিয়া কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখা সুমধুর এবং সংযত। ভাবসমাবেশের চাঞ্চল্য দূর হইলে, ইনি আদর্শ লেখিকা হইতে পারিবেন। তাহার লেখনীতে পুষ্প বর্ষিত হউক।

৪। মানস-সরোবর। শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য ॥০। পদ্য এবং গদ্যময় গ্রন্থ। ৺সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সকল সন্তানই কৃতী এবং সুবিখ্যাত—সকলেই দেশের হিতৈষী। কিন্তু মুনীন্দ্র প্রসাদই কেবল জাতীয় ভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল, তাঁহার সন্তান যে পিতার অক্ষয় সুনাম সংরক্ষণের প্রতিভায় ভূষিত হইয়াছেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়। মুনীন্দ্রপ্রসাদের কবিতা সুমিষ্ট এবং সরস; পদ্য আরো মধুর এবং সুচিন্তিত। দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই—আমরা স্ফুটপ্রতিভার পরিচয়ে আনন্দিত হইলাম।

৪। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। শ্রী-মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য ।/০। মুণীন্দ্রপ্রসাদের এ গ্রন্থখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। লেখকের সুরুচি ও মহান্ উদ্দেশ্যের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বিধাতা গ্রন্থকারের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

৫। জীবন-প্রসূন। শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৺ আনন্দনাথের জীবন-চরিত। ইহা নব্য-ভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলেই তাহা পাঠ করিয়াছেন, আশা করি।

৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। স্বামী বিবেকানন্দ, মূল্য ॥০। সহজ ভাষায় কঠিন বিষয় এমন করিয়া বুঝাইবার শক্তি বুঝি বা এদেশের আর কাহারও জন্মে নাই। গ্রন্থকার বলেন—

"এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন, যে নির্ব্বৈর হও, এক গালে চর মার্‌লে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর, পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আস্‌ছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর, আমাদের ঠাকুর বল্‌ছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কাজ কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝলি রাম" হলো; ওরা, ইউরোপীরা, যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগ সুখ আকর্ষণ করে ভোগ কর্‌ছে। আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে দিন রাত, মরণের ভাবনা ভাব্‌ছি, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং" গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ্ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে? না—ইউরোপীয়। আর যীশুক্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করেছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তার পর, বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ—বেশ কথা উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়া শুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নও। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আট ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ কর্‌লেন আমাদের সর্ব্বনাশ; যীশু কর্‌লেন গ্রীস রোমের সর্ব্বনাশ!!! তার পর, ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষের ৩০ ক্রোর লোক, দেরি হচ্ছে।

৩০ ক্রোর লোককে চেতানো কি এক দিনে হয়?

বুদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত,ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হ'ল? 'কালেতে হয়' বল্লে কি চলে? কাল কি, কার্য্যকারণসম্বন্ধে ছেড়ে, কাজ কর্ত্তে পারে?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—"জাতিধর্ম্ম" "স্বধর্ম্ম," যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার, অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বল্ছেন যে, এ দেশের লোকের খোসামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁহাদের নিকট বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোসামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে এক মুঠা অন্ন দেয় না; ভিক্ষে শিক্ষে করে,বাইরে থেকে এনে, দুর্ভিক্ষ অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশিপণ্ডিতমণ্ডলী! এই ত আমার দেশের লোক, তাদের আবার কি খোসামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে,তার হাতে দু দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায় সেই যথার্থ বন্ধু। এই "জাতিধর্ম্ম," "স্বধর্ম্ম" সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ "জাতিধর্ম্ম," "স্বধর্ম্ম" নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম স্বধর্ম্ম বলে বুঝছেন,ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্ম্মের ঘোড়ার ডিম বুঝছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের ঝোল টান্ছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বল্‌ছি না, বংশগত জাতির কথা বল্‌ছি, জন্মগত জাতির কথা বল্‌ছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু, গুণ দু চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্ব্বনাশ হল কেন? "সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা"। কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হলো, সাদা রং কাল কেন হল, সত্বগুণ, রজোগুণপ্রধান—তমোগুণে কেন উপস্থিত হল, সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বল্‌বার রইল।"

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা, পত্র ও প্রবন্ধ এদেশে আদৃত হইলে, দেশের মহা কল্যাণ হইবে।

৭। ভারবি কৃত কিরাতার্জ্জুন।

বঙ্গানুবাদ, প্রথম ভাগ,প্রথম ৫ সর্গ। শ্রীনবীন চন্দ্র দাস কবি গুণাকর এম-এ, বি-এল, মূল্য ॥০। উপমায় কালিদাস এবং অর্থের গৌরবে ভারবি ভারতের অমর কবি। ভারবির কিরাতার্জ্জুন অনুবাদ করিয়া নবীনচন্দ্রও এদেশে অমরত্ব লাভ করিলেন। এমন বিশদ, সরল, বিশুদ্ধ অনুবাদ কেবল নবীনচন্দ্রের প্রতিভাতেই সম্ভব। বাঙ্গালা ভাষা কত মধুর এবং ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন—নবীনচন্দ্রের এই অনুবাদ পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বরদাচরণের মেঘদূতের অনুবাদ যেমন মিষ্ট, নবীনচন্দ্রের কিরাতার্জ্জুনও তেমনি মিষ্ট, ভাষা-সম্পদে অতিমাত্রায় ভূষিত না হইলে এরূপ কাজে কেহই কৃতীত্ব দেখাইতে পারেন না। ধন্য নবীনচন্দ্র, তিনি বঙ্গে আদর্শচিত্র দেখাইলেন। আমরা তাঁহার লেখা পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। বলা বাহুল্য, সর্ব্বত্রই এ গ্রন্থের আদর হইবে।

# বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুএকটী কথা

গীতাকার বলিয়াছেন, "কিং কর্ম্ম কি[illegible]-কর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" [illegible]-স্থার বিপর্য্যয়ে কি ব্যক্তি কি জাতির নি[illegible]ট যখন কোনও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়, ত[illegible]ন সর্ব্বত্রই 'কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ' হ[illegible] পড়েন, পণ্ডিতেরাও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধা[illegible] অসমর্থ হয়েন, উহা গীতার সময়ের বা কু[illegible]-ক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষত্ব নহে। স্বাভাবিক ত[illegible]-স্থায় যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যে অস্বাভাবিক ত[illegible]-স্থায় কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না, ইহা ব[illegible] নিষ্প্রয়োজন। সুস্থ শরীরের পক্ষে যা[illegible] ব্যবস্থা, অসুস্থের পক্ষে তাহা অব্যবস্থা, ই[illegible] অতি অব্যবসায়ীরও বোধগম্য হইতে দে[illegible] লাগে না। যাহার শরীরের রক্ত কুষ্ঠ-ব্যাধি[illegible] দূষিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যতই কে[illegible] ভাল দ্রব্য খাওয়ান যাক না, তাহার শরীরে দূষিত রক্তই উৎপন্ন হইবে, তাজা রক্ত উৎপন্ন হইবে না। তুরস্ক হইতে বাবুর্চ্চি আনাইয়া তাহাকে কালিয়া কোর্ম্মা খাওয়াইলে তাহার রসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইতে পারে, শরীরের পুষ্টি অসম্ভব। শরীরের পুষ্টির জন্য আগে ব্যাধির চিকিৎসা প্রয়োজন, পরে খাদ্যের ব্যবস্থা। শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া যখন গাত্রের সর্ব্বত্র স্ফোটক হইতে আরম্ভ করে, তখন ফোঁড়ার চিকিৎসা অপেক্ষা রক্তের চিকিৎসা প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। কেন না, ফোঁড়া কাটিবার জন্য যতই কেন উপ-যুক্ত সার্জ্জন আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, স্বাস্থ্য-লাভ ঘটিবে না, সে ব্যবস্থা, সে সার্জ্জন জার্ম্মানই হউক, ইংরেজই হউক, আর ফরাসীই হউক। ব্যবস্থা করিতে হইবে রক্ত পরিষ্কারের, নতুবা রোগ-মুক্তি অসম্ভব। পরাধীনতা-রূপ মহা ব্যাধিতে আমাদের জাতীয় শরীর জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে, সে ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া যাহারা স্থানীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাদিগকে সুব্যবস্থাপক মনে করিতে পারি না। এ ব্যাধি দূর না হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না। মানব-সমাজ Mechanism নহে, Organism. Mechanismএর যেমন একটা চক্র বা দণ্ড নষ্ট হইয়া গেলে, তাহা বদলাইয়া দিলেই যন্ত্র সুস্থ হয়, Organism তাহা নহে। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইলে সে স্থলে আর একটা হৃদ্‌যন্ত্র লাগাইয়া দিলে শরীর সুস্থ হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ভাল নয়, সুতরাং জার্ম্মান শিক্ষা-প্রণালী * সে স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিলেই সব আপদ চুকিয়া যাইবে, মনে করা একটা ভ্রান্তিমাত্র। একটা জন্তু-শরীরের হৃদ্‌যন্ত্র তুলিয়া যেমন সে স্থলে আর একটা জন্তুর হৃদ্‌যন্ত্র বসান যায় না, বিদেশ হইতেও তেমনই একটা শিক্ষা-প্রণালী আনিয়া আমাদের দেশে লাগাইয়া দিয়া কোন সুফল আশা করা যায় না। জার্ম্মান স্বাধীন-দেশ, সে দেশে যে শিক্ষা-প্রণালী কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা আমাদের এই অধীন, পর-পদানত, শতবন্ধনে বদ্ধ দেশে ফলোপধায়ী হইবে, ইহা আশা করা নিতান্তই বর্ত্তমান

* আষাঢ়ের প্রবাসী—"জার্ম্মান শিক্ষা-নীতি" [illegible]

সমাজতন্ত্রের সকল উপদেশ বিরুদ্ধ। যেখানে আমাদের দেব-মন্দিরে দেবমূর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত দেখিয়া আমরা নিরুপায় হইয়া কেবল হা হতোস্মি করিতেছি, আর শান্তি-রক্ষকগণ উপহাস ছাড়া আর কিছু করিতেছেন না, যেস্থলে আমরা আমাদের রমণীগণের সতীত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া চারিদিক আঁধার দেখিতেছি, কিন্তু রাজপুরুষগণ আমাদের আত্মরক্ষার শেষ সম্বল লাঠিগাছটী পর্য্যন্ত ছিনাইয়া লইতেছেন, সে স্থলে বে খরচা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিবার কল্পনাটা কল্পনার দিক হইতে অতি সুন্দর ও মনোহারী হইলেও বাস্তব জীবনের দিক্ হইতে একটা কঠোর বিদ্রূপ ও বিরাট বিড়ম্বনা মাত্র। বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় লাভ কি? শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা দেশের অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু ভারতবাসী কলির শূদ্র, তাহার ধনে অধিকার নাই। শ্বেত-ব্রাহ্মণ যখন ইচ্ছা, যে উপায়ে হউক, তাহার ধন অপহরণ করিবে, ভারতবাসীর বাধা দিবার অবসর আছে কি? বিদেশী তাহার ধন কোথা দিয়া লুঠ করিতেছে, তাহা সে জানিতেও পারিতেছে না, কোথা দিয়া অপব্যয় করিতেছে, তাহার হিসাব পাইবার সে অধিকারী নয়। এরূপস্থলে অর্থাগমেই যুগান্তর উপস্থিত হইবে কি? অর্থাগমই কথা নহে, অর্থ-রক্ষাই প্রধান কথা। আজ যদি দেশের অর্থের অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিতাম, আজ যদি দেশের অর্থের বিদেশে গমনের পথ অবরুদ্ধ করিতে পারিতাম, তবে এমনই দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইত, সেজন্য অর্থাগমের নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। অর্থ নির্গমনের পথ-রোধ করিতে না পারিলে, দেশের লোকের আয় যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'—অন্নকষ্ট দূর হইবে না। তাহার উপায় কি, বে-খরচা প্রাথমিক-শিক্ষা, না অর্থকরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা? যদি শরীরের পক্ষে রক্তের অপচয়ের জন্য এমন একটা পথ উন্মুক্ত থাকে যে তাহা দ্বারা কত রক্ত নির্গত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবে রক্ত বৃদ্ধির উপায় শরীর রক্ষার উপায় নহে। আমি যখন নিজেই আপনার নহি, তখন পরকে আপনার করিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষায় পরপদাঘাত-প্রপীড়িত ভগ্নপ্রায় হৃদয়ের একটা নিষ্ফল সান্ত্বনা আছে বটে, কিন্তু কঠোর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কোন ফল নাই। ইহা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষা বিষয়েও আমাদের সম্যক্ অন্তর্দৃষ্টির অভাব ও বহির্দৃষ্টি-প্রবণতারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আর একটা কথা এই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কি কোন একটা বিষয় সরকার বাহাদুরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারি? দেশের স্বার্থ ও গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ এমন বিভিন্ন যে এক জনের পক্ষে যাহা অমৃত, অন্যের পক্ষে তাহা বিষ। সুতরাং আমরা কিছুতেই গবর্ণমেণ্টের হস্তে শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিতে পারি না। এখন যাহা কিছু গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবে, তাহাতেই দেশের বিশেষ অকল্যাণ ঘটিবে। বিমাতার হাতে যদি একবার মাত্র সন্তানকে দুধ খাওয়াইবার ভার থাকে এবং তিনি যদি ঐ একবার দুগ্ধকে বিষযুক্ত করেন, তবে মাতা আর চারবার অতি সবল সুস্থকায় গাভীর খাঁটী দুধ খাওয়া-

ইয়াও সন্তানকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি? বিমাতা জ'লো দুধ খাওয়াইয়া যদি সন্তানের পেট এমন ভরিয়া দেন যে মাতার আর সন্তানকে দুগ্ধ খাওয়াইবার অবসর ও সুযোগ থাকে না, তবে মাতার পক্ষে কি সন্তানকে বিমাতার নিকট যাওয়ার আবশ্যকতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য নহে? এরূপ চেষ্টায় যে শক্তি প্রয়োগ, তাহা বৃথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-জনিত শক্তিক্ষয় নহে, সন্তানের কল্যাণার্থ শক্তির সর্ব্বপ্রধান সদ্ব্যবহার। ইহাকে কিছুতেই শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার বলা যাইতে পারে না। সন্তানের সন্তানত্ব বজায় থাকিলেতো তাহার শিক্ষা। গোলামখানায় যদি তাহার সন্তানত্বই নষ্ট হইয়া গেল, তবে আগায় জল ঢালিয়া কি লাভ হইবে? তারপর, কেবল বিমাতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেই হইল না, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের হস্ত হইতেও সন্তানগণকে রক্ষা করা চাই। যাহারা চিরদিন গোলামী করিয়া ছাই (C. I. E.) বা ছার (Sir) হইয়া বাহির হইতেছেন, অথবা ছাই বা ছার হইবার আশায় গোলাম বনিয়া গিয়াছেন, তাহাদের হস্ত হইতেও দেশের শিক্ষাকে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের অবস্থাই স্বতন্ত্র। সুশাসিত দেশে অনেক কাজ সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া জন-মণ্ডলী নিশ্চিন্তমনে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে। আমরা তাহা পারি না। শত্রুপক্ষ যখন গৃহের এক কোণে আগুন লাগাইয়া সমস্ত গৃহকেই ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে, তখন আমি অপর কোণে নিশ্চিন্ত মনে বিষয়-কর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারি না। বাড়ীখানা যখন নিলামে অপরের হস্তে গিয়াছে এবং সেখানাকে কখন ভূমিসাৎ করা হইবে, তাহা যখন আমার পরামর্শের আয়ত্ত নহে, তখন গৃহের একপ্রান্তে বসিয়া কুঠুরী বিশেষের চূণকামের ব্যস্ততায় কেবল অপরপক্ষের বিদ্রূপের একটা বিকট হাস্যের উদ্রেক ছাড়া অন্য কোন বৈষয়িক লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ চূণকামের আনন্দ ও সান্ত্বনা জগতের কাছে আমাদের অন্তঃসার-বিহীনতাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতেছে মাত্র। যেদিক্ দিয়াই বিচার করি না কেন, আমাদের পক্ষে কিছুতেই সুশাসিত স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন স্বাধীন-দেশের নিয়ম-পদ্ধতি খাটিবে না। বিকারের রোগীর বিষবড়িই ব্যবস্থা। সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় Evolution উন্নতির প্রণালী, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে revolutionই ব্যবস্থা, এইরূপ অবস্থাতেই গীতা ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

সাধারণতঃ মানুষ নরহত্যাকে অকর্ম্ম বলিয়া জানে, কিন্তু অবস্থা ভেদে যে নরহত্যাই কর্ম্ম, ইহা যিনি বুঝিতে পারেন, সমস্ত কর্ম্মকারী এমন ব্যক্তিই যোগী। বাস্তবিক এখন আমাদের সমস্ত কর্ম্মকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে এবং সে কেন্দ্র স্বরাজ। সকল কর্ম্মের গতি হইবে ঐ মুখে।

স্বরাজ (১) উদ্দেশ্য নয়, উপায়। মনুষ্যত্ব লাভের অপরিহার্য্য উপকরণ। স্বরাজ লাভ করিলেই মনুষ্যত্ব লাভ পূর্ণতা লাভ করিবে, তাহা নহে, তাহা কেহ কখনও বলে নাই; কিন্তু স্বরাজ লাভ না করিলে কখনও মনুষ্যত্ব লাভ হইবে না, বরং দিন দিন মনুষ্যত্ব

(১) আষাঢ়ের প্রবাসী—"স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন উত্তম কথা। কিন্তু জাতীয় চরিত্র কোথায়, সবই ত দেখিতেছি বিজাতীয়! জাতীয় করিতে গেলেই যে গুর্খার গুঁতো ও রেগুলেশন লাঠি! যতদিন বিজাতীয় চরিত্র গঠন করিতেছিলাম, ততদিন কোন গোলমাল হয় নাই ; এখন জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যাইয়াই না এই বিপদ! চরিত্র গঠন হয় কার্য্যক্ষেত্রে, আমাদের উন্মুক্ত কার্য্যক্ষেত্র আছে কি? ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার মধ্যেও গোয়েন্দা বসিয়া থাকে। যে কর্ম্মে চরিত্রে বল আছে, হৃদয়ে দৃঢ়তা উৎপন্ন হয়, মনে বীর্য্যের আবির্ভাব হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, জাতীয় সে সব কার্য্যক্ষেত্র হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে তাহা বিদেশীর একচেটিয়া। এতদিন মনে করিতাম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই না হয় বিদেশীর সঙ্গে ঝগড়া, শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে তো আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারি। এখন সে মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও এমন মোহান্ধ কেহ কেহ আছেন, যাহারা মনে করেন যে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারের সঙ্গে বিদেশীর কি সম্বন্ধ, আমরা সেখানে তো কুরীতি দুর্নীতির সংস্কার করিতে পারি? হা অন্ধতা! আমাদের যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা কি বিদেশীর চক্ষে সহিবে। আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ যে তাহার ভীষণ ক্ষতি। যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা আমরা কোন মতেই নিরুদ্বেগে করিতে পারি না। আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ বিদেশীর স্বার্থবিরোধী। আমরা কি স্বরাজ না পাইলে "পর্য্যাপ্ত ভোজন-পুষ্ট সুস্থ সবল দেহ" লাভ করিতে পারি? অসম্ভব! যতই চেষ্টা করি না কেন, স্বরাজ না পাইলে অন্নকষ্ট দূর হইবে না। যাহার ইচ্ছা হয় তিনি একথা লোহার কলমে পাথর গাত্রে লিখিয়া রাখিতে পারেন। যে শিক্ষাতে "জ্ঞানোন্নত তেজস্বী সাহস-সম্পন্ন মন" হয়, সে শিক্ষা কি কলির শূদ্র ভারতবাসী পাইতে পারে? যে শিক্ষায় ভীরু কাপুরুষ, পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল একদল জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাহাই আমাদের প্রাপ্য। যেটুকুও সৎশিক্ষার সম্ভাবনা ছিল, তাহারও মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। আসল কথা এই, জীবন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা যদি গুর্খার লাঠির আশঙ্কা করিয়া চলিতে হয়, তবে কখনও জীবন বিকশিত হইতে পারে না। এই নাগপাশ হইতে উন্মুক্ত হইবার চেষ্টাই এখন আমাদের একমাত্র চেষ্টা। সেই জন্যই এখন আমরা স্বরাজ ছাড়া আর কিছুই চাই না। স্রোতের মুখ বন্ধ হইলেই জলে নানা আবর্জ্জনা জমা হয়। একটা একটা করিয়া আবর্জ্জনাগুলি দূর করিবার পণ্ডশ্রম হইতে বিরত হইয়া, স্রোতের মুখ খুলিয়া দিবার চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে আবর্জ্জনা আপনা হইতেই দূর হইবে, জল আপনা হইতেই পরিষ্কার হইবে। জাতীয় জীবন-স্রোতের মুখও ঐ স্বরাজের দ্বার দিয়া খুলিয়া দাও, দেখিবে জাতীয় জীবনের আবর্জ্জনা গুলি ধীরে ধীরে তোমার অলক্ষিতেই সরিয়া পড়িতেছে। ৭৫ বছর ধরিয়া সংস্কারকগণ জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু বিগত ৫ বৎসরে জাতীয়তার উদ্দীপনায় জাতিভেদ যত শিথিল হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহা হয় নাই। জাতীয় প্রচারক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বাড়ীতে এক সঙ্গে আহার করিতে

কিছুই দ্বিধা করেন নাই, যদিও অন্য অবস্থায় মহাযুক্তির খাতিরেও তাহার বাড়ীতে যাইতেই কুণ্ঠিত হইতেন। কেন? জাতীয় জীবন সামাজিক জীবনের উপরে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির খাতিরে সামাজিক বাধা আপনিই পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। ষ্টার থিয়েটারের অমৃতলাল বসু বিবাহ সংস্কার উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কত না কুরুচিসম্পন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু এই জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপনায় তিনিও বাল্য বিবাহের সঙ্কোচন সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে আপনার জ্ঞানানুসারে পারিবারিক সুব্যবস্থার দিক্ হইতে বিচার করিতেছিলেন। এখন তাহার নিকট উচ্চতর আদর্শ খুলিয়া গিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, জাতীয় উন্নতি ছাড়া পারিবারিক সুশৃঙ্খলা অসম্ভব। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য বাল্য বিবাহ ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইবে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সমস্ত সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে আমরা ধস্তাধস্তি করিতেছি, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই তিরোহিত হইবে। শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যলাভ হইলে অনেক বিশেষ বিশেষ রোগ আপনা হইতেই দূরীভূত হয়, তাহাদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। বিদেশীর অধীনতা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, তাহা দূর হইলে সমাজ দেহের অনেক অস্বাভাবিক রোগ আপনা আপনিই চলিয়া যাইবে। স্রোতের মুখ খুলিয়া গেলে যেমন আবর্জ্জনা আপনিই চলিয়া যায়। কিন্তু যেখানে স্রোতের মুখ আটকাইয়া গিয়াছে, সেখানে মুখ খুলিবার জন্য শক্তি চাই; অর্থাৎ স্বরাজ লাভের জন্য কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যত্ব চাই, মনুষ্যত্ব না হইলে যেমন স্বরাজ হইবে না, তেমনি আবার স্বরাজ ছাড়াও, মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না। এই যে পরস্পর মুখাপেক্ষী ভাব, ইহা আমরা যেন না ভুলি। স্বরাজই চাই, আর স্বরাজ ছাড়া আর কিছু চাই, স্বরাজ ও মনুষ্যত্ব লাভ এই দুইয়ের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে, ঘাত প্রতিঘাত আছে, তাহা যেন মনে থাকে। যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা লাভকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া বসিয়াছেন, আর কোন কথা শুনিবেন না, তাঁহারাও ভ্রান্ত, কেন না, স্বাধীনতা উদ্দেশ্য নয়, উপায়। আবার যাঁহারা বলেন, স্বরাজের হাঙ্গামা কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া রাখ, আগে সামাজিক কুরীতি সব দূর কর, মনুষ্যত্ব লাভ কর, পরে স্বরাজ লাভ করিও, তাঁহারাও ভ্রান্ত; কেন না, তাঁহারা উদ্দেশ্য লাভের উপায় ছাড়িয়া দিতেছেন। তাঁহারা একটু বেশী ভ্রান্ত, কেন না, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বরাজ ছাড়া একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আমরা সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত এক অসভ্য বর্ব্বর জাতি নহি যে, আমাদের কোন প্রকার শক্তি সামর্থ্য নাই, আমাদের কোন অধিকার বা দাবী দাওয়া নাই। আমাদের সভ্যতার স্রোত থামিয়া আবর্জ্জনাযুক্ত হইয়াছে। এই স্রোত আনিতে হইবে, নতুবা কোন উন্নতি হইবে না। স্রোতহীনের যে উন্নতি সম্ভব, তাহা আমাদের হইয়াছে। এখন ঐ স্বরাজ স্রোত ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, খাইয়া জীবনধারণও সম্ভব নহে। সেই জন্যই জাতীয় জীবনের পক্ষে স্বরাজ একটা উপায় হইলেও এখন উদ্দেশ্যের মত প্রতিভাত হইতেছে। মানুষ ধনোপার্জ্জন করে, সুখের জন্য। সুখ উদ্দেশ্য, ধন উপায়। কিন্তু এমন সময় আসে, যখন ধনই উদ্দেশ্য বলিয়া

মনে হয়। ' মানুষ মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ধনের জন্য খাটে, সুখের দিকে তাকায় না। না হয়, উত্তরাধিকারী তো সুখী হইবে! আমাদিগকেও স্বরাজ অর্জ্জনের জন্য এই ভাবেই মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা ফল ভোগ করিতে না পারি, আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা স্বরাজ ধনে ধনী হইয়া সুখী হইবে। তা ছাড়া আর উপায় নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# উপনিষদের আখ্যায়িকা। (২)

## ভৃগু ও বরুণের উপাখ্যান।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় এই আখ্যায়িকায় উপদিষ্ট তত্ত্বগুলির মধ্যে, শক্তি ও শক্তির জড়ীয় আধার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—পাঠক তাহা জানেন এবং তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রুতির মীমাংসা বিজ্ঞানানুমোদিত। এই সংখ্যায় আমরা শ্রুতির উপদিষ্ট অন্য একটী অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। এই ভৃগু-বরুণ-সংবাদে, উপনিষদে, "পঞ্চ-কোষের" কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতি এই শরীরকে পাঁচটী কোষে বিভক্ত করিয়াছেন। অন্নময়, মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়—এই চারিটী কোষ লইয়াই শরীর; এতদ্ব্যতীত এই শরীরে আনন্দময় কোষ নামক আরও একটী কোষ আছে। এস্থলে এই কোষ পাঁচটীর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক; নতুবা এই আখ্যায়িকাটী ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই শরীরে দুইটী প্রধান অংশ আছে; একটী স্থূলাংশ, অপরটী সূক্ষ্মাংশ। সেই স্থূলাংশ লইয়াই অন্নময় কোষ; অর্থাৎ অন্ন দ্বারা উপচিত ও পুষ্ট দেহ ও দেহাবয়বগুলি লইয়াই অন্নময় কোষ। এই অন্নময় কোষই —অপর কোষগুলির স্থূল ভূতাত্মক আধার। অপর কোষগুলি সমস্তই সূক্ষ্মাংশ লইয়া। এই দেহ শুক্র শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন হয়; পিতা মাতা হইতেই শিশু, দেহের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। শির, পাণি, পাদাদি অবয়ব বিশিষ্ট স্থূল দেহটীই অন্নময় কোষ নামে বিদিত। এই প্রধানতঃ অন্ন-পানাদি বিকার হইতে উৎপন্ন ও পুষ্ট হয় বলিয়াই ইহার তাদৃশ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে অন্নই (খাদ্যদ্রব্য) প্রাণীদ্বারা ভুক্ত হইলে, রসাদিরূপে পরিণত হয় এবং ক্রমে শুক্র ও শোণিতের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং শিশু-দেহ এই অন্নদ্বারাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই কোষে পৃথিবী ও জলের অংশই অধিক। এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে এবং ইহার আশ্রয়ে, প্রাণময় কোষ অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহের যাবতীয় ক্রিয়া-নির্ব্বাহের মূলরূপে অবস্থান করিতেছে। শরীরের নানাপ্রকার কার্য্য-ভেদে, একই শক্তির বিবিধ নাম। দেহের সমুদয় চেষ্টার মূলে এই প্রাণশক্তিই বর্ত্তমান। এই প্রাণশক্তি না থাকিলে যেমন একদিকে, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস লওয়া যাইত না, তদ্রূপ, কথন, গ্রহণ, আদান, ত্যাগ,

বিসর্জ্জন প্রভৃতি দৈহিক কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত না। এই প্রাণশক্তিই ইন্দ্রিয়ের গোলক গুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, সেই সকল গোলকের আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। যাবতীয় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া এবং রস-রুধিরাদির চলনাত্মক-ক্রিয়ার মূলে এই প্রাণশক্তির অস্তিত্ব আছে। ইহা সমগ্র দেহটা ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। এই সকল কথা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে, কোন কোন উপনিষদে, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিবাদের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও দেহ-রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু প্রাণশক্তির অভাবে দেহ রক্ষিত হইতে পারে না,—সেই বিবাদে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রয় বা হেতু—এই প্রাণশক্তি।

ইহা অপেক্ষ ও ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর,মনোময় কোষ নামে, দেহে আর একটা কোষ আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, আমাদের এক একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিজ্ঞান লব্ধ হয়; সে গুলিকে ইন্দ্রিয়বর্গ এই মনের নিকটেই অর্পণ করিয়া থাকে। যুগপদুপস্থিত এই রাশি রাশি বিজ্ঞানগুলির (Sensations) মধ্যে,—এই মনই একটা শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেয়; নতুবা আমাদের বিষয়-বিজ্ঞান (Perceptions) জন্মিতে পারিত না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Attention কতকটা এই মনের অনুরূপ। মনই, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। Kant যাহাকে Understanding বলিয়াছেন, এ মন তাহাই।

এই মন ব্যতীত, আর একটী সূক্ষ্মতর কোষ আছে; তাহাকে শ্রুতি বিজ্ঞানময়-কোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই,—'বিজ্ঞান' বা 'বুদ্ধি।' বুদ্ধিবৃত্তি প্রধান বলিয়া, এই কোষকে 'বিজ্ঞানময়' কোষ বলে। মন শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিয়া, যে সকল বিষয় উপস্থিত করিল, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাকে "এটী গো, এটী বৃক্ষ"—ইত্যাকারে নিশ্চয় করে। অন্তর্নিহিত বিচার-শক্তির (judgment) প্রভাবে, এই বুদ্ধি দ্বারাই পরিশেষে,—এটী অমুক বস্তু, ওটী অমুক বস্তু,—এইরূপে পদার্থ বোধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন যেমন ব্যক্তি-গত শ্রেণীবিভাগ করে, বুদ্ধি তদ্রূপ জাতিগত শ্রেণী-বিভাগ করে! তবে আমাদের বৈষয়িক উপলব্ধি হয়। আবার লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, বাসনা, দুঃখ, স্মৃতি প্রভৃতি বৃত্তি সকল এই বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। এই মন ও বিজ্ঞানকে লইয়া একত্রে 'অন্তঃকরণ' বলে। ইন্দ্রিয়গুলি,—এই অন্তঃকরণেরই বিষয়োপরক্ত বৃত্তি মাত্র। বিষয়মাত্রই, ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উদ্রেক করায়; অন্তঃকরণ,—সেই সকল ক্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয়া করিলেই, আমাদের বিষয় বিজ্ঞান জন্মে। এই অন্তঃকরণ.—যাবতীয় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় বা হেতু। এতদ্ব্যতীত, গাঢ় সুষুপ্তি কালে, জীবের আর এক রূপ বোধ অনুভূত হইয়া থাকে। গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, জীবের একটা সাধারণ আনন্দের অনুভূতি অস্পষ্টভাবে স্মৃতিতে উদ্রিক্ত হয়; নতুবা 'বড়ই সুখে ঘুমাইয়াছিলাম'—এরূপ একটা অনুভূতি জীবের হইতে পারিত না। এতদ্দ্বারাই- শ্রুতি, 'আনন্দময় কোষের'

অস্তিত্ব অনুমান করেন। আমাদের যাবতীয় সুখ দুঃখাদি ভোগ,—এই আনন্দময় কোষেরই অংশ। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, তবে মানুষ্য এই নির্ম্মল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, দেহে পাঁচটী কোষ আছে। ব্রহ্ম-চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত এই কোষপঞ্চক, উহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। ফলতঃ, আত্মচৈতন্য—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি এবং পূর্ণানন্দ স্বরূপ। বিষয় সংসর্গে সেই পূর্ণেরই,—অপূর্ণ বিজ্ঞান,অপূর্ণক্রিয়া ও অপূর্ণ সুখ দুঃখাদি অনুভূত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ—বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয়; এবং প্রাণ—বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলির সাধারণ আশ্রয়। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় সংসর্গে—এই দুই শক্তি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার আকারে পরিণত হইতেছে। কিন্তু ইহারা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়েই ক্রিয়াশীল হইতেছে। আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহারা ক্রিয়া বা বোধ জন্মাইতে পারিত না।

এইরূপে ভৃগু, বরুণের উপদেশে, এই কোষগুলির অবলম্বনে, সূক্ষ্মতম ব্রহ্ম-জ্ঞানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত উপদেশ গুলি পাইয়াছি :—

১। এক প্রাণশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই প্রাণশক্তির 'অন্ন' নামে একটী জড়ীয় আধার আছে; ইহা তাহার আশ্রয়েই ক্রিয়া করে এবং আধারটীকেও ক্রমে দেহাদির আকারে গড়াইয়া তোলে।

৩। এই দেহে পাঁচটী কোষ আছে। অন্নময়,প্রাণময় মনোময়,বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।

৪। এই কোষগুলি ব্রহ্মপোলব্ধির দ্বারমাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথমটী হইতে পর পরটী ক্রমসূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

৫। এই পঞ্চকোষে ব্রহ্ম দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# কমলাকান্ত-কথা।

বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বহুদিন নীরব। অনেকে হয়ত মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তাঁহার সখের দপ্তরটী দিয়া কমলাকান্ত ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তিনি মরেন নাই, মরিতে পারেন না; তিনি হনুমানের ন্যায় চারিযুগে অমর। প্রিয় সুহৃদ্ বঙ্কিমের মৃত্যুর পর, কমলাকান্ত অহিফেনের মাত্রাটা এত বেশী করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, বাহ্য-জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক যেন এক রকম ঘুচিয়া গিয়াছিল, চক্ষু মেলিতে পারিতেন না, কথাবার্ত্তার প্রবৃত্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল একরূপ সমাধি অবস্থায় থাকিয়া, বিপুল জ্ঞান সঞ্চয়ান্তে, অহিফেনের মৌতাদ কমাইয়া পুনরায় নর-লোকের সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁহার নিকট গিয়া থাকি এবং ঐহিক, পারত্রিক নানা বিষয়ে বহুবিধ আলাপ করিয়া বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করি। পাঠকগণকে তাঁহার কথামৃত উপহার দিতে

প্রবৃত্ত হইলাম। উহা যে সকলের সমানভাবে রুচিকর হইবে, এমন আশা করা যায় না। তবে বৃদ্ধ কি বলেন, শুনিলে ক্ষতি কি ?

## সূচনা।

প্রশ্ন। আপনি এতদিন যে ভাবে কালাতিপাত করিলেন, তাহাতে যেন মনে হয়, এই সময়ের কোন খবর আপনি রাখেন না।

উত্তর। ও কথা ঠিক নয়, আমি কেবল চক্ষু মেলি নাই এবং কথা কহি নাই, কিন্তু কোন দিনের কোন সম্বাদ আমার অগোচর নাই জানিবে।

প্রঃ। আমরা আপনার নিকট কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রকে যে ভাবে যে সকল কথা বুঝাইয়াছিলেন, তদুপযুক্ত না হইলেও আমাদিগকে আমাদের মত দু এক কথা বলিয়া কৃতার্থ করেন, ইহা অধমদিগের প্রার্থনা।

উঃ। ভাল, তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে আমি যথাশক্তি উত্তর দিতে পারি; নচেৎ তোমরা কি শুনিতে চাও, কতদূর কি বুঝিতে সক্ষম, ইহা না জানিয়া কি কথা পাড়িব ?

## প্রথম প্রসঙ্গ।

প্রঃ। পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ বলিতেন, যে পুকুর মজিয়া যাইতেছে, সেই পুকুরেই দল হয়, কারণ তাহা মৃত্যু-মুখে পতিত; স্রোতস্বতী নদী বা সমুদ্র যেখানে জীবনীশক্তি প্রবলা, সেখানে কিছুতেই দল তিষ্ঠিতে পারে না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যে বিস্তর দল হইয়াছে, উহা কি অমঙ্গলের লক্ষণ ?

উঃ তিনি ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, খানা-ডোবাতেই দল হয়, নদ নদী সমুদ্রে দল হয় না, অর্থাৎ সংকীর্ণমতাবলম্বী লোকদের মধ্যেই দল দেখিতে পাওয়া যায়, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে দল অসম্ভব। যাহা যউক, ও কথা অন্য-ক্ষেত্রেও খাটে। অধঃপতিত জাতির মধ্যেই একতার অভাবে পরস্পরের অনৈক্যতা-বশতঃ বহু দল এবং দলাদলি হইয়া থাকে। বিভিন্নমুখী বিস্তর দল দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া একে অন্যের ক্ষতি করিতেছে মাত্র; সবাই আসল কাজ হারাইয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে। ওরূপ স্থলে উন্নতি একেবারেই অসম্ভব, অলক্ষিত ভাবে অবনতির দিকেই গতি। ভাবিয়া দেখ, কোন পদার্থকে চারিদিক হইতে চারি দল টানাটানি করিলে তাহা প্রযুক্ত-শক্তির তারতম্যানুসারে একবার এদিক একবার ওদিকে নড়ানড়ি করে মাত্র কাহারও দিকে যাইতে পারে না। জড়-জগতে যে নিয়ম, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্বত্রই সেই এক নিয়ম।

প্রঃ। তবে কি সকল বিষয়ে সবাই এক মত হইবে ?

উঃ। তাহা অসম্ভব, যেহেতু অনৈসর্গিক। ইহাতে সকলেই জানে যে, বিশ্বসংসারে কুত্রাপি এমন দুইটী পদার্থ পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে কোন প্রকারের একটুও প্রভেদ নাই, সকল বিষয়ে একেবারে ঠিকঠাক সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও কোথাও না কোথাও একটু গরমিল ধরা পড়িবেই। এক গাছের দুইটী পাতা শিরাদি-সর্ব্বাঙ্গে এক মাপের এক রকম দেখা যায় না, নিতান্তপক্ষে কেশাগ্রপরিমাণের তফাৎ আছেই। ইহাই বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের বাহাদুরী; বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠবিকাশ মানুষে তাহার চরম,—প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রী কণ্ঠস্বরাদি এতই পৃথক্ যে,

কোটী কোটীর মধ্যে ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা অনায়াসে এক জনকে বাছিয়া লওয়া যায়; বাহ্যিক চিহ্ন সমূহে যেমন পার্থক্য, আন্তরিক চিন্তাস্রোত মতামতাদি ততোধিক বিভিন্ন। পরন্তু এবম্প্রকার বিচিত্রতা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে একমত হইয়া মানুষ সমাজ-গঠন করতঃ একত্রে বাস করে, সভ্যাসভ্য কেহই একা থাকিতে পারে না, থাকা অসম্ভব। তাই দেশভেদে মানুষের মধ্যে জাতি ও জাতীয় স্বার্থ। দেশচর্য্যা বা জাতীয়-স্বার্থ রক্ষা মানুষের একটা প্রধান ধর্ম্ম।

প্রঃ। স্বজাতীয়-স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে ত অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ জন্মিতে পারে। মানুষমাত্রেই এক ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া ভিন্ন দেশীয় লোককেও আপনার বিবেচনা করা উচিত। সেদিন কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক প্রকাশ করিয়াছেন :—"সকল দেশ সকল জাতিকে গ্রহণ করা এদেশের শাস্ত্র। "অয়ংবন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি শত্রু, ইহা ক্ষুদ্র-চিত্ত লোকের গণনা, উদারচরিত্রের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর লোকই আত্মীয়। অতএব তোমরা বিলাতকে পর ভাবিতে পার না। বিলাতের কথা দূরে থাকুক, কোন দেশ কোন জাতিকে পর ভাবিবার অধিকার নাই।"

উঃ। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া অপর জাতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে কেহ বলে না। পরস্বাপহরণ দ্বারা নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা যেমন প্রত্যেক জীবের পক্ষে মহাপাপ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষেও তাই। অন্যদিকে অপরের অন্যায় আক্রমণ অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সম্যক্ প্রয়াস পাওয়া অধর্ম্ম নয়, পরম ধর্ম্ম, উদাসীন থাকা বরং প্রত্যবায়। ইংরাজের আইনেও বলে, আততায়ীর প্রাণ-নাশ করিলেও তাহা মার্জ্জনীয়। সমগ্র মানব-মণ্ডলী একটা অখণ্ড জিনিস, সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা এক প্রকার শ্রম-বিভাগ-ব্যবস্থা। প্রত্যেক গৃহস্বামী যেমন আপনার পরিবারবর্গের ভার লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, পরিবারের ভরণ-পোষণাদি সারিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তদ্দ্বারা প্রতিবেশী প্রভৃতির সেবা-সাহায্য করিয়া থাকে, তেমনি, জাতীয় উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তারপর, "বসুধৈব কুটুম্বকং" বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল; Father-hood of God and Brother-hood of man" অতি উচ্চ আদর্শের কথা। পরন্তু সংসারের সেরূপ উন্নত অবস্থা এখনও আসে নাই, কখন যে আসিবে, সহজে বিশ্বাস করাও যায় না। ইংরাজীতে যাহাকে "মিলেনিয়ম" বলে, যখন নরাকৃতি জীব-মাত্রেই পরস্পরকে সরল প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবে, মানুষে মানুষে কোন প্রকার ব্যবধান থাকিবে না, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে, সেটা যেন কবির কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

প্রঃ। দেশের বর্ত্তমান দলগুলির সম্বন্ধে কি বলেন?

উঃ। এই দলগুলিকে গোরুর পাল বলিলে ক্ষতি হয় না। রাখাল যখন গোরুর পাল লইয়া পথে যায়, তখন দেখিয়াছ, তাহাকে ক্রমাগত বিপথগামী এটা সেটাকে তাড়াইয়া পালের মধ্যে আনিতে হয়। তেমনি, আমাদের দেশের দলের লোকগুলি, কে কখন্ দল ছাড়িবে, ঠিক নাই। ইহার কারণ আমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান, কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার

করতঃ দশজনে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে জানি না। বেশ দলে আছি, কিন্তু একটু পান থেকে চূণ খসিলেই অর্থাৎ ব্যক্তিগত কোন প্রকার স্বার্থে অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই অমনি দল ছাড়িলাম। আর এক দোষ আমরা সবাই নেতা হইতে চাই, নিজের শক্তির পরিমাণ মোটেই বুঝিতে পারি না। আমাদের আপনার কথাই পাঁচ কাহন, পরের কথায় বড় একটা কাণ দিতে রুচি হয় না; পরের প্রাধান্যের প্রতি ত বিষদৃষ্টি। এ অবস্থায় কাজের দল বাঁধাই কঠিন। জাতীয় স্বার্থ উত্তমরূপে বুঝিয়া তাহার রক্ষা-হেতু এক উদ্দেশ্যে সহস্র দল থাকিলেও লাভ বই ক্ষতি নাই, যেমন পাশ্চাত্য-দেশ-সমূহে আছে—ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে উপায় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উদ্দেশ্যে পার্থক্য নাই; বাহির হইতে উদ্দেশ্য সাধনে কোন রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইলে দলাদলি ভুলিয়া সবাই একপ্রাণ হইয়া তাহা দূর করিতে বুক পাতিয়া চেষ্টা করে। আমাদের দলগুলির উদ্দেশ্য এক নয়, সুতরাং উহাদের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি অসম্ভব। কেহ চা'ন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; কেহ চা'ন ইংরাজের সহিত সামান্য মাত্র সম্পর্ক রাখিয়া "স্বরাজ"; কেহ চা'ন ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের ন্যায় পার্লামেণ্ট স্থাপন; দেশীয় লোকে বড় বড় রাজপদগুলি পাইলে কেহ সন্তুষ্ট, আবার কাহারও মতে যে অবস্থায় আছি, তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট, কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। অবশ্য শেষ দলে চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক আদৌ নাই বলিলেই চলে। "গণ্যমান্যের" মধ্যে দুইএক জনকে মাত্র আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কথা বড় কেউ শুনে না, সামান্যসংখ্যক জন কতক অনভিজ্ঞ লোক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তাঁহাদের উপদেশ পঁহুছেও না, তাঁহাদের যেমন তেমন দুই একখানা কাগজও আছে, তাহাও বেশী লোকে পড়ে না, সুখের বিষয়, ওরূপ খুচরা কাগজের বড় কাটতি নাই; সুতরাং ইঁহাদিগকে গণনার মধ্যে না ধরিলেও, চলে। কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে কপট ভাবে চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করা আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর তথাকথিত সম্ভ্রান্ত লোকের একরূপ স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা আপনাদের শত্রু না হইলে এবম্বিধ দুর্দ্দশা কেন? যাহা হউক, উল্লিখিত রূপ নানা রঙ্গের বহু লোকে অনেক রকম দল বাঁধিয়াছে। কোন দলে দশ হাজার, কোন দলে দশ শত, কোন দলে বা দশজন মাত্র লোক আছে। অবশ্য সকল দলেরই দুই এক জন চাঁই আছেন, দলের লোকগুলি তাঁহাদের গোঁড়া। পরন্তু কোন দলের যে একটা সুদৃঢ় মতবিশ্বাস আছে, যাহার জন্য সে দলের প্রত্যেক লোক কতক পরিমাণে ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারে, এমন বলা কঠিন। প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি তবু মত বিশ্বাস ছাড়িব না, বুক ঠুকিয়া এরূপ না বলিতে পারিলে কোথায় কোন্ কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে? একটু আধটু স্বার্থত্যাগে কি আর আশা করা যাইতে পারে? এইত অবস্থা; তবে এতটুকু দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ভারতে হয়ত এমন দশ জন লোকও পাওয়া যাইত না, যাহারা সমাজের জন্য, দেশের জন্য, ভারতমাতার জন্য ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়া সম্মুখ-সমরে দাঁড়াইতে সক্ষম ও প্রস্তুত; কিন্তু আজ, দশ সহস্র না হউক, এরূপ মাতৃভক্ত এক সহস্র লোক মিলে, যাহারা জীবন মরণের চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করতঃ,

"বন্দেমাতরং" রবে জন্মভূমির কল্যাণের পথে ছুটিতে প্রস্তুত। যদি পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে জাতীয়-সম্বিৎ (১) এতদূর জাগিতে পারে, আশা করা অসঙ্গত নয় যে, পঞ্চাশ বৎসর পরে ভারত আর এ ভারত থাকিবে না। এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন ঐ একটু বিদ্যুতের চমক্ দৃষ্ট হইতেছে।

প্রঃ। যে সকল দলের কথা উল্লিখিত হইল, দেশের প্রত্যেক লোক কি উহার কোন না কোন একদল-ভুক্ত ?

উঃ। হরি! হরি! হরি! তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ আশার কথা ছিল। যদি ভারতের আপামর সাধারণ দেশের দুঃখ-অভাবের বিষয় কিছু না কিছু ভাবে, একদিন সে ভাবনার ফল ফলিবেই। তাহা কোথায়? পূর্ব্বোক্ত দল-সমূহের বাহিরে দেশের ৯৯.৯৯ জন লোক জানিবে। যদিও এই বিপুল সংখ্যক লোক দলবদ্ধ নহেন, তত্রাচ ইঁহাদের এক মত, এক ভাব; হাঁড়ির ভাতের মত একটা টিপিয়া দেখিলে সকল গুলির খবর পাওয়া যায়। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের মত ইঁহাদের স্বস্ব-প্রধান শাখা প্রশাখা নাই, ইঁহারা রোমাণ-কাথলিক সম্প্রদায়ের ন্যায় একমাত্র পোপপ্রভুকে অভ্রান্ত বিশ্বাস করিয়া মুদিত-নেত্রে অবনতমস্তকে জোড়-করে তাঁহার অধীনে চলিয়া থাকেন। ইঁহাদের সেই পোপের নাম ব্যক্তিগত স্বার্থ। তিনিই ইহাদের দলপতি, তিনিই ইঁহাদের নেতা, তিনিই ইঁহাদের পরিচালক। এই জনসংখ্যার মধ্যে না আছেন, এমন জীব নাই;—রেসিডেণ্ট-প্রতাপে ধুক্-ধুক্-প্রাণ, হস্তপদ-বদ্ধ স্বাধীন নরপতি আছেন; ধামাধরা রাজ্যশূন্য রাজা মহারাজা আছেন; জুজুভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত গৃহিণীর অঞ্চলধারী হেঁসেলকোণাশ্রিত বাহাদুর আছেন; রাইয়ত-রক্তে পুষ্টভুঁড়ি জমীদার তালুকদার আছেন, পাকা-ডাঁসা-কাঁচা-থস্‌থ'সে হরেক রকমের সিবিলিয়ান * আছেন; দুরন্ত-স্বভাব সেলাম্‌বাজ হাকিম-আম্‌লা আছেন; গাউন্‌পরা বারিষ্টার-ভাকিল আছেন; শাম্‌লা-মাথায় এটর্ণি-উকীল আছেন, গাছতলার মোক্তার-সোক্তার আছেন, আদালতের পাইক-পেয়াদা আছেন; কাঁটা-কম্পা'সে ওবারসিয়ার-ইঞ্জিনিয়ার আছেন; স্বদেশী-পীড়ক দারোগা-জমাদার আছেন; রেগুলেশন-লাঠিধারী কনষ্টবল-চৌকিদার আছেন; বন্দুকঘাড়ে শিখ-গুর্‌খা-পাঠান সিপাহী আছেন; রেসাল্‌দার-সুবাদার-হাওল্‌দার মিলিটারি আছেন; ছাত্র-রাখাল মাষ্টার-প্রোফেসার আছেন; নানা শ্রেণীর পাস্ করা ভেল্ করা বেকার-পুরুষ আছেন; লেখক, গ্রন্থকার, বিদ্যার্থী আছেন; টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভট্ট আছেন; নানা ধর্ম্মের গুরু পুরোহিত, যাজকপ্রচারকাদি আছেন, খোদারবন্দা মোল্লা মৌলুবি-মুন্সি আছেন; কলমপেষা কেরাণীমুহুরী আছেন; মুদি, বে'নে, দোকানদার, মহাজন আছেন; কৃষি, শিল্পী, ময়রা, শেকরা আছেন; মুচি, মেথর, বাগদি, খেদল আছেন; হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল আছেন; কোল, ভিল, সাঁওতাল আছেন; গারো, কুকি, নাগা, খাসিয়া আছেন; আর কত বলিব? সিকি-পয়সা-পতি হইতে ক্রোর পতি পর্য্যন্ত সব রকম লোকই আছেন। ইঁহাদের বীজমন্ত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুন এবং যথাসম্ভব ভোগ-

(১) National Consciousness.

* বিলাতে পাস্‌করা—পাকা, ভারতে নিযুক্ত ষ্টাটুটারি—ডাঁসা, ডিপুটী, সবজজ হইতে উন্নীত—কাঁচা, শ্বেতাঙ্গের একচেটিয়া পুলিস, শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতির উচ্চপদ-প্রাপ্ত—পচা বা থস্‌থ'সে।

বিলাস ও অর্থ সঞ্চয়। স্ত্রী পুত্র পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতার বাহিরে ইঁহাদের নজর চলে না। যদিচ কেহ কেহ কখন কখন লম্বা চস্‌মা লাগাইয়া এদিক ওদিক তাকান, তাহা কেবল রঙ্গতামাসার জন্য, নতুবা দুনিয়া ডুবিলে ইঁহাদের একহাঁটু জল! যতক্ষণ পর্য্যন্ত উঁহাদের খাশ তনুতে কোন রকম আঁচর না লাগে, ততক্ষণ ইঁহারা বেখাতির বেখেয়াল। যদি কখন হঠাৎ লেজে একটু পা পড়ে, অমনি একবার চমক্ হয়, কিন্তু সে সংজ্ঞাটুকু ক্ষণিক মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কদাচিৎ ভিন্ন মতাবলম্বীর সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন, কিন্তু সেটা কেবল মৌখিক, কারণ ভিতরে ত কোন প্রকার বল নাই। শক্তের প্রতি কপট ভক্তি দেখাইতে ইঁহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত,তদ্বারা যদি দৈবাৎ কোনরূপ স্বার্থ সাধিত হইয়া যায়, এটাও মতলব। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কোন রকম গোলমালে থাকিতে চাহেন না, এমন কি, ঘরের দরজায় খুন হইলেও তাহার খবর রাখেন না।

প্রঃ—এবম্প্রকার জীবগণের কি উপায়ে চেতনা হইতে পারে?

উঃ—অহিফেনবিষে জর্জ্জরিত হইয়া মানুষ যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের চেতনা সম্পাদন জন্য চিকিৎসকেরা যে প্রকার বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, একমাত্র তদ্রূপ উপায়ে এই সকল আত্মবঞ্চক কৃপাপাত্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে:—উপর্য্যুপরি ঘোর দুঃখবিপদের কশাঘাত ভিন্ন আর কিছুতেই উঁহাদিগকে সহানুভূতি সমবেদনা শিক্ষা দিতে পারে না। যাহারা সচ্ছলতা বা প্রচুরতা জন্য সপরিবারে খুব আরামের সহিত কালাতিপাত করিবার অবকাশ পাইয়াছে, সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না, উৎসাহ উদ্যম উত্তেজনার দিক্ দিয়াও যায় না, কলের মত সটান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ঐ সকল কলুর বলদগণ পৃথিবীর ভার স্বরূপ, ঈশ্বরের অন্নজলবায়ু দ্বারা দেহ পোষণ করে মাত্র; সংসারের কোন উপকারে ত আসেই না, উপরন্তু নিজেদের অসদ্ব্যবহারের মন্দ উদাহরণ দ্বারা জনসমাজের সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে।

প্রঃ—যাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়াও দুঃখী বিপন্ন-উৎপীড়িতের সাহায্যার্থ প্রকাশ্যভাবে চেষ্টা করেন, ঐ সকল মহাত্মাদের উদাহরণেও ত তেমনি শুভফল ফলিয়া থাকে।

উঃ—নিশ্চয়! সকলেই জানে, সদুপদেশাপেক্ষা সদৃষ্টান্তের ফল বেশী ও স্থায়ী। উপদেশবাক্য দ্বারা ভাল কাজ করিতে বলিয়া দেওয়া হয় মাত্র; যাহারা ঐরূপ কথার অনুসরণ করে, তাহারা পরের মুখে ঝাল খায়, আর জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া দর্শক নিজে নিজে বিশেষভাবে চিন্তা ও বিচার করতঃ তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। উদাহরণ দেখিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে, নিজের সম্পত্তি হয়। উহার শক্তি বেশী হইবেই, কারণ উহা পরের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা নয়, নিজের প্রতি নিজের হুকুম; উহা তামিল করিতেই হইবে, অমান্য করিবার যো নাই। ভাবিয়া দেখ, পরের মুখে ত্যাগস্বীকার করিবার উপদেশ শুনিয়া যন্ত্রবৎ তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিলাম; কিছুদিন পরে হয়ত ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপরের বাহ্যিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম:—কেন আমি বৃথা ওরূপ করি? কোন ফল ত দেখি না, শুধু নিজকে কষ্ট দিই। ক্রমাগত এইরূপ ভাবনা দ্বারা পদস্খলন সম্ভব। অনেক লোককে এমন বলিতে শুনা যায়,

"ধর্ম্মের পথে চলিয়া ত দেখিলাম, এই লাভ, সংসারে অধর্ম্মেরই জয়; দুষ্ট দুরন্ত লোক কত সুখে কাল কাটাইতেছে।" পরন্তু যাহারা পরার্থপর ব্যক্তির উদারচরিত ও পবিত্র জীবন উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে যে উহারা কিরূপ বিমলানন্দ ভোগ করেন, তাঁহাদের কেমন সন্তুষ্ট-চিত্ত, কি প্রকার সদা-প্রফুল্ল বদন, যেন শান্তির আলয়, স্বর্গের ছবি, তাহারা মনে মনে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণরূপ সাধন আরম্ভ করিলে কখন অসতের চাক্‌-চিক্যময় সম্পদে মুগ্ধ হইয়া বা কুলোকের কথায় ভুলিয়া পথভ্রষ্ট হয় না।

প্রঃ—ভাল; কিন্তু যাঁহারা চারিদিকের অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া পৃথিবীর দুঃখ দারিদ্র্য দলনাদির জন্য কেবল মাত্র নির্জ্জনে নীরবে তপ্তাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, ততোধিক আর কিছু করিবার ক্ষমতা রাখেন না, এব-ম্বিধ দয়ার্দ্র চিত্ত মহানুভব ব্যক্তিগণের এরূপ কার্য্য দ্বারা সংসারের কি কোন উপকার হইয়া থাকে?

উঃ—বিশেষ উপকার হয়। সাধারণ বলে, উহা অক্ষমের কাজ, শুধু বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? পরন্তু ভাবরাজ্যের কার্য্যপ্রণালী অতীব বিচিত্র। অতি সুন্দর কথা তুলিয়াছ, এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রদ। প্রকৃতির নিয়ম এই:—যাহা যত স্থূল তাহার শক্তি তত কম, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরের শক্তি ক্রমেই বেশী হইয়া থাকে। জড়জগতের একটা দৃষ্টান্ত দেখ। এক খণ্ড বরফ পাথরের মত কঠিন, কিন্তু স্থূলতা বশতঃ তাহার শক্তি কম, যেখানে রাখ সেইখানেই পড়িয়া থাকে, চল-চ্ছক্তিরহিত; উহার স্থূলতা হ্রাস হইয়া যখন তরল জলের অবস্থা পায়, তখন উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ নিম্নাভিমুখে গতিশীল হইয়া সম্মুখের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ অগ্রসর হইতে থাকে; আবার ঐ জল যখন বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া সূক্ষ্মতর অবস্থায় পঁহুছে, তখন দেখ কিরূপ তেজের সহিত প্রকাণ্ড রেলগাড়ী সমূহ উড়াইয়া লইয়া যায়; অতঃপর বাষ্প হইতে ইথারের অবস্থায় উত্থিত হইলে উহার কি পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না, নবাবিষ্কার তারহীন বার্ত্তা-বহের (১) কথা ভাবিলে কতক বুঝা যায়। আন্তরিক, বাহিক, দৃশ্য, অদৃশ্য সকল জগতে নৈসর্গিক নিয়মাবলী সমান ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; ইহা অনেকে বুঝিতে পারেন না বলিয়া চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শক্তি-সমূহকে গণনার মধ্যে আনেন না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা স্থূলশক্তি অপেক্ষা অধিক বলবতী। আর একটী কথা ভাবিয়া দেখা উচিত, সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের জন্ম, সুতরাং সূক্ষ্ম প্রবলতর। আগে চিন্তা, পরে কথা ও কাজ, সকল কার্য্যেরই প্রসূতি চিন্তা। তবে কার্য্যকরী হইবার জন্য ভাবের গাম্ভীর্য্য চাই, চিন্তার একাগ্রতা চাই। জল, বাষ্প, ইথারের পক্ষে যে নিয়ম, চিন্তার পক্ষেও তাই, প্রগাঢ়-তানুসারে শক্তি। ভাবিয়া দেখ, সুবিস্তৃত একখণ্ড জলাভূমিতে এখানে খানিকটা, ওখানে খানিকটা, এই ভাবে বহুস্থানে অল্প-বিস্তর জল ছড়াইয়া আছে, উহাতে কোনই কাজ হয় না; যে হেতু জল সমষ্টির শক্তি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু কতক-গুলি ছোট ছোট নালী কাটিয়া সমস্ত জলকে একস্থানে আনিতে পারিলে উহা দ্বারা অনেক

(১) Wireless Telegraphy.

কাজ পাওয়া যায়। তেমনি, বাষ্প ও ইথার ত সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যমান, কিন্তু কতকটা এক জায়গায় বদ্ধ না করিলে উহাদের শক্তি অনুভূত হয় না। চিন্তা সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ. এমন ত শিথিল ভাবে অনেক রকম কথাই ভাবা যায়, তাহাতে কি হইবে? পরন্তু যখন জপ-ধ্যান-ধারণাদির মধ্যে কোন একটা প্রক্রিয়া দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট চিন্তাকে মনোমধ্যে বদ্ধ করা যায়, তখনই তাহার একাগ্রতাপ্রসূত ফল লাভ হইয়া থাকে। সমুদ্রে ভাসিলে রত্ন মিলে না, রত্ন সংগ্রহের জন্য ডুব দিতে হয়। ভাসাভাসা চিন্তাই বল আর কথাই বল, কাজই বল সবই সংসার-সাগরে ভাসিয়া যায়; কোনই ফল দেয় না। ভবের বাজারে সব দোকানেই গভীরতার দাম, তদভাবে কোন জিনিস বিকায় না।—এখন বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিলে যে, স্বর্গীয় সুতীব্র সকরুণ সহানুভূতি-জনিত অপরের দুঃখ বিপদে যাঁহার প্রাণে গভীর সমবেদনা উপস্থিত হয়, তাঁহার তদ্বিষয়ক প্রেমময় চিন্তার একাগ্রতাতে কি প্রকারে সুফল ফলিয়া থাকে। লোকচক্ষুর অগোচরে কি প্রণালীতে উহা কার্য্য করে (১), তাহা বুঝিতে গেলে অদৃশ্যজগতের (২) বিষয়ে কতক জ্ঞানের আবশ্যক। মোটামুটি এখানে এইমাত্র বলিলেই হয়ত যথেষ্ট হইবে যে, "চিন্তাস্রোত" কথাটা নেহাত কবির কল্পনা বা আলঙ্কারিক বাক্য নহে; বাস্তবিকই এক জনের চিন্তা অপরের চিত্তে গিয়া স্রোতের ন্যায় আঘাত করে এবং সুযোগমত কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায়; ঐ স্রোত কতদূর যায় ও কত লোককে ধাক্কা দেয় বা ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা উহার পরিমাণ ও তেজের উপর নির্ভর করে। তারপর বহু লোকের বহু চিন্তার সংহতি দ্বারা একটা প্রকাণ্ড চিন্তাস্রোত (৩) চলিয়া থাকে; তাহা হইতে অনেক চিন্তা অনেকের মাথায় প্রবেশ করে, সাধারণের ধারণা সে গুলি তাহাদের নিজের চিন্তা। এইরূপে অধিকাংশ লোক পরের চিন্তা ধার করিয়া সংসারে চলে; প্রকৃত পক্ষে চিন্তার জন্মদাতা পৃথিবীতে বড়ই কম। একথা শুনিয়া অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, এবং বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, কিন্তু বাস্তবিক ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

প্রঃ—তবে সাধারণ মানুষের কি নিজের চিন্তা নাই?

উঃ—ওরূপ বলিলে নিতান্ত দোষের হয় না, কথাটা সহজে ছুড়িয়া ফেলা যায় না। একপ্রকারে দেখিলে আমাদের প্রতিদিনের সাংসারিক চিন্তাসমূহ নিজেদের বলিয়া মনে হইলেও, সেগুলি, গতানুগতিক প্রণালীতে, পিতামাতা প্রভৃতি পূর্ব্বগত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি, খাশ আমাদের নহে, কেবল দেশকাল পাত্রানুসারে একটু এদিক ওদিক করিয়া লই মাত্র। সাধারণ প্রয়োজনাদি সাধন জন্য যে সকল চিন্তা, তাহাই নিজস্ববোধে লোকে মাথায় স্থান দিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত যেগুলি মনে উদয় হয়, সেগুলিকে ক্ষণমাত্র রাখিয়া বিদায় দেয়। চিন্তাশক্তির অনুশীলন ব্যতীত নিজের চিন্তা জন্মে না। আমাদের মধ্যে কয়জন তাহা করিয়া থাকেন? কাজেই সকলে গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছি ম[illegible] তবে যে দেখা যাইতেছে, ইদানীং অনেকে অনেক রকম উচ্চ কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা জনকতক

(১) *Modus operandi.*

(২) Unseen World.

(৩) Thought-current.

লোকের চিন্তাশক্তির প্রভাবে। কেহ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বক্তৃতাদি দ্বারা, কেহ বা অজ্ঞাতসারে নিভৃতচিন্তার বলে সাধারণ জীবকে তাঁহাদের মতে টানিয়াছেন; তাহারা যে বিশেষ্ বিবেচনা করতঃ কোন প্রকার মত বিশ্বাস গ্রহণ বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে, এমত নহে। মহৎ লোকের উচ্চচিন্তা গ্রহণ করিয়া ভাবনা দ্বারা তাহাতে দ্বিগুণ বল সঞ্চার করতঃ গ্রহীতাগণ নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণকে দিয়া থাকে, তাহারা আবার ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর তাহাদের নীচের লোকদিগের মাথায় প্রাবল্য করায়। এই প্রণালীতে ক্রমান্বয়ে উহা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া কাজ করে। এবিষয়ে কোন উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি যোগনেত্রে প্রত্যক্ষ করতঃ সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

* * * * We are all continually affecting each other by these waves of thought, sent out without definite intent, and what is called public opinion is largely created in this way. Most people think along certain lines, not because they have carefully thought a question out and come to a conclusion, but because large numbers of people are thinking along those lines, and carry others with them. The strong thought of a great thinker goes out into the world of thought, and is caught by receptive and responsive minds. They reproduce his vibrations, and thus strengthen the thought-wave affecting others who would have remained unresponsive to the original undulations. These answering again, give added force to the waves, and they become still stronger, affecting large masses of people.

ইহাতে যে "চিন্তাতরঙ্গ" "কম্পন" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রূপক নয়, বাস্তবিক অতি সূক্ষ্ম হইলেও চিন্তাতরঙ্গকম্পনাদি জলের ঢেউ ও বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূক্ষ্ম জগতের বিষয় কিছু জানা থাকিলে এসব কথা আজগুবী মনে হয় না।

প্রঃ—উক্ত প্রণালীতে যদি ওরূপ কাজ হয়, তাহা হইলে বক্তৃতাদি অপেক্ষা ত উহাই অবলম্বনীয়।

উঃ—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ভারতে যদি আজ দশ জন লোক নির্ম্মলচিত্তে বিধাতার চরণে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা যদি আপনাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া দেশোদ্ধার কল্পে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে পারেন, অন্য কোন কথা মনে স্থান না দিয়া কায়মনোবাক্যে ঐ এক চিন্তাতেই চব্বিশ ঘণ্টা মগ্ন থাকেন, পাহাড় উড়িয়া যায়। দশ জন বলিলাম? পাঁচ জন হইলেও হয়। বক্তৃতা দ্বারা প্রচার কার্য্য যাহা হয়, তাহার ফল তত স্থায়ী নয়, যতক্ষণ বক্তার গণ্ডীর মধ্যে থাকা যায়, ততক্ষণ যেরূপ উৎসাহ থাকে, পরে তাহা থাকে না। বক্তা কেবলমাত্র বীজ ছড়াইয়া যান বৈ ত নয়। তাহার কথায় সেই সকল লোক অনুপ্রাণিত হয়, যাহারা চিন্তার কর্ষণ দ্বারা পূর্ব্ব হইতে মানসক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। নিজের মনের কথা বড়লোকের মুখে শুনিয়া তাহারা বল পায়, আর বাজে লোক কেবল বাহবা দিয়াই গৃহে প্রস্থান করে। তারপর বক্তা যতখানি গভীর চিন্তাশীল ব্যথার ব্যথিত ত্যাগী পুরুষ হইবেন, শ্রোতৃবর্গের উপর ততখানি ফল হইবে। বক্তৃতা করেন, আবার যোগযুক্ত হইয়া নিভৃত চিন্তায় মগ্ন থাকেন, এইরূপ পরার্থপর সংসারসেবক বক্তার দ্বারাই নিরেট কাজ হইয়া থাকে, নচেৎ ফাঁকা বক্তৃতায় কি হইবে? এস্থলে উপরোক্ত মহাজীবের কথা পুনরায় উল্লেখ করি;—

* * * The man of meditation is the man who wastes no time, scatters no energy, misses no opportunity. Such a man governs events, because within him is the power whereof events are only the outer expression; he shares the divine life, and therefore shares the divine power.

এইরূপ যোগযুক্ত মহাপুরুষ ক্রম্‌ওয়েল (১) ছিলেন। তাঁহার একার শক্তিতেই ইংলণ্ডের উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই বাস্তবিক জনসাধারণের নেতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। নেতা যেদিন যোগভ্রষ্ট হইয়া অতি সামান্যমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের গণনা আরম্ভ করিবেন, সেদিন তাঁহার পতন নিশ্চয়। যেমন নেপোলিয়নের ঘটিয়াছিল। আর নেতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ যতক্ষণ কার্য্য করিবেন, ততক্ষণ কাহার সাধ্য তাঁহার কার্য্য নষ্ট করে! গারিবাল্ডি(২) তাহার প্রমাণ।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# গঙ্গাজলে।

(স্বর্গগত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের দেহাবসান উপলক্ষে)

ধর মা জাহ্নবি! আজি বঙ্গের রতন,
　　চিরদিন নিরমল,
　　সু-পবিত্র গঙ্গা-জল,
যে দেহে হয়নি কভু পাপ পরশন;
　　বিশ্বই যাঁহার গেহ,
　　সর্ব্ব-ভূতে সম স্নেহ,
সবারি কল্যাণে রত, তুমি মা যেমন,
রাখ ও পবিত্র-কোলে পবিত্র রতন।

২

বিধির মানস-সুত উরিলা জগতে,
　　বলিব কি হরি! হরি!
　　আদর্শ জীবন ধরি,
দেখাইলা স্বর্গালোক মানবে মরতে;
　　ধর্ম্মেতে উৎসর্গ-প্রাণ,
　　ভক্তিমান, প্রীতিমান,
আত্ম-জয়ী, চির-জয়ী এ দুর্গম পথে,
বিধির মানস-সুত উরিলা জগতে!

অবলা নারীর বল, সাহস, সহায়,
　　স্নেহময় পিতৃ-বেশে,
　　কতই আয়াস ক্লেশে,
নারীর উন্নতি হেতু খাটিলা ধরায়;
　　কিসে লভি জ্ঞান ধর্ম্ম,
　　করিবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
আর্য্য-বালা-সমা কিসে হবে পুনরায়,
এই চিন্তা, এই চেষ্টা, এই "মাতৃদায়

কিসে হবে বঙ্গ-যুবা ধার্ম্মিক সুজন,
　　বাঙ্গালী "অধম" ভবে,
　　কেমনে মানুষ হবে,
স্বদেশের দুঃখ কিসে হবে বিমোচন,
　　নির্ম্মল কলঙ্কহীন,
　　কিসে রবে চিরদিন,
সু-মহত্ত্বে মনুষ্যত্বে ভরি যাবে মন,

(১) Oliver Cromwell, the Protector of England.

(২) Garibaldi, the Emancipator of Italy.

সদুপায় চিন্তি মনে,
মিলি প্রিয় বন্ধুগণে,
সে "সিটি কলেজ" আহা করিলা স্থাপন
লভিল বাঙ্গালী কত নবীন জীবন !

৫

সংসারের গলগ্রহ কালা-বোবাগণে,
বাক্-শক্তি দিলা শিক্ষা,
বিভু নামে দিলা দীক্ষা,
অদ্ভূত আনন্দ তারা লভিছে জীবনে ;
সর্ব্বত্র মঙ্গল কার্য্যে,
বিশাল ভারত-রাজ্যে,
খাটিলা সহস্র করে সদা প্রাণপণে ;
সহসা সে কর্ম্মযোগী বঙ্গের রতনে।

৬

আমরা সর্ব্বস্ব হারা ঘরে ফিরে যাই—
কি করিব ঘর বাড়ী,
এ হেন স্বজনে ছাড়ি,
কি দেখিব কি শিখিব কি করিব ছাই !
দেশের অমূল্য রত্ন,
ক'র মা, আদর যত্ন,
পরশে পবিত্রা তুমি, মনে রেখ তাই,
অভাগা অভাগী মোরা শূন্য প্রাণে যাই !

৭

এ হেন সুহৃদ্, পিতা, ভাগ্যে ঘটে কার,
সু-চরিত্রে অদ্বিতীয়,
গুণে রাজ-পূজনীয়,
নিষ্কলঙ্ক, কর্ম্ম-যোগী, সরল উদার ;
সাধক নিষ্কাম ধর্ম্মে,
নিরত নিঃস্বার্থ কর্ম্মে,
ভক্তিমান, প্রীতিমান, দেব-অবতার,
যে পায় এমন পিতা কি সৌভাগ্য তার !

৮

সিত-অষ্টমীর নিশা তিমির বসনা,
ডুবিয়াছে চন্দ্র তারা নিবেছে জ্যোছনা ;
দেব-বালা সারি সারি,
ঢালিছে নয়ন-বারি,
হেরি মূরছিতা বঙ্গে, বিষম বেদনা !
আঁধার আকাশ ধরা,
মহা হাহাকার ভরা,
করাল দানব যেন করে আনাগোনা ?
হৃদয় করিয়া শূন্য,
দেশের মঙ্গল পুণ্য,
ডুবাইনু গঙ্গা-জলে, উহু কি যাতনা !
অভাগা অভাগী মোরা কি পাব সান্ত্বনা !

৯

যাই তবে যাই দেব ! ভকত-বৎসল !
(ফোটে না মনের ভাষা)
সাহস, ভরসা, আশা,
দুঃখে জুড়া'বার ঠাঁই, দারিদ্র্যে সম্বল,
সকলি তোমার সাথে,
রহিল জাহ্নবী মা'তে,
ফিরে যাই লয়ে শুধু নয়নের জল ?
তুমি পিতঃ ! দেব-বেশে
চলি গেছ দেব-দেশে,
আমরা অনাথ হায়, শূন্য ধরাতল !
ফিরে যাই শূন্য-বুকে, কাঁদিতে কেবল।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

## পাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মার নাম বিরাজমান রহিয়াছে, আমরা সর্ব্ব প্রথমেই, সেই পরমারাধ্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর শ্রীচরণকমলে যাষ্টাঙ্গে কোটী কোটী প্রণিপাত করিতেছি।

"ভক্তিরসের মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার।"
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেম-পূর।
ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যতির মুকুট-মণি মাধবেন্দ্রপুরী।
এ বৃক্ষের মূল তিনি, আগ্রে অবিতরি॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেম ভক্তিরসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥
ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্ব রস-প্রয়োজক॥
ভক্তমাল গ্রন্থ।

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তি পথে যে প্রথম অবতরি॥
বৈষ্ণব-বন্দনা।

ভক্তিকল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর প্রেমের-আদি সূত্রধর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর ভক্তিবিহ্বল জীবনের অনেক কথাই আমাদের মনোবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। অন্ততঃ যেমন করিয়া বলিলে ঠিক বলা হয়, তেমন করিয়া বলা যায় না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বর্ণন করিতে করিতে ভাবাবেশে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহার সম্যক বর্ণনা করিয়া করিয়া উঠিতে পারেন নাই—

মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ॥

তাহা আজ আমরা এই বিজ্ঞান-বিশুষ্ক হীন-মস্তিকে কি প্রকারে ধারণা করিব ? আর কি প্রকারেইবা বর্ণনা করিব ?

শকাব্দীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, কোন এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি পুরী গোস্বামীর রচিত যে বাঙ্গালা পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই বঙ্গদেশের কোন স্থানই তাহার জন্মভূমি রূপে ধন্য হইয়াছিল, বলিয়াই অনুমান হয়। অধুনা রচিত "বৈষ্ণবাচার দর্পণ" নামক একখানা গ্রন্থে বর্ণিত—

রাধিকার-মহামন্ত্র মন্ত্রচিন্তামণি।
প্রেমময় প্রেমপ্রদ নাম আহ্লাদিনী॥
সন্ধিনী সম্বিৎ রূপ চৈতন্য সঙ্গেতে।
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর দেখি সেই মতে॥
মন্ত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী পূর্ব্বকালে হন।
এবে মাধবেন্দ্রপুরী কহিল কারণ॥

পুরী গোস্বামীর এই অভ্যন্তরীণ পরিচয়টুক ভিন্ন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথম জীবনের কোন কথা প্রাচীন গ্রন্থ পত্রে আমরা কিছুই পাই নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন—

"যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখা সূত্র ত্যাগ।"
"সে সব মহান্ত ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্য রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে।"

তাহাতে বোধ হয় জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সংসার-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে প্রৌঢ় বয়সে মাধ্বী সম্প্রদায়ী শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতিপুরীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ভাগ্যবান্ লক্ষ্মীপতিপুরী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরও মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা।
যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী এই সীমা॥
* * * * * *
লক্ষ্মীপতি স্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ।
বাড়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ॥

পাঠকগণের সবিস্তর অবগতার্থে শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও ভক্তিরত্নাকর হইতে

মাধ্বীসম্প্রদায়ীগণের একটী ধারা এ স্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং॥
শুকো ব্যাসস্তশিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
তস্য শিষ্যাঃ অশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ॥
ব্যাসাল্লব্ধ কৃষ্ণদীক্ষো মধ্যাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া।
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধু স্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্র স্তস্য সেবকঃ॥
জয়ধর্ম্মো মুনি স্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্যশিষ্যোঽভূৎব্রাহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং॥
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতি স্তস্য শিষ্যো ভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীত প্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফল ধারিণঃ॥

*    *    *    *    *

সর্ব্বাদিক পরব্যোম নাথ নারায়ণ।
তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের ভূষণ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীনারদ মুনি প্রেমময়।
শ্রীশুকের গুরু ব্যাস, তাঁর শিষ্য হয়॥
হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার।
নিজ নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার॥
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা চলিল।
শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল॥
তাঁর শিষ্য নরহরি, শ্রীমাধব তাঁর।
শ্রীঅক্ষোভ তাঁর শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার॥
জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য, তাঁর জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁর শিষ্য মহানিধি দীন হীন বন্ধু॥
তাঁর বিদ্যানিথি, তাঁর রাজেন্দ্র বিদিত।
জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত॥
ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥
জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্যের শুদ্ধরীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত॥
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেঁহো।
বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা গ্রন্থ যেঁহো॥
তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয়॥

শ্রীপাদমাধবেন্দ্রের শিষ্যত্ব ও কৃপালাভ করিয়া তখন যে সকল মহাত্মারা অশেষ প্রকারে কৃতার্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, রঙ্গপুরী, অদ্বৈতাচার্য্য, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মাত্র কয়েক জনের নাম গ্রন্থপত্রে বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইলেও তখনকার ভক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধে মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। মাধবেন্দ্রশিষ্য শ্রীপাদঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরী-গোস্বামীর এই সম্মান ও গৌরব আরও বিশেষ রূপে সম্বর্দ্ধিত করেন।

যখন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া দেশের মধ্যে প্রেম ভক্তির এক মহা প্লাবন উপস্থিত করেন, তখন ভারতবর্ষে যে কেমন একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যবনাধিকৃত পরাধীন ভারতে তখন ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের কিছু কাল পূর্ব্বে, পুরী গোস্বামী যখন প্রচার ক্ষেত্রে, তখনকার অবস্থার একটু বর্ণনা এখানে

বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবিগুরু শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিলাপের করুণ কণ্ঠে তৎসাময়িক দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
বিষ্ণুভক্তি শূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন করেন কি কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরম রঙ্গে করি হরি ধ্বনি॥
কখন বা হেন সে আনন্দ মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখন বা বিরহেতে করেন রোদন।
গঙ্গা ধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দরসে ক্ষণে হয় দিগ-বাস॥
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥
কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংস দানব ভূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণু-মায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমো-গুণে॥'
লোক দেখি দুঃখ ভাবি শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধে সম্ভাষা যারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে নারায়ণ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥
জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী খ্যাতি যার।
কার মুখে নাহি দাস্য মহিমা প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি॥
লোক মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও বৈষ্ণব নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ সকল লোক মধ্য হৈতে।
বনে যাই, লোক যেন না পাই দেখিতে॥
এথে বন ভাল এ সকল লোক হৈতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥
এই মত মনদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে॥
বিষ্ণ-ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈত সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥

দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব লক্ষণ।
প্রণাম করিয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ॥
মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
অন্যান্যে কৃষ্ণ-কথা রসে দুই জন।
আপনার দেহকারে না হয় স্মরণ॥
মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিল গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন॥

সম্ভবতঃ এই সময়েই পুরী-গোস্বামী একবার নবদ্বীপ-ধামে আগমন করিয়া, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনার প্রায় ৩০ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করেন, তখন পাণ্ডুপুরে শ্রীপাদ রঙ্গপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় কথা প্রসঙ্গে পুরী গোস্বামীর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। যথা চরিতামৃতে—

তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র-গৃহে বসিয়াছেন, দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড পরণাম।
পুলকাশ্রু, কম্প, সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোঁসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমের গন্ধ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাই কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন॥
ক্ষণেক আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপের নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী॥
জগন্নাথ-মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্র-সম স্নেহ করায় সন্ন্যাসী-ভোজনে॥
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি-প্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥

মাধবেন্দ্র লোকালয়ে বড় অবস্থান করিতেন না। অধিকাংশ সময় "গ্রাম্য বার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ-হীন" হইয়া বৃন্দাবনের কোন নিভৃতকুঞ্জে তাঁহার প্রাণারাধ্য শ্রীবৃন্দাবন-বিহারির ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে যদিও সময় সময় এদিক ওদিক যাইতেন, কিন্তু প্রায় বন-পথেই চলিতেন। একবার তীর্থ-পর্য্যটন সময়ে প্রতীচী-তীর্থের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সন্দর্শন হইয়াছিল। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

হেথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায়।
তীর্থ পর্য্যটন করে উল্লাস হিয়ায়॥
কতদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হৈল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে॥
যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে।
তাহাকে বর্ণিবে; যে দেখিল সেই জানে॥

প্রেমবিহ্বল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র সম্মিলনে তখন যে আনন্দের প্রস্রবণ খুলিয়াছিল, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আছে—

এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে বন।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইল মিলন॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণ-রস বিনা আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিকার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া আপন পাসরি॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছে বার বার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহার দর্শনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরীপুরী আদি শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য দৃষ্টি দুই জন।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
বালুগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে॥
প্রেম-নদী বহে দুই জনের নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, প্রেমের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥

নিত্যানন্দ কহে যত তীর্থ করিলাম।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাম॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥
মাধবেন্দ্র পুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেমজলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হইতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
ঈশ্বর-পুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেম কাহার শরীরে না দেখেন॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বনে সবে ভ্রমেণ দেখিয়া॥
অন্যান্য সে সব দুঃখের হইল নাশ।
অন্যান্য দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ॥
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ কথা পরানন্দ রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণ-প্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ত্ব রসে।
কতকাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥

জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥
এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি ॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥
এই মত অন্যান্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি ॥
কতদিন মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে ॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে সে কি বিরহে প্রাণ রহে ॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

# পাটের চাষ।

বাঙ্গালায় ধান চাউলের দর দিন দিন যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছে। পাটের চাষ যে ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ দূর হইয়াছে। বঙ্গবাসী-সম্পাদক এ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন তুলিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে পাটের চাষ ও ধান চাউলের রপ্তানি বন্ধ করার জন্য সকলকেই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালার অধিকাংশ সম্পাদকই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।' আমরা সাধরণের অবগতির জন্য প্রধান প্রধান পত্রিকার মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, আন্দোলন করা সত্ত্বেও পাটের চাষ বাড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি সতেরটী জেলা হইতে এবৎসরের (১৯০৭) পাটের চাষের বিবরণ আসিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় সকলেই বুঝিতে পারিবেন, পাটের চাষ কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে এই অবস্থা—অন্য দিকে ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ, বাঙ্গালার অনেক গৃহে দুবেলা আহার জুটিতেছে না। কে ইহার প্রতিবিধান করিবে?

| জেলার নাম | গত বৎসর | বর্ত্তমান বৎসর |
|---|---|---|
| হুগলী | ৪২২০০একর | ৭১২৮৯একর |
| মালদহ | ৩২৭০০ | ৪৫০০০ |
| ভাগলপুর | ৪৭০০ | ৫২০০ |
| ময়মনসিংহ | ৮২২১০০ | ৮০১০০০ |
| রঙ্গপুর | ৩৮৮০০০ | ৪৫৫৮০০ |
| ঢাকা | ২৯৫০০০ | ৩১২০০০ |
| বগুড়া | ১১৮০০০ | ২০০০০০ |
| নোয়াখালী | ১০৪০০ | ১৪৬০০ |
| দরং | ৮৭ | ৫৮২ |
| পাবনা | ১৭৬৪৫০ | ১৫৪২৯৪ |
| দিনাজপুর | ১৩০০০০ | ১৪৩০০০ |
| জলপাইগুড়ী | ১০৮০০০ | ১২৫৫০০ |
| ফরিদপুর | ১১৭০০০ | ১২৫০০০ |
| রাজসাহী | ১০৬০০০ | ১১২০০০ |
| বাখরগঞ্জ | ২৫০০০ | ৩৫০০০ |
| দারজিলিং | ৩০০০ | ৩৯৭১ |
| নওগা | ৩০০ | ১০২৫ |

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ২৫৮৫২৪ একর বেশী আবাদ হইয়াছে।

বঙ্গবাসী—(৪ঠা ফাল্গুন,১৩১৩, বড় প্রবন্ধ হইতে) "আট টাকা মণ চাউলের দর ধার্য্যই রহিল। যদি কমে—দুই চারি আনা এদিক ওদিক কম্‌তি বাড়্‌তি হইবে। পূর্ব্বের মত পাঁচ টাকা মণ চাউলের দর সহজে হইবে না। কারণ ৩টী (১) বাঙ্গালার ধানের আবাদ একেবারে অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। পাটের চাষ খুব বাড়িয়াছে। এত বাড়িয়াছে যে, বাঙ্গালায় সাত কোটি নরনারীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত ধান চাষ হয় না। এমন কি, চাষারাও এখন ধান কিনিয়া খাইতেছে।"

বঙ্গবাসী—(১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৩) "বঙ্গে পাট চাষ বৎসর বৎসর বাড়িয়া উঠিতেছে। ফলে—ধান চাষ কমিয়া আসিতেছে।"

বঙ্গবাসী—(২৫শে ফাল্গুন, ১৩১৩, বড় প্রবন্ধ হইতে)—"আমরা বলিয়াছি, দেশ হইতে পাটের চাষ কমাইতে হইবে।"

হিতবাদী—(১১ই মাঘ ১৩১৩)"পাট চাষে সর্ব্বনাশ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বসুমতী—(১৯শে মাঘ ১৩১৩) "পাট আছে, বাণ ভেণ্ডী আসিতেছে। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। ধান যায়, তাহার উপায় ?"

বসুমতী—(১১ই শ্রাবণ ১৩১৩)—"পাট ক্রমে বাঙ্গালার অনেক ভূমি অধিকার করিতেছে। এই পাটের ব্যবসায়ে অনেক লাভ, তাই কৃষক পাটের চাষে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। এই সর্ব্বনাশী পাট চাষের পরিণাম কি, তাহা চিন্তনীয়।"

সঞ্জীবনী—(২৬শে আষাঢ়, ১৩১৩।)

"এ বৎসর যত জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে, কয়েক জেলা সম্বন্ধে তাহার বিবরণী প্রকাশ হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত হইল।

| জেলার নাম | মোট আবাদী ভূমির পরিমাণ (একর)। | পাটের আবাদ। সালে। | ১৯০৭ সালে। |
|---|---|---|---|
| বাখরগঞ্জ | | ২৫,০০০ | ২৫,৫০০ |
| | | ১,১৭,০০০ | ১,২৫,০০০ |
| পাবনা। | | ১,৭৬,৫০০ | ১,৫৪,০০০ |
| দিনাজপুর। | ১৪,৮৪,০ | ১,৩০,০০০ | ১,৪৩,০০০ |
| রাজসাহী। | ১২,৭০ | ১,০৬,০০০ | ১,১২,০০০ |
| জলপাইগুড়ী। | ৯,২৮,০ | ১,০৮,০০০ | ১,২৫,০০০ |
| মালদহ। | | ৩১,০০০ | ৪৫,০০০ |
| হুগলী। | ৪,৪৬,০ | ৪২,০০০ | ৭১,০০০ |

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর যে পাট দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, তাহার লোভে অনেক জেলায়ই পাটের চাষ বাড়িয়াছে, আর দুই এক জেলায় চাষের পরিমাণ কমিয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি যে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও পাটের চাষ হয় না ; হইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ পাটের চাষের জন্য অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত আবশ্যক। যদি বাঙ্গালা দেশের কৃষকদের একতা থাকিত, এবং তাহারা অল্প পরিমাণে পাট চাষ করিত, তাহা হইলে পাটের মূল্য এত বাড়িত যে, অল্প জমীতে পাট চাষ করিয়াও অধিক জমীতে চাষের সমান লাভবান্ হইতে পারিত। শিক্ষিত ভদ্র সমাজেই যখন একতা নাই, তখন বাঙ্গালার ন্যায় সু-

বিস্তীর্ণ দেশে অশিক্ষিত সমাজে একতার সম্ভাবনা অতি অল্প। বহু মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া দুর্মূল্যে ব্রহ্মের চাউল ক্রয় করিলে বালাম ছাড়িয়া মগের চাউল উদরসাৎ করা ভিন্ন আর অন্য কোন লাভ নাই।

আমরা যে তালিকা প্রকাশ করিলাম, তাহাতে দেখা যায় যে, বাখরগঞ্জে আবাদ-যোগ্য জমীর আট ভাগের এক ভাগমাত্র পাটের চাষ হয়। কিন্তু ফরিদপুরে ৯ ভাগের এক ভাগে, পাবনায় ৫ ভাগের এক ভাগে, দিনাজপুরে ১৪ ভাগের এক ভাগে, রাজসাহীতে ১২ ভাগের এক ভাগে, জলপাই-গুড়ীতে ৯ ভাগের এক ভাগে এবং হুগলী জেলা ১০ভাগের এক ভাগে পাটের চাষ হইয়া থাকে।"

হাবড়া-হিতৈষী—(২১শে আষাঢ়, ১৩১৪) "পাট চাষে সর্ব্বনাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য :— "পাটের চাষের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিহত করিতে না পারিলে এ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, পানীয় রক্ষা, সংক্রামক রোগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছিলাম, পাট চাষেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে।"

সময়—(১০ই শ্রাবণ, ১৩১৪) "পাট চাষের লাভ ও ক্ষতি-পরিমাণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। "উপ-রোক্ত ৩টী সাধারণ ক্ষতি। ইহা ভিন্ন গোচ-রণ ভূমিতে পাট, কাজেই গো প্রতিপালন করা কঠিন হইয়াছে। তরকারির জমীতে পাট, আউস জমীতে পাট, যে দিকে একটু উচ্চ জমি দেখিবেন, এবং উৎকৃষ্ট ধানী-জমী দেখিবেন, সকল জমীতেই পাট। এই পাট ক্রমে বঙ্গদেশের কৃষকদিগকে এবং তাহার গ্রামস্থ জনসাধারণকে সর্ব্ব প্রকার লোপাট করিতে বসিয়াছে।"

নীহার। ৩রা আষাঢ় ১৩১৪) "পাট চাষে সর্ব্বনাশ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"অনভিজ্ঞ কৃষকেরা ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নগদ টাকা লাভের প্রত্যাসায় আউস ও বোরো ধান্য এবং কলাই আদি আহার্য্য-শস্যের জমীতে সেই সকল ফসলের আবাদ বন্ধ করিয়া পাট চাষে প্রবৃত্ত হওয়ায় ক্রমেই অধিকাংশ জমী পাট ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে কৃষক-দের গৃহে যেরূপ অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে, অন্যদিকে তদ্রূপ পাট পচা দূষিত জলের দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য নিতান্তই শোচনীয় হইয়া উঠি-য়াছে। ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া রোগে লোকে ক্রমেই অধিকতর সংক্রামিত হইতেছে। পাট পচা দূষিত জলের গ্যাসেই ম্যালেরিয়া বীজ উৎপন্ন হয় এবং ঐ গ্যাসে বায়ু দূষিত হইয়া লোকের নানাবিধ উৎকট পীড়া উদ্ভব করায়।

বিদেশী বণিকেরা এ দেশ হইতে পাট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া সেই পাটে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া, পুনরায় ১০।১২ গুণ লাভে তাহা এ দেশে ফেরৎ পাঠাইয়া শূন্যে শূন্যে প্রচুর লাভমান হয়। সুতরাং পাট চাষের দ্বারা দেশের কোনরূপ উপকার না হইয়া বরং প্রচুর অপ-কার হইতেছে। যদি স্বদেশোৎপন্ন পাট দেশে থাকিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইত এবং তাহা বিদেশে রপ্তনী হইত, তাহা হইলেও লাভের অনেকটা আশা ছিল। তা না হইলে যখন বিদেশীদের জন্য পাট চাষ হইতেছে, তখন ইহাতে আমাদের অণুমাত্রই লাভ নাই। চাষীরা টাকার লোভে পড়িয়া যদি আহার্য্য শস্যের চাষ বন্ধ করিয়া পাট চাষ করে, তাহা হইলে তাহারা প্রাণ বাঁচা-

হবে কি খাইয়া? টাকা খাইয়া কেহ কখনও প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। গৃহের গোলা ধান্য বোঝাই থাকিলে টাকার জন্য তাহাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

পাটের আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী বণিকদের ব্যবসা বাড়িয়া যাইতেছে। গত ১৯০৬ সালে এদেশে ৯,৮৪১ খানা চটবোনা কল চলিত; এখন সেই স্থানে ২৩৮৮৪ খানা তাঁত চলিতেছে। দশ বৎসরে তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার সঙ্গে পাটের দরও যে না বাড়িয়াছে, এরূপ নহে; পূর্ব্বের ৪৬ টাকার পাট গাঁইটের মূল্য এখন ৭০।৮০ টাকা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ কিছুই লাভ নাই।

সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, সমগ্র অখণ্ড বঙ্গে ৩১৪৪৬০০ একর জমীতে পাট চাষ হইয়া থাকে। আমাদের এই মেদিনীপুর জেলায় পাট-চাষের পরিমাণ কম নহে, এই জেলায় ১০৫০০ একর জমীতে পাট হয়। শুধু পাটের জন্য যদি প্রতিবৎসর এত অধিক পরিমাণ জমী আবদ্ধ থাকে, তবে লোকের অন্নাভাব ঘটিবে না কেন? এই পাট চাষের আধিক্যেই দেশে খাদ্য শস্যের অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এখন চারিদিকেই অন্নাভাবের দারুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। এ দুঃসময়ে যাহাতে দেশে প্রচুর আহার্য্য শস্য উৎপন্ন হয় ও দেশে তাহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকিতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত। পাট-চাষের সময় আসিয়াছে, সকলেরই এখন পাটের চাষ বন্ধ করিয়া তাহাতে আউস কিম্বা বোরো ধান্য অথবা বীরি, অরহর আদি খাদ্য শস্যের আবাদ করা একান্তই কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববঙ্গে এ সম্বন্ধে যে গ্রাম্য-গীতি প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট হইত, যথা—

পাটে লোপাট করলে বাংলা দেশ।
লোকের নাইকো বিবেচনার লেশ।
ধানের চাষে নাইকো তেমন মন,
পাটের চাষে আস্‌বে টাকা লোভটা বিলক্ষণ;
কিন্তু টাকা খেয়ে পেট ভরেনা, ভাইরে—
ভেব দেখ সবিশেষ!
যে জমীতে ফলত প্রচুর ধান,
গরুর খাদ্য বিচালি, আর ধানে বাঁচত প্রাণ;
এখন সেই জমীতে পাট বুনেছে, ভাইরে—
তাই মানুষ গরুর এত ক্লেশ!
পাট বেচে যে টাকা গুলি পায়,
ছাতা জুতা এনামেলের বাসন কিন্‌তেই যায়;
কিন্তু ঘরেতে ভাত নাইকো কারো ভাইরে—
কেউ ভাবে না কি হবে, শেষ!
পাট-পচা জল বিষের সমান ভাই,
খেলে ছুঁলে রোগে ধরে, গন্ধ শুঁকতেও নাই;
এখন বাংলা যুড়ে পাট পচা জল ভাইরে—
সবাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছ বেশ!"

বঙ্গভূমি—(৭ই শ্রাবণ, ১৩১৪, বড় প্রবন্ধ হইতে) "বাস্তবিক কৃষকগণ পাটের জমীতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, যদি এই পরিশ্রম সহকারে ধানের চাষ করিত, অথবা খাদ্য উপযোগী অন্য প্রকারের শস্য উৎপাদন করিত, তবে পাট অপেক্ষায় যে দ্বিগুণ লাভবান হইত, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের পক্ষে লভ্যাংশ কম দাঁড়াইলেও যাহারা পাটের ব্যবসা করে, অথবা সাহেবদের আফিসে চাকুরী করে, তাহারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। পাটের ব্যবসাতে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাহা ঠিক; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহা অতি সামান্য, বণিকদিগের উদর পূর্ণ হইয়া পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট তণ্ডুল-কণার ন্যায় বাঙ্গালী

বাবুরা যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পাটের চাষে পূর্ব্ববঙ্গে কেবল যে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়াছে, তাহা নয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দারুণ সংক্রামক রোগেরও অত্যধিক পরিমাণে স্থায়ী সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ পাট কাটিয়া খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি পচাইতে হয়, পাট-পচা দুর্গন্ধে নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়ার পশার বৃদ্ধি করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর সেই দুর্গন্ধযুক্ত জল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পানীয় জলের সহিত মিশিয়া যায়, তাহাতে ঠিক ঐ সময়ই কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সেই জন্য যে কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঔষধের আবিষ্কার-কর্ত্তাদের বংশাবলীর পোষণ কল্পে কৃষকের প্রাণসম অর্থরাশি জীবনের মায়ায় দায়ে পড়িয়া ডাক্তারগণের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়, ইহা কি কম আক্ষেপের কথা। যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখি, যেন সেই পাট-রাক্ষসী করাল মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান না করিলে অচিরকাল মধ্যেই আমাদের স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত হইবে।"

চিন্তা। (বৈশাখ—১৩১৪)"সেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একদিন রেলপথে ঘুরিয়া আসিয়া দেখুন—পাটের চারায় কেমন করিয়া আশু ধান্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।"

ইহা ভিন্ন মফঃস্বলের প্রায় সমস্ত পত্রিকা এক বাক্যে পাট-চাষের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পাট-চাষে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না। দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে পাট চাষ বন্ধ করার জন্য সমিতি-সংস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; নচেৎ দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া কিছুতেই কমিবে না। নিত্য-দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিতে পারে, এরূপ অর্থ বা শক্তি কাহার আছে? এ বৎসর ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাইতেছি। যাহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে, তাহার উপায়বিধান করা প্রতি হিতৈষীর একান্ত কর্ত্তব্য।

## বস্তু ও অ-বস্তু। (৩)

জড় বিবর্ত্তন। ইথার ও বস্তুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। বস্তুকণিকা। বস্তুর উদ্ভব ও লয়। অনন্তচক্র।

এতক্ষণে অবশ্যই বুঝা গিয়াছে যে, আমরা যাহাকে অবস্তু বলিতেছি, তাহা আর কিছুই নহে, শক্তি। শক্তিই জগতে একমাত্র সত্তা, বস্তু তাহারই বিকাশ মাত্র। কিন্তু শক্তি কি হঠাৎ-ই বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে? না ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুর আকার ধারণ করিয়াছে? জীব-জগতে এক্ষণে বিবর্ত্তন-বাদ স্বীকৃত হইতেছে। জড়-জগতও কি বিবর্ত্তন-বাদের অধীন? আমরা দেখিয়াছি, জীব ও জড়ে মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই (১)। সুতরাং যাহাকে সচরাচর জড়-জগৎ বলা হয়, তাহাতেও বিবর্ত্তনবাদের প্রয়োজ্যতা স্বীকার করিতে বাধা কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু

(১) The modern conception of matter tends to make the whole world alive. J. A. Thomson.

প্রকৃত পক্ষে ঐ মত এ স্থলেও প্রযোজ্য কিনা, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সমস্ত বস্তু-পদার্থই অণু সমষ্টি মাত্র। অণু, পরমাণুসমষ্টি। পরমাণুও বহুসংখ্যক পরংপরমাণুতে গঠিত। বস্তুর এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃত পক্ষে তড়িতেরই অংশ। বস্তুপদার্থ তড়িদণুরই সমষ্টি। তড়িদণু দ্বিবিধ, কিন্তু মূলে এক। উহা সেই সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারেরই ভাবান্তর মাত্র। ইথার মধ্যে স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াই তড়িৎরূপে এবং বস্তুরূপে প্রকাশ হয়। এই ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত্তের বেগাধিক্যে তড়িতের বিকাশ; এবং বেগ-মান্দ্যে বস্তু-পদার্থ (১)। আবর্ত্তের বেগাধিক্য বশত তড়িতের ন্যায় অনুভূতি উৎপন্ন হয়; এবং তাহার বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে বস্তু পদার্থের ন্যায় অনুভূতি জাত হয়। তড়িদণু ও বস্তুর অণু মধ্যে প্রধান প্রভেদ বেগের পার্থক্যে, এবং অণুদ্বয়ের গঠন প্রণালীতে। এই গঠন প্রণালী কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, বস্তু পরমাণু সমষ্টি। পরমাণু তড়িদণু মাত্র। তড়িদণু ইথারীয় ঘূর্ণাবর্ত্ত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বস্তু পদার্থ ইথারেরই বিকাশ। ইথার কি, তাহা বুঝা যায় নাই; কিন্তু উহা বস্তু নহে। বস্তু উহা হইতে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে; উহা বস্তু নহে, অ-বস্তু। বস্তুর একমাত্র লক্ষণ উহার গুরুত্ব, অর্থাৎ ওজন। উহার রূপ ও অবস্থা কিছুই নহে; কেবল ওজনই স্থিরধর্ম্ম। ইহাই বস্তু-বাদিগণের মত-সম্মত। যাহা কঠিন, তাহা তরল হইতেছে, যাহা তরল, তাহা বায়বা হইতেছে। যাহা গোলাকার, তাহা লম্বা হইতেছে; যাহা লম্বা, তাহা ত্রিভুজরূপ গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং রূপ এবং অবস্থার কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বস্তুর ওজন অপরিবর্ত্তিত থাকে। ওজন অর্থাৎ গুরুত্বই এক মাত্র স্থির বস্তু-ধর্ম্ম, কিন্তু উহা ইথারের নাই। পণ্ডিতগণ যে সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারের কল্পনা করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিতেছেন না; অথচ এই গুরুত্বহীন সত্তাতে সমধিক ঘনত্ব আরোপ না করিয়া উপায় নাই! রৌপ্য স্বর্ণ ইত্যাদি হইতে ইহাকে অধিকতর ঘন বিবেচনা করিতে হইতেছে। যাহা গুরুত্বহীন, তাহাই আবার এত ঘন! কিন্তু এত ঘনত্ব সত্ত্বেও চন্দ্র সূর্য্য হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলই তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিছে, কোন বাধা নাই!! গুরুত্ব নাই, কিন্তু ঘনত্ব আছে; আবার ঘনত্ব থাকা সত্ত্বেও বাধকত্ব নাই!!! এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তুধর্ম্ম সকলের আরোপ করিতে হয় বলিয়াই ইথারকে বস্তু বলা যাইতে পারে না। যদি ইথার হইতে বস্তু-পদার্থ জাত হইয়া থাকে, তবে অ-বস্তু হইতেই বস্তু জাত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু হঠাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি ক্রমশঃ এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই মাঝামাঝি অবস্থার কোন না কোন সত্তা জগতে বিদ্যমান আছে; যাহা সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুও নহে, এবং সম্পূর্ণ অবস্তুও নহে। ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়ম এস্থলে প্রযোজ্য হইলে অবস্তু ক্রমশঃ আপন ধর্ম্ম হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। অবস্তু ক্রমে কিছু কিছু বস্তুভাবাপন্ন হইয়া

(১) When the transformations of equilibrium are rapid, we call them electricity &c; when * * slower, we give them the name of Matter.
The evolution of Matter P. 17.

শোণিত • বস্তুরূপে বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং অবস্তু এবং বস্তুর মাঝামাঝি উভয়রূপ লক্ষণযুক্ত সত্ত্বা অবশ্যই জগতে বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমবিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহা আশা করা যায়। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই দেখা যাইতেছে। রেডিয়ম্ হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থ সর্ব্বদাই ব্যোমমণ্ডলে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কণিকা সকল (Effluves) বিকীরণ করিতেছে। কেবল রেডিয়ম্ হিলিয়ম নহে, অধ্যাপক গুস্তেব-লি-বোঁ প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১) যে, জগতে সকল বস্তু হইতে সর্ব্বদা কণিকা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। এই কণিকা সকলের বস্তুধর্ম্ম নাই বলিলেই হয়; অথচ একবারে তড়িৎভাবাপন্নও নহে। ইহারা ইথার হইতে অনেক বিভিন্ন। ইহারা বায়ুকে তড়িৎ পরিচালক করিতে পারে; কিন্তু তড়িৎ বায়ুকে আত্ম-পরিচালক শক্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কোন বস্তুতে তড়িৎ উৎপন্ন করিয়া তাহা বায়ুতে রাখিলে বায়ু তড়িদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু ঐ কণিকা সকল বায়ুকে তদ্ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইয়া—এদিকে উহারা চৌম্বক-শক্তি দ্বারা তড়িতের ন্যায় আকৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাদিগের গুরুত্ব নাই। তড়িতেরও নাই। (১) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উহারা কোন কোন অংশে বস্তু-ভাবাপন্ন এবং অপরাংশে তড়িদ্ভাবাপন্ন। যেন উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। ইথারচক্রের নাম-ই তড়িৎ, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল কণিকা ইথার ও বস্তু, এতদুভয়ের যেন মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিত। এই কথাই অন্যভাবে বলিলে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, যাহা ইথার, তাহাই যথাক্রমে তড়িদ্রূপে, বস্তু কণিকারূপে, অবশেষে বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়।

এ স্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। বস্তু কণিকা, কি অণু, পরমাণু? উত্তর—না, তাহা নহে। অণু, পরমাণু যতই ক্ষুদ্র হউক, উহা বস্তুধর্ম্মী; উহাদিগের গুরুত্ব আছে; এবং উহারা পৃথক পৃথক বস্তু হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু এই সকল কণিকা—অর্থাৎ রেডিয়ম ইত্যাদি হইতে যে সকল কণিকা সতত নির্গত হইতেছে, উহারা সকলেই এক ভাবাপন্ন। যে কোনও বস্তু হইতেই নির্গত হউক, কণিকা সকল একধর্ম্মী। (১) সকলেই বায়ুকে তড়িৎ পরিচালক রূপে পরিণত করে এবং চৌম্বক-শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। এই এক-ধর্ম্মীতা হইতেই বুঝা যায় যে, উহারা অণু পরমাণু হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। যেন বস্তু-পদার্থের পরমাণু সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি যে,—পরমাণু অবিভাজ্য নহে; উহাও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রতর অংশের সমষ্টি মাত্র। এখন দেখিতেছি যে, উহা যে কেবল মাত্র বিভাজ্য, তাহা নহে, উহা বিভক্ত হইয়া পরমাণু হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। অণু, পরমাণু বস্তু-পদার্থের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম ঠিক রাখে; কিন্তু এই সকল কণিকা তাহা রাখে না। যে বস্তুরই কণিকা হউক, সব এক ভাবাপন্ন। সুতরাং ইহারা অণু পরমাণু হইতে পৃথক্। এক্ষণে পূর্ব্বের ক্রম-বিবর্ত্তন

(১) The evolution of Matter.
—Gustave Le Bon.

(১) উহারা বস্তুর ন্যায় অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে।

(১) The particles emitted during dissociation possess identical characters, whatever the substance in question.—Ibid. P. 37.

স্মরণ করুন। আমরা বলিয়াছিলাম, "যাহা ইথার তাহাই তড়িদ্রূপে, বস্তু কণিকা রূপে, অবশেষে বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়।" কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কণিকা ও বস্তু মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। কণিকা বস্তু-ধর্ম্মী নহে; সুতরাং কণিকার পর অণুর উল্লেখ করিতে হয়, তৎপরে বস্তুর উদ্ভব। তাহা হইলে অভিব্যক্তির ক্রম এইরূপ হয়;— ইথার, তড়িৎ, কণিকা, অণু পরমাণু, তৎপর প্রত্যক্ষীভূত বস্তু-পদার্থ। ইহাই জড়-জগতের অভিব্যক্তিবাদ। (১) এই তত্ত্ব জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতেও কথঞ্চিত প্রতিপ[illegible] [illegible]য়। পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্বীকার [illegible] ন যে নীহারিকা হইতে জ্বলন্ত বাষ্পাবর্ত্ত [illegible] হইতে (ক্রমে তাপ মন্দীভূত হইয়া) কঠিন জ্যোতিষ্ক সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই নীহারিকাই আবর্ত্তিত হইয়া ঘনীভূত হইতেছে ও ক্রমে বস্তুরূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু নীহারিকাও মৌলিক অবস্থা নহে। যাহা সম্পূর্ণ বস্তুধর্ম্মের বহির্ভূত, তাহাই নীহারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা হইতেও বস্তুর ক্রমবিকাশ বুঝা যাইতে পারে।

আমরা পুনঃ পুনঃ তড়িৎ-শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। উহার গুরুত্ব কিছুমাত্র নাই। সুতরাং বস্তুর প্রধান লক্ষণই অভাব। উহা অবস্তু, উহা শক্তি। কিন্তু ইথার চক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের ধর্ম্ম। ইথার কি, তাহা বোধগম্য নহে। কিন্তু এ কথা বলিতে পারা যায় যে, উহাও বস্তু নহে। অবস্তু হইতেই ক্রম-বিবর্ত্তনের বশে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। (২) আর অমিশ্র বস্তুর যোগে মিশ্রবস্তুর উৎপত্তি।

কিন্তু অমিশ্র বস্তুই কি এক শ্রেণীর এবং এক ভাবাপন্ন; রৌপ্য, লৌহ, ইহাদিগকে অমিশ্র বলি; কিন্তু ইহারাও কত প্রকার। রৌপ্য বোধ হয় ছয় প্রকার, লৌহও অনেক প্রকার। অঙ্গার নানা প্রকার, কয়লা হীরক ইত্যাদি। অম্লজানও অন্ততঃ দুই প্রকার। ইহাদিগকে অমিশ্র-ভেদ (allotropic modification) বলা যাইতে পারে। যেমন বানর ও মানুষ একশ্রেণীর হইয়াও বিভিন্ন, যেমন বিড়াল ও সিংহ একশ্রেণীর হইয়াও পৃথক, যেমন উই ও পিপীলিকা এক শ্রেণীর হইয়াও স্বতন্ত্র, উহারাও তদ্রূপ। আর যদি ততদূর প্রভেদ নাও বলা যায়, অন্ততঃ চীনদেশীয় মানুষ ও ইংলণ্ডীয় লোকে যে প্রভেদ, তাহাত স্বীকার না করিয়া আর উপায়ই নাই। তাহা হইলেই জীবজগতে যেমন বিভিন্ন জন্তুকে বিভিন্ন শাখাতে বিভক্ত করা হইয়াছে, জড়জগতেও সমস্ত বস্তু-পদার্থকেই তদ্রূপ বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখাতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) আর জীবজগতে যেমন বিবর্ত্তনবাদ স্বীকৃত হইতেছে, জড়জগতেও তেমনই বিবর্ত্তনবাদ স্বীকৃত হইতে পারে। জড়জগতের মূল পরমাণু। সেই পরমাণুও চিরস্থির নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, উহা বিভাজ্য এবং বহু অংশের সমষ্টি। আর এই অংশ সকলের সমষ্টি ফল একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রেডিয়ম্ পরমাণু হিলিয়মের পরমাণুতে পরিণত হয়। আর পণ্ডিতগণ পরমাণুকে চিরস্থির মনে করিতে সক্ষম হইতেছেন না। উহারা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিণত

(১) In evolution towards the state of matter, the ether must no doubt have passed through intermediate phases of equilibrium. Ibid p. 171.

(২) This conception leads us to view Matter as a variety of energy. Ibid p. 10.

(১) Chemical species evolves like organic species, Ibid. p. 79.

হইতেছে'। (১) সুতরাং যেমন জীবজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ (কোষ) চিরপরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন হইতে উচ্চজীব সকলকে বিবর্ত্তিত করিয়াছে, জড় জগতেও পরমাণু সকল চিরবিবর্ত্তিত হইয়া এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু রচনা করিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। এক্ষণে সেই কণিকার কথা পুনরায় স্মরণ করুন। জগতে সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা কণিকা বিকীর্ণ করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল কণিকা, বস্তু হইতে পৃথক। উহারা সম্পূর্ণ বস্তুধর্ম্মী নহে। এ কথার প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে, বস্তু-পদার্থ অর্থাৎ তাহার অণু সততই বিশ্লিষ্ট হইতেছে? বস্তু চিরস্থির নহে। জগতে কিছুই চিরস্থির নহে। যেমন ইথার হইতে ক্রমে বস্তু-পদার্থ বিবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই বস্তু-পদার্থও সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই অনন্ত, সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারেই লীন হইতেছে। (২) যাহা হইতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই লয়। ইহা কি বিজ্ঞানের চরমা কথা নহে? মানব-জ্ঞানের ইহাই শেষ কথা, ইহাই শেষ সীমা।

আমরা বস্তু হইতে পরমাণুতে, পরমাণু হইতে তড়িতে, এবং তাহা হইতে ইথারে গিয়াছি। এই ইথার সাম্যাবস্থ, অব্যক্ত। ইহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণের সহিত তুলনা করিতেছেন (৩)। বিজ্ঞান ইহার পশ্চাতে আর যাইতে সক্ষম হইতেছে না; ইহাকে মূল শক্তি রূপে কল্পনা করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইহারও পশ্চাতে গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনন্যোপায় হইয়া এই ইথারকেই জ্ঞান-চৈতন্য আরোপ করিতেছেন। জগতে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের খেলা। জড় হইতে উদ্ভিদ ও মানব পর্য্যন্ত, একটা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তাই অণু, পরমাণুতে, সুতরাং পরিণামে ইথারেও, আর জ্ঞান-চৈতন্যের আরোপ না করিয়া উপায়া-
[illegible]্যাদি হইতে সে[illegible]
ন্তর [illegible]ছ না (১)। পণ্ডিতগণ জ্ঞান-
[illegible]ছে, উহারা
[illegible] শক্তি স্বীকার করিয়া সেই
যে কো[illegible]তে জগতের অভিব্যক্তি অঙ্গীকার
কণিকা সব[illegible]ধ্য হইতেছেন। সেই একমাত্র
[illegible] পরিচ[illegible]
সত্তা, জ্ঞান-চৈতন্য হইতেই অণু পরমাণুর মধ্য দিয়া ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে; আবার ব্রহ্মাণ্ড-পদার্থ ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই অণু পরমাণুর মধ্য দিয়াই সেই মৌলিক সত্তায় লীন হইবে। উহার সাম্যাবস্থা অচিন্তনীয়, এবং চক্রাবর্ত্তে ব্যক্তাবস্থাই জগৎ। জগতের যাহা কারণ, তাহাই পরিণাম। যখন জগৎ এই পরিণামে উপনীত হইবে, তখন মহাসাম্য। সে সাম্য শান্ত, অচঞ্চল। তাহা আবার চক্রাবর্ত্তে অভিব্যক্ত হইতে, আবার চঞ্চলতা, অর্থাৎ জগৎ-রূপ প্রাপ্ত হইবে। কি উপায়ে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে চিন্তার অবিষয়। তবে এই পর্য্যন্ত চিন্তা করা সম্ভব যে, উহার সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইবেই; উহা স্পন্দিত, বিবর্ত্তিত হইবেই। যে কারণে পূর্ব্বে সেই সাম্যাবস্থা

(১) Thomson's theory clearly explains how atoms of one element by losing their outer ring or ring of electrons may be transformed into those of another. —Salceby, Evolution p. 91.

(২) It Ether) is no doubt the first source and ulitimate end of things.—The Evolution of Matter p. 93 and p. 310.

The ponderable issues from the ether and returnsto it under manifold influences. M. A. Ducland. Revue Scientifique. April, 1904.

(৩) It is a sort of final Nirvan * * an infinitive and motionless nothingness.—The evolution of Matter p. 73 and p.315.

(১) Atoms * * in a sense, possess consciousness in some dim remote decree. Burke origin of life p. 338.
The Evolution p. 249.

অপনীত হইয়া জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, সেই কারণেই আবারও সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির পর তাহা অপনীত হইয়া জগৎ অভিব্যক্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। এ ধারা অনন্ত। যেমন পূর্ব্বে ছিল, পরেও তেমনই হইবে। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—এই মহাশ্রুতি অনন্তের দিকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই অনন্ত চক্রের গতি অবিরাম, আদিহীন এবং অন্তহীন; সেই একমাত্র অদ্বিতীয়ের গূঢ় ও ব্যক্ত ভাব। মানব মনের অতীত মহান লুকাচুরী খেলা। এ খেলা কেনই বা হইল, কেনই বা হইতেছে, আর কেনই বা হইবে, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বিজ্ঞান ত সম্পূর্ণ অসমর্থ, ধর্ম্মবৃত্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়া পরাস্ত হয়। ইহা তুল্যরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবিষয়। ওঁ তৎসৎ। শ্রীশশধর রায়।

# আত্মত্যাগী ভূপেন্দ্রনাথ।

"When, after his last imprisonment, he had mournfully spoken of the moral retrogression which the incapacity and corruption of monarchy and its tools had caused in Italy a friend sought to convert the admission into an argument for his taking rest before recommencing his labours, he (Mazzini) answered, "the more distant the goal the greater the need of struggling onwards *without haste and without rest.*"

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তার ঠাঁঞি।"

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?"

একদিন কলিকাতা পুলিস-কোর্টে দাঁড়াইয়া রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মাবতার, তামা-তুলসীতে আমার আর বিশ্বাস নাই, উহা স্পর্শ করিয়া আমি শপথ করিতে পারিব না।" আর সেদিন ভূপেন্দ্রনাথ গর্ব্বের সহিত পুলিস-কোর্টে বলিয়াছেন—"আমি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়াছি;—আমার তাহা অস্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহার দায়ীত্ব সম্পূর্ণ আমার।" রসিককৃষ্ণের কথায় এক সময়ে কলিকাতাতে যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, আজ ভূপেন্দ্রনাথের কথাতেও সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই বলিতেছে—"ছেলেটা করিল কি ?—জেলে যাইতে একটুও ভীত হইল না ?"

ভূপেন্দ্রনাথের মহত্বকে খর্ব্ব করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি ক্ষমা-প্রার্থনার পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া (১) নানা মন্তব্য ও টীকা টিপ্পনী করিতেছেন। ঐ পত্রের প্রতিবাদ হওয়া সত্বেও তাঁহাদের লেখনী নিরস্ত হইতেছে না। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, তিনি দুর্ব্বলতার সময়ে কাহারও অনুরোধে ক্ষমা চাহিয়া থাকিলেও, পরে যখন সাহসের পরিচয় দিয়া জেলে গিয়াছেন, তখন পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নয় কি ? কিন্তু লোকের মহত্ত্ব ঘোষণা—কিছুতেই তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কত রূপ তীব্র শ্লেষ করিতেছেন! বুঝিবা, ভূপেন্দ্রনাথের এইরূপ বাহাদুরী গবর্ণমেণ্টেরও সহ্য হইতেছে

(১) Unity and the Minister, July 28, 1907.

না। নচেৎ এ কথার উল্লেখ হইল কেন?

আর এক শ্রেণীর লোক বলিতেছে—কোন্ স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া অম্লান-চিত্তে হাসিতে হাসিতে ভূপেন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য জেলে গেল?

স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ,সকল লোকের মধ্যেই নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। চতুর্দ্দিকে হই-চই পড়িয়া গিয়াছে।

এদেশের কত ভূপেন্দ্রনাথ আছেন—তাঁহারা শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন, ভাবিয়া আকুল। তাঁহারা পা-চাটার দলে যাইবেন, কি স্বদেশীর দলে ফিরিবেন, চিন্তা করিয়া কূল পাইতেছেন না; কিন্তু এ ভূপেন্দ্র নাথ কিরূপ ধাতুর লোক? পিতার নাম, না ভ্রাতার নাম, না স্বদেশের নাম রাখিবার জন্য তিনি জেলকে আলিঙ্গন করিলেন? কেহই কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না।

এদেশের কত স্বদেশ-ভক্ত লেখক আছেন, তাঁহারা অহঙ্কারের-কূলে ঘর বাঁধিয়া দর্পে ঘোষণা করিতেছেন, "তাঁহারা বড় সতর্ক লেখক—কেহ তাঁহাদের লেখার গভীরতা ভেদ করিতে পারে না, কেহ তাঁহাদিগকে সিডিসন আইনে ফেলিতে পারে না।" তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, অতি দর্পে হত লঙ্কা। তাঁহারা ভূপেন্দ্রকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন এবং অসংযত লেখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন—"তাহার অপরাধ ঠিক, কিন্তু বালকের শাস্তি গুরুতর হইয়াছে!" তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া স্বদেশ-হিতৈষী হইতে চান, কিন্তু জেলে যাইতে ভীত! তাঁহারা আজ সুর নরম করিয়া, সত্যই, কেমন বিকৃতির পথ ধরিয়া চলিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার ও কঠোর শাসনের পরিণাম জানিয়া শুনিয়াও কঠোর বিধান অবলম্বন করিতেছেন কেন? আমরা জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের নব্যভারতে এ কথার উত্তর দিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটু কঠোর তীব্র শাসন আরম্ভ করিলেই জলে জল মিশিয়া যাইবে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তিরোহিত হইবে, রাজভক্তের দল, চতুর্দ্দিকে, ভয়বিহ্বল-চিত্তে স্তুতিবাদ ও খোসামুদী লইয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এই ভূপেন্দ্রনাথের ব্যবহার দেখিয়া বুঝি বা কিছু চিন্তাকুল হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য ভূপেন্দ্রের দল রাজভক্তির গাজন আরম্ভ করিলেও, চিন্তার বিষয় কি কিছুই নাই?

মানুষ, চিরকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষপাতী;—বিশেষতঃ বাঙ্গালী, যে শুইতে পাইলে বসে না, বসিতে পাইলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইতে পারিলে হাঁটে না এবং হাঁটিতে পারিলে দৌড়ায় না। কে তোমার এত আপদ বিপদ ডাকিয়া আনিবে, অহিফেন বা মদ্য পানে বিভোর হইয়া সকল অত্যাচার ভুলিয়া প্রগাঢ় সুখ-সুষুপ্তিতে ডুবিয়া যাও!—ইহাই বাঙ্গালীর চির-সেব্য এবং চিরারাধ্য কামনা। সেই বাঙ্গালীর মধ্যে একজনও, প্রফুল্ল-চিত্তে, ম্যাট্সিনীর মত, কারাগারে গেল; রবার্ট এমেটের ন্যায়, সেও বলিল, "স্বদেশের সেবা রূপ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, ক্ষমা চাহিব কেন?" সত্যই যে জন আপনাকে, আপনার পরিবারকে স্বদেশের জন্য উপেক্ষা করিতে পারে,সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়। তুমি কি ছাই কথা লিখিয়া তাঁহার মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছ? ভূপেন্দ্রনাথ সত্যই নর-দেবতা। তাঁহার নামে, বাঙ্গালী,

আর কিছু না পার, তুমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে তুলসী-চন্দন অর্পণ কর। সে তোমার দেশকে অনেক উপরে তুলিয়া গিয়াছে,—নীরবে তোমার দেশকে স্বর্গের উপযোগী করিয়া দিয়াছে। এ যুগের লোকেরা যদি, এইরূপে, স্বদেশের জন্য খাটিয়া আত্মত্যাগ করিতে পারে, এ দেশের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, বড় উজ্জ্বল, নিশ্চয় জানিও, বড় উজ্জ্বল।

সুখ, সুখ, সুখ—চিরকালই ত এই কথা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বলোকের মুখে শুনিয়া আসিয়াছি; উহাতে আর কি নূতনত্ব আছে? ভাই, বিপদ এবং দুঃখ সাধন কর, নিবৃত্তির পথ অনুসরণ কর, অন্ধকারের যাত্রিক হও, অহঙ্কার আস্ফালন ভুলিয়া যাও,—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও;—বুঝিতে পারিবে, তাহাতে যে শান্তি, সে শান্তি সুখে, রিপু-লালসায়, প্রবৃত্তি-সাধনে পাওয়া যায় না। জানিও, মরণের পথে না চলিলে কেহ মৃত্যুঞ্জয় নাম পায় না। জানিও, নিবৃত্তিতে সিদ্ধ না হইলে কেহ লক্ষ্মণের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ-বধের শক্তি পায় না। ভাই, সংযত হও, সংযত হও, চির-সংযত হও। কিসের সুখের ভেল্কি? কিসের রিপুর গঞ্জনা? যে দেশের কোটী কোটী লোক অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ও প্লেগে জর্জ্জরিত—সে দেশে আবার আনন্দ-উল্লাস কিসের? টাকার বাটা, (১) ইংরাজের ভাতা, পাউণ্ড সিলিঙ্গের ক্ষতি, হোমচার্জ্জ, বহুবিধ টেক্স, রপ্তানি প্রভৃতিতে দেশ যে দরিদ্র হইতেও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, কেহ তাহা বুঝিয়াও বুঝিবেন না। এ সকল দোষের কথা লিখিলে রাজ-বিদ্রোহ হয়! হায়রে হায়, সকল অত্যাচার, মূকের ন্যায় নীরবে সহ্য করিতে হইবে! কেবল তাহা নয়, সহ্য করিতে হইবে এবং জাতিকে বুঝাইতে হইবে, আমরা বেশ শান্তিতে আছি! অন্তরে ক্ষত—তবুও বাহিরে উল্লাস দেখাইতে হইবে! হায়রে ইংরেজের নীতি! সত্যই লিখিতেছি, যখন বাদ্য বাজাইয়া, রোশনাই করিয়া, মহানন্দে, বিবাহের জন্য, বর প্রোসেসন করিয়া যায়, তখন আমাদের হাসি পায়, মনে ভাবি, "মামা, তুমি কি সুখে আছ!" যখন থিয়েটারে, নৃত্য গানে মানুষ আত্মহারা হয়, তখন সত্যই ভাবি, এদেশের লোকের, দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত গোলামের আর কি বাকী আছে যে, এত উল্লাস, এত সুখ, এত আনন্দ!! গিয়াছে ত আমাদের সব গিয়াছে;—যদি কখন মানুষ হইতে পার, জাগিতে পার, স্ব-অধীন হইতে পার, স্ব-জাতিকে তুলিতে বা রক্ষা করিতে পার, তবে তখন স্বদলে মিলিয়া নাচিও, হাসিও, গাইও। এখন, তোমাদের উল্লাস উল্লম্ফন বিষ-পাত্র-চুম্বন বই আর কিছুই নয়—উহা ব্যক্তিত্বের-নরক-কুণ্ড, উহা স্বার্থসুখের চির নিরয়,—জাতি, দেশ, ডুবিয়া যায়, মূর্খ তাহা দেখিতেছ না? কিসের ঠাট্টা বিদ্রূপ, নিন্দা তিরস্কার, মান, অপমান?—এবার যদি দেশের উত্থান না হয়, —চির তরে এদেশ রসাতলে যাইবে। অতএব ভাই, তুমি স্থির এবং ধীর হও, অতএব তুমি অচঞ্চল এবং সংযত হও, অতএব তুমি —মরণ এবং নিবৃত্তি সাধনের জন্য প্রস্তুত হও। মহা নিবৃত্তিতে ডুবিয়া দিবারাত্রি স্বদেশ এবং স্বজাতির উদ্ধারের জন্য কার্য্য-তৎপর হইয়া বিধাতার নিকট বল ও সাফল্যের

(১) পূর্ব্বে প্রতিরৌপ্য টাকা বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাঁচ ছয় আনা লাভ পাইতেন, নিকেল ধাতুর টাকা প্রচলিত হইলে ষোল আনা লাভ হইবে। গত বৎসর টাকা পয়সা প্রস্তুত করিয়া ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬ কোটী টাকা লাভ হইয়াছে। গত ১২ বৎসর ধরিয়া এইরূপ লাভ হইতেছে।

জন্য প্রার্থনা কর। কেবল কার্য্য, কেবল কার্য্য, কেবল প্রার্থনা, কেবল প্রার্থনা,—দেশ রক্ষার জন্য এই দুর্দ্দিনে আর কোন কর্ত্তব্য নাই। প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া, ভাই, তুমি আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য্য-স্রোতে ডুবিয়া যাও। ভূপেন্দ্রনাথ তোমার জন্য যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন—সেই পূত-নিষ্কাম আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্র ধরিয়া নিবৃত্তির পথে আজ চলিয়া যাও। ঐ নর-দেবতা তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ঐ শুন, ঐ শুন।

# বাঙ্গালায় ইস্‌লাম রাহু।

বাঙ্গালী কে? বাঙ্গালা দেশে যাহাদের বাস, আশৈশব যাহারা বঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়া আসিয়াছে—তাহারাই কি বাঙ্গালী? এই বাঙ্গালা দেশে ২ কোটী ২৫ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটী ৯০ লক্ষ হিন্দুর বাস। ইহারা উভয়ে কি বাঙ্গালী? হিন্দুরা কি মুসলমানদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন? হিন্দুদিগকে স্বদেশের লোক বলিয়া কি মুসলমানদের ধারণা? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর কাহার নিকট পাইব?

হিন্দুর লিখিত সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয় যেন বাঙ্গালায় মুসলমানেরা গণনার মধ্যেই নহে। বখ্‌তিয়ার খিলীজী যখন বাঙ্গালা দেশ জয় করেন, তখন মুসলমানদের সম্বন্ধে যে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, আজ ৭০০ বৎসর পরেও মুসলমানদের সম্বন্ধে সেইভাব আবাল বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না কি? কোন্ প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা মোট অধিবাসীর তুলনায় শতকরা কয় জন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| খাশ বাঙ্গালায় | ৫৪ |
| পঞ্জাবে | ৫২ |
| পশ্চিমাঞ্চলে | ১৮ |
| বোম্বাইতে | ১৪ |
| মান্দ্রাজে | ৬ |
| মিথিলায় | ১৬ |
| মগধে | ১০ |
| বাঙ্গালার মধ্যে—— | |
| পূর্ব্ববাঙ্গালায় (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) | ৬৬ |
| উত্তর বাঙ্গালায় (রাজসাহী) | ৫৯ |
| মধ্য বাঙ্গালায় (কলিকাতা সমেত) | ৪৯ |
| রাঢ়ে (বর্দ্ধমান) | ১৩ |

সংক্ষেপতঃ কলিকাতা ও রাঢ় পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালীর মধ্যে দুই অংশ মুসলমান এবং এক অংশ হিন্দু। বঙ্গদেশে এক কোটি ৯২ লক্ষ লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের মধ্যে ৫৬ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণের যাজন ও স্পর্শন যোগ্য। যথা ব্রাহ্মণ ১১ লক্ষ, কায়স্থাদি ১৩ লক্ষ এবং নবশাখ ৩২ লক্ষ। অবশিষ্ট এক কোটি ৩৬ লক্ষ ব্রাহ্মণ-যাজন বহির্ভূত। রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী প্রভৃতি ৭৬ লক্ষ লোক হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা যদি আজই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে ব্রাহ্মণ-যাজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। বাউরী, মুচি প্রভৃতি ১৬ লক্ষ বাঙ্গালীর সম্বন্ধে তো কথাই নাই। ২৫ লক্ষ চাষী কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা কোন কোন অঞ্চলে

ব্রাহ্মণের পাণীয় জল বহন করে, সুতরাং তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-যাজিত সম্প্রদায়ের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গালাদেশে—

| | |
|---|---|
| ব্রাহ্মণ-যাজিত হিন্দু সংখ্যা | ৫৬ লক্ষ |
| এই সকল হিন্দুর জলবাহী | ২৬ লক্ষ |
| যাজন ও স্পর্শের অযোগ্য হিন্দু | ১২০ লক্ষ |
| একুনে হিন্দু সংখ্যা | ১৯২ লক্ষ |
| মুসলমান সংখ্যা | ২২৫ লক্ষ |

ধোবার সঙ্গে কাপড় কাচা লইয়া কথা, জেলের সঙ্গে মাছ ধরা লইয়া কথা, তাঁতির সঙ্গে কাপড় বোনা লইয়া কথা। সে নিজকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিক, বা মুসলমান বলিয়াই পরিচয় দিক, তাহাতে প্রাচীন ঋষিদের সুধা সংগ্রহে কোন বাধা থাকিবে কি? অথবা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানিরও প্রকোপ খর্ব্ব হইবে কি? আজ ৭০০ বৎসর ব্রাহ্মণেরা নিম্নশ্রেণী হিন্দুর প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। যে ধর্ম্মে অধিক পরিমাণে সাম্যের ব্যবস্থা আছে, নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা সেই ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় এক কোটি ৯২ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ১১ লক্ষ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অবশিষ্ট এক কোটি ৮১ লক্ষ লোকের পূর্ব্বপুরুষেরা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অভিধান লোপ করিয়া ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণকেই শত শত শূদ্রবর্ণে পরিণত করিলেন। কেহ কাহারও সঙ্গে আদান প্রদান বা আহার পান করিবে না, এই নিয়ম করিয়া বৌদ্ধদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। এই সময় ইস্লাম আবির্ভূত হইয়া সকলের কর্ণে সাম্যের মন্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। ইস্লাম-সাম্য প্রকৃত পক্ষে সাম্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নেটিভ্ নেটিভই থাকে। কিন্তু ইস্লাম ধর্ম্মের সাম্য শুধু ধর্ম্মগ্রন্থে আবদ্ধ নয়। ধনবল, চরিত্রবল, বিদ্যাবল ও দেহবল থাকিতে মুসলমান সমাজে এমন কোন উচ্চ স্থান নাই, যাহা একজন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অধিকার করিতে না পারে। অন্ততঃ হিন্দু সমাজে যে ঘৃণিত স্থান কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতির জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের সেই ঘৃণিত অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। এই সাত শত বৎসরে, পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালার দুই তৃতীয়াংশ লোক হিন্দুয়ানি পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইসলাম রাহু শনৈঃ শনৈঃ বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজকে গ্রাস করিয়া আসিতেছে। ইহাতে হিন্দু সমাজের কোন অনিষ্ট হইয়াছে কি? যদি বাঙ্গালার ৪ কোটি লোক মধ্যে সাড়ে তিন কোটী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ ব্যতীত অপর সকলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে হিন্দু সমাজের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি?

আগামী দশ বৎসর কাল যদি পাঠশালা সমূহে বিনা বেতনে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদের অনেকে ব্রাহ্মণের আনুগত্য অস্বীকার করিবে কি? শিক্ষিত মুসলমানেরা, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টীয়ান পাদরির ন্যায়, নিম্নশ্রেণী হিন্দুর নিকট সাম্যধর্ম্ম প্রচার করিলে ইসলাম ধর্ম্মের উপর হিন্দুর শ্রদ্ধা বাড়িবে কি? বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্যের ধর্ম্ম বলিয়া নিম্নশ্রেণীর এত আদরের ধর্ম্ম হইয়াছিল। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুসলমানকে

পর্য্যন্ত আশ্রয় দিয়াছিল। শিক্ষিত মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের দেশাচারমূলক গোমাংস ভক্ষণাদি রূপ কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া এবং মুসলমান গুণ্ডাদিগকে শাসনে রাখিয়া প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে মুসলমানদের উপর নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদের আধুনিক বিদ্বেষ থাকিবে কি? বাঙ্গালাদেশে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যাবল চরিত্রবলের অভাব নাই। বিদ্যা ও চরিত্রের আকর্ষণেই লোক নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অনেকে হিন্দুয়ানির সমর্থনার্থ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান নবাবগণ তাঁহাদের প্রাধান্য সময়ে তরবারির আশ্রয়ে ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই কথা সম্পূর্ণ অমূলক। সেন্‌সাস্ অফিসর বলিতেছেন, "সহস্র অধিবাসীর তুলনায় মুসলমান সংখ্যা (শতকরা)

| | |
|---|---|
| বগুড়া জিলায় | ৮২ জন |
| রাজসাহী " | ৭৮ " |
| নোয়াখালী " | ৭৬ " |
| পাবনা " | ৭৫ " |
| ময়মনসিংহ " | ৭১ " |
| চট্টগ্রাম " | ৭১ " |

ইহার মধ্যে কোন স্থলেই মুসলমানদের রাজধানী ছিল না। ঢাকাতে একশত বৎসর মাত্র নবাব আমলে রাজধানী ছিল। কিন্তু ফরিদপুর ব্যতীত ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জিলা সমূহে ঢাকা অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা বেশী। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সাড়ে চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত নবাবদের রাজধানী ছিল। কিন্তু এই দুই জিলায়, পার্শ্ববর্ত্তী দিনাজপুর, রাজসাহী ও নদিয়া জিলা অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা অল্প। বিহার, ভাগলপুর এবং মুঙ্গের নবাবদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। অথচ এই সকল জিলায় মুসলমান সংখ্যা নগণ্য।"

শুধু পাশব বলে কোন দেশে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। আরংজীব বিশ্বেশ্বরের মন্দির চূর্ণ করিয়া মস্‌জিদ্ করিলেন; অথচ কাশীধামে মুসলমান ধর্ম্মের কোন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল না। এজন্য বলিতেছি যে, বাঙ্গালাদেশে যদি এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়া থাকে, তাহা ঐ সকল ধর্ম্মের প্রচারকের চরিত্র-মাহাত্ম্যে। আর এই সাত শত বৎসরে যদি বাঙ্গালাদেশে মুসলমান সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, তাহা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের আকর্ষণে। তামসিক বা তামাসাপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও যে এই তামসিক ধর্ম্ম অপেক্ষা সাম্যের ধর্ম্ম অধিকতর আদর করে, বাঙ্গালাদেশের রাজবংশী, নমশূদ্র প্রভৃতি কৃষক শ্রেণীর বৈষ্ণব ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণই তাহার প্রমাণ।

ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় গুণ্ডা মুসলমানদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানদের চক্ষু ফুটিয়াছে। চরিত্র-মাহাত্ম্য ও বিদ্যাপ্রভায় ইসলাম ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। যদি মুসলমান বাঙ্গালীরা হিন্দু বাঙ্গালীর ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক হয়, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, দেশ মধ্যে কল কারখানা স্থাপন করিয়া এবং নদীতে সমুদ্রে জাহাজ চালনা করিয়া ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের প্রতি এখন হিন্দুর যে একটা ঘৃণার ভাব রহিয়াছে, তাহা কখনই থাকিবে না।

বাঙ্গালাদেশে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা করেন কেন? শিক্ষিত মুসলমানেরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে

সঙ্কোচ বোধ করে এবং অশিক্ষিতেরা শেখ বা আরববাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। হিন্দুরা যেমন কথায় কথায় আর্য্য ঋষির দোহাই দেন, মুসলমানদের ব্যবহার তদনুরূপ কি? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এখন আর কান্যকুব্জের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহত্ত্ব এই যে, পৃথিবীর যে কোন দেশে মুসলমান আছে, তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার মুসলমানদের আদান প্রদান, আহার পান চলিতে পারে। বাঙ্গালী মুসলমানদের আর একটী দুর্ব্বলতা এই, তাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা না করিয়া বিদেশী পার্শী বা উর্দ্দু ভাষার চর্চ্চায় ব্যস্ত। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্য। জর্ম্মান, ফরাসী, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে লোক কানাডা (Canada) বা আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে বাস করিয়া সেই সকল দেশেরই ভাষা গ্রহণ করে এবং সেই সকল দেশের নিবাসী বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। ভদ্র মুসলমানেরা ভদ্র হিন্দুদের সঙ্গেও মিলিতে মিশিতে চাহেন না। বাঙ্গালার ভদ্র মুসলমানেরা এপর্য্যন্ত বিদ্যা বুদ্ধির ও ধনগৌরবের বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই। ঢাকার নবাব বাড়ী ভিন্ন সকল প্রাচীন বংশের অবস্থাই বিলাসিতা বা অন্য কারণে শোচনীয় হইয়াছে। ঢাকার নবাব বংশেরও ঋণের জন্য প্রকাশ্য আদালতে অভিযোগ হইয়াছে। কিন্তু কৃষি-বাণিজ্যে এবং জাহাজের কার্য্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরা শ্রেষ্ঠ। ইহার এক কারণ এই যে, তাহারা আহার পানে জাতিভেদ মানেন না, তাহাদের পক্ষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। দ্বিতীয় কারণ, তাহারা বেশী সাহসী। সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহাদের চেতনা বিনষ্ট হয় না। যে সকল বনাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল দেশে নূতন জমীতে মুসলমানেরা চাষ আবাদ করিবে, সেখানে যাইতে হিন্দুর সাহস হইবে না। অথচ হিন্দু হইতেই কৃষক ও নাবিক মুসলমানের উৎপত্তি। এই পার্থক্য কি ইস্‌লাম ধর্ম্মের গুণে?

জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণেরা যে সকল বৌদ্ধদিগকে হিন্দুনাম দিয়া যাজন-সীমায় আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের তদানীন্তন আচার ব্যবহারের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমানদের প্রভেদ কি? বৌদ্ধেরা বেদ মানিতেন না, জাতিভেদ মানিতেন না, ঈশ্বর পর্য্যন্ত মানিতেন না। ব্রাহ্মণেরা তথাপি বৌদ্ধদিগকে স্বীয় যাজন-গণ্ডীর মধ্যে আকর্ষণ করিলেন। বৈদিক ধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক ব্রহ্ম বিদ্যায় পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ নাই। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগকে সহজে বশে আনিবার জন্য বৌদ্ধদের পৌত্তলিকতা স্বধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। যে সকল তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার-বিরোধী বৌদ্ধদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের যাজন ও জল গ্রহণ করিতে পারিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কি বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগকে হিন্দু সমাজে স্থান দিতে পারেন না? মানিলাম, বৌদ্ধদিগকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দু সমাজ গঠিত হইতে পারিত না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই হিন্দু সমাজ কি অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারিবে? ইংরেজ-পক্ক অন্ন গ্রহণ করিয়া বিলাতফেরত মহাশয়েরা সমাজে চলিতেছেন। অনেক অর্থশালী ব্যক্তি বিলাত না গিয়াও মুসলমান-পাচকের পক্ক মাংস পরিপাক করিয়া হিন্দু সমাজে চলিয়া যাইতেছেন। তবে মুসলমানদিগকে "জল অচল-

নীয়” বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রহণ করা হয় না কেন? ইংরেজের সঙ্গে বসিয়া আহার পান করিলে যদি জাতি নাশ না হয়, তবে স্বদেশী শিক্ষিত মুসলমান সঙ্গে আহার পান করিলে জাতি নাশ হয় কেন? প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা এক সময় উচ্চশ্রেণী বৌদ্ধদের যে প্রকার যাজন করিতে পারিলেন, আধুনিক ব্রাহ্মণেরা উচ্চশ্রেণী মুসলমানদের সেই প্রকার যাজন করিয়া তাহাদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করেন না কেন? বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর আধুনিক হিন্দু সমাজ গঠন সময়ে যে সাহস, রাজনীতি, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে, এখন সংকীর্ণতা, কূটবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। যদি হিন্দুরা মুসলমানদিগকে হিন্দু সমাজে স্থান দিতে না পারেন, তবে মুসলমানগণ যে হিন্দু সমাজের অধিকাংশকে ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ ও সাম্য মন্ত্রে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন?

জল গ্রহণ, আতিথ্য গ্রহণ ও যাজন, এই তিন উপায়ে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগকে হিন্দু-সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। একদিনে বা এক যুগেই বৌদ্ধেরা সকলে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন নাই। শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ্যে না হউক, গোপনে (অথচ সকলের জ্ঞাতসারে) মুসলমানের জল গ্রহণ বা পক্ক আহার চলিতেছে। শিক্ষিত যুবকেরা, মনে করিলে, মুসলমান যুবকদের সঙ্গে পাংক্তেয়তা অর্থাৎ এক সঙ্গে বসিয়া আহারপান করিতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজে নেতা হইয়া মুসলমানদের যাজন করিতে সম্মত না হইবেন, তাঁহাদিগকে অগত্যা পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। পঞ্জাবে আর্য্য-সমাজের লোকেরা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং হিন্দু-সমাজের ধ্বংস নিবারণ করিয়াছেন। যদি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ, অবস্থা বিশেষে, যাজন, আতিথ্যগ্রহণ ও জল গ্রহণ, এই তিন উপায়ে মুসলমানদিগকে হিন্দুসমাজে স্থান দিয়া মুসলমান-সমাজকে হীনবল ও হীনসংখ্যক না করেন, তবে ইস্‌লাম্‌-রাহুর গ্রাস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অনেকে বলিবেন, মুসলমানেরা হিন্দুসমাজে আসিবে কেন? এইজন্য আসিবে যে, এখনও হিন্দু হওয়াকে অনেক মধ্য-শ্রেণী মুসলমান গৌরবের বিষয় মনে করে। হিন্দু হইলে যদি পৌত্তলিকতা স্বীকার করিতে না হয় এবং প্রচলিত জাতিভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে না হয়, তবে অনেক মুসলমান হিন্দু হইতে সম্মত হইবে। হিন্দুসমাজ একবার আশ্বাস দিলেই হয়। পূর্ব্বকালে যে চারি বর্ণ ছিল এবং চারি বর্ণের অনুলোম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার নিয়ম ছিল, সেই নিয়ম অবলম্বন করিলেই, সকল বিঘ্ন কাটিয়া যায়।

পঞ্জাব ও বাঙ্গালায় ইস্‌লাম-রাহুর গ্রাস, কল্পনার কথা নহে। ভারতের পূজ্য শ্রীযুক্ত লাজপত রায় প্রভৃতি আর্য্যগণ মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছেন। যদি এতাদৃশ মনস্বিতার পরিচয় দিয়া, বাঙ্গালার হিন্দু-নায়কেরা, মুসলমানদিগকে স্ব-সমাজে স্থান না দেন, তবে মুসলমান-সমাজ অচিরে বাঙ্গালায় প্রভাব সংস্থাপন করিবে। অবস্থাও তদনুকূল হইয়াছে। ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আর পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে আস্থা নাই; সমাজ-শাসন ভয়ে যতদূর জাতিভেদ মানিতে আবশ্যক হয়, তাহাই রক্ষা করা হয়। কিন্তু অন্তরে আর শ্রদ্ধা নাই।

এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে প্রধান অনৈক্য। হিন্দুসমাজে যেমন ব্রাহ্মেরা অগ্রণী হইয়া চতুর্দ্দিকে আলিঙ্গনের হস্ত প্রসারণ করিতেছে, যদি শিক্ষিত মুসলমান মধ্যে এতাদৃশ উদারমতি লোকের আবির্ভাব হয়, তবে অনেক শিক্ষিত হিন্দু, নামে না হউক, বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারে মুসলমান হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরাও তাঁহার পদানুসরণ করিবে। বাঙ্গালা দেশে মুসলমানদের বর্দ্ধমান অবস্থা। হিন্দু-মুসলমানে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিরোধ, শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের তৎসম্বন্ধে উচ্চ মুসলমানগণের সহিত সহানুভূতি রহিয়াছে। এজন্য বলিতেছি, বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, ইস্‌লামের অধিকতর প্রচার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যদি এই অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার না হইয়া থাকে, তজ্জন্য মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতারা দায়ী। মুসলমান-সমাজের সৌভাগ্যবশতঃ সৈয়দ ও পাঠান বংশীয় মুসলমানেরা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে, বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষা ও চর্চ্চা করিতে এবং বাঙ্গালা দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও জাহাজ চালনার উন্নতি করিতে সঙ্কোচ মনে করেন না। যদি হিন্দুরা সাবধান হইয়া না চলেন, তবে ইস্‌লাম রাহুর সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

## "দেখে লও মিঞা" !!

মুনি বলে, হে রাজন্ কর অবধান।
আমার কথায় তুমি পাইবে পরাণ।
মোর গল্প শুনে যেবা করে অবহেলা।
অতি কষ্ট পাইবে সে ভোজনের বেলা।
"দেখে লও মিঞা" গল্প অমৃত সমান।
যে শুনিবে সেই হবে অতি পুণ্যবান।
মনোযোগ সহকারে, পড় ভাই সবে।
বৃদ্ধভণে, ফুল্লমনে, নবজীবন হবে॥

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, বক্ষ্যমান প্রবন্ধের মধ্যেই নিহিত আছে। মনোযোগ সহকারে ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিলে, পাঠক মহাশয়েরা এই কৌতুককর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। সহজে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে একটা হাস্য-রসোদ্দীপক গল্প বলি।

বঙ্গদেশে এক সময়ে এক সৌখীন নবাব ছিলেন। তিনি সমস্ত দিবস গাঁজা, গুলি, চরস, অহিফেন প্রভৃতির নেশায় প্রমত্ত থাকিতেন, এই জন্য দিবা কালে ঘরের বাহিরে আসিতেন না। সায়াহ্ন অতীত হইয়া গেলে, যখন নগরের লোকেরা প্রদীপ জ্বালিত, সেই সময়ে সৌখীন নবাব বাহাদুর, পেচকের ন্যায়, রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখের প্রশস্ত, মনোরম ও নবীন শষ্পসমাবৃত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইতেন। ভৃত্যেরা পালঙ্ক আনিয়া তদুপরি সুকোমল শয্যা বিস্তার করিয়া দিলে, নবাব বাহাদুর "তাকিয়া"য় ঠেস্ দিয়া বিছানায় শুইয়া

তামাকু সেবন করিতেন এবং আকাশের দিকে নয়নদ্বয় নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুবিশাল গগনের অনন্ত তারকা-মালাকে দর্শন করিতেন। চাকরেরা তাঁহার হাত, পা, মাথা এবং সমস্ত দেহ টিপিয়া দিত। নিকটে চাপরাশী, আড়দালী ও খানসামারা বসিয়া থাকিত। এইরূপে অনেক কাল পর্য্যন্ত আকাশের নক্ষত্রনিচয়কে অবলোকন করিতে করিতে, নবাব সাহেব তাঁহার চাপরাশীকে আদেশ করিলেন "অতি শীঘ্র দেওয়ানজীকে ডাকিয়া আন।" দেওয়ানজী আহারাদি সমাপন করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন; নবাবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্রুত পদে নবাবসন্নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব বলিলেন "দেওয়ানজী! আমি প্রতি রাত্রে আকাশের নক্ষত্রনিচয়কে দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহাদিগকে কখন গণনা করিতে সক্ষম হই না। আকাশে কতগুলা তারা আছে, তাহার ঠিক সংখ্যা তুমি আমাকে বলিয়া দাও।" দেওয়ান বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! উহারা অগণ্য।" নবাব কহিলেন, "অগণ্য শব্দের অর্থ কি?" দেওয়ান উত্তর দিল "অগণ্য মানে যাহাকে গণনা করা যায় না।" তখন নবাব সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি তোমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইলাম না। তোমাকে অযোগ্য লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অতি সত্বর এমন একজন লোক আনিয়া দাও, যে ব্যক্তি আকাশের তারার ঠিক সংখ্যা বলিয়া দিতে সক্ষম।" দেওয়ানজী কহিলেন "হুজুর! বড় মশিদের মোল্লা সাহেবের নাকি চারিশাস্ত্র পড়া আছে, শুনিয়াছি, অতএব তাঁহাকে একবার ডাকিয়া পাঠাই।" নবাব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা। জল্‌দি বোলাও।" সিপাহীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে মোল্লাকে ডাকিয়া আনিল। বুড়ো মোল্লা, নবাবের মুখে প্রশ্ন শুনিয়া আশ্চর্য্যে উত্তর দিল, "জনাব! আকাশের তারা অসংখ্য।" নবাব কহিলেন, "অসংখ্য শব্দের মানে কি?" মোল্লাজী বলিল "অর্থাৎ বে-সোমার্।" নবাব বলিল, "বে-সোমার মানে কি?" মোল্লা কহিল, 'বে-সোমার মানে যাহার সোমার অর্থাৎ সংখ্যা অর্থাৎ গণনা হয় না।" ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মাবৎ আকার ধারণ করিয়া নবাব সাহেব বলিলেন, "তুমি অকারণে সরকারী টাকা অপব্যয় করিতেছ, তোমাকে আমি শীঘ্র এই সহর হইতে দূর করিয়া দিব। আকাশের তারার ঠিক নম্বর চাই; একটী চুল প্রমাণ ভুল হইলে আমি মাথা কাটিয়া ফেলিব।" ভীত, লজ্জিত, অপমানিত ও দুঃখিত হইয়া দেওয়ান সাহেব বলিলেন, "হুজুর! শুনিয়াছি, গঙ্গা-নদীর ধারে নবদ্বীপ নামে এক নগর আছে। সেখানে নাকি অনেক দিগ্বিজয়ী হিন্দু পণ্ডিত বাস করেন; তাঁহারা সর্ব্ব বিদ্যায় দিগ্‌গজ এবং চৌদ্দ ভুবনের সকল বিষয়েই তাঁহারা অদ্বিতীয়রূপে অভিজ্ঞ। এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তুলনা-রহিত। হুজুর! নবদ্বীপে লোক পাঠাইয়া একজন এইরূপ পণ্ডিতকে আনাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের (অর্থাৎ মুসলমান) জাতির মধ্যে জ্যোতিষ বিদ্যার বড় চর্চ্চা নাই। আকাশের তারা গণনা করা আমাদের কার্য্য নয়; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত না হইলে এই গুরুতর কার্য্য সমাধা হইবে না।" নবাব কহিলেন "দেওয়ানজী, তবে তুমি অবিলম্বে নবদ্বীপে লোক পাঠাইয়া এক জন ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আনাইয়া দাও।" দেওয়ান বলিল "বহুৎ আচ্ছা, হুজুর!"

তখন রেল বা ষ্টীমারের বহু প্রচলন ছিল না, সুতরাং অনেক দিবস পরে নৌকা যোগে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয় নবাব-সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহার আগমনের সমাচার শ্রবণ করিয়া নবাব বলিল, "এক সপ্তাহ কাল পরে আমি পণ্ডিতকে ডাকিয়া পাঠাইব, এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিব। পণ্ডিতের আহারাদির ব্যয়ের জন্য প্রতিদিন তাঁহাকে দশ টাকা দিবার আজ্ঞা দেওয়া গেল।" এক সপ্তাহ কাল অতীত হইলে যথাসময়ে নবাবের আদেশানুসারে দেওয়ান সাহেব ঐ পণ্ডিতকে নবাব-সমীপে উপস্থিত করিয়া দিল। অতীব মনোযোগ সহকারে নবাবের প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক পণ্ডিত কহিলেন, "ভো ধর্ম্মাবতার! নবাবাধিক নবাববর! এরূপ গুরুতর এবং অত্যাবশ্যক প্রশ্ন হুজুরের মুখেই শোভা পায়। শুনিয়াছিলাম, আপনি চারি শাস্ত্রে পণ্ডিত, এখন বুঝিলাম, আপনি চারি গুণ চারি অর্থাৎ ষোল শাস্ত্রে বিদ্যাদিগ্‌গজ। পণ্ডিত না হোলে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্ন কাহারও চিন্তা করিবার সাধ্য হয় কি? যাহা হউক, আমি ঐ অনন্ত আকাশের নক্ষত্র সমূহের নির্ভুল সংখ্যা হুজুরকে জানাইয়া দিব, ইহাতে একটী তিল প্রমাণ বা চুল প্রমাণ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাত দিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ের গণনা জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইবে, অতএব অদ্য হইতে অষ্টম দিবসে হুজুরের প্রশ্নের নির্ভুল এবং সন্তোষকর উত্তর দান করিয়া চরিতার্থ হইব।" নবাব বাহাদুর বৃদ্ধ পণ্ডিতের মধুময়ী বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, সাদরে পণ্ডিতজীকে এক সপ্তাহের জন্য অবকাশ দিলেন।

বুড়ো পণ্ডিত পরদিন স্বয়ং বাজারে গিয়া তিন দিস্তা কাগজ ক্রয় করিয়া আনিল।' ঐ তিন দিস্তা কাগজে সাপ, ব্যাং, টিকটিকির বাচ্ছা, গিরগিটির ডিম্ব, ইজি বিজি মিজি প্রভৃতি কত কি লিখিল; তাহার লেখার অক্ষর বা ভাষা কিম্বা তাহাদের অর্থ পৃথিবীর কোন পণ্ডিতের চৌদ্দ পুরুষ উর্দ্ধতন বা অধস্তনের মধ্যে কাহারও তিল প্রমাণ বুঝিবার সাধ্য রহিল না। তাহার পরে বাঁশপাতা, শুষ্ক কলাপাতা, শালপাতা, বকুলপাতা, কচুপাতা প্রভৃতিতে কত যে কি লিখিল, তাহা ভগবান ভিন্ন আর কেহ জানে না। তাহার পরে দুইটা শ্লেট ঐরূপ ইজি, বিজি, লেখায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই সব লেখার অক্ষর সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই যে পড়িয়া উঠে।

অষ্টম দিবসে দিনমণি অস্তগত হইলে, নবাব সাহেব রাজপ্রাসাদের বাহিরে আসিয়া পালঙ্কে বিপুল বপু বিস্তার করিয়া, চাপরাসীকে কহিল "পণ্ডিতজীকে এই স্থানে লইয়া আইস।" দেওয়ান, নায়েব, খাজাঞ্চী প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারী-বৃন্দ এবং তদ্ভিন্ন নগরের বহু গণ্য-মান্য লোক সঙ্গে শ্রীমান নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য জ্যোতির্ব্বিদ নবাব সন্নিধানে উপনীত হইলেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিল "পণ্ডিতজী! হিসাব ঠিক হোয়েছে কি না?" পণ্ডিত কহিল "হুজুর! হিসাব ঠিক হোয়েছে। খোদার কৃপায় হিসাবটা একেবারে নির্ভুল হোয়ে গেছে। সাত দিন পর্য্যন্ত ভাত খাইবার যথেষ্ট অবকাশ পাই নাই, বাজারের লুচি মণ্ডা খাইয়া দিন কাটাইয়াছি। কাগজ, শ্লেট, গাছের পাতা, ঘরের দেওয়াল, রান্নাঘরের দ্বারদেশ, যেখানে যা পেয়েছি ও দেখেছি, সেইখানেই লেখাপড়া কোরে, অঙ্ক কোসে, হিসাব

সম্পূর্ণ কোরেছি।" অত্যন্ত আনন্দ সহকারে নবাব জিজ্ঞাসা করিল "পণ্ডিতজী! আপনি যথার্থ সুযোগ্য বিদ্বান ব্যক্তি বটেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনার মত পণ্ডিত এদেশে আর কেহ ছিল না, এখনও নাই, আর হইবেও না, ইহা একেবারে নিশ্চয়। যাহা হউক, আকাশের নক্ষত্রের নম্বর কিরূপ দেখ্‌লেন?" পণ্ডিত বলিল "ধর্ম্মাবতার! আকাশের নক্ষত্রের ঠিক সংখ্যা হোচ্ছে—বিরানব্বুই কোটি, সাতান্ন লক্ষ, পঁয়ষট্টি হাজার, নয় শত সাড়ে বত্রিশ।" নবাব কহিল "সাড়ে বত্রিশ কেন? আর আধখানা কোথায় গেল?" পণ্ডিত কহিল "খোদাতাল্লা যখন আশমান তৈয়ার কোরে নক্ষত্রগুলা নির্ম্মাণ কোর্‌ছিলেন, তখন মনে মনে ভাবলেন, সমুচয় তারাকে আমি আস্ত (গোটা) নির্ম্মাণ কোরেছি, একটা নক্ষত্রকে আধখানা করা যাউক, এই ভাবিয়া কেবল একটা তারার তিনি আধখানার অধিক তৈয়ার করেন নাই। নবাব বলিল "ধন্য! ধন্য! অতি সৌভাগ্য বলে এ হেন পৃথিবী-বিজয়ী বিদ্বান জ্যোতিষীর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হোলো।" তদনন্তর কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া দেওয়ানজীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া দেওয়ান বলিল "পণ্ডিতজী! আপনি যে অদ্বিতীয় বিদ্বান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, আপনি তারামালার যে নম্বর কহিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার হিসাবটা যে নির্ভুল, তাহা জানিতে চাই। আপনার হিসাবটা যে ঠিক, তাহার প্রমাণ কি?" দেওয়ানের বাক্য শুনিয়া, ভূমিতলে দুই তিনবা'র সজোরে করাঘাত পূর্ব্বক পণ্ডিতজী সেই সকল বিপুলাকার কাগজ, শ্লেট, শুষ্ক-পত্র প্রভৃতি দেওয়ানের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল "তবে দেখে লও মিঞা"!! কাগজাদির দুই এক পাতা উল্টাইয়া লইয়া দেওয়ানের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "যদি বলি আমি ইহার কিছুই বুঝিনা, তাহা হইলে নবাব সাহেব কহিবেন, তবেতো দেওয়ানটা নিশ্চয়ই অযোগ্য এবং নিশ্চয়ই মূর্খ।" এই ভাবিয়া মৌনং সম্মতি লক্ষণং বুঝিয়া দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিল। ইত্যবসরে নবাব কহিল, "পণ্ডিতজী! আপনার গণনাটা যে ঠিক, তাহার প্রমাণ কোথায়?" সুচতুর পণ্ডিত পূর্ব্ববৎ কাগজ পত্রাদি নবাব বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "দেখিয়া লও। হিসাবের প্রমাণ দেখিয়া লও"। নবাব সাহেব কাগজ পত্র দেখিয়াই বুঝিল, "এই অদ্ভুত বিদ্যায় দন্তস্ফুট করা আমার চল্লিশ পুরুষের মধ্যে কাহারও শক্তি নাই। যদি কহি, আমি কিছুই বুঝিনা, তাহা হইলে আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এই দেশান্তরবাসী পণ্ডিত এবং নগরের সমুদয় লোক আমাকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া হাস্য করিবে। অতএব কিছু না বলাই ভাল।" সুতরাং পণ্ডিতের জয় হইল; নবদ্বীপের দিগ্বজয়ী পণ্ডিতবর সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। সেই দিবস হইতে কোন বিষয়ের প্রমাণের জন্য আর কেহ নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিতে সাহসী হইত না। যখন কেহ কোন বিষয়ের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পণ্ডিতকে কহিত "প্রমাণ কোথায়?" পণ্ডিত অমনি উত্তর দিতেন "দেখে লও মিঞা"। আর তাহার পরে একটী কথাও উঠিত না; প্রশ্নকর্ত্তা নিরুত্তর হইয়া থাকিতে বাধ্য হইত।

পাঠকগণ! গল্পটা এবারে শেষ হইয়া

গেল। গল্পটা কেন লিখিলাম, তাহা এখনও কহি নাই। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, এদেশে ইংরাজ শাসনে এত দিনের শিক্ষা, সভ্যতা, রাজভক্তি ও বিবিধ প্রকার অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির পরে "দেখে লও মিঞা" এই চমৎকার নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নবীন নীতি অনুসারেই রাজ্যশাসন হইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গ দেশের ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় (লেজিজ্‌লেটিব কৌন্সীলে) একজন অনরেবল সভ্য মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঙ্গালাদেশে বহুসংখ্যক সুযোগ্য, বহুদর্শী, উচ্চ-অবয়ব্‌ ও শিক্ষিত ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে বিলাত হইতে অল্পবয়স্ক নবীন যুবকগণকে বহুব্যয়ে আনাইয়া এদেশের শিক্ষা বিভাগে উচ্চতর বেতনে নিযুক্ত করা হইতেছে কেন?" গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দিলেন, "বিলাতের সাহেব এদেশীয় লোক অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য।" সভ্য বলিলেন "ইহার প্রমাণ কোথায়? গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা যে নির্ভুল,তাহার প্রকাণ কি?" উত্তর হইল, "তোমরা তাহা দেখে লও"। এই খানেই উত্তর শেষ!! আর কথাটী নাই! আবার প্রশ্ন হইল—"বহুবর্ষ কাল ব্যাপিয়া কয়েকজন এতদ্দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অতীব যোগ্যতা, সুখ্যাতি, রাজভক্তি ও সচ্চরিত্রতা সহ চাকুরী করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পদোন্নতি অথবা বেতন বৃদ্ধির সময়ে, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া একজন নিম্নশ্রেণীস্থ অল্প বেতন-ভোগী ও অল্পদিনের ইংরাজ ডেপুটীকে ইহাঁদের উচ্চতর স্থানে ও উচ্চতর বেতনে উন্নীত করা হইল কেন?" প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটরি কহিলেন "Merits and not seniority are observed" অর্থাৎ "গুণ এবং পারদর্শীতা অনুসারেই এরূপ করা হয়।" সভ্য জিজ্ঞাসিলেন "উঁহাদের অপেক্ষা ঐ নবীন সাহেব যে অধিকতর গুণবান ও সুযোগ্য, তাহার প্রমাণ কি?" সাহেব বলিলেন, "তোমরা তাহা দেখে লও"।

কৌন্সীলে বজেট আলোচনা করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট কহিলেন "ধনধান্যে এদেশের অবস্থা গতবর্ষে অধিকতর উন্নত। প্রজা সাধারণের অবস্থা খুব ভাল; দেশের কোথাও বিশেষ জলকষ্ট বা অন্নকষ্ট নাই। যাহাদের বাটীতে পূর্ব্বে এক তোলা রৌপ্য পাওয়া যাইত না, এখন সেই বাটীতে বড় বড় সোণা রূপার অলঙ্কার দেখা যাইতেছে। শিক্ষার চর্চ্চাও বাড়িয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।" কৌন্সীলের সভ্য বলিলেন "একথা ঠিক নয়। দেশে ভয়ানক অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার প্রবাহ দেখা যাইতেছে। প্রজার অবস্থা অতীব জঘন্য। শিক্ষার প্রচার এত সামান্য যে, তাহা প্রায় গণনায় আইসে না। অতএব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যে পুনঃ পুনঃ সুখ, স্বচ্ছন্দতা, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির কথা কহিতেছেন; তাহার প্রমাণ কোথায়?" গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে উত্তর হইল—"দেখে লও মিঞা" (You better book yourself into that, good Sir.)

মান্দ্রাজের গবর্ণরের কৌন্সীলে এতদ্দেশীয় অনরেবল সভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিগত অষ্টাদশ বৎসর কাল মধ্যে পাঁচটী নেটিব ভিন্ন আর কোন এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক উচ্চ বেতন বা উচ্চ পদে নিযুক্ত বা উন্নত হয় নাই। কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ কাল মধ্যে একশতাধিক ফিরিঙ্গির অযথা নিয়োগ ও পদবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহারা অতি উচ্চবেতন

পাইতেছে। ইহার কারণ কি?" উত্তর হইল, "তোমরা তাহা বুঝে লও।" তোমরা তাহা দেখে লও।" বোম্বায়ের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন হইল "প্রায় দশ বর্ষাধিক কাল হইতে এতদঞ্চলে ভয়ানক প্লেগের প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ইহার শীঘ্র অবসান হইবে, এরূপ ভরসাও নাই। প্লেগের দমন অথবা বিস্তার নাশের জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে, জাহাজের বন্দরে, বড় বড় রাজপথের পার্শ্বে যাত্রীদিগের পরীক্ষা করা হইতেছে। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ডাক্তার-দিগের দ্বারা যে সকল ভয়ানক অবিচার, অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহার হইয়া গিয়াছে ও নিত্য নিত্য হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট অবশ্য অবগত আছেন। এমন অবস্থায় সুযোগ্য দেশীয় ডাক্তারগণকে এ পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয় না কেন? বিশেষতঃ স্ত্রী-যাত্রীর জন্য এতদ্দেশীয়া পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী এবং চিকিৎসিকা নিযুক্ত করিবার কেন বন্দোবস্ত করা হয় না? উত্তর হইল "ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় লোকেরা অধিকতর কর্ম্মকুশল, পরিশ্রমী ও সৎব্যবহারকারী।" সভ্য বলিলেন, "তাহার প্রমাণ কি?" উত্তর হইল, "দেখে লও মিঞা।" মহামান্য বড়লাট সাহেব বাহাদুরের কৌন্সীলে জনৈক দেশীয় সভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "এদেশে অহিফেন ও সুরার বহু প্রচারে সরকারী আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি কিম্বা রোগ ও দরিদ্রতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই, একথা গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া কহিলেন? ইহার প্রমাণ কি?" উত্তর হইল "তোমরা তাহা দেখিয়া লও।" ঢাকার ছোট লাট ফুলার সাহেবকে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কহেন, আপনার দুইটী স্ত্রী আছেন; একটী মুসলমানী আর একটী হিন্দু-কন্যা। ইহার মধ্যে মুসলমানী স্ত্রীকে অধিক ভালবাসেন বলিয়া ঘোষণা করেন কেন?" ফুলর উত্তর দিলেন "You better look yourself, Sir. "তুমি তাহা দেখে লও মিঞা।" কুমিল্লায় এত অত্যাচার, এত লোমহর্ষণ হাঙ্গামা হইয়া গেল, অথচ পুলিষ বা ম্যাজিষ্ট্রেট নীরবে বসিয়া রহিলেন। এক সাহেব সুযোগ্য বাঙ্গালী উকিল মহাশয় জেলার মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সাহেব বলিলেন "তোমরা অর্থাৎ হিন্দুরা তোমাদের দলপতি বিপিন পালের নিকটে গিয়া প্রতিকার প্রার্থনা কর। এখানে কিছু প্রতিকার হবে না।" উকিল বলিলেন "এমন বিশ্ববিক্রমী বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী থাকিতে আমরা বিপিন পালের নিকটে যাইব কেন?" উত্তর হইল, "তোমরা তাহা দেখে লও।" বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহাতে প্রায়ই শুনা যায়—"এখন আর সে সকল কথার আলোচনা করিবার আবশ্যকতা দেখি না।" "গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কিছু করিতে বা কহিতে সম্মত নহেন," যাহা করিবার তাহা করা গিয়াছে, আর কিছু করা যাইবে না; এ সম্বন্ধে গুপ্তকথা প্রকাশ করা যাইবে না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে উত্তর হইবে "তবে দেখে লও মিঞা।" ইহার পরে একেবারে দুই পক্ষই নিরুত্তর; আর একটী কথাও চলিবে না। তাহাতেই বড় দুঃখে কহিতেছি, দেখে লও মিঞা। এই নবীন নীতি অবলম্বন করিয়া এখন ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অপরন্ধা কিং ভবিষ্যতি। যে যাহার ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে, অথচ আমাদের

কথাটী কহিবার শক্তি নাই কিম্বা একটী অক্ষরও লিখিবার সাহর্য্য নাই। অস্ত্র শস্ত্র বিষয়ক আইন আছে, সিডিশন ল আছে, দণ্ডবিধি আইনের ১৮৭ এবং ১৮৬ এবং ১৫৩ (A) ধারা আছে, কোম্পানীর রেগুলেশন আছে, পেনেল কাডের ১২১ ও ১২৫ ধারা আছে, কোর্ট মার্শাল ল আছে,—অর্থাৎ আছে সব এবং জানি সব, কেবল কবে মর্ব্বো, তাহাই জানি না। ঘাটের পথও চিনি, মাঠের পথও চিনি, কেবল মরতে জানিনা, এই দুঃখ। পার্লামেণ্টে ওয়ারেন্ হেষ্টীংশের যখন বিচার হইয়াছিল, তখন নাকি তিনি সগর্ব্বে কহিয়াছিলেন "ভারতের লোকেরা গোলাম; তাই আমি তাহাদিগের সহিত গোলামোচিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি"। সেই অবধি অনেক ইংরাজের ধারণা, ভারতবাসী এখন ত গোলাম এবং গোলামের জাতি ও বংশধর। একটা প্রবাদ আছে, স্বর্ণকারের সম্মুখে সোণা কহিয়াছিল "হে স্বর্ণকার! তুমি আমাকে অগ্নিতে দাহ করিয়া হাতুড়ী দ্বারা সজোরে আঘাত কর, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নহি, কিন্তু ধাতুশ্রেষ্ঠ সুবর্ণকে তুমি গুঞ্জ সহ একত্রে (সম ভাবে) ওজন কর, ইহাই আমার পরম দুঃখ"।

অগ্নি দাহে ন মে দুঃখং, ন দুঃখং লৌহ তাড়নে।
ইদমেব মহদ্দুখং গুঞ্জয়া সহ তোলনে॥

এখন প্রশ্ন এই, উপায় কি? শ্বেতকায় ইংরাজের সহিত তুমি কৃষ্ণকায় নেটিব কি সখ্যতা করিতে চাও এবং মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চাও? কিন্তু তাহা তো একেবারেই অসম্ভব। আড়াই শত বৎসরের বহুদর্শীতায় আমরা বুঝিলাম, এরূপ মিলন একেবারেই অসম্ভব। যাঁহারা এরূপ মিলনের আশা করেন বা আশা দেন, তাঁহারা মূর্খ হইতেও মূর্খতর! হিউমই বল, আর ওয়েডারবরণই বল, কটনই বল আর জটন্ই বল, শাদায় কালোয় মিশিবেনা ও মিশিবেনা। ইহা ধ্রুব সত্য।

বিড়ালে ইন্দুরে সখ্য, হবিষ্যান্ন বাঘের ভক্ষ্য,
দেখে শুনে বুদ্ধি হলো হত।
ইংরাজে নেটিবে হবে মিল, তালের তুল্য হবে তিল,
বধিরে শুনবে বোবার গান শত।
অসম্ভব কি হয়রে বোকা! চাঁদে তুল্য জোনাকি পোকা?
বাসুকি নাগের তুল্য হয় কি ঢোড়া?
তুল্য হয় কি গরুড়ে কাকে, মেঘের গর্জ্জন ঢাকে কি ঢাকে,
ঘোড়ার সঙ্গে তুলা হয় কি ভেড়া?
সাধুর কাছে যেমন চোর, হাতির কাছে বন্যশূকর
পদ্মফুলের কাছে কি শিমুল ফুল?
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা, সাগরের কাছে কি সার ডোবা,
গজমতির কাছে কি শোভে কুল?
তুল্য হয় না কাঁচ আর হীরে, গুবরে পোকা আর সত্যপীরে,
ফকিরের কাছে কি ফকর শোভা পায়?
ভায়া! অমৃতের তুল্য হয় না বিষ, পুতুলের তুল্য হয় কি জগৎকর্ত্তা জগদীশ?
রেলের তুল্য কি হেঁলে চলে যায়?

তাহাতেই পুনরায় বলি, সাপে আর নেউলে যদি হয় সখ্য, মক্কার মশিদে যদি হয় মোক্ষ, আর ইংরাজী হোটেলে যদি থাকে হবিষ্যান্ন ভক্ষ্য, তাহা হইলে কৃষ্ণে ও শ্বেতে মিশ্ খাইতে পারে।

বক মানায় না হংস মাঝে
মুর্গীকে কি ময়ুর সাজে?
বেতো ঘোড়া পক্ষি রাজে,
তুল্য হয় কি শুকে বাজে?
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা,
শেয়ালে কি হয় সিংহের রাজা?
বাতাসা কি হয় খাসা খাজা?
তুল্য হয় কি তীরে বাজে?

তেলের সঙ্গে মিশেনা জল,
ডিমের সঙ্গে মিশে কি ফল ?
সাধুর সঙ্গে মিশেনা খল,
পাথর সাথে মিশে কি কাদা ?
ভায়া ! সম্ভবে মিলেনা অসম্ভব,
ভৈরবী রাগে মিশেনা গাধার রব,
জীবিতের সাথে মিলেনা শব,
কালোতে মিশিবে কেমনে শাদা ?

সেদিন বিলাতের একখানা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্বাদপত্র-সম্পাদককে একজন বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি শুনিয়া থাকিবেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক নেটিবের প্রাণ নিহত হইতেছে, অথচ ইহার প্রতিকার বা সুবিচার হয় না ; নেটিবের প্লীহা ফাটা রোগ আছে বলিয়া বিচারপতি সাহেব আসামীকে মুক্তি দেন। আপনি ইহার কিরূপ প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দেন ?" সম্পাদক মহাশয় কহিলেন "শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীগ্রামে ও প্রতি নগরে ম্যালেরিয়া নামক রোগ আছে। সেখানকার লোকেরা অধিক ভাত খায় এবং ঐ ভাত হজম করিতে পারেনা, প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি হয় সুতরাং সাহেবদের হস্তের একটা মাত্র ঘুষিতে অথবা একবার মাত্র পদাঘাতে মরিয়া যায়। আমার বিবেচনায়, ভারতবর্ষীয় নেটি-বের পক্ষে এখন (Light Food) লঘু পথ্য আহার করা উচিত, তাহা হইলে অকারণে প্লীহা যকৃত বাড়িবেনা এবং সাহেবের হাতে সহজে প্রাণ যাইবে না।" পাঠকগণ, উপরি উক্ত ইংরাজ-সম্পাদক এ কথা যে তামাসা-চ্ছলে কহিয়াছেন,তাহা নহে,বাস্তবিক ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজের অভিজ্ঞতাই এইরূপ !! যদি সম্পাদক সাহেবের কথানুসারে চলিতে হয়, তাহা হইলে বলা আবশ্যক—

এখানে বাবু হবেন কাবু ;
সাগু খেয়ে পেট্ পূরবে।
Liver, Fever উড়ে যাবে,
শুধু clean spleen থাক্‌বে।
বুড়ো বুড়ি খাবে মুড়ি ; যুবা খাবে খই।
প্রবীণ খাবে নবীন চিঁড়ে আর টকো দই।
মুড়্‌কি খাবে এডিটর ; "বক্তা"শাকের ঝোল।
বৃদ্ধ ভণে, ফুল্ল মনে, হরি হরি বোল॥

একবার বিলাতের একটা যুবক কহিয়াছিল, "আমি আমার পিতার সঙ্গে একবার পার্লা-মেণ্টে গিয়াছিলাম। সেখানে যেই ভারতের কথা উঠিল, অমনি সমস্ত সভ্য নাক ডাকা-ইয়া ঘুমাইতে লাগিল। ইহাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষ খুব ভাল দেশ, সেখানকার সকল লোক খুব ঘুমায়, সুতরাং বোধ হচ্ছে ভারত-বর্ষ দেশের একটা নিদ্রাকর্ষিণী মোহিনী শক্তি আছে।" সাবাশ !! এইরূপ অনভিজ্ঞতাই, "দেখে লও মিঞা" নীতির মূল মন্ত্র। ভার-তের লোককে এখনও ইংরাজেরা অসভ্য, কাপুরুষ ও গোলাম ভাবে, তাই সকল কথা-তেই "দেখে লও মিঞা" নীতির সৃষ্টি। যদি বল, শ্বেতে ও কৃষ্ণে মিলন সম্ভব, তাহা হইলে আমি কহিব—

তাও কি হয়, তাও কি হয়,
তাও কি লয় ভাই।
শ্বেত কৃষ্ণ মিলনের কোন উপায় নাই।
তাও কি হয়, তাও কি হয়,
তাও কি হয় মিঞা !
ওহে ! কোকিল ২ থাকে, পাপিয়া পাপিয়া।
তাও কি হয়, তাও কি হয়,
তাও কি হয়, জ্ঞানীবর !
গাধীতে ঘোড়ায় মিলিলে হয়
(মিউল) অশ্বতর।

ইহাতেও যদি কেহ আশা বা ভরসা করেন,

যে, বিশ্ববিক্রমী শ্বেতপুরুষের সহিত বিশ্বত্রাসী হতভাগ্য কৃষ্ণকায় গোলামের অকৃত্রিম বন্ধুতা হইবে, তাহা হইলে আমিও এই প্রবন্ধের উপসংহার কালে বলিয়া রাখি "তবে দেখে লও মিঞা"।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# কটাসেন।

মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে, ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজি সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহী-সৈন্যের সাহায্যে নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অসময়ে, অতর্কিত ভাবে এরূপ আক্রমণে একটী নগর অবশ্যই অধিকার করা যাইতে পারে এবং পৃষ্ঠপোষক অন্যান্য সৈন্যের দ্বারা দেশের অবশিষ্টাংশ জয় করা যাইতে পারে। অবশ্যই এক্ষেত্রে রায় লক্ষ্মণীয়ার শিথিলতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পায়। কিন্তু মাত্র ২৫০ জন সৈন্য দ্বারা প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলে, বিতাড়িত সৈন্যের ভীরুতা ও অকর্ম্মণ্যতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। কটাসেনের যুদ্ধে ২৫০ জন হিন্দু-সৈন্য পঞ্চাশ সহস্র মুসলমান সৈন্যকে বিতাড়িত করে।

কটাসেন "কি এবং কোথায়," এবিষয়ে ষ্টুয়ার্ট, ব্লকমান, ডাউসন, ষ্টার্লিং, টমাস, রেক্কিং, রাভের্টি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক মস্তিষ্কচালনা করিয়া নিষ্ফলকাম হইয়াছেন। বালেশ্বরের অনেক প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারকারী বিমস সাহেব এবং রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদুল সালাম প্রভৃতি কেহই কটাসেনের অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করেন নাই। এমন কি, গভর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত বঙ্গদেশের প্রাচীন কীর্ত্তির লিষ্টে (List of ancient monuments in Bengal) এই কটাসেনের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। অথচ এই কটাসেন উড়িষ্যার একটী প্রধান হিন্দুকীর্ত্তি।

কটাসেন, বা কাটাসিন অথবা কোটাসনি, বর্ত্তমান নাম রাইবনিয়া দুর্গ বা গড় বালেশ্বর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে সুবর্ণরেখা নদীর পারে অনুমান তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুর্গ সুবর্ণরেখার ঘাট ও পুরীর রাস্তা রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও দুর্গের পরিখা, প্রাচীর ও অভ্যন্তরের কতক অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে। দুর্গপ্রান্তর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা সুরক্ষিত। অভ্যন্তরে কোটাসনি দেবীর মন্দির। এই দেবীর নাম, কোট বা দুর্গ অভ্যন্তরে বাস হেতু, এইরূপ হইয়াছে। দুর্গপ্রাচীর প্রত্যেক পার্শ্বে এক মাইলেরও অধিক দীর্ঘ, সুতরাং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম অপেক্ষাও বৃহৎ। লেখকের সময়াভাব হেতু দর্শনকালে আয়তনাদির পরিমাপ অথবা প্রাচীন তথ্যের সম্যক অনুসন্ধান হইতে পারে নাই। দুর্গের পার্শ্বেই রাইবনিয়া গ্রাম অবস্থিত।

এই দুর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার সুবিখ্যাত রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব কর্ত্তৃক স্থাপিত ও নির্ম্মিত হয়। উড়িষ্যার উত্তর-সীমায় ও বঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত হেতু কটাসেন দুর্গ জয় না করিলে কাহারও উড়িষ্যায় প্রবেশের সাধ্য ছিল না। নদীর পরিবর্ত্তনে রাজঘাটে উড়িষ্যা গমনের রাস্তার খেয়া হওয়াতে রাইবনিয়া বা কটাসেন দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তবাকতইনসিরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কটাসেন লক্ষ্ণৌতির এলাকা ও যাজনগরের সীমায় অবস্থিত। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসে কটাসেনের অবস্থান-অনভিজ্ঞ হেতু এবং উড়িষ্যার মাদলা পাঞ্জি প্রভৃতিতে এই যুদ্ধের উল্লেখ না থাকাতে, যাজনগরকে উড়িষ্যা বলিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। এলফিনষ্টোন ত্রিপুরাকে যাজনগর বলিয়াছেন। এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণও তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে (রাজমালায়) যাজনগরের নামোল্লেখ নাই। অপর পক্ষে যাজনগরকে মুসলমান লেখকগণ কাজপুরও

বলিয়াছেন। সকলেই জানেন, যাজপুর উড়িষ্যায়। বারনি লিখিয়াছেন যে, সুলতান মগিস ১২৮০ খ্রীঃ সোণারগাও হইতে ৭০ মাইল দূরে যাজনগর গমন করিলেন। সোণার গাঁ হইতে ৭০ মাইল দূরে যাজনগর, উড়িষ্যায় হইতে পারে না। কিন্তু ব্লকমান বলেন যে, এই সোণারগাঁ সাতগাঁ হইবে এবং তাহাই সম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ যাজনগরের রাজার জামাতা লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। তাহার নাম তবাকতইনসিরিতে সাবন্তরা বলিয়া উল্লেখ আছে। এই সাবন্তরা অবশ্যই সামন্তরায় নামক সুবিখ্যাত উড়িয়া উপাধী। রাজা অনঙ্গভীম দেবের সময় সামন্ত রায়, পট্টনায়ক, সেনাপতি প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হয়। অনঙ্গভীম ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরলোক গমন করেন। সুতরাং যাজনগর যে উড়িষ্যা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

তবাকতইনসিরির গ্রন্থকার মিনহাজী শিরাজ কটাসেনের যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা যুদ্ধ বৃত্তান্ত গ্রহণ করিলাম।

হিজিরা ৬৪১ মোতাবেক ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যাজনগরের রায় লক্ষ্ণৌতির এলাকায় উপদ্রব আরম্ভ করেন। তাঁহার উপদ্রবে বাঙ্গালার তদানীন্তন পাঠান-শাসনকর্ত্তা তুগন খাঁ উক্ত সনের সওয়াল বা কার্ত্তিক মাসে রওনা হইয়া ৬ই জিলকদ বা অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে কটাসেন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে হিন্দু সৈন্য তিনটী পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া মুসলমান-সৈন্যের প্রতীক্ষায় সজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত ছিল। মুসলমান সৈন্যগণ কটাসেন ও নিকটবর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রবল বেগে হিন্দু-সৈন্য আক্রমণ করেন। মুসলমানগণ দুইটী পরিখা অধিকার করিলে হিন্দুসৈন্য পলায়ন ভান করিয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎপদ হয়, কিন্তু হস্তির ঘাস ভিন্ন অপর কোনও বস্তু মুসলমানগণের হস্তগত হয় নাই। হিন্দুহস্তিগণ নির্ব্বিরোধে প্রস্থান করিল এবং মুসলমান-সৈন্য যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এইরূপে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মুসলমান-সৈন্য আহারে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ২০০ দুই শত হিন্দু পদাতিক ও পঞ্চাশ জন হিন্দু অশ্বারোহী নিবিড় বেত্রবনের অভ্যন্তরস্থ পথ দ্বারা ঘুরিয়া হঠাৎ অতর্কিত ভাবে মুসলমান সৈন্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পাঠানসৈন্য বিধ্বস্ত ও পলায়নপর হইল। বহু সৈন্য হতাহত হইল এবং প্রভূত লুণ্ঠন দ্রব্য জেতাগণের হস্তগত হইল। তুগন খাঁ ভগ্ন সৈন্য সহ অতিকষ্টে লক্ষ্ণৌতিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

৬৪২ হিজিরা ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যাজনগর সৈন্য রাজজামাতা সাবন্তরার অধীনে লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। এই সৈন্যে অনেক হস্তি ও অসংখ্য পাইক সৈন্য ছিল। সাবন্তরা কটাসেন লুণ্ঠনের প্রতিশোধ দেওয়ার মানসে লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। তিনি প্রথমে লক্ষুর নামক স্থান আক্রমণ করেন। করিমউদ্দিন ফজলল্‌মুলক নামক পাঠান সেনাপতি লক্ষুর রক্ষা করিতেছিলেন। সাবন্তরা তাহাকে সসৈন্য নিহত করিয়া লক্ষুর অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। তুগন খাঁ সাহায্য জন্য সম্রাট আলাউদ্দিন মসুদসার নিকট প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বহু সৈন্য বঙ্গে আগমন করাতে সাবন্তরা লুণ্ঠন দ্রব্য সহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে সুবিখ্যাত রাজা লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষ্টার্লিং ও হাণ্টারের মতে ইনি ১২৩৭ খ্রীঃ হইতে ১২৮২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি ১২৩৮ খ্রীঃ হইতে ১২৬৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বঙ্গদেশে যুদ্ধ কালে ইঁহার জামাতা সামন্তরায় সেনাপতি হেতু তাহার কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করা মাদলা-পাঞ্জি লেখকগণ সঙ্গত মনে করেন নাই। এই রাজার রাজত্ব কালে কনারকের বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির Black Pagoda নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, নিতান্ত অবিশ্বাসীও ইহা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করেন। এই রাজার শারীরিক বল, ক্ষমতা ও বুদ্ধি দর্শনে অমানুষিক বিবেচনায় লোকে ইহার লাঙ্গুলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পুনরায়

নরসিংহ দেবের সহিত বঙ্গের পাঠান রাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজ-জামাতা সামন্তরায় বিশেষ বিক্রমের সহিত মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করেন। দুইটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি হীনসাহস না হইয়া প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেন। তৃতীয় যুদ্ধে মালিক উজবেগ তুগ্রিল খাঁ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার একটী শ্বেত হস্তি ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য সম্ভার হিন্দুগণের হস্তে পতিত হয়।

(বদায়ুনি, তবাকতইনসিরি, ব্লকম্যান, জিওগ্রাফী অব বেঙ্গল, ষ্টার্লিং, উড়িষ্যা হণ্টার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

# স্বদেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

জন্ম—১২৬৮ সালের—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। মৃত্যু—১৩১৪ সালে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, (১৯০৭) হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থ মহাসমুদ্র বক্ষে।

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি বুঝিবি তাহা অন্যে কেহ জানে না,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা।" বসু দীনেশচন্দ্র।

বিগত কার্ত্তিক মাসে, যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম, তখন একদিন, কাঞ্চলিয়া গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে দুপ্রহরান্তে আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময়ে, একটী বালক এই গানটী গাইয়াছিল—

রাউলের সুর।

শোনরে ভাই দেশের দশা কি দুর্দ্দশা
গেলরে দেশ রসাতলে।
হয়েছে দারুণ আকাল নাই কালাকাল
ফরিদপুর আর বরিশালে॥
শিশুরা দারুণ ক্ষুধায় কেঁদে লুটায়
কি খাব কি খাব বলে।
হারায়ে বুদ্ধি শুদ্ধি ইমানদ্দি
কেটেছে তার কোলের ছেলে॥
ঘরেতে নাইক মুঠি দিবে দুটী
পরিজনের মুখে তুলে।
করেছে আত্মহত্যা হায় অগত্যা
কৈলাস এক কামারের ছেলে॥
উঠেছে ঘোর হাহাকার রক্ষা নাই আর
মরবে কত দলে দলে।
ওরে ভাই যার আছে প্রাণ দেও কিছু দান
দেশের এমন বিপদকালে॥

গানটী শুনিবার সময় চক্ষের জলে আমাদের বদন ভাসিয়া গিয়াছিল, আমরা আরআহার করিতে পারিয়াছিলাম না। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের কঙ্কালময় ছবি, অনাহারের হাহাকার রবের মধ্যে এই মধুর গানটী আমাদিগের মনে যে ভাব জাগাইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমাদের নাই। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, গানটী কাব্যবিশারদের। তাঁহার রচিত আরো অনেক গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছি, কিন্তু এরূপ জীবন্ত গান জীবনে আর কখনও শুনি নাই। যে ব্যক্তি এরূপ জীবন্ত গান রচনা করিতে পারেন, তিনি অলৌকিক শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন ভাবি নাই, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এহেন ব্যক্তিকে হারাইব। কাব্যবিশারদের শোকে আমরা অবসন্ন হইয়াছি। কাব্যবিশারদ ক্ষণজন্মা পুরুষ।

কাব্যবিশারদের ৺পিতৃদেবও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। আমরা ভবানীপুরে এল-এম-এস ইনষ্টিটিউসনে তাঁহার নিকট বহুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিলে চক্ষে জল আইসে। কালীপ্রসন্ন তখন বালক ছিলেন। পিতার অশেষ গুণে তখন তিনি ভূষিত হইতেছিলেন। কালীপ্রসন্ন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান।

যুবক কাব্যবিশারদ পাদ্রীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতেন, তাহা আমরা জানি।

রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমলের তীব্র সমালোচনায় কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাও জানি। তিনি ৺যোগেন্দ্রনাথ বসুর ধর্ম্মভবন সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাও জানি। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের জন্য কিরূপ নির্ভয়ে লেখনী চালনা করিতেন, তাহাও জানি। তাঁহার রচিত একটী কবিতা লইয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাও জানি। এসকলই এজগতে ঘটিতে পারে, ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার স্নেহ, বা তাঁহার বিদ্বেষ, তাঁহার সাহস বা তাঁহার অহঙ্কার, তাঁহার শক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তি, তাঁহার ভাল এবং মন্দ যে দিন হইতে মাতৃভূমির চরণে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা তুলনা-রহিত, তাহা এ জগতের অতি আদরের জিনিস। কালীপ্রসন্ন গুরুপুত্র বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতাম না; তিনি ক্ষমতাশালী বলিয়াও ভালবাসিতাম না; তিনি মায়ের অকৃত্রিম ভক্ত সন্তান, এই জন্যই তাঁহাকে হৃদয়ে পূজা করিতাম। বঙ্গের যে অকৃত্রিম রত্ন সাগরবক্ষে বিসর্জ্জিত হইয়াছে;—এরূপ রত্ন এদেশে নিতান্তই দুর্লভ জিনিস।

এক ছিলেন রমাকান্ত, আর ছিলেন কাব্যবিশারদ;—আমরা জানিতাম,এই দুই-ই স্বদেশী-আন্দোলনের দুর্জ্জয় মহাশক্তি। যখন কার্য্যের জটিলতায়, বা নৈরাশ্যের তীব্রতায় প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন এই দুই দেবতার কথা ভাবিয়া সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হইতাম, ভাবিতাম, যে দেশে এহেন দুই দুর্দ্ধর্ষ বীর বর্ত্তমান, সে দেশের আর চিন্তা কি? ভাবিতাম, ইংরাজের প্রলোভনে সব লোক ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইঁহারা পারেন না। ইঁহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃত প্রাণে বল পাইতাম, নিরাশ হৃদয়ে দুর্জ্জয় সাহস পাইতাম। কিন্তু হায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইঁহারা তিরোহিত হইলেন! দারুণ দুঃখে প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বঙ্গের ঘোর দুর্দ্দিন যে আসিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কি গুণে কালীপ্রসন্ন এদেশে পূজ্য হইয়াছিলেন? তাঁহার লেখায় নয়,গানে নয়,বক্তৃতায় নয়,—কেবল তাঁহার স্বদেশ-প্রেমে। তাঁহার লেখা,বা গান বা বক্তৃতা যখন স্বদেশপ্রেমের স্বর্গীয় সুধায় অভিসিঞ্চিত হইত, তখন সব যেন মধুময় হইয়া যাইত;—যে পড়িত, সে তন্ময় হইত; যে শুনিত,সে ভাবে বিভোর হইত। কাব্যবিশারদ স্বদেশপ্রেমের অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট।

তদীয় জীবনের ভুল ভ্রান্তি, হিংসা বিদ্বেষ, চাঞ্চল্য এবং তারল্য, শেষ জীবনে সব যখন স্বদেশ-প্রেমের জলধিতে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল, তখন নীরবে এমন এক বীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা বিস্ময়ে ভাবিত, এ কি সুন্দর দৃশ্য? যাহারা তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিয়া সুখ পাইতেন, তাঁহারাও ভাবিতেন,এ অজেয় শক্তি কোথা হইতে আসিল? লেখায় বা কথায়, ভাবে বা বক্তৃতায় কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—বিরাট-বপুর অভ্যন্তরে কেবল আগুন, কেবল আগুন। তাকাইয়া, তাকাইয়া সকলে অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিত। বঙ্গ ধন্য যে, এহেন অগ্নিমন্ত্রের সাধককে বক্ষে স্থান দান করিয়াছিল। আর আমরা? আমরা স্বদেশী সন্তানবৃন্দও ধন্য যে, এহেন অগ্নিময় হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছি।

তিনি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক কে নয়?—তুমি,আমি,সে—কে না স্বদেশপ্রেমিক? তিনি ব্যক্তিত্ব বা স্বার্থ সাধনের অন্যতর উপায় রূপে স্বদেশের হিত-সাধনে তৎপর ছিলেন না, কিন্তু মানবের চরম আদর্শ যে নিষ্কাম অনাবিল স্বাধীনতা, তাহা লাভের জন্য, আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা নিষ্কাম সাধনা ছিল, তিনি কোন দিন পূতিগন্ধময় স্বার্থ-সাধনের জন্য স্বেচ্ছাচার বা অদম্য প্রতারণা, বঞ্চনা বা কপটতার প্রশ্রয় দেন নাই। প্রকৃত বীরের মধ্যে কখনও স্বার্থপরতা বা কপটতা, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বা পরস্ত্রীকাতরতা দেখিতে পাইবে না। যেদিন হইতে কাব্যবিশারদ স্বদেশ-প্রেমিকত্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দিন

হইতে অটল প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তিনি আপনার বক্ষকে উদারতার রাজ্যে পাতিয়া দিয়াছিলেন,—বঙ্গের সকল সন্তানের সেবাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু সে জ্ঞানে কখনও অহঙ্কার স্থান পায় নাই, তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন, কিন্তু সে প্রতিভায় কলঙ্কিত আত্মাভিমানের ছায়া প্রকটিত হয় নাই। তিনি জ্ঞানের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত হইয়া, প্রকৃত বীরত্বের দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া যখন এই বঙ্গে, "স্বদেশ, স্বদেশ" বলিতে বলিতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন সবিস্ময়ে সকলে তাঁহাকে স্বদেশের রাজা বলিয়া বাক্য মনে স্বীকার করিল। সেই স্বীকৃতি বলে তিনি শয়নে স্বপনে কেবল স্বদেশের হিতকামনা করিতে লাগিলেন এবং রোগে শোকে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, কেবল স্বদেশের জন্য খাটিতে লাগিলেন। খাটিতে খাটিতে, মজিতে মজিতে—দূরের রোগকে আরো নিকটে আনিলেন—মৃত্যুকে আরো নিকটে আনিলেন। বলিতে কি, তিনি আমাদের ন্যায়, বঙ্গের দুর্দ্দশা,—ভারতের দুর্দ্দশা,—নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, অত্যাচার, অবিচার দেখিতে আর ফিরিয়া আসিলেন না; পুণ্যবান অনন্ত সাগর-বক্ষে আপন দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। হায়, তিনি যদি ফিরিতেন, বুঝি বা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিবার জন্য রিয়েঞ্জির বেশে বঙ্গকে উজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আত্মিক-জগতে অবতরণ করিয়া তদীয় পূতজীবন বঙ্গে ঢালিয়া দিতেছেন! তিনি বঙ্গে অমরত্ব, চির-অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

# শোকোচ্ছ্বাস।

## ( কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যু উপলক্ষে )

কেনরে স্বভাব ক্ষুব্ধ,
কেনরে ভারত স্তব্ধ,
সরস কবিতা-কুঞ্জ—শূন্য কেন আজি,
বনের বিহঙ্গ গীতি
নহেক জীবন-প্রীতি,
কল্পনা-পাদপে কেন নাহি পুষ্পরাজি॥
রবি শশী গ্রহ তারা,
ঢালে নাক জ্যোতি ধারা;
সৌন্দর্য্য-আনন্দ হাসি কেন নাহি আর?
বঙ্গের গৌরব মণি,
বসুধা ভূষণ গণি;
কইরে-জীবন্ত-ছবি নর-দেবতার?
ভারত-সৌভাগ্য আলা,
অমলা-কমলা বালা;
চারু-শিল্প কক্ষে কেন নীরবে কাঁদিছে,
নীরব ভারতী-বীণা
কাঁদিছে কবিতা দীনা,
শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গ-মাতা—শোকেতে ভাসিছে!
কেন নাহি প্রেম-মেলা,
কেন নাহি হাসি খেলা;
নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য—জাতীয় মিলন।
কে সাধিল হেন বাদ,
কেন এই পরমাদ;
কি হেতু শ্মশান হেরি—ভারত-জীবন!!

বিহগ বিষাদে গায়,
করুণ বেহাগে হায়,—
নাহিক জগত-মাঝে শ্রীকালীপ্রসন্ন!
অভ্রভেদি আর্ত্তনাদে,
সবিষাদে তাই কাঁদে;
সোণার সংসার হ'লো বিয়োগ-প্রপন্ন॥
হে আচার্য্য! শুনি তব,
সুধামাখা গীতিরব,
নীরস জীবন সদা সরস হইত;
কল্পনা অতীত যাহা,
ভাষায় নাহিক তাহা;
সংসারে মুমূর্ষু নর জীবন লভিত॥
বলিতে বিদরে হৃদি,
প্রবাসে হরিল নিধি,
রবিসুত কাল—বসন্তের পিকবর।
সাধিতে মঙ্গল-ব্রত,
সাধনে হইয়া রত
সমুদ্রে সমাধি তাই নিলে কবিবর!
ছাড়ি পত্নী পুত্রধনে,
রাখি শিষ্য বন্ধুগণে,
জাপানে ধাইলে তুমি স্বাস্থ্যের কারণে।
স্বাস্থ্য না লভিয়া হায়,
প্রশান্ত সাগরে তায়,
বর্জ্জিলে জীবন-রত্ন কালের তাড়নে॥

উদার নির্ভীক-চেতা,
অতুল্য আদর্শ-নেতা,
ফেলিয়া কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র কোথায় চলিলে ?
তোমার মতন কেবা,
করিবে স্বজাতি-সেবা ;
জাতীয়-উন্নতি--ব্রত—ছাড়িয়া রহিলে ॥
আর্য্যের মঙ্গল হেতু,
সৃজিয়া যুক্তির সেতু ;
তর্কাস্ত্রে খ্রীষ্টানে কেবা পরাস্ত করিবে।
কাব্যরস ভাব-শুদ্ধ,
কিম্বা যাত্রা গীতিযুক্ত,
ললিত প্রবন্ধ ছন্দ কে আর রচিবে !
জানাইতে দেশ-কথা
সুবক্তৃতা যথাতথা,
কে করিবে, কে লিখিবে, প্রতি ছত্রে পত্রে ?
রাজভৃত্য অত্যাচার,
অবিচার অনাচার,
বর্ণিবে কে, আর বলো হিতবাদী পত্রে ?
কাহারে শুনাব কথা,
কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
ভুলিতে পারি না হায় সে মূর্ত্তি তোমার ;
বিহনে উদার রথী,
কেই বা ব্যথার ব্যথী,
স্বজাতি নিমিত্ত আজি বল একবার ?

পরিশ্রমে হ'য়ে ক্লান্তি,
লভিবারে চির শান্তি,
প্রশান্ত-সমুদ্রবক্ষে করিলে শয়ন !
সহিয়া নিয়তি জ্বালা,
ধরিয়া শোকের মালা ;
বিশুষ্ক হ'য়েছে তাই বঙ্গের বদন।
ফেলিয়া সংসার খেলা,
ফেলিয়া আনন্দ-মেলা,
তাঁহার জীবন-কথা সমুদ্রে বিলীন।
কে আঁকিবে পত্রে চিত্র,—
'জাপান নহেক মিত্র' ;
ভারত তাহাতে নহে--বিষাদে নিলীন।
হে দেব রহিবে যথা,
সঙ্গীতে বলিও তথা ;
ভারত-নিবাসী হায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত !
স্বজাতির অবনতি,
পুরুষার্থ-হীন অতি,
অকাল মরণে স'বে--শ্মশানে মিলিত !!
তুমি দেব বিশ্বপতি,
ওহে অগতির গতি,
বিশারদ-পরিবারে—রক্ষ শান্তি-দানে।
উথলিত অভাগার,
শোক-সিন্ধু অনিবার ;
নিবার জীবনে দেব চাহি দীন-পানে ॥

শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী।

# আহ্বান সঙ্গীত।

বিশ্ব ভরিয়ে উঠেছে বাজিয়া
শোনরে অই বাজনা,
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !
লাঞ্ছিত হিয়া জাগাও তুলিয়া,
নব-সঙ্গীত-তানে উঠরে মাতিয়া,
চলরে চলরে ধরা কাঁপাইয়া
অই—বাজিয়া উঠেছে বাজনা,
কে রহিবে ঘরে, এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !

২

আঁধার বিদারি উঠেছে সূর্য্য,
দীপ্ত বহ্নি হৃদে নবীন বীর্য্য,
উগারি অনল,
জ্বলে ঝল মল
জাগায়ে নব চেতনা,
কে রহিবে ঘরে, এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !

৩

সাহস-গৌরবে তো . নিশান,
প্রমত্ত উৎসাহে হও আগুয়ান,
উন্মত্ত ঝটিকা কাঁপাও ভূধর,
আসুক গরজি প্রলয়ে সাগর,
তাণ্ডব নর্ত্তনে ছুটুক লহর
কি ভয় ? কি ভয় ? বলনা ?
অই শোন বাজে ভৈরব রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা !

৪

চল দেখি সবে বীরের মতন,
ঘুচাও নিরাশ কাতর ক্রন্দন।

রৌদ্রমন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
ছুটুক অশনি অগিনি মন্ত্রে,
জাগাও সাহস হৃদয়-যন্ত্রে,
গরজে ভেরী. শোন না ?
কে রহিবে ঘরে,এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !

৫

এক দিন যার কুটীরে কুটীরে
উঠিত সঙ্গীত সুমধুর সুরে,
আজি হের তার নগরে নগরে,
হা অন্ন ! হা অন্ন রবে কাঁদে নারী নরে,
শ্মশানে এখন প্রেতিনী বিহরে
স্বর্ণপুরী মলিনা !
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !

৬

ঘুচাও কলঙ্ক. যাক্ অবসাদ,
কেন এ দৈন্যতা ? বৃথা পরমাদ !
ভাই ভাই মিলি জননীর ব্যথা,
দূর করা বলো বেশী কিবা কথা ?
জাগাও শকতি, জাগাও একতা
বাঁধহ বলে আপনা !
অই শোন বাজে, ভৈরব রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা !

৭

বীরত্ব-গৌরবে চির গরবিনী,
স্বর্ণপ্রসূ মাতা বৈভবশালিনী,
হের হের আজি সে যে রত্নহারা,
দু' কপোল বাহি ঝরে অশ্রুধারা,
লাঞ্ছিতা দলিতা মলিনা কাতরা
একবার চেয়ে দেখ না ?
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবে না !

৮

সম্মুখ সমরে অরাতি দলি,
রণরঙ্গে মাতি কৃপাণ খুলি,
দেশের লাগিয়া করেছিলা রণ,
সেই বীরজাতি তোরা কি এখন ?
প্রতিজ্ঞা অটল ভীম দরশন !
একবার কিরে ভাবনা ?
জাগিতেছে চীন, জেগেছে জাপান
উঠেছে বিজয় বাজনা,
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা !

৯

জাগিয়াছ যদি জাগ এইবার,
ঘুচাও কলঙ্ক দৈন্যতা মাতার !
ভোল দলাদলি ভোল হিংসা দ্বেষ,
হও একপ্রাণ—একাত্মা বিশেষ,
থাকেনাকো যেন বিন্দু ঈর্ষা লেশ,
জাগাও সুপ্তে চেতনা,
অই শোন বাজে, ভৈরব রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা !

১০

যাও দ্বারে দ্বারে বল নিবেদন,
কে ঘুমের ঘোরে জাগরে এখন !
হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খ্রীষ্টান,
জৈন শিখ ব্রাহ্ম সকলই সমান,
ওরে তোরা সবে মিলে হও আগুয়ান
হেররে মায়ের যাতনা !
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা !

১১

মায়ের অঙ্গনে মোরা সবে এক,
ওরেরে জগৎবাসী তোরা চেয়ে দেখ্.
পূজার লাগিয়ে কর আয়োজন,
কৃষি-শিল্প আদি উন্নতি কারণ
হও সবে এক,—কর প্রাণপণ
নবভাবে কর অর্চ্চনা !
অই শোন বাজে ভৈরব রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা !

১২

নব ভাবে কৃষি চষুক মাঠ,
তাঁতি জোলা নব চালাক নাট,
সূতা জাঁতা কল ঘরে ঘরে ঘরে,
চলুক ছুটুক নব তেজ ভরে
আপনার পায়ে দাঁড়াও নির্ভরে
কি কাজ ভিক্ষা লাঞ্ছনা ?
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা !

১৩

ঘরে ঘরে শিক্ষা করহ প্রচার,
ছোট বড় ভেদ কিছু নহে আর,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিক্ষা একতার বলে,
অসাধ্য সাধন হয় ধরাতলে
আমি বড় হ'য়ে উঁচু হ'য়ে র'লে
কিছুই—কিছুই হ'বেনা ।
অই শোন বাজে, কি ভীষণ রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা !

১৪

সাম্যতন্ত্র সহ প্রেমের বন্ধনে,
ভুলি আত্মমান বাঁধ প্রাণপণে

জ্ঞানহীনা হ'য়ে, হইয়ে লাঞ্ছিতা,
তোমাদেরি ঘরে ভগিনী দুহিতা—
সহে নির্য্যাতন, ঘুচাও এ ব্যথা,
জাগাও ভারত ললনা,
কে রহিবে ঘরে, এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

১৫

আত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী,
সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী সতী—
বিদুলা, দ্রৌপদী গরীয়সী নারী,
তারাওত ছিল এই ভারতেরি,
আবার তেমন জ্ঞানদান করি
জাগাও, জাগহ আপনা!
অই শোন বাজে, কি ভীষণ রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা!

১৬

দলিত পন্নগ, তোল তোল শির,
গর্জ্জিবে লহর কর্ম্ম পয়োধির!
কি কাজ ভাবিয়ে অতীতের কথা,
বর্ত্তমানে ভাবহ ভবিষ্য বারতা,
মিছে স্বপ্ন শুধু প্রাচীনের কথা
সে সকল কিছু হ'বেনা!
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

১৭

চল-চল ছুটি এস ভাই ভাই,
সময় চলেছে আর দেরী নাই!
বাঁধহ উষ্ণীষ, কটিতে কৃপাণ,
রণসাজে সাজ গাহ জয় গান!
করে ধরে চল বিজয় নিশান,
মেঘ মল্লারে তোল মূর্চ্ছনা!
অই শোন বাজে কি ভীষণ রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা?

১৮

জয় জয় জয় জয় ভারতের,
জয় বাঙ্গালীর জয় মারাঠের
পারসী পাঞ্জাবী সবারি জয়।
অই আসে শত্রু নাহি কিছু ভয়,
দুর্ভেদ্য দুর্গে করহ আশ্রয়
জাগায় শক্তি প্রেরণা!
কে রহিবে ঘরে, এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

১৯

গর্জ্জিছে কামান ধূম উদ্গারি,
গরজিছে ভেরী কি ভয় তারি?
শত্রু-অস্ত্রাঘাতেঝরিছে রুধির
কাঁপে হাতে অসি—কম্পিত শরীর,
স্বেদবারি ঝরে হ'ওনা অধীর,
হও আগুয়ান সাহসমনা!
অই শোন বাজে কি ভীষণ রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা!

২০

অশনি ছুটিছে দামিনী ঝলকে,
জলদ গরজে রমকে ঝমকে,
প্রাবৃটের ধারা ঝরে অবিরল,
হওনা অধীর হওনা বিকল,
আছে আছে আছেরে সম্বল
হ'ওনা কখন বিমনা!
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

২১

সম্মুখে তোমার উন্নত ভূধর,
তুষার কিরীটি ভীম কলেবর,
শীতের বাতাস শ্বাসিয়া ছুটিছে,
বরফ গলিয়া তটিনী সৃজিছে,
সম্মুখের শিলা পথ রুধিছে
আগুসারি, চলনা?
অই শোন বাজে ভৈরব রবে
প্রলয় বিষাণ বাজনা!

২২

শত বাধা বিঘ্ন দলি চরণে,
চলরে চলরে অভয় শরণে
যদি থাকে তব লক্ষ্য পথ ঠিক,
বাঁধা বিঘ্ন ঠেলা সেকি গো অধিক?
হ'ওনা অবশ!—সে যে বড় ধিক্,
পথ কভু ভুলোনা!
কে রহিবে ঘরে, এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

২৩

জীবনে মরণে প্রতিজ্ঞা দারুণ
রাখিও সতত হৃদয়ে আগুন,
সরল উন্নত তরুটীর প্রায়,
উচ্চ লক্ষ্য ধরি জাগরে ধরায়,
আকাশের পানে হের গ্রহ ছুটি ধায়,
ক্ষণ তরে স্থির রয়না!
বিশ্ব ভরিয়ে উঠেছে বাজিয়ে
শোনরে অই বাজনা,
কে রহিবে ঘরে এস ত্বরা করে
দিন গেলে আর পাবেনা!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

# আগ্রা-ভ্রমণ

১৩১৩ সনের ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, আগ্রা যাইবার জন্য কাশীধাম হইতে রওনা হই। কাশীধামে যাঁহাদের বাটীতে ছিলাম, তাঁহারা অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। সে যত্ন ভুলিতে পারিব না। বাটীর সকলেই আমার ন্যায় নগণ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সৌকর্য্যার্থ যে কষ্টস্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ। এত যত্নে থাকিলেও এস্থান আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, কেননা, বহু বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান নিবন্ধন ইঁহারা আমাদিগের হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন। পুরুষ বা স্ত্রীই বল, বালক বা বালিকাই বল, ইহাদের চক্ষু স্নেহপ্রদীপ্ত ও প্রশান্ত হইলেও, একপ্রকার অলস ঔদাস্য ইঁহাদের চক্ষুর জ্যোতিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। আর এক কথা, আমাদের বাঙ্গালা দেশস্থ নরনারীদিগের হৃদয়ে যে অনাবিল স্নিগ্ধ কমনীয় ভাব দেখি, এস্থলে তাহার সহিত উদ্ধত পৌরুষ ভাব জড়িত হইয়া সমস্ত লাবণ্য শ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কারণ বহু বৎসর ধরিয়া "কিণাঙ্কিত পুরুষ কঠিন" হিন্দুস্থানীদিগের সহিত অবস্থান।

আগ্রা যাত্রাকালীন ইহাঁদের জন্য মনটা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। আমার সহিত আত্মীয় কে—বাবু যাত্রা করিলেন। কে—বাবু ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত, সুরসিক, মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে ভ্রমণকরা তেমন অভ্যাস নাই। তাঁহারই তাড়নায় বা দৌরাত্ম্যে অগত্যা আমাকেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইল।

কে—বাবুর ন্যায় বন্ধুর সহিত দেশ-ভ্রমণে ভ্রমণজাত কষ্টের লাঘব হইয়া যায়। তাঁহার কথাগুলি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, কোন কথা না বলিয়া কেবল শুনিতে ইচ্ছা করে। কে—বাবু সাহেব সাজিলেন; তাঁহার এরূপ অভ্যাস আছে। আমাদের গাড়ীতে আমাদের লইয়া তিন জন বাঙ্গালী, দুই জন সাহেব ও এক জন আরব দেশীয় ভদ্র লোক উঠিলেন। এই আরব দেশীয় ভদ্র লোকটীর সঙ্গে কে—বাবু খুব গল্প জুড়িয়া দিলেন। ইঁহাদের কথা এদেশী হিন্দী বা উর্দ্দু নহে। ইনি ব্যবসায়ের অনুরোধে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন; ভারতবর্ষেও ব্যবসা করিতে আসিয়াছেন। ইনি বলেন, বিলাস-স্রোত-উছলিত প্যারিস নগরী ভূস্বর্গস্বরূপ। ইনি প্যারিসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। এই ভদ্রলোকটী ইংরাজি কিম্বা কোন ইউরোপীয় ভাষাই জানেন না, অথচ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন। আমাদের সহিত চুনার পর্য্যন্ত আসিলেন। নামিবার সময় আমরা তাঁহাকে একটু সাহায্য করিলাম; ইনি অতিশয় কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

পরদিন প্রাতে বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আমরা টুণ্ডলা ষ্টেসনে পৌছিলাম। এই খানে গাড়ী বদলাইতে হয়; এখান হইতে এক শাখা লাইন আগ্রা অভিমুখে গিয়াছে। আমরা আগ্রা-দুর্গ-ষ্টেসনের টিকিট লইয়াছিলাম। আগ্রা টুণ্ডলা হইতে প্রায় তের মাইল। আগ্রা ষ্টেসনের নিকট গাড়ী আসি-

বার বহু পূর্ব্বে হইতেই সুবিখ্যাত তাজমহলের শ্বেতগম্বুজ অতিদূরে দিক্‌বলয়ের নিকট নয়ন-গোচর হইতেছিল, বোধ হইতেছিল যেন আকাশের নীলাম্বুসাগরে ভাসিতেছে। আমরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, দূরে, বহুদূরে—যেখানে সূর্য্যকিরণ-প্লাবিত শান্ত নীলাকাশ অসীম শূন্য হইতে নামিয়া তরুছায়া-ঘন শ্যামল প্রান্তরের সহিত মিলিয়াছে, সেইখানে সেই "নিভৃত, বিশ্রব্ধ, মুগ্ধ" প্রণয় দেখিবার জন্য ও মুগ্ধ প্রণয়িযুগলের বিরাট স্নেহসখ্যের বন্ধন বাঁধিবার জন্য, বোধহয়,কোন দৈত্যললনা স্মিতহাস্যে দণ্ডায়মান। আমরা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের গাড়ী যমুনার পোল অতিক্রম করিয়া ষ্টেসনের নিকট আসিল। আগ্রাদুর্গের রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত বিশাল প্রাচীর ষ্টেসনের সম্মুখেই প্রসারিত রহিয়াছে। আর একদিকে একটী সুন্দর মস্‌জিদ নয়নগোচর হইল। ইহার নাম জামে মস্‌জিদ।

কে—বাবু কাশীধাম হইতে, আগ্রাবাসী, তাঁহার আত্মীয় আ—বাবুকে আমাদের আগ্রা গমনের দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ষ্টেসনে দেখি,আ—বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বাসা ষ্টেসনের নিকটেই। তিনি তাঁহার বাসায় আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন। বাসায় যাইয়া দেখিলাম, আমাদের সুবিধার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিবার পর অপরাহ্নে আগ্রানগর দর্শন করিবার জন্য শকট ভাড়া করিলাম। আগ্রার প্রাচীন হর্ম্ম্যগুলির বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আগ্রার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস দেওয়া গেল।

আগ্রা নগর আগ্রা জেলার অন্তর্গত। আগ্রা জেলার পরিমাণ ১৮৫০ বর্গ মাইল। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান, নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২৭ডিগ্রি ১০ফিট ৭ইঞ্চি উত্তরে এবং ৭৮ডিগ্রি ৫ফিট ৪ইঞ্চি পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়। আগ্রা সমুদ্রতল হইতে ৬৫০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। যমুনা যে স্থান হইতে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছেন, সেই কোণাংশে যমুনার দক্ষিণ দিকে আগ্রা নগর স্থাপিত; কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৮৪১ মাইল। লোদী বংশীয় সেকন্দর লোদীর রাজত্বকালে আগ্রা নগরকে রাজধানী করা হয়; কিন্তু তখন রাজধানী যমুনার বামকূলে স্থাপিত করা হয়। এই বামকূলে অনেক পুরাতন হর্ম্ম্য আছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাধি আছে। আইন-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবরী-প্রণেতা আবুল ফজল যমুনার বামকূলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর আগ্রায় রাজত্ব করেন; পরে তৎপুত্র হুমায়ুন রাজধানী দিল্লীতে লইয়া যান; তৎপুত্র আকবর ১৫৬৬ অব্দে পুনরায় রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া আসেন। সম্রাট আকবর ইহার নাম রাখিলেন, আকবরাবাদ; তাঁহার সময় আগ্রার বিশেষ সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি। ১৫৭০ অব্দে আকবর আগ্রা হইতে ২৪ মাইল দূরস্থিত ফতেপুরসিক্রীতে রাজধানী উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আকবরই লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ নর্ম্মাণ করেন এবং ইহার অন্তর্গত অনেক সুচারু হর্ম্ম্য নিম্মাণ করিয়া স্থাপত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে আগ্রার ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে আগ্রা নগরী প্রাচীর বদ্ধ ছিল এবং এই প্রাচীর বদ্ধ অংশের পরিমাণ ১১ বর্গ মাইল।

আইন-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবরের সময় আগ্রা নানা উদ্যান ও সুরম্য অট্টালিকায় পূর্ণ ছিল এবং ইহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। আমরা আকবরী হইতে একটী স্থল অনুদিত করিয়া দিলাম। "আগ্রা একটী বৃহৎ সহর; ইহার বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত......নদীর উভয় কূলে রমণীয় অট্টালিকা ও উদ্যান অবস্থিত। ইহাতে সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা বাস করে এবং সর্ব্ব ঋতুজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হয় *।"

জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের রাজত্বকালে আগ্রার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। আগ্রা দুর্গের মধ্যে যে অংশের নাম জাহাঙ্গীর মহল, তাহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত; আগ্রার শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উন্নতি সাজাহানের সময়ে। সাজাহান ১৬৫৮ অব্দে পুত্র আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং আগ্রা-দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া ৭ বৎসর জীবিত থাকেন। এদিকে আরঙ্গীব রাজধানী আগ্রা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিলেন; কিন্তু সাজাহান যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন,সেই কয় বৎসর আগ্রার শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে মহিমশ্রীমণ্ডিতা আগ্রানগরী হতশ্রী হইল এবং আগ্রার গৌরব-মুকুট দিল্লীর মস্তকের শোভাবৰ্দ্ধন করিতে লাগিল।

১৭৬৪ অব্দে ভরতপুরাধিপতি জাঠ বংশীয় সূর্য্যমল্ল সমরুর সাহায্যে আগ্রা অধিকার করেন; ১৭৭০ অব্দে আগ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৭৭৪ অব্দে নজীব খাঁ মারাঠাদিগকে আগ্রা হইতে বিদূরিত করিয়া আগ্রা অধিকার করিলেন। পুনরায় ১৭৮৪ অব্দে গোয়ালিয়ারাধিপতি মাধোজি সিন্ধিয়া আগ্রা অধিকার করেন। ১৭৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা তাঁহার অধিকারে ছিল। ১৮০৩ অব্দে লর্ড লেক দৌলতরাও সিন্ধিয়ার নিকট হইতে আগ্রা জয় করিয়া ইংরাজাধিকারে আনয়ন করেন; তদবধি ইহা ইংরাজদিগের অধীনে। এখন যেমন পেশোওয়ার, পূর্ব্বে তেমনি আগ্রা ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল; সেই সময় আগ্রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী। ১৮৫৩ অব্দে রাজধানী আগ্রা হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসিল। সেই অবধি আগ্রার পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। রাজশ্রী চিরকালই আগ্রার উপর চঞ্চলা; কত শতাব্দী ধরিয়া রাজধানী আগ্রায় আনীত ও তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

যদিও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা এলাহাবাদে বাস করেন, তথাপি এখনও আগ্রার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি আছে। ইহা একটী বাণিজ্য-প্রধান সহর। আগ্রা হইতে অনেকগুলি রেলওয়ে লাইন গিয়াছে; এই জন্য অনেক প্রদেশের দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়; উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে রাজপুতানায় যাইতে হইলে আগ্রা দিয়া যাইতে হয়। রোহিলখণ্ড হইতে চিনি এখানে আনীত হইয়া, পরে অন্যত্র প্রেরিত হয় *। আগ্রাজাত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রসিদ্ধ;—সতরঞ্চি, জরির ফিতা, জুতা, নানাবিধ বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য যুক্ত দ্রব্য (Mosaic work), ফতেপুরসিক্রীর প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য। বিদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের নাম:—চিনি, তামাক, ভুষামাল, লবণ এবং তুলা। নদীকূলে অবস্থিত বলিয়া আগ্রায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা।

* Vide Ayeen Akbari p 327 edited by Jagadis Mukerjee.

* Vide Hunter's Imperial Gazetteer of India, Vol I. p 76.

আগ্রার নামকরণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অনেকে (কীন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ) বলেন "আগর" শব্দ হইতে আগ্রার উৎপত্তি। আগর শব্দের অর্থ লবণের খনি এবং এই স্থলের ভূমিখণ্ড লবণাক্ত বলিয়া ইহার নাম আগ্রা। কীন (Keene) বলেন, "আগর" শব্দের অর্থ লবণ প্রস্তুতের জন্য লবণাক্ত জল জ্বাল দিবার কটাহ এবং পূর্ব্বে এখানে লবণ প্রস্তুত হইত। (১) আবার অনেকে বলেন,"আগাড়ি" শব্দ হইতে আগ্রার উৎপত্তি। আগ্রাস্থাপয়িতা সম্রাট সেকেন্দর লোদী আগ্রার নিকট নৌকাযোগে যমুনা দিয়া যাইবার সময় নৌকার চালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাজধানী কোথায় স্থাপিত করা উচিত? নাবিক নাকি বলিয়াছিল,"আগাড়ি"অর্থাৎ আরও অগ্রে। আগাড়ি হইতে আগ্রার উৎপত্তি। (২) পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্রাট আকবর আগ্রার নাম আকবরাবাদ রাখিয়াছিলেন। অনেকে বলেন "আকবরাবাদ হইতে আগ্রার উৎপত্তি।" আগ্রা-নামের উৎপত্তি লইয়া আর একটী মত আছে। আগ্রা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানের নাম অগ্রবন। অগ্র শব্দ হইতে আগ্রার উৎপত্তি হইয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আগ্রা সহর দেখিবার জন্য অপরাহ্নে শকট ভাড়া করিয়া আমরা বহির্গত হইলাম। আমাদের শকট যমুনার পন্টুন ব্রিজ বা ভাসা-পোলের উপর দিয়া চলিল। এক টাকা ভাড়া দিতে হইল; যমুনা নিতান্ত প্রশস্ত নহে। পরপারে আমরা ইতিমাৎ-উদ্দৌলার সমাধি দর্শন করিতে যাইলাম। এতৎসম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইতিমাৎ-উদ্দৌলার পূর্ব্বনাম মীর্জ্জা গিয়াস্ বেগ। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের উজীর বা অমাত্য ছিলেন। ইঁহার বাটী পারস্য দেশে; ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য পুত্রকন্যা সহ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আইসেন। আসিয়া সম্রাট আকবরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। সম্রাট, মীর্জ্জার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন, ইতিমাৎ-উদ্দৌলা। ইতিমাৎ-উদ্দৌলার কন্যাই ভারতেশ্বরী নূরজাহান্ এবং ইঁহার পুত্র আসফ খাঁর কন্যা জগৎবিখ্যাত মুমতাজ-ই-মহল।

১৬২২ অব্দে ইতিমাৎ-উদ্দৌলার মৃত্যু হয়; নূরজাহান পিতার (১) কবরের উপর ১৬২৮ অব্দে এই সুন্দর সমাধি হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইতিমাৎ-উদ্দৌলার নামানুসারে তাঁহার সমাধি-হর্ম্ম্যের সংক্ষিপ্ত নাম ইতিমাৎ-উদ্দৌলা। ইহাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই চির-সমাধিমগ্ন।

ইতিমাৎ-উদ্দৌলার দ্বারদেশে আমাদের শকট প্রবেশ করিবামাত্রই "গাইডেরা" দৌড়াইয়া আসিল। আমাদের গাইডের প্রয়োজন নাই শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। সমাধি-মন্দির মধ্যে প্রশস্ত অঙ্গন ও উদ্যান এবং সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত তোরণ; সমস্ত অঙ্গন ও উদ্যানটী প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রাচীরের কোণে কোণে এক একটী গম্বুজওয়ালা সৌধ। প্রকৃত সমাধিস্থলটী বাটীর পশ্চিমদিকে যমুনার তীরে; ইহার সমস্ত মসৃণ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর।

(১) Vide Keene's Hand-book for visitors to Agra. p 9.

(২) Cyclopoedia of India p 44, vol 1.

(৩) প্রবাসের পত্র—নবীনচন্দ্র সেন।

(১) Vide Keene's Hand-book for visitors to Agra p 42.

সমাধি-হর্ম্ম্যটী চতুরস্রাকৃতি এবং এক এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট এবং উর্দ্ধে ১২ ফিট। এই মর্ম্মর-হর্ম্ম্য এক প্রশস্ত রক্তপ্রস্তরের অনুচ্চ বেদির উপর নির্ম্মিত। বেদিটীও চতুরস্রাকৃতি ও দৈর্ঘ্যে ১৪৯ ফিট ও উর্দ্ধে ৩ ফিট। আমরা ইতিমাৎ-উদ্দৌলার সমাধি-মন্দিরের পাদদেশে পাদুকা উন্মোচন করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যে প্রকোষ্ঠে স্বামী স্ত্রীর সমাধি রহিয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ২২ ফিট ৩ ইঞ্চি। গৃহভিত্তিতে অনেকগুলি কুলুঙ্গি আছে। ইহারা পুষ্প ও পুষ্প পাত্রের সুন্দর চিত্র দ্বারা চিত্রিত। এই সমাধি-মন্দিরের দেওয়ালে মিনের (enamal) কার্য্য আছে; গৃহভিত্তি গৃহতল হইতে ৩॥ ফিট উচ্চে অতি সুন্দর মসৃণ-মর্ম্মর প্রস্তরমণ্ডিত (Dado work)। সমাধি-মন্দিরের চারিকোণে চারিটী ৪০ ফিট উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরের স্তম্ভ বা মিনার রহিয়াছে। সমাধিহর্ম্ম্যের চারিধারে নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখচিত কার্য্য আছে; ইতিমাৎ-উদ্দৌলার দ্বারদেশের এই প্রস্তর-কার্য্য বা মোজেয়িক (Mosaic) দৃষ্ট হয়।

আমরা যমুনা দর্শন করিবার জন্য সমাধি-সৌধের উপরে উঠিলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল এবং সূর্য্যের অরুণ-রশ্মি জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। কে—বাবু ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে উঠিলেন, পাছে বহু পুরাতন কোন প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হয় এবং আমাকে স্নেহ-কোমল চিত্তে ও কিছু পরুষ-কণ্ঠে অত দ্রুতপদ-বিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। কে—বাবুর সর্ব্বদা আমার প্রতি স্নেহসতর্ক দৃষ্টি। তিনি নিজে যুবাপুরুষ হইলেও আমার উদ্ধত যৌবনের দৃপ্ত তেজকে একটু নিয়ন্ত্রিত করিতে বলিলেন। কে—বাবুর "পৈত্রিক প্রাণের" মায়াটা কিছু বেশী ও বাঙ্গালী-সুলভ।

ইতিমাৎ-উদ্দৌলার সমাধিমন্দিরের সৌন্দর্য্য লইয়া মতদ্বৈধ আছে। এক জন ফরাসী লেখক ইহার নির্ম্মাণে বিকৃত-রুচির পরিচয় পান; কর্ণেল শ্লিমান বলেন, ইহা একটী সুন্দর সৌধ এবং হাণ্টার সাহেব তাঁহার গেজেটীয়ারে লিখিয়াছেন যে, ইহা ভারতীয় স্থাপত্যের একটী ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

আমরা এখান হইতে আরামবাগ বা রাম-বাগের দিকে যাত্রা করিলাম; ইহা একটী বিস্তৃত প্রমোদোদ্যান। এখানে বৎসর বৎসর মেলা বসিত। রাজমহিষীরা এ মেলায় আসিয়া যোগদান করিতেন। এই উদ্যান সম্রাট আকবরের পিতামহ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং আকবরের সময়েই ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি। যমুনার পরপারস্থিত "জনপূর্ণ সুবিজন" রাজধানীর স্বার্থ-কোলা-হল ও মত্ত-আবেগ হইতে শান্তিলাভ করিবার জন্য সম্রাট রামবাগের পুষ্পবীথিতলে ভ্রমণ করিতেন, কিম্বা কোন মঞ্জুল ছায়াকুঞ্জে বসিয়া "নির্ম্মল-সলিলা তটশালিনী" যমুনার অস্ফুট কল্লোলধ্বনি শ্রবণ করিতেন এবং শুনিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়কে মহত্তর করিবার চেষ্টা করিতেন।

আইন-আকবরী গ্রন্থে রামবাগের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু যমুনার বামকূলস্থিত চার-বাগের উল্লেখ আছে। (১) এই চারবাগকে হুমায়ুনের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন বলা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই চারবাগই আধুনিক রামবাগে পরিণত হইয়াছে। উদ্যানটী সুন্দর কিন্তু উদ্যানবাটীকা নিতান্তই আধুনিক

(১) Vide Ayeen Akbari p 327 edited by Jagadis Mukerjee.

বলিয়া বোধ হইল। এইখানে এক্ষণে লোকে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আইসে; এই সময় একজন মুসলমান ভদ্র-লোক এখানে বাস করিতেছিলেন।

আরামবাগ যমুনার কূলে, আমরা একটী সিঁড়ি দিয়া মৃত্তিকা নিম্নতলস্থ এক বহু পুরাতন অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়া, যমুনার তীরে আসিলাম। একটা ভগ্নপ্রায় ঘাট আছে। কে—বাবু এক জন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। যমুনার জল স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল; আমি সেই ছায়ালোক-বিচিত্র গোধূলিতে যমুনার কূলে ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলাম; "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী!" ইত্যাদি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন-প্রদীপ্ত হইয়াও কি জানি কেন যমুনার জল স্পর্শ করিলাম। যমুনার প্রবাহকে চেতন প্রবাহ বলিয়া বোধ হইল, ইহার জলের সহিত কত যুগ-যুগান্তের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। এই যমুনার চিন্তা হইতে মহাভারতের আখ্যান স্মরণ-পথে উদিত হইল; ভাবিলাম, শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশরী-স্বরে যে যমুনার জল উজান বহিত, ইহা কি সেই যমুনা? যে যমুনার কূলে বাঁশরী-নিস্বন শুনিয়া আকুল অঞ্চলা শ্রীমতী আবেগক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেন, ইহা কি সেই যমুনা? ক্রমে ক্রমে প্রাচীন পুরাবৃত্ত হইতে আধুনিক ইতিহাসের আখ্যান স্মরণ-পথে আসিল। এই যমুনার স্মৃতি হইতে জয়দৃপ্ত, গর্ব্ববিস্ফারিত-লোচন মোগল-পাঠানের কথা স্মরণে আসিল। ইহার জলে ভারতের অতীত ইতিহাস প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, দেখিলাম। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর মধ্যে যমুনার ন্যায় আর কোন নদীই সাম্রাজ্যের এত বার অভ্যুত্থান, তিরোধান দর্শন করে নাই; কোন নদীর জলই বোধ হয়, মনুষ্য শোণিতে এতবার রঞ্জিত হয় নাই। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন;—

যুগ যুগ বাহি প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও॥
কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি মরমে পরশে কথা
ভূত সে ভারত-গাথা ও॥

যমুনার এপারে অনেক গুলি দেখিবার জিনিষ আছে; সময়াভাবে আমরা দেখিবার অবকাশ পাই নাই। ইহাদের মধ্যে "চিনি কি রোজা" প্রসিদ্ধ। ইহা সম্রাট সাজাহানের মন্ত্রী আফজল খাঁর সমাধি-হর্ম্ম্য।

আরামবাগ দেখিয়া আমরা নদীর পরপারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; সেখান হইতে চন্দ্রকিরণ-বিধৌত তাজ দেখিবার জন্য যাত্রা করা গেল। আমাদের শকট যমুনার Strand এর উপর দিয়া চলিল, ইহা একটী প্রশস্ত রাস্তা। ১৮৩৮ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় কোম্পানী বাহাদুর দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই রাস্তা নির্ম্মাণ করেন।

পথে যাইতে যাইতে চন্দ্রোদয় দেখা গেল। আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কের ধার দিয়া চলিলাম। দূরে অস্পষ্ট চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্তরাল স্থাপিত তাজ স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। আমরা সকলেই শকট হইতে মুখ বাহির করিলাম, এবং বিস্ময়াকুল নেত্রে নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া তাজের অর্দ্ধাবৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম; ক্রমে তাজের মুক্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম।

আমাদের শকট তাজের বহিঃ তোরণে আসিয়া থামিল। বহির্দ্বারটী তাজেরই উপযুক্ত। রাত্রে দ্বারের উচ্চতা ভিন্ন শিল্পজাত সৌন্দর্য্য কিছুই দেখা গেল না। এই দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া প্রস্তর-মণ্ডিত দীর্ঘ পথ দিয়া চলিলে তাজের সমাধিহর্ম্মে পৌছান যায়। এই পথ দিয়া যাইতে আমাদের সম্মুখে তাজ প্রসারিত রহিয়াছে, দেখিলাম। তাজের চূড়ার সে দিকে চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণ হয় নাই; পার্শ্বে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি পার্শ্ববিকীর্ণ আলোকে এক প্রকার ম্লানোজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

তাজ একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ স্থানের উপর স্থাপিত; নিম্নে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বেদির উপরে উঠিলাম। ইহা একটী প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত অঙ্গন্। এই অঙ্গনের এক কোণে অনেক গুলি ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলারা বসিয়া গল্পগুজক করিতেছিল। তাজের যেদিকে চন্দ্রকিরণ পড়িতেছিল, আমবা সেইদিকে যাইলাম।

তাজটী আমার নিকট মর্ম্মরপ্রস্তরে কঠিনীভূত স্বপ্নরঞ্জিত সৌন্দর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। বাস্তবিক দৃশ্যটী কি সুন্দর! উপরে নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ, এদিকে অস্পষ্ট চন্দ্রালোক-বিধৌত শ্যামতরুছায়া, অদূরে কলনাদিনী যমুনার উদ্বেগান্দোলিত বক্ষে চন্দ্রকিরণ-সম্পাত এবং চারিধারে পুলক-কম্পিত, স্বপ্নালস, শীকর-শীতল সুরভি উচ্ছ্বাস, আর সম্মুখে মানবশিল্পের ললামভূত, মহামৌন, ফুল্লজ্যোৎস্নাসুপ্ত তাজ!!

তাজে একটা অনাবিল শুচিতার ভাব আছে, যাহাতে হৃদয় দ্রব হয়। ইহার নির্ম্মাণের বিশালতায় এবং কল্পনার বিরাটত্বে একটী হৃদয়ের প্রতি আর একটী হৃদয়ের আসক্তির গভীরতার নির্দ্দেশ করে। বিশপ হিবার তাজের বিরাটত্ব ও শিল্পকুশলতায় বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং রত্নজীবী কর্ত্তৃক ইহার শেষ পারিপাট্য সাধিত।

তাজমহল যদিও সমাধিমন্দির, কিন্তু তথাপি ইহার উন্নতশীর্ষ, অভ্রভেদী চূড়া প্রণয়ের নিখিলবিস্মৃতির ভাব জ্ঞাপন করিতেছে, কিম্বা ইহারা যেন দুইটী মুগ্ধপ্রণয়ীর প্রণয় পৃথিবী হইতে বহু উচ্চে উঠিয়া অলক্ষ্য ব্যবধানে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোন অলক্ষ্য দেবতার চরণতলে যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তত্ত্বজ্ঞ ইহার অন্য কোনরূপ অর্থ করিবেন। তিনি হয়ত বলিবেন যে, শিল্পকুশল-প্রাসাদের বক্ষে সমাধি আমাদের জীবনের মত্ত আবেগের অসারতাই নির্দ্দেশ করে, আর ইহা সপ্রমাণ করে যে, পার্থিব প্রণয়ের মৃত্যু বিজয়িনী শক্তি নাই।

আমি রাত্রেই অন্ধকারে মিনারেটের উপর উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম; একজন দরিদ্র বৃদ্ধমুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল; সে ভয় দেখাইয়া উঠিতে নিষেধ করিল। আমি তথাপি উঠিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শন করাতে কে—বাবু তিরস্কার করিলেন। তাজের জানালায় যে প্রস্তরের প্রশস্ত জাফরি আছে, তাহার নিকট মুখ লইয়া গিয়া প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য উচ্চ শব্দ করিলাম। প্রতিধ্বনিও আরও উচ্চ ও গম্ভীর-স্বরে শ্রুত হইল। তাজের প্রতিধ্বনি একটী উপভোগ করিবার জিনিস। সামান্য মৃদুশব্দ গম্ভীর নির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠে এবং ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এ প্রতিধ্বনির সহিত যেন স্বর্গের সুর বাঁধা। বোধ হয় যেন এ প্রতিধ্বনির

উদাত্ত স্বরে চিরসুপ্তিমুদিত মুগ্ধ প্রণয়িযুগল স্বপ্নাবেশবিহ্বল-নেত্র মেলিয়া দেখে এবং পুনর্ব্বার সুপ্তিমুদ্রিত করে। অন্ধকারে প্রস্তরের জাফরির মধ্য দিয়া সামান্য আলোক ভিন্ন কিছুই দেখা যাইল না; একটু ভয় হইল। বোধ হইল যেন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী কবর হইতে উঠিয়া তাজের মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন।

কে—বাবু ও প—বাবু আমাকে এমন সুন্দর রাত্রিতে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি গাহিলাম "অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।" এ গান তাঁহাদের ভাল লাগিল না; পুনরায় গাহিলাম "অয়ি ভুবনমনমোহিনী!" ইত্যাদি।

এইবার আমরা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথে যাইতে যাইতে যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, তাজ দেখিতে দেখিতে চলিলাম; পথে ভিক্টোরিয়া পার্কে নামিয়া, ভারতেশ্বরীর ব্রঞ্জনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা আগ্রা নগরী হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রা গ্রামস্থিত আকবরের সমাধিহর্ম্ম্য দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমাদের শকট চকের মধ্য দিয়া চলিল। চকের রাস্তা প্রস্তরমণ্ডিত; কর্দ্দম নাই; বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চকটী জনকীর্ণ দেখিলাম এবং সমৃদ্ধিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল।

সেকেন্দ্রা যাইবার পথে আমরা লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বিশাল দ্বার বা ফটক দেখিতে পাইলাম; ইহার নাম "দিল্লীদরওয়াজা।" পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগ্রা সহর প্রাচীরবদ্ধ ছিল এবং এই "দিল্লীদরওয়াজা" এই প্রাচীরেরই একটী দ্বারবিশেষ। দিল্লী, লাহোর বা কাশ্মীর যাইতে হইলে এই দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে হইত।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা সেকেন্দ্রানগরস্থ আকবরের সমাধি-সৌধের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারটী অতিশয় উচ্চ; ইহা লোহিত প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং ইহাতে নানাবিধ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণ বা মোজেয়িক কার্য্য আছে। আমরা সংক্ষেপে সমাধি সৌধকে সেকেন্দ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সেকেন্দ্রার দ্বার দেশ এমনই বিশাল যে, ইহা স্বয়ম্ একটী পৃথক্ হর্ম্ম্য এবং প্রথমেই আমাদের ইহাকে আকবরের সমাধি-সৌধ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। দ্বারের চারিদিকে কোরাণের বয়েৎ লিখিত আছে; অক্ষর গুলি এমনই কৌশলের সহিত যোজনা করা হইয়াছে যে, অত উচ্চ (প্রায় ৭০ ফিট) দ্বারদেশের শীর্ষস্থ অক্ষর গুলি এবং সর্ব্ব নিম্নের অক্ষর গুলি একই আয়তনের বলিয়া বোধ হয়। তাজেরও এই প্রকার বিশেষত্ব। দ্বারদেশ অতিক্রম করিলেই অতি সুন্দর বিস্তৃত উদ্যান। সেকেন্দ্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া গেল।

লোদী-বংশীয় সিকান্দার লোদীর সমাধির জন্য এই স্থানের নাম সেকেন্দ্রা; সে কবর দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; সম্রাট আকবরের মৃতদেহ সেকেন্দ্রায় সমাহিত; তিনি জীবদ্দশায় আপন সমাধি-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, এই সমাধিহর্ম্ম্য মোগল-স্থাপত্যানুযায়ী নহে; হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধশিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত। (১) ভারতের আর কোন মুসলমান সমাধিমন্দির এ প্রণা-

(১) Vide Fergusson's Architectural History of India, p. 593

নীতে নির্ম্মিত হয় নাই ; কেন না,এই সমাধি-হর্ম্যের উপরিতলস্থিত "জওয়ার কবর" বা কবরানুকৃতির উপর গম্বুজ নাই। ফার্গুসন আরও বলেন যে, ইহার উপর একটী গম্বুজ নির্ম্মিত হইলে পৃথিবীর মধ্যে তাজের নিম্নেই এই সমাধি-মন্দির স্থান পাইত। ফার্গুসন তাঁহার পুস্তকে সেকেন্দ্রার যে সেক্‌শন চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে একটী গম্বুজ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি সম্পাদন হইয়াছে ; কিন্তু সেকেন্দ্রার প্রকৃত চিত্র অনেকটা একটী কর্ত্তিতশীর্ষ পিরামিডের ন্যায়।

সেকেন্দ্রা একটী উচ্চ বেদির উপর স্থাপিত ; এই বেদির চারিধারে প্রশস্ত উদ্যান বিস্তৃত রহিয়াছে। উচ্চ বেদিটী চতুরস্রাকৃতি এবং আয়তনে চারিশত ফিটের উপর। সমাধি-হর্ম্ম্য পঞ্চতল-বিশিষ্ট। প্রথমতল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩২০ ফিট এবং সম্মুখে দশটী করিয়া খিলান। সমস্ত তল গুলির আয়তনের পরিমাণ দেওয়া গেল।

| | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
|---|---|---|---|
| প্রথম তল | ৩২০ ফিট | ৩২০ ফিট | ৩০ ফিট |
| দ্বিতীয় তল | ১৮৬ " | ১৮৬ " | ১৪—৯ |
| তৃতীয়-তল | ১৮৬ " | ১৮৬ " | ১৫—২ |
| চতুর্থ তল | ১৮৬ " | ১৮৬ " | ১৪—৬ |
| পঞ্চম-তল | ১৫৭ " | ১৪৭ " | (ছাদ নাই) |

পঞ্চম-তল ভিন্ন সমস্ত তলগুলি রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ; পঞ্চম তলের ছাদ নাই ; চারিধারে মর্ম্মরপ্রস্তরের জাফরি কাটা প্রাচীর (trellis work) আছে। ছাদের চারিধারে সুদীর্ঘ বারাণ্ডা ; এই ছাদের মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত অনুচ্চ বেদি রহিয়াছে ; এবং এই বেদির উপর একটী কবর রহিয়াছে। ইহা আকবরের প্রকৃত কবর নহে, কবরের অনুকৃতি ; ইহার পারিভাষিক নামে "জওয়ার কবর।" ঠিক ইহার নিম্নে প্রথম-তলে সম্রাটের প্রকৃত কবর রহিয়াছে ; এই জওয়ার কবরের সম্মুখে একটী অনুচ্চ মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ বিদ্যমান। তাহার উপর একটী মর্ম্মর প্রস্তরের পাত্র অবস্থিত। কথিত আছে, এই আধারে জগৎবিখ্যাত কোহিনুর স্থাপিত ছিল। এই তলের চারিধারে যে জাফরি কাটা মর্ম্মরের প্রাচীর আছে, তাহার মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া দেখিলে উদ্যানটী অতি সুন্দর দেখায় ; ঠিক যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হয়। পাঁচটী তলের প্রত্যেক তলের চারিকোণে লোহিত প্রস্তরের স্তম্ভের উপর নহবৎখানার ন্যায় মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত গম্বুজওয়ালা প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। আমরা সেকেন্দ্রার "অম্বরচুম্বিত" মিনার বা স্তম্ভের উপর উঠিয়াছিলাম, ইহার সিঁড় গুলি গণনা করিয়া দেখা গেল যে, কলিকাতার অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা ইহা অল্প উচ্চ নহে। ভূমিতল হইতে বেদির উপরে মিনারের পাদদেশ পর্য্যন্ত সিঁড়ির উচ্চতা প্রায় ১ ফুট।

প্রথম-তলস্থ সমাধি-হর্ম্ম্যের সম্মুখ-দ্বার প্রশস্ত ; এই দ্বার অতিক্রম করিলেই এক প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে পৌঁছান যায় ; এই প্রকোষ্ঠের ছাদ গিল্টি করা ; এক্ষণে ইহা মলিন হইয়া গিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠ হইতে একটী পথ ক্রমশঃ নিম্নে গিয়াছে ; এই পথ দিয়া চলিলে যে প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়,ইহাতেই সম্রাট আকবর সমাহিত রহিয়াছেন ; প্রকোষ্ঠটী চতুরস্রাকৃতি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩৫ ফিট। ঘরে তেমন আলোক প্রবেশ করে না।

আমি মহামতি আকবরের সমাধির সম্মুখে তাঁহার মৃত-আত্মার উদ্দেশে নতজানু হইয়া

মস্তকাবনত করিলাম। আকবরের মহত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া হৃদয় তখন আবেগ-ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

সমাধি-হর্ম্ম্যের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে আর দুইটী সমাধি রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে একটী আকবরের দুহিতা আরাম-বন্নুর এবং আর একটী আকবরের পৌত্রীর বা জাহাঙ্গীরের কন্যার। "আর্য্যাবর্ত্ত"-রচয়িত্রী ভ্রম করিয়া উহাদের মধ্যে একটীকে আকবরের ধাত্রী-পুত্রের সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক আকবরের সমাধি আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য বহুমূল্য, জরির কার্য্যযুক্ত একখানি সুন্দর আচ্ছাদন বস্ত্র (pall) উপহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহা দ্বারা কবর আচ্ছাদিত রাখা যায় না; শুনিতে পাই, ইহা নাকি অপহৃত হইয়াছে।

সেকেন্দ্রার অনেক বহু মূল্য প্রস্তর ভরতপুররাজ কর্তৃক আগ্রা বিজয়ের সময় অপহৃত হইয়াছে। জাঠেরা সেকেন্দ্রার সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছে, স্বীকার করিলেও, অদ্যাপি সেকেন্দ্রার সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন। এতৎসম্বন্ধে "A Civilian's Wife in India"র লেখিকা বলেন যে, ইউরোপে হইলে একখানি প্রস্তরের উপর আর একখানি প্রস্তর স্তুপ থাকিত না। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানের যোগ্য। আমরা একাংশ অনূদিত করিয়া দিলাম। (১) "আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল হর্ম্ম্যের এত সামান্য ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আমাদের পাশ্চাত্য দেশবাসীর ন্যায় ইহাদিগের মস্তকে ধ্বংস-প্রবৃত্তির তত বিকাশ হয় নাই। ইহারা কখন কারণ ব্যতীত উচ্ছেদ-সাধন কিম্বা নির্য্যাতন করে না, কিম্বা কাহাকে কষ্টও দেয় না। * * আমাদের দেশ হইলে একখানি প্রস্তরের উপর আর একখানি প্রস্তর স্তুপ থাকিত না, কিম্বা কারুকার্য্য-যুক্ত স্থাপত্যের এক টুক্‌রাও অটুট থাকিত না। এই সকল হর্ম্ম্যের কোন ক্ষতি-সাধন না করার জন্য আমরা এই সকল লোকদিগের স্বাভাবিক শিষ্ট-শিক্ষার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।" এই পাশ্চাত্য-দেশবাসী হইয়াও তথাপি এসিয়াটিক-সোসাইটীর হলে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার সময় লর্ড কর্জ্জন শ্লেষ করিয়া আরঙ্গীব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ruthless vandalisms of the court of Aurungzeb !!!"

সেকেন্দ্রা গ্রামে আরও অনেক সুন্দর দৃশ্য আছে; কিন্তু আমাদের অবকাশ ছিল না, কেন না মধ্যাহ্নে তাজ দেখিবার কথা ছিল। বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নানাহার করিয়া তাজ দর্শন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; আ—বাবু আমাদের জন্য আহারের ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া আফিসে গিয়াছেন; কথা আছে, আফিস হইতে তাঁহাকে লইয়া তাজ দেখিতে যাইতে হইবে। তিনি রেভিনিউ আফিসে কর্ম্ম করেন। স্নানাহার করিয়াই তাঁহার আফিসে যাওয়া গেল; তাঁহাকে লইয়া আমরা তাজ দেখিতে যাইলাম।

গত রাত্রে আমরা তাজের কাব্যাস্বাদ বা সৌন্দর্য্যাস্বাদ করিয়াছি; অদ্য এই প্রখর রৌদ্রে তাজের শিল্পকলা ও স্থাপত্য দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। প্রত্যেক বস্তুরই দুইটী দিক আছে, এই দুইটী দিক হইতে দেখিলেই বস্তুটির সম্যক উপলব্ধি হয়। শুধু তাজের স্থাপত্য দেখিলে সমস্ত দেখা

(১) "A Civilian's Wife in India," Vol I, pages, 203, 204.

হইল না, কিম্বা সৌন্দর্য্য দেখিলেও সমস্ত দেখা হইল না। সৌন্দর্য্য দ্বারা মৃত স্থাপত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তাজ দর্শন করাই তাজের সম্যক দর্শন।

আমাদের শকট ভিক্টোরিয়া পার্কের ধার দিয়া চলিল; কাশীধামে বা কানপুরে ভিক্টোরিয়ার যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা ইহা বৃহৎ ও সুন্দর; উদ্যানটীও প্রশস্ত; তাজে প্রবেশ করিবার পথের দুই ধারে বেশ বৃক্ষশ্রেণী আছে।

আমরা তাজের বিশাল দ্বার দেশে পৌছিলাম; দ্বারটী দক্ষিণ-দিকে। পূর্ব্ব পশ্চিমে দুইটী মস্‌জিদ; পশ্চিমের মস্‌জিদটীই প্রকৃত মস্‌জিদ; পূর্ব্বদিকেরটী "জওয়ার মস্‌জিদ" বা মস্‌জিদের অনুকৃতি। তাজের উত্তর দিক দিয়া যমুনা প্রবাহিত; যমুনা একটু সরিয়া গিয়াছে।

দ্বার-দেশটী তাজেরই উপযুক্ত; ইহাতে তাজের শোভার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। দ্বারের গাত্রদেশ নানাবিধ বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণ বা মোজেয়িকে মণ্ডিত। দ্বারটী সাধারণ প্রবেশ-দ্বারের ন্যায় নহে; ইহা স্বয়ম্ একটী প্রশস্ত হর্ম্ম্য বিশেষ। দ্বারদেশস্থ হর্ম্ম্যের উপর হইতে তাজ অতি সুন্দর দেখায়। "A Civilian's wife in India"র লেখিকা এই হর্ম্ম্যের উপর হইতে তাজ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। (১) বাস্তবিক ইহার উপর হইতে তাজ বড়ই সুন্দর দেখায়। দ্বারদেশের গাত্রে কোরাণের শ্লোক লিখিত আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিলেই এক প্রস্তরমণ্ডিত পথে উপনীত হওয়া যায় এবং সম্মুখেই তাজ নয়নগোচর হয়। এই পথের দুই ধারে ঝাউ গাছের শ্রেণী; এই পথের মধ্য দিয়া বরাবর এক অপ্রশস্ত জলাধার বা চৌবাচ্চা বিস্তৃত রহিয়াছে; এই জলাধারে অনেকগুলি কৃত্রিম উৎস রহিয়াছে।

এই পথ অতিক্রম করিলেই সম্মুখে ৮ ফিট উচ্চ লোহিত প্রস্তরের এক প্রশস্ত বেদি দৃষ্ট হয়; এই বেদির পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯৫০ ফিট এবং প্রস্থে ৩৩০ ফিট। ইহার উপর মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত চতুরস্রাকৃতি আর একটী বেদি আছে; ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩১৩ ফিট এবং উচ্চতা ১৮ ফিট। তাজমহল এই বেদির উপর নির্ম্মিত

তাজ একটী অষ্টভুজ-বিশিষ্ট সৌধ; ইহার চারি কোণের বাহুচতুষ্টয় অন্য বাহুগুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং দৈর্ঘ্যে ৩৪ ফিট; অন্য বাহু চতুষ্টয় দৈর্ঘ্যে ১৩৮ ফিট। মর্ম্মর বেদির চারিকোণে চারিটী মর্ম্মর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ বা মিনার তাজকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমরা তিনটী মিনারে উঠিয়াছিলাম। একটীর সর্ব্ব উপরে উঠিয়া আদৌ আলোক পাইলাম না; বোধ হয়, ইহার গবাক্ষ বন্ধ; ভয়ানক অন্ধকার। হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ পরে চর্ম্মচটিকা বা চামচিকা জাতীয় কি একটা জীবের পক্ষ সঞ্চালন-জনিত শব্দে ভীত হইয়া অতি দ্রুতপদ-বিক্ষেপে নিম্নে আসিতে হইল। মিনারে উঠিবার সময় কে— বাবু আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। দেখিলাম, তিনি বেশ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত উপরে উঠিতেছেন। আমরা সর্ব্ব শেষের যে মিনারে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে মুরাদাবাদের দুইজন খেলানা-ব্যবসায়ী উঠিয়া ফিতা দিয়া মিনারেটের সমস্ত পরিমাণ লইতে-

(১) A Civilian's Wife in India, Vol I, page 190.

ছিলেন, কারণ ইঁহারা তাজের অনুকরণে খেলানা প্রস্তুত করিবেন; আমি তাঁহাদের নিকট হইতে মাপ গুলি নোটবুকে লিখিয়া লইলাম।

মিনার-চতুষ্টয় ত্রিতল-বিশিষ্ট এবং ত্রিতলের উপরিস্থিত আটটী স্তম্ভের উপর একটী গম্বুজ; সুতরাং এই গম্বুজকে চতুর্থ তল বলা যাইতে পারে।

প্রথম-তলের উচ্চতা—৩৭ ফিট
দ্বিতীয়-তলের „ —৩৫ „
তৃতীয়-তলের „ —৩৯ ফিট।

লোহিত-প্রস্তরের বেদি হইতে গম্বুজ লইয়া মিনারের উচ্চতা ১৩৩ ফিট। মিনারের গম্বুজের উপরে গিল্টি করা বা পিতলের চূড়া আছে। মিনারের চূড়ার অগ্রভাগ ভূমিতল হইতে ১৬২ ফিট উচ্চ। প্রত্যেক তলে একটী করিয়া অপ্রশস্ত বারাণ্ডা মিনারকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মিনারের যে সর্ব্বোচ্চ তলে আমরা উঠিয়াছিলাম, তাহার ব্যাস ১১ ফিট ১০ ইঞ্চি এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যে বারাণ্ডা রহিয়াছে, তাহা প্রস্থে ২ ফিট ৫ ইঞ্চি। মিনারের সিঁড়িগুলি লোহিত প্রস্তর (Sand-stone) নির্ম্মিত; কেবল মিনারের বহিরাবরণ মর্ম্মর প্রস্তরের বলিয়া বোধ হইল।

তাজের শীর্ষস্থ গম্বুজের ব্যাস ৫০ ফিট এবং উচ্চে ৮০ ফিট। যেখান হইতে গম্বুজ উঠিয়াছে, তাহার উচ্চতা ভূমিতল হইতে ১৩৯ ফিট। তাহা হইলে গম্বুজের শীর্ষদেশ ভূমিতল হইতে ২১৯ ফিট। গম্বুজের শীর্ষদেশে কনকোজ্জ্বল পিত্তলের চূড়া রহিয়াছে; ইহার উচ্চতা ৩০ ফিট। তাহা হইলে, ভূমিতল হইতে তাজের চূড়ার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৯ ফিট উচ্চ। তাজের মধ্যস্থ বৃহৎ গম্বুজকে বেষ্টন করিয়া হর্ম্ম্যের চারি কোণে চারিটী গম্বুজ। তাজের অনেক স্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরের মিশ্রণ কার্য্য বা মোজেয়িক রহিয়াছে; নানা দেশ বিদেশ হইতে প্রস্তর গুলি আনীত হইয়াছিল। এই প্রস্তর গুলির মধ্যে জ্যাস্পার, কর্ণেলিয়ান্, টারকয়েস্, এগেট, রকস্পার, স্যাফায়ার প্রধান। সম্মুখ দ্বার ভিন্ন তাজের সমস্ত দ্বার গুলি মর্ম্মর-প্রস্তরের জাফরি বা জাল্‌তি দ্বারা আবদ্ধ। জাফরি গুলির সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া বোধ হয় শিল্পীরা কিরূপ সুদক্ষ। বাস্তবিক তাজের নির্ম্মাণে শিল্প ও স্থাপত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আমি নিজে একজন স্থাপত্য-ব্যবসায়ী হইয়াও তাজের শিল্প ও স্থাপত্য দেখিয়া পাশ্চাত্যালোক-প্রদীপ্ত নিজ স্থাপত্য-জ্ঞানের উপর ঘৃণা জন্মিল; বোধ হইল কিছুই শিখি নাই। কল কারখানার উদ্ভাবনের পূর্ব্বে অত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর অত ঊর্দ্ধে কি প্রকারে লইয়া গিয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখনকার লোকে নব্য applied mechanics জানিত না; কিন্তু তাহাদের নির্ম্মিত সৌধ গুলির কোথাও কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ফাটও (Hair cracks) ধরে নাই; কিন্তু নব্য স্থাপত্য-শাস্ত্রাভিমানী স্থপতির সৌধগুলির কি দুর্দ্দশা!! একটী উদাহরণ দিতেছি, —মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিমন্দির বা Victoria Memorial Hall তাজের তুলনায় অতি নগণ্য। কত মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহার অঙ্কন, উচ্চ গণিতের সাহায্যে ইহার দৃঢ়তা নির্ণয়, ভূমিখণ্ডের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ইত্যাদি সমাধা করিয়া প্রবীণ ও অভিজ্ঞ স্থপতির তত্ত্বাবধানে এই স্মৃতিমন্দিরের যতটুকু নির্ম্মিত হইয়াছে, ততটুকু ইহারই মধ্যে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বসিয়া গিয়াছে। তবে একটী

কথা আমরা এস্থলে স্বীকার করিব। প্রাচীন স্থাপত্য অপেক্ষা নব্য-স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহা এই যে, নব্য-স্থাপত্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি economy বা অল্প খরচের দিকে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি তত তীক্ষ্ণ নহে। আমাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, এ জীবনটা কড়াক্রান্তি লইয়া ব্যস্ত থাকিবার জীবন নহে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা কড়াক্রান্তি বা utilityর যুগ।

তাজের মর্ম্মর বেদিস্থ দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে যে প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, তাহার মধ্যস্থ মর্ম্মর প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বরাবর একটী ক্রমনিম্ন পথ দিয়া উত্তর দিকে যাইলে যে প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, তাহার মধ্যেই সম্রাট সাজাহান ও তদীয় প্রিয়তমা-পত্নী মুমতাজ-ই-মহল সমাহিত রহিয়াছেন। এই ঘরটী একটু অন্ধকারযুক্ত। সম্মুখের পথ ভিন্ন আলোক প্রবেশের উপায় নাই। এই প্রকোষ্ঠের তল-দেশ মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত; ইহার কোনরূপ শিল্প-গৌরব না থাকিলেও একটা অনাবিল-শুচিতার ভাব আছে। ফরাসী-চিকিৎসক বারনিয়ার বলেন যে, এই প্রকোষ্ঠে বৎসরের মধ্যে একদিন অতি সমারোহের সহিত খোলা হইত এবং ক্রিশ্চানদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। (১) সেই জন্যই ইহার ভিতর কিরূপ, বর্ণনা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে কিন্তু প্রবেশ করিতে দেওয়া দূরে যাউক, সাহেবেরা পাদুকা উন্মোচন না করিয়াই এই সমাধি-হর্ম্ম্যের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপ করিয়া ইহার পবিত্রতা নষ্ট করেন। আমরা নগ্নপদে সমস্ত দেখিলাম, শুনিয়াছি, লর্ড কর্জ্জন পাদুকা উন্মোচন করিয়া নাকি সমাধি-হর্ম্ম্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মার্জ্জিত রুচির নির্দ্দেশক। মহামতি বার্কের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে যে, যে মুমতাজের ইঙ্গিতে "ten thousand swords would have leaped from their scabbards to avenge even a look that threatened her with insult" (২) সেই মুমতাজের সমাধির অবমাননা দেখিয়া অন্তরে যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভের উদয় হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, নগ্নপদে ভ্রমণ করা যদি তোমার রীতি-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যেখানে যাইতেছ, সেখানকার রীতির অবমাননা করা সংনীতি-বিরুদ্ধ নহে কি? তোমার রীতি-বিরুদ্ধ হইলে তুমি অপরের রীতিকে পদদলিত করিতে যাইও না। তোমাদের সভ্যতাতেই ত ইহা বলে!!

তাজের শিল্প-সম্বন্ধে আমরা আর একটী কথার উল্লেখ করিব। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন বলেন যে, আকবরের মৃত্যুর পর মোগল-স্থাপত্যের একটী বিশেষত্ব এই যে, নানাবিধ বিভিন্ন বর্ণের বহু মূল্য প্রস্তরের মোজেয়িক নির্ম্মাণ করা। তাজে এই বিশেষত্বের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

আমরা তাজমহলের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলাম। তাজমহল সাজাহান-পত্নী মুমতাজ-ই-মহলের সমাধি-মন্দির। ইঁহার প্রকৃত নাম অর্জ্জমন্দ-বানু বেগম। স্থানীয় লোকে ইহাকে "তাজকা রৌজা" বা সংক্ষেপে 'রৌজা' বলিয়া অভিহিত করে। একদিন সম্রাজ্ঞী, সাহজাহাঁর সহিত তাস-ক্রীড়া করি-

(১) Vide Bernier's Travels published by Constable, page, 298.

(২) Burke's Reflections on the French Revolution.

বার সময় সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জাঁহাপনা! আমার যদি আপনার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার কিরূপ সমাধি নির্ম্মাণ করেন।" সম্রাট আবেগ-ভরে বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে এমন এক অদ্ভুত সৌধ নির্ম্মাণ করিব, যাহা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু হইবে এবং তোমার নাম অমর করিয়া রাখিবে।" সম্রাজ্ঞী ১৬৩১ অব্দে একটী কন্যা প্রসব করিবার ২ ঘণ্টা পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্রাজ্ঞী মৃত্যুশয্যায় সম্রাটকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মুমতাজের প্রতি সাজাহানের প্রেম অসাধারণ ছিল; তিনি মহিষীর মৃত্যুতে উন্মত্তপ্রায় ও মৃতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। (১)

তাজমহল এই স্বর্গীয় প্রেমেরই আংশিক অভিব্যক্তি; মানুষের শিল্প ও ললিতকলার দিব্য নিদর্শন। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর সম্রাট ৩৫ বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই ঘটনাটী মোগল-ইতিহাসে কেন, সমস্ত মুসলমান ইতিহাসের মধ্যে অভিনব। ১৬৩১ অব্দে তাজের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়; দ্বাবিংশতি বৎসর ধরিয়া বিংশতি সহস্র শিল্পী ও মিস্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। তাজ নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৩১৭৪৮০২৪ টাকা; (২) কিন্তু কর্ণেল এণ্ডারসেন্ Calcutta Review পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, আনুমানিক ব্যয় ৪১১৪৮৪২৬ টাকা। তাজ নির্ম্মাণের অনেক বহুমূল্য উপকরণ সাজাহান অন্যান্য রাজাদিগের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মজুরিও অনেক স্থলে বিনা মূল্যে পাইয়াছিলেন, তথাপি তাজ নির্ম্মাণে এত ব্যয় হইয়াছিল। জয়পুরের মহারাজা সমস্ত শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তর সরবরাহ করেন; জয়পুরের নিকটবর্ত্তী মাকরাণা (৩) হইতে মর্ম্মর প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের জন্যও মাকরাণা হইতে শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর আনীত হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর হইল, ইহা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হল্যাণ্ড সাহেব ম্যাকরাণায় গিয়াছিলেন। ফতেপুর-সিক্রী হইতে লোহিত বালু-প্রস্তর আনীত হয়। পঞ্জাব, বুন্দেলখণ্ড, যশল্মীর, গোয়ালিয়র, লঙ্কা, তিব্বত এবং চীনদেশ হইতে বহুমূল্যবান নানা বর্ণ-বিশিষ্ট প্রস্তর আনীত হইয়াছিল।

তাজের নির্ম্মাণ জন্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত উড়িষ্যা, পঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি নানা প্রদেশ হইতে ও তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি নানা বিভিন্ন দেশ হইতেও শিল্পী ও স্থপতি আনয়ন করা হইয়াছিল। তাহাদের বেতন মাসিক এক শত হইতে পঞ্চ শত মুদ্রা।

তাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের নাম ইসা মহম্মদ।
" " চিত্রকরের নাম অমরনন্দ খাঁ।
" " রাজমিস্ত্রীর নাম মহম্মদ হানিফ।

ইঁহাদের সকলেরই বেতন মাসিক এক সহস্র টাকা। (৪)

তাজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার কল্পনা ও নির্ম্মাণের জন্য ভারতবাসীকে প্রশংসা না করিয়া, একজন ফরাসীকে প্রশংসার পাত্র মনে করেন।

(১) Vide Bernier's Travels published by Constable p 293.

(২) বিশ্বকোষ আগ্রা-পর্য্যায় দেখুন।

(৩) Vide Keene's Hand-book for Visitors to Agra. p 30.

(৪) "অষ্টাদশোর্দ্ধি হইতে কুতব পর্য্যন্ত" পুস্তক দেখুন, পৃষ্ঠা ৩৭।

ইঁহার নাম অষ্টিন(Austin De Bordeaun) ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে তাজের নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য প্রশংসার পাত্র অষ্টিন্ ডি বোর্ডে এবং নানাবিধ বর্ণের প্রস্তরের মোজেয়িক কার্য্যের জন্য প্রশংসার্হ ইটালিয়ান্ শিল্পকরেরা। তাজে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের যে জাফতি বা Trellis Work আছে, তাহাতে হনিসাক্ল (Honey Suckle) পুষ্পের খোদাই দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেই পুষ্পে ইটালীয় শিল্পের গন্ধ পাইয়াছেন এবং ইহা হইতে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন যে, তাজের নির্ম্মাণ ইটালীয় আদর্শের উপর স্থাপিত। এই সকল মন্তব্যের উত্তরে "Travels of a Hindu"র প্রবীণ-লেখক বেশ শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়েরা কি কেবল তাজের নির্ম্মাণ-কার্য্য নির্ব্বাক বিস্ময়ের সহিত দেখিয়াছে ? (১)

সাজাহানের রাজসভায় অনেক ইউ-রোপীয় ছিলেন, স্বীকার করি, ইঁহাদের মধ্যে মণিবিক্রেতা ট্যাভারনিয়ারই প্রসিদ্ধ ; এবং তাজ নির্ম্মাণের পঞ্চ বৎসর পরে ফরাসী চিকিৎসক বারনীয়ার মোগলরাজ-চিকিৎসক হন। তখন সাজাহানের গৌরবরবি অস্ত-মিত হইতেছে। ট্যাভারনিয়ার তাজ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া-ছিলেন ; তিনি তাঁহার লেখার মধ্যে তাজ-নির্ম্মাতা বলিয়া অষ্টিনের নাম উল্লেখ করেন নাই। মানব মাত্রেরই স্বভাব, একটু সুবিধা পাইলে স্বজাতির মহিমা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে ; এরূপ সুবিধা ট্যাভারনিয়ার কখনই ছাড়িতেন না। বর্ণিয়ারও তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। আর এক কথা এই যে, তাজের ন্যায় অত সুন্দর নাই হউক, কিন্তু একই প্রকার মূল কল্পনা প্রণোদিত শত; শত সমাধি-মন্দির আছে, তাহাদের সমস্তই কি ইউরোপীয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ?

বৌদ্ধস্তূপ, অশোকস্তম্ভ, সারনাথের চৈত্য, বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া ইলোরা, অজ-ন্তার গুহা-মন্দির, বিজাপুরের সমস্ত প্রাচীন সৌধ গুলি, দিল্লীর কুতব মিনার হইতে জামে মস্জিদ, লক্ষ্ণৌর ইমাম্বারা, রুমিদরওয়াজা, মচ্ছিভবন প্রভৃতি সমস্তই, ফতেপুর-সিক্রীর প্রাসাদগুলি, ধারওয়ারের দীপদান, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বর, মাদুরা, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দির গুলি সমস্তই ইউরোপীয় শিল্পের নিদর্শন স্থল, প্রমাণ করিতে পারিলেই ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এ সমস্ত ত সামান্য কথা ; সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে সংস্কৃত বলিয়া কোন ভাষাই ছিল না, ইহা গ্রীক-ভাষার আদর্শে প্রস্তুত, এমন কি, রামায়ণ পর্য্যন্ত হোমরের অনুকরণ। ইহা ভাষাতত্ত্ববিৎ সংস্কৃতজ্ঞ (সংস্কৃতাজ্ঞ !) ম্যাক্-ডোনাল্ড সাহেবের মত !! (১)

ঐতিহাসিক কিন বলেন যে, তাজ ইটালীয় কর্ত্তৃক আদৌ কল্পিত হয় নাই এবং ইহাতে ইটালীয় শিল্পের বা স্থাপত্যের আদৌ সাদৃশ্য নাই। তাঁহার মতে তাজের বহিরাকৃতির (elevation) কল্পনা সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ হইতে লওয়া হইয়াছে। (২) কিন্তু কিন্ বলেন যে, মোজেয়িক কার্য্যের জন্য ইটালীয় শিল্প বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই

(১) Travels of a Hindu Vol I, p 416.

(১) The Nineteenth Century" পত্রিকায় সমালোচক Andrew Lang এর একটী প্রবন্ধ এইরূপ পাঠ করিয়াছি।

(২) Keene's "Handbook for visitors to Agra" pages 30,31.

জন্যই তিনি অষ্টিনের অস্তিত্বে আস্থাবান্। অনেকে বলেন, তাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইশা মহম্মদই অষ্টিন সাহেব। অষ্টিন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ নাম ধারণ করেন। তাঁহার নাকি আগ্রায় মৃত্যু হয় এবং আগ্রা-দুর্গের দেওয়ানীখাসে তাঁহার তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল।

তাজ দর্শনান্তর আমরা আগ্রা-দুর্গ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম; অ— বাবু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য "পাশ" সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের শকট দুর্গের দ্বারে আসিয়া থামিল। আগ্রা দুর্গ বলিলে আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত কোন দুর্গ বুঝায় না। ইহা একটী পরিখা-বেষ্টিত প্রাচীর-বদ্ধ সুরক্ষিত প্রাসাদ। সম্রাট আকবর আগ্রা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তবে ইহার অন্তর্গত সমস্ত হর্ম্ম্যগুলি ইঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। "Historical Studies প্রণেতা ভ্রম ক্রমে আগ্রাদুর্গ সাজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া লিখিয়াছেন। (১) দুর্গ সুন্দর লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ; প্রাচীরের উচ্চতা ৭০ ফিট। ২১ ঘণ্টা গোলা বর্ষণেই ইহাকে ভূমিসাৎ করিতে পারা যায়। দুর্গ প্রাচীর দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল। দুর্গ এমন স্থানে নির্ম্মিত হওয়া উচিত যে, স্থানটী প্রকৃতি কর্ত্তৃক আপনিই সুরক্ষিত; কিন্তু আগ্রা-দুর্গের সে প্রকার সুবিধা নাই। ইহা প্রকৃতি হস্ত হইতে বিন্দুমাত্রও সুবিধ পায় নাই। এক্ষণে যে পরিখা বিদ্যমান, তাহারও বাহিরে এক প্রাচীর ছিল এবং এই বহিঃপ্রাচীরের বাহিরে সুগভীর আর একটী বহিঃপরিখা ছিল; বহিঃপরিখা মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করা হইয়াছে।

(১) Historical Studies by Soshee chunder Dutta, Vol II, p 540.

আগ্রাদুর্গে প্রবেশের জন্য দুইটী দ্বার আছে; একটীর নাম "দিল্লীগেট" বা দিল্লী-দরওয়াজা, ইহা জামে মস্‌জিদের সম্মুখে এবং আগ্রাফোর্টে ষ্টেসনের নিকটে। আর একটী দ্বারের নাম "অমর সিংহের দ্বার" (অমর সিংহকা ফটক)। অমর সিংহ মারওয়ার বংশাবতীর্ণ; ইনি সাজাহানের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সাজাহান ইঁহার সাহসে ও শৌর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ দ্বারের নামানুকরণ করেন "অমর সিংহকা ফটক।"

আমাদের শকট "অমর সিংকা ফটকের" নিকট থামিল। আমরা একটী draw-bridge এর (যে পোলকে উঠান ও নামান যায়) উপর দিয়া যাইলাম। সম্মুখের দ্বারে একজন ইংরাজ-সৈনিক পাহারা দিতেছিল; তাহাকে পাশ দেখাইলে আমরা প্রবেশাধিকার পাইলাম। "আমরা অমর সিংকা ফটকের" দক্ষিণ-দিকের পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম; পথটী প্রস্তরমণ্ডিত এবং ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে; ইহা দুর্গপরিখার সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে। আমরা খাসমহলে আসিলাম; খাসমহলের এক বারাণ্ডাতে প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরের বিশাল কারুকার্য্য-খচিত বিশাল কাষ্ঠদ্বার রক্ষিত আছে; তাহার সম্মুখে কাষ্ঠের বোর্ডের উপর ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত আছে; আমি নোটবুকে লিখিয়া লইলাম; কে—বাবুর তাড়াতাড়িতে সমস্ত লিখিবার সময় পাওয়া গেল না।

১৮৪২ অব্দে আফগানযুদ্ধের অবসানে ইংরাজেরা গজনি নগরীস্থিত মামুদের সমাধিহর্ম্ম্য হইতে জয়চিহ্নস্বরূপ এই কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার লইয়া আইসেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড এলেনবরা প্রচার করিয়া দেন যে, ইহাই সোমনাথের মন্দিরের সেই পুরাতন দ্বার;

কিন্তু এক্ষণে এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, ইহার শিল্পকার্য্যে হিন্দুশিল্পের আদর্শ বিদ্যমান নাই এবং আরও বলেন যে, সোমনাথের প্রকৃত দ্বারটী চন্দন-নির্ম্মিত বলিয়া কথিত, কিন্তু এই বর্ত্তমান দ্বারের কাষ্ঠের সূক্ষ্মাংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা পাইন জাতীয় দেবদারু বিশেষ। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডেলিনিউস পত্রিকায় কলাকুশল পণ্ডিত সিম্পসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, বোধ হয়, মামুদের সমাধিহর্ম্ম্যে সোমনাথের যে প্রকৃত দ্বার ছিল, তাহা অগ্নিতে ভগ্নসাৎ হওয়ার পর এই বর্ত্তমান দ্বার সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মতে ইহা কখনই সোমনাথের মন্দিরের দ্বার নহে। (১)

খাসমহলের নিকটবর্ত্তী এক অতি অপ্রশস্ত দ্বার দিয়া আমরা অন্ধকারময় পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম। একটী লোক একটা মশাল জ্বালিয়া আনিল; আমরা অবশেষে এক গর্ত্তের নিকট আসিলাম। ইহার তলদেশ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না; গর্ত্তের ৭।৮ ফিট উপরে একটী বৃহৎ কাষ্ঠ রহিয়াছে; কথিত আছে, এই কাষ্ঠ হইতে লম্বমান রজ্জু দ্বারা সম্রাটের রাজান্তঃপুরবাসিনী দ্বিচারিণীদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইত, শুনিলাম, এই গর্ত্তের সহিত নাকি যমুনার সংযোগ আছে। গুরু অপরাধে অভিযুক্তা রাজান্তঃপুরবাসিনীদের কারাবাসের জন্য অনেকগুলি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ দেখা গেল, কিন প্রভৃতি অনেকে বলেন যে, এই গৃহগুলিতে সম্রাট প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে অতিবাহিত করিতেন এবং সূর্য্যের কিরণ চক্ষে কষ্টদায়ক বলিয়াই এই গুলিতে অন্ধকারময় করিয়া নির্ম্মিত করা হইয়াছিল।

খাসমহলের পর অঙ্গুরিবাগ দেখা গেল; ইহা খাসমহল-সংলগ্ন। পূর্ব্বে ইহা একটী অপ্রশস্ত উদ্যান ছিল। এই অঙ্গুরিবাগে সিপাহিবিদ্রোহের সময় ইংরাজ সৈনিকেরা সপরিবারে বাস করিতেন; এই খানেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা কল্‌ভিন্ সাহেবের মৃত্যু হয়।

খাসমহল রাজান্তঃপুর এবং অঙ্গুরিবাগ, এই অন্তঃপুর ললনাদের প্রমোদোদ্যান; কিন্তু ইহা তেমন বিস্তৃত নহে। খাসমহল শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত। ইহার ঠিক পূর্ব্ব দিয়া যমুনা প্রবাহিত এবং প্রকোষ্ঠগুলি ঠিক যমুনার ধারে। এই খাসমহলেই কাবুল, পারস্য, কাশ্মীর, তুর্কীস্তান হইতে আনীত কত শত চম্পকদাম গৌরী সুন্দরী আপনার মঞ্জুল-যৌবনকুঞ্জ উন্মুক্ত রাখিতেন, এই খাসমহল এক সময় সিরাজীর ফেনিলোচ্ছল স্রোতে উদ্বেলিত হইত। ইহা এক সময় সুন্দরীদিগের সুললিত হাস্যে মুখরিত হইত, আর আজ এইখানে মহামৌনতা বিরাজমান।

খাসমহল দেখিয়া আমরা জাহাঙ্গীর মহলে আসিলাম; ইহা লোহিতপ্রস্তর নির্ম্মিত; ইহাতে বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। যোধাবাইমহল, জাহাঙ্গীর মহলেরই অন্তর্গত। জাহাঙ্গীর মহল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু অনেকে বলেন, ইহার কিয়দংশ আকবরের শাসনকালের অবসান সময়ে নির্ম্মিত হয়। "Our visit to Hindustan" লেখিকা এন্‌সলি (Mrs. Aynsley) বলেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত প্রাসাদগুলির কতিপয় বিশে-

(১) Vide Keene's Handbook for visitors to Agra, p 149.

স্বত্ব আছে। এই সব প্রাসাদে খিলান নাই, প্রাসাদের একটা বিশালতা (Massiveness) বিদ্যমান এবং ইহার নির্ম্মাণে জটিলতা নাই। এই ত্রিবিধ কারণে প্রাসাদগুলির স্থাপত্যের সহিত হিন্দু স্থাপত্যের বিশেষ সম্বন্ধ।

ইহার পর আমরা "শিসমহল" দর্শন করি, শিস মহলের অর্থ কাচের বাটী। এই গৃহের প্রাচীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ দ্বারা মণ্ডিত; এই গৃহে রাজান্তঃপুর ললনারা স্নান করিতেন, এবং দর্পণে আপনাদের অবেনীসম্বদ্ধকুন্তলভার-প্রপীড়িত, কনকোজ্জ্বল, রুচির বদনকান্তি, ভ্রুবিলাস, বিলোলকটাক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া উল্লাসে উৎফুল্ল ও হর্ষবিকম্পিত হইতেন। প্রাচীরের এক অংশ হইতে জল বাহির হইয়া একটী তীর্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত প্রস্তরের উপর দিয়া পড়িয়া একটু ঢালুমেজের উপর দিয়া এক মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত জলাধারের মধ্যে সঞ্চিত হইত। বাহির অপেক্ষা প্রকোষ্ঠের ভিতর একটু শীতল বোধ হয়; শিসমহলের ভিতর তেমন আলোক আইসে না; ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বোধ হয়; কেন না, অন্ধকারেই আলোকের প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণখণ্ডে আলোক প্রতিফলিত হইলে শোভা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শিসমহলের পর আমরা দেওয়ানীখাস দর্শন করি; দেওয়ানী খাসে সম্রাট বিশেষ অনুগৃহীত, সম্ভ্রান্ত ওমরাহ ও অমাত্যদিগের সহিত রাজ্যসংক্রান্ত গুপ্ত মন্ত্রণা করিতেন; ইহাতে বর্ত্তমানের Cabinet Ministry বসিত। দেওয়ানী খাস একটী নাতিবৃহৎ সৌধ এবং দুইটী দালানে বিভক্ত; ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফিট, প্রস্থে ৩৪ ফিট এবং উচ্চতায় ২২ ফিট। গৃহতল মর্ম্মর মণ্ডিত; দালানের খিলান স্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই শ্বেত-মর্ম্মরনির্ম্মিত। বীরবল, মানসিংহ, আবুল-ফজল, ফৈজী, টোডরমল্ল ইত্যাদি নবরত্ন-মণ্ডিত হইয়া সম্রাট আকবর এই দেওয়ানী খাসের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। (১) যে গৌরব সম্রাট আকবরের স্মৃতিকে দিব্যমহিম-শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে,সে গৌরবের প্রতিষ্ঠা এই দেওয়ানী খাসে।

দেওয়ানী-খাস অতিক্রম করিয়া আমরা "মচ্ছি-ভবনে" আসিলাম। মচ্ছিভবন একটী লোহিত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল সৌধ বিশেষ। ইহার মধ্যে প্রশস্ত অঙ্গন; কিন্তু পূর্ব্বে এই উদ্যান জলাশয় ছিল এবং "মচ্ছি-ভবনের" বারাণ্ডায় বসিয়া সম্রাট ও বেগমেরা মৎস্য ধরিতেন। ইহা সম্ভবতঃ সাজাহানের সময়ই নির্ম্মিত হয়। "মচ্ছিভবনের" উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র মস্‌জিদ আছে। ইহার নাম "নাগিনা মস্‌জিদ"। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০ ফিট, প্রস্থে ১৮ ফিট, এই মস্‌জিদ অতি সুচিক্কণ শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত; দেখিলে বোধ হয় সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখে গোলাপ জলের ফোয়ারা; এই মসজিদে রাজান্তঃপুর-নারীরা নমাজ পড়িতেন। এই মসজিদে "মতিমসজিদের" বিশালতা না থাকিলেও এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে; ইহারই নাম মতি-মস্‌জিদ রাখিলে নামকরণ অতি সুন্দর হইত। ইহারই সন্নিকটে বেগমদিগের বাজার; এই বাজারে বেগমেরা পছন্দমত সামগ্রী ক্রয় করিতেন; এই বাজারের অন্তর্গত প্রকোষ্ঠ-গুলি লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত। এই বাজারের

(১) কলিকাতাস্থ মিউজিয়মের (Museum) ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসম্বন্ধীয় প্রকোষ্ঠে নবরত্ন-মণ্ডিত আকবরের একখানি ক্ষুদ্রচিত্র দেখিয়াছি।

নাম মিনাবাজার। প্রবাদ আছে, মিনাবাজারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের একটী অতি প্রশস্ত বারাণ্ডা হইতে মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া দুইটী পথ গিয়াছে, একটী তাজ পর্য্যন্ত, আর একটী দিল্লী পর্য্যন্ত। আমরা চেষ্টা করিয়া একটীরও সন্ধান পাইলাম না।

মচ্ছিভবনের নিকটস্থ ছাদের যেদিকে যমুনা প্রবাহিত, সেই দিকের ছাদের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাসন আছে; ইহা একখানি প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত হইয়াছে, ইহা একটী দেখিবার জিনিস। সম্রাটেরা ইহার উপর বসিয়া যমুনা সন্দর্শন করিতেন; ইহারই নিকট একটী শ্বেতমর্ম্মরের আসন আছে; প্রবাদ আছে, ইহার উপর মন্ত্রী বীরবল বসিয়া সম্রাট আকবরের সহিত কথোপকথন করিতেন। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাসন ফাটিয়া গিয়াছে; ইহা শ্লেটজাতীয়। কিন্তু এন্সলি (Mrs. Aynsley) (১) বলেন যে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যাসাল্ট (Basalt) জাতীয়; আমার কিন্তু ইহা শ্লেট বলিয়াই বোধ হইল। "Travels of a Hindu" লেখক ইহাকে কৃষ্ণবর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা একেবারেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

মচ্ছি-ভবন অতিক্রম করিয়া আমরা ইহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেওয়ানী আমে পৌঁছিলাম; দেওয়ানী আম মচ্ছি-ভবন-সংলগ্ন। জন সাধারণের আবেদন শুনিতে সম্রাট যে প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিতেন, তাহারই নাম দেওয়ানী আম। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৯২ ফিট, প্রস্থে ৬৪ ফিট; প্রকোষ্ঠের ছাদ স্তম্ভের উপর রক্ষিত। ইংরাজ বাহাদুরের পূর্ত্তবিভাগ (P.W.D) ইহার সংস্কার করিতে যাইয়া ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। দেওয়ানী আমের সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন; রাজসিংহাসনের সম্মুখে লোহিত বর্ণের প্রস্তরের রেলিং এবং রেলিং-এর বাহিরে সাধারণের বসিবার স্থান ছিল; রেলিংএর ওধারে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বসিতেন; এবং মর্ম্মর প্রস্তরের রাজসিংহাসনে সম্রাট বসিতেন। দেওয়ানী আমের নির্ম্মাণে কোনরূপ শিল্পকৌশল বা কারুকার্য্য নাই। সম্রাটের বসিবার গৃহ এরূপ সামান্য হওয়া বিসদৃশ বোধ হয়; ইহার কারণ পরে বলিব।

ঐতিহাসিক কিন বলেন যে, অনেকের ভ্রান্ত ধারণা, দেওয়ানী আমের সিংহাসনে আকবর বসিয়া বিচার করিতেন; তিনি বলেন যে, 'শিলালিপি (inscription) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, আরঙ্গীবের রাজত্বের সপ্তবিংশতি বর্ষের পূর্ব্বেও দেওয়ানী আমের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই" *।

কিনের মত খণ্ডন করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, অধুনা যে দেওয়ানী আম বর্ত্তমান, আকবর বা জাহাঙ্গীরের সময় সে অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল না এবং তাহারই স্থলাভিষিক্ত অন্য কিছু ছিল; কারণ, জাহাঙ্গীরের রাজসভাস্থ ইংরাজদূত সার টমাস রো (Sir Thomas Roe) দেওয়ানী আমের উল্লেখ করিবেন কেন? আর একটী প্রমাণ এই যে, সার টমাস রো ইহা দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে,তিনি জীবনে যত প্রকার সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়াছেন, দেওয়ানী আম তাহার মধ্যে অন্যতম, কিন্তু আধুনিক দেওয়ানী আম দেখিয়া মুগ্ধ হইবার এমন কিছুই নাই। তৃতীয়

(১) Vide "Our Visit to Hindustan" by Mrs. Aynsley.

* Vide Keene's Handbook for visitors to Agra, page 16.

প্রমাণ এই যে, শুধু সার্ টমাস রো নহেন, তাঁহার ধর্ম্মযাজক টেরি (Terry)ও এই দেওয়ানী আম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন * "এই রাজসিংহাসনের বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ বিদ্যমান; সিংহাসনে উঠিবার সিঁড়িগুলি রৌপ্য মণ্ডিত এবং নানা মহমূল্য প্রস্তর-ভূষিত পাঁচটী রৌপ্য হস্তি দ্বারা সিংহাসন ভূষিত ছিল।" এখন এসমস্তের চিহ্নও নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান দেওয়ানী আম আরঙ্গীবের রাজত্ব সময়েই নির্ম্মিত হয়, কেননা, ইহাতে আমরা শিল্পচাতুর্য্য দেখি না, অথচ পূর্ব্বেকার দেওয়ানী আমে যথেষ্ট শিল্পচাতুর্য্য ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আরঙ্গীব শিল্পচাতুর্য্যের নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। ইনি ললিতকলার উৎকর্ষের বিরুদ্ধে আইন লিপিবদ্ধ করেন। "Our visit to Hindustan" লেখিকা লিখিয়াছেন যে "Aurungzeb had issued edicts against the fine arts as tending to frivolity." † আরঙ্গীব বোধ হয় পূর্ব্বের দেওয়ানী আম ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান সৌধ নির্ম্মাণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজেরা আগ্রাদুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওয়ানী আমের সম্মুখে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা কল্‌ভিন্ সাহেবের আড়ম্বরশূন্য সমাধি রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অঙ্গুরিবাগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ঐতিহাসিক ফার্গুসন সাহেব ভ্রম ক্রমে দেওয়ানী আমকে দেওয়ানী খাস বলিয়াছেন এবং দেওয়ানী খাসকে দেওয়ানী আম বলিয়াছেন।

দেওয়ানী আম দর্শনানন্তর আমরা মতি-মস্‌জিদ বা Pearl Mosque দেখিতে আসিলাম। মতি মসজিদ দেওয়ানী আমের উত্তর পশ্চিম দিকে। আমরা পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। মতিমসজিদ দেখিতে অতি মনোজ্ঞ; মসৃণ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম মতিমসজিদ। ইহা এক উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত বেদির উপর নির্ম্মিত; ইহার নির্ম্মাণে কোনরূপ আড়ম্বর নাই। তাজ বা অন্যান্য সমাধিমন্দিরের ন্যায় ইহাতে বিচিত্র বর্ণযুক্ত প্রস্তরের মিশ্রণ বা মোজেয়িক ওয়ার্ক নয়নগোচর হয় না; ইহার সুচিক্কণ মর্ম্মর প্রস্তরে কৃষ্ণবর্ণের অক্ষর বা রেখা মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অথচ সহজ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব করিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণে উপযোগিতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী চতুরস্রাকৃতি অঙ্গন; আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৫৮ ফিট এবং প্রস্থে ১৫৪ ফিট। এই অঙ্গনের মধ্যে একটী জলাধার; উঠানের তিন দিকে সুদীর্ঘ বারাণ্ডা এবং পশ্চিম দিকে মসজিদ। মস্‌জিদের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফিট এবং প্রস্থে ৫৬ ফিট (ভিতরের মাপ)। ভজনালয়টী তিনটী দালানে বিভক্ত; তিনটী দালানের স্তম্ভের উপর সাতটী করিয়া প্রশস্ত খিলান। এই খিলান গুলি মুসলমান (Saracenic) স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। দালানের উপরে মর্ম্মর প্রস্তরের তিনটী গম্বুজ। মসজিদের তিনটী দালান পুরুষদিগের প্রার্থনা করিবার জন্য এবং দুই পার্শ্বের দালান স্ত্রীলোকদিগের প্রার্থনা করিবার জন্য। আমরা, সহযাত্রীরা সকলেই চলিয়া যাইতেছিলাম, কেননা সন্ধ্যা

* "Travels of a Hindu, page 402, vol I.

† "Our visit to Hindustan" by Mrs. Aynsley, p 23.

হইয়া আসিতেছিল। আমি তখনও ছায়ালোক-বিচিত্র মসজিদের মধ্যে পাদচারণা করিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। কে—বাবু একটু বিরক্ত হইলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রার্থনা-স্থান দেখিবার জন্য কৌতূহল হইল; তাড়াতাড়ি বামদিকের দালানে প্রবেশ করিলাম; ইহাতে তেমন আলোক ছিলনা; অস্পষ্ট আলোকে একটু ভীষণ দেখাইতেছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কে—বাবু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

দুর্গের বাহির হইতে মতিমসজিদের গম্বুজত্রয় দৃষ্ট হয়। দূর হইতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শুভ্র গম্বুজত্রয় আকাশে ভাসিতেছে বলিয়া বোধ হয়; আশ্চর্য্যের বিষয়, মতি-মসজিদ ইসলাম-স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু ইহাতে মুসলমান স্থাপত্যের শিল্পাড়ম্বর আদৌ নাই; এবং এই আড়ম্বরের অল্পতা নিবন্ধনই ইহার একটী পবিত্রভাবে দর্শকের মন পূর্ণ হয়। দুর্গের প্রতি কতবার গোলাবৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ অভ্রভেদী গম্বুজের কোন অংশই আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

কর্ণেল শ্লীমান লিখিয়াছেন যে, মতিমসজিদ দেখিলে মনে হয় যে, তাজের সহিত অন্যান্য সমাধি-হর্ম্ম্যের যে সম্বন্ধ, মতি-মসজিদের সহিত অন্যান্য ভজনালয়ের সেই সম্বন্ধ (১)। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেন যে, মতিমসজিদ সাজাহান কর্ত্তৃক ১৬৫৪ অব্দে নির্ম্মিত হয়; (২) কিন্তু কর্ণেল শ্লীমান্ সাহেব বলেন যে, মসজিদের শিলালিপি (inscription) হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৬৫৬ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। মতিমসজিদে এমন এক পবিত্রভাব আছে যে, প্রকৃতই হৃদয় দ্রব হয়। এই জন্যই টেলার সাহেব লিখিয়াছেন—

> "It is a sanctuary so pure, and stainless, revealing so exalted a place of worship, that I felt humbled as a Christian, to think that our noble religion has never inspired its architects to surpass this temple to God and Mahomed."

আমরা মতি-মসজিদ দর্শনান্তর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; আমরা যে দ্বার দিয়া বহির্গত হইলাম, তাহার নাম "দিল্লী দরওয়াজা" বা Delhi gate। এই দ্বারদেশের সন্নিকটে ইংরাজ সেনানিবাস বা Barracks আছে।

"দিলী দরওয়াজা" দিয়া বাহিরে আসিলে "আগ্রাদুর্গ"-ষ্টেসনের সম্মুখে উপনীত হওয়া যায় এবং সম্মুখে জামে-মসজিদ প্রসারিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা জামে-মসজিদ দেখিবার সময় পাই নাই; ইহাও মতি-মসজিদের ন্যায় উচ্চ বেদির উপর স্থাপিত। দূর হইতে ইহার শ্বেত ও লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত গম্বুজ নয়নগোচর হয়; কিন্তু মতি-মসজিদের ন্যায় চিত্তাকর্ষক নহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসনের মতে জামে-মসজিদের নির্ম্মাণে পাঠান ও মোগল স্থাপত্যের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ফার্গুসন বলেন, আকবরের সময় ইহা নির্ম্মিত হয়; কিন্তু কিন বলেন যে, মসজিদের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬৪৪ অব্দে সাজাহানের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হয়; এই মসজিদ প্রিয়তমা পিতৃবৎসলা কন্যা জাহানারার জন্য নির্ম্মিত হয়।

আগ্রা দুর্গ দেখিয়া আমরা অবসন্ন দেহে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আগ্রাদুর্গের

---

(১) Vide "Rambles and Recollections" by Colonel Sleeman, p 27.

(২) Vide "Imperial Gazetteer of India" by W. W. Hunter. vol I, p 73.

চিন্তা মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছিল। ইহার প্রসাদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা মোগল-স্থাপত্যের একটা সুন্দর ক্রমবিকাশ দেখি। আকবরের সময়কার লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধগুলি শিল্পের জটিলতা ও সৌন্দর্য্য হইতে বিমুক্ত হইলেও, একটা সৈনিক জনোচিত শৌর্য্যের ভাব ও বিরাটত্ব জ্ঞাপন করে। জাহাঙ্গীরের সময়ের প্রসাদগুলি শৌর্য্যভাব নির্দ্দেশ করে এবং সম্রাট সাজাহান নির্ম্মিত হর্ম্ম্য গুলি (১) শান্তিপ্রিয়তার পরিচায়ক; কিন্তু আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে এই শিল্পের বিকাশ সঙ্কোচে পরিণত হইয়াছে। আরঙ্গজীবের সময় শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অবনতি সাধিত হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তাজমহল অপেক্ষা আগ্রাদুর্গ আমার হৃদয়কে অধিকতর দ্রব করিয়াছে; ইহার প্রত্যেক প্রস্তরে বিষাদের গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে। তাজমহল একটী প্রণয়ি-যুগলের সমাধি, আর আগ্রাদুর্গ একটী পরাক্রান্ত জাতির সমাধি বলিয়া বোধ হইল। অগ্রাদুর্গে একটা মহামৌন অসীমতার ভাব আছে; ইহার দর্শনে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়। রমণীর উন্মুক্ত যৌবন ও বিলোল কটাক্ষই বল, আর জয়দৃপ্ত সৈনিকের গর্ব্ব-বিস্ফারিত লোচনই বল, সমস্তই নশ্বর বলিয়া বোধ হয়। আগ্রাদুর্গ দেখিয়া আমার হৃদয় আবেগ-ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভারতের ইতিহাসের একটী অধ্যায় হইতে পূর্ব্বাপর সমস্ত অধ্যায়গুলি সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, দেখিলাম। এই আগ্রাদুর্গ দেখিয়া ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সমস্তই চিত্রার্পিতবৎ বোধ হইল। ভারতাকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু এই মেঘের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ-বিকাশ দেখিলাম।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(১) "Our visit to Hindustan" by Mrs. Aynsley page 23.

# উপনিষদের আখ্যায়িকা। (৩)

## নচিকেতার উপাখ্যান।

পুরাকালে গোতম নামক একজন মহর্ষি উন্নত স্বর্গলোক প্রাপ্তির আশায়, 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই গোতমেরই পিতা, ভারতে দরিদ্রদিগকে অন্নপানাদি দান করিবার নিমিত্ত, অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি গোতম, এই যজ্ঞে, সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি গোতমের, নচিকেতা নামে, একটী অল্প বয়স্ক পুত্র ছিল। গোতম, যজ্ঞ সমাপনান্তে, যখন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ কয়েকটী গাভী দান করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"পিতা সর্ব্বস্ব দান করিয়া, যজ্ঞের দক্ষিণার্থ যে সকল গাভী দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ গাভীগুলি ত দেখিতেছি নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। এই গাভীগুলি সকলেই অতি বৃদ্ধ হইয়াছে—ইহারা সকলেই জরাগ্রস্ত, তৃণাদি ভক্ষণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ইহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে! পিতা এরূপ গাভী দান করিতে উদ্যত হইলেন কেন? আমি শুনিয়াছি, যাঁহারা দক্ষিণার্থ এরূপ দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরকালে সুখবর্জ্জিত লোক-সকলে গতি হইয়া

থাকে।" নচিকেতা আপনার চিত্তে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, পিতৃ-সম্পাদিত যজ্ঞের অঙ্গ-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া, পিতার নিকটে বিনীত ভাবে উপস্থিত হইল, এবং মৃদুস্বরে নিবেদন করিল,—"পিতঃ! এই গাভী গুলির সহিত, দক্ষিণা-স্বরূপে, আমাকেও কি দান করিবেন না?" পিতা, প্রথমবারে, পুত্রের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। পুত্র পুনরায় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। এইরূপে, তিন চারিবার ক্রমাগত পুত্র, পিতাকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে, মহর্ষি গোতম পুত্রের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, আমি তোমায় যমকে দান করিলাম।" নচিকেতা, পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল,—"আমি ত পিতার সকল পুত্রের মধ্যে নিতান্ত নির্গুণ পুত্র নহি, তথাপি পিতা আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যাহা হউক, ক্রোধবশতই হউক্ বা অপর কোন কারণেই হউক্, পিতা যে কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে; পিতার যাহাতে বাক্য ভ্রষ্ট না হয়,—পিতার বাক্য যাহাতে নিষ্ফল না হয়, তাহা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আমি মৃত্যু-লোকের অধীশ্বর যম দেবতার নিকটে গমন করিব।" নচিকেতা, এই সংকল্প করিয়া, যম-ভবনে গমন করিল। নচিকেতা যে সময়ে যম-ভবনে উপস্থিত হইল, যম তখন স্বগৃহে ছিলেন না। সুতরাং নচিকেতাকে কেহ সম্ভাষণ করিল না। তিন দিবস কাল নচিকেতা যম-ভবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া যমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিন দিন পরে, যম স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, জ্বলদগ্নিসদৃশ একটী তেজস্বী ব্রাহ্মণ-বালক অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত আছে। তাহার অদ্যাবধি কোন্ সম্ভাষণ করা হয় নাই। যম, অতিথি-সৎকার হয় নাই শুনিয়া আশঙ্কিত চিত্তে, নচিকেতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি আমার গৃহে আজ তিন দিবস পর্য্যন্ত সৎকৃত হন নাই। ইহাতে আমার প্রত্যবায় সঞ্চিত হইয়াছে। অতিথি, গৃহস্থের গৃহে অসংকৃত থাকিলে, গৃহীর যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল নিষ্ফল হইয়া যায়,—গৃহী পাপগ্রস্ত হইয়া, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায়ে, স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয়। মহাশয়! আমার উপর প্রসন্ন হউন্; পাদ্যাসনাদি গ্রহণ করুন্। আপনি তিন দিন আমার গৃহে অসংকৃত অবস্থায় উপস্থিত আছেন, সুতরাং আমি আপনাকে তিনটী বর প্রদান করিব; আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা করুন্; আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করিতেছি।"

নচিকেতা, যমকে নমস্কার করিয়া, করযোড়ে নিবেদন করিল:—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তাহাই আমার পক্ষে বর লাভ সদৃশ হইল। তথাপি, আমি আপনার নিকট হইতে তিনটী বর প্রার্থনা করিব। আমার পিতা আরুণি গোতম অবশ্যই আমাকে প্রেতলোকে প্রেরণ করিয়া, চিন্তাকুল হইয়াছেন। তিনি আমার অতিশয় নিরুদ্ধ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়াই, এই লোকে আসিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। যমরাজ! আমি যখন এই লোক হইতে ফিরিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইব, তখন যেন পিতা আমাকে চিনিতে পারেন এবং তিনি যেন আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ সস্নেহ ও প্রসন্ন হন। আপনার নিকট আমার এই প্রথম প্রার্থনা।" যমরাজ নচিকেতাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

নচিকেতা পুনরায় নিবেদন করিল :—"হে যমরাজ ! আমার আর একটী প্রার্থনা আছে। আমি "অগ্নি-বিদ্যার" প্রার্থী। আপনি যে লোকের অধীশ্বর, ইহা স্বর্গলোক। এ লোকে রোগশোকাদির পীড়া নাই, কোন প্রকার ভয় নাই। এ লোকে, মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় জরামরণজনিত কোন ক্লেশ নাই। এই দিব্য-লোকের অধিবাসীবর্গ, তৃষ্ণাপাশ অতিক্রম করিয়া,দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। কি সাধনের প্রভাবে এই লোকের অধিবাসী হইতে পারা যায় ? আমি শুনিয়াছি, যাঁহারা "অগ্নিবিদ্যা" অবগত আছেন, তাঁহারাই এই লোকে আসিতে পারেন। দয়া করিয়া সেই অগ্নিবিদ্যার প্রণালী কীর্ত্তন করুন্। "যম বলি-লেন—"বিরাটপুরুষই অগ্নি নামে বিদিত। এই সর্ব্বব্যাপী বিরাটপুরুষের যাঁহারা যথা-বিধি উপাসনা করেন, তাঁহারাই এই স্বর্গ-লোকে স্থান পাইবার উপযুক্ত। এই বিরাট-পুরুষ জীবের বুদ্ধি-গুহায় নিয়ত অবস্থিত। বৈদিক যজ্ঞে, যে অগ্নিতে হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদিত করা যায়, সেই অগ্নিকে বিরাটরূপে ভাবনা করিবে। কিন্তু ইহা সকাম যজ্ঞ। যাঁহারা স্বর্গ-লোকাদি প্রাপ্তির উদ্দেশে, বাহ্যিক দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে, বিরাটপুরুষের ভাবনা করেন, তাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির কামনা থাকা প্রযুক্ত, এই উপাসনা সকাম উপাসনা। (১) ইহার ফল স্বর্গলোকপ্রাপ্তি।"

যমরাজ এই বলিয়া, নচিকেতাকে সেই "অগ্নি বিদ্যার" তত্ত্ব বলিয়া দিলেন এবং এই বিদ্যা নচিকেতার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং তৃতীয় বরটী প্রার্থনা করিবার জন্য নচিকেতাকে আহ্বান করি-লেন। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

(১) শ্রুতিতে, কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অনুষ্ঠানকারী এবং কেবল জ্ঞানানুষ্ঠান-কারী—এই তিন প্রকারের উপাসনা এবং উপাসক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা নিতান্ত সংসার-নিমগ্ন, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখে না, তাঁহারা বাপীকূপাদি খননাদি ও দানাদি দ্বারা শুভকর্ম্মের আচরণ করেন,—ইঁহারা কেবল কর্ম্মী নামে কথিত। আর, যাঁহারা তদপেক্ষা কিছু উন্নত, তাঁহারা আপনার সাংসারিক লাভোদ্দেশে বা পরলোকের স্বর্গাদি সুফললাভের জন্য যে দেবতার উপাসনা করেন, ইঁহারা কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অনুষ্ঠানকারী; কিন্তু ইঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না, কেন না ইঁহারা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করেন। আর যাঁহারা, যজ্ঞের উপকরণে ও অগ্ন্যাদিতে ও দেবতাদিতে ব্রহ্মের স্বরূপের আরোপ করিয়া লন, তাঁহারাও কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু ইঁহারা উন্নত সাধক। কেন না, ইঁহারা সর্ব্বত্র, সকল ক্রিয়ায় ও সকল ক্রিয়ার উপকরণে ব্রহ্মেরই স্বরূপের চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারাই পরে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভাবনাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহা-রাই সকল পদার্থে ও সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্মশক্তির অনুভব করিতে যত্ন করেন। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে "অগ্নি-বিদ্যা" বা বিরাটের উপাসনা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত-সাধক তাঁহারা, যাঁহারা কেবল জ্ঞানের, ধ্যান-যোগে, উপাসনা করেন; তাঁহা-দের ক্রমে অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, মৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের অবতরণিকায় কথিত হইয়াছে।

# স্বদেশ-সেবক

আমরা বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজের ফল চাই। হাতে হাতে ফল না পেলে অস্থির হয়ে পড়ি। রাতারাতি বড়লোক না হ'তে পেলে নৈরাশ্যের আর সীমা থাকে না। বীজ বপন করবার পরক্ষণ হ'তেই অঙ্কুরের আশায় বসে থাকি। কোন একটা কাজ আরম্ভ ক'রে, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে গেলে যত শক্তি, সময় ও লোকের দরকার, তার সমুচিত আয়োজন না ক'রেই "হ'লনা, হ'লনা," 'The movement is a huge failure' ব'লে সকল আশা ভরসা একেবারে ছেড়ে দিই। এ রকম ছেলেমানুষী আমাদের প্রায় সকল কাজেই দেখা যায়। ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করেই তার ঘাড়ে বোঝা বোঝা বই চাপিয়ে দেওয়া হয়, পাছে একটু দেরী হ'লে বিদ্যাদিগ্‌গজ হবার আশা কিছু ক্ষীণ হয়। আমাদের গ্রন্থকারেরাও তাড়াতাড়ি তাঁদের অব্যর্থলেখনী-প্রসূত রচনাগুলি, লেখা শেষ হওয়া মাত্রই ছাপিয়ে ফেলেন ও বিদ্বৎ সমাজের প্রশংসার আশায় দিন যাপন করেন। কিছু দিন লেখাগুলি ঘরে ফেলে রাখ্‌লে অথবা নিজের মনের ভাবটাকে আর একটু পাকৃতে দিলেই হয় ত নিজের অসম্পূর্ণতা নিজেই বুঝতে পেরে প্রতীকার করতে পারেন। কিন্তু সেটুকু বিলম্ব সহ্য হয় না। ভয়, পাছে আর কেহ এ কয়দিনের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার মৌলিকতার যশ, originalityর claim হতে বঞ্চিত ক'রে ফেলেন! ব্যবসাতেও তাই। একটা কারবার খুলেই অহরহ কেবল লাভের খাতাই নাড়াচাড়া করা হয়। কোন্ কোন্ জিনিষের কাট্‌তি বেশী, কি উপায়ে নূতন একটা জিনিষের চলন বাড়ান যায়, advertise যথেষ্ট করা হয়েছে কিনা, কোন্ ফিকিরে বিজ্ঞাপন দিলে লোকের মন আকৃষ্ট করা যায়, এসব ভাল রকম ক'রে বুঝে কাজ করতে গেলে যত সময়ের দরকার, তত অপেক্ষা করার শক্তি ও সহিষ্ণুতা থাকে না। "এ ব্যবসায় লাভ নাই মশায়—আর একটা কিছু ধরতে হবে" —অনেক মহাজনের মুখেই এই কথা। এমন কি, শরীরের যদি অসুখ হয়, তখনও একবার কবিরাজী, আর একবার ডাক্তারী বা এক সঙ্গেই নানা রকমের, বিভিন্ন মতের চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। আশু প্রতীকারের জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। কোন উপায়ে জোড়াতালি দিয়ে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে থাকি। ব্যারামের মূল কি? গলদটা কোথায়? কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করলে কেবল সাময়িক উপকার না হ'য়ে ভবিষ্যতের জন্যও ভাবতে হবে না, এ সব কথা ভেবে কাজ করতে গেলে বেশী সময় যায়। তাই "এখনকার মত ত ঠিক থাক্ তার পর দেখা যাবে"—এই ব'লে শরীরটাকে চিরকালের মত ব্যাধিমন্দির ক'রে তোলা হয়। সবুরে যে মেওয়া ফলে, এ কথা মনেই থাকে না। এখন যে সুবিধাটা পেয়েছি, তা আর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে কি হবে, তা দেখবার আর প্রবৃত্তিই হয় না। বর্ত্তমানের লাভের মোহে অন্ধ হয়ে থাকি। লেখাপড়া শেষ করে স্কুল হ'তে বের হয়েই

হাতে যে চাকরীটা পাই, অমনি তা নিয়ে ফেলি। এ উপায়ে যে কত লোকের ও কত পরিবারের ভবিষ্যতের উন্নতির আশা নষ্ট হয়ে গেছে, তার অন্ত নাই। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবার উপায় আছে কি না, অথবা নিজের যতটুকু শক্তি আছে, তার প্রয়োগ করেই নূতন এক পথ আবিষ্কার করতে পারা যায় কি না, এ সব না ভেবে কাজ করাতে, আমাদের দেশ যে একেবারে দুটা চারটা বাঁধা পথের গোলাম হয়ে পড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা সকলেই আজ কাল মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছেন। আমাদের নিজের বর্ত্তমান সুবিধা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ডেপুটীগিরি আর ওকালতীর জন্য লালায়িত হই। কিন্তু ইহাতে যে স্বপরিবারেরই ভবিষ্যৎ এবং পাড়ার ও দেশের অন্যান্য লোকদের আশা, একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায়, সে কথা কজন ভাবে ? দুমুটো ভাতের জন্য সমস্ত দেশবাসীকে যে পরের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হচ্ছে, তা কেবল এই অদূরদর্শীদের কাজের ফলে। সকল লোকই ত বড় বড় চাকরী বা ওকালতীর উপযুক্ত নয়। তাই যাতে সকলেরই বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের প্রকৃত উপকার হয়, তার চেষ্টা করা, যে দুচারজন উপযুক্ত আছেন, তাঁদের দরকার। কিন্তু তাঁরাই এত লোভান্ধ যে, কেবল চোখের সামনে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তাই পাবার জন্য মারামারি কাটাকাটি করেন। যে সকল কাজ সময়সাপেক্ষ, যাতে বেশী দিন লেগে থাক্‌তে হয়, তা আমরা করে উঠ্‌তে পারি না। কেবল temporary shifts, যাতে কিছু দিনের জন্য ঠেকা দিয়ে রাখা যায়, তারই চেষ্টা করে থাকি। ফললাভ কিছু কম হ'লেই হতাশ হ'য়ে পড়ি। এ রকম অধীর ব'লেই আমরা সর্ব্বদা কেবল পরের সাহায্য চাই। নিজের শক্তির অভাব বা নিজের কিছু নাই ব'লে যে আমাদের পরনির্ভরতা, তা নয়। আমাদের কি আছে না আছে, আমাদের সামর্থ্য কতটুকু, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমরা উপযুক্ত, তা না দেখেই আমরা পরের কাছে নিজকে বিকাইয়া দিই। এ একটা মস্ত নৈতিক দোষ, স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ! আমরা নিজকেই নিজে চিনি না। চিন্‌বার উপযুক্ত চেষ্টাও করি না। নিজের শক্তির পরিচয় যে না পেয়েছে, যে নিজের উপর বিশ্বাস করতে পারে না, সে ত কষ্ট বিপদ অতিরঞ্জিত করবেই। সে সামান্য বাধাবিপত্তিতেই চিত্তের ধীরতা হারায়। যার সাহস নাই, যে কাপুরুষ, সে রাস্তায় হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বাঘের ভয় ক'রে শুক্‌না ডেঙায়ই আছাড় খায়। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"He meets a lion in the way." নিজে মনে মনে অনেক অসুবিধা তৈয়ার ক'রে স্বকপোলকল্পিত এক কঠিন সমস্যায় পড়ে আছে। "আত্মানং বিদ্ধি" এ নিয়মটা কেবল আধ্যাত্মিক জগতের নয়, প্রতিদিনকার সামান্য কাজেও খাটে। যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা না ক'রে কেবল পরের কাঁধে চ'ড়ে বড় হ'তে চায়, সে কোন কাজের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভেবে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করতে পারে না। আমরাও তাই দূরভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি না ব'লে, আমাদের long viewএর অভাব ব'লে, মাঝে মাঝে এমন কাজ করে ফেলি, যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হয়, ও যার প্রতীকারের চেষ্টায় সমস্ত ভবিষ্যৎ ব্যয়িত করতে হয়। তাই

আমাদের জীবনে অসংখ্যinconsistencies, এক সময় ও এক বিষয়ের কাজ ও মতের সহিত অন্য সময় ও অন্য কাজ ও মতের এত পার্থক্য, দ্বন্দ্ব ও গোলমাল। দুই কাজই যে একই লোকের, তা বুঝে উঠা কঠিন। অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে কাজ করতে গেলে অত শীগ্‌গির, যখন তখন পরের সাহায্য নিতে বা এখনকার মত একটা খুঁটো দিয়ে খাড়া করে রাখতে ইচ্ছা হয় না!

আমাদের দেশের প্রায় লোকই ব'লে থাকেন যে বড় লোকদের, জমীদার ও রাজাদের সাহায্য না পেলে কোন কাজই আমাদের সফল হ'তে পারে না। ধনীদের কাছে বড় বড় Endowment পেলে কাজে হাত দেওয়া উচিত;—আর না পেলে যে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ছে, তা ঐ নিজেদের উপর অবিশ্বাসের ফল। "গরীবদের মাসিক চাঁদায় আর কি হ'তে পারে, চাঁদা অস্থায়ী—এর উপর নির্ভর করা যায় না" একথা প্রায় সকল জেলার সকলের মুখেই শুনা যায়। আর মনে এরূপ দুর্ব্বলতার ভাব আছে ব'লেই যেখানে সেখানে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। যত জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় হয়েছে, সকলগুলিই কল্‌কাতার Councilএর যে কলাখ টাকার জমীদারী আছে, কেবল তারই দিকে তাকিয়ে। প্রত্যেক জেলার জনসাধারণের শক্তি যথেষ্ট সঞ্চালন না করেই, ঐ গচ্ছিত ধনটার উপর দাবী করবার চেষ্টা সকলেরই। নিজেরা Self-supporting হব, নিজের জেলাকে স্বাধীন করব, পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌ব না, এটা অনেকেই ভাবেন না। আর কি উপায়ে পারা যায়, তার সমুচিত চেষ্টা করা হয় না। দুচার দশজন উকীল মোক্তারের কাছে টাকা তুলেই কল্‌কাতার অর্থের জন্য আবেদন।

এই প্রকারের আমাদের অনেকানেক দোষ। কোন একটা বিষয়কে ব্যাপক ভাবে বুঝতে আমরা পারি না। এক কাজের সঙ্গে অপর এককাজের কি সম্বন্ধ, একটা করতে গেলে অপরটার বাধা হবে, কি সাহায্য হবে, একাজটা না হ'লে ওকাজটা সফল হ'তে পারে কি না, কাজের এরূপ ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্য বুঝে কাজ করতে পারি না। তাই অনেকে বলেন, আগে জীবনের উন্নতি কর। গ্রামেই ভারতবাসীর প্রাণ। গ্রামগুলো সকল বিষয়ে অবনত হয়ে গেছে বলে দেশের এত দুর্দ্দশা। আগে গ্রামের উৎকর্ষ সাধন না করলে কিছুই হইবে না, আর সব বৃথা,—একথা ব'লে অনেককে ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম করে দেন। কেহ কেহ বলেন, "সমাজের সংস্কার আগে না করলে রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন ফলই আশা করা যায় না। সমাজ এখন উচ্ছৃঙ্খল, কেহ কাহাকে মান্‌তে চায় না। যার যা ইচ্ছা তাই করে। অসংখ্য ব্যভিচার ও অত্যাচার চল্‌ছে। ধর্ম্মে ও সমাজের কাজে কেবল অর্থের আড়ম্বর। স্বভাবের ও কুলের আভিজাত্য ছেড়ে মানুষ ধনের আভিজাত্যকেই সম্মান যতদিন করবে, ততদিন আমাদের কোন বিষয়েই উন্নতি হইবে না। আজকাল বিবাহ আর ধর্ম্মের বন্ধন নয়, একটা economic contract হয়ে পড়েছে, এতে একটা বেচা কেনার ভাব এসেছে। যে দেশের লোকেরা বিয়েতে টাকা নেওয়া বন্ধ করতে পারে না, তারা আবার political আর, economic স্বাধীনতা চায়!"

অনেকের মত, "পেটের ভাতের যোগাড়

না করে দিতে পারলে স্বদেশী টিক্‌ল না। দুর্ভিক্ষ নিবারণ আগে কর, তাহলে সবই সোজা হয়ে পড়বে। আগে অন্নের ব্যবস্থা কর, তার পর দেশহিতৈষিতা।" কেহ কেহ বলেন, "স্বদেশী আন্দোলনটা কেবল কাপড়-চোপড়, নুন চিনিতেই থাক্, দেশের industry support কর, তাহলেই ত সব হ'ল, অন্য কোন বিষয়ে চেষ্টা করা অন্যায়। Government যা করতে দেয়, তার বেশী করা ভাল নয়। Disloyalty কেন? সরকার বাহাদুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কেন? ওদের দেশ, ওরা যা ইচ্ছা করতে পারে। আমরা যখন গোলাম, তখন ওদের সকল অত্যাচারই সহ্য করতে হবে। যা কিছু করতে ইচ্ছা, তা Governmentএর সাহায্য নিয়ে ওদের সঙ্গে মিলে করাই ভাল। আর ওদের সাহায্য না নিলে আমরা কোন বিষয়েই সফলতা লাভ করতে পারব না। ওদের মত আমাদের টাকা কৈ? এই যে দেশে এত National School হয়েছে, এসব কি টিক্‌তে পারে? শীগ্‌গির শীগগির ওদের Universityর সঙ্গে affiliate করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর আমাদের দেশের লোককে কেহ বিশ্বাসই করে না। কতবার কত টাকা ফাঁকি দিয়ে খেয়েছে। তা ছাড়া আমাদের লোকেরা শেখাবেই বা কতটুকু? ওদের মত laboratory, Library আমাদের কোন দিনই হবে না। তাই সাধারণ শিক্ষা ওরাই দিক, আর আমরা যাতে দুপয়সা আসে, এরকমের Technical Education, কলকারখানায় ছুতারী মিস্ত্রিগিরির শিক্ষা দিই। বড়লোকের ছেলেরা বা যারা ভাল ছেলে, তারা সরকারী স্কুলেই পড়ুক। গরীবের ছেলেরা, আর যারা লেখা পড়ায় তত ভাল নয়, তাদেরই জন্য Governmentএর সাহায্য নিয়ে কয়েকটা Technical School খোলাই যুক্তিসঙ্গত।" যেন মানুষ কেবল এক গাঁটরি কাপড় বা এক থালা ভাত! "আর একটা কথা, এখন এত বড় একটা কাজ আরম্ভ করে অর্থাভাবে বা অন্য কিছুর অভাবে যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতে দেশের লোক আর কোনও দিন কোন কাজে অগ্রসর হবে না। চিরকালের মত তারা নিরাশ হয়ে থাকবে।"

"তাই কেবল দেশে যাতে কাপড় চোপড় প্রস্তুত হয়,—আর যাতে দুবেলা লোকে খেয়ে বাঁচতে পারে, এরূপ কৃষিশিল্প ইত্যাদি অন্ন সংস্থাপনের উপায় করে দিলেই যথেষ্ট দেশের উপকার করা হ'ল। এর বেশী আর কিছু সম্ভবপর নয়, চেষ্টা করার দরকারও নাই। সরকারী চাকরী করবনা, ওকালতী করবনা,—National Court of Arbitration করে দেশের যত মাম্‌লা মোকদ্দমা সব নিজেদের আদালতে ঢুকিয়ে নেব, দূরদেশে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত আমরা নিজেরাই করে নেব, এসব খ্যাপামি ছেড়ে দেওয়া উচিত। ওসকল কাজ Governmentএরই সাজে, ওদের লোকবল আছে, অর্থবল আছে। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে কাজ কি?"

"আমাদের হুজুগ দুদশ দিনের জন্য। কিছুকাল সময় নষ্ট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তার পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ও পরে পছ্‌তাতে হয়। কাহারই কোন কাজে লেগে থাক্‌বার ভাব নাই। উঠেপড়ে লেগে একাজটা করে ফেলবই, এরকম কেহই ভাবে না। কিছুদিন আগে এদেশে অসংখ্য Fund হয়েছিল, এখন একটারও অস্তিত্ব নাই,

সবকটা ফেল মেরেছে। আর যারা আমাদের নেতা, তারা নিজেদের স্বার্থ একটুও ছাড়্‌তে পারেন না। সকলেই নিজের স্বার্থ বজায় রেখে পরোপদেশে পাণ্ডিত্য ফলান। এত National School হয়েছে, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভ্যদের ছেলেরা পড়ে সব সরকারী স্কুল কলেজে! নিজেরা সরকারী Councilএ বা আদালতে বড় বড় পদের সুবিধা পেলে ছাড়ছেন না, অথচ দেশবাসীকে হুকুম করেছেন, "স্বার্থত্যাগ কর, ওসব বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষা হয় না, আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি—এখানে এস। একটু যদি কষ্ট স্বীকার করতে হয়, মনকে এই বলে শান্ত কোরো "The blood of the martyrs is the seed of the Church."

অনেকের মত এই যে —"দেশের দুর্ভিক্ষ চাষা বেটাদের জন্যই হয়। ওদেরকে পাটের চাষ বন্ধ করাতে পারলেই সকল দুঃখ চলে যায়।" কেহ কেহ বলেন,"অভাব না বাড়ালে দেশের সম্পদ্ শ্রী বৃদ্ধি হবে না। যত গরীব ভাবে থাকতে যাবে, ততই দেশের ক্ষতি। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ততই আমরা হার্‌ব। সেজন্য standard of living উঁচু করা দরকার। দেশের এখন povertyর vow নেওয়া দেশের অনিষ্টজনক।" আর স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে এরূপ শোনা যায় যে, "যে জিনিষ দেশে প্রস্তুত হয় না, সে জিনিষ যদি বিদেশ হতে নিতেই হয়, তবে England, France, Germany, Japan এর তফাৎ করি কেন? যেখানে সস্তা পাওয়া যাবে, সেখান হতে নেওয়া উচিত। দেশে বিদেশী দ্রব্যের বয়কট যখন একটু শিথিল কর্‌তে হলই, তখন জাপানী ও ইউরোপীয় প্রভেদ করে বিলাতকে জব্দ কর্‌বার ভাব কেন? জাপান কি আমাদের এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

অনেকের মত—"স্বদেশসেবা কেবল বড় লোকদেরই পোষায়, গরীবদের নয়। সাধারণ লোকেরা অর্থাভাবে জর্জ্জরিত; তারা দেশের কাজ কর্‌বে, এটা আশা করা উচিত নয়। আর যারা একবার বিয়ে করে ফেলেছে, তাদের স্বদেশের জন্য খাটা হইতেই পারে না। তাদের উপর কত দায়িত্ব। পরিবারপালন করে দেশের কাজ খুব কম লোকেই কর্‌তে পারে, অতএব বিয়ে কর্‌লে দেশহিতৈষী আর হওয়া যায় না। কেবল অবিবাহিত যারা,তারাই স্বার্থত্যাগ করতে উপযুক্ত, তারাই যা করে করুক। আর বিয়ে করলে পর, যদি বড় চাকরী হয় বা অন্য কোন উপায়ে ধনাগমের সুবিধা করা যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। তার পর দানধর্ম্ম করা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, আত্মীয়স্বজন পালন, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন, এসব ত কেহ বারণ কর্‌ছে না। এসব কর্‌লেই হল। এটা কি দেশের কাজ নয়? বরং সরকারী চাকরী বা ওকালতী ছেড়ে গরীব হয়ে থেকে দেশের যে উপকার করা যায়, তার চেয়ে বেশী উপকারই করা যেতে পারে।" আজকাল আবার জায়গায় জায়গায় শুনা যায়, "studentsদের আবার politics কি? ছেলেদের কর্ত্তব্য লেখাপড়া করা, বই মুখস্থ করা, পরীক্ষা দেওয়া, আর সার্টিফিকেট নেওয়া। পঠদ্দশায় বাজে কাজে মন লাগিয়ে ভবিষ্যতের উন্নতির আশা নষ্ট করতে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। ছেলেদের সভা সমিতিতে যেতে না দেওয়াই ভাল। তার পর ত দিন পড়েই রয়েছে। অত meeting কেন? অত হৈ

হৈ রৈ রৈ বা দরকার কি? চুপচাপ কাজ কর—organise কর, silent worker হও। সভাসমিতে কোন কাজই হয় না, কেবল গলাবাজী ও নাম করবার ইচ্ছা। সরকারী কলেজে M. A. পাশ করে নেও, তার পর না হয় জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ কোরো। এখন হ'তে পরের কথায় নাচ্‌লে পরকাল খাওয়া হয়।"

"বাঁধা পথ ছেড়ে নূতন কোন পথে যাওয়া বোকামী। Government যখন ইচ্ছা করবে, তখনই এক আইন জারী করে সব বন্ধ করে দিতে পারে। তখন "ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্ট" হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তাই সকল দিক বুঝে নিজের কাজ গুছিয়ে যা করবার হয়, করা উচিত। আর Governmentকে চটিয়ে কেবল নির্য্যাতনই ভোগ করিতে হয়। লাভের মধ্যে যে দু একটা Meeting করা যাচ্ছিল, তাও বন্ধ হয়ে যায়, —আর গুর্খার উপদ্রব।"

অনেকে আমাদের নেতাদের গাল দিয়ে বলেন যে "তাঁরা Governmentএর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পরে দেশভক্ত হয়ে পড়েছেন। যখন দেখ্‌লেন যে Magistrate হতে পার্‌লেন না, অথবা ব্যারিষ্টারী ওকালতী করে দুপয়সা জুটল না, তখন স্বদেশী প্রচার আরম্ভ করলেন। অভিমান করে বা পরের উপর চটে দেশসেবার মধ্যে যথেষ্ট কপটতা আছে।" কেহ কেহ পরামর্শ দিয়ে থাকেন "আগে নিজে বড়লোক হয়ে নেও, টাকা পয়সা রোজগার করে নামজাদা লোক হও, লোকে মানুক, influence হ'ক্, তার পরে দেশ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে যা বল্‌বে, অবনতমস্তকে তাই শুন্‌বে। Insignificant pauper হলে তার কথায় কেহ কাণ দেয় না।"

যারা কিছু অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তারা বুঝে যে, "কতকগুলি ইংরাজীজানা দেশের লোক নিজেদের স্বার্থলাভের জন্য সরকারের সঙ্গে একটা গোলযোগ বাধিয়ে দেশশুদ্ধ ডুবাবার মতলবে আছে। যারা চাকরী করে বা ওকালতী করে খায়, তারা তাদের সে পথে বাধা হয়েছে দেখে, "সরকারী স্কুলে পড়োনা, মোকদ্দমা ঘরে মিটিয়ে নেও"—ব'লে দেশের মস্ত উপকারী হয়ে পড়েছে!"

অনেকে আমাদের দেশের নানা রকমের ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও ভাষা দেখে, এদের ঐক্য কোন মতেই সাধিত হতে পারে না, বুঝে নিস্তেজ হয়ে বসে থাকেন, ও অন্য লোককেও বাধা দেন। এত দলাদলি, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, হিন্দুর মধ্যেই এত গোলমাল। মৈথিলীরা ভাবেন, বাঙ্গালীদের আর তাঁদের একই উদ্দেশ্য নয়। অতএব এদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করায় নিজেদের ক্ষতি। বিহারীরাও বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিলিতে চায় না। বলে—সকলের interests এক নয়। "এত গৃহবিবাদের মধ্যে আর কি আশা করা যায়?" তার উপর গবর্ণমেণ্টের বাধা ত সর্ব্বত্র সব সময়ে আছেই।

যাঁরা কিছু ধার্ম্মিক, তাঁরা বলেন—"পুরাণে আমাদের এ দুর্দশার কথা বলা আছে। আমাদের দেশের সমাজে, ধর্ম্মে, পারিবারিক জীবনে কলিযুগে যে এত অবনতি হবে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে। এ সব নিবারণ করা মানুষের সাধ্য নয়। পুরুষকারে কিছুই হবে না। ভগবানের ইচ্ছা হ'লে আপনা হতেই সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।"

এরূপ নানা রকমের নানা কথা আমাদের লোকেরা বলে থাকেন। কেহ নিজের স্বার্থ ছাড়তে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাই

অপরকে কোন এক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে বিদায় করেন। কেহ কেহ অন্য লোককে স্বদেশসেবা হতে বিরত করবার চেষ্টা করেন। অনেকে কেবল একদিকে বুঝে দুটা একটা আংশিক সত্য কথা বলেন বটে, কিন্তু একগুঁয়ে হয়ে অপরের অন্যবিধ কাজের বাধা জন্মাতে পশ্চাৎপদ হন না। অনেকে অশান্তি অরাজকতার ভয়েই অস্থির। কেহ কেহ "এদেশের কোন দিন কিছু ছিলনা, এদেশের গৌরব করবার কিছুই নাই, সবই পরের কাছে শিখতে হবে"—বুঝে, দেশের লোকের প্রত্যেক স্বাধীন কার্য্য ও চিন্তাকে morbid fanaticism মনে করেন।

আমাদের এত দুর্ব্বলতার, এত দোষের অনেক কারণ আছে। যারা কাজ কোন দিনই করেনি, তার একটা কাজ করতে কত দিন খাটতে হয়, কত পরিশ্রম করতে হয়, কতবার বিফলমনোরথ হ'তে হয়, সে বিষয় জানে না। সমগ্র দেশের উন্নতিকল্পে যে আন্দোলন বা যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, তাতে প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে মন প্রাণ সমর্পণ করা অসম্ভব। প্রথমাবস্থায় অনেক insincerity, half-heartedness থাকেই। দুজন চারজন করে ক্রমশঃ লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শেখে, একদিনে উতলা হলে চলে না।

আর আমরা যে এত অসম্ভব আশ্চর্য্য রকমের কথা বলি, তার কারণ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি কি কারণে এরূপ ধারণ করেছে, তা ভাল করে না বুঝা। দেড়শ দুশ বৎসরে আমাদের দেশের ধর্ম্মে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার আদিকারণ যে ইউরোপীয় সভ্যতা, তা আমরা তত ভাল রকম বুঝি না। যে কারণে আমরা স্বদেশের শিল্পকারুকার্য্য বর্জ্জন করে বিদেশের পণ্যে মনোনিবেশ করেছি, সেই কারণেই আমাদের সাহিত্যের প্রতি পর্য্যায়ে বিদেশী ভাব প্রবেশ করেছে, আমরা কেবল Lancashire এর তাঁতীদের দাস নই, Oxford ও Cambridge এর সাহিত্য-সেবী এবং লেখকেরাও লেখা পড়ার নিয়মকানুন, বিদ্যাদানের প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের প্রভু। সেই কারণেই আমাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা ও ভক্তি কমে গিয়ে একটু বিষয়ে আসক্তি ও scepticismএর ভাব ঢুকেছে। আবার সেই জন্যই বিলাসিতা, সুখপ্রিয়তা, ভোগাকাঙ্ক্ষা গ্রামের শান্তিকুটীর পরিত্যাগ করে, গার্হস্থ্যের সুন্দর নিয়মগুলি যে ক্রমশঃ শিথিল করে ফেল্‌ছি, তাও এই নূতন অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। ছেলে একটা পাশ বেশী করছে, আর অমনি বিয়ের বাজারে যে দর বাড়ল, তা যখন পাশের মর্য্যাদা ছিল না, তখন কখনই সম্ভবপর নয়। শিক্ষাদীক্ষা, কাজ কর্ম্ম, সকল বিষয়েই সেই এক ভাব। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের অন্তরতম স্থানকে অধিকার করতে চেষ্টা করেছে। আমরা সকল বিষয়েই ইউরোপকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এসেছি। তার ফলেই আমাদের এখনকার অবস্থা। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছে। তাতে আমাদের এক Renascenceএর সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে; কিন্তু তাতে প্রথম অবস্থায় ইহার বাহ্য চাকচিক্যে মজে থাকায় ইহার মূলমন্ত্র কোথায়, খুঁজে বের করতে পারা যায় নি। তাই আমাদের সঙ্গে এই সভ্যতার সংঘর্ষণে একটা বিপর্য্যয় ঘটেছে। আজকালকার অবস্থাটা ভালই হক্ আর মন্দই

হ'ক, একটা মস্ত পরিবর্ত্তন যে ঘটেছে, আর এ পরিবর্ত্তন সকল বিষয়কেই আক্রমণ করেছে, এটা বুঝে কাজে নামতে হবে। কিন্তু এই সর্ব্বতোমুখী বিপ্লবের কথা আমরা ভাল করে বুঝি না বলে, নানা রকমের inconsistent কথা বলে থাকি।

সকল দোষের প্রধান কারণ হচ্ছে অধীনতা। আমরা এত দিন যে ইউরোপকে ভাল করে বুঝিনি এবং ইউরোপের সকল জিনিষই অতি উপাদেয় বলে গ্রহণ করবার অভিপ্রায়ে নিজেদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, আদর্শ প্রথা, সবই পরিত্যাগ করে আমাদের মহা অতীতকে ভুলতে চেষ্টা করেছি, তার কারণ আমরা ইউরোপকে স্বাধীন ভাবে আমাদের নিজের মত ক'রে, বুঝবার অবসর পাইনি। অন্যে যে ভাবে বুঝাইয়াছে, সেই ভাবে বুঝেছি। ইহাই অধীনতার প্রধান কুফল। বিলাতী গবর্ণমেণ্ট আমাদের যদি ক্ষতি করে থাকে, তবে কেবল এই ভাবে যে, ইহা আমাদের প্রকৃতির উপযোগী করে ইউরোপকে গ্রহণ করতে দেয় নাই। পরাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যদি Science, Democracy, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির, আমরা যতটুকু হজম করতে পারি, ততটুকু নিতে পারিতাম,—পাশ্চাত্য সভ্যতার এক প্রাচ্য সংস্করণ করে, ইউরোপীয় সকল বস্তুকেই ভারতীয় জলে শোধন করে নিজেদের মত করে ব্যবহার করতে পারতাম, তা হলে পরাধীনতাকে তিরস্কার করা দরকার হত না। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতাকে Indianise করতে পারছি না বলে, আমাদের সমাজকে বিংশ শতাব্দীর জটিল অবস্থার উপযুক্ত করে দাঁড় করাতে পারা যাচ্ছে না বলেই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের এত দরকার হয়ে পড়েছে।

আর এই দাসত্বের জন্যেই অনেক নৈতিক অধোগতি হয়েছে, জীবনের উচ্চ আদর্শ হারাতে হয়েছে। মানুষের পক্ষে কত দূর কি কাজ করা সম্ভব, সে বিষয়ে আমরা অতি নীচ ভাবই ধারণ করতে শিখছি, স্বার্থত্যাগ করে যে মানুষ দেশের জন্য খাটতে পারে, নামের আশা না করেও জীবন উৎসর্গ করতে পারে, খবরের কাগজে নাম না দিয়েও যে লোকে প্রচুর অর্থ দান করতে পারে, এরূপ ভাববার শক্তিই ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কোন লোক যে হেসে জেল খাটতে যেতে পারে, তা আমাদের কাছে স্বপ্নের মত। আর martyrsদিগকে appreciate করতে আমরা অক্ষম। যাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে গিয়ে দেশবৈরীদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন, তাঁদের মনে হয় fool বা খ্যাপা, না হয় নামাকাঙ্ক্ষী। সামান্য একটু যদি sacrifice করি, অমনি তাকে বাড়িয়ে "অনেক দান করেছি, সবই কি একজন করবে?"—এরূপ ভেবে, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে বসে থাকি। মহানুভাবতা, ঔদার্য্য, পরাধীন জাতির নিকট অপরিচিত। কবি বলিয়াছেন—

> Nor happiness, nor majesty, nor fame,
> Nor peace, nor strength, nor skill in arms or arts,
> Shepherd those herds whom tyranny makes tame.

আর স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে সকল বিষয়েই দেশকে স্বাধীন করা, এটা না বুঝতে পেরে, কেহ বলেন, স্বদেশী শিক্ষার দরকার নাই, কেহ বলেন, Court of Justice boycott কোরোনা ইত্যাদি। আর দেশের ভবিষ্যৎ ধনসম্পদের বৃদ্ধির জন্যই যে,

অভাব কমান অত্যন্ত আবশ্যক, তা অনেকে বুঝতে পারেন না। অভাব কমালে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক যত কম হয়, ততই আত্মার উৎকর্ষ সাধনের পথ যে পরিষ্কার হয়, একথা অনেকে বুঝলেও বুঝতে পারেন; কিন্তু এই অভাব কমালেই যে দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়, এটাও বুঝ্‌তে হবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে মূলধনের দরকার। তাহা কেবল সঞ্চিত ধন হতেই সংগৃহীত হয়। সেজন্য প্রত্যেকেরই সঞ্চয়শীল হয়ে দেশের নানাবিধ কাজে সেই ধন খাটাতে পারলেই দেশের বৈষয়িক উন্নতির সহায়তা করা হবে। আর দেশকে যদি শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাধীন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ত আজকাল কিছু দিন অন্ততঃ যত কম জিনিষের দরকার হয়, ততই ভাল। স্বদেশী আন্দোলনে সফলতা লাভ করবার এক উপায় দেশের অভাব দেশেই মোচন করা, আর এক উপায় অভাব কিছু কমান। সকল অভাব মোচন করার উপযুক্ত capital চাই ব'লে, যাতে দেশের মূলধনের ভাণ্ডার বৃদ্ধি হয়, তার চেষ্টা করা দরকার। আর একয়দিনে স্বদেশী আন্দোলনের যে সফলতা হয়েছে, তার দ্বারা এই বুঝা যায়, আগে যে ধনের অপব্যয় হচ্ছিল বা কেবল সঞ্চিত হয়েছিল, তারই যথাযথ প্রয়োগ হওয়ায় দেশের amount of capital বর্দ্ধিত হয়েছে। তাই এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য সকল লোকেরই যতদূর সম্ভব, অতি সামান্য ধনও সঞ্চয় করে রাখা, এবং তার সুবিধা করে দেওয়া। দেশে Deposit Banks, Jointstock Companies ইত্যাদি নানা রকম organisationএর দরকার হয়ে পড়েছে, যাতে গ্রামের কৃষক বা সহরের মজুর এবং অল্প রোজগার যাদের, সকলেই যথা সম্ভব জমা রেখে নিশ্চিন্ত ভাবে কাল কাটাতে পারে। গরীবদের একত্রীকৃত টাকাতে দেশের অনেকবিধ বড় বড় কাজ চালান যায়। তাই লোকে যেন এটা না ভাবে যে, দারিদ্র্যকে শিরোধার্য্য করে লোকগুলো দেশটাকে ফকীর করে, অন্যদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একেবারে দুর্ব্বল করে ফেল্‌বে, অথবা ক্রমশঃ দেশটাকে Primitive Ageএর অসভ্য বর্ব্বরদের অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে।

আর Government যে কোন দিনই আমাদের শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদির স্বাধীনতা হতে দিতে পারে না, এটা ভাল করে বুঝা উচিত। তাদের ইচ্ছা, এদেশ চিরকালই তাদের কলকারখানার জন্য কৃষিজাত দ্রব্য যোগাক। এদেশকে তারা তাদের রাজনীতি শিক্ষা করবার প্রধান স্কুল মনে করে। ভারতীয় প্রজার আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে Governmentএর সম্পূর্ণ ক্ষতি। ওরা সকল বিষয়েই বাধা দিতে পারে এবং দিবে। বরং অত্যাচার ও নির্য্যাতন এখনও অতি অল্পই হয়েছে। ওদের হাতে যত অস্ত্র আছে, তার অতি সামান্যই এখন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেছে।

যাঁরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌তে চা'ন, তাঁদের ধর্ম্ম কেবল মুখেই, আর ধর্ম্মের সারমর্ম্ম তাঁর খুব কমই বুঝেন। যদি দেশের এ দুর্গতি কোন দিন যায়ই, তাত হঠাৎ একদিনে ভেল্কীবাজীতে হবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে, এই সকল লোকের ভিতর দিয়েই হবে। যে মহাপুরুষ এসে যুগান্তর সৃষ্টি করবেন, তিনি ত আর গাছ পাথরকে উপদেশ দেবেন না! তাই

নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌লে যুগান্তরের কাল ক্রমশই পেছিয়ে যাবে।

যে কারণেই হ'ক্‌, আমাদের এসব দোষ আছে, আমাদের দেশের লোকেরা সকল বিষয়েই নিরুৎসাহ। নিজেরা কতটুকু করতে পারি; তার বিষয় না ভেবেই পরের সাহায্য চেয়ে থাকি। নৈরাশ্যের কথা বলে অন্য লোককেও রণে ভঙ্গ দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। স্বদেশ-সেবকদের এ সব দেখে শুনে ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমাদের এ অবস্থা স্বাভাবিক। ভয়ের কথায়, কষ্টের কথায় পশ্চাৎপদ হ'লে চলবে না। বরং এত লোক এত রকমের কথা দেশ সম্বন্ধে ভাবে, এটাই সুলক্ষণ। এখন যে অন্ধকার, গোল-মাল দেখা যাচ্ছে, ক্রমশঃ তার প্রতীকারের পথ দেখা যাবে। এতে বুঝা যায়, দেশের লোক অনেক সময় ভীরু বা দুর্ব্বল বটে, কিন্তু একেবারে উদাসীন নয়। আমাদের কর্ম্মীরা এই অবস্থাতেই আশার স্থান খুঁজে নিয়ে স্বদেশের কাজে ব্রতী হবেন। আর নিজেরা কাজে প্রবৃত্ত হয়ে দুর্ব্বলচিত্তদের হৃদয়ে উৎ-সাহ প্রদান করবেন।

স্বদেশসেবকেরা আমাদের নেতাদের অসম্পূর্ণতা দেখে দুঃখিত হবেন না। তাঁদের যে অশেষ দোষ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ কাল যাঁরা নেতা ও নায়ক ব'লে পরিচিত বা নেতৃত্বপদের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা বাস্তবিকই কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের নেতা হবার উপযুক্ত নন। আজকালকার নেতৃ-ত্বের প্রধান qualification বক্তৃতা করবার ক্ষমতা। যাঁরা অন্যান্য বিষয়ে দেশের মধ্যে গণ্য মান্য, যাঁরা সরকার বাহাদুরের ঘরে বেশ সুপরিচিত, যাঁদের দুপয়সা আছে, তাঁদের যদি গলা থাকে, তাঁরা তাহার ব্যবহার করিয়া দেশহিতৈষিতা, patriotism একটা desirable thing মনে ক'রে, public life দ্বারা একটা variety করেন; প্রতি-দিনকার সাধারণ একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যের সৃজন করেন। এঁদের স্বদেশ ব্রতে বড় বেশী যায় আসে না। অর্থের অভাব নাই, অতএব এই "স্বদেশী" দিনে নাম করবার একটা সুবিধা ছাড়া যায় কেন? এরূপ মনের ভাব অধিকাংশ না হ'ক, অনেক নেতাদেরই, বল্লে অত্যুক্তি হয় না। নেতাদের মধ্যে দশবিশ জন খাঁটী থাকলেও থাকৃতে পারেন; কিন্তু প্রায়ই মেকী। এঁরা leader বটে, কিন্তু "lead the way" করেন খুব কম বিষয়েই। আর এর বেশী তাঁদের কাছে আশা করা যায় না। যারা চিরজীবন ঐশ্বর্য্যের সেবায় দিন কাটিয়েছে, অথবা ধনসম্পদের আশায় প্রাণে বেঁচে আছে, তারা যে কেবল "স্বদেশী" করলে বেশ ভাল দেখায় বুঝে patriot হবে, তার আশ্চর্য্য কি? স্বার্থত্যাগ কাকে বলে, বাল্যকাল অবধি ইহাদের অনেকেরই এশিক্ষা ভাগ্যে জুটে নাই। কেবল গাড়ী জুড়ী, গবর্ণমেন্টের সম্মান বড়লোকের লক্ষণ, ইহাই শিক্ষা হয়েছে। এসব লোকের pat-riotismএ যে কপটতা ও duplicity থাক্‌বে, তাত নিশ্চয়ই। এদের পক্ষে মন খুলে কথা বলা সম্ভবপর নয়। যখন যে সমাজে থাকে, তখন সেরূপ কথা ব'লে থাকে। সুখভোগের যত যা আছে, সমস্তই করবে, অথচ স্বার্থত্যাগের শিক্ষক হয়ে দেশের লোকের কাছে নাম নেওয়া চাই। প্রকৃত নেতা অন্য উপকরণে গঠিত হন। বাল্যকাল হ'তেই তাঁর হৃদয়ে নর-সমাজের উচ্চ আদর্শ আধিপত্য স্থাপন করে। তাঁর জীবন আরম্ভ হয়, স্বার্থ ত্যাগ ক'রে। স্বার্থ-

ত্যাগ করতে হলে চিত্তের যত উৎকর্ষের প্রয়োজন, তাঁর শিক্ষা, কাজকর্ম্ম, চাল চলন, সকল বিষয়েই তার উপাদান লক্ষিত হয়। একটী মহানুভব নরপতির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলিয়াছেন—

তং বেধা বিদধেনূনং মহাভূত সমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলাগুণাঃ॥

যিনি দেশের বা সমাজের যথার্থ নেতা, তিনি দেশের আপামর সকল শ্রেণীর সকল লোকের সঙ্গেই ভাবের আদানপ্রদানে বর্দ্ধিত হ'য়ে প্রত্যেকের হৃদয়ের রাজা হয়ে বসেন। তিনি কখনও আমাদের আজকালকার নেতা-দের মত মুখ বিকৃত করে সাধারণ লোকদের "mass" বলে উল্লেখ করতে পারেন না। নেতার প্রধান লক্ষণ, সমগ্র দেশবাসীর আশা ভরসা, সুখদুঃখ, সকল বিষয়েরই সহিত পরি-চিত থাকা। তিনিই সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজের প্রতিভূস্বরূপ। তাঁর হৃদয়ে সেই সমাজের প্রত্যেক নরনারীর আর্থিকনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান। তাঁকে দেখ্‌লেই সমস্ত সমাজের আদর্শ বুঝা যায়। এইরূপে সমগ্র দেশের representative হওয়া যায় কেবল তখনই, যখন ইতর নিকৃষ্ট, উচ্চনীচ, ছোট বড়, বিদ্বান মূর্খ ভেদ না করে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে, সুখদুঃখের সময়, উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে সহায় হয়ে, কোন্ সম্প্রদায়ের কি আশা ও আদর্শ, বুঝবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আজ কালকার নেতাদের মত সুরম্য অট্টালিকায় বাস ক'রে, দারিদ্র্যদুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের অবস্থা বুঝবার জন্য একবারও দুর্ভিক্ষের স্থানে উপস্থিত না হ'য়ে, কেবল সভা ক'রে, Famine Fund স্থাপন ক'রে ও মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে, "বিশেষ দরকার আছে" বলে সভা হ'তে চলে গেলে, দেশ-বাসীর হৃদয়-সিংহাসনে বসবার অধিকার জন্মায় না। এই মেকী নেতাদের স্বভাব, কাজকর্ম্ম দেখে দেশের লোকের আদর্শ, বা চিন্তা কিছুই বুঝা যায় না। এঁদের, সঙ্গে দেশের লোকের সংযোগ স্থান কোথায়? মনোভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ হয় কখন? এঁদের যে কি মতামত, ইহার কখন কি পরিবর্ত্তন হয়, তা দেশের লোকেরা বুঝতে পারে না, আর দেশের লোকেরাও যে দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাবতে পারে, এই সব নেতারা বিশ্বাসই করতে পারে না। Leader আর followersএ যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, যার জন্য কয়েক জন লোক এক জনকে মেনে চলতে পারে, সে ভাবটীই নাই। কিন্তু প্রকৃত নেতা তাঁর দলের মধ্যেই পরিপুষ্ট বলে তাঁর শিষ্যেরাও জানেন তাঁর কি শক্তি এবং তিনি নিজেও শিষ্যদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপর বিশ্বাস করে কি কাজ তাঁদের মনে লাগবে, বুঝতে পারেন। প্রত্যেকে প্রত্যে-ককে সম্মান করতে পারে। এই সম্বন্ধে অনেক অসাধ্য সাধন হয়, কারণ ইহাতে হৃদয়ের টান আছে, মনের মিল আছে। প্রকৃত নেতা যে কেবল দেশের সমস্ত শক্তির আধার, সকল প্রকারের চিন্তা ও কার্য্য যে এই কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়ে সমাজকলে-বরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করে দেয়, কেবল তাহাই নয়; দেশের নেতা সমাজের দীক্ষাগুরুস্থানীয়, তাঁহার শক্তি সক-লের একত্রীকৃত শক্তির চেয়ে বেশী। তিনি একদিকে যেমন সমস্ত দেশের প্রতিনিধি, অপর দিকে সমস্ত দেশের আদর্শ, সমস্ত সমা-জকে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত করবার অগ্রণী—

নূতন পথে চালিত করবার pioneer। তাঁকে দেখেই দেশের লোকের শিক্ষা হয়। তাঁর উপদেশই তাদের মন্ত্র। তিনিই তাদের মর্ত্ত্যস্থিত দেবতা। অনন্ত প্রেমময় ও জ্ঞানময় ভগবানের অংশ তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান বলে, তাঁর ঐশীশক্তি প্রভাবে তিনি সকলকে অভিভূত করেন। সকলকে অনন্তের দিকে টেনে নিতে তাঁর প্রয়াস। তাই নিজে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মূর্ত্তিমান ত্যাগ ধর্ম্মরূপে সংসারে বিরাজ করেন ও তাঁহার জ্যোতিতে সকলকে আকৃষ্ট ক'রে ত্যাগী, পরোপকারী ও প্রেমিক ক'রে দিয়ে তাদের নরজন্ম সার্থক করেন। তাই তাঁর এত শিষ্য, এত ভক্ত। এরূপ পরদুঃখে দুঃখী ও পরহিতে রত নেতা অতি বিরল,—সকল সময়ে সকল সমাজে আবির্ভূত হন না। তবে সময়ের উপযুক্ত ছোট খাট নেতা দুচার জন সব সময়েই থাকেন। আমাদেরও এখন যে সেরূপ মহাপ্রাণ নেতা নাই, তার জন্য খেদ করলে আর কাজ এগুবে না। আমরা যেমন শিষ্য, গুরুও আমাদের তেমনি। আমরা কি সকলেই আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পেরেছি? আমাদের এখনও সে উৎকট বৈরাগ্যের ভাব আসেনি। তাই আমাদের মেকী নেতারাও ওসব কথা মুখে আনেন না, অথবা স্বার্থত্যাগের কথা যখন বলেন, তাঁদের মুখে কিরূপ বিকৃত শুনায় যে মনে হয়, তাঁরা ওটা একটা কথার কথা বলছেন। আমরা যদি দেশের ও ধর্ম্মের জন্য বাস্তবিকই সাময়িক ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি বা প্রস্তুত হব, এইরূপ ইচ্ছায় চরিত্র গঠন করতে আরম্ভ করি, তবে কে জানে, আমাদের এ সামান্য জেলায়ই হয়ত উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হতে পারে! আমাদের নেতা সরকার বাহাদুরের পদবীপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন না, এটা ঠিক। তাঁর চোখে সরকারের সম্মান দেশের কাজের পক্ষে অনিষ্টজনক। তিনি ইহাকে লোভনীয় বস্তু মনে না করে একটা বর্জ্জনীয় disqualificationই মনে করবেন। তিনি অতি নগণ্য স্থানের অতি সামান্য কুটীরেই হয়ত প্রতিপালিত। যে সম্প্রদায়ে বা যে সমাজেই থাকুন, ত্যাগের চরমসীমায় তিনি অবস্থিত। যদি ধনীর গৃহেই পালিত হন, তাঁর কাজ আরম্ভ হবে, ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব রাজভাবে নয়, ফকীর ভাবে। চৈতন্যের মাহাত্ম্য সাংসারিক ভাবে নয়, সন্ন্যাসাশ্রমে।

আমাদের স্বদেশসেবকেরা বর্ত্তমান নেতাদের দোষ দেখে ভগ্নোৎসাহ না হয়ে, দেশে প্রকৃত নেতার অভাব মনে করে দুঃখিত হৃদয়ে যেন দেশের সেবা হতে বিরত না হন, বরং প্রকৃত নায়ককে যথার্থরূপে হৃদয়ের সহিত সম্মান করবার উপযুক্ত হতে চেষ্টা করুন। তাই নিজেরা এখন হইতে স্বার্থত্যাগী হতে শিখুন। কারণ স্বার্থত্যাগই প্রকৃত নেতার অর্চ্চনা। তিনি এসে যখন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন কাজের জন্য আহ্বান করবেন, তখন যেন পশ্চাৎপদ হতে না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে এটাওত জেনে রাখা উচিত যে, দেশের অধিকাংশ লোকই বিষয়ে নির্লিপ্ত। ধন জন, বাড়ীঘর ইত্যাদি পার্থিব জিনিষে প্রায় লোকই মজে আছে। ভাই বন্ধু, দারাসুত, টাকা পয়সা, দালান কোটা যে "তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম" অস্থায়ী, একথা কেহই ভাবেন না। এই পৃথিবীতে permanent settlement করবার জন্যই যেন

ভগবান্ মানুষকে এখানে পাঠিয়েছেন! দুকুড়ি দশ বৎসর পরেই যে নিজে ejected হয়ে আর এক প্রজার জন্য সব পরিষ্কার করে দিতে হবে, একথা মনেই থাকে না। তাই পার্থিব জিনিষ নিয়ে এত অহঙ্কার, এত দলাদলি। ধর্ম্মের কথা, ত্যাগের উপদেশ, খুব কম লোকেরই কাণে যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।"

এই দুদিনকার সংসারে ভোগাসক্ত হয়োনা—প্রহ্লাদের এ বচন অতি অল্পসংখ্যক দৈত্যের কাণে প্রবেশ করিত। আমাদেরও—

"যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তদা লব্ধং ভবেন্নকিম্॥"

একথা কাণে প্রবেশ করলেও মরমে পশে না। এখানেই চিরকাল থাকৃতে হবে, এই ভেবে আমাদের আড্ডাকে সকল প্রকার ভোগবিলাসের দ্রব্যে ভরে রাখতে অহরহ খাটছি। রামপ্রসাদের মত দুটী একটী সাধক ভক্ত ভিন্ন ইহাকে "ভূতের বেগার খাটা" বই আর কিছু কেউ বলেন না। এসব দেখে শুনে আমাদের মনে যেন কখনো নিরুৎসাহের ভাব না আসে। স্বার্থ ছাড়বার জন্য সকলে বসে নাই। তা আশা করে যেন কোন লোকের কাছে আমরা উপস্থিত না হই।

যখন আমরা স্বদেশবাসীদের কাছে আবেদন করব বা মনের ইচ্ছা প্রকাশ করব, তখন কেবল উকীল মোক্তারদেরকেই যেন দেশের লোক মনে না করি। বাস্তবিক দেশের লোক কারা? কাদের উপর দেশের ভরসা? কারা আমাদের শক্তির আধার? এ প্রশ্নের উত্তর এতদিন আমাদের দেশে ভাল করে দেওয়া হয়নি। এতদিন পর্য্যন্ত মনে হ'ত যে, কয়েকটা লোক ইংরাজী শিখে Governmentএর কাছারীতে চাকৃরী বা ওকালতী করে, তারাই প্রকৃত শিক্ষিত সভ্য, দেশের লোক তারাই। তারা যা করে, তাই ঠিক। আর যে লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশের রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা করে, তারা proletariat class। তাদের যা করাবে, তাই করবে। দেশের উন্নতি অবনতিতে তাদের কিছু যায় আসে না। ইংরাজীওয়ালারাই natural leaders of the society,—ওরা কেবল হুকুম মেনে চল্‌বে। এতদিন যে কাজ কর্ম্ম হ'ত, যত আন্দোলন হ'ত, সকল গুলিই ঐ ইংরাজীশিক্ষিত দলে আবদ্ধ থাকৃত। দুই দলে কোন সহানুভূতিই ছিল না। কিন্তু আজ কাল এ দুবছর স্বদেশী আন্দোলনের পর বোধ হয় আর কেহ ওরূপ mass classকে তফাৎ করতে ইচ্ছুক নন। এখন হয়ত সকলেই বল্‌বেন যে, যে কজন লোক ইংরাজী ব'লে সভা সমিতি করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, বা চাকরী করে খায়, তারা দেশের প্রকৃত শক্তি নয়। দেশের আসল শক্তির স্থান—অপর সকল অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত বা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকেরা। দেশবাসী বল্লে আমি এই সব লোকই বুঝি, যাদের হাটে বাজারে দেখি, রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, যারা দোকান করে, ব্যবসা করে, ঘরে বসে থাকে, তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের লোক। ইহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। ইহাদের সামর্থ্যেই দেশ বলীয়ান। দেশকে শেখাতে হবে, লোকশিক্ষা দিতে হবে, জাতীয়তা বর্দ্ধন করতে হবে, ঐক্য সাধন করতে হবে। দেশের লোকের সাহায্য নেওয়া হ'ক, যখন

এরকম কথা বলি, তখন আমি বুঝি, যে মুদী পসারী, তেলী গোয়ালা, তাঁতী দরজী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি যত রকমের লোক আছে, কেবল উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী চাকর বা লেখক নয়—সকলকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করে একই কাজে ব্রতী করতে হবে। বড় একটা কাজ করতে হ'লে যে ধনের প্রয়োজন, তা কেবল দুজন একজন বড় লোকের দানে সংগৃহীত হ'লে, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কাজ হল না। সমস্ত জাতির পক্ষে মঙ্গলকর কাজ কেবল সেটাই, যাতে ইতর দরিদ্র, ধনী জমিদার সকলে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার সাহায্য করবার জন্য যত্ন করে। আমাদের গলায় গোলামীর যে ছিকল লাগান আছে, তার দর্প না করে, বরং তা খুলে ফেলে দিয়ে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলে মিশে, কি উপায়ে কাজ করতে পারি, এখন হ'তে কেবল সেই চেষ্টা করতে হবে। তবেই সমস্ত দেশের ঐক্যসাধন হবে। তা না হইলে যত দিন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, aristocratic aloofness এর ভাব থাকবে, ততদিন কোন কাজকেই national পদবাচ্য করতে পারা যায় না। প্রকৃত ভাবে জাতির কাজ করতে হলে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উকীল দোকানদারকে একই কর্ম্মক্ষেত্র দাঁড়াইয়া নিজ নিজ অধিকারানুসারে কর্ত্তব্য পালন করতে হবে, এ কথাটা আমাদের স্বদেশ-সেবকেরা মনে রাখ্‌বেন। সকল কাজেই জনসাধারণের মত গ্রহণ করে তাদের কে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন। ইংরাজীজানা লোক দেশে কজন? কেবল তাদের দ্বারাই কি দেশের উদ্ধার হবে? কেহ কেহ এরকমও বলে থাকেন, এঁরাই ত চরিত্র সম্বন্ধে অধিক অবনত, এঁদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব যথেষ্ট, কষ্টের মধ্যে মনস্থির রাখ্‌তে একেবারে অসমর্থ, আর বর্ত্তমান স্বার্থের লোভে সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ আশা নির্ম্মূল করতে কুণ্ঠিত নন। এঁদের মধ্যেই অনেক লোক স্বদেশদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়াবেন, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জনসাধারণের চরিত্রে অনেক গুণ আছে। তাদের শরীর বেশ শক্ত, তাদের পরনির্ভরতার ভাব নাই, তাদের মধ্যেই স্বদেশের সনাতন আদর্শ সম্পূর্ণ বিদ্যমান, এরাই দেশের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন।

হিন্দুমুসলমানের বিরোধের ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব নাই। আর প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম নিয়ে কোন দুসমাজে গোলযোগ বাধ্‌তে পারেই না। ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম। যে সমাজেই ত্যাগী ব্যক্তি দেখিনা কেন, তাঁকে হিন্দু বল্‌ব, কি মুসলমান বল্‌ব, কি খ্রীষ্টান বল্‌ব, ঠিক বুঝতে পারি না;—তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারা যায় যে, তিনি ধার্ম্মিক। তাঁর হৃদয়ে মলিনতা দূরীভূত হয়ে মহাসত্যের দিব্য আলোক বিরাজমান। তবে দেশকাল ভেদে আচার ব্যবহারের পার্থক্য জন্মে বটে। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক এই বাহ্য পার্থক্যের ভিতরেই যথার্থ হৃদয়ের ভাব বুঝে নিয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে থাক্‌তে পারেন। ত্যাগে, অনাসক্তিতে, বৈরাগ্যে কখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে না। ভোগে, আসক্তিতেই যত কলহ। বাহ্য বস্তুর প্রতি টান হ'লেই কতটুকু আমার, কতটুকু তোমার, এপ্রশ্ন আসে, self-interest বলে এক জিনিষ উপস্থিত হয়। তাহারই অর্জ্জন ও রক্ষণে যত জ্বালা, যত কষ্ট, সত বিরোধ। তাই যখন হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মিল নাই,

একথা শুনি, তখন যেন না বুঝি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদের মারামারি কাটাকাটী, সেই ধর্ম্মভেদের মীমাংসা না হ'য়ে গেলে দুয়ে মিলেমিশে কোন কাজই করতে পারবে না। দুদিনের জন্য হয়ত মিল্‌লেও মিলতে পারে, কিন্তু বারিরের শত্রু ঘর হতে গেলেই আবার কলহাগ্নি জ্বলে উঠবে। যদি বিরোধের কথাতেই ভয় পেতে হয়, তবে হিন্দুদের মধ্যেই ত কত বিরোধ দেখা যায়? বাড়ী ঘর, টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভায়ে ভায়ে কত লাঠালাঠি। সেরূপ হিন্দু মুসলমানেও লোভের বস্তু, ভোগের বিষয় নিয়েই দলাদলি। আর বাজে লোকেরা সেই সব পার্থিব সুবিধার দ্বারাই ইহাদের মনোমালিন্য ঘটাতে চেষ্টা করে থাকে। Govt. এর officeএ চাকরী, Govt. এর সম্মান, এক কথায় Govt. আমাদিগকে যা যা দিতে পারে, সেই দানের অংশ নিয়েই প্রতিযোগিতা। এক টুকরা রুটি ফেলে দিলে যেমন কুকুরগুলো তার লাভের জন্য নিজেদের ভিতরে কামড়াকামড়ি করে, সেরকম দুএকটা চাকরীর লোভে হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, মুসলমানে মুসলমানে ঈর্ষাদ্বেষ কলহের প্রবৃত্তি জন্মে ও বেড়ে যায়। আজ যদি এরূপ শুনা যায় যে ২৫০।৩০০৲ টাকার একটা চাকরী, সামান্য শিক্ষিত যে কোন লোক আবেদন করবে, তাকেই দেওয়া হবে, তবে একথা নিশ্চয় বলতে পারি, এখনও আমরা এত উন্নত হইনি যে, তাকে উপেক্ষা ক'রে, মাথা ঠিক রেখে ধীর ভাবে নিজের কর্ম্মে মনোনিবেশ করতে পারি। আমার বিশ্বাস, এখানকার প্রত্যেকেই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, বিহারী, মৈথিলী, মাড়োয়ারী, নিজের বা নিজের ছেলের জন্য এখনই দরখাস্ত করবেন ও যাতে নিজেদেরই ভাগ্যে জুটে, সে ইচ্ছায় পীরের সিন্নি অথবা ঠাকুরের লুট মানবেন। তাই ধর্ম্মের বৈষম্যে ভয় করার কোনই কারণ নাই। দুদলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত—কেহই স্বার্থত্যাগের জন্য নয়। তবে হিন্দু আজকাল বুঝেছে যে, Govt. এর কাছে স্বার্থসিদ্ধির আশা তত বেশী নাই। বিদেশী শিক্ষা সভ্যতা চালচলন সমস্ত হিন্দু ভাল ক'রে দেখে শুনে বুঝেছে যে, ওর মধ্যে স্থায়িত্বের কিছুই নাই। সবই ফাঁপা—"দিল্লীর লাড্ডু"। হিন্দুর এভাবে পৌঁছাতে অনেক দিন লেগেছে, অনেক ডেপুটীগিরি, কেরাণীগিরি, জজিয়তী, ওকালতীর পর, তবে এখন কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে যে, স্বাধীনতা হীন হ'লে অন্নের গ্রাস তত সুস্বাদু হয় না। আর পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকৃলে মাঝে মাঝে চল্‌লেও অনেক সময়ে ভুগ্‌তে হয়। সে জন্য যাতে নিজে করে খেতে পারে, তার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেছে। মুসলমানদেরও তাই করতে হবে। ওদেরকেও সেই রসের আস্বাদ দিতে হবে। ভোগবাসনা তৃপ্ত না হ'লে ভোগের মর্ম্ম বুঝবে না ও ত্যাগের স্পৃহা জন্মিবে না। এখনো বিদেশী-শিক্ষা মুসলমান সমাজে বেশী প্রবিষ্ট হয় নাই। বিদেশী সভ্যতায় কতটুকু সত্য আছে, তা এখনো ওরা বুঝে নাই। মুসলমানেরা সরকারবাহাদুরের সুখ্যাতি, মানসম্ভ্রম এখনও প্রচুর পরিমাণে পান নাই। Government হ'তে এত তফাৎ বলে এর কাছে আস্‌তে এঁরা এত ব্যস্ত। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। হিন্দুর যেমন একদিনেই ভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই, অনেকবার অনেক রকমে গোলামীর কুফল সহ্য করিয়াও তাহাকেই শ্রেয় জ্ঞান করত, অবশেষে অনেক

ধাক্কা খাওয়ার পর উহার প্রতি বীতস্পৃহা হচ্ছে, মুসলমানদেরও সেরূপ ভোগের ইন্দ্রিয়গুলি চরিতার্থ না হ'লে নিবৃত্তির দিকে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। তাই ওরা যে এখনও এত আগ্রহের সহিত সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে, ওদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য সুবন্দোবস্ত হচ্ছে, ঘরে ঘরে সরকারের চাকরী বিতরণের চেষ্টা হচ্ছে, সমস্তই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। ভোগপরায়ণ, বিষয়ে নির্লিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তির পথে আন্‌তে হলে, তাহার সদ্‌গুরু যেমন তাহার ঐ ভোগের অবস্থাই উৎসাহিত ক'রে, তার স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ না ক'রে—বরং ভোগাকাঙ্ক্ষাতে তৃপ্ত করবার জন্য, ইহাকে "work out" করাবার জন্য ইহার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়া, এই অবস্থাতেই যতটুকু সম্ভব,best of a bad case ক'রে, ত্যাগের উপদেশ, নিবৃত্তির পথে চল্‌বার উপদেশ দিয়ে থাকেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেন, মুসলমানদের সম্বন্ধেও হিন্দুদের সেইরূপ করতে হ'বে। ওদের Govt.এর সঙ্গে ঘনিষ্টতার ভাবে দুঃখিত না হ'য়ে, বরং তারই মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ, যতদূর সম্ভব, দেখাইয়া, তাদের মুক্তির সহায় হওয়া উচিত। পরে যখন ওরা ক্রমশ দেখ্‌বে যে, Govt. হিন্দুদের শত্রু আর মুসলমানের মিত্র, এ বিশ্বাস ভুল; যখন দেখ্‌বে Govt. এর কাছে মুসলমান সমাজ এমন বেশী আদরের বস্তু নয়, নিজস্বার্থের জন্যই কিছুদিন ইহার সঙ্গে কুটুম্বিতার ভান করেছে; যখন উচ্চশিক্ষার আলোকে দেখ্‌তে পাবে যে, যে মুসলমান সমাজ একদিন এশিয়ার একপ্রান্ত হ'তে ইউরোপের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে জ্ঞানালোক দান করেছিল,সেই সমাজের প্রতি ইউরোপ কৃতজ্ঞ না হ'য়ে বরং তাদের কীর্ত্তি হ্রাস ও লোপ করতে বদ্ধপরিকর; যখন ইতিহাস ও রাজনীতির উপদেশ ওদের চক্ষু উন্মীলন করাইয়া বুঝাইয়া দিবে যে,ইংরাজেরা মুসলমান সমাজ বা সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক নয়,—বরং তাদের মহিমার ইতিহাস বিকৃত করতেই অভিলাষী; আর যখন বুঝবে যে, মুসলমানজের গৌরব ও মাথার মণি Turkeyর Sultanকে ইউরোপ অতি ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে, Liberal ও Enlightened ইউরোপের মধ্যে Turkey এক চন্দ্রকলঙ্ক, ইউরোপের মানচিত্রে Turkeyর ছবি এক কালিমারেখা;—তখন আর বঙ্গজননীর যমজ সন্তান হিন্দু মুসলমান দুদিনকার স্বার্থ নিয়ে মজে না থেকে, পরস্পর পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আনয়নের সহায়তা করবে। "তখন খেলাধূলা সকল ফেলে মায়ের কোলে ছুটে এসে"—নিজেদের প্রকৃতিগত সভ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশ করাবার জন্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে। এবিপুল বিশ্বে মুসলমান সাহিত্য, কারুকার্য্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতা কোন্ mission নিয়ে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবীতে ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কি না, তাহা বুঝবার জন্য ব্যাকুল হবে। মুসলমানসমাজ নরসমাজের কোন্ কাজ করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছে, এই বিংশ শতাব্দীতেই স্বাভাবিক Division of Labourএর নিয়মানুসারে কর্ম্মের অধিকারের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের কোন্ অভাব মোচন করতে হবে, কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে কি না, তা বুঝতে যত্নবান্ হবেন।

তাই এখন আমাদের আশার কারণই

হয়েছে। ওদের চাকরীর প্রবৃত্তিতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। এজন্য তিরস্কার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ অসময়ে ওদের বন্ধু হওয়াই দরকার। দোষ করলেও তাই সহ্য করতে হবে। স্বভাব যদি বাস্তবিকই নিম্নগামী হয়, তবে তার গতিরোধ করতে যাওয়া বিফলপ্রয়াস। ইহাতে কুফলেরই সম্ভাবনা। আর এই (degradation) অধোগতির সময়ই অধিক যত্ন, অধিক আদর দরকার। তাই মুসলমানেরা "lost to the country" ওদের "case hopeless" বলে ছেড়ে না দিয়ে নিজেরা স্থির হ'য়ে ওদেরকে ধ'রে ধ'রে রাস্তা দেখাইয়া চল্‌তে হবে। ইহাইত heroism, এখানেই বীরত্ব। আর এখনকার দিনে বেশী দিন এ কষ্ট সহ্য করতে হবেনা। মুসলমানেরা শীগ্‌গির দেখতে পাবে, স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদেরই ষোলআনা লাভ। তাঁতীজোলা ইত্যাদি মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। আর স্বাধীন ব্যবসা বা জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ে যে কত সুখ পাওয়া যায়, তাও দুএকটা দৃষ্টান্ত দেখতে পেলেই চোখ ফুট্‌বে। হিন্দুদের দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা তাদের কাজকর্ম্ম দেখে বুঝবে, স্বাধীনতায়, স্বদেশী কাপড় চোপড় ব্যবহারে, স্বদেশী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে কোন বিষয়েই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। দেশে এত রকমের independent institutions, স্বাধীনতার organisation এবং স্বাধীনতার অসংখ্য কেন্দ্র ও ন দেখলে, স্বাধীনতার লিপ্সা ওদের হ'তে বেশী দেরী হবেনা। হিন্দুদের এভাবে আস্‌তে যতদিন লেগেছে, ওদের ততদিন লাগবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় ৩০ বৎসরের কাজ ১০ বৎসরে হয়ে যাবে।

হিন্দুদের প্রধান কর্ত্তব্য, ওদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা, ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। সেজন্য পরস্পর পরস্পরকে যাতে ভাল রকম চেনা যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। অচেনা লোকদের মধ্যে অনেক বৈষম্যই উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমানকে যে একেবারে চেনেই না, তা নয়। প্রত্যেক সমাজই প্রত্যেকের অন্তরের কথা জানে। অনেক দিন হতে একত্র বাস করায় দুএর মধ্যে হৃদয়ের যোগ হয়ে গেছে। সে সদ্ভাব যাবার নয়। তবে এই দুশ বছরে বিদেশীর প্ররোচনায় ও শিক্ষার ফলে ইংরাজীআলোকপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য ঘটেছে। তা নিবারণ করবার জন্য, হিন্দুর এখন মুসলমান সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। মুসলমানকেও হিন্দুর আচার ব্যবহার সাহিত্য শাস্ত্র পড়ান উচিত। এ উপায়ে দু সমাজের স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত করা হবে।

আর, একতার শিক্ষা মুসলমানকে দিতে হবেনা। জাতীয়তা সম্বন্ধে, nationalityর জটিল সমস্যা সরল করতে মুসলমানদের মত নিপুণ জাতি খুব কমই আছে। ইহাঁদের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ কেবল ধর্ম্মবীর নন, কর্ম্মেই তাঁহার অধিকার বেশী। জগতে অনেক nation-makerএর জন্ম হয়েছে, অনেকে স্বদেশের গৃহবিবাদ conflict of interests ঘুচাইয়া দিয়া প্রত্যেক লোকের একমন একপ্রাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু আরব্য মরুভূমির উষ্ট্রপালকের মত জাতীয়তার স্রষ্টা অতি অল্পই আবির্ভূত হয়েছেন। ইঁহার মন্ত্রবলে দুই মহাদেশের অসংখ্য লোক ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভুলে মুসলমান সাম্রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বিস্তার জন্য পৃথিবীতে যে

অদ্ভুত কাৰ দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক জগতে সেরূপ অলৌকিক ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। যীশুখ্রীষ্টও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগৎকে বিমোহিত করেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মতেজে মনুষ্যসমাজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মহিমার ভাব উদিত হয়েছিল। জগতে ওরূপ Sublimityর দৃষ্টান্ত আর নাই। বুদ্ধদেব সংযম ও কঠোরতার প্রতিমূর্ত্তি। নিয়মপালনে যে চরিত্রগঠন হয়, সংসারে অনেক অভিলাষ দমন করতে হয়, তাঁর জীবনের এই উপদেশ। চৈতন্য ভক্তি ও প্রেমের রসে সকলকে মাতাইয়াছিলেন। প্রেমবারি সিঞ্চন করে তিনি সকলের হৃদয়-ক্ষেত্র ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য উর্ব্বরা করে দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা সব ভক্ত, প্রেমিক বৈরাগী। কিন্তু মহম্মদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কর্ম্মী, organiser, nation-maker। তাই মহম্মদের উপাসকদেরকে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল তাঁদের স্বাভাবিক ভাব, যা বিদেশীয় প্রভাবে কিছু বিকৃত ও মলিন হয়ে আছে, তাদের প্রকৃতির নৈসর্গিক অবস্থা, যে উপায়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির জন্মিতে পারে, সে উপায় অবলম্বন করতে হবে। একবার প্রকৃতিস্থ হলে, ওঁদের কি কাজ ওঁরা নিজেরাই বুঝে, অসংখ্য বাধাবিপত্তির ভিতরেই স্বদেশ-পোতকে চালাইতে সক্ষম হবেন।

কাজের কথা এই যে, আমাদের দেশে এত মতভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ দেখে বসে থাকবার প্রয়োজন নাই। একতার বাধা বিঘ্ন অনেক বটে, কিন্তু তা নিবারণ করবার উপায়ও অনেক। দুশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা অতি কঠিন ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের বিজ্ঞানের বলে এসব অতি তুচ্ছ বিঘ্ন। আগে যা অসম্ভব ছিল, এখন তা সুসাধ্য। আমরা তবুও নূতন অবস্থায় পুরাতন নিয়ম ও বুলি চালাতে চেষ্টা করিয়া এতদিন এদেশে "India for the Indians" এ রব উত্থিত করতে পারে নি, চট্টগ্রাম ও করাচির লোক একই ভাবে একই বিষয় ভাববার ও বুঝবার সুযোগ পায়নি, একদল অপর দলের সহিত সুপরিচিত হতে পারত না ব'লে এখনও মনে করি যে "united action" এর জন্য ভাবের ও কর্ম্মের যে আদান প্রদান দরকার, তা এদেশে কথনই সম্ভবপর নয়। অপর দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ যে উপায়ে সমাহিত হয়ে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, ইউরোপে ও আমেরিকায় অসংখ্য মতভেদ থাকা সত্বেও অতি দূর দেশের লোকেরা যে উপায়ে, যে কৌশলে একই দেশের, একই সমাজের লোক বলে পরিচিত হ'তে পারে, আমাদের এদেশেও তাই সম্ভব। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞান কখনও কোন লোকের বা সমাজের এক-চেটিয়া থাকতে পারেনা। Science কোন দিনই private property হ'তে পারে না। জ্ঞানের গতি অতি প্রবল, উহাকে কোন মতেই nationalise করা যায় না, উহা চল্‌বেই, সর্ব্বত্র প্রসারিত হবেই, তবে দুদিন আগে আর পরে, এই যা। আমাদের দেশে এখন এই বিজ্ঞানালোচনার দরকার। জড়-জগতের ও চিজ্জগতের সমস্ত নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের দেশের লোকের জানা প্রয়োজনীয়। তা হলে বাহ্য জগতের ও মনোজগতের যে যে বাধা বিঘ্ন আছে, তার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবিত হবে। এই বিজ্ঞানালোচনাই স্বরাজ আনিয়া দিবে এবং ইহাকে স্থায়ী করবার ব্যবস্থা করবে। Democracy, অর্থাৎ যে প্রণালীতে

প্রত্যেক প্রজার অধিকার স্থাপিত হয়, যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, হিন্দুমুসলমান সকলের সম্পূর্ণ বিকাশের সুবিধা করে দেয়, তা কেবল রেলগাড়ী, খবরের কাগজ দ্বারা সুসাধিত হতে পারে। দেশ ও কালরূপী যে দু মহা-রাক্ষস সর্ব্বদা মানুষের কাজকে বাধা দেয়, তারা কেবল বিজ্ঞানের দ্বারাই খর্ব্ব হতে পারে। বিজ্ঞান যেমন representative Govt. স্বায়ত্ত-শাসনেরই পৃষ্ঠপোষক; প্রজা-তন্ত্র, democracyও তেমন জ্ঞানী বিদ্বৎ সমাজের উপযুক্ত; বিদ্যা ও বুদ্ধি বলেই গঠিত, অত্যুচ্চ বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সৃষ্ট। প্রত্যেক নরনারীর যে কেবল কর্ত্তব্যই আছে, খাজনা দিতে বাধ্য, হুকুম মেনে চল্‌বে. আইনানুসারে কাজ করবে, তা নয়; তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, সকল রাষ্ট্রীয়-কর্ম্মে, দেশের সমস্ত ব্যাপারেই তাদের মতা-মত গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল tax দেওয়াই প্রজার কর্ত্তব্য নয়, সেই ট্যাক্স কি বিষয়ে কি পরিমাণে ব্যয়িত হবে, তাও তার বুঝবার ও জানবার ও সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ বলবার অধিকার আছে। ইহাই democracy, ইহাতেই প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়। আর এজন্যই প্রজাতন্ত্র ভিন্ন আর কোন রাজ্যশাসনতন্ত্রই সত্য নয়। Science ছাড়া যেমন democracy হ'তেই পারেনা, তেমনি democracy ছাড়া এ জগতে scientific form of Govt. আর কিছুই নয়। তাই আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক মহাতমসী নিশার রাজ্য হতে উজ্জ্বল জ্যোতি-বিশিষ্ট দিবালোকে গমন করবার জন্য, এই মহা "অসৎ" হতে "সৎ" এ যাবার জন্য আমা-দের জেলায় জেলায়, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চ্চার গণ্ডী বিস্তৃত করতে হবে। The hall of science is the temple of democracy, তাই স্থানে স্থানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

স্বদেশ-সেবকদের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত, মানুষ যত কাজ করে, যত আন্দোলন করে, সকলগুলিই পর-স্পর সম্বদ্ধ। একটী অপরটীর সাহায্য ব্যতি-রেকে হতেই পারে না। এই বিশ্ব একটী grand organic whole বলিয়া, মানুষের মন ও শরীর এক একটী organic unity বলিয়া, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক আন্দোলনের শুভাশুভ ফলের উপর অপরের ভালমন্দ নির্ভর করে। সেজন্য "স্বদেশী" কেবল কাপড় চোপড়ই থাক্, শিক্ষা, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, চিকিৎসা ইত্যাদিতে করবার দর-কার নাই, এটা অতি অস্বাভাবিক। অথবা industrial movement করা হ'ক, political movement রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার নাই, এটা ভুল। রাজনৈতিক অধি-কার প্রাপ্ত না হলে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে উন্নতি, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ততঃ হতেই পারে না। অনেকে বলেন, বিয়েতে টাকা নেওয়া বন্ধ করাই স্বদেশী আন্দোলনের কর্ত্তব্য, অন্য সব পরে হবে। কিন্তু এটা বুঝা উচিত যে, বিয়েরও ব্যাপারটা কেবল সামাজিক এক কাণ্ড নয়, ইহাতে অর্থনীতির নিয়মও কাজ করছে। শিক্ষা, দীক্ষা, কাজকর্ম্ম যদি সমস্তই materalistic অর্থ-পিশাচতার ভাবেই হ'ল, মন যদি সকল সময়েই বৈষয়িক সুখ ভোগের দিকেই থাক্‌ল, তবে কেবল বিয়েতে টাকা নেওয়া বন্ধ হয় কি ক'রে? অর্থই পদমর্য্যাদার প্রধান উপা-দান মনে হয় ব'লে, এবং ক্রমশঃ অভাবের বৃদ্ধি হওয়ায়, বিবাহের বাজারেও বরের দাম

টাকা দিয়েই স্থির করা হয় ও দুটা একটা পাশ করলে দর বেড়ে যায়। মানুষের মন হ'তে বাহ্যাড়ম্বর ও বিলাস ভোগের ইচ্ছা দূরীভূত না হ'লে, সামাজিক সকল কাজে অর্থের আধিপত্য থাক্‌বেই। এবং সেজন্য সমস্ত দেশের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি না হলে অর্থের যেখানে অভাব, সেখানে স্বভাব নষ্ট হবেই। তাই সকল আন্দোলনই—সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, একটাকে ছেড়ে আর একটা হতে পারেনা। তবে কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা কিছু পরে, যদি ঠিক করবার দরকার হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ততঃ রাজনৈতিক শিক্ষা ও আন্দোলনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। Stateই যখন মানুষের সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের হর্ত্তাকর্ত্তা, তখন সেই stateএর ভালমন্দ না হ'লে ধর্ম্ম, সমাজ, সবই বিধ্বস্ত হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া এখন স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করবার সুবিধা না হ'লে ধর্ম্মের উন্নতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষা প্রণালীর সুব্যবস্থা—সবই সুদূরপরাহত।

তাই সকল বিষয়ে জীবনের প্রত্যেক কাজেই যখন আমাদের স্বজাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এত দরকার, তখন কেউ কেউ যে বলেন Governmentএর সাহায্য লও, ওদের অনেক টাকা,—এটা নিতান্তই বোকামী। সকল জিনিষই নিজেদের লোক দ্বারা করাইয়া নিতে হবে। স্বদেশের অর্থেই সমস্ত চালাতে হবে। সাধনোপায়ও সমস্তই দেশের উপযোগী হওয়া চাই। ইহাতে ফল অতি সামান্য হলেও তাতেই আমাদের গৌরব, কারণ সেখানেই আমরা নিজেদের সত্তা অনুভব করছি। পর সাহায্যে মস্ত ফল পেলেও নিজের আনন্দ করবার কারণ নাই।

আর এসিয়ার বৌদ্ধ ও মুসলমান সভ্যতা আমাদের ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্গে যখন অতি স্বাভাবিক ভাবে সম্বদ্ধ, অতি প্রাচীন কাল হ'তেই আমাদের সকলের চিন্তা ও কার্য্যের পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা যখন প্রায় একই ভাবে চলে এসেছে, তখন এই ঐতিহাসিক ও চরিত্রগত নৈসর্গিক ঐক্যকেই হৃদয়ে স্থান দিয়ে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে। ভারতের জাতীয় জীবনের ভাগ্যলক্ষ্মীর অভ্যুদয় সমস্ত প্রাচ্যদেশের অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িত। সমগ্র এসিয়ার সভ্যতার কেন্দ্র স্থল ভারতবর্ষ। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের নানা প্রকারের চিন্তাস্রোত, সমস্তই ভারতের পুষ্টি সাধন করেছে, আবার এখান হইতে বহির্গত হইবার সময় রূপান্তরিত হয়ে নূতন বেগে অন্যত্র প্রবাহিত হয়েছে। ভারতসমাজে যেমন সকল ভাবের সমন্বয়, তেমনি অন্যান্য দেশের ভাব-তরঙ্গও ইহার সহিত ঘাত প্রতিঘাতেই বর্ত্তমান অবস্থা ধারণ করেছে। তাই এসিয়ার অভ্যুত্থানে ও ঐক্যেই আমাদের মঙ্গল। ইউরোপের জাতিরা যেমন Greeko-Roman সভ্যতার অস্তিত্বেই ও বিস্তারেই নিজের মহিমার পরিচয় পায় ও ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য এত যত্নবান্, আমাদেরও এই Hindu-Islamic সভ্যতার রক্ষায় ও আধিপত্য স্থাপনেই জাতীয় গৌরব।

China, Japan, Afghanistan এর সঙ্গেই আমাদের কাজকর্ম্ম প্রথম কর্ত্তব্য। ওরা আমাদের বন্ধু ব'লে যে বিদেশী বর্জ্জন ক'রেও, স্বদেশী না পেলে, জাপানী নেওয়া উচিত, তা নয়। ওরা শত্রুই হ'ক্, আর মিত্রই হ'ক্, ইউরোপের কোন Powerই ত আর আমাদের সঙ্গে মিত্রতা ক'র্‌তে আস্‌ছে না। ইউরোপের কোন জাতির সঙ্গেই আমাদের

প্রকৃতির মিল হতে পারে না। যে নিয়মে খারাপ জিনিষ হলেও স্বদেশীই গ্রহণীয়, সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হয়েই স্বদেশের লাগালাগি ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বিশিষ্ট যে সকল দেশ, পরিবার আছে, বিদেশের দ্রব্য যদি গ্রহণ ক'র্‌তেই হয়, তবে তাদের জিনিষই, খারাপ হ'লেও, পছন্দ করা উচিত।

বিশেষতঃ এটা বুঝা উচিত, Political সমস্ত কাজই রাজসিক। রাষ্ট্রনীতি প্রধানতঃ প্রবৃত্তিমূলক। ব্রাহ্মণোচিত সাত্বিক ভাব humanityর problem solve করবার সময়, মানবজাতির হিতসাধনের জন্য দরকার। Nationality, জাতীয়তার সময়, বিশেষ কোন এক জাতির মঙ্গলবিধানের জন্য ক্ষত্রিয়ের তেজই কাজ করে, আর ইহাই বাঞ্ছনীয়। এখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাই বিরোধ আছে, আপন পর ভেদ আছে, নিজকে assert করবার, নিজের বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্র অধিকার স্থাপন করবার প্রবৃত্তি আছে। ফকীর, সন্ন্যাসী, অনাসক্ত ব্যক্তিরা সমগ্র নরসমাজের ভিত্তি হলেও, কোন এক stateএর "pillars" হতে পারেন না। তাই আমাদিগকে শত্রু, মিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্র, ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান ক'র্‌তে হবেই। অন্য লোককে জব্দ করা ত আমাদের মতলব নয়, নিজেদের জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি। ইউরোপের লোকেরা "Balance of Power"স্থাপন করেছে, তাকি Japanকে নিয়ে, না Chinaকে নিয়ে? ইউরোপের কোন জাতিই চীন বা জাপানের শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস দেখে নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে না। ওদের প্রত্যেকে প্রত্যেককে খর্ব্ব ক'রে হীন-পরাক্রম করবার চেষ্টা করে। এ উপায়ে ওদের মধ্যে শক্তির সাম্য স্থাপন ক'র্‌তে পার্‌লে, তার পর দূরদেশের diplomatic movements study ক'র্‌তে অগ্রসর হয়। তাই England, আগে Russia, Turkeyর সঙ্গে বুঝাপড়া ক'রে, Japanএর বা পারস্য দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ক'রে থাকে। আর বাস্তবিক Asiar Balance of Power আগে স্থির না হলে, Europeএর সঙ্গে Asia International Diplomacyতে, রাজনৈতিক কুটুম্বিতায় ও মনোরাখা আনাগোনায় এক জটিল গোলমেলে ভাব থাক্‌বেই। সেই জটিল সমস্যা ভারতীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আগে মীমাংসা হবে না। তাই জাপানের জিনিষ নেব, কি Germanyর জিনিষ নেব, এটা সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতি দ্বারা মীমাংসা হবার নয়। এটা কেবল সস্তা ভালর প্রশ্ন নয়। এটা রাজনীতির কথা, সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতির সঙ্গে জড়িত। Turkeyকে যেমন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান জাতিরা পরস্পরকে খর্ব্ব করিবার জন্য রেখে দিয়েছে, Turkeyর অবনতি হ'লে Russia বা Austria ইউরোপের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে পড়বে, সেই ভয়ে যেমন মুসলমান সভ্যতাকে একটা মন্দের ভাল ব'লে, lesser evil মনে ক'রে ইউরোপ হ'তে দূরীভূত করেনি, সে রকম, আমাদেরও বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপের কোন জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না বাড়াইয়া, এসিয়ারই অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাজকর্ম্ম, রাজনৈতিক নিয়মানুসারে করা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের মহাজাতিগঠনের কাজ অতি প্রকাণ্ড ও বহুসময় সাপেক্ষ। অনেক পরিশ্রম, অনেক লোকের দরকার। কেবল দু'জন চারজন বক্তা দ্বারা বা দুটা চারটা "স্বদেশী ভাণ্ডার" দ্বারা সমস্ত দেশকে জাতীয়

ভাবে তৈরী করা যেতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা যে যে অবস্থায় আছে, প্রত্যেককে সেই অবস্থার উপযুক্ত কাজ করতে হবে। কেবল অবিবাহিত, সন্ন্যাসী, ফকীর, বা ভবঘুরের দলের দ্বারা সমস্ত কাজ হবার নয়। ছাত্র বৃদ্ধ যুবা, সকলেরই এসম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে। "ছাত্রাণামধ্যয়নংতপঃ" বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক আলমারী বই নয়। ছাত্রেরা কেবল ছেলে নয়, তারা মানুষ। অতএব বাল্যকালের কর্ত্তব্য পালনের মধ্যে মনুষ্যোচিত কার্য্যও করতে হবে। কষ্টের ও বিপদের মধ্যে থেকেও স্বভাবকে অস্থির হ'তে না দেওয়া,—নানা রকম লোকের সঙ্গে মিলে-মিশেও নিজের খুঁটী না ছাড়া, পরোপকারী হওয়া, বুড়োদের মত, ছাত্রদেরও কর্ত্তব্য। আর ছাত্রজীবন ত চিরকাল থাক্‌বেনা— অচিরেই প্রত্যেককে সংসারে প্রবিষ্ট হয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের গুরুভার বহন করতে হবে। সেজন্য ত এখন হতেই প্রস্তুত হতে হবে। দেশসেবা যদি বৃদ্ধ বা প্রবীণদেরই কাজ হয়, তার জন্যও ত শিক্ষা দরকার। তাই পঠদ্দশায় দেশের কাজে মন দিলে অধ্যয়নের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই নাই। বরং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, অল্প বয়স হতেই স্বার্থত্যাগ করতে অভ্যস্ত হ'য়ে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশেরই সুবিধা পাওয়া যায়। আর অনেকে যে বলেন, বিবাহিত লোকদের দেশহিতৈষিতা পোষায় না, এ কথার যে মানে কি, তাঁরাই বলতে পারেন। সংসারীদের ধর্ম্ম কি কেবল টাকাপয়সা রোজগার করা, আর পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা? নিজের ও নিজের পরিবারের ভাত কাপড় যোগান ত কর্ত্তব্যই। গরু ছাগলও তা করে। সন্তানসন্ততির মঙ্গল কামনা, পশু মানুষ, দুই জীবই করে থাকে। তবে মানুষের বিশেষত্ব থাক্‌ল কোথায়? যে লোক পশুর সমান না হ'য়ে মানুষ হ'তে চায়, তার কর্ত্তব্য নিজের পরিবার পালনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অন্যান্য লোকেরও যতদূর সম্ভব হিতসাধন করা। নিজেদের পেটই চলে না, তা আবার পরোপকার, এরূপ ভাব্‌লে নরজীবন সার্থক হয় না। অতি সামান্য ধনাগম হ'লেও, তাহারই অংশ পরের জন্য গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের দৈনিক কাজের তালিকায় ও দৈনিক খরচের হিসাবের খাতায়, পরের কাজে কিছু সময় দান ও পরের সাহায্যে কিছু অর্থদানের ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হ'লে, আগে পরিবার পালন করা যাক্, তারপর যদি সময় থাকে ও কিছু বাঁচে, দেশের জন্য খরচ করা যাবে, এরূপ ভাব্‌লে, যত বড় ধনীই হ'ন না কেন, পরের জন্য কিছুই বাঁচাতে পারবেন না। তাই সময়ের ও আয়ের কিয়দংশ পরের জন্য দিতে হবেই, ঠিক ক'রে সংসারকর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। পারিবারিক জীবনের মত, সামাজিক জীবনের জন্যও ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক মানুষই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আর দেশ যখন সংসারীদেরই নিয়ে, তখন দেশসেবা ত তাদেরই প্রধান কর্ত্তব্য। জ্বালা যন্ত্রণা, অভাব কষ্ট সংসারীদের সর্ব্বদা ভোগ করতে হ'লেও, এই অবস্থায়ই ভবিষ্যৎ সুখস্বচ্ছন্দতার আশায় কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ফকীরদের আবার দেশবিদেশ কি? তাঁরা

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?

এই ভেবে সর্ব্বত্র সমদর্শী, ও 'আস্‌মান্‌কা তল আর জমীন্‌কা উপর' নিজের ঘর মনে ক'রে থাকেন, তাঁদের কাছে জাতীয়তা "স্ব"দেশহিতৈষিতা ত আশা করাই উচিত নয়।

তাঁরা সমস্ত মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য দিন রাত ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁরা নিম্নস্তরের এ ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তবে সমস্ত দেশের ও সমাজের মুক্তি সাধন না হ'লে ধর্ম্মভাব লোপ পাবার সম্ভাবনা, ও ক্রমশঃ মানুষ বিষয়ভোগ ইত্যাদি নীচ চিন্তায় মন প্রাণকে কলুষিত ক'রে সমস্ত উচ্চ আদর্শ বর্জ্জন করতে পারে, সেজন্য অনেক সময় সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মারা দেশের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক আন্দোলনেও যোগদান করে থাকেন, এবং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে রক্তপাতে সহায়তা করতে পশ্চাৎপদ হন না।

স্বদেশের এখনকার কাজে যেমন সকল প্রকার ও সকল অবস্থার লোকেরই সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন, তেমন, দেশের সর্ব্বত্র সকল স্থানেই সেই চেষ্টার কাজ হওয়া চাই। বড় বড় সহরের কয়েকজন ধনী বা ইংরাজিশিক্ষিত লোকেরা দেশের জন্য খাট্‌লে বা ভাবলে বেশী ফল পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক লোকের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আশা ও উপায়ালোচনা প্রবেশ করাতে হবে। কেবল যেখানে অধিক লোকের সমাগম হয় বা ব্যবসা বাণিজ্যের কল কোলাহল খুব বেশী, যেখানে সরকার বাহাদুরের পুলিশ প্রহরীদের ভয়ে জনসাধারণ শশব্যস্ত, কেবল সে সব জায়গায় শিক্ষার আন্দোলন বা শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা বা বিজ্ঞানচর্চ্চা বা রাজনৈতিক শিক্ষা হ'লে দেশের প্রায় সমস্ত লোকই এ সব বিষয়ে নাবালক থেকে যাবে। তাই আমাদের স্বদেশসেবকদের প্রধান কর্ত্তব্য এই, নবযুগের নূতন মন্ত্র ও নূতন সাধনা প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে শুনান। যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে গরু বাছুরদের সঙ্গে নিরীহস্বভাব লোকেরা শ্রম বিনোদন করছে, যেখানে সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়ই কোন চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করছে, যেখানে বিদেশী সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর প্রবেশ এখনো বেশী করেনি, যেখানে হিন্দু মুসলমান একমন একপ্রাণ হ'য়ে পাড়ার সমস্ত কাজই ক'রে থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত লোকই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখবার জন্য যত্নবান, যেখানকার আমকাঁঠালবনের দেবমন্দির হ'তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনো অপহৃত হয় নাই, সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, আমাদের পল্লীসমাজে এই নবতন্ত্রের নূতন কথা শুনাইয়া তাদের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া দিয়া তাদেরকে ব্যাকুল করে তুলতে হবে। তাদের শান্তিময় কুটীরাবাসে অস্থিরতা, উদ্বেগ, কষ্টভোগ ও কাজ করবার বাসনা প্রবেশ করাতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল আন্দোলনের দ্বারা তাদের চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাতে হবে। তাদেরকে শেখাতে হবে, Security আর নাই, ধর্ম্মরক্ষা, সংসারযাত্রা, পরিবারপালন, লোকশিক্ষা আর এখন তত নিরাপদ নয়, ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা কোন্ কাজ হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সংযোগ রেখে এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করে গ্রাম্যজীবনকে সঞ্জীবিত করতে হবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছুকাল হ'ল ঘটেছে এবং সেজন্য পল্লীতে যে যে দোষ প্রবেশ করেছে, সমস্তই প্রতীকার করবার

জন্য ঘরে ঘরে, হিন্দুমুসলমান, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ, জোলাতাঁতী সকলকে শিক্ষাদান ক'রে স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করতে উপদেশ দিতে হবে।

এই নানা জায়গায় নানা লোকের এক-কালীন কাজ করবার আমাদের দেশে এখনো ভালরকম বন্দোবস্ত হয় নাই। সকল কাজই যেন খাপছাড়া বা পরস্পর বিরোধী। দেশের সমস্ত লোককে জমাট বাঁধাবার চেষ্টা এখনো করা হয়নি। সেজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনের ভাব প্রত্যেককে জানাবার জন্য সকলের মধ্যে আনাগোনা হবার সুবিধা করতে হবে। পূর্ব্বকালে রেলগাড়ী-টেলিগ্রাফ-ডাকঘর যখন ছিল না, তখন যেমন তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী, ফকীর বা ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে ভাবের আদান প্রদান করতেন, ও ঐ উপায়ে অতি দূরদেশের সংবাদ ও আচার ব্যবহার জানা যেত, এখনকার রেলগাড়ী, খবরের কাগজের দিনেও,সেই রকম,"স্বদেশী" ভাবের interchange of ideas করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য জেলায় জেলায় political missionaries, রাজনীতি প্রচারক দরকার, যাঁরা সহরের চিন্তা ও কাজের তালিকা পল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের শিক্ষকতার কাজ করবেন এবং পল্লীর অবস্থা সহরকে শুনাইয়া, নূতন facts, নূতন আলোচ্য বিষয় ও অভিনব সমস্যা প্রদান করিয়া উপযুক্ত লোকদের কাজে সহায়তা করবেন। এঁরা খবরের কাগজের লেখাকে নিজেদের প্রাণের কথার সঙ্গে, হৃদয়ের আবেগের ও স্বভাবের দৃঢ়তার সহিত মিলাইয়া সজীব করে তুলবেন। সংবাদ পত্র এ উপায়ে কেবল বইএ পড়া জিনিষ বা দায়িত্বহীন মাথাপাগলা লোকের বিকারবচন না হয়ে এক মহাসত্য রূপে সকলের মনে স্থান পাবে। আর ইহাতে পাড়ার সঙ্গে পাড়ার, সহরের সঙ্গে গ্রামের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সহানুভূতি ও একপ্রাণতা বর্দ্ধিত হয়ে সমস্ত দেশ ও সমাজকে একীকৃত করবে। তাতে কার কি কর্ত্তব্য,কোন্ সামাজিকorgan এর কোন্ function, কোথায় কোন্ বস্তুর অভাব, অতি স্বাভাবিক নিয়মেই স্থির হয়ে যাবে। তাই সংবাদপত্র যদি সরকারের আইনে উঠিয়াই যায়, তাতে কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ নাই। এই রাজনৈতিক পর্য্যটকেরাই আরও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীভাবে দেশের লোককে শিক্ষাদান ক'রে ও ঘরে ঘরে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে গিয়ে সমস্ত জাতির হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করবেন। এই political missionariesদের নাম শুনে ভয় পাবার কারণ নাই। এ কাজ সকলের পক্ষেই সম্ভব, সন্ন্যাসী, সংসারী, ছাত্র, যুবা, বিবাহিত, অবিবাহিত, প্রত্যেকে একাজ অনায়াসেই করতে পারেন। আর ইহাতে হৈ চৈ নাই, স্থিরভাবেই সকলের কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া যাবে।

আর সর্ব্বত্র সভাসমিতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজ করতে হবে বটে, কিন্তু তা ব'লে বক্তৃতা বা লোককে বুঝাবার জন্য কোন উপায়াবলম্বন একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। দেশের সমস্ত লোকই যদি কোন দিন কেজো হ'য়ে উঠেন, তবুও meeting করবার দরকার থাকবেই। সরকারের হুকুমে রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, লোকের বাড়ীতে, ময়দানে, লোক সমাগম হয়ত বন্ধ করতে বাধ্য হ'তে হবে। কিন্তু তাতে একপ্রকার সুবিধাই পাওয়া যাবে। তখন শীগ্‌গির লোক তৈরী হ'য়ে যাবেন, যাঁরা political mission নিয়ে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়,

দেশের দুর্দ্দশার কথা ব'লে ঘুরে বেড়াবেন ও রাজনৈতিক মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করবেন। আর এ উপায়ে বড় বড় সভাসমিতি বন্ধ হয়ে যাবে বটে; কিন্তু ঘরে ঘরে অসংখ্য সভাসমিতি ও দেশের অবস্থা আলোচনা করবার বন্দোবস্ত হবে। এবং ইহাতে বাক্য-ব্যয় কম হ'লেও কাজ বেশীই হবে। তাই অনেকে যে বলেন, meetingএ কেবল হৈ চৈ হয়, কাজ কিছুই হয় না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁদের অধিকাংশ স্থলেই দেশের জন্য কোন কিছু করতেই অপ্রবৃত্তি, এবং নিজের ছেলেদের স্বাধীনতা শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা। এই যে Congressটা কেবল তিন দিনের জন্য একটা পয়সাওয়ালা উকীল ব্যারিষ্টারদের আমোদপ্রমোদ বা বিশ্রম্ভালাপের আড্ডা বলে সর্ব্বদা গাল দিয়ে থাকি, এই তিন দিনের meeting দিয়েই, আর কিছু কাজ হক্ বা না হক্, Government আমাদের কথা শুনুক বা নাই শুনুক, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আমাদের অনেক উপকার হয়েছে, আমরা আমাদের চিন্‌বার উপযুক্ত অবসর পেয়েছি, আমাদের কোথায় কে কি ভাবেন, কে কি করেন, কোন্ ব্যক্তির কত সাহস, কত কার্য্যনৈপুণ্য, সব বুঝতে সুযোগ পাওয়া গেছে। এই মহা-দেশের কাজটাকে সকলেরই নিজের কাজ ব'লে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমরা একটা Indian public opinion তৈরী করতে সমর্থ হয়েছি,দশের সমস্ত কাজেই এই প্রকাণ্ড দেশের জনসাধারণ এক মত বা এক অমত প্রকাশ করতে পারছে। আর এ উপায়ে united actionএর পথ, সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করবার উপায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আর আজকাল যে District Conference, জেলাসমিতি এত হচ্ছে,তাতে বাজেকাজ, নিরর্থক বক্তৃতা অনেক হলেও, সহরে পল্লীতে সংযোগ দৃঢ় হচ্ছে, দুয়ে হৃদয়ের বাঁধন শক্ত হচ্ছে। অবশ্য কেবল বক্তৃতা বা সভায় কাজ এগুবে না। তার জন্য নানা রকমের, দেশের সর্ব্বত্র, নানা উদ্দেশ্যে organisation চাই, যাহাতে বক্তৃতার বা বইএর উপদেশ হাওয়ায় উড়ে না গিয়ে কাজের ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরে রাখা যায়। কোথায় বা শিল্পোন্নতির জন্য, কোথায়ও বা সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য, কোথাও বা সমাজসংস্কারের জন্য, কোথায়ও বা জেলার ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্য, কোথায় বা ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য। এরূপ ছোটবড় অনেক দল বাঁধা চাই, এসব দলে সকলে মিলেমিশে কাজ করতে অভ্যস্ত হ'য়ে, একই উদ্দেশ্যে জীবন গঠন করতে শেখে, আর ইহাতে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র পেয়ে নিজের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তির বিকাশের সুযোগ পায়। আর এসব স্থানে প্রধান শিক্ষা এই হয় যে, organisationএর, দলের, বা সমিতির প্রত্যেক লোকেরই কেবল কর্ত্তব্য আছে, তা নয়, অধিকারও আছে—প্রত্যেক কাজেই মতামত প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে। Rights ও privileges ছাড়া duties ও obligations থাকে না।

এইরূপে এই বিশাল সমাজ-কলেবরের মেরুদণ্ড শক্ত ও ভারসহ হইলে, এর মধ্যে জাতীয় উন্নতির চিন্তারুধির প্রবেশ করাইয়া প্রত্যেক শিরাকে সেই তেজে তেজীয়ান্ করিয়া, ইহার হৃদয়ে ভক্তি, বাহুতে শক্তি দান করে, ইহাকে সজীব ও সচেষ্ট করতে হ'লে স্বভাবের ও বুদ্ধির যে ধৈর্য্য ও তীক্ষ্ণতা চাই,

আমাদের স্বদেশ-সেবকদের তার জন্য শিক্ষা করতে হবে। দেশে উকীল জজের দরকার এখন আর নাই। এখন চাই আমরা statesmen, ও politicians—রাজনীতিবিশারদ, সমাজনীতিজ্ঞ। ওকালতী বুদ্ধিতে কতটুকুই বা হতে পারে? উকীলেরা দেশের Government যে আইন প্রস্তুত করেছেন, কেবল তাহারই প্রয়োগ করতে চুলচেরা বুদ্ধি খাটাইয়া দিন যাপন করেন। ইহাতে ইহাঁদের চালাকী, ফিকিরী, বাক্যপাণ্ডিত্য ও অপরকে বাগে ফেলবার বুদ্ধিরই বৃদ্ধি পায়। ইহাতে আবিষ্কার করার শক্তি বা নূতন অবস্থায় পড়লে কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার, তার জন্য মাথা খাটাতে যে ক্ষমতার দরকার, তার চেষ্টা কোন দিনই হয় না। জজিয়তী বুদ্ধিতেও তাই, কেবল এই তফাৎ, যে উকীলেরা বাঁধা আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে কেবল এক পক্ষের যত যা বল্‌বার আছে, তারই চেষ্টা করেন, আর জজহাকীমেরা কোন এক পক্ষ সমর্থন না করে নিরপেক্ষভাবে কোনদিকে না ঝুকে কাজ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেবল ফাঁকী দেবার চুলচেরা বুদ্ধি বা ধীর ও নিরপেক্ষ স্বভাব দ্বারা বড় একটা জাতি বা দেশের কাজ চলতে পারে না। তার জন্য এমন লোকের দরকার, যিনি এত বড় একটা দেশের সমস্ত অতীত পর্য্যবেক্ষণ করে, ও বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ আলোচনা করে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য কোন্ পথে চল্‌তে হবে, তার আবিষ্কার করিতে পারেন। অসংখ্য মতভেদ, জাতিভেদ, অবস্থাভেদ, ধর্ম্মভেদের মধ্যে কি উপায়ে সমন্বয় ও ঐক্যসাধন হতে পারে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের অসুবিধা না হয়, অথচ অধিকার ও উপযোগিতানুসারে প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে পারেন, এমন প্রশান্ত হৃদয়, স্থিরবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি লোকের দরকার। আইন মেনে চলতে পারে বা কেবল আইন প্রয়োগ করতে পারে, এমন লোকের প্রয়োজন বেশী নাই, আমরা চাই এমন লোক, যাঁরা আইন প্রস্তুত করতে পারেন, Makers of Law and Legislators, এদেশে এতদিন কেবল কেরানী উকীল ডাক্তারই তৈরী করা হয়েছে। Governmentএর কলে উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন, কোন কাজে initiative নেবার উপযুক্ত, মানুষ প্রস্তুত করবার সুবিধা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী বা High Courtএর জজ ব্যারিষ্টারেরা সেভাবে inventive facultyর অনুশীলন করবার সুবিধা পান না। তাঁদেরকে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা স্বাধীন ভাবে কোন বিষয় বা ব্যাপারের অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয় না। আর তারা সেজন্য চিন্তিতও নন। তাঁদের দ্বারা বেশী আশা করা যায় না। দেশের কাজের মধ্যে, নানা গোলমালের মধ্যে, গৃহবিবাদ মতভেদের মধ্যে থেকে যাঁরা জীবন গঠন করতে সুযোগ পান, কেবল তাঁদেরই দ্বারা সে কার্য্য সুসাধিত হ'তে পারে। দেশের জন্য খাট্‌তে খাট্‌তেই তার কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। আমাদের এখন দেশে সে রকম organisation অনেক করা দরকার, যাতে সকলে দেশের নায়ক হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। আমাদের স্বদেশ-সেবকদের সেই ভাবে শিক্ষালাভ করতে হবে। সরকার বাহাদুর নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য একপ্রকার লোক গড়বার চেষ্টা পেয়েছেন। আমাদের দেশের উন্নতির জন্য লোক প্রস্তুত করবার কোন

কারখানা খুলেননি। সেজন্য নূতন রকমের বন্দোবস্ত আমাদেরই ক'রে নিতে হবে। দেশের আদর্শকর্ম্মী ব্যাপকভাবে সমস্ত কাজ দেখে অতিদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে কাজে হাত দিবেন। পথের মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি হ'তে পারে, অনেক নৈরাশ্যের কারণ উপস্থিত হতে পারে, অনেক ঝড়তুফান উঠতে পারে, এসব প্রথম হ'তেই বুঝে তার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করেই যাত্রা করা দরকার। হটাৎ বিপন্ন বোধ করলে চলবে না, কারণ "মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে"—সে আশা খুব কম।

তাঁদেরকে দেশের যত জায়গায় যত resources আছে, যত সুযোগ সুবিধা আছে, কোথায় কোন্ শক্তি আছে, সব খুঁজে বের করে সকলকে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যার দ্বারা যে উপায়ে যতটুকু সম্ভব, করিয়ে নিতে হবে। তাঁদেরকে অনেক মানুষ ও অনেক জিনিষ নিয়ে কারবার করতে হবে। তাই কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার দরকার বুঝে চল্বেন। এবং অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বা অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সকল লোককে দায়িত্বের কার্য্য একটু একটু করতে দিয়ে ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে বড় কাজ করবার জন্য উপযুক্ত করে দেবেন। এরূপ কাজের লোক ছোটখাট অনেক তৈরী করা চাই।

শীগ্গির শীগ্গির মনের মত লোক পাওয়া যাচ্ছে না বা ফললাভ হ'লনা দেখে, নিরুৎসাহিত না হ'য়ে, দেশের যত যা কাজ আছে, সকল বিষয়ে একসঙ্গে মনোনিবেশ করবেন। বালিকাদের জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেবার কোন বন্দোবস্ত করা যেতে পারে কি না, National Girls' Schoolsএর জন্য কি কি দরকার, সব ভেবে ঠিক করে রাখ্তে হবে। বালকবালিকা বা যুবকদের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপে হ'লে দেশের মঙ্গল হয়, তার জন্য ভাবতে হবে। নৈতিকশিক্ষা এবং স্বভাব গঠনের ব্যবস্থা দরকার। পরের খাটবার ও স্বার্থত্যাগ করবার শিক্ষা পঠদ্দশায়ই দিতে হ'লে ছেলেদের কোন্ সময় ও কতটুকু সময় ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়? বই পড়াই যদি ছাত্রজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়, তবে দেশের কাজ কি কি ছাত্রদের পক্ষে সম্ভবপর এবং তাদের বয়স ও অবস্থার উপযোগী, এবং কোন্ কোন্ কাজ আরম্ভ করলে সময়ের অপব্যয় ও লেখাপড়ার ক্ষতি না হ'য়ে চরিত্রগঠনের সুবিধা হতে পারে, তার অনুসন্ধান করতে হবে। আজকালকার দিনে কোন্ কোন্ জিনিষ নিতান্তই অনাবশ্যক, স্থির করে তাদের বর্জ্জনোপায় দেখ্তে হবে এবং ধন সঞ্চয় ক'রে তাকে দেশের কাজে লাগাবার সুবিধা না থাক্লে Co-operative stores ইত্যাদি স্থাপন করে দিতে হবে। মাম্লামোকদ্দমা, সরকারের কাছারীতে না নিয়ে, দেশেরই কোন জায়গায় মীমাংসা হ'তে পারে কি না, তার জন্য লোককে কি ভাবে শিখাতে হবে, এবং তার বন্দোবস্ত করতে কত টাকা বা কত লোকের দরকার, আর তা এখন আরম্ভ করা যেতে পারে কি না; পল্লীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিনপয়সায় দিতে হ'লে কত টাকার দরকার, আর কি উপায়ে সে টাকা তোলা যায়;—গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম শিক্ষা ও আত্মরক্ষা শিক্ষার জন্য কি করা যেতে পারে, এক কথায়, দেশের যত রকম কাজ হ'তে পারে, তার কোন্ কোন্টা এখন আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত,

স্থির করে শীগ্‌গির শীগগির তা ক'রে ফেলবার জন্য যত্নবান্ হবেন।

Government সকল কাজেই বাধা দিবেন, এটা জানা কথা। আমাদের কাছে যা গুণ ও পুণ্যের জিনিষ, ওদের হিসাবে তা দোষ ও পাপের। আমাদের patriotism, ওদের আইনে crime। মাতৃপূজার উপর ট্যাক্স বসিয়াছে ব'লে ত মাতৃভক্তি বা মাতৃসেবা বন্ধ করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় Governmentকেও খুসী করব, আর দেশেরও উপকার কর্‌ব, এ অসম্ভব। ভগবানের অর্চ্চনা আর স্বার্থসিদ্ধি, একসঙ্গে চল্‌তে পারে না। শ্যাম ও কুল, এ দুয়ের এককে ছাড়তে হবেই। ওদের সকল প্রকারের বিঘ্ন জেনেশুনেই কাজে নামা গেছে। এখন এসকল কাজ করতে যত সহিষ্ণুতা ও কৌশল দরকার, সমস্ত অবলম্বন ক'রে, দেশের সমস্ত লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে হবে। এসব কাজ নিজেদেরই করে নিতে হবে। কোন জিনিষই "বাড়া ভাত" নয়। নিজেদের চেষ্টায়ই সকল লোককে একাজে ব্রতী করতে হবে। আর অন্যে সাহায্য করছে কি না করছে, এ পথে আমি একা, একা কতটুকু কাজই বা করা যেতে পারে, আদর্শ স্বদেশসেবকদের তা ভাবা উচিত নয়। আর, তাঁরা বেশ সতর্ক ভাবে লোককে নিজেদের মতে আনতে চেষ্টা করবেন। স্বার্থত্যাগ করার কথায় প্রায় সকল লোকই পেছিয়ে যায়। অধিকাংশ লোকই স্বদেশী কাজ করলে টাকা লাভ হবে কি না, তার কথাই জিজ্ঞাসা করে। সেই স্বার্থসিদ্ধির আশা দিয়েই লোককে জাতীয় কাজে প্রবৃত্ত করান যেতে পারে, নতুবা নয়। পৃথিবীতে অমরতা লাভ করবার জন্য কেহই ব্যস্ত নয়।

"কিমপ্যহিংস্যস্তবচেন্মতোঽহং যশঃশরীরে ভবমেদয়ালুঃ।
একান্তবিধ্বংসিষুমদ্বিধানাং পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলুভৌতিকেষু॥

এ রকম কথা কেবল মহাপ্রাণ, কষ্টসহিষ্ণু, বংশমর্য্যাদাপালক রাজা দিলীপের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ লোকে এই মাংসপিণ্ডটাকেই পুষ্ট করতে পেলে আর কিছু চায় না; নিন্দা মলিন প্রাণের জন্য দুঃখিত নয়। তারা "যশোধনানানাংহি যশোগরীরঃ" একথার অর্থ বুঝে না। তাই সকলের self-interest এই appeal করতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির আশা দিয়েই সকলের মন ভিজাতে হবে। আর এজন্য অনেক অপমান নিন্দা সহ্য করতে হলেও হতে পারে। "আমাকেই উদ্ধার করেছেন" ভই ভেবে সকল লাঞ্ছনাই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে।

আর এসমস্ত কাজে দেশের প্রত্যেক লোকের নিকট অর্থ সাহায্য নিতে হবে। সকল কাজেই টাকার দরকার। এই টাকা মাসিক চাঁদা করে তোলাই বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে নিজেদের লোককে নিজেরা tax, কর দিতে শেখা হবে। বড় বড় Endowment বা জমীদারী পেলে কাজ খানিকটা এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না। হঠাৎ দুটা একটা লোক দান করে স্বার্থত্যাগ দ্বারা উঁচিয়ে গেলে সমস্ত দেশের উপকার হয় না। সমস্ত দেশের লোককে যথাসাধ্য ত্যাগশিক্ষা করাতে হবে। ইহাতেই যেটুকু ফললাভ হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর জমীদারদের কাছে বেশী আশা করাই অন্যায়। তাদের স্বাধীনতা কতটুকু এবং ভয়ত তাদেরই বেশী। এ দেশটা ত কেবল জমীদারদের নয়; কাঙ্গাল গরীব, মুটে মজুর সকলের ধনেই দেশের ধন,

সকলের শক্তির একীকরণে দেশের সামর্থ্য। তাই চাঁদা সামান্য হলেও, অতি পরিবর্ত্তনশীল হলেও, তাতেই যা করতে পারি, তাই করতে হবে। কারণ এ চাঁদায় লোকের প্রাণ আছে, সমস্ত দেশের নিষ্ঠা ও ভক্তি আছে। আর এ উপায়ে যদি প্রত্যেক লোককে আমাদের এই Self-taxation, স্বেচ্ছা-প্রদত্ত করের নিয়মে ভুক্ত ক'রে, অন্ততঃ একদিনের আয় দান করাতে পারি, তা হলে, কেবল জাতীয় বিদ্যালয় কেন, National Court of Arbitration, Post office ইত্যাদি যত যা দরকার, সবই স্বদেশী ক'রে ফেল্‌তে পারি। Government যে এত বড় কাজ করে তা ত এই মাসিক চাঁদার উপরেই নির্ভর ক'রে। সরকার বাহাদুরকে যে খাজনা দেওয়া হয়, তাও একপ্রকার চাঁদাই। আমাদের দেশের লোকেরা বিদেশী এই Governmentকে যদি বিশ্বাস করে খাজনা দিতে পারে, যে খাজনার ব্যয় সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, তবে আমাদের দেশের লোককে যৎসামান্য দান ক'রে স্বাধীনতা আনয়নের সহায় হতে পারে না? আর জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে ধন অর্পিত হবে, তাতে প্রত্যেক দেশবাসীর অধিকার থাক্‌বে, কোন্ বিষয়ে কত খরচ হবে, তা নিজেরাই ঠিক করে দিতে পারবে।

এখন আমাদের দরকার, বার বার সকলের নিকট ভিক্ষা করা। তাগাদা যথেষ্ট করা হয় নাই। দুমাস, একমাস, একবৎসরের চেষ্টায় সমস্ত দেশকে তৈরী করা যেতে পারে না। দু তিন বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করলে তবে জাতীয় সমস্ত কার্য্যের উপযুক্ত টাকা সংগ্রহ হ'তে পারে। নিজেরা নিজের জেলাকে এ উপায়ে স্বাধীন করতে চেষ্টা না করে অন্য কোথায়ও সাহায্য প্রার্থনা করা অতি দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। একটা স্কুল চালাবার জন্যই যদি এ জেলাকে কলিকাতার অধীন হ'তে হয়, তবে অন্যান্য গ্রামের স্কুল ইত্যাদি কিরূপে সম্ভবপর হবে? অনেক কষ্ট বিপদ রয়েছে বটে। ভাল রকম আদায়ের বন্দোবস্ত এখনো হয় নাই। কত উপায়ে আদায় করা যায়, তাই ভাল করে দেখা হয় নি। তাতে আবার অনেকেরই অনিচ্ছা ও স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ। কিন্তু এসব প্রতীকারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয় নাই। অল্প পরিশ্রম করেই "অনেক করা গেছে, কিছুই হল না" ভেবে নিরাশ হ'লে চলে না। নৈরাশ্যেরই বা কারণ কি? সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করা যায় না। সময় কিছু বেশী লাগ্‌বে, বা অনেক লোকের সাহায্য দরকার, যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন ব'লে কাজটাত একেবারে অসাধ্য নয়। কোন জিনিষ গড়ে তুল্‌তে হ'লে অনেক দিন লেগে থাকে। কথায় বলে, Rome was not built in a day. একটা বাড়ী ভেঙ্গে ফেল্‌তে যত সময় ও কলকারখানার দরকার, তাকে তৈরী করতে তার চেয়ে শতগুণ বেশী নৈপুণ্য, লোক ও সময়ের দরকার। এ সব ত দিন রাত চোখের সামনেই দেখ্‌ছি। তবে আর নিরুৎসাহ কেন? কষ্টসাধ্য বলেই ত দেশসেবা একটা পুণ্যের কাজ। যদি কোন গোলমাল না থাক্‌ত, তবে আর patriotism একটা virtue হ'তে পার্‌ত না। পথ সোজা হ'লে স্বর্গে যেতে খুব কমই হ'ত। কিন্তু স্বর্গের পথ অতি লম্বা, দুরূহ ও কণ্টকময়। এত যাতনা ভোগ করতে পারলে তবে স্বর্গ রাজ্যের মন্দিরচূড়া দৃষ্টিগোচর হবে। কষ্ট যদি করতেই না হ'ত, সকলেই

যদি একেবারে স্বার্থত্যাগী হয়ে, জাতীয় কার্য্যে অর্থ সাহায্য ক'রত, তবেত জাতীয় জীবন অতি সস্তা হয়ে পড়্‌ত। তার জন্য লোক এত লালায়িত হ'ত না। তাহ'লে লালা লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের দরকার হ'ত না। ফুটা ভাতে কাঠি দেবার জন্য সে মহাত্মার জন্ম হয় নাই। এদেশে অশ্রুতপূর্ব্ব দেশসেবার বিপৎসঙ্কুল পথ দেখাবার জন্য তিনি এসেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত নূতন পথে চল্‌তে পার্‌লেই জাতীয়তার ধ্বজা উড়াবার উপযুক্ত হওয়া যাবে, তা না হ'লে নয়।

আর এ সব বাধা বিপত্তি আছে বলে, এসকলকে পরাভূত কর্‌তে হয় বলেই মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষের শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবল, সে কত বিপদ্ কষ্টভোগ ক'রে তারই মধ্যে কাজ কর্‌তে পারে, তা দেখে। যে যত বাহিরের অবস্থাকে নিজের করতলগত কর্‌তে পারে, চরিত্র দ্বারা বহিঃ শত্রুকে যে যত পদানত কর্‌তে পারে, যে মানসিক ও নৈতিক বল দ্বারা প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূল ক'রে নিতে পারে, নিরাশার বেষ্টনীকে পদদলিত ক'রে তার উপর বিজয় পতাকা উড্ডীন কর্‌তে পারে, সে তত মানুষ পদের অধিকারী। আর তা না হ'লে পশুর সমান অবস্থার দাস হওয়া হয়, তাতে নরজন্ম বৃথা।

> man would be
> Must rule the empire of himself ; in it
> Must be supreme, establishing his throne
> On vanquished will, quelling the anarchy
> Of hopes and fears, being himself alone.

তাই ভয় বিপদ দেখে চুপ করে থাক্‌লে চলে না। বল্‌তে গেলে মানুষের সকল কাজেই কষ্ট। অন্নের গ্রাস মুখে তুল্‌তেও ত কষ্ট। কিন্তু কৈ? সে ভয়ে ভীত হ'য়ে, নিরুৎসাহ হয়ে ত বসে থাকি না। আর মানুষোচিত যত বড় বড় কাজ আছে, সবই বিষাদে পরিপূর্ণ। যাতে যত বিষাদ, তাই তত মহৎ। মনুষ্য জীবনের উচ্চতম আদর্শ primrose path of dalliance tread কর্‌লে, সুখময় নীড়ে বসে থাক্‌লে লাভ করতে পারা যায় না। মানুষ ভালবাসে, কিন্তু তার অর্থ কি? কেবল আঁখি ভরা জল। ভগবানের আরাধনা, আর পরোপকারের অর্থ সংযম ও কঠোরতা। লোকে বড় হয়, কেবল ছোট হ'য়ে। স্বাধীনতার অর্থ, নিয়ম ও ধর্ম্মের অধীনতা। লোককে সুশিক্ষা দিতে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত crossএ প্রাণ দিতে হয়। জীবনের কোন এক উচ্চ আদর্শকে সুসাধন কর্‌তে হ'লে, দৃঢ়ভাবে কোন লক্ষ্যের প্রতি আসক্ত হ'তে হলে, তাতে তন্ময় হ'তে হয়। তন্ময়তার অর্থ তাতে প্রাণ সমর্পণ করা। তবে আর সংশয় দুর্ব্বলতা চিত্ত অধিকার করে কেন? বিশ্বের কোন মঙ্গল কর্ম্মই বাহ্য দৃষ্টিতে মধুর নয়। "আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম আমি আজি" এই বচনটা সকল মহাপুরুষদের। সমস্ত জগতকে আপনার ক'রে নেবার "সময়" যখন "নিকট" হ'য়ে আসে, তখন "কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ?"—ব'লে কোন না কোন জায়গায় বাঁধন ছিড়্‌তে হয়ই। প্রকৃতিরঞ্জনের জন্য রাজা রামচন্দ্রের সীতাবর্জ্জনও তাঁর কাছে এইরূপ কঠোরই বোধ হ'য়েছিল।

> বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
> কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥

এইরূপ জীবনের সকল কাজেই একটা বিষাদের ভাগ, tragic element রয়েছে। কেবল দেশসেবায় বা Public Lifeএ এইরূপ বিষাদাত্মকনাটক অভিনীত

হয়, তা নয়, সামান্য গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবনেও বিষাদপূর্ণ অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। আর মনুষ্য জীবন স্বয়ংই একটা grand tragedy. মানুষের আদর্শ অতি উঁচু, চায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে অনন্তলীলাময় ভগবানের মহিমা তন্ন তন্ন ক'রে বুঝতে, অসীম জ্ঞান, অসীম কর্ম্ম ছাড়া মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না, কিন্তু এদিকে তার অসংখ্য অসম্পূর্ণতা, অনেক limitations. স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণের সঙ্গে সমকক্ষ হ'তে একান্ত বাসনা, কিন্তু নিজের সঙ্গেই অনেক নীচ প্রবৃত্তি, অনেক পাশবিক ইন্দ্রিয়। তাই প্রতিপদেই দুঃখ-জ্বালা। সেই জন্যই, যা কখন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হবার নয়, মানব প্রকৃতির সেই অসীম বাসনারাশির দিকে লক্ষ্য করে কবি বলিতেছেন,—our 'sweetest songs are those that tell of saddest thought. বিষাদ, দুঃখ, নৈরাশ্যের বিষয়ই মানুষের এত "sweet" এত ভাল লাগে, কারণ এতে তার স্বভাবের কথা আছে, তার নৈসর্গিক উচ্চপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর মানুষ হতে হলে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চল্‌তে হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়। তাই কষ্টকে আলিঙ্গন করে, দারিদ্র্য মস্তকে ধারণ করে, নিরাশার ভীতিকেই একমাত্র সহায় ক'রে, জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে

শ্রীবিনয় কুমার সরকার।
মালদহ।

# পল্লী সংস্কার।

শরতের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কর-প্রপীড়নে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, বিহঙ্গকুল-মুখরিত উদ্ধ্‌তবাহু বহু যুগান্তের সাক্ষী-স্বরূপ বাপীতীরস্থ এক বটবীটপী পদে উপবেশন করিয়া আমি আজ পল্লী-শোভা দেখিতেছি। এখন বরষা-বারিরাশি পল্লী-পথকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া নিষ্ঠুর নিদাঘের মত পরিহার করে নাই। মাঠে ঘাটে অসংখ্য শষ্পের সমবেশ, কোথাও বা অর্দ্ধস্ফুট বনফুল সঞ্চালন কালে সমীরণ ভরে নর্ত্তন-নৈপুণ্য দর্শন করাইতেছে। সেই গ্রাম্য পুষ্করিণীর সুরম্য সানুবাঁধান ঘাটের সন্নিহিত তরুর ছায়ায় ঐ রাখাল বালকগণ বসিয়া মনের সুখে পঞ্চম রাগে নানাবিধ সঙ্গীত গাহিতেছে। দুটী সন্তরণ-নিপুণ হংস ছুটিয়া গিয়া পুকুরের জলে গ্রীবা ডুবাইয়া মনের সাধে আহারান্বেষণ করিতেছে।

আমি এক দৃষ্টে দেখিতেছি, সুদূরে গৃহস্থের গৃহাবলী। পল্লী-বধূরা কাঁখে কলসী লইয়া মৃদু-মন্দ পদে ধীরে ধীরে ঐ সুরম্য সরোবর-তীরে উপস্থিত। তাহাদের মনের আবেগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে প্রাণের কথা একজন আর এক জনকে বলিতেছে, কিন্তু হঠাৎ অপরিচিত বৃক্ষতলস্থিত পথিকের সন্দর্শনে তাহাদের গল্পের প্রখর প্রবাহ থামিয়া গেল। শরৎ-কালের মেঘের মত একখানি আস্তরণ তাহাদের মুখচন্দ্র ঢাকিয়া ফেলিল।

তাহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল—পূর্ব্ব রাত্রির ঘোষপাড়ার নিমন্ত্রণ।

একজন বলিলেন "আমার ভর্ত্তা কল্য ঘোষ বাবুদের বাড়ীতে জল গ্রহণ করে নাই, বাবুদের কি সাহস যে তাহারা যাদব বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

এইরূপে সামাজিক দলাদলির বিষয় এবং মামলা-মোকর্দ্দমার বিষয় মাত্র তাঁহাদের আলোচ্য ছিল। আমি একান্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ভাবিলাম, বঙ্গের প্রতিপল্লীর শক্তি, স্বাস্থ্য ও সাধনা কি এরূপ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের ভিতর, সমাজের দলাদলির ভিতর ব্যয়িত হইতেছে না? যাঁহারা দেশনায়ক নামে খ্যাত, তাঁহারা পল্লী ছাড়িয়া সহর আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পল্লীর কর্দ্দমপঙ্কিল-জল লতাগুল্মকলুষিত ক্ষুদ্র বর্ত্ম প্রভৃতি নিতান্ত ক্লেশকর। তাই তাঁহারা পল্লীনিবাস ছাড়িয়া দলে দলে সহর আশ্রয় করিয়াছেন। শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গপল্লী গুলি এত অনাদৃত ছিল না। তখন জন্মভূমির প্রতি লোকের মমতা ছিল, সহরে আফিসাদির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া ছুটীতে শত শত সুশিক্ষিত সন্তান মাতৃভূমিতে আগমন করিয়া তাহার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন। শিক্ষাই সভ্যতার মূল, ইহা এক সর্ব্বজনসমাদৃত সার সত্য! আজ তুমি শিক্ষিত হইয়া যদি নব শক্তি-প্রাপ্ত পাখীটীর মত পল্লী-জন্মভূমিরূপ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, বৃথা যশ ও সম্মানের আশায় সহরের অঙ্ক আশ্রয় কর, তবে তোমার শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনায় কোন ফল হইবে না।

সহরবাসী সুশিক্ষিত লোকগুলিকে পল্লীবাসী সরলপ্রাণ লোকগণ এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব মনে করেন এবং করিবার যথেষ্ট হেতুও আছে। তাঁহারা ইংরেজী মিশ্রিত ভাষায় কথা বলেন। পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহ, পল্লীর পুষ্করিণী ঘাট, মাঠ ও হাট, তাঁহাদের চক্ষে নগণ্য! পল্লীবাসী মনুষ্যগণ তাঁহাদের চক্ষে হেয়। এইরূপে সহরবাসী "মনুষ্য ফলগুলি", মাকাল জাতীয় ফলরূপ অতি দূর হইতে আত্মশোভা সৌন্দর্য্য ফলাইয়া অতি উচ্চ বৃক্ষে ঝুলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দাঁড়কাকেরই ভোগ্য হইয়া থাকেন।

এখন দেশময় একটী ভাব হইয়াছে, কিরূপে দেশের হিত করি। বাস্তবিক যদি কাহারও দেশ-হিত-বাসনা মনে হইয়া থাকে, তবে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, সংবাদ পত্রিকার স্তম্ভে যাহাতে স্বীয় নাম প্রকাশিত না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া। আমি মহাত্মা যীশুর সেই সারোপদেশ যথার্থ মনে করি—"তোমার ডান হস্তে যাহা দান করিবে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না।" সেরূপ, তুমি দেশকে যে প্রীতি দিলে, তাহা অপরকে জানিতে দিও না, তাহা হইলেই যথার্থ প্রীতিদান হইবে।

তোমার জীবনের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার ফলে যদি একটী নষ্ট ও হতশ্রী পল্লী নবশোভায় শোভিত হয়, যদি সেই স্থানের নর-নারীগণ বাস্তবিকই সমুন্নত হয়, তবে সমগ্র পৃথিবীতে স্বীয় সাময়িক নামে যিনি প্রচারিত হইয়াছেন, তাহা হইতে তোমার আসন অনেক উচ্চে স্থাপিত হইবে, এবং তোমার কার্য্যের ফলে একটী দেশের যথার্থ উপকার হইবে।

এইরূপ শুভ কার্য্যকারক দল যতদিন সমগ্র ভারতের গ্রাম-সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইবেন, ততদিন দেশের কোন আশা নাই।

বক্তৃতা। আমাদের দেশের বক্তৃতা-বাহুল্যে সমূহ অনিষ্টের হেতুস্বরূপ হইয়াছে—বক্তাদের নাম যত সহজে প্রচারিত হয়, আর কোন লোক তত সহজে পরিচিত হইতে পারেন না। সংবাদ পত্রিকার স্তম্ভে বক্তৃতা-দাতার নাম প্রকাশিত হইলেই বক্তা মহাশয়

একরূপ আত্মপ্রসাদ ভোগ করেন, 'এইত স্বদেশ-হিতৈষণার জ্বলন্ত উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া আমি কি না করিয়াছি।' কিন্তু আমি বলিব, বাতাসে তোমার শব্দ লয় পাইতেছে, তোমার দ্বারা দেশের কোন কাজ হয় নাই এবং স্থায়ী কাজ এদেশে বক্তৃতা দ্বারা হইতেও পারে না। পক্ষান্তরে তোমার অস্থায়ী নামে স্থায়ী কার্য্যকরী ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে এই এক সার্ব্বজনীন সত্য রহিয়াছে যে, দৃষ্টান্ত কথা হইতে অনেক বেশী কাজ করে। ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে লোকের অগাধ কার্য্যকরী উৎসাহ, কাজ করিবার জন্য দলে দলে নরনারী ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন, সেদেশে অবশ্য ভাবপ্রচারক বক্তাদের দ্বারা উপকার আছে। কিন্তু যে দেশ বাকাবীর পরিপূর্ণ, সে দেশের বালক যুবক সকলেই বক্তৃতার করতালী নিতে ব্যস্ত হইবেন এবং কঠিন কঠোর কার্য্যভার গ্রহণে বিমুখ হইয়া সরিয়া পড়িবেন, বিচিত্র কি !

আমার মনে আছে, একবার বেলুড়মঠে মহাত্মা বিবেকানন্দের সহিত (আমার পাঠ্য-জীবনে) সাক্ষাৎ করিতে যাই। একজন ভদ্র লোক তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, আপনি অনেক দিন পরে ইয়ুরোপ হইতে এদেশে আসিলেন, ২।৩টা বক্তৃতা দিবেন না ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "এখানে বক্তৃতা করিয়া কোন ফল আছে আমার মনে হয় না, তবে ফলের মধ্যে একটী আছে, সকলে বলিবে "শালা ভাল বলিয়াছে, কি শালা মন্দ বলিয়াছে" এইরূপ কথার মধ্যেই সমস্ত শেষ হইবে।"

আমি তাঁহার কথাগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। সহজসাধ্য দেশ-হিতৈষী হওয়ার একমাত্র উপায় বক্তৃতা ; কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি প্রকৃত দেশ হিতের বাসনা করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। জগতের কাছে অপরিচিত থাকিয়া কাজে নামিতে হইবে। যত গোপনে কাজ করিবে, ততই জগৎ তোমার শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, ভাবিও না, তোমার দৃষ্টান্ত বৃথা যাইবে। আমরা আর কিছুই চাহি না, চাহি কেবল গোপনে দেশের উন্নতি-সাধক বৈরাগী।

এরূপ দেশ-হিতব্রতের দীক্ষা নিতে হইবে। ভারতে যত ধর্ম্ম প্রচার, যত কাজ, সব দীক্ষার প্রভাবে হইয়াছিল। প্রাণের গভীর সাধনার জন্য ভারতের নর-নারী গুরু-বক্ত্রগম্য মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গুরুমন্ত্র ছাড়া—স্বদেশ-হিতের দীক্ষা ছাড়া, ভারত জাগিবে না, ভারত উঠিবে না।

ভারতের এখন পূর্ণ কাল আসিয়াছে। "ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে," এই সময়ে, কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি যুগাদর্শ স্বরূপ হইয়া এদেশের কল্যাণ-কামনায় যদি সন্তানদলের সৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগকে যদি এক একটী গ্রামসংস্কারের ভার দেন, তবে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে

দেশের যাঁহারা উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। বাহ্যিক জটা গৈরিকের দরকার নাই। কিন্তু যথার্থ প্রাণ দিয়া দেশকে ভালবাসিলে ও দেশের জন্য সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ বলি দিলেই যে কোন লোককে আমাদের অভিধানে সন্ন্যাসী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত, আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া, কেহ দেশের কাজ করিতে পারিবেন না। এই দেশহিত-ব্রতধারীদের অন্য আর একটা সাধনা আছে, তাহা

ধর্ম্মনিষ্ঠা। বিশ্বপিতা বিধাতার উপর তাঁহার এক গভীর বিশ্বাস চাই, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণে সতত প্রার্থনা চাই। সেই একান্ত ভগবৎ-প্রীতিকে ধরিতে না পারিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় না। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমি একবার ছয় মাস-কাল অবস্থিতি করি। আমি তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার স্বদেশ-সেবার ভাব, তাঁহার গভীর ভগবন্নিষ্ঠা হইতে যেন বাহির হইত।

এই শ্রেণীর আর দুই জন সাধককে জানিতাম, তাঁহাদের এক জন পুণ্যাত্মা কালী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য জন স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত। আমি তাঁহাদের সমস্ত জীবনের ভিতর এইরূপ অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি।

আধুনিক যশোকাঙ্গালী তথাকথিত অনেক দেশহিতৈষী লোকদের সত্য মিথ্যা জ্ঞান এত অল্প এবং বৃথাভিমান ও স্বার্থ বুদ্ধি এত বেশী যে, সত্য সত্যই দেখিলে ঘৃণা হয়। তাই আমাদের সভা সমিতিতে তেমন সুফল হইতেছে না।

জগতে বিমল চরিত্রের এক অমূল্য প্রভাব। যদি দেশনায়ক-খ্যাত লোকের ভিতর চরি-ত্রের হীনতা ও বৈরাগ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে কি দেশ তাঁহাদিগকে যথার্থ সম্মান দিবে? না, তাদের আদর্শে দেশে কোন সুফল ফলিবে?

ধর্ম্মই মানুষকে বড় করিয়াছে, ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া যিনি স্বীয় ভ্রাতা ভগ্নীর কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হইবেন, তিনিই যথার্থ দেশের হিত করিতে পারিবেন। ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা।

বলিতে দুঃখ ও ক্ষোভের যুগপৎ আবি-র্ভাব হয়, বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষার সহিত আমাদের অনেকে চরিত্র হারাইয়াছি। যে সব লোকের চরিত্র নাই, তাঁহারা যে যথার্থ দেশ-হিত বলিয়া কিছুই করিতে পারেন, তাহা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। আপাততঃ তাঁহার বক্তৃতা শ্রুতিসুখকর হইতে পারে, আপাততঃ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী নানা রূপে চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, কিন্তু রাম-ধনুর রঙ্গের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে গগন অঙ্কে সেই সৌন্দর্য্য মিশিয়া যাইবে।

আমি অনেকবার কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতিতে গিয়া কোন কোন দেশখ্যাত লোকদের আচরণ দর্শনে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি। কিন্তু ভিতর হইতে উত্তর পাই-য়াছি, এই লোকদের সাধনা নাই, যশো-বাসনাই ইঁহাদের ক্ষুদ্রতার মূল। তবে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি হইতেও আমি বড় কার্য্য মনে করি, পল্লী-সংস্কার।

এই উপলক্ষে প্রধান বক্তব্য এই, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষিত ব্যক্তি যেন পল্লী গ্রামের গ্রাম্য-নিকেতন পরিত্যাগ না করেন। বিশেষ বিশেষ পল্লীতে এক একটী লোকের উত্থানকে আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে মনে করি। ঈশ্বর যেমন সমগ্র এসিয়াকে তুলিবার জন্য পূর্ব্বপ্রান্তে জাপানকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং জাপানের স্নেহ আদর স্থাপন করিয়া চীনকে উঠাইতেছেন, সেইরূপ, প্রতি গ্রামের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোককে যেন সেই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের কল্যাণ কামনায় উন্নত করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রামের প্রতি তাঁহাদের ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে

তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য,—

(১) গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করা।

(২) সালিসাদি দ্বারা গ্রাম্য মোকর্দ্দমা গুলির মীমাংসা করা।

(৩) গ্রাম্য রাস্তা, জলাশয়, দেবমন্দির প্রভৃতির সংস্কার করা।

(৪) ব্যায়ামাগার, পুস্তকাগার, ধর্ম্ম সভা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া গ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করা।

(৫) গ্রামের পারিবারিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা, ব্রাহ্মণ ও মৌলবীদের সংস্কার করা, গ্রামের উন্নতিকল্পে মুষ্টি-চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

(৬) গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ্রামে শিক্ষার বিস্তার কল্পে প্রতি গ্রামে তিন শ্রেণীর স্কুল চাই।

(১) বালক শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়। (২) বালিকা বিদ্যালয়। (৩) কৃষক প্রভৃতির শিক্ষার জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয়। এই তিন শ্রেণীর স্কুল প্রতি গ্রামেই থাকা প্রয়োজন। দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণ যেন সুশিক্ষিত হয়, এবিষয় দেশহিতৈষীমাত্রকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। বিদ্যার ভিতর দিয়া যাহাতে বালক বালিকাদের চরিত্র সুগঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি চাই। গ্রামের শিক্ষক ধীর, স্থির, চরিত্রবান ও সাধু প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা প্রচারই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে। মধ্যে মাঝে গ্রামের উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে গিয়া, উক্ত বালক বালিকাদের ও নৈশ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কৃষক-শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। এই স্থলে ইহাও বলা উচিত, এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেরূপ সামাজিক দলাদলী যাহাতে গ্রামকে স্পর্শও করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সকলকে সাবধান হইতে হইবে। যিনি গ্রাম-সংস্কার-ভার লইবেন, তাঁহার প্রধান এবং সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য, গ্রাম্য সামাজিক দলাদলী নষ্ট করিয়া ফেলা। সকল নরনারী যেন একস্থানে মিলিয়া প্রীতি-ভোজ গ্রহণে সক্ষম হন।

গ্রাম-সংস্কারের উদ্দেশ্যে গ্রামের মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর গণ্য মান্য লোক লইয়া একটী গ্রাম্য সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে। অন্ততঃ প্রতি মাসে একবার তাহার অধিবেশন হইবে। এই সভার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। গ্রাম-সংস্কারক মহাশয়ই এই সভার কেন্দ্র-শক্তিরূপে কার্য্য করিবেন। সালিসের দ্বারা সমস্ত বিচারের মীমাংসা করাই ইহার লক্ষ্য। সালিসের নায়কগণকে উক্ত সভাই মনোনীত করিয়া রাখিবেন। যদি কোন পক্ষের অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে অর্থ দণ্ড করিয়া দেশের কোন রূপ হিতকর্ম্মে, তাহা ব্যয় করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, গ্রামে আর একটী কর্ত্তব্য, রাস্তা, জলাশয় ও দেবমন্দির প্রভৃতির সংস্কার করা। এই কার্য্য সর্ব্বসাধারণের কাজ। বারোয়ারী পূজা বা অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অথবা গ্রামে যত বিবাহ হয়, প্রতি বিবাহে গ্রাম-সংস্কার ফণ্ডে এক টাকা করিয়া গৃহীত হইবে। সেইরূপ, নবপুত্রের জন্ম, নূতন চাকুরী, প্রতি শ্রাদ্ধে, বিদেশ হইতে অর্থ আনয়ন প্রভৃতি উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে, অনায়াসে এই সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এইরূপে গ্রামের জঙ্গল পরিপূর্ণ পঙ্কিল পুষ্করিণীগুলি আবার নব কদলীদল পরিশোভিত নির্ম্মল সলিলময় সরোবর রূপে গ্রামের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। গ্রাম্য রাস্তাগুলি সংস্কৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ পথিকগণের গমনের সহায় হইবে। দেবমন্দির গুলির চূড়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

এইরূপে নবীন আনন্দে গ্রাম্য বালক বালিকাগণ নবশক্তি লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ, গ্রামে একটী ব্যায়ামাগার, একটী পুস্তকাগার ও ধর্ম্ম সভা থাকিবে। ধর্ম্ম সভাতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলের যাহাতে পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইবে। সেখানে প্রতি রবিবার পুরাণ ভাগবত পাঠ ও নানা রূপ ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও উপদেশ দানের ব্যবস্থা থাকিবে। পূর্ব্বের কথকতা এদেশে কি শক্তি দিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবার নবভাবে কথাটার সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যায়ামাগার, পুস্তকাগারও ঐস্থানে, ঐ গৃহেই হইতে পারে।

অনেকগুলি দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ও উৎকৃষ্ট বহি ঐ গ্রাম্য পুস্তকাগারে রাখিতে হইবে। গ্রামের সকলেই যাহাতে বহি নিয়া পড়ে, তাহার বিধান করিতে হইবে। ব্যায়ামাগারে ডুডু, কপাটী, ব্যাটবল, ফুটবল, যিউযুৎসু, টেনিস্ প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা চাই।

ক্রীড়া-ক্ষেত্রগুলি অপূর্ব্ব খেলা স্থল। এখানে শৈশব-প্রীতি, যুবক-বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই স্থানের মিলন-কেন্দ্রে যে সৌহৃদ্য ও বন্ধুতার সূত্রপাত হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বাবু-বাঙ্গালী ছিল না, তাহাদের অসাধারণ বল ছিল। এখন শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য পল্লীতে পল্লীতে তেমন ক্রীড়াকেন্দ্র আর নাই। এখন স্কুল-বালকেরা বিদ্যালয়ে ক্রীড়া-কেন্দ্রে মিলিত হইয়া লম্ফঝম্প করে বটে, কিন্তু সাধারণের ক্রীড়া-কেন্দ্র গ্রামে না থাকাতে দেশ হইতে আনন্দ চলিয়া গিয়াছে।

দেশে আবার নবীন আনন্দের নব প্রবাহের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম সভার বিশেষ উপযোগীতা পরিদৃষ্ট হয়। আগেকার বৃদ্ধগণ, রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবন গঠিত করিতেন। কিন্তু এখন অর্দ্ধশিক্ষিতা গ্রাম্যবধূগণ সেকালে পুস্তক বলিয়া উক্ত শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে দূরে পরিহার করিয়াছেন।* সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে নানা রূপ জল্পনা ও কল্পনা-ক্ষেত্র করায় অনেক স্থানে কুফলও ফলিতেছে। এইরূপ, গ্রামের ধর্ম্মভাব তিরোহিত হইয়া যাওয়ায়, মানব জীবন নিতান্ত অসার হইয়া পড়িয়াছে। যদিও ২।৪টা ব্রত, কি ৫।৭ বার উপবাস, কি ৮।১০ প্রকার পূজা প্রতি বর্ষে প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি যেন দু বেলার ভাত খাওয়ার মত নিয়ম-বাঁধা কাজ। ইহাতে আত্মার উন্নতি বা উৎকর্ষ-বিষয়ক কোন অনুষ্ঠান নাই। প্রতি গ্রামে ধর্ম্ম-সভা থাকিলে এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মভাব-বিকাশক নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করিলে, গ্রামের অনেক উন্নতি হইবে।

যে গ্রামে ধর্ম্মভাব-বিকাশক সদনুষ্ঠান হয়, যে গ্রামে ধর্ম্মের নাম নর নারীর কণ্ঠের ভূষণ হয়, সেই গ্রাম নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত গ্রামসংস্কারক মাত্রেরই লক্ষ্য থাকা উচিত। ব্যায়ামাগার ও ধর্ম্ম-সাধন কার্য্যাবলীর দ্বারা গ্রামের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, গ্রামে শান্তি স্থাপিত হইবে এবং গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

৫মতঃ, গ্রাম-সংস্কারকদের কর্ত্তব্য, (ক) প্রতি গ্রামের লোকগণের পারিবারিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা, (খ) ব্রাহ্মণ ও মৌলবীদিগকে

---

* ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার পারিতোষিকে রামায়ণ, মহাভারত দেওয়া হয় বলিয়া, একব্যক্তি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া, অশ্লীল পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। ন, স।

সংস্কৃত করা, (গ) গ্রামের উন্নতি কল্পে মুষ্টি পরিমাণ চাউল প্রতিদিন প্রতিবারের গৃহীত চাউল হইতে সকালে ও বিকালে সংগ্রহ করা।

গ্রামের নমঃশূদ্র,ধোপা, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার,কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে পারিবারিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা দরকার। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের সহিত একদিকে যেমন প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হইবেন, অন্যদিকে স্বীয় স্বীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্যও চেষ্টান্বিত হইবেন। মনে করুন, কোন কুম্ভ-কার-পরিবারের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইল। এই বংশের যে মণি নামক এক-কুম্ভকার ছিল, তাহার কৃত হাঁড়ি খুব দৃঢ় হইত, সে কৃষ্ণনগর কুম্ভকারের মত অতীত উৎকৃষ্ট পুতুল নির্ম্মাণ করিতে পারিত। অপর একজন সেই বংশীয় লোক যখন তাহার পূর্বপুরুষের যশোখ্যাতি শুনিবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেও উন্নত হইতে চেষ্টা করিবে। সচরাচর ভদ্রলোকেরা নগণ্য জ্ঞানে ইতর লোকদের কোনরূপ ইতিবৃত্ত রাখিতে চান না; ইহার ফল বড়ই মন্দ হয়।

(খ) তৎপর গ্রামের পূজক ব্রাহ্মণ ও মৌলবীদের সংস্কার সাধন করাও সকলের কর্ত্তব্য। তাঁহারা সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র না হওয়ায় বহুলোকের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে প্রকৃত দেশহিতৈষী রূপে কাজ করিতে পারেন, তাহার উপায় করা চাই।

(গ) গ্রামের উন্নতি-কল্পে প্রত্যহ সকালে একমুষ্টি, বিকালে এক মুষ্টি চাউল,প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতে রক্ষিত হইলে, তাহা দ্বারা গ্রামের অনেক কার্য্য সাধিত হইতে পারে। মাসান্তে ঐ চাউল বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা অনেক সুকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। অন্য-পক্ষে এইরূপ কার্য্য দ্বারা গ্রামের মধ্যে এক-রূপ প্রীতি-বর্দ্ধনও স্থাপিত হইতে পারে।

শেষ কথা—গ্রামের উন্নতি[illegible] গ্রামে একখানি আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের [illegible]ষ্ঠা করা উচিত। এদেশ সুজলা সুফলা, এ দেশের যদি যথার্থ উন্নতি চান, তবে দেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইবে। মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহা-শয় একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমার ক্ষেতে মালী যদি দুই পয়সার শাক উৎপন্ন করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, তাহা আমার দেশের লাভ। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমার ছেলেকে বিলাতে কৃষি-শিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছি এবং অন্য আর এক ছেলেকে শিবপুর কৃষি-বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছি।" বাস্তবিক কৃষির মত ধন এদেশে কিছুই নাই, এদেশে এক সংস্কৃত প্রবাদ বাক্য চলিত আছে।

"ধান্য ধনান্বিতং নান্যধনং"

"ধান্যের মত ধন নাই।" দেশের কোন কোন সুশিক্ষিত লোককে এরূপ আদর্শ-কৃষক করিবার জন্য গ্রাম্য-সমিতি চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিলে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রগুলি উন্নত হইবে, লোকে ভালরূপে চাষ করিতে শিখিবে। এদেশে গোবরের মত উৎকৃষ্ট সার নাই, অথচ গোবর কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা অনেকে জানে না।

গ্রামের শেষ শিক্ষণীয় বিষয় শিল্প। গ্রামে কুম্ভকার, স্বর্ণকার অনেক স্থানেই আছে, কিন্তু সূত্রধরের কার্য্য ও অন্যান্য শিল্প কার্য্যের জন্য কারখানা খুলিলে সুবিধা হয়। টিনের কারখানা খোলা যাইতে পারে।

এইরূপে গ্রামের সমৃদ্ধিতে গ্রাম্য-জীবন আবার সুখের হইবে এবং গ্রামে আবার

লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে। এইরূপে বঙ্গপল্লী গুলি আনন্দ উৎসবে যখন মুখরিত হইয়া উঠিবে, তখনই দেশের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।

# প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।* (শেষ)

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ আমাদিগের মাতৃ-ভূমি। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল না বলিয়া বোধ হয়। অথর্ব্ববেদে কীটক দেশের (বিহার) উল্লেখ দেখা যায় মাত্র।

পৌরাণিক-কালে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম-কর্ম্মা ভীমসেনের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মহাবীর বৃকোদর বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ-সাগরস্থিত দ্বীপবাসিগণকে জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপ দুই জন নরপতি রাজ্য-শাসন করিতেন। মহারাজ সমুদ্রসেন দক্ষিণ-বঙ্গ-স্থিত তাম্রলিপ্ত নগরে (বর্ত্তমান তমলুক্) এবং মহারাজ চন্দ্রসেন উত্তর-বঙ্গে গৌড়ী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। পৌরাণিক কালে দক্ষিণ ও উত্তর-বঙ্গই সমৃদ্ধি-শালী ও জনগণে পূর্ণ ছিল। মধ্য-বঙ্গ কেবল জলাকীর্ণ। এমন্ কি, পাঠান ও মোগল-সাম্রাজ্য-কালেও মধ্য-বঙ্গের নৌ-বল অতি প্রবল। তৎকালে উহা দ্বাদশ ভৌমিকের ("বারো ভূঁইয়ার") রাজ্য মধ্যে বিভক্ত ছিল। মহাভারতীয় কালে উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্ত-স্থিত প্রাগজ্যোতিষ দেশ (বর্ত্তমান আসাম) মহারথ মহারাজ ভগদত্ত কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর রাজা ভগদত্ত সুদৃঢ় প্রস্তর-ময় ভাণ্ড, বায়ুবেগগামী অশ্ব-সমূহ ও বিশুদ্ধ দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিতৎসরু (বাঁট) যুক্ত অসি সকল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার প্রদান করিয়া-ছিলেন।

ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহ সিংহ-নাদ করত মদবারি-যুক্ত পর্ব্বতাকার দশ সহস্র হস্তী লইয়া ভীমনন্দন ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি ঘটো-ৎকচ-নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া, অতি সত্বর পর্ব্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং সেই হস্তী দ্বারা ভীম-তনয়ের রথখানিরও গতি-রোধ করিলেন।

যে বঙ্গদেশ মহাভারতীয় কালে এতাদৃশ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, যে বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় মহাবীর বিজয়সেন সিংহল জয় করিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার স্বাধীন ছিল; যাহার নৌ-বলের নিকট ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান নৃপতিগণ নতমস্তক ছিল, আজি সেই বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য, দাসত্ব-শৃঙ্খলা-বদ্ধ, ভীরু-বাঙ্গালীর আবাস-ভূমি বলিয়া জগতে পরিচিত। তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রো-পকূলে অবস্থিত ছিল। ঐ নগর হইতে সাংযাত্রিকেরা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর-

* লেখক বহুদিন পীড়া নিবন্ধন শেষাংশ লিখিতে অক্ষম ছিলেন। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। ন, স

স্থিত দ্বীপপুঞ্জ-বাসিগণের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত।

প্রবলপ্রতাপ বৌদ্ধ-সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য-কালে বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধিত হইয়াছিল। এই কালেই বৌদ্ধ-বণিক্‌গণ পোতারোহণে সুমাত্রা, যাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়া তত্তৎদ্বীপে উপনিবেশিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। যৎকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য “নবরত্নে” পরিবেষ্টিত হইয়া, উজ্জয়িনীর সিংহাসন সুশোভিত করিতেছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের অন্তর্বহি বাণিজ্য উন্নতির চরম-সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তাম্রলিপ্ত নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ-শাস্ত্র সকল সংগ্রহ করেন। এই সময়ে কতিপয় হিন্দুবণিক্ পোতারোহণে, সাগরপানে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। ফাহিয়ান্ তাহাদের সহিত চতুর্দ্দশ দিবসের পরে সিংহল দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সুবর্ণগ্রাম নগর হইতে কার্পাস-বস্ত্র লইয়া এতদ্দেশীয় বণিকেরা, খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে, ইজিপ্টদেশে (মিশরদেশে) বাণিজ্যার্থ গমন করিত। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে বণিক্‌গণ পোতারোহণে গ্রীস ও রোমদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান তুলা-বস্ত্র জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন্ রোমদেশে বহুকাল যাবৎ বহুমূল্যে বিক্রীত ও সাদরে পরিগৃহীত হইত। এমন্ কি, ইংরাজ-রাজ-প্রথম সময়েও, অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য শাসন-কালে উক্ত প্রদেশ সকল হইতে মুসলমান্ বণিক্‌গণ পোতারোহণে ইংলণ্ডে যাইয়া বাণিজ্য করিত।

আর্য্য-চিত্রবিদ্যা মুসলশাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায় পাঠান ও মোগল-সাম্রাজ্য কালেই বিলুপ্ত-প্রায় হয়। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল না, কিন্তু ভারতে ইংরাজ কোম্পানির রাজ্যশাসনকালে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উচ্ছেদ সংসাধিত হওয়ায়, ভারতে ইয়োরোপীয় বাণিজ্য, বিশেষতঃ ইংরাজ বাণিজ্যের প্রসার, সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইক্ষণ ভারতে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিলুপ্ত হওয়ায়, উহা একমাত্র কৃষিপ্রধান হইয়াছে। ভারতে একমাত্র কৃষকই উৎপাদক, আর মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র লোক পর্য্যন্ত, সকলেই কৃষকোৎপাদিত দ্রব্যজাতের ভক্ষক মাত্র। শিল্প ও বাণিজ্যের লোপ হওয়ায়, দেশান্তর হইতে ভারতে ধনাগম হইতেছে না। ভারতীয় দ্রব্যজাত ও কৃষিলব্ধ সামগ্রীর দেশান্তরে রপ্তানি হওয়ায় যে যৎসামান্য ধনাগম হয়, তাহা ক্ষতির হিসাবে নগণ্য। ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্য যদি ভিন্ন দেশে রপ্তানি না হইত, তবে লোকের অর্দ্ধাশন বা অনাশনে প্রাণ নাশ ঘটিত না। যদিও ধনাভাবই উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়, তথাপি দেশের উৎপন্ন দ্রব্য যদি দেশে থাকিত, তাহা হইলে লোকের এতাদৃশ অন্নাভাব, প্রাণ-বিয়োগ ও হাহাকার হইত না। ভারতে যেমন লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি আবার তদনুপাতে চাষের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অন্ন কষ্টের কারণ

হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। রাজা বৈদেশিক; আবার তিনি অবাধবাণিজ্য-প্রিয়; সুতরাং ভারত হইতে রপ্তানি কখনই বন্ধ হইবে না। তবে এই অন্ন কষ্টের দুর্দ্দিনে ভারতীয়-জনগণ যদি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় স্বদেশোৎপন্ন বস্তু-প্রিয় হইয়া বাণিজ্যাবলম্বন দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করে ও প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন কৃষির রপ্তানি দ্বারা বিদেশ হইতে ধন লাভ করিতে পারে এবং বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্যজাত ভোগে আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে পারে, তবে তাহাদিগের দুঃখময়ী অমানিশার অবসান হইবার সম্ভাবনা হইবে। রত্নপ্রসবিণী ভারতভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তির নিকট পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় ভূমির তাদৃশ শক্তি অকিঞ্চিৎকরী। সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাক্, এই "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" একা বঙ্গভূমিতে বিবিধ প্রকারে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন দেশ আছে যে, ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে? সুসভ্য ইংরাজ আমাদের রক্ষক আছেন। আমাদিগের ইষ্ট, অনিষ্ট, ধন, প্রাণ, মান, অপমান ইত্যাদি তাঁহার হস্তে।

ইদানীং ইংরাজ-রাজের সুশাসনে ভারতে দস্যু ও তস্কর প্রভৃতির উপদ্রব অনেক কমিয়াছে। এইক্ষণ আমরা কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা ধন লাভ করিয়া স্বাবলম্বী, বলবান্ ও নিজ পদে দণ্ডায়মান হইতে পারিব।

"অর্থেন বলবান্ লোকঃ"—অর্থ দ্বারা লোক বলবান্ হয়। এই যে ইংরাজ জাতি এত বলবান্ হইয়াছে, অর্থই তাহার নিদান। ভারত যদি ধনবান্ হয়, তবে রাজাও তাহার বশ হইবে, রাজা তাহার কথা শুনিবে। ভারত যাহা চাহিবে, রাজা তাহাই দিবেন। হতভাগ্য দরিদ্রের কথা কে শুনিবে? তাহার আবেদন নিবেদন অরণ্যে রোদন মাত্র।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ব্যবসায়ই শ্রীবৃদ্ধির আদি কারণ। ব্যবসায় সাধারণতঃ ত্রয়োদশবিধ। ইহা আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পশু পালন, এই চারিটী উত্তম; ধর্ম্ম, চিকিৎসা, ব্যবহারাজীব (ওকালতী), ও সঙ্গীতাদি চিত্ত-বিনোদন শাস্ত্র এই পাঁচটী মধ্যম; বেতন-গ্রহণ, হিংসাজীব, চৌর্য্য ও ভিক্ষা, এই চারিটী ব্যবসায় অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ব্যবসায়গুলি মধ্যে বাণিজ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বেতন গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। শাস্ত্রকারেরা যে বেতন গ্রহণ রূপ দাসত্বকে কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ কুক্কুর নিজের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে, কিন্তু পর-সেবক ব্যক্তিকে চলিতে হইলে প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিতে হয়। দাসত্ব গ্রহণ করিলেই অভিমান, তেজ, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল প্রভুর সন্তুষ্টি বা রুষ্টি-সূচক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়। বেতনগ্রাহী দাসকে স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি ও স্বীয় পদের স্থায়িত্ব বা উন্নতি সাধনার্থ সময়ে সময়ে কত যে নীতি, ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মৃত্যুকালে লোকের হ্রস্বস্বর, মন্দগতি, গাত্র-কম্প ও মহাভয় ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রভুর নিকটে যাচঞা সময়ে ভৃত্যগণের সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ভৃতিগ্রাহিগণ যত বড় মর্য্যাদাশালী ও উচ্চ পদাভিষিক্ত হউন্ না কেন, তিনি পরের দাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং কত মনস্তাপ ও অপমান যে সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভুর নিকট চুপ করিয়া থাকিলে মূর্খতা, অতিরিক্ত কথা বলিলে বাচালতা বা বাতুলতা হয়, অপমান সহ্য করিলে ভীরুতা বা কারুষতা এবং সহ্য না করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। প্রভুর নিকটে থাকিলে ধৃষ্টতা এবং দূরে থাকিলেও অকর্ম্মণ্যতা হয়। বেতনগ্রাহীকে প্রভুর নিকট কায়মনোবাক্যে অধীন হইয়া বাস করিতে হয়। কায়ে প্রভুপদে প্রণতি, মনে সর্ব্ববিধ নীচতা এবং বাক্যে প্রভু-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতে হয়। উত্তম ভৃত্য বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যখন অধম ভৃত্য বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি রোষকষায়িত-নেত্রে তিরস্কার ও কটূক্তি প্রভৃতি করিয়া আপন পদের গৌরব প্রদর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সেই মুখভঙ্গিমা দেখে কে? বা তাঁহার সেই দেবদুর্লভ পদের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করে কে? হায়! তুচ্ছ যৎকিঞ্চিৎ ধনলাভের জন্য স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া এতাদৃশ হেয় জীবন যাপন করা কি বুদ্ধিমান জীবের কার্য্য? দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য লোকেরা এতাদৃশ জঘন্য দাসত্ব-বৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দাসত্বকে সর্ব্ববিধ সুখ, সম্মান ও ভদ্রতার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছেন! তাঁহারা সর্ব্বসুখাকর, স্বদেশোন্নতি-নিদান, জাতীয়-জীবনাধায়ক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়কে হেয় ও নীচজনোচিত ভাবিয়া দাসত্ব লাভের জন্য সদা লালায়িত! কি ক্ষোভের বিষয় যে, বাঙ্গালী কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই জঘন্য-বৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র অপমান সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে কৃতী ও ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিতেছেন!

হে মসীজীবী ভদ্রাভিমানিগণ! আপনারা যখন কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করেন, তখন আপনারা কি নিজে নিজকে কারামুক্তির ন্যায় জ্ঞান করেন না? পরন্তু শ্রমজীবিগণ, কৃষকবর্গ ও ব্যবসায়িগণ কেমন হর্ষ-প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। হায়, বঙ্গ-সমাজ এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে যে, যাহারা এতাদৃশ ক্লেশকর অপবিত্র জঘন্য দাসত্ব করিয়া থাকে, তাহারাই এ অধম-সমাজে ভদ্র, কৃতী ও সম্মানিত বলিয়া পরিগণিত হয়! আর যাঁহারা পবিত্র বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, তাঁহারা অভদ্র বা ছোটলোক এবং পবিত্র কৃষিকারিগণ "চাষা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুসভ্য ইয়োরোপে কৃষিজীবিগণই সমাজে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

পরমপিতা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত মানবজাতি স্বতঃই স্বাধীনতা-প্রিয়। অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে কোন লোকই ইচ্ছা করে না। তবে কেন বঙ্গবাসী দেশহিতকর, প্রভূত অর্থকর ও স্বাধীনতা-বর্দ্ধক বাণিজ্য-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অবনতিজনক, অকিঞ্চিৎকর, পরাধীনতা-দুঃখজনক দাসত্বাবলম্বনে নিতান্ত লোলুপ? বঙ্গ-বাসীদিগের জাত্যভিমান, ভীরুতা ও দেশাচার প্রভৃতিই এই

জঘন্য-বৃত্তি অবলম্বনের প্রধান কারণ বলিয়া লক্ষিত হয়।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, আদি কালে মনুষ্য মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না, কিম্বা কোন প্রকার বর্ণ-সঙ্করও ছিল না। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন। যাহারা বেদ-পারগ, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন, যাঁহারা বীরকার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিলেন, যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ, তাঁহাদিগকে বৈশ্য এবং যাঁহারা ক্ষীণ-জীবী ও কেবল দাসকার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে শূদ্র করিলেন। এইরূপ আপস্তম্ব-সূত্রেও লিখিত আছে যে, কর্ম্মানুসারেই লোকমধ্যে জাতি-ভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম বা ব্যবসায়ই জাতি-ভেদের মূল কারণ।

আজি ভারতবর্ষ পরাধীন। ভারত হিন্দু-রাজার অধীন নহে; সুতরাং আজি ভারতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় স্ব স্ব জাত্যুক্ত-ব্যবসায়, আচার ও ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট। বায়ুপুরাণানুসারে যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাস-কার্য্যে নিপুণ, তাহারা শূদ্র। অতএব বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাস-কার্য্যে নিপুণ, তাহারা শাস্ত্রানুসারে শূদ্র-জাতীয় মধ্যে গণ্য। তবে হে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ! আপনাদিগের জাত্যভিমান ও তজ্জনিত দেশাচার কোথায় রহিল?

পরন্তু ভারতের এই দুর্দ্দিনে, ভারতের এই আপৎ-সময়ে মনূক্ত আপদ্ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যা-বলম্বন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। অতএব কেবল দাসত্বাবলম্বন দ্বারা শূদ্র জাতীয় মধ্যে গণ্য না হইয়া দ্বিজাতিগণের বৈশ্য-ধর্ম্মাবলম্বন করাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর; কারণ, তাহা হইলে দ্বিজত্বের লোপ হইবে না এবং তজ্জন্য জাত্য-ভিমানও কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইবে।

মানবজাতি দ্বারা যে সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসমস্তই একমাত্র বাণিজ্যের কল্যাণে সংসাধিত হইয়াছে। অধুনা আমরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল দ্রব্য উপভোগ করিতেছি, তৎসমস্তই একমাত্র বাণিজ্যের কল্যাণে প্রাপ্ত। যে সকল বিদ্যার প্রভাবে জন-সমাজে অভূতপূর্ব্ব সুখ-সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধিত হইতেছে, বাণিজ্যই সকলের মূল। বাণিজ্য প্রচলিত না থাকিলে পূর্ব্বকালে পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলির তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইত না এবং অধুনাতন সভ্য ইয়োরোপ ও আমেরি-কারও এতাদৃশী উন্নতি কদাপি দৃষ্ট হইত না। বাণিজ্য প্রচলিত না থাকিলে চীনদেশে প্রস্তুত ঘুড়ী আমেরিকাবাসী বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ পাইতেন না এবং তিনি মেঘের সময় ঘুড়ী উড়াইয়া তাড়িত-পদার্থেরও আবি-ষ্কার করিতে পারিতেন না। *

আজি আকাশের বিদ্যুৎ জন-সমাজের যে কত প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাড়িতবার্ত্তাবহ, বৈদ্যুতশকট, বৈদ্যুতালোক প্রভৃতি কত কি যে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন! বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সৌকর্য্যার্থই প্রথমতঃ বাষ্পের গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে বাষ্প সহযোগে ব্যোমযান, বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয়-নৌকা প্রভৃতি চালিত হইতেছে। এই বাষ্প সহযোগে যে কত প্রকার যন্ত্র চালিত হইয়া জনগণের কার্য্য

* Chamber's Essay on Electricity, p 15.

সকল সম্পাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

এখনও বুদ্ধিবিষয়ে ভারতবাসী হিন্দুজাতি কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে। যদি হিন্দুগণ বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পাদি ব্যবসার জন্য সকলে একবাক্য হইয়া যৌথ কারবারে ধন নিয়োগ করে ও প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ দেয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই এতদ্দেশীয়দিগের সভ্যতার যেটুকু ত্রুটি আছে, তাহার পূরণ হইতে পারে। শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক ইয়োরোপ হইতে শিক্ষক আনাইয়া জনগণের শিক্ষা বিধান করিলে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলে প্রভূত মঙ্গলের কথা। আমাদিগের দেশীয় লোকেরা কুল-ক্রমাগত কুসংস্কার, জাত্যভিমান, লৌকিকতা, এই সকল কুৎসিত প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি শিল্পাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট সুশিক্ষিত হয়, তবে এই হতভাগ্য দেশের পুনরুন্নতি হইতে পারে।

ভারতীয় রাজা,মহারাজা ও ভূম্যধিকারিগণ এক একটী যন্ত্রস্বরূপ। তাঁহারা দেশের উন্নতি-সাধন বিষয়ে একপ্রকার উদাসীন। তাঁহারা স্বয়ং উপার্জ্জনে অক্ষম। তাঁহাদের অনেকেই ব্যয়-বিবেচনা-শূন্য, দেশাচার ও কুলাচার জন্য অমিতব্যয়ী হইয়া নির্ধন হইয়া যাইতেছেন। এই বাঙ্গালা দেশে এমন ভূম্যধিকারী নাই যে, যিনি ঋণ জালে আবদ্ধ নহেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। অনেক রাজা মহারাজের গৃহে কৃত্রিম ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্ম অরণ্যে বসিয়া রোদন করে। তবে ইঁহাদের মধ্যে কৃতবিদ্য, সহৃদয়, দেশহিতৈষী মহাপুরুষ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক আচার ব্যবহার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেই পরিশ্রম পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের ভৃত্যবর্গ তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিয়া থাকে। তাঁহারা স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিয়া, ভোগ-বিলাস-দ্রব্যজাত-সমন্বিত স্থানে গিয়া বাস করেন। শরীর রক্ষার্থ যে যৎকিঞ্চিৎ শ্রমের আবশ্যক, কেহ কেহ আবার তাহাতেও পরাঙ্মুখ; পরিশ্রমের মধ্যে পান, ভোজন ও অপত্যোৎপাদনকালে তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। ভৃত্যবর্গ দ্বারা ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন হয়না বলিয়াই স্বয়ং করিতে স্বীকার করেন। এই দেশের ভরসাস্থল রাজা, মহারাজা ও ভূম্যধিকারিগণ যদি সমবেত হইয়া কৃষিবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় এবং কেবল গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠোপযোগী বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া জনগণের শিক্ষা বিধান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত হিতসাধন করা হয়। তাঁহারা যদি সমবেত হইয়া বিদেশ হইতে নানাবিধ যন্ত্রাদি আনয়ন করেন এবং এতদ্দেশীয়েরা যতদিন শিক্ষিত হইয়া যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারগ না হয়, ততদিন যদি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বাষ্পীয় যন্ত্র, যন্ত্র চালন ও বস্ত্র-বয়ন-নিপুণ লোকদিগকে আনয়ন করেন, তবে অতি সুবিধার সহিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া ইয়োরোপীয় বস্ত্রাদি হইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। স্থানে স্থানে কৃষিভাণ্ডার সকল স্থাপন করিলে অন্ন-কষ্টের সময়ে সেই সকল ভাণ্ডার হইতে

সুলভ মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিলে প্রজাবর্গের ও সাধারণ জনগণের অন্নকষ্ট-জনিত দুঃখের অনেক লাঘব হইলে পারে।

এতদ্দেশীয় লোকেরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে নাই। তাহারা আবার সংশয় স্থলে মুদ্রাবিনিয়োগ করিতে কদাচই সম্মত নহে। তাহারা বোঝে না যে, "ন সংশয়মনারুহ্য নরোভদ্রাণিপশ্যতি" সংশয়ারূঢ় না হইলে লোকেরা কদাচই ভদ্র দেখিতে পারে না। দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না। এই পৃথিবীতে ধনরাশি নানা সঙ্কট, নানা ক্লেশ ও নানা প্রকার ভবিষ্যৎ ভয় কারণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যে পুরুষ উদ্যোগী, যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকল বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নির্ভায় চিত্তে সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই ধন্য। তদীয় মাতা বীর-প্রসূ, তিনি বীর পুরুষ।

এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সন্তানেরা ধর্ম্মহীন শিক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া যাইতেছেন। হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই একজন দেশকাল-পাত্রজ্ঞ সুলেখক লিখিয়াছেন :—

"There can not be two opinions on the fact that we, the Bengalis are dying by inches. We have greatly deteriorated physically, morally, intellectually and spiritually, from our forefathers. So rapid is the downward course that a mere cursory glance will convince even the most superficial observer that the Bengal of to-day is worse off than the Bengal of some sixty years back. The cause must be sought for, and some restorative must at once be applied."

A very learned Hindu Pandit once said in this connection :—

"The hand of God is visible everywhere. It is a Divine Decree that we should get deteriorated in this way. The *Kaliyuga* has set in, in right earnest.

We have come to this lowest pit of depravity for transgressing the Divine Law. Some canker is eating into the vitals of our social organism, and is thereby undermining its very constitution.

Of every disease, there are two causes, viz ; the predisposing cause and the exciting cause. The first is inbred ; the second is extraneous. Our degeneration has no doubt two sets of causes. One set is working from without the social organism, while the other is exerting its baneful influence from without. Most of us have renounced our religion, lost the moral stamina, forgotten the injunction of the *shastras* ; and hence we are in such a sorry plight. Here the predisposing cause of our social degradation is fully in evidence, The constitution which harbours the predisposing cause of a certain disease is liable to fall a prey to the malady at the slight influence of any exciting cause. Our irreligiousness has weakened our body and mind and hence a slight disturbance of the external circumstances is telling so heavily upon us. The only remedy for this evil lies in imparting religious education to our young men on sound *shastric* principles."

অন্যান্য দেশে ভৃতিজীবী, রাজা, মহারাজা ও ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা, যথাক্রমে বণিক, শিল্পী, সৈনিক সংক্রান্ত লোক সকল এবং কৃষক লোকেরা অধিকতর মান প্রাপ্ত হন। এই কারণেই ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন লোকেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছেন, বিজ্ঞান শাস্ত্র সাহায্যে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় সকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতেছেন। ভারত যখন সভ্যতার উন্নততম চূড়ায় সমুত্থিত ছিল, তখন ভারতবাসিগণ বিজ্ঞান বলে শূন্যমার্গে গমনাগমন ও জল মধ্যে বাস করিতে পারিত। তাহারা বাণিজ্য সাহায্যে স্বর্ণ পাত্রে ভোজন করিতে পারিত এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ভেকের জিহ্বায় স্বাদহীনতা বুঝিয়াছিল। যখন পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, তখন ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া অপর

ভূভাগনিবাসিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল; "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহামন্ত্রের সাধক হইয়া ঐহিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যের বিষয়-সকল পাঠ করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। "চিরদিন কখন সমানে না যায়।" হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। যবন রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল। কাল-ক্রমে যবন সংসর্গে ভারতবাসিগণ ভে-সুখাসক্ত হইয়া বাণিজ্যকে ক্লেশকর ম-করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল অন্তর্বাণি-দ্বারা দ্রব্য বিনিময় বা দ্রব্য মূল্য নিবন্ধন দেশীয় লোকের পরস্পর অভাব বিমোচন হয়। দেশ মধ্যে জনগণের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, দেশ সমৃদ্ধিশালী ও বলশালী হইয়া উঠে। দেশ মধ্যে একতা জন্মে, অন্নকষ্ট বিদূরিত হয়, দেশ স্বাধীন ভাবে বিরাজ করে।

বহির্বাণিজ্যের বহুপ্রকার ফল। ইহাতে সমুদ্রপথে গমনাগমন-জনিত সাহস, বলবীর্য্য, কার্য্য-দক্ষতা এবং ধনবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। নানাদেশ দর্শন ও নানাপ্রকার লোকের সহিত সংসর্গ, আলাপ এবং নানা জাতীয় লোকের আচার, ব্যবহার-জ্ঞান-নিবন্ধন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা জন্মিয়া থাকে।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমিতে কতই যে স্থলজ, জলজ, উদ্ভিজ্জ, খনিজ দ্রব্যজাত উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। যে ভূমিতে যথাক্রমে ছয়টী ঋতু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সে স্থানে বিবিধঋতু জন্য বিবিধ প্রকার দ্রব্য যে উৎপন্ন হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দেবগণও ভারতবর্ষে ভোগ-সুখ-লাভার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন।

পাঠক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আবুল্‌ফজল্‌ কৃত আইন-আকবরী নামক গ্রন্থখানি পাঠ করুন। দেখিবেন, সম্রাট্‌ আকবর সাহের সাম্রাজ্য কালে ভারতবর্ষে কত স্বল্প মূল্যে দ্রব্য-জাত পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ পাঠান-সাম্রাজ্য কালে দ্রব্য-সকল অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। তাহা হইলে, হিন্দু রাজত্বকালে যে অতি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যাইত, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পুরাণ শাস্ত্রাদি অভিহিত ভারতের দ্রব্য সামগ্রী ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিলে আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এইক্ষণ ঐ বর্ণনাগুলি আমাদিগের নিকট উপন্যাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সাম্রাজ্য কালে ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইত।

যদিও ইংরাজ কোম্পানির রাজ্যকালে ভারতে শিল্প বাণিজ্য বিলোপিত হইয়াছে, তথাপি এখনও যে সকল স্থান যে সমুদায় দ্রব্য জন্য প্রসিদ্ধ আছে, ঐ সকল বস্তুর উন্নতি সাধন কল্পে তত্তৎ স্থানীয় জন-গণ যদি প্রযত্নপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য উৎকৃষ্টতর হইয়া জন-সমাজে সমাদৃত ও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইবে।

শ্রীহট্টের কমলালেবু ও পাথুরিয়া চূণ সুপ্রসিদ্ধ। বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাঢ়দেশের চাউল উৎকৃষ্ট। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান, সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ঢাকা ও কটকের স্বর্ণময় ও রৌপ্য অলঙ্কারগুলি অতীব মনোহর। ভাগলপুর, মালদহ, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান রেশমী বস্ত্রের

জন্য প্রসিদ্ধ। বারাণসীর শাড়ী এবং কাশ্মীর দেশের শাল বহুমূল্য ও অতি উপাদেয়। আসাম দেশের এণ্ডি ও মুগা এবং ভুটানের দেবাঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র। রাণীগঞ্জের মৃণ্ময় পাত্র সকল সৌন্দর্য্য বিষয়ে চীন দেশীয় পাত্র-সমূহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। রাণী-গঞ্জ, বীরভূম এবং রাজমহল প্রভৃতি স্থানে যে সকল লৌহ-খনি আছে, সেই সকল আক-রোৎপন্ন লৌহ যদি শিক্ষিত লোক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহা হইলে আর সুইডেন্ ও ইংলণ্ড হইতে লৌহ আনিয়া ইউ-রোপীয় বণিক্‌গণ আমাদিগের দেশে বিক্রয় করিয়া এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া যাইতে পারিবে না। জয়পুরের শ্বেতপ্রস্তর ও গয়ার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র সকল অ[illegible] সুন্দর। দাক্ষিণাত্য ও মুরশিদাবাদে হ[illegible], দন্ত-নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত [illegible] সকল পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে চন্দন [illegible] নির্ম্মিত সুন্দর খোদিত নানাবিধ দ্রব্য [illegible] হইয়া থাকে। অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে [illegible]বিধ পশমী বস্ত্র ও কম্বল পাওয়া যায়। এই সকল প্রসিদ্ধ স্থান ব্যতীত কত স্থানে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য যে রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

স্মরণাতীত কাল হইতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগস্থ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকল সামুদ্রিক বাণিজ্য নিমিত্ত সুবিখ্যাত।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পোত-নির্ম্মাণোযোগী নানাবিধ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, কলিকাতা ও কটক, এই কয়েকটী স্থানে পোত-নির্ম্মাতা লোক সকল, সুবিজ্ঞ কার্য্য-দক্ষ কর্ণধার এবং পোত-চালন-কুশল ব্যক্তি-গণ বাস করে। সিন্ধুনদ তীরে করাচি এবং ভারত-সাগরোপকূলে বহুসংখ্যক বন্দর রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বন্দর হইতে এখনও সাংসাত্রিকেরা বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে গমন করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম, মাতলা ও কটকের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে কয়েকটী বন্দর আছে, ঐ সকল বন্দরে জাহাজ রাখিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্য করা যাইতে পারে।

সুচারুরূপে বাণিজ্য কার্য্য করিতে হইলে ক্রেতাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা, সত্য কথা বলা এবং এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় [illegible] বিধেয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, [illegible]দেশীয় দ্রব্য-বিক্রেতারা ভুলেও সত্য কথা [illegible] না, তাই ক্রেতৃগণ সহজে তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে সত্য বাক্য বলা ও সদ্ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে বিক্রেতা যে পরিমাণে সত্য বাক্য বলিবে ও সদ্ব্যবহার করিবে, সে সেই পরিমাণে আদর-নীয় হইয়া লাভবান্ হইবে। অসত্য বাক্য বলিলে এবং অসদ্ব্যবহার করিলে বিক্রেতার ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই হইবে না। "সত্যং ব্রয়াৎ" এই মহাবাক্যটী যেন ক্রেতা ও বিক্রে-তার মনে সতত সমুদিত থাকে।

## উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে ভারতীয়-ভদ্রাভিমানি-জনগণ, আপনাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্যগণ কিরূপ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত হইয়া, কিরূপ ঐহিক সুখভোগে কাল কাটাইতেন, তাহা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন। আর আপনারা কিরূপ হেয় ও নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, এক-বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনা-দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহাদিগকে করতলস্থ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকোপার্জ্জন করতঃ

কত কত মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, আপনারা তাঁহাদের সন্তান হইয়া পরা-ধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া কেবল উদরান্নের জন্য তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পরপদ-লেহন করিতেছেন! আপনারা স্ব স্ব জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে মহান্ ও পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু আপনাদিগের পরিবারবর্গ ভিক্ষা-পাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে উদারান্নের জন্য ভ্রমণ করিতেছে! শিশুসন্তান-গণ ক্ষুধার জ্বালায় আর্ত্তনাদ করিতেছে! ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়স্বজনগণ অন্যের আশ্রয় লইতেছে, এই সকল দেখিয়া বিদেশী-য়েরা আপনাদিগকে কাপুরুষ ও জঘন্য বোধ করিয়া ঘৃণা করিতেছে! দেখুন, আপনা-দিগের উৎপাদিত ও অধিকৃত বস্তু-জাত লইয়া বিদেশীয়েরা ধনবান্ হইতেছে, আর আপ-নারা আজীবন-মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত দরিদ্র থাকিয়া কেবল বিবিধ কষ্ট ভোগ করিবেন! আপনাদিগের ন্যায় কোন্ দেশের লোক স্বার্থচিন্তা-বিরহিত, নির্ব্বোধ এবং দেশাচারের দাস হইয়া চিরকাল কষ্ট পাইতেছে?

এই যে মহামহিমান্বিত সসাগরা পৃথি-বীর ঈশ্বর, প্রবল প্রতাপ ইংরাজ, যাঁহার রাজ্যের উপর ভগবান্ সহস্ররশ্মি কখন অস্ত-মিত হন্ না, তিনিও এক সময় বাণিজ্যের কৃপায় ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। আপ-নারা ইতিহাস পাঠ করিয়া জ্ঞাত আছেন যে, প্রাচীন বেবিলন্, টায়ার, কাল্‌ডিয়া, ফিনি-সিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি নগর সকলের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি যাহা কিছু তৎ-সমস্তই একমাত্র ভারতবর্ষের ধন দ্বারা সংসা-ধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালেও লণ্ডন ও পারিস্ প্রভৃতি নগর এই ভারতবর্ষের ধন দ্বারাই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন।

দেশাচার, কুলাচার ও জাত্যভিমানই ভারতবর্ষের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আপ-নারা যতদিন সৌভাগ্য ও সর্ব্ববিধ উন্নতির মহৎ অন্তরায় স্বরূপ জাত্যভিমান ও তদনু-গত জঘন্য লৌকিকতা পরিত্যাগ না করিতে-ছেন, ততদিন আপনাদিগের উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বাণিজ্য দ্বারা সুখ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, আর অতি প্রাচীন, সুসভ্য, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আদরের ধন, ভারত দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত থাকিবে, ইহা কি সাধারণ দুঃখ, মনস্তাপ ও লজ্জার বিষয়! এক কালে অসভ্য, আজি সুসভ্য জাপান জ্ঞান বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্ ও বাণিজ্য-লব্ধ ধনে ধনবান্ হইয়া রুষ-ভল্লুককে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছে। সুসভ্য জাপানের এই যে সুখ-সমৃদ্ধি, এই যে প্রবল প্রতাপ, এই যে সর্ব্ব-বিধ উন্নতি, এই সকলের প্রধান কারণ বাণিজ্য ও জাত্যভিমান-পরিত্যাগ। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি আপনাদিগের চৈতন্যোদয় হইবে? বাণিজ্য করিলে আপনা-দিগের পবিত্রতা নষ্ট হইবে না, লোক-সমাজে হেয় হইতে হইতে হইবে না, বরং সম্মান ও সুখসমৃদ্ধি সহকারে পরম সুখে মানব জন্ম অতিবাহিত করিতে পারিবেন। হায়, কি লজ্জার কথা যে, আপনারা ঘুস দিয়াও ঘুসি খাইবার জন্য জঘন্য দাসত্ব করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু সর্ব্বসুখ-নিদান, সম্মান-বর্দ্ধক, অর্থকর বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নহেন!

আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যাহা-দিগের উপর আধিপত্য করিতেন, আজি তাহাদিগের অধস্তন সন্তানেরা আপনাদের

উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষিত হইতেন বা স্বদেশীয় ভাষা উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয় ভাষায় আপন পিতা মাতার নিকট পত্র লিখিয়া বা আত্মীয় স্বজনগণের সহিত কথোপকথন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন?

হে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ছাত্রবৃন্দ! তোমরাই পরাধীনা, প্রাচীনা, দরিদ্রা, সুদুঃখিতা ভারত-মাতার একমাত্র আশা ও ভরসা স্থল। তোমরাই কিছুদিন পরে গৃহী হইবে, সুতরাং তোমাদিগের উপর ভারত-জননীর সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, যতদিন তোমরা পাঠাবস্থায় থাক, ততদিন তোমাদিগের হৃদয়ে কত উৎসাহ, কত তেজ বীর্য্য, কত স্বদেশানুরাগ, কত সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি শুভ কামনা সকল উদিত হয়। তোমরা পাশ্চাত্য সুমার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে পণ্ডিতম্মন্য হইয়া, বিজাতীয় আচার ও ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিলে এবং স্বদেশীয় জন-গণকে মূর্খ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ও অলস বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিতে লাগিলে, স্বদেশীয়গণের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি এবং ধর্ম্মগত ও সমাজ-গত সর্ব্ববিধ সংস্কার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলে; কিন্তু হায়, বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে মনুষ্য-দলে প্রবিষ্ট হইয়াই তোমরা এক একজন বহুরূপীর রূপ ধারণ করিয়া থাক। এক একজন বাক্য-বীর হইয়া বাগ্মিতায় গগন-মণ্ডল ফাটাইতে থাক! বাক্যে সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের প্রলাপ বকিতে থাক, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই দেখিতে পাইনা! তোমরা মুখে যেরূপ লম্বা চওড়া বাক্য বলিতে পার এবং বাহ্যাড়ম্বরে দেশের মঙ্গল সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া আশা প্রদান কর, কিন্তু কাজে যদি তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারিতে, তাহা হইলে মনকে কোন প্রকারে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারিত। তোমাদিগের খাদ্য সুমিষ্ট ও দেখিতে সুন্দর হইলেই হইল, সেই দ্রব্যটী যে কি কি উপাদানে প্রস্তুত হইল এবং কোন্ জাতীয় ব্যক্তি উহা প্রস্তুত করিল, তাহা তোমরা জানিতে বা দেখিতে আবশ্যক বোধ কর না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আহারের সহিত স্বভাব ও ধর্ম্মভাবের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। তোমরা হয়ত অন্তঃকরণ হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসিদ্ধান্ত-পারদর্শী বলিয়া মনে কর। ভক্তিকে কুসংস্কার এবং পরলোকাস্তিত্ব-বিশ্বাসটীকে দুর্ব্বলতা বা কুসংস্কার প্রসূত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক। ফলতঃ, পাঠ্যাবস্থার পরে গৃহী হইয়া তোমরা ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র সমাজ বা কুলাচারে বাধ্য হইয়া ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিলেও প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হইয়া থাক। আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া গৌরব করিবার নিমিত্তই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাক। কেহ আবার পাঠ্যবস্থাতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া একেবারে পরমহংস হইয়া বসে। কখন বা তোমরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দুরাবস্থা দর্শন করিয়া বাক্যে সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, কিন্তু আপন আপন বিবাহের সময় তোমরাই আবার বহু পোষ্য সমন্বিত, ত্রিংশন্মুদ্রাবেতনোপজীবী, দরিদ্র শ্বশুর বেচারীর নিকট হইতে সুবর্ণ-চেন-সমন্বিত

স্বর্ণময় ঘটিকা-যন্ত্র, হীরক-খচিত অঙ্গুরীয়ক, দ্বিচক্র-শকট (বাইসাইকেল), টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দাবি করিয়া না পাইলে আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া যারপর নাই অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। তোমরা যখন বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া তারস্বরে বক্তৃতা করিতে থাক, তখন মনে হয়, বুঝি, ভারতের দুঃখ-নিশার অবসান হইল। তোমরা যাহাই বল না কেন, যতদিন তোমাদের মনে, মুখে ও কার্য্যে একতা সম্পাদিত না হইতেছে, ততদিন কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। একবার নির্জ্জন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্যগণ কত সৎকার্য্য সকল করিয়া গিয়াছেন, আর তোমরা কি করিতেছ? ভারত-মাতার দশাটী ভাবিয়া দেখত, তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! তোমরা তাঁহার সন্তান, তোমরা তাঁহার আশা ও ভরসা স্থল। তোমরা যদি তাঁহার দুঃখ বিমোচন করিতে বদ্ধপরিকার না হইবে, তবে কে আর তাঁহার দুর্দ্দশা দূর করিবে? পণ্ডিতপ্রবর ভট্ট মোক্ষমুলর বলিয়াছিলেন যে, এককালে জারমানি দেশীয় লোকেরা অজ্ঞানান্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও অবদান-পরম্পরার আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা জ্ঞান-রজ্জু অবলম্বনে সমুত্থিত এবং ক্রমে সভ্যতার উচ্চতম চূড়ায় আরূঢ় হইয়াছিলেন। আজি তাঁহারা পৃথিবী মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ-জাতিতে পরিণত হইয়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও শক্তি বিষয়ে পরমোচ্চ পদ লাভ করিয়া সকলের পূজনীয় হইয়াছেন।

হে ছাত্রগণ, তোমরা যতই তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও অবদান-পরম্পরার আলোচনা করিতে থাকিবে, তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির অনুসরণ করিতে থাকিবে, তাঁহাদিগের সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা, বদান্যতা, সৎসাহস, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, উপরতি, শম, দম প্রভৃতি গুণ-গ্রামে অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুকরণ করিতে থাকিবে, ততই তোমাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা হইবে।

"Lives of great ছিয়াছে। এ উন্নতি কি
We can make our
বড়লোকদিগের ... থাকিলে বিশ পঁচিশ
বড় হইবার ইচ্ছা জন্মিয়া ... প্রশস্ততা ... সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের গুণগ্রাম সমালোচনা করিলে, আমাদিগের মহা মোহ ঘুচিয়া যাইবে, আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারিব। আর্য্য মহর্ষিগণ দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে যে সকল ব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত সবিশেষ আলোচনা করিয়া, যে সকল বিধান তোমাদিগের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই সকল বিধানোক্ত নিয়মগুলি তোমাদের অবশ্য প্রতিপালনীয়; আর যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী তোমাদের নিকট উপাদেয় ও সাধনানুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরাধনায় চিত্ত সমাহিত করা কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্ম মহাসাগর-সদৃশ। ইহার তলদেশে বিবিধ সাধনরূপ মহারত্ন নিহিত আছে। অবহিত-চিত্তে সেই মহাসাগর-তলে নিমগ্ন হইয়া যাহার যেটীতে শ্রদ্ধা, সে সেই রত্নটী লইয়া সাধন-রাজ্যে ধনী হইতে পারিবে ও ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্য-কলাপ সম্পাদন

করা বিধেয়। কারণ "একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো-নিধনেপ্যনুযাতিযঃ। শরীরেন সমংনাশং সর্ব্ব মন্তত্তু গচ্ছতি॥" ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ; কেননা, মরিলে সমস্ত পার্থিব পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই আ[illegible]আত্মার সহিত পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞা[illegible]ষ্টা, অতী[illegible] গুণনিধি মহর্ষি[illegible]গণের সন্তান হই[illegible]রা ভারত-মাতার এ[illegible] জীবিকানির্ব্বাহার্থ ভরসা স্থল। তোমরাই[illegible]। আমাদিগের [illegible]হইবে, সুতরাং তোম[illegible] সে সুখ নাই, সে শা[illegible]র সুখ[illegible]কেবল অহরহঃ আধি ও ব্যাধিতে নিপীড়িত ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া দুঃখ-সঙ্কুল, অশান্তিময় জীবন যাপন করিতেছি। যদি প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবার অভিলাষ থাকে, তবে আমাদিগকে সেই ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য-ঋষিগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত বিধান সকল অনুসরণ করিতে হইবে। যদি প্রকৃত বীর হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে সেই আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের পথ সকল অনুসরণ করিতে হইবে; আর যদি ধনী হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই আর্য্য বৈশ্যবর্গের মার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। আর্য্য-প্রবর্ত্তিত পথগুলি কুটিলতা-শূন্য, ধর্ম্মানুমোদিত, পরমপবিত্র এবং ইহ ও পরলোকে শুভ-বিধায়ক।

আমাদের সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের বংশজাত, এই ভাবটুকু আমাদিগের অন্তঃকরণে সতত পোষণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই ভাবটুকুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি তক্ষশীলা-প্রাণ চন্দ্রবংশীয় পুরুরাজ জগদ্বিখ্যাত, মহাপ্রতাপশালী, পৃথ্বী-বিজয়ী সেকেন্দর সাহের অন্তরাত্মাকে প্রকম্পিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদিগের এই ভাবটুকু আছে বলিয়াই এখনও আমরা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হই নাই। যখন ঐ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাপিত হইবে, তখনই আমরা অসার, অপদার্থ, সুতরাং অসভ্যজাতীয় জনগণ মধ্যে গণনীয় হইব।

পাঠক মহোদয়গণ, এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আজি ভারতবাসিগণ, বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা যদি জগদীশ্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিতে থাকে, তবে তাহাদিগের অভাব সকল বিদূরিত হইবে, দুঃখ-নিশার অবসান হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি কয়েক মাস যাবৎ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম। এইজন্য এই প্রবন্ধটীর শেষটুকু লিখিতে বিলম্ব হওয়ায় আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়া অপরাধী হইয়াছি। ভরসা করি, নিজগুণে অপরাধটী মার্জ্জনা করিবেন। আমি পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিতে পারিলাম। যদি শরীর ও মন ভাল থাকে, তবে বারান্তরে অন্য একটী প্রবন্ধ আপনাদিগের সমীপে উপস্থিত করিব।

এই প্রবন্ধে যে দোষগুলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান দোষ এইটী যে, প্রস্তুত বিষয় ব্যতীত অবান্তর অনেক কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সে দোষটী আমি

ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছি ; কারণ, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোপলক্ষে উহার তাৎকালিক সুখসমৃদ্ধি ও সভ্যতাদির বিষয় যথাজ্ঞান বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতর উদ্দেশ্য।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বংভুবনমাবিবেশ ;
য ঔষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়নমোনমঃ।

সমাপ্ত।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

# "আমাদের নিবারণ"।

"These are one, through the bond of charity ; their thought is the same, their will is the same, and in love they are all united one to another."

Thomas a' Kempis.

যেদিন নিবারণ রায় প্রভৃতির খালাশের সংবাদ জলপাইগুড়িতে পঁহুছে, সেইদিন সন্ধ্যাকালে তথাকার একটী দশমবর্ষীয় বালিকাকে, তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আলো দিবার আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ততার সহিত নিযুক্ত দেখিয়া, পথের কোন ভদ্রলোক কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কন্যা উৎফুল্ল বদনে উত্তর দেয়, "আমাদের নিবারণ খালাশ পাইয়াছে, তারে খবর আসিয়াছে, আপনি কি জানেন না ?" এই কথা কয়টীতে যে কি আনন্দ, কি প্রেম, কি সহানুভূতি, কি মধুরতা, কি স্বর্গীয় ভাব নিহিত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সহজে অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সরস "আমাদের নিবারণ।" কুমিল্লার অজ্ঞাত কুলশীল নিবারণ সুদূর জলপাইগুড়ির একটী ছোট মেয়ের কাছে "আমাদের নিবারণ" হইয়াছে, ইহা ভাবিলেও প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। কত জায়গার কত ফাঁসীর আসামী হাইকোর্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছে, কৈ কেহ ত কখন কোথাও "আমাদের" হয় নাই। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, হে বঙ্গবাসি, মহাত্মা কর্জ্জনের কৃপায় তোমরা কত উচ্চে উঠিতে সক্ষম হইয়াছ! দুই বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলে, আর আজ কোথায় পঁহুছিয়াছ। এ উন্নতি কি সহজ! সাধারণভাবে থাকিলে বিশ পঁচিশ বৎসরেও তোমাদের হৃদয় এত প্রশস্ততা লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই জন্য কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঠাকুর! সর্ব্বদা দুঃখ বিপদ দিও যাহাতে তোমাকে নিকটে পাই।" কোন ইংরাজ দার্শনিকও বলিয়াছেন "No evolution without suffering"-দুঃখ ক্লেশ ব্যতীত জীবের বিকাশ হয় না। সুখস্বচ্ছন্দতায় অধোগতি, কষ্ট যন্ত্রণায় উন্নতি, ইহা ত আমরা কতবার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পরের কথার দোহাই দিবার দরকার কি ?

সহানুভূতি, সমবেদনা, শিক্ষার জন্যই আমাদের সংসারের স্কুল। স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আমরা গৃহস্থালীর প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করি। তৎপরে, বিষয়কে অধিকাংশ ছাত্র এই নিতকিমাকার জানোঙ্ক পড়িতেই ইহলোক হইতে বেভায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, পরিবার হইতে পল্লীতে, পল্লী হইতে দেশে, দেশ হইতে পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে সমগ্র বিশ্বে আপনাকে ছড়াইয়া যাইতে অত্যল্প সংখ্যক মাত্র সমর্থ হন। ঈশ্বর প্রেমময়, তাঁহার প্রেমের বাঁধনেই এই বিশ্বসংসার

আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম। প্রেম ভিন্ন জগতে কোন স্থায়ী কাজ অসম্ভব, কারণ যেখানে প্রেমের অভাব, সেখানে ঐশীশক্তি নাই, জানিতে হইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষ যেখানে নিজ বলে যত বড় কাণ্ডই করুক না কেন, তাহা তিন দিন বৈ তিষ্ঠিতে পারে না। প্রেমশূন্য হৃদয়ে শুদ্ধ গায়ের জোরে যিনি যে কারখানা খাড়া করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, অতি স্বল্পকালের জন্য তাঁহার সফলতার চাকচিক্যে পৃথিবী মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহা অতি সামান্য কারণে নিশীথ স্বপ্নের ন্যায় আকাশে মিশাইয়া গিয়াছে। ইতিহাস বারম্বার এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে। বেশী দূর যাইতে হইবে না, সেদিনকার নেপোলিয়নের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা ভাবিলেই বেশ বুঝা যায়।

প্রকৃত নিয়ম এরূপ নয় যে, এক লম্ফে কেহ কোন বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, সকলকেই উন্নতি-সোপানের প্রত্যেক ধাপে পদনিক্ষেপ করিয়া ক্রমে শিখরদেশে উঠিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত ভারতের শতকরা ৯৯·৯ জন উল্লিখিত নিম্নতম ছাত্র হইয়াই দিন কাটাইতেছিলেন, পারিবারিক স্বার্থের বাহিরে কাহারও বড় একটা খেয়াল না; পরন্তু এখন যেন একটু দূরদৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রামে আগুন লা[illegible] [illegible]ীর গৃহের প্রতি নজর না রা[illegible] আপনার ঘরখানি রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকিলে কাজ চলে না, বাধ্য হইয়া আপন পর ভুলিয়া অন্যের পর্ণশালাকে নিজের মত বাঁচাইতে উৎসাহ জন্মে, তেমনি, রাজ্যব্যাপী উপদ্রব ও অত্যাচারের সময় সমগ্র দেশবাসীকে নিজ পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। যখন কোন জনমণ্ডলীর হৃদয় ভয়ানক সংকীর্ণতা ব্যাধিতে ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্রতর হইয়া যাদশাপন্ন হয়, তখনই বাহির হইতে তাহাদের সকলের উপর একটা ভীষণ রকমের উৎপীড়ন অত্যাচার আরম্ভ হইয়া সর্ব্বসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, "United we stand, divided we fall"—সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় নাই। জাতীয় সম্বিৎ জাগাইবার জন্য ইহা বিধাতার এক বিচিত্র কৌশল। আজ একজনের প্রতি, কা'ল অপরের প্রতি, এই প্রকারে বহুলোকের উপর ক্রমাগত উপদ্রব হইলেই প্রত্যেকের হৃদয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা জন্মে এবং তজ্জন্য পরস্পরের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; তখন এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সহানুভূতি, সমবেদনা স্বাভাবিক, তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং নির্ব্বিশেষে সবাই আত্মীয়তাসূত্রে নিবদ্ধ হয়।

সকল নিয়মেরই ব্যভিচার আছে। উল্লিখিত রূপ অবস্থাতেও ক্ষুদ্র এক দল সম্পন্ন লোক ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণের দুঃখ ক্লেশে উদাসীন থাকে, যতক্ষণ তাহাদের গায়ে কোন রূপ আঁচড় লাগিবার আশঙ্কা না হয়। অনুন্নত বা অবনত সমাজের স্বার্থসঙ্কুচিত হীনমতি নীচাশয় সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ চিরকালই দুঃখী-বিপন্নের প্রতি বেখেয়াল। নিরীহ নিবারণের প্রাণ দণ্ডের সংবাদ রাখিলেও তাহার জন্য এক বিন্দুও দুঃখিত নয়, জামালপুরের অসহায়া কুলকামিনীগণের প্রতি পাশব অত্যাচারের খবর তাহাদের কাণে উঠিলেও তাহাতে অবিচলিত-চিত্ত, পঞ্জাবের বিভ্রাটেও তাহাদের মনে কোনরূপ ছাপ পড়ে নাই—দুনিয়া ডুবিলে তাহাদের একহাঁটু জল।

তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কিসে নিজেরা আরামে থাকিবে, এবং সুবিধামত রাজপুরুষগণের নিকট হইতে দু'টা "সাবাস্" "বাহাবা" লাভ করতঃ দুর্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। এই শ্রেণীর জীবগণ চিরকাল শক্তের ভক্ত, কারণ নিজেদের শরীর মন একেবারে ফাঁপা, শোলার মত হাল্কা, সর্ব্বদা ফর্ ফর্ করিয়া হাওয়ায় উড়িতেছে, যেন ফিন্‌ফিনে পাতলা কাগজে গঠিত। যে শক্তি যখন ছলে বলে কৌশলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, ন্যায্যান্যায্য বিচার না করিয়া কেবলমাত্র ভয়ে ও মতলবে নিরন্তর শত মুখে তাহার যশোগান ও জয়ঘোষণা ইহাদের মজ্জাগত অভ্যাস, সেই শক্তি তাহাদিগকে যখন যে ভাবে নাচায়, তখন সেই ভাবে তালে তালে নৃত্য করিয়া ইহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে; আর যদি দৈবাৎ কোনরূপ ভুলভ্রান্তির জন্য প্রভু পদাঘাত করেন, অমনি অতি অপ্রতিভভাবে গভীর সমবেদনা সহকারে "এ অধমকে লাথি মারিতে হুজুরের পায়ে হয়ত কত ব্যথা লাগিয়াছে!"—বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করে না। ইহারা যে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান মানবাখ্য জীব, এ কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত! কৌশলে ধৃত অরণ্যের দুর্দ্ধর্ষ ভল্লুক মানুষের আয়ত্তাধীনে তাহার বন্য স্বাধীনতা-বীর্য্য-পরাক্রম হারাইয়া অধিকারীর ইঙ্গিতে লোকের বাড়ী বাড়ী যেমন নাচিয়া বেড়ায়, এই নরাকার জম্বুবানগণের অভিনয়ও ঠিক তদ্রূপ—যে শক্তির দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে জড়সড় হইয়া স্বাতন্ত্র্যভ্রষ্ট, তৎকর্ত্তৃক ইহারা যে সময়ে যেমন আদিষ্ট হয়, সে সময়ে তেমনি ভাবে চলে ফিরে; প্রভু যেদিকে নাকের দড়ি ধরিয়া টানেন, সুড়্ সুড়্ করিয়া সেই দিকে যায়, এবং যখন যেখানে লাঠির তাড়নায় "নাচ্ রে জঙ্গল্‌কে ভাল্!"—বলিয়া যেরূপে নাচাইতে থাকেন, তখন সেখানে সেইরূপে মৃদুমন্দ ঘোঁঘোঁরব সহকারে হাত পা খেলাইয়া নাচ্ দেখায়। এবম্প্রকার ভাঁড়ামীর উপযোগিতা সংসারের হাস্য কৌতুক আমোদ ভিন্ন অন্যদিকে নাই।

কোন মহাপ্রাণ পূজ্যপাদ ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

"Wealth dulls the intellect, paralyses the will, deadens the heart. * * * Has wealth the power or inclination to study the problems of human happiness? * * * Wealth is self-centred, it has a world of its own and does not recognise this wide world of ours."—

ধনের দ্বারা মানুষের বুদ্ধি ভয়ানক স্থূল হয়, ইচ্ছাশক্তি একেবারে বল হারায়, হৃদ্‌বৃত্তিসমূহ মৃতকল্প হইয়া পড়ে। মানবসমাজের সুখ স্বচ্ছন্দতা কি কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, একথা ভাবিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি ধনীর আদৌ নাই। ধনী ঘোর স্বার্থপর, সে নিজের জন্য মনের মত একটা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বাস করতঃ এক প্রকার বিকৃত পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করে, সুতরাং আমাদের এই বিশাল সংসারের কোনই সংবাদ রাখে না। মূল কথা, ধনের সেবা করিতে করিতে মানুষ ঈশ্বর হইতে বহুদূরে গিয়া পড়ে, কাজেই প্রেমের পথের ঠিক বিপরীত দিকে চলিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় মাত্র, প্রকৃত মানবজীবনের কোনই ধার ধারে না। যাহা হউক, এই সকল লোককে বাদ দিয়া কাজ করিলে আমাদের কোনই ক্ষতি নাই, সমাজে ধনাঢ্য কয় জন? ইহাদের যাহাতে সুমতি হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেই

উঁহাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্য করা হইল। জন্মান্তরে যখন উহারা আবার দীন দুঃখীর দলে পড়িবে, তখন আপনিই আক্কেল পাইবে, কাহাকেও উপদেশ দিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতি-ক্রিয়া আছে, ইহা প্রকৃতির অতি কঠোর নিয়ম,—কখন নৌকার উপর গাড়ী, কখন গাড়ীর উপর নৌকা,—এই ভাবে আবহমান-কাল সংসারচক্র ঘুরিতেছে।

আমাদের এখন আসল কথা এই যে, আসমুদ্রহিমাচল, যেখানে যে কেহ যখন কোন প্রকার দুঃখ বিপদে পড়িবেন, তাঁহাকে যেন আমরা জলপাইগুড়ির ঐ বালিকাটীর মত প্রাণ খুলিয়া "আমাদের" বলিয়া কোলে টানিতে সক্ষম হই, প্রেমময়ী বিশ্বজননী আমাদিগকে সেইরূপ শক্তি ও প্রেম প্রদান করতঃ এই ঘোর দুর্দ্দিনে কৃতার্থ করুন।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

# রাজা সুবোধ নারায়ণের ভগ্ন বাটী।

রাজা সুবোধ নারায়ণের নাম ও কীর্ত্তি এক সময়ে শ্রীহট্টবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার সুপরিচিত থাকিলেও, আজ কাল কাল-মাহাত্ম্যে সেই পবিত্রচরিত রাজার নাম যেমন এদেশবাসীর স্মৃতির অন্তরালে পতিত, তেমনি রাজার ভগ্নবাটীর অস্তিত্ব ও তাহার বহুমূল্য পদার্থগুলি কৃষক ও মৃত্তিকার কবলে নিপতিত হইয়া দিনে দিনে অনন্ত বসুধা বক্ষে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

১৩০৭ সালের ৭ম সংখ্যা নব্যভারতে "রাজা সুবোধ নারায়ণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহোদয় সাধ্যসম্ভব সত্য নির্ণয়ে ত্রুটি করেন নাই। পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন ঐ প্রবন্ধটী পুনর্ব্বার পাঠ করেন। তাহাতে রাজবাটীর অবস্থিতি স্থান, রাজার হিন্দুত্বের বিকাশ ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর অশ্রুময় চিত্র দেখিতে পাইবেন। সেই মধ্যাহ্ন হইতে রাজবাটী রাজাশূন্য—শ্রীশূন্য হইয়া আরণ্য জন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট মৌলবীবাজার সব্‌ডিবি-সনের অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে সুবোধ নারায়ণ রাজার ভগ্ন বাটী আজ বৃক্ষ লতাদি সমাকীর্ণ হইয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্রীতে বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড বাড়ী, রাজা নাই, অট্টালিকা নাই, বিহার ক্ষেত্র নাই, নশ্বর পদার্থ সব নশ্বরের পথে চলিয়া গিয়াছে; আছে প্রকৃতির বক্ষজাত স্বাভাবিক তরুগুল্ম লতাদি। পরস্পর পরস্পরে আলিঙ্গন দিয়া বায়ুতে হেলিতেছে, রাজার মৃত্যুকালীন তপ্ত নিশ্বাস আজও যেন বৃক্ষলতাদিতে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া রাজার দুঃখ কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে।

বর্ত্তমানে উহার প্রাশস্ত্য ভিন্ন রাজবাটী বলিয়া মনে করিবার কোন কিছু প্রায় নাই, এই প্রশস্ত বাড়ীর অনেকাংশ কৃষকদের—চাষ বাসের জমিতে পরিণত হইয়াছে, মধ্যাংশ অগাধ জঙ্গলে পূর্ণ। লতা গুল্মগুলিকে একে একে সরাইয়া যখন ভগ্ন বাটীতে প্রবেশ করি, তখন রাজার পবিত্রতা, হিন্দুত্বে আস্থা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া এই পবিত্র মাটীতে পা ফেলিতে

যেন বুক দম্‌কিয়া গেল; কত অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—আজ যেখানে লতা গজাইয়াছে, গাছ গজাইয়াছে, শৃগালাদি অবাধে চরিতেছে, একদিন এই পবিত্র ভূমিতে বসিয়া বৈদিকগণ বেদোচ্চারণে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেন, হোম হইত দেবোপাসনা হইত, রাজা কতই আনন্দে বিহার করিতেন, কত দীন দুঃখীর আশ্রয় স্থান ছিল, আজ ইহা জনশূন্য নিস্তব্ধ।

বাটীখানি পূর্ব্বমুখী। উহার তিন দিকে গড়খাইয়ের ন্যায় প্রশস্ত ও গভীর দুইটী খাল ছিল, পনর ষোল বৎসর হইল, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট কৃষকদের যত্নে ঐ সকল খাল উৎকৃষ্ট দো-আশ জমিতে পরিণত হইয়াছে। কৃষক ও মিরাসদারগণের অর্থ-লিপ্সুতায় রাজ বাড়ীর কোন অংশই উদ্ভিদ শূন্য থাকিতে পারে নাই। ঠিক মধ্য স্থান—যেখানে বসবাসের গৃহাদি ছিল, সেই স্থানটী ছোন ও অল্প কয়েকটী বড় বড় বৃক্ষে আচ্ছাদিত। গৃহ গুলির আংশিক উন্নত ভিটা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ী খানিতে ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের পরিমাণ অতি অল্প ছিল বলিয়াই বোধ হয়। রাজ বাড়ীর ভগ্নাবশেষে যত অধিক ইষ্টক দেখিবার কল্পনা করা যায়, তদ্ পরিমাণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে অল্প কয়েক খণ্ড ইষ্টক দেখিতে পাইলেও উহা আধুনিক কালের। এবং পরিমাণের অল্পতায় উহা রাজ প্রাসাদাবলীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া কোন রূপেই সিদ্ধান্ত হইবার নহে। রাজা দরিদ্র-জনোচিত কুঁড়ে ঘরে বাস করিতেন, এ কথা আমাদের নূতন দলের মধ্যে অনেকেরই আশ্চর্য্য ঠেকিতে পারে, কিন্তু রাজার সাত্ত্বিকতার কথা ভাবিলে সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে।

আমি কর্ষণে ব্যস্ত কৃষকদের সহিত আলাপ ও প্রশ্ন করিতে করিতে বাড়ীখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, তাহারা কেহ আমাকে লোক মুখে শ্রুত রাজার কীর্ত্তি-কাহিনী, কেহ রাজ ভ্রাতার পলায়ন, কেহ রাজ-কন্যা "বরদা'র * কথা বলিতে বলিতে যেন সুবোধ নারায়ণকে সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া তাঁহার রাজ্যশাসন-স্তরগুলি আমার চক্ষে তুলিয়া দিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, রাজ বাড়ীতে "ন গণ্ডা" পুকুর ছিল। পাঁচ সাতটী গর্ত্তাকারে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে আজও বাড়ীর সীমানাদির পরিচয় করিতে পারা যায়। কিন্তু যেরূপ দ্রুত গতিতে ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, হয়ত অল্প দিন মধ্যেই শ্রীহট্টের আদি রাজবাটী শস্যভূমি ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় রাখিতে পারিবে না।

কৃষকদের মুখে সরল ভাবের কথা ও গল্প শুনিয়া প্রাণে বড় আরাম বোধ হইতেছিল, আমরা নগরে বাস করিয়া পল্লী জীবনের সরলতা ও উদারতা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাই সরলভাবে গল্প করিতে, মুক্ত ভাবে কথা কহিতে জানি না, পারি না। তাহারা নগরের তীব্র হাওয়ার বাহিরে থাকিয়া পল্লীর সরলতা, স্নেহ-শীলতা আজও জীবিত রাখিয়াছে। বহুদিন পরে পল্লীর এই মিষ্ট রস আস্বাদন করিয়া প্রাণে প্রীতির উৎস উঠিল। পুরাতন ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে পুরাতন কত কথা অলক্ষিতে মনে জাগিল।

* বরদার রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া পাঠান-সেনাপতি খাঁজা ওস্‌মান খাঁ রাজবাড়ী আক্রমণ করেন, রাজা আক্রমণ সংবাদ পাইয়া জাতিনাশ ভয়ে প্রাণত্যাগ করিলে কন্যাও স্বেচ্ছায় পিতৃপথ অনুসরণ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে. এই বরদা নামের 'বলদা' সাগর নামে দীঘী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক।

আমি আগ্রহে কৃষকদের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম; গল্পে গল্পে আমার চিরবাঞ্ছিত একটী তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি—একজন পলিত-কেশ কৃষক রাজার গল্প চ্ছলে রাজবাড়ীর একখানা ভগ্ন "চন্দনপাটা" পাথরের কথা বলে। চন্দনপাটার তত্ত্ব কেহ জানিত না, এত দীর্ঘকাল পরে সাত্ত্বিকতার আধার রাজার একটা পূজার উপকরণ স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা ঘটিল ভাবিয়া, আমি আনন্দে অধীর না হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমি আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় ঐ পাটাখানির প্রাপ্তি স্থানের খবর লইয়া রাজবাড়ীর এক মাইল পূর্ব্বস্থ 'পাঠান টোলা' গ্রামে আছকর মহাম্মদের বাড়ী উপস্থিত হই। আছকর মহাম্মদও খুব প্রাচীন মানুষ, বৃদ্ধত্বে চক্ষু কর্ণ আপন আপন কর্য্যে প্রায় অক্ষম হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার নিকটে আরও কয়েকটী তত্ত্ব ও চন্দনপাটার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার বাড়ীর পাছে একটী 'বরওী' গোছের জাগায় পতিত পবিত্র পাথরখানি আমাকে দেখাইয়া দেয়। রাজা সুবোধ নারায়ণ,দেবতা-গৃহে,মধ্যাহ্নে পূজা কালে, মুসলমান সেনাপতির আগমনে, জাতিনাশ ভয়ে হীরার আঙটী মুখে দিয়া মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথার সাক্ষী আর কেহ নাই, আছে ঐ দেব গৃহের চন্দনপাটা। রাজার অন্তিম শ্বাস এই দেখিয়াছে, আর কেহ দেখে নাই। রাজা দেবগৃহের কবাট দিয়া আপনার সত্ত্বভাব পূর্ণ জীবন দেবতার চরণ চাহিয়া চাহিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ঐ পাথর খানা সে সত্যের সাক্ষী। পাথর খানি পাথর নহে, শ্রীহট্ট জিলার কুলীন ব্রাহ্মণগণের পূজা-পীঠ, তাই চন্দনপাটা খানি বারম্বার দেখিয়াও হস্তামর্দ্দন করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই।

ঐ পাথর খানি পূর্ণ পাটা নহে, এক চতুর্থাংশ মাত্র, দীর্ঘে দেড় হাত, প্রস্থে তিন পোয়া হাত, উচ্চতা এক বিঘত। মধ্যে মসৃণ দুইটী গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ গর্ত্তদ্বয়ে চন্দন রাখা হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ চতুর্থাংশেরই ওজন দেখিলে, অবাক্ হইতে হয়, মৃত্তিকায় প্রোথিত হওয়ার ভয়ে, একটী গাছের আশ্রয়ে ঠেস্ দিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিয়া, চেষ্টা করিলে, আমরা চারিজন যুবক কষ্টে উহার দিক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গাছের নিকটে নিতে পারিয়াছিলাম। ইহার অপর একাংশ অন্য এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এখন সংবাদ পাইতেছি। রাজবাড়ী দর্শনেচ্ছু কোনও ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কৌতূহলার্থ স-বুট পায়ে দন্দনপাটার উপর দাঁড়াইলে পাথরখানি সোজাসোজি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া লোক-মুখে প্রবাদ আছে। বাড়ীর সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। আর এই শ্মশান দৃশ্য বলিয়া অন্যকে অনুভব করাইতেও লেখকের তত যোগ্যতা নাই। এখন রাজবাড়ীর দীঘিটার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

দীঘী খুব প্রকাণ্ড, তবে এই পরগণায় এমনতর দীঘী আরও দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ তিন শত হাত প্রস্থ ইহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু অল্প হইবে। জল পরিষ্কার কিন্তু জলজ তৃণাদিতে আবৃত। ইহার দক্ষিণ তীরে রাজনগর ডাকঘর এবং ক্ষুদ্র একটী পুলিস আছে। ঐখানের কর্ম্মচারিগণ এই দীঘীর কতকাংশ সযত্নে পরিষ্কার রাখিয়া উহার জল

পান করিয়া থাকেন। গভীরতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, হয়ত কালে কর্ষণোপযোগী ভূমিতে পরিণত হইবে, রাজার স্মৃতি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইবে। পুকুরের ঘাট পাথরে বাঁধান; দীর্ঘ ১৮ হাত, উহাতে ১৩টী সিঁড়ি ছিল বলিয়া বোধ হয়, তিনটী স্পষ্ট রূপে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলির পূর্ণ অংশ দেখিতে বা পরিচয় করিতে পারা যায় না। ঘাটের পাথরগুলি, সাধারণত আমরা ঘাটে যে জাতীয় পাথরের ব্যবহার করি, সেরূপ নহে, এগুলি প্রাশস্ত্য ও উচ্চতায় খুব বড় এবং মসৃণ ও শক্ত।

ঘাটটী জঙ্গলে আবৃত-প্রায় হইয়াছিল, একজন নীচ জাতীয় লোকের চেষ্টায় আজ কাল লুপ্ত-প্রায় ঘাটটী স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের সুখ দুঃখকাহিনী শিরে ধরিয়া পাথরগুলি শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে, এগুলিও ক্রমে কালের অনন্ত গর্ভে আশ্রয় লইবে। নশ্বর পদার্থের কোনও চিহ্ন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না—এগুলিও থাকিবে না জগৎ ধ্বংসশীল, জগতের পদার্থ যে পথে ... বদনে ... পথে গিয়াছেন,—রাজত্ব গিয়াছে, তাঁর স্নেহ-রচিত পুকুর ঘাট এগুলিও সে পথে যাইবে; থাকিবে কেবল মানব মনে প্রতিধ্বনি করিতে—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।'

শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

## বঙ্গভূমি

ধরার সৌন্দর্য্য রাশি করি আহরণ
সৃজিলা এ বঙ্গভূমি বিধাতা আপনি,
ভূস্বর্গ ভারতভূমি
তার পুণ্যভূমি তুমি,
বঙ্গভূমি ধরাখ্যাত ঐশ্বর্য্যের খনি,
প্রকৃত রাজ্যের তুমি অনন্তরূপিনী।

২

উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব বিরাট গম্ভীর
দাঁড়াইয়া আছে যোগী তুলি শত শির,
গাহিয়া অনন্ত গীতি
চলিয়াছে নিতি নিতি
চুম্বিয়া দক্ষিণ তট, অর্ঘ্য সুযতনে,
নিয়ত মনের সাধে ঢালিছে চরণে।

৩

ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা দুই পবিত্র সলিলা,
প্রাচীন আর্য্যের কীর্ত্তি মর্ম্মে জাগাইয়া,
বুক ভরা জল লয়ে,
কুল কুল কুল গেয়ে,
ছুটেছে বারিধি পানে আপনার মনে,
শত নদ বহে যায় বাঙ্গালার বনে।

৪

বাঙ্গালার ধন ধান্য বিদিত জগতে,
ভারতের শস্যাগার বাঙ্গালার ক্ষেতে,
অনন্ত বাণিজ্য-তরি,
শস্যে গর্ভ পূর্ণ করি,
নিয়ত ছুটেছে হায় দূর দেশান্তরে,
বাঙ্গালী সন্তান শুধু অনাহারে মরে!

৫

দাসত্বের ঘুম ঘোরে যদিও এ দেশ,
অন্তস্তেজ এখনও হয় নাই শেষ;
প্রগাঢ় তিমিরে যবে
আবরিত ছিল সবে,
বিমল জ্ঞানের বিভা উজলিয়া শিক্ষা,
তখনও বাঙ্গালায় দিতেছিল দেখা।

৬

অজ্ঞান আঁধারে যবে ছিল আবরিত,
অত্যাচারে পূর্ণ যবে সমগ্র ভারত,
তখনও প্রাণ ভরে,
বসি বাঙ্গালার কোলে
গেয়েছিল "জয়দেব" সুমধুর গান,
মুগ্ধ হয়ে কল্লোলিনী বহিত উজান।

৭

শুধু অত্যাচা[illegible] উলঙ্গ কৃপাণ করে,
ঘুরিত ফিরিত নাচিত [illegible]তে
মৃত্যু কিম্বা মুসলমান,
ছিল যবে পরিত্রাণ,
প্রেম ভক্তি মহাশক্তি বহাতে উজান,
বাঙ্গালা কাননে ছিল গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ।

৮

প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিভা যবে এ ভারতে
এসেছিল স্বার্থ মন্ত্র করিতে প্রচার,
ভারতের অস্থি যবে
ভগ্ন চূর্ণ হবে হবে,
রাজপুত যায় যায়, মোগলেরো শেস,
রামমোহন গেয়েছিল ধরমের যশ।

৯

সরল যশোর পতি "প্রতাপ আদিত্য"
বঙ্গে ধরে ধন্য আজ বঙ্গ ইতিহাস,
অতুল বীরত্ব যার,
নহে কভু ভুলিবার,
অগণ্য ইস্লাম সৈন্য ধ্বংস মুখে দিল,
যবন বিজয়-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল।

১০

বাঙ্গালী সাহসী কিনা নিদর্শন তার,
শোণিত অক্ষরে লেখা ইচ্ছামতী তীর।
প্রবল প্রতাপে যার,
দিল্লী ছিল স্তব্ধাকার,
যার জলে জয় আশা দিয়ে বিসর্জ্জন
পলাইল যবনেরা লইয়া জীবন।

১১

সেই শেষ বীররক্ত প্রতাপের সনে,
ইছামতী স্বচ্ছ জলে পড়িল খসিয়া,
সেই শেষ স্বাধীনতা
হারাইল বঙ্গমাতা,
বাঙ্গালার প্রাণ হতে স্বাধীন চীৎকার
লুপ্ত হয়ে গেল হায়! সেই শেষবার।

১২

স্বাধীনতা হারা হয়ে নিয়ত ক্রন্দন,
বাঙ্গালার গৃহে গৃহে করিল প্রবেশ,
বলহীন বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন,
বিলাসে বাঙ্গালী চিত্ত হইল মগন,
অদৃষ্টের ভীরু নাম কে করে মোচন!

১৩

বীরপ্রসূ ইতালীর অবস্থা দেখিলে,
হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত কার না উথলে,
জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রীতি,
ধরিয়া জীবন্ত মূর্ত্তি,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মাঝে তুলেছিল ত্রাস,
সে জাতিও হয়েছিল বিলাসের দাস।

১৪

কিন্তু সেও করিয়াছে কলঙ্ক ক্ষালন,
স্বাধীন কিরীট পুনঃ লইয়াছে বলে,
আমাদের স্বাধীনতা,
নহে কভু স্বপ্নকথা,
"বন্দে মাতরম্" গানে মাতিয়া বাঙ্গালী,
অবশ্য ফেলিবে তবে কলঙ্ক প্রক্ষালি।

১৫

অথবা
আঁধারের যবনিকা করি উন্মোচন,
দেখিছে সে বলবীর্য্য কত আপনার,
বলিতে সে চির দিন
বাঙ্গালী গৌরবহীন,

দিবে না ধরণী ধামে, ভেদিয়া আঁধার,
বাঙ্গালার সুখসূর্য্য উদিছে আবার।

১৬

বিলাসী ইতালি যদি মোহ নিদ্রা ছাড়ি,
ম্যাট্‌সিনির বজ্রনাদে মেলিল নয়ন,
বিলাসী বাঙ্গালী তবে
কেন ঘুম ঘোরে রবে,
আট কোটি শুনে যদি "সুরেন্দ্রের বাণী"
অবশ্য উঠিবে বলি "বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।

১৭

বঙ্গবাসি! ভুলিও না আপন সম্মান,
ভাবিও না বঙ্গপুত্র অতি কুলাঙ্গার,
জাতীয় গৌরবে মাতি,
প্রকাশি বিমল ভাতি,
ভুলিওনা ক্ষুদ্রচেতা ফিরিঙ্গির গালি,
আপনার দুর্ব্বলতা যাও সবে ভুলি।

১৮

এক দিন দুই দিন হাসি খেলা নয়,
শুভ দিন বাঙ্গালার,
বহু দূর নহে আর,
হারাওনা এ সুযোগ আমোদে মজিয়া,
থাকিওনা নিরাশার কুমন্ত্রে ডুবিয়া।

(১৯)

কিছুকাল দলাদলি হয়ে বিস্মরণ,
সমবেত বল সবে কর উপার্জ্জন।
এক দিন তপ করে,
ভগীরথ নাহি পারে,
আনিতে এ ভাগীরথী পবিত্র-সলিলা,
একদিনে হয় নাই জাপের এ খেলা।

(২০)

আপনার পায়ে যদি ছাড়াতে বাসনা,
যবন ব্রাহ্মণে মিলে, কর কোলাকোলি,
ভুলি শত ভেদ-জ্ঞান,
কর সবে প্রাণ দান,
তবে সে জাতীয় ভাতি মেলিবে নয়ন,
আনন্দে মিলিত হও সকল সন্তান।

(২১)

মাগো! কেন আজি তব বিষণ্ণ বদন,
কেন আজি হেন দশা অয়ি বিষাদিনি,
একি এ ভীষণ ভাব,
কোথা তব সে প্রভাব,
কেন আজি হেরি হায় ভীম দরশন,
নিদাঘে শুকায়ে তব গিয়াছে জীবনী!

২২

উঠ উঠ জন্মভূমি উঠ একবার,
বিষণ্ণ বদনে মাতা থেকো নাকো আর,
আট কোটি পুত্র যার,
কিসের অভাব তার,
কি দুঃখে কাঁদিছ তুমি বল না সবায়?
তোমার এ দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়॥

২৩

উঠ মাতঃ! চেয়ে দেখ মেলিয়া নয়ন,
আজি কেন তোর তরে কাঁদিছে পরাণ?
কত কাল বল হায়,
গাঢ়তম তমিস্রায়,
হৃদয়বিহীন হয়ে থাকিবে এমন,
কত কাল অন্ধ রবে থাকিতে নয়ন।

২৪

বিগলিত অশ্রুধারা কর সংবরণ,
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ,
চারি দিকে শুন সব,
আনন্দ-উৎসব রব,
তুমি শুধু একা আছ ধূলি-ধূসরিতা,
হে আমার জন্মভূমি, পতিতা, তাপিতা।

২৫

তাইত ধিক্কার করে জগত মাঝার
মা যাহারে ছেড়ে গেছে মিছে গর্ব্ব তার,
তাই ছিন্ন হীন বল,
তোমার সন্তান দল
নীরব নিষ্পন্দ সদা নাই বীর্য্যজ্ঞান,
সকলেই অন্ধ হায় থাকিতে নয়ন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

# শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির। (৪)

ইহা পূর্ব্ব মীমাংসার কথা। উত্তর মীমাংসায় বা উপনিষদে (অর্থাৎ বেদের অন্তর্ভাগে) ঈশ্বরোপাসনার বিবরণ পূর্ব্বমীমাংসার মত প্রতিমা পূজা নিরাকরণ পুরঃসর প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে, পূর্ব্ব মীমাংসায় মন্ত্রময় দেবতা, তাহাও আবার নানা প্রকার; উত্তর মীমাংসায় মন্ত্র ভিন্ন সর্ব্বব্যাপক পাদপাণ্যাদি রহিত, তথাপি কার্য্য-করণ-নিপুণ নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রকটিত হয়। কালক্রমে, বোধ হয়, মতদ্বয়ের একতা-প্রতিপাদক জ্যামিতি শাস্ত্রানুগত ওঙ্কার মন্ত্রানুকারী জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি ভাস্কর বিদ্যার শৈশবাবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ওঁ মূর্ত্তি নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণ বিরাট-মূর্ত্তির পরিচায়ক কর চরণ বিহীন হইয়াছেন। ওঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তির সংগঠন হইয়াছে। ইহা দ্বারা উপনিষদের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরমাত্মা, আত্মা বা জীবন এবং মায়া অর্থাৎ ব্রহ্মচিদাভাস ও প্রকৃতির চিত্র মহর্ষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপে সম্পূর্ণ অনুমেয়। প্রতিমা যে বেদানুমোদিত নয়, ইহা নয়। ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রগুলিতেও আকৃতির বর্ণনা আছে। মাত্র বাহ্যজগতে প্রকাশিত হয় নাই। কর্ম্মকাণ্ডে পৃথিবী প্রভৃতিকে মন্ত্র দ্বারা অব্যয়াত্মক দেবতারূপে বর্ণনা করায় ধরা আদি দেবতাগণের প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির বাহিরে যে সুন্দর আকৃতি দেখা যায়, তাহা পশ্চাৎ কল্পিত। তন্মধ্যে যে দারুময় মূর্ত্তি আছেন, তিনি এ প্রকার নহেন; কেবল কর-চরণ বিহীন দারু মাত্র এবং শিল্প-বিদ্যার প্রথমাবস্থা না হইলে এরূপ অসম্পূর্ণ যন্ত্রানুকারী প্রতিমা হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ভারতের প্রাচীন পিঠগুলিতে মণিময় মূর্ত্তিগুলির এইরূপ আকার। সেই হেতু মহর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডাত্মক নব ভিত্তিতে এই মূর্ত্তিকে স্থাপন করিয়াছেন। নচেৎ উক্ত মূর্ত্তি আগম যুগের ব্যক্তি, অনন্তর পৌরাণিক যুগের অধিবাসী, তৎপরে শঙ্কর প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়দিগের আদর নির্ব্বিবাদে প্রাপ্ত হইত না। তবে এক্ষেত্র অতি প্রাচীন, বেদমূলক এবং হিন্দুদিগের দ্বারা স্থাপিত, কদাপি বৌদ্ধদিগের দ্বারা স্থাপিত নহে।

আমরা পৌরাণিক ও বৈদিক প্রমাণ দ্বারা, পুরী-মন্দিরের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিলাম। কিন্তু পুরাণ সমূহের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নহেন, "নানা মুনীনাম্ মতয়ো বিভিন্নঃ"। কিন্তু যাহাহউক, পুরাণে অতিরঞ্জন লক্ষিত হইলেও তাহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্বও নিহিত আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মনু, মহাভারত আদিতে উৎকলের নাম লিখিত আছে। মহাভারতের সময়, দত্ত সাহেবের মতে, খ্রীঃ পূঃ ১২৫০ অব্দ বলিয়া কল্পিত হয়, কিন্তু অনেক পণ্ডিতের ইহাতে ঐক্যমত দৃষ্টিগোচর হয় না। "A comprehensive History of the Religion of the Hindus" গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত

ধীরেন্দ্রনাথ পালের "Life and Teachings of Sri Krishna" গ্রন্থে প্রকাশ আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর অধিক নহেন। শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত দেবী কহেন,"তিনি শ্রীকৃষ্ণের খ্রীঃ পূঃ একত্রিংশ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভবলীলা সাঙ্গ করিবার প্রমাণ পাইয়াছেন!" এইস্থানেই দেখুন, ১২৫০, ১৬০০ এবং ৩১০০, এই তিন সময়ের মধ্যে কত তারতম্য। এইরূপ অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধার করিয়া, বৈষম্য দেখান নিষ্প্রয়োজন। তজ্জন্য আমরা নিজেদের কোনও ব্যক্তিগত মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী নহি, কিন্তু পুরাণকে একেবারে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, মহাভারত ও ব্যাস বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ব, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং উৎকল প্রদেশের নাম মহাভারতে লিখিত থাকাতে এবং মন্দির উক্ত সরোবরের সমসাময়িক হওয়াতে, মহাভারতের রচনা সময়, মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হওয়া অনুমান করা যায় (২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তজ্জন্য মন্দির বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বের, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অবশ্য বর্ত্তমান মন্দির, সেই বৌদ্ধপূর্ব্ব মন্দির নহে। বহু পরিবর্ত্তন পরে মন্দির বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত পরিবর্ত্তনের বিষয় যথাস্থানে প্রবন্ধে লেখা যাইবে। মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বে, সাধারণ হিন্দুমতানুযায়ী, অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা ব্যাসদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা পুরাণ সকল ব্যাসদেব রচিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। উপস্থিত প্রবন্ধে সে সকল মত লইয়া পর্য্যালোচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের মতে "রামায় স্বাহা" "রাবণায় স্বাহা" সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মতই হউক বা আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতই হউক, যে কোনও দিক দিয়া দেখিলে, শ্রীক্ষেত্রের প্রাচীনতা অক্ষুণ্ণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। মহাভারত হইতে সর্ব্বশেষ পুরাণ ভাগবত পর্য্যন্ত, প্রত্যেক পুরাণে এবং তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে এবং মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-প্রচলিত স্মৃতি সকলে পুরুষোত্তমের নাম ও মাহাত্ম্য উল্লেখ থাকায়, ইহা প্রাচীন ও ভারতীয় সমস্ত হিন্দুসমূহের পবিত্র স্থান। ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি দ্বারা স্থির করা গেল।

আধুনিক উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস স্বরূপ "মাদলা পঞ্জিকা"য় কি আছে, তাহা বিচার করা যাউক। এই পঞ্জিকা, লম্বা লম্বা ভাবে তালপত্রে লেখা হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায়, ইহার নাম "মাদলা পঞ্জিকা" হইয়াছে। ইহাতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের এবং উড়িষ্যার নরপতিদিগের ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, কাশ্মীরবংশানুরচিত রাজতরঙ্গিণী নামধেয় সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত এতাদৃশ যথারীতিতে লিখিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থ ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। ভারতের, পুরাণ ব্যতীত, প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ না থাকায়, অতিরঞ্জিত অংশ বাদ দিলে, পুরাণ ভারতীয় ইতিহাস বলিয়া নিশ্চয় স্বীকৃত হইবে। মাদলা-পঞ্জিকা পুরাণকে অবলম্বন করিয়া কতকদূর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে; হইবারই কথা। কারণ, এতদ্ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনের একান্ত অভাব। মন্দিরকে লইয়াই "মাদলা পঞ্জিকা"র সৃষ্টি। তজ্জন্য যে সকল রাজাদিগের অধীনে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ছিল, তাঁহাদিগের চরিত

মাদলা পঞ্জিকায় লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, ইহা মন্দিরের সমকালীন। সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যযাতির সময় হইতে যথারীতিতে লিখিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব; কারণ, বোধ হয়, চতুর্থ শতাব্দীতে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা যযাতি হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই রাজা অত্যন্ত বিক্রমশালী ও সুপণ্ডিত ছিলেন! ইহাঁকে উড়িষ্যার স্বাধীনতা ও আন্তরিক উন্নতিসমূহের বিধাতা বলিতে হইবে। যে সময়ে লেখা হইবার কথা, তাহাত গেল। সে সময়ের ভাষা ও মাদলা-পঞ্জিকার লিখিত ভাষা, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা যযাতির সময় হইতে লেখা হইয়াছে, স্পষ্ট জানা যায় না; কারণ উভয় ভাষায় অনেক অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তবে গঙ্গাবংশের সময় হইতে ইহা লিখিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা প্রমাণ করিতে গেলে, স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ইহা অমূলক। কারণ গঙ্গাবংশীয়দিগের কার্য্য হইলে, ইহাতে স্ববংশের কীর্ত্তি বর্ণনা ব্যতীত বিজিত রাজাদিগের কীর্ত্তি বর্ণনা করা অসম্ভব। যযাতির সময়ে তৎকাল-প্রচলিত ভাষায় মাদলা পঞ্জিকা লিখিত হইয়াছে বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু শিক্ষার উন্নতি সহকারে ভাষা ক্রমোন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছে। ইহার রীতি এইরূপ প্রচলিত আছে যে, যে সময়ে যে রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, সেই সময়ে এই মাদলা পঞ্জিকা পুনরায় প্রথম হইতে লিখিত হইয়াছে এবং সেই পুস্তক ভবিষ্যতের কার্য্যে আসে। পুরাতনগুলি অকর্ম্মণ্য হয়। তজ্জন্য তাৎকালীন ভাষা কি প্রকারে দেখা যাইবে? অতএব পূর্ব্বকথিত হেতুটী ব্যভিচারিত।

প্রস্তাবিত বিষয় হইতে প্রসঙ্গক্রমে বহুদূর আসা গেল। বোধ হয়, পাঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হইবে। তথাপি এ বিষয় প্রকটভাবে না লিখিলে আকাঙ্ক্ষার পুষ্টি হইত না। যাহা হউক, তল্লিখিত বিষয় দেখা যাউক। উক্ত পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে, ভারতের যে যে রাজা যে সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের অধীনে মন্দির ছিল। এইরূপে অশোক প্রভৃতি যে যে বৌদ্ধরাজা, চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অর্চ্চনাদি হইবার কথা উক্ত পঞ্জিকায় প্রকাশ। যদি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দুরা যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে এ মতের উল্লেখ মাদলা-পঞ্জিকায় হইত না। এই হেতু, পঞ্জিকা, প্রকৃত সত্য ঘটনার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুমেয়। এই সময় হইতে জগন্নাথ বৌদ্ধ অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি এ প্রদেশে শুনা যায়। এই মতে জাতিভেদ না থাকায়, সমস্ত জাতি উক্ত ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নির্ব্বিকল্পভাবে এখানে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধমত অবস্থিতির এই একটী প্রধান হেতু বলিয়া ধরা যায়। এ বিষয়ে আমাকে বেশী কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে না; কারণ শাস্ত্র প্রমাণানুসারে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে এই স্থান স্থাপিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তবে অন্ন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধের প্রমাণসমূহ যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সেই গ্রন্থের নাম এ স্থানে উল্লেখ করা হইল; যথা পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্তক, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, তত্ত্বযামল, বহ্বৃচ পরিশিষ্ট, রুদ্রযামল, চতু-

বর্গ যোগীশ্বর, ব্রহ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য,প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, জাতিভেদ এবং স্পৃষ্ট দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তি একত্রে অন্নমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, দূর দেশে লইয়া গেলেও অন্নমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য লঘু হইবেনা। এই সম্বন্ধীয় প্রমাণসমূহের নিমিত্ত দ্বিতীয় পরিশিষ্ট অনুসন্ধেয়।

পাঠকবর্গ, অন্ন মহাপ্রসাদ, প্রাচীন কাল হইতে, কিম্বা বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রচলিত, তাহা নিজে নিজে বিচার করুন। বর্ত্তমানে এই বিষয় সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণোক্ত ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য হইতে, পাঠকবর্গের কৌতূহলার্থ একটী উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি। তীর্থযাত্রানুরোধে মধ্যপ্রদেশ হইতে বেদবেদান্তপারগ,আচারনিষ্ঠ,ধর্ম্মপরায়ণ, জনৈক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সপরিবারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনোপলক্ষে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি কার্য্য সমূহ অনুষ্ঠান করিয়া, সেখানে ত্রিরাত্র অবস্থান করিলেন। কিন্তু, যজ্ঞশেষান্ন কেবল গৃহস্থাদিগের গ্রহণীয়, তদ্ভিন্ন অন্নান্তর গ্রহণীয় নহে, তবে অত্রত্য মহাপ্রসাদ ভক্ষণীয় নয়, এই কথা চিন্তা করিয়া অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর, সপরিবারে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়াতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আমি এইস্থানে কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, নচেৎ সহসা এতাদৃশ অভাবনীয় ব্যাধি আমার হইত না। তজ্জন্য স্তব সহকারে সতত ভগবানের চিন্তা করাতে, স্বপ্নে আদেশ হইল, তুমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। দেখ, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, এস্থানে যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিতেছ, তাঁহা নিতান্ত অমূলক। এস্থানে সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রসার হয় না, ইহা না বুঝিয়া অন্ন মহাপ্রসাদ ভক্ষণ না করা তোমার গুরুতর অপরাধ। তুমি অন্ন মহাপ্রসাদ, সত্বর ভক্ষণ কর, শীঘ্র রোগমুক্ত হইবে। এই আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র, পরদিন প্রাতঃকালে অন্ন প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, সপরিবারে দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। পাঠকবর্গ এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অন্যান্য বিষয় লেখা হইতে বিরত হইলাম। নির্ব্বাচিত রাজাদিগের সময়ে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পূজাদি কিয়ৎকাল বৌদ্ধমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়, অন্ন মহাপ্রসাদের বিশেষ প্রচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু পুরীমন্দির কদাপি বৌদ্ধমতে প্রতিষ্ঠিত নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধমতে মূর্ত্তিত্রয়ের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘের পূজা হইতেছিল, তাহারই অনুকরণে, উক্ত ধর্ম্মের নাম লোপ করার অভিপ্রায়ে মূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করিয়া, নিজ নিজ মত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, হিন্দুদিগের বদ্ধপরিকর হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং বৌদ্ধদিগের রথযাত্রাকে অনুকরণ করিয়াও ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ হিন্দু মত বৌদ্ধ মতের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতে বিদ্যমান। পরমাত্মা অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মাত্মক সাকার জীব সমষ্টি বিরাট্, ব্যষ্টিজীবাত্মা এবং প্রকৃতি ইহাদের উপাস্য। এ মূর্ত্তিত্রয়ের পরিচায়ক, যথাক্রমে জগন্নাথ, বলভদ্র, ও সুভদ্রা। উক্ত মূর্ত্তিত্রয়ের অনুকরণে বৌদ্ধের মূর্ত্তিত্রয়ের অর্চ্চনা করিয়া থাকিবে,

বলিলে অসঙ্গত হইবে না। রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত আছে এবং মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে যদি রথযাত্রার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে, বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণে রথযাত্রা করিয়া থাকিবে, কারণ, পরকার্য্যসমূহ পূর্ব্বানুগামী হয়। বৌদ্ধমত হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন মত নহে। তাহা হিন্দুধর্ম্মের শাখা বিশেষ, অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত। তাহাদিগের মতের মূলভিত্তি স্বরূপ, ললিতবিস্তর, মহাশম্ভু পুরাণ, এবং অষ্ট সহাস্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সে গুলি, হিন্দুদিগের পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছে। সেই হেতু অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধরাজাদিগের মতে, জগন্নাথ দেবের পূজা অনুষ্ঠিত হইলেও, হিন্দুদিগের পূজা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল না। ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ।

# উদ্দীপনা

জাগরে বঙ্গ! জাগ কলিঙ্গ !!
জাগরে ভারত-ললনা !!
আপন মায়ের উন্নতি তরে
প্রাণপণ কর সাধনা!
এসগো হিন্দু! মোস্‌লেম যত,
বর্জ্জন কর বিদ্বেষ এত;
যতেক ভারতী এসগো ত্বরিত,
করিতে মায়ের বন্দনা !!

২

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা,
বিপুল বিশ্বমোহিনী!
রত্ন-গর্ভা, সর্ব্বে সর্ব্বা
মা মোদের চিত্তহারিণী!
এমন মায়েরে করিয়া তুচ্ছ
বিদেশী ধরণে হইতে উচ্চ,
ধরিবার তরে বিদেশী পুচ্ছ
এখনো বাসনা ত্যজনি!

৩

ভারত-গগন তমিশ্র ভেদি
দেখা দিক্ নবাদিত্য,
আলস্য জড়তা দূরেতে ঠেলিয়া
প্রফুল্ল করুক চিত্ত!
গম্ভীর নাদে বাজুক বিষাণ,
ভ্রাতৃ-প্রেমের মঙ্গল টান্,
পরাণে পরাণে ছুটুক সমান
বিজলীর প্রায় নিত্য!

৪

আজিকার এই মহান যজ্ঞে
ত্রিংশৎ কোটি ভারতী,
স্বদেশের হিত কল্যাণ তরে
দাও গো পূর্ণ আহুতি;
জাতিভেদে কেহ ক'রোনা লজ্জা,
ভারত-জননী সবারি পূজ্যা,
মা নহে দুঃখিনী! মা নহে ত্যজ্যা !!
কর সবে মায়ে প্রণতি!

৫

যে প্রতিজ্ঞা-সূত্রে বাঁধিয়াছ বুক
যতেক ভারত ভক্ত,
রহে যেন ঠিক, অক্ষম, অটুট,
নিরাময়, চির-শক্ত!
হোক্‌না মায়ের বসন-ভূষণ
বিলাস-বর্জ্জিত অতি সাধারণ,

আমরা উহাই করিব গ্রহণ,
প্রদানিব হৃদি-রক্ত !

৬

মায়ের ছিন্ন, জীর্ণ বসন
পরিয়া ঘুচাও লজ্জা,
মায়ের মুক্ত-অঞ্চল কোণে
বিন্যাস কর শয্যা !
জননী যা'দেন সন্তান-করে
স্বর্গীয় জ্যোতি তা'হ'তে ক্ষরে,
দিব্য আশীষ উহারই পরে
জননী মোদের পূজা !

৭

বিদেশী ঝলকে,—বাহ্য ফলকে
লভিয়াছ ঢের্ শিক্ষা !
হে ভারতবাসি ! জাগ্রত হ'য়ে
লহ গো মায়ের দীক্ষা !
সন্তান-নব-বিক্রম হেরি
ভারত-জননী উঠিবে শিহরি,
নয়ন-অশ্রু নয়নে নিবারি
চাহিবে না পর-ভিক্ষা !

৮

বিলাস-ব্যসন কর পরিহার
যতেক ভারত-বন্ধু !
মাতৃ-সেবায় ঢাল মন-প্রাণ,
দেখা দিবে সুখ-ইন্দু !
বিদেশীর পদ-পঙ্কজ তলে
কত পূজা আর দিবে ফুল-জলে ?
একবার সবে জয় ! জয় ! ব'লে
কাঁপাইয়া তোল সিন্ধু !!

৯

বিদেশী ধমক্, সাহেবী চমক্
ত্যজ গো ভারতী তূর্ণ,
স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য-রসে
হৃদি-মন কর পূর্ণ !
লেক্‌চারে 'শুধু' হবেনাকো ফল,
দেখাও সকলে হৃদয়ের বল,
প্রতিজ্ঞা-যাহা করেছ সম্বল
নাহি হয় যেন চূর্ণ !

১০

ভারত-প্রাচীন-গৌরব-স্মৃতি
কারো কি হৃদয়ে জাগে না ?
হে বঙ্গ-ভারতি ! পর-মুখ চেয়ে
ভুলেছ কি সব আপনা ?
এই ভারতের কীর্ত্তি-কাহিনী,
দীপ্ত প্রতিভা, মহিমা-ধ্বনি
মুগ্ধ করেছে বিশাল অবনী,
হে ভারতি ! তাকি জাননা ?

১১

গভীর মন্ত্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে
উঠুক বিজয় বাজনা !
ললিত ছন্দে, বিপুলানন্দে
করগো মায়ের বন্দনা !
সিন্ধু হইতে বঙ্গ সাগর,
কুমারিকা হ'তে হিমগিরি-বর,—
ভারতের এই বিশাল প্রান্তর
কম্পিত ক'রে তোলনা !!

শ্রীনুরর্‌হমান্‌খান্ ইউসফ্‌জী।

# বস্তু ও অবস্তু। (৪)

উপসংহার

পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, (১) অবস্তু অর্থাৎ শক্তি হইতেই বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। শক্তিই মৌলিক, বস্তু তাহার বিকাশ মাত্র।

(২) শক্তি ক্রম-বিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে।

(৩) তাহার পারম্পর্য্য এইরূপ :—

শক্তি
|
মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।
|
বস্তু।

(৪) তড়িৎকেই একমাত্র শক্তি জানা যাইতেছে। তথাকথিত বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার পশ্চাতে যাইতে অক্ষম। তড়িৎ দ্বিবিধ হইলেও এক। এতদুভয় হইতে

(৫) ইথার †। ইথার সর্ব্বব্যাপ্ত। ইহার মধ্যে চক্রাবর্ত্ত সকল অতি বেগে ঘূর্ণিত অর্থাৎ "স্পন্দিত" হইতেছে। ইথার চক্র সকল বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত। * দুই-এর সংযোগে সাম্য। এ নিমিত্ত ইথার সাম্যবস্থ কিন্তু স্থানে স্থানে আবর্ত্তিত; এবং সেই আবর্ত্তনের ফলে তড়িদ্রূপে প্রতিভাত।

(৬) তড়িদনু। ‡ (বস্তুপক্ষে) পরং পরমাণু ¶ ইহারা অবস্তু ও বস্তুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

(৭) কণিকা। § ইহারাও তাহাই। এতদুভয় এক দিকে তড়িৎ ভাবাপন্ন, অন্য দিকে বস্তু ভাবাপন্ন।

(৮) পরমাণু, অণু; এবং বস্তু পদার্থ। ইহারা সকলেই চৈতন্যময়। মৌলিক ইথার অণু পরমাণু সকলই জ্ঞান চৈতন্য যুক্ত। সুতরাং জীব ও জড় অপ্রভেদ। ‖ সকলই চেতন, অচেতন অথবা জড় কিছুই নাই। নিম্নে বিবর্ত্তন-ক্রম চিত্রাকারে প্রদর্শিত হইল।

তড়িৎ-শক্তি
|
ইথার।
চক্রাবর্ত্ত।
|
তড়িদণু।
|
কণিকা ইত্যাদি।
|
পরং পরমাণু।
পরমাণু।
অণু।

জড় জীব

জীবাণু ও জড়াণুতে কেবল অণুর গঠন ও গতির প্রভেদ মাত্র। তড়িদণু ও বাস্তব অণুর মধ্যেও এই প্রভেদ। ফলতঃ বস্তু বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় শক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র প্রতিপন্ন হয়। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক মহাশক্তি; উহাতে বস্তু বোধ ভ্রম মাত্র; যাহাকে পণ্ডিত

---

† Of these two electricities (positive and negative) we imagine the ether to be composed.

Modern views of Electricity, p. 247—8.

* Left handed and right handed vortices.

‡ Electron.

¶ Ion.

§ Efluves.

‖ The modern theory of matter makes the whole world alive.

J. A. Thomson.

রিগি (১) simulation অর্থাৎ প্রতারণা বলিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক মত কি? ইহা সেই বেদান্তেরই মত। ঋষিগণের অলোক-সামান্য জ্ঞান ইহা ঘোষিত করিয়াছে। আধুনিকগণ তড়িৎ ও ইথার হইতে আরম্ভ করিতেছেন; বস্তু বিজ্ঞান ইহার উর্দ্ধে যাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। তড়িদাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তির, ইথার আদি সর্ব্বপ্রকার সত্তার মূলে সেই এক, অদ্বিতীয়, অজ, শাশ্বতকে নিরূপণ না করিয়া মানব স্থির থাকিতে পারে না। নিরূপণ কি? তাঁহাকে কি বুঝা যায়? যিনি বাঙমনের অগোচর, তাঁহাকে কি ধারণা হয়? হয় না, এ কথা সত্য নহে। হয় বলিলেও ভ্রম হইতে পারে।

কেনোপনিষৎ বলেন—

নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ।
যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ॥

"নিতান্তই বুঝি না যে তাও সত্য নহে, বুঝি যে, এমন কথা কার সাধ্য কহে। জানি না, তবুও জানি, এই কথা যাঁর, তিনিই সে ব্রহ্ম-বস্তু বুঝেছেন সার।" (২) কিন্তু কি বুঝিয়াছেন? বস্তু বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের কি সহায়তা করে? যে টুকু করে, তাহা বুঝা যাউক আর না যাউক, কল্পনা করা যাইতে পারে। আর বস্তু বিজ্ঞান যে স্থলে অক্ষম, সেস্থলে ভগবদ্বাক্যই একমাত্র আশ্রয়।

সৃষ্টিতত্ব। বস্তু বিজ্ঞান অনুসারে আমরা কল্পনা করিতে পারি যে—এক বিরাট সর্ব্বব্যাপ্ত (৩) (চৈতন্যময়) সত্তা সাম্যাবস্থায় ছিল; তাহার স্থানে স্থানে চক্রাবর্ত্ত ( vortex ) উৎপন্ন হইয়াছিল। কবে, কি কারণে হইয়াছিল, তাহা মানব মনের অজ্ঞেয়। এই চক্রাবর্ত্ত বশতঃ কণিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে পরমাণু এবং অণু সকল জাত হইল। এই অণু সকলের গঠন ও অন্তর্নিহিত পরমাণুর গতির তারতম্য অনুসারে জীবাণু ও জড়াণু উৎপন্ন হইল। ক্রমে জীবাণুর বিবর্ত্তনে মানব পর্য্যন্ত, এবং জড়াণুর বিবর্ত্তনে ধূলিকণা হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত গঠিত হইল। তাহারা ঐ বিরাট-সত্তা হইতে জাত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মসম্পাদন করিতেছে; এবং কালবশে আরও বিবর্ত্তিত হইয়া সেই মৌলিক-সত্তাতে লীন হইবে। (৪) বস্তুবিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ইহার পশ্চাতেরও রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছে। ঐ ইথার ও তড়িৎশক্তি কি? ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া দিতেছে, উহারা মৌলিক সত্তা নহে, একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই মূল; উহারা তাঁহারই বিকার মাত্র। তিনিই মহাসাম্য, তখন তিনি নির্গুণ। তিনিই চক্রাবর্ত্ত, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডচক্র; তখন তিনি সগুণ। ব্রহ্ম পদার্থই মৌলিক সত্তা, তাঁহারই বিকার ঐ তথা-কথিত ইথার এবং তড়িৎ-শক্তি। পণ্ডিতগণ সকল বস্তুর ও সকল শক্তির সমন্বয় করতঃ যে ইথার ও তড়িতে উপনীত হইতেছেন, তাহাকে ব্যবহারতঃ মৌলিক স্বীকার করিলেও, পরমার্থতঃ মৌলিক স্বীকার করা যায় না। তাহাদিগের পশ্চাতে এক অনন্তশক্তি স্বীকার করিতে হয়। আর পণ্ডিতগণ (৫) যে অণু পরমাণুকে জ্ঞান-

(১) Righi Modern Theory of Physical phenomena, p. 151.

(২) উপনিষদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৬৯। (৩) Ether.

(৪) It (ether) is no doubt the first source and the ultimate end of things.
Evolution of Matter p 93.

(৫) গুস্তেভ লিবোঁ, ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু, জম্বাক, অগস্তো, রিগি প্রভৃতি।

চৈতন্য আরোপ করিতেছেন, তাহাও সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের একাংশ মাত্র। জ্ঞান-চৈতন্যই মৌলিক, তিনিই অজ, তিনিই সত্য। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ক্ষণিক বিকাশ, অথবা মাত্র। এ লীলা, এ ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই লীন হইবে। কিন্তু পুনর্ব্যক্ত হইবে। এ চক্রকে অনন্ত স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

ওঁ তৎসৎ॥

শ্রীশশধর রায়।

# অনুভবানন্দ

ভুবনমোহিনী বালা, চিনেছি তোমায়,
স্বরূপসি হে প্রকৃতি! বর্ষমান পরে
বিবরিয়া আপনার সৌন্দর্য্য উদার
সূর্য্যালোকে, শুকাইছ কুন্তলের ভার
উলঙ্গিনী, দিকে দিকে ঝঙ্কারে রাগিণী!
এতদিন হে সুন্দরি, কি অবগুণ্ঠনে
ঢেকেছিলে রূপরাশি, কোথা ছিল তাহা
তোমার বদনে কিংবা নয়নে আমার?
এত পরিচয় মাপে চিনিনি তোমায়
তিলমাত্র; দেখিয়াছি শৈশবে প্রভাতে
কুহেলি-সিঞ্চিত বনে করে সুকুমার
সঞ্চিতে শিশির অশ্রু নেত্রে মল্লিকার!
দেখিয়াছি কিশোরের জাগ্রত আগ্রহে
ব্যোমচারী মেঘস্বরে রোমাঞ্চিত হয়ে
দাঁড়াইতে; তার পরে যৌবন পরশে
দেখিয়াছি আনন্দিনী গলিয়া রভসে
সূর্য্যকর সহ মিশি ঝঙ্কারে নামিয়া
কোণে কোণে বিশ্বভাণ্ড রাখিতে পূরিয়া!
জীবনের মহাদিন আজিকে আমার,
বুঝিয়াছি আনন্দের রহস্য উদার!
চিরদিন প্রকৃতির তৃষিত প্রেমিক
উচ্ছৃঙ্খল বন্যশিশু—হৃদয় যাহার
জানেনা বিরতি, তৃপ্তি; অমৃত সাগরে
মত্ত তিমিঙ্গিল সম আমি চিরদিন!
উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠি বিলোল নয়নে
চাহিতাম আকাশের ধরণীর পানে!
গভীর নিশীথে উঠি জাগি বিনিদ্র বিভোরে
ডুবাতাম প্রাণ খানি আকাশ গভীরে!
সাগরের তীরে গিয়ে রহিতাম শুনি
অসীম বিস্তৃতি জুড়ি অসীম রাগিণী!
শুনিতাম কাণ পাতি হুঙ্কার ওঙ্কার
মনোগম্য ভাবা কিছু আছে কি তাহার।
সেই আমি দিশাহারা বিশ্ব মাঝখানে
অজ্ঞাত বিরূপ দেশে ক্ষিপ্তের মতন
ঘুরিতেছি এতকাল; উপহাস ভরে
তাড়া করিয়াছে মোরে পল্লীবালগণ;
আজি মোর একি হল, পলক আড়ালে
কে দিল অমৃত ঢালি' ভিখারীর থালে!
অমৃতে পূরেছে বিশ্ব; সুনীল আকাশ
সমুজ্জ্বল দেবতার দীপ্ত অধিষ্ঠানে
মেঘের পতাকাতুলি উল্লোল বাতাসে
আনন্দ কল্লোল করি কারা চলি যায়,
নভঃপথে অভিযানে অসীম উল্লাসে!
কারা পুনঃ চেয়ে আছে আনন্দে উচ্ছ্বাসে
কুসুমের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল নয়নে!
আকাশে বাতাসে তরু লতা কিশলয়ে
সঙ্কেতে ইঙ্গিতে রঙ্গে হাসে ভাসে কারা!
আমি যেন রাজা হয়ে বিশ্ব সিংহাসনে
বসিয়াছি কেন্দ্রস্থলে; বিশ্বভুবনের
রূপ রস গন্ধ আদি আমারে ঘেরিয়া

তরল উজ্জ্বল মূর্ত্তি বেড়ায় নাচিয়া !
বাজিছে অজ্ঞাত বাঁশী সুরলয়ে যার
ছন্দে ছন্দে নাচিতেছে বিশ্বের ধমনী
প্রাণময়ী ; হৃদাকাশ ভাষায়ে রভসে
এসেছে পূর্ণিমা, যার বাহিরে অন্তরে
পারাবার, প্রাণকল্পে প্রাণিত যাহার
লহরী ঝলকময় সমুদ্র উদার !
শৈলগুলি তুলিয়াছে সমুচ্ছ্রিত শির
যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিবার তরে !
ছন্দের নিক্কনস্বনে নূপুর বাজায়ে
বিমোহিনী রাগিনীর ; আলোক পুলকে
ভাসিছে মানসহংস বিশ্বের সাগরে
নিত্যকালে নিত্যভাবে যথায় বিহরে !

এ জগৎ সিন্ধুমাঝে, নিয়ত চঞ্চল
প্রপঞ্চ তরঙ্গ দলে, শান্ত সমাকুল
ঊর্দ্ধমুখে বিকশিত মহাশতদলে
দাঁড়াইয়া কেহে তুমি ! কে তুমি রঙ্গিনী
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী ! পলকে চকিতে
কি দেখিনু ! সরে গেছে আকাশের বাঁধ
অসীমেতে আপনারে গেছে হারাইয়া !
অহো ! অহো ! জগতের সমুদ্র মথিয়া
জগতের কমলারে কি দিলে তুলিয়া !

কে দেখিবে, কে বুঝিবে আনন্দ আমার !
আমি দেখিয়াছি তারে, সে বরবর্ণিনী
এ বিশ্ব সংসার যার আনন্দ রাগিণী !
আপন রাগিণী ছন্দে ওতপ্রোত হয়ে
গড়িয়া তুলিছে বিশ্ব সুর তান লয়ে !

ধাতার ভাষিণী কন্যা বিশ্ববিমোহিনা
শতরূপা কামিনীরে দেখিয়াছি আমি
জগতের প্রসূতি যে ; অমূর্ত্ত ষোড়শী
এ বিশ্বের সহস্রার কেন্দ্র স্থলে বসি
ভাবময়ী জ্ঞানময়ী করেছে প্রচার
জড়তা আভাষময় জগৎ সংসরি !

জগতের খোজা যারা করিছে চর্ব্বণ
বিন্দু রস না পাইল সারাটা জীবন
অতৃপ্তি ও ছুটাছুটি, তবু হাহাকার
মরণ ক্ষণেক তরে সরণি যাহার !

আনন্দপুরীর দ্বারে ভৈরব প্রহরী
দাঁড়ায়ে কম্পিত রোষে আঁখি রক্ত করি ;
উত্তরি দুর্গম পন্থা মোহে দুনিবার
দ্বারী ভয়ে মজিতেছে জগৎ সংসার !

হে সুন্দরি, হে রঙ্গিণি, সম্বর, সম্বর,
প্রকাশো প্রকাশো দেবি ! কত দিক্ হতে
এ জীবনে কতবার উকি মেরেছিলে
বুঝিতে পেরেছি তাহা—হ শাদ্বলের মত
এ সংসার গহনেতে কত্রদ্ধি ।াইলে ;
এই কি আজিকে দেবি পূর্ণ দেখা দিলে
মূর্ত্তির ভিতরে মূর্ত্তি স্রোতের নিখিলে ?
কাটিল কি মোহবন্ধ, ঘুরাঘুরি মম
কাটিল কি আজি চির জীবনের তরে !

আজিকে হৃদয় মম পেয়েছে কি জানি,
শিকল কেটেছে মম পরাণ পক্ষিনী,
জগতের যবনিকা বহু দূরে সরে
গেছে যেন ; প্রাণ শুধু চাহিছে তোমারে।

হে মোর একান্ত—ভা হে মোর নিয়তি,
এস এস প্রাণ পুরি থাক' দিবা রাতি !
মৃত্যু যবে জীবনের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া
আত্মাপক্ষী মহাকাশে দেয় উড়াইয়া
বহির্মুখ নেত্রদ্বয়ে প্রশান্ত চুম্বনে
ঢাকিয়া, উন্মালি' হের তৃতীয় নয়নে ;
জড়তার কারাগৃহ বজ্রপাতে দলি'
দেবযানে আলোকের অনল ঝঙ্কায়
অভিষেক করে যবে প্রসুপ্ত আত্মায়
সে মহামুহূর্ত্ত শিরে, দাঁড়াইয়া আজি
ডাকিতেছি, প্রাণে মম স্থিরপ্রভা হও !

আইস সুষমারূপে এ মোর আগারে,
দাঁড়াও মূরতি ধরি ধ্যান-তটী পারে !
চেয়ে রই অনিমেষে শুধু চেয়ে রই,

নিষ্কম্প নিবেশ ভরে, জবাফুল যথা
আগুনের হিয়া খুলি' ঊষাবালাপানে
নীরবে চাহিয়া থাকে দৃষ্টি মনোলয়ী,
যবে শুধু দেখা ভিন্ন থাকে না কিছুই!
তদ্‌গত রাসের রসে ডুবি অনিবার
শুধু ডুবে রই; যবে জুড়িয়া সংসার
ষোড়শ সেবিকা মম এক তান লয়ে
আমারে ঘেরিয়া সব বেড়ায় নাচিয়া!
আইস রাগিণীরূপে সুরধুনী ধারে,
যে রাগিণী, দাঁড়াইয়া বিশ্বপর পারে
ধরেছিলা [illegible] তুলি উর্দ্ধে শির
অনির্ব্বাচ্য, রা[illegible] ভিতরে রাগিণী?
উচ্ছ্বাসে উল্লাসে রঙ্গে তরঙ্গে গভীর
অসীমের পদ হতে ছুটিয়া আসিয়া
ধ্বনিময় পদ হতে ছুটিয়া আসিয়া
ধ্বনিময় এই বিশ্ব তুলিছে গড়িয়া!
নিয়েছিলা উদ্ধস্রোতে ফিরায়ে যাহারে
মহাপ্রণয়ের রূপে আপন আসারে!
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর দেশে উঠিতে উঠিতে
আপনারে হারাইয়া যায় যে চকিতে!
অদ্বৈত আনন্দময় ভূমা ও মহান্
বিষ্ণুপদ সিন্ধু মাঝে যার সমাধান।
ক্ষুদ্রকরে ছোটকরে রাখিওনা মোরে!
তোমার স্নেহের টীকা ভ্রূমধ্যের পরে
দাও মোর, নিত্যস্পর্শে জাগ্রত হইয়া
নিত্যকাল মন যেন থাকে নিমজ্জিয়া।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

# বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান।

সেদিন কলিকাতা পুলীশ কোর্টে যুগান্তরের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের মন্তব্য বাস্তবিকই নব্যবঙ্গে এক মহা যুগান্তরের আভাস প্রদান করিতেছে। যুগান্তর বহুদিনই হইয়াছে, কিন্তু এতদিন তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। এতদিন অন্তর টিপুনি দিতেছিল, এখন প্রকাশ হইয়া পড়িল। কে প্রকাশ করিল? বিদেশীর অপকর্ম্ম! ভূপেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন, "আমি দেশের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি, তোমাদের যাহা করিবার থাকে কর।" কথাটা শুনিয়া মহারাষ্ট্রের জাতীয় জাগরণের এক অধ্যায় মনে পড়িয়া গেল। মহারাষ্ট্র-সিংহ ছত্রপতি শিবাজির অভ্যুত্থান সময়ে কবি-ভূষণ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আওরংজীবের সিংহাসন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটের মুখের উপরই বলিয়াছিলেনঃ—

তেজ তিমিরাংশ পর কান্‌হ জিমি কংশ পর
তুম্ ম্লেচ্ছবংশ পর শের শিবরাজ হৈঁ!

ভূপেন্দ্রনাথ ইংরাজের রাজতক্তের সর্ব্ব প্রধান খুঁটি পুলীশ-কোর্টে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, "তোমাকে মানিনা, তোমার উপর আর একজন আছেন, তাঁহা-কেই কেবল আমি মানি। আমি মানি, আমার স্বদেশ এবং তাহার সেবা, আর কিছুর অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।" ইহাই যুগান্তরের অভিব্যক্তি। এতকাল বিদেশী কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলেও তাহাদেরই পদ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়াছি, তাহারই আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আজ হঠাৎ রাজতক্তের উপর বজ্রাঘাত হইয়া আমাদের সে বন্ধন কাটিয়া গেল। ভূপেন্দ্রনাথ আজ আমাদের সম্মুখে যে পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহাই জাতীয় জীবনের মুক্তির পথ,

অন্য পথ নাই এত দিন অন্ধের ন্যায় হাতড়াইয়া আজ হঠাৎ পথ পাইলাম। ভূপেন্দ্রনাথ বিদেশীর প্রভুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। কেবল প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, প্রভুত্বের উপর যে একটা অস্বাভাবিক সমীহা ছিল, তাহার উপর সজোরে পদাঘাত করিয়াছেন। তোমার পশু-বল আছে, তুমি তাহা প্রয়োগ করিতে পার, তুমি শাস্তি দিতে পার, কিন্তু যে সম্ভ্রম-জ্ঞান তোমার রাজশক্তিকে এত দিন অপ্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ অনন্তকালের জন্য বিনাশ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইল। ভূপেন্দ্রনাথ শাস্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরাজ রাজের উপর এ দেশের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথের কার্য্যাবলির অর্থ এই যে, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করিব না, কেন না, আমার বিশ্বাস, তোমার বিচারালয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না। তবে, এই যুগান্তরের যুগে ভূপেন্দ্রনাথের কার্য্যের এ অর্থটীও বাহ্য। গূঢ় অর্থ এই যে, সকলের উপর আমার মাতৃভূমি এবং সকল কার্য্যের উপর আমার মাতৃপূজা, ইহাতে যে থাকে থাক্, যে যায় যাক্, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। রাজপুরুষগণের ঘটে যদি কিঞ্চিৎমাত্রও বুদ্ধি থাকিত, তবে এ ঘটনায় তাহাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। কিন্তু সে বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাইতেছি না। তবে হইতে পারে, "ভয়েতে কম্পিত-প্রাণ, কিন্তু মুখে শব্দ হান্ হান্।" তাই আত্ম গোপন বাসনায় ইংরাজ দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া চারিদিকে ছুটিতেছে, কিসে এই নব-শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে পারে। কিন্তু ইহা যে অঙ্কুর নয়, তাহা সে বুঝিতে অক্ষম। ইহা যে শক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার হয় নাই। আর তাহার পোষ্যপুত্রগণ তো "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি", তাহাদের তো আর মনুষ্যত্ব নাই যে বিচার করিয়া চলিবে! এ শক্তি যখন আত্ম প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, তখন ইহার উপচয় অবশ্যম্ভাবী, কাহারও সাধ্য নাই যে, ইহাকে বিনাশ করে। তাই, যুগান্তরের মোকর্দ্দমার দিন হইতে সকল ঘটনার মধ্য দিয়াই এই শক্তি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইংরাজ যতই পশুবলে এই শক্তির বিনাশ চেষ্টা করিতেছে, ততই উহা নৈতিক বলে বলবতী হইয়া উঠিতেছে। বিদেশীর অত্যাচার শক্তির জন্মদাতা, বিদেশীর অত্যাচার ইহার পোষণকর্ত্তা এবং বিদেশীর অত্যাচার বিনাশেই এই নবাভ্যুদিত শক্তির চরম সার্থকতা। আমরা পশুশক্তির যতই আস্ফালন দেখি না কেন, এই জগৎ নৈতিক শক্তিতে (moral force) পরিচালিত। সুতরাং দুর্নীতির মধ্যেই তাহার বিনাশ-বীজ নিহিত রহিয়াছে। তাই ইংরাজরাজ যতই রাজনীতি ভুলিয়া, প্রজার মঙ্গল ভুলিয়া, পশুবলে রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেছে, ততই তাহার শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশক্তি অভ্যুত্থিত হইয়া তাহার বিনাশমার্গ প্রদর্শন করিতেছে। তাই, ইংরাজের আজ "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!" তাই, বিপিনচন্দ্রকে ধরিয়া সে আজ মহা ফাঁফরে পড়িয়াছে। নবীন ভূপেন্দ্র-নাথ শক্তির এক দিক দেখাইয়াছেন, প্রবীণ বিপিনচন্দ্র আর এক দিক দেখাইলেন। বড় সাধে সে বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মানিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবে। কিন্তু "উল্টা বুঝিলিরে রাম।"

বিপিনচন্দ্র সদর্পে বলিলেন "আমি সাক্ষী দিব না।" এ বিকট উত্তরের জন্য আদালত আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তাই ধাক্কা সামলাইতে কিছুক্ষণ লাগিল, শেষে কাষ্ঠ হাসি ভর করিয়া দাঁড়াইল। আমরা কিন্তু আদালতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। নব্যবঙ্গের প্রথম অভ্যুদয়ে মল্লিক রসিককৃষ্ণ ধর্ম্ম ও সমাজ ক্ষেত্রে একটা মহা বিপ্লবের আভাস দিয়াছিলেন, ইংরাজের আদালতের সম্মুখে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শপথ করিব না,কেন না, আমি তামা তুলসি ও গঙ্গাজল মানিনা।" বিপিনচন্দ্রের উক্তিও এক মহা রাজনৈতিক ঝড়ের সূচনা করিতেছে। তিনি বলিতেছেন, 'আমি শপথ করিব না, কেন না, ইংরাজের প্রভুশক্তিকে সকলের উপর বলিয়া মানিনা, তার উপর, আমার বিবেক। প্রজাশক্তি দলন করিবার জন্য তোমরা এই বে-আইনী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতেছ, সুতরাং তাহার অংশী আমি হইব না, তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, কর।" ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "হে ইংরাজ, আদর্শ ক্ষেত্রে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার "মা", বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন, হে ইংরাজ (কার্য্য ক্ষেত্রে) তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার "আমি".—সমবেত প্রজাশক্তির প্রতিনিধি "আমি"। এই আদর্শ-ক্ষেত্র ও কর্ম্ম ক্ষেত্র যদি একত্রিত হয়,এই "মা" ও "আমি" যদি মিলিত হয় তাহা হইলে মাঝখান হইতে যে আর সব মুছিয়া যাইবে, ইহা যদি ইংরাজের বোধগম্য হয়, তবে সে নিশ্চয়ই ভাবিবে, "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"। তাই তো সুশীলের বেত্রাঘাত! যাহাকে মরণে ধরে, তাহাকে রক্ষা করে সাধ্য কার। সাহেব আজ মার খাইয়া আদালতে ফরিয়াদী! কালস্য কুটিলা গতিঃ!! সাহেবের কাণমলা খাইয়া বাঙ্গালী যখন আদালতে দৌড়াইত, তখন বিদেশী কাগজগুলি কতই না বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়াছে। আজ কালের অনিবার্য্য কুটিল গতিতে বাঙ্গালীর কাণমলা খাইয়া সেই সাহেবেই ফরিয়াদী রূপে আদালতে হাজির! আজ সে বিদ্রূপের হাসি নাই। মুখ চূণ হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আবার, এ কি যে সে কাণমলা! পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সুশীলের হাতে কাণমলা খাইয়া হোম্‌ড়া চোম্‌ড়া শ্বেতকায় পুলীশ সার্জ্জেন্ট "আমাকে মেরেছে" বলিয়া পুলীশ কোর্টে হাজির! কাপুরুষটার লজ্জাও হইল না,কথাটা বল্‌তে? ধিক্ তোর ইংরাজ নাম! ধিক্ তোর রাজত্বে! পুলীশ কোর্টে না যাইয়া দড়ী ও কলসী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হওয়া ছিল ভাল। আমরা না হয় চাঁদা করিয়া দড়ী কলসীর দাম দিতাম। অবশ্য দড়া কলসী! ওদিকে আবার দেখ পুরুষসিংহ সুশীলের বীরত্ব! এই সাহেবের কাপুরুষতার পার্শ্বে সুশীলের নির্ভীকতা ও বীরত্ব, এই নবশক্তির অভ্যুত্থানকে এমন উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিতেছে, যাহা নিতান্ত অন্ধ না হইলে, না দেখিয়া থাকা যায় না। ইংরাজের অধঃপতনও তেমনই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। সুশীল অস্বীকার করে নাই, মিথ্যা কথা বলে নাই—কেন না, আর ভয় নাই! যে দেশে লাল পাগড়ীর নাম শুনিলে লোকের পেটের পিলে চম্‌কিয়া যাইত, সেই দেশের পঞ্চদশ বর্ষীয় শিশু লাল পাগড়ীর প্রধান আড্ডা পুলীশ কোর্টে লাল মুখো কাজীর মুখের উপর বলিয়া দিল—"ঐ লাল মুখোটাকে মারিয়াছি, কেন না,

ও আমাকে মেরেছে।” লক্ষ বেত মারিলেও, হে ইংরাজ, তোমার গায়ের এ দাগ মুছিবে না, কেবল প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া লাভ করিবে। এই নবশক্তির অভ্যুদয়ে ইংরাজ নিতান্তই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, মা'রের পরিবর্ত্তে মার খইয়া সে কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন হইয়া উঠিয়াছে। (আমরা তো “ভারতের রাজভক্তি” প্রবন্ধে ঐ কথাই বলিযাছিলাম। মা'রের পরিবর্ত্তে মা'র লাগাও, ভারতে বিদেশী-শক্তি আপনার ভারেই ডুবিয়া যাইবে। ইংরাজের অত্যাচার দমনের এই একমাত্র উপায়। প্রতিজ্ঞা কর মার খাইয়া আদালতে যাইবে না, সুদ শুদ্ধ মার ফিরিয়া দিবে।) ইংরাজের গত্যন্তর নাই, সে আদালতে যাইতে বাধ্য হইবে। তখন বীরের ন্যায় সত্য কথা বলিও। বলিও, অত্যাচার করিলে সহ্য করিব না। তাহা হইলে, জোঁকের মুখে লবণের ন্যায় ফিরিঙ্গীর অত্যাচার আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। একবার একজন মিশনারী পঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। প্রচার আর কি, শিখগুরু নানকের নিন্দা! এক শিখ তখন এক লগুড়াঘাতে মিশনারীজীকে ভূশায়ী করিল। কাজেই হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। পুলীশেরা শিখকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হইল। মাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে শিখ বলিল, “হুজুর, কেতাবমে লেখ্‌খা হ্যায়, যো গুরুজিকা নিন্দা কিয়া উস্‌কো তিন দাণ্ডা মার, হাম তো এক ডাণ্ডা মারা, বেচারী মর্ গিয়া, আবি তো দো ডাণ্ডা বাকী হ্যায়।” এই বলিয়া সে ডাণ্ডার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ইহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয় হইল, পাছে বা ঐ দু ডাণ্ডা তাহারই মস্তকে পড়ে। এইরূপ নির্ভীক ভাবে দু চার-ব্যাপারে আদালতে দাঁড়াইলে নবশক্তির পরিচয় পাইয়া বিদেশী আপনিই সোজা হইবে। ভারতে ইংরাজ আজ আপনাকে কিরূপ বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছে, সে চারিদিকে সর্ব্বদা কিরূপ বিভীষিকা দেখিতেছে, সে যে ভারতে আপনার রাজ্য পদ্মপত্রের উপর জল বিন্দুর ন্যায় মনে করিতেছে, এটোয়ার জাল-বিদ্রোহ দমনের জন্য সমর সজ্জাই তাহার প্রকৃত প্রমাণ। বাস্তবিকই তাহার অবস্থা শোচনীয়, তবে তাহা স্বকর্ম্মের অনিবার্য্য ফল। ফল পাকিয়াছে, সামান্য ঝাঁকিতেই যে উহা বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইবে, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে, তাই, সংবাদপত্র দলনচেষ্টা! কিন্তু বৃথা এ সাধনা! এ চেষ্টায় এই নবশক্তি কেবল আপনার বিভিন্ন দিক্ উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত করিবে মাত্র। এ উপলক্ষে মুসলমান ভ্রাতাদিগকে একটা কথা বলিবার আছে। তুমিই না ভাই, ইউরোপের দুর্দ্দিনে একদিন সভ্যতার আলোকে দিগ্‌-দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া সভ্য জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলে, তবে আজ তুমি তোমার গৌরব-মুকুট বিদেশীর পদতলে লুণ্ঠিত করিতেছ কেন? কেরাণীগিরিকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিতেছ কেন? ভারতে হিন্দুরই গৌরব ইতিহাস না হয় পুরাণে পরিণত হইয়াছে, তুমি ভাই, তোমার ইতিহাসকে সামান্য কেরাণীগিরির লোভে এত সত্বরই পুরাণ করিয়া তুলিলে কেন? সেদিন দিল্লীর সেই বিরাট কেল্লার দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল এই সব কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। ভাই মুসলমান, তুমি কি আমার এই চিন্তার অংশ গ্রহণ করিবে না?

গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধির দোষে আরো অনেক

সিদিসান মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, সকলেরই ফল সমান হইবে, সরকারের নিজের পদে কুঠারাঘাত। প্রবন্ধান্তরে সেগুলির, বিশেষত বন্দেমাতরমের মোকদ্দমার সার সত্যের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

## সুলভ রত্ন।

জেনেও নাহি জানি একটি মাণিক্
তুমিরে ধন হাজার রাজার;
চিনেও নারি চিন্‌তে, মণি কিন্‌তে
ঘুরে বেড়াই বাজার বাজার।
দিতেছ আপ্‌নি ধরা; তবু ধরা
খুঁজে আনি ঘরে মাটি,—
তপাচ তোমায় ঠেলে সোণা ফেলে
আঁচলেতে গেরো আঁটি।
তেজিয়ে সুলভ নিত্য ভূষণ দীপ্ত
পরের সোণা লোভে পরি;
সে যে হে কঠিন্ ক্কেজায়—কেড়ে নে'যায়
দিন দুপুরে; ক্ষোভে মরি।
পড়্‌ছে বিশ্বখানি ক্রমে ভাঙি,
ভূমিকম্পে ধ্বসে ধ্বসে;
গড়ছি তবু খাসা পাকা বাসা,
একটী কোণে বোসে বোসে।
যাচিয়ে দিচ্ছ তুমি দিব্য ভূমি
অচল অটল চরণ তলায়;
বাঁচিয়ে থাক্‌লে সেথা, তবু হেথা
ভুলে বাঁধি মরণ গলায়।
যদিচ থাকে পড়ি কাণা কড়ি
লক্ষ্য করি লক্ষ ক্রোশে;
অথচ রত্ন রাজে বক্ষ মাঝে,
দেখিনে তা চক্ষু দোষে।
অজানা মাটি খুঁড়ে—পাতাল ফুঁড়ে,
ধূলি তুলি নিত্য থানায়;
বুঝিনা মূল্য হাওয়ার, পড়ে পাওয়া
জিনিষ ভারি চৌদ্দ আনায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

## কে তুমি গো মম অন্তঃপুরে।

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, কে তুমি বিচিত্র সুরে,
গাহ নিত্য নব নব গান!
বুঝিনা গানের ভাষা, জানিনা কি তার আশা,
কি রাগিণী কি বিচিত্র তান!
প্রাণের নিকটে এসে, যেন বহু ভালবাসে,
সোহাগেতে কাছে এস সরে,
ধরি ধরি যত করি, ধীরে ধীরে যাও সরি,
একি খেলা স্বপনের ঘরে!
চিনি চিনি যত করি, হায় গো চিনিতে নারি,
নয়নেতে কিসের কুয়াসা।
কে তুমি বিচিত্র সুরে, গাহ মম অন্তঃপুরে
কেন মিছে জাগাও দুরাশা!
ছিনু আমি সাবধানে, আপনার মাঝখানে
কেন মোরে করিছ প্রকাশ।
কি যেন দেখায়ে আলো, কি যেন বাসায়ে ভালো
জাগাইছ কিসের পিয়াস?
কিবা চাহ, কেন চাহ, কি বিচিত্র গান গাহ,
আসিয়াছ কদিনের তরে,
হে অতিথি তব নাম, বল বল তব ধাম
বল মোরে সব ভাল করে!
কোথায় বা ছিলে তুমি, কোথা ছিল বিশ্বভূমি
কোথা ছিনু আমি আপনার!
আজি পথে দেখা শোনা, আধখানি চেনা শোনা
কে খুলিল হৃদয় দুয়ার!
অজানিত হে অতিথি, জান কি আমার প্রীতি—
বুঝ তুমি মনের কথন।
বিচিত্র বরণ মাখা, সোণার পালক ঢাকা,
তোমারো কি আশার স্বপন?
শুধাবেনা কোন কথা—তোমার প্রাণের ব্যথা—
গান গাওয়া শুধু দূরে দূরে?

দূরেতে বাজাবে বাঁশি হাসিবে করুণ হাসি
কে তুমি গো মম অন্তঃপুরে!
শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

## শক্তি আরাধনা।

১

দেহ মা, বাহুতে শক্তি অভয়া তারিণি!
এ ভবে কে আছে আর? তুমিই ভারত-সার,
তুমি মাত্র ভারতের আশা-প্রদায়িনী;
তোমার সে ভীম ছবি, নয়ন জ্বলন্ত রবি,
তোমার সে ভীম খাড়া অসুরনাশিনী!
বদন রক্তিম কিবা ভীষণ সে লোল জিহ্বা,
নর-মুণ্ড মালা গলে—হে মুণ্ডমালিনি?—
জাগায় নবীন রাগে, হৃদয়ের প্রান্ত ভাগে,
উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা কত সুশান্তিদায়িনী;
দেহমা বাহুতে শক্তি অভয়া তারিণি!

২

কত দিন রব মাতঃ! অপরের করে,
কর আছে করহীন, ধন আছে তবু দীন!
রহিয়ে সোণার দেশে পড়িয়ে পাথারে!
হেন জাতি কোথা পাই? সব থেকে কিছু নাই,
অথচ সকল নেয়া—দূর সিন্ধু তীরে;
জীবিত ওরা এ'অন্নে, ভারত কাঁদিছে দৈন্যে,
বলতো জগতে কা'রা এ সহিতে পারে?
শুধু হীনবীর্য্য দেশে, সহে মুখে হেসে হেসে,
জানে সে কি ব্যথা আছে নিহিত অন্তরে?
কত দিন র'ব মাতঃ! পরিয়ে পাথারে?

৩

দেহমা দেহমা শক্তি ডাকি যোড় করে,
কতদিন রবো হীন, দাও মা দীনের দিন,
জাগাও ভারত নব শক্তির সঞ্চারে;
ওই যে দানব দল, করে ঘোর কোলাহল,
ডুবাইয়ে স্বর্ণভূমি পাপ অত্যাচারে,
হবে নাকি প্রতিকার? তোমার কি সুবিচার?
আসুক সে দিন যথা নিশম্ভু সমরে,
যদি রক্ত-বীজ-দল, না ছাড়ে এ ধরাতল,
পাতিও প্রকাণ্ড জিহ্বা রুধিরের তরে;
দেহমা দেহমা শক্তি ডাকি যোড় করে।
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

## মাতৃ ভাষা।

(১)

অয়ি মাতৃ ভাষা!
অভিমুক্ত প্রবাহের সম,
স্ফীতোদরা বরষার উচ্ছ্বসিত স্রোতে
জাগিয়াছ, অনিন্দ্য-রূপসি;
বিজয়ের ঊর্ম্মিমালা কণ্ঠে তব দোলে—
যেন মুক্তা ঝোলে!

(২)

হে প্রগ্রত দেবি!
কোন্ দূর বারিধির মাঝে
আপনারে বিলাইতে ছুটিছ বিহ্বলা,
কোন্ দৃপ্ত ঐরাবতে নাশি'
চূর্ণ অস্থি দিয়া তার পরিবে মেখলা,
বিজয়-চঞ্চলা!

(৩)

নিত্য উপাসিতা!
সপ্ত স্বর্গ-রাজ্য করি জয়
চাহ কিগো ফিরাইতে অদৃষ্ট তোমার;
অন্ধপুত্রে চক্ষু করি' দান
দেখাইতে চাহ কিগো প্রতিষ্ঠা-বিস্তার
পূর্ণ অধিকার!

(৪)

জাগো—জাগো তবে,
উৎসবের নব আয়োজনে,
দিগন্তের লব্ধ অর্ঘে কর অভিষেক;
অতীতের অপবাদ নাশি'
উজ্জল ভবিষ্য ল'য়ে দাঁড়াও বারেক
স্থির, নির্নিমেখ!

(৫)

হে কল্যাণময়ি!
শুদ্ধশীলা তাপসীর মত,
উদ্‌যাপন কর ব্রত নিখিল-রঞ্জনে;
ঢালো, ঢালো দিব্য সুধা মুখে,
দাও পুণ্য-আশীর্ব্বাদী দুঃস্থ অকিঞ্চনে,
পীযুষ সিঞ্চনে!

(৬)

জননী আমার—
হে বঙ্গ-বন্দিতা,
তুমি মোর কল্যাণ-সম্পদ;
মর্ম্মে মর্ম্মে ফুকারিছ মন্ত্র অভিনব;
জীবনের প্রতি পলে পলে
রাখিয়াছ ব্যক্ত করি পূর্ণ সত্ত্বা তব—
অতুল বিভব!
হে ধাত্রী-রূপিণী মোর, অয়ি শুচিস্মিতা,
চিরদিন থেকো মোর কণ্ঠ-বিরাজিতা!
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

## ভক্তের প্রতি।

কঠিন স্বদেশ-সেবা, পূজি সেই দলে
স্বার্থদলি', আত্মদলি', সজনে, বিরলে
সাধিছে একান্তে যারা শুভ মহাব্রত—
আপন সর্ব্বস্ব দিয়া, কিঙ্করের মত
লুটায়ে পড়িতে চাহে নগ্ন ভূমিতলে ;
স্বপন আবেশে যার তপ্ত অশ্রুজলে
সিক্ত হয় উপাধান, স্বদেশ ব্যথায়
সুখশয্যা পরিণত কণ্টক-শয্যায়।
এ নহে স্বার্থের লীলা, কোলাহল গেহ
—মধু-অন্ধ ভ্রমর-গুঞ্জন ; যদি কেহ
পেয়ে থাক সেই শুভ্র দিব্য চেতনায়
এস আজি, সঙ্গোপনে বিজন সন্ধ্যায়,
হৃদয়ের যত শিরা উপশিরা যত
ভরি দাও বেদনায় জীবনের মত।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

## কবি-শ্মশানে।

মধুর বরষা সন্ধ্যা!—স্তব্ধ নিরজন!
বিশ্ব-চরাচর স্নিগ্ধ মেঘের ছায়ায় ;
জাগাতে কবির স্মৃতি নিতাই নূতন,
সমাগত সুধীজন আজিকে হেথায়!
সম্মুখে গম্ভীর দৃশ্য!—এ ঘোর বিরলে,
লভেন বিরাম চির দেব মহাপ্রাণ!
আঁধার ধরণী গর্ভে শুভ্র শিলাতলে,
ভুলি' সে করাল দুঃখ শ্রীমধু শয়ান!
কবীন্দ্র! অতীত কথা জাগাও না আর,
বজ্রসম দুঃখ-স্মৃতি নির্ম্মম ভীষণ!
এ সুপ্ত নির্জ্জনে স্মৃতি নাহি সে ব্যথার
সমাধি শ্মশান চির শান্তি নিকেতন!
রহি' হেথা সৃজেছ হে মহাকবি তুমি!
বঙ্গে এক মহাতীর্থ ঋষি-ভোগ্য ভূমি!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

## প্রাচীন দিল্লী।

(তোগলকাবাদ)

সুপ্ত জন কোলাহল প্রশান্ত মেদিনী,
সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়া পড়েছে ভুবনে ;
আসিছেন মৃদুপদে ধীরে নিশীথিনী,
ধ্বংসের অনন্ত বুক জুড়াতে স্বপনে।
তৃণাচ্ছন্ন পথে ভ্রমি' হই আত্মহারা,
স্মরিয়া সে অতীতের গৌরব বিশাল!
রাখি' এ শ্মশানে স্মৃতি কোথা গেল তারা?
নিরখি' নশ্বর-কীর্ত্তি হাসে মহাকাল!
সম্মুখে সমাধি কার ভীষণ-দর্শন, *
কার এ দুর্জ্জয় দুর্গ—তুঙ্গ সিংহদ্বার?
জন-শূন্য—রব-শূন্য—শূন্য নিকেতন!
কে শোনে মঙ্গলগীতি আঁধারে শিবার!
নির্ব্বাণ সে রণবহ্নি পুরী নিরজন,
নিস্তব্ধ সে অশান্তির মহা হাহাকার!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

## স্বার্থপর।

হউক সে মহাজ্ঞানী মহাধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধুজল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল!
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্ম্য মাঝে,
সাজুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে!
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেনরে বোত্তম!
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকগণ স্তব সঙ্কীর্ত্তন।
কিন্তু যেবা—জন্মভূমি—স্বর্গের কমল,
ফেলিনি বন্ধনে তার কভু অশ্রুজল।
জন্মভূমি সেবা আহা! করেনি কিঞ্চিৎ,
সাধে নাই অনুরাগে স্বজাতির হিত ;
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব নগণ্য সেই ঘৃণিত বর্ব্বর!
বৃথারে জীবন তার! বৃথারে জনম!!
মানব-সমাজে সেই অভাগ্য অধম!
মরিবারে দাও তারে কীটের মতন,
করিও না কোন জন বিলাপ-ক্রন্দন!
ভ্রমেও তাহারে কেহ ক'রনা স্মরণ,
বিস্মৃতি-সাগরে তারে কর নিমগন।
শতকল্প হ'ক তার জাহান্নামে বাস,
লুপ্ত হ'ক বিশ্ব হতে নাম বংশ বাস!!

শ্রীসৈয়দ সিরাজী।

* মহম্মদ তোগলক সাহের সমাধি মন্দির।

## জন্মাষ্টমী।

ঘোর কৃষ্ণ অষ্টমীর নিবিড় আঁধারে
বিদ্রোহের বজ্রনাদে চকিত ধরণী ,
বিদ্যুৎ কৃপাণ হাসে দৃপ্ত গর্ব্ব ভরে,
উচ্ছৃঙ্খল মুক্ত মেঘে এলাইয়া বেণী ;
তাণ্ডব উল্লাসে মগ্ন উলঙ্গ প্রকৃতি ;
লেলিহান রসনার রক্ত-স্রোতে ভাসি,
যায় যায় শান্তি-রাজ্য ; তাই, বিশ্বপতি
জনমিলে ধর্ম্মক্ষেত্রে পাপতমঃ নাশি';—
তাই, প্রভো, কুরুক্ষেত্রে করিলে স্থাপন
ধর্ম্মের সাম্রাজ্য পুনঃ, গীতার প্রচার।
এস, দেব, এস কর দুষ্কৃতি দমন
মহা কুরুক্ষেত্রে পুনঃ ধর্ম্মের উদ্ধার,
পাপের দুন্দুভি ধ্বনি বিদ্রোহ হুঙ্কার
নরকে বেড়িল পুনঃ তোমার সংসার।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

---

## চীনকে লক্ষ্য করিয়া।

হে অমর বরপ্রাপ্ত রাবণ অনুজ!
কত আর ঘুমাইবে ? জাগ একবার ;
দুয়ারেতে থানা দিয়া মর্কট মনুজ,
স্বর্ণ লঙ্কা দহে তব, করে অত্যাচার!
উঠ বীর! দিয়া তব বিরাটাঙ্গ ঝাড়া,
কও মেঘমন্দ্রে, রোষ-কষায়িত চোকে,
"কেরেরে দুয়ারে মোর দাঁড়া দস্যু দাঁড়া,
এখনি গিলিব সব, না রবে ভূলোকে
চিহ্ন লেশ, জাননা এ দেব-দৈত্য-ত্রাস,
বিশ্বজয়ী কুম্ভকর্ণ, রাবণ অনুজ,
যার দাপে কাঁপে এই ত্রৈলোক্য নিবাস,
স্বর্গে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু ব্রহ্মা চতুর্ভুজ,
পাতালেতে নাগাধিপ। কি সাহসে ডাকা,
রাক্ষসের পুরে তোর জোর করি থাকা ?"

শ্রীবরদাচরণ গুহঠাকুরতা।

## জাপান-নারী-নীতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সার সংগ্রহ করিয়া,
জাপান সবার আজ আদর্শ স্থানীয়া।
নারীনীতি তথাকার শুনহ কেমন,
কিসে করিতেছে জাপ সমাজ-বন্ধন!
প্রশান্ত বাধ্যতা দয়া ধরম বিনয়,
আর সেই গুণ যারে বাঙ্গালায় কয়—
"ফাটিলেও বুক তবু মুখ না ফুটিবে"
অতুল ভারত যার আজিও গৌরবে,
সে সতীত্ব মহানিধি জাপান-ললনা
হৃদে ধরে ; নাহি যার ধরায় তুলনা।
আপন জনক আর জননী সমান
শ্বশুর শাশুড়ী যোগ্য বিহিত সম্মান।
ভালবাসে তাঁহাদেরে একান্ত হৃদয়ে,
ভক্তি করে যথাশক্তি আগ্রহ করিয়ে ;
সন্তানের মত সেবা করে তাঁহাদেরে
স্বকরে সকলি করে, নাহি দেয় পরে।
যে কথা যখনি তাঁরা বলেন করিতে,
তখনই যায় বধূ আদেশ পালিতে।
আপনি প্রস্তুত করে তাঁদের আহার,
পোষাক সেলাই করা কর্ত্তব্য তাহার।
বলিতেছি এবে যায় বলি মহা দোষ—
অবিনয়, পরনিন্দা, দ্বেষ, অসন্তোষ,
অলসতা ; এই পাঁচ মহা ব্যাধি করে
সাত আট জনে দশ জর্জ্জর ভিতরে।
এইরূপ জাপানের নীতিশাস্ত্র কয়
নারী কভু করিবেনা আপনে প্রত্যয় ;
স্বামীরে স্বরগ সম করিবেক জ্ঞান ;
স্বামী গতি, স্বামী মুক্তি নাহি পদ আন।
বিশ্বাস, কারুণ্য, নিষ্ঠা, আত্ম বিসর্জ্জন,
সবে করিবারে সুখী চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ ;
নারীতে এসব গুণ সহস্র বরষে
অন্যত্রে নাহিক হ'বে করি হেন ভাষে।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

---

## বন্দী নৃপতি।

(আলেক্‌জান্দার ও পুরুর প্রসঙ্গ অবলম্বনে)

(১)

অন্ধ সাহসে সিন্ধু তরিলা
ভুবনবিজয়ী যবন-বীর,
তপ্ত শোণিত করিল প্লাবিত
ক্ষিপ্র-প্রবাহ বিপাশা-তীর।
"আইস রে আজি মুক্ত-কৃপাণ
পঞ্জাব-পুত কে আছ আর,"
বল্লম ধরি হুঙ্কার ছাড়ি
কহিলা বিজয়ী সেকেন্দার।

(২)

গরবে শোভিল রতন আসন
মাসিদোনিয়ার পতাকা-তলে,
"বন্দীর আজ হইবে বিচার"
বসিলা বীরেশ সদলবলে।
গ্রীক, আফগান, পারসী, আরব,
তুর্কী, তাতার দাঁড়াল থরে,
অসি কার্ম্মুকে ভীষণ কর্ম্মা
বর্ম্ম-আবৃত চর্ম্ম করে।
"চুপ, চুপ" অই আসিছে বন্দী,
রুধির-ধারায় সিক্তকায়,
বিদ্ধ ললাট, বদ্ধ রসনা,
শৃঙ্খল-যুত চরণ, হায়!
রক্ষিত বাহু প্রহরীর করে,
মৃদু পাদক্ষেপে আসিলা পুরু;
উদার মূরতি, উজল নয়ন,
কোথা সে প্রাণের বেদনা গুরু?

(৩)

উন্নত ভাষে কহিলা বিজেতা
"শুন হে ধৃষ্ট আর্য্যবীর,
লৌহ শিকলে বান্ধিতে তোমায়
গিয়াছে গ্রীসের অনেক শির।
শুনহে বন্দী, কত কত দেশ
লোটায়েছে এই চরণতলে,
কেহনা দিয়াছে এহেন যাতনা
মাসিদোনিয়ার বীরের দলে।
পাইলে কবলে দুষ্ট দ্বিরদে
দৃপ্ত কেশরী কি করে তায়?
পাইলে কবলে তোমা হেন অরি
কিবা ব্যবহার-যোগ্য, রায়?

(৪)

অপূর্ব্ব তেজ ভাতিল বদনে,
ভাতিল নয়ন উজলতর;
ভেদি সে জনতা হইল ধ্বনিত
সরল, সতেজ কণ্ঠ-স্বর।
"নহি শঙ্কিত" কহিলা বন্দী,
নশ্বর এই জীবন তরে,
ক্ষত্র-শোণিতে পূর্ণ ধমনী
যবন-কৃপাণে কভু কি ডরে?
নহি তস্কর শুনহে নরেশ,
দস্যুবৃত্তি না করি আমি,
প্রবল অরাতি করিতে বিনাশ
সংগ্রাম-ভূমে অগ্রগামী।
স্বদেশের তরে, স্বজাতির তরে,
মাতৃ-ভূমিরে করিতে ত্রাণ।
করেছি পালন নৃপতি-ধর্ম্ম,
নৃপতির সম রাখিবে মান।"

(৫)

ঈষৎ হাসিলা মাসিদন-পতি
—বীরের হৃদয় বীর সে জানে,
করি বিদূরিত শৃঙ্খল-ভার
বসা'লা আসনে সসম্মানে।
কহিলা বীরেশ "শুন পুরুরাজ,
চিনেছে তোমায় সেকেন্দার।
শাসহ স্বদেশ, আজি হ'তে তুমি
আজীবন হ'লে বন্ধু তার।"

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

## আত্মত্যাগী ভূপেন্দ্রনাথ।

এবার হইবে ভাই, মায়ের সাধনা,
বুক চিরে রক্ত দিতে শিখেছে বাঙ্গালী,
আত্মাহুতি প্রদানিতে জেগেছে প্রেরণা
ভূপেন্দ্র সে মহাযজ্ঞে হইয়াছে বলী।

বাজারে বাজারে শঙ্খ প্রলয় বিষাণ,
কোটী স্বরে ভীম মন্ত্রে তোলনা সঙ্গীত?
গাহ আজি পূর্ণতেজে আনন্দের গান
বাঙ্গালী করেছে হের জগত স্তম্ভিত।

কে দিবিরে মাতৃপূজা? আয় ছুটে আয়!
করালবদনী কথা ডেকেছে শোননা?
হৃৎপিণ্ড দিতে হ'বে মহা সাধনায়,
তবে হ'বে পূজা তাঁর,—নৈলে বিড়ম্বনা!

ভূপেন্দ্র! ভূপেন্দ্র তুমি,—রাজা মহারাজ
ত্রিশ কোটি হৃদয়ের সিংহাসনে আজ!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

## সুশীলকুমার।

পঞ্চ বৎসরের ধ্রুব উগ্র তপস্যায়
পেয়েছিল আরাধ্যেরে, তুমিও তেমন
সহি বেত্রাঘাত পৃষ্ঠে তীব্র যাতনায়
মাতৃপূজা মহাযজ্ঞ কৈলে আয়োজন।

ওত নহে বেত্রাঘাত পৃষ্ঠেতে তোমার,
এ যে আহা! শেল-চিহ্ন সন্তানের বুকে,
একটী আঘাতে কোটী হৃদয় মাঝার
জাগিবে প্রলয় শক্তি, ভীম-বজ্র মুখে।

প্রতিহিংসা চাহি মোরা,—প্রতিশোধ চাই,
গোলা গুলি কামানের চলে গেছে ডর,
কে আছ ঘুমের ঘোরে? ছুটে এস ভাই!
সুশীলের বেত্রাঘাতে তনু জর জর।

এ বেতের প্রতিশোধ হবে যেই দিন,
বাঙ্গালা হইবে ধনী জানিও সেদিন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

# পরবশতা।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। সর্ব্বমাত্মবশং সুখং

আত্মবশে সকলই সুখ, পরবশে সকলই দুঃখ। কিন্তু আত্মবশ ত কেহই নহে। প্রথমজ (Protozoa) হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি যাহা আছে, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা একদিকে দেহকে এবং অপর দিকে মনোবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে। মন দেহকে, অথবা দেহ মনকে অনুসরণ করে,—সে প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, যে জীবের দেহ যেমন, তাহার মনও তদ্রূপ। দেহ ও মনের সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। প্রথমজ জীবের দেহ কেবল একটী জীবকোষ মাত্র; উহার জটিলতা কিছু মাত্র নাই। উহার মনও তদুপযোগী। উহার মনে কোন উচ্চভাব থাকার পরিচয় নাই। এককৌষিক শ্রেণী হইতে জীব ক্রমে বহু-কৌষিকে উন্নত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তিও উন্নত হইতে লাগিল। বহু-কৌষিক জীব মধ্যেও যাহারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাহাদিগের মনোবৃত্তিও অনুন্নত। আর যাহারা দেহ-বিধানে উন্নত, তাহাদিগের মনোবৃত্তিও উন্নত। "দেহ বিধানে উন্নত" বলিতে জটিল বোধ করে। যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, এবং ঐ সকল অংশ জটিল রূপে গঠিত, সেই জীবকেই দেহ বিধানে উন্নত বলা যায়। আর, যাহার দেহ-গঠন সহজ এবং দেহাংশে ক্রিয়া বিভাগের বাহুল্য নাই, তাহাকে অনুন্নত বলা যায়। সমস্ত জীব-রাজ্যের ইহা প্রায় অখণ্ডিত নিয়ম যে, যে জীবের দেহ যত উন্নত, তাহার মনও ততই উন্নত। বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, তাহার উপর নির্ভর করে না। শম্বুক পিপীলিকা হইতে বৃহৎকায়; তথাপি পিপীলিকার দেহ গঠন জটিলতর হওয়ায় উহারা শম্বুক হইতে উন্নতমনা। দেহ-বিধানের মধ্যেও স্নায়ুগুলের, বিশেষতঃ মস্তিষ্কপিণ্ডের জটিলতা এবং কর্ম্ম বিভাগের উপরই মনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কীট হইতে মানব পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দেহও যত উন্নত হইয়াছে, মনও ততই উন্নত হইয়াছে। সুতরাং দেহ ও মনের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে।

এই কথা সত্য হইলে, পরবশতার ফল কি হইবে? উহা দেহের উপর কিরূপ ক্রিয়া

উৎপন্ন করিবে? এবং মনকেই বা কি ভাবে পরিণত করিবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, মানবের অবস্থাও পরিজ্ঞাত হইতে বাকী থাকিবে না।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে, কোন জীবকেই উন্নত কি অনুন্নত বলা যায় না (১) কারণ প্রত্যেক জীবই তাহার নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী। নতুবা সে জীবিত থাকিতেই পারিত না! আদি জৈবিক (২) সময়ের সরীসৃপ সে যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। উহারা বর্ত্তমান নবজৈবিক (৩) সময়ের সরীসৃপ হইতে এ হিসাবে অনুন্নত নহে। বর্ত্তমান যুগের সরীসৃপ এ যুগের উপযোগী; পূর্ব্বোক্তগণ সেই যুগের উপযোগী। এ হিসাবে কেহই উন্নত অনুন্নত নহে। তবে প্রভেদ এই মাত্র যে, পূর্ব্বোক্তগণ অপেক্ষা আধুনিক যুগের সরীসৃপগণ অধিকতর জটিলতার দিকে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে উন্নত বলা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ জীবের কথা স্মরণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, সরীসৃপ সরীসৃপত্বে যেরূপ উন্নত, মানব মানবত্বেও তদ্রূপই। এদিক হইতেও কাহাকেও উন্নত অবনত বলা যায় না। কিন্তু কেবল মাত্র দেহের জটিলতা এবং মনের অবস্থাতেই জীবগণকে উন্নত অবনত বলা যাইতে পারে। দেহের উন্নতি অবনতির উপর মনের উন্নতি অবনতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

পরবশতায় দেহের অবস্থা কিরূপ হয়?

(১) It cannot be asserted that the primeval types of any given group are necessarily lower, zoologically speaking, than their modern representatives.
Nicholson—Ancient Life history of the Earth p. 372.

(২) Palæozoic age.

(৩) Kainozoic age.

জীব-রাজ্যে অমেরু (invertebrate) প্রাণিগণ মধ্যে পর-পুষ্টের সংখ্যা অধিক। ইহারা কেহবা আহার্য্য বস্তুর সহিত অপর জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়; কেহবা বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অপর দেহে আশ্রয় লয়; অন্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক অপর জীব দেহে ডিম্ব প্রসব করে, তদবধি ডিম্ব সেই দেহেই বর্দ্ধিত ও পালিত হয়। কেহবা দেহ মধ্যে, কেহ বা দেহ-ত্বকের উপরে পর-পুষ্ট ভাবে অবস্থান করে। হয় ত চির-জীবন এই ভাবেই কাটাইয়া দেয়; নতুবা জীবনের কোন অংশ-বিশেষ এই ভাবে যাপন করে। যে যে ভাবেই পর-পুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করে, ফল একই প্রকার উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ স্ব-চেষ্টায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ক্রমশঃ অনভ্যস্ত হইয়া পড়ে। পর-পুষ্ট জীব অন্যের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়; তাই স্বাবলম্বন ভুলিয়া যায়। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থা কি? দেহের অবনতি; দেহ যন্ত্রের ও দৈহিক ক্রিয়ার (১) উভয়েরই অবনতি। পর-পুষ্টের দেহ, স্বাবলম্বনের অভাবে ক্রমে অবনতির দিকে চলিয়া যায়। পরিশেষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেহ যন্ত্রাদিও লুপ্ত অথবা অবসন্ন হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিৎগণ একবাক্যে বলিতেছেন, যে জীব পরপুষ্ট, পরের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে, তাহার এ অবস্থা হইবেই। কোন নির্দ্দিষ্ট জীব মধ্যে, যাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাহাদিগের তুলনায়, যাহারা পরপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কাহারও বা চক্ষু, কাহারও বর্ণ, কাহারও হস্ত,

(১) Retrograde metamorphosis and degeneration. Ency. Brit. Vol. 18 p. 263.

কাহারও পদ, কাহারও উদর, কাহারও বা জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। (১)

এই অবস্থা অধিকতর অগ্রসর হইলে সেই হতভাগ্য পরপুষ্ট জীব কেবল মাত্র একটী ডিম্বাধারে পরিণত হয়। উহার আর কিছুই থাকে না। দেহ ক্রমে অবসন্ন, নিষ্ক্রিয় ও লুপ্ত হইয়া যায়। জীবন-সংগ্রামে দেহের যে পরিচালন হয়, তাহাতে দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। পর-মুখাপেক্ষীর জীবন-সংগ্রাম নাই; তাই তাহার দেহের পুষ্টিও নাই। আর সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার উন্নতির আশাও নাই। প্রায় সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও, উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতি আরম্ভ হয়। সে অবনতি পরিশেষে পরপুষ্ট জীবকে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত করে। পরপুষ্ট অবস্থা থাকিলে এই শোচনীয় পরিণামের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই, ইহা নিশ্চিত।

আমরা পরবশতা আলোচনা করিতেছিলাম। পরবশতা জীবরাজ্যে দুই প্রকার দেখা যায়। (২) পরপুষ্টতা; (৩) গৃহপালিত অবস্থা। এই দুই-ই অতি গুরুতর বিষয়, এবং বহু বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। উপরে অতি সংক্ষেপে পরপুষ্টতার পরিণাম ফল ইঙ্গিত করিয়াছি। এক্ষণে তদ্রূপ সংক্ষেপেই গৃহপালিত অবস্থার ফল কীর্ত্তন করিব। এই দুই অবস্থাতেই জীবগণ স্বীয় চেষ্টায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকে। সুতরাং ফলও যে হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। গৃহপালিত পক্ষী ক্রমে উড়িতে অক্ষম হইয়া যায়; গৃহপালিত মৃগ ক্রমে দৌড়াইতে অপটু হয়। ডারউইন্ গৃহপালিত এবং স্বাধীন হংসের পাখার ও পদ-যষ্টির অস্থি সকল তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, গৃহপালিতের পাখার অস্থি ওজনে কম এবং পদ-যষ্টি ওজনে বেশি হয়। (১) ইহার কারণ এই যে, গৃহপালিতের আহারান্বেষণের নিমিত্ত উড়িতে হয় না, অথবা অতি অল্পই উড়িতে হয়; তাই তাহার পক্ষাস্থি ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনেক গৃহপালিত জীবের বংশ হানি হইয়া থাকে। উহারা হয়ত কারাবাস সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়াই যায়; নচেৎ অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা অনেক স্থলেই হ্রাস হইয়া যায়। গৃহপালিত অবস্থারও পরিণাম দৈহিক দুর্ব্বলতা ও অবনতি (২) ইহারও কারণ, সেই স্বাবলম্বন-হীনতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরপুষ্ট এবং গৃহপালিত জীব উভয়েই স্বাবলম্বন ত্যাগ করা হেতু দেহাংশে নিতান্তই অধঃপতিত হইয়া যায়।

দেহের ত এই অবস্থা হইল, কাজেই মনের যে অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে আর বাকী থাকে না। অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অধঃপতন অনিবার্য্য। পরিচালনের অভাবে অস্থি, পেশি সুতরাং স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অবনত হইয়া গেল; তখন মনোবৃত্তি কখনই উন্নত থাকিতে পারে না। দেহ পীড়িত কিম্বা অবসন্ন হইলে মনও তদ্রূপ হয়। যে পক্ষী উড়িতে অক্ষম

(১) This mode of life * * * reacts upon the parasite itself, as is manifested by the aberrant and degraded structure of parts (directly and indirectly) concerned in nutrition and even of the reproductive system. —Ibid p. 268.

If the parasitic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears; the active, highly gifted crab, insects may become mere sack.

Ray Lankester, Degeneration p 33.

(১) Origin of Species, (1901) p 19.

(২) Variation of animals and plants under domestication.

হইল, যে সিংহ মৃগয়া করিতে অনভ্যস্ত হইল, যে মৃগ দৌড়াইতে অপারগ, তাহার মনও সেই পরিমাণে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়। পক্ষী গগন মার্গে উড্ডীন হইয়া মুক্ত বায়ুতে, মুক্ত আকাশে, কত কি দেখিত, কত কত কি ভাবিত; কত আনন্দই উপভোগ করিত! পিঞ্জরাবদ্ধ সে সকল ভাব কোথায় পাইবে? সিংহ মৃগয়া কালে স্বাধীন ভাবে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিত, আবদ্ধ হইলে তাহা কোথায়? স্বাধীন ভাবে আপন জীবন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে দেহ ও মনের যেরূপ পুষ্টি সাধিত হয়, পরপুষ্টের তাহা হইতেই পারে না। জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিলে উত্তরোত্তর বুদ্ধি ও কৌশল, ধীরতা ও সাহস প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি সকল যেরূপ ভাবে উৎকর্ষতা লাভ করে, তাহাতেই ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এ সকল যদি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে মস্তিষ্ক ক্রমে জড়তা প্রাপ্ত হয়; এবং মনও ক্রমে অধঃপাতে চলিয়া যায়। পরাপেক্ষীর দেহ ও মনকে অবনতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। কার্য্যের অস্ফুরণেই জড়তা; তাহা পরবশতার অনিবার্য্য ফল।

জীব জগতে ইহা প্রমাণিত সত্য। মানব জীব জগতের বাহির নহে। জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল মানবে ও অন্য জীবে তুল্যরূপেই প্রযোজ্য। সুতরাং মানবও যখন স্বচেষ্টায় জীবনের (পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক) কার্য্য সকল করিতে ক্ষান্ত ও অনভ্যস্ত হইবে, তখন তাহার পক্ষেও অধঃপতন অনিবার্য্য। তাহার দেহ ও মন ক্রমে অবনত ও অবসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল পরের হস্তে ন্যস্ত করিবেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতা লোপ হইবেই, বুদ্ধি বৃত্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবেই।

পিপীলিকা হইতে নবাব ওয়াজেদ আলী পর্য্যন্ত, পর-প্রত্যাশী হইলে সকলেরই মানসিক অবস্থা একরূপই হইয়া যাইবে। এক লাল পিপ্‌ড়ার ভৃত্য কাল পিপ্‌ড়া ছিল; কাল না খাওয়াইয়া দিলে, লাল পিপড়াটী মরিয়া যাইবে, তথাপি সম্মুখস্থ আহার স্বচেষ্টায় গ্রহণ করিবে না। পরিচর্য্যা পাইতে পাইতে লালটী স্বাবলম্বন হারাইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। তাই অধ্যাপক ওয়েয়ার বলিয়াছেন, পরাপেক্ষীর দেহের সহিত মনও অধঃপাতে যায়।* মানবের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই সত্য। † পরাপেক্ষী প্রভু এবং পরবশ দাস উভয়ই তুল্যরূপে অধঃপতিত হইবে। পরবশতা কখনও বা দেহকে অগ্রে আক্রমণ করে, পরে মন অবসন্ন হয়; আর কখনও বা মনকেই প্রথমে অবসন্ন করে, পরে দেহের অবনতি উহা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যে পথেই হউক, এ ফল হইবেই, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বরং অন্য জীবের অপেক্ষা মানবের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই এই শোচনীয় অবস্থা উৎপন্ন হইবে, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়। দৈহিক ও মানসিক স্বাবলম্বনই

* Here we have an example of degeneration in the mentality of an animal incident to the enervating influence of slavery. Weir Dawn of Reason p. 156.

† The influence of slavery on the hunman race * * shows very plainly that man himself quickly (comparatively speaking) loses his stamina when subjected to it. This fact is but another proof of the kinship in all animals, aud the similarity, nay, the sameness of mind in man and the lower animals, mind is the same in kind, though differing in degree.

Ibid p. 157.

ইহার একমাত্র মহৌষধ। দেহ ও মন যুগপৎ এমত ভাবে গড়িয়া উঠা আবশ্যক যে, জীবন-ব্যাপারের কোন অংশে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে না হয়। নতুবা অবনতি ও ক্রমে ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হইবেই। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনই সত্য, কারণ জাতি ব্যক্তির সমষ্ঠি মাত্র, আর কিছুই নহে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহা কখনই সম্ভব নহে; কারণ মানব নিজ নিজ কার্য্য নিজেই সম্পন্ন করিবে, পরপ্রত্যাশা করিবেই না, ইহা কখন হইতে পারে না। ঠিক এ কথায় কোন আপত্তি নাই। মানব সমাজ-বদ্ধ জীব, সুতরাং একে অন্যের শ্রমভার লাঘব করিবেই। নতুবা সমাজ চলিতে পারে না। কিন্তু সমাজের গঠন এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ব্যক্তির আত্মবশতার বিঘ্নজনক না হয়। যখন সমাজ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত হয়, যখন ব্যক্তির মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল এক হইয়া যায়, তখন সমাজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধক ত হয়ই না; বরং বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। এ সমাজ ব্যক্তির সহিত সমভাবাপন্ন। কিন্তু যখন কোন প্রতিকূল সমাজ ব্যক্তিত্বকে পদতলে চূর্ণ করিতে চাহে, তখনই ব্যক্তি ও সমাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি দুর্ব্বল, সমাজ প্রবল। এ নিমিত্ত ব্যক্তি পরাজিত হয়। তাহার ব্যক্তিত্বও নষ্ট করিয়া তাহাকে সমাজের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলে। তখন সে প্রকৃত পরপ্রত্যাশী হয়। নিজের জীবন-ব্যাপারের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই যদি ব্যক্তি সমাজ শক্তির দিকে তাকাইয়া থাকে, অথবা নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তখনই তাহার পরপুষ্টের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়; আর তখনই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। যেমন সমাজ ব্যক্তিকে এই অবস্থায় আনিতে পারে, তেমনি এক সমাজও অন্য সমাজকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে পারে। তখনই উৎপীড়িত সমাজের পতনের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই অবস্থার প্রতিরোধ করিতে না পারিলে ব্যক্তিরও যেমন, সমাজেরও তেমনই, আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়ান্তর নাই।

শ্রীশশধর রায়।

# পারিপার্শ্বিক

বড়ই শক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। শক্ত এই জন্য যে, শার্দ্দূলে এবং মেষে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে;—অসম্ভব যাহা, তাহাই সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। চির-রাজভক্ত নিরীহ ভারতবাসী নাকি আজ শার্দ্দূলের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত! এ সব কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, ঘটনা-পারম্পর্য্যে এ কথা আজ কাল আর অস্বীকার করে, সাধ্য কাহার?

একজন সুবিখ্যাত রাজভক্ত পণ্ডিত সেদিন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—"এদেশের লোকগুলো ক্ষেপেছে কি?—এরা করিতেছে কি? বালীর বাঁধ দ্বারা কি প্রবল স্রোত রুদ্ধ করা যায়?—নিষ্পেষিত হইতে হইতে এজাতির অস্তিত্ব যে একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। আপনারা কি ভাবিতেছেন?"

আমরা প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—"এপক্ষের

কথা ছেড়ে দিয়া আপনি বলুন ত উঁহারা কি আরম্ভ করিলেন? এদেশে এত আত্মদ্রোহিতা, এত দলাদলি, এত বাদবিসম্বাদ, এত জাতি-ভেদের তাড়না থাকিতে কি প্রকারে বিদ্রোহ সম্ভব? তবে ইঁহারা বালকোচিত এরূপ নিষ্পেষণ, নির্য্যাতন, নির্ম্মম ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন কেন? এই গৌরবান্বিত দৃপ্ত ইংরাজ-জাতির মধ্যে একজনও কি এমন বুদ্ধিমান লোক নাই, যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম বুঝাইয়া দিয়া, সকলকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে? ইঁহারা এত ভীত এবং উন্মত্ত হইলেন কেন?"

পণ্ডিত-প্রবর অনেক সুযুক্তির অবতারণা করিলেন, কিন্তু সদুত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে মীমাংসা হইল—এরূপ বিধান না হইলে এই মৃত জাতি জাগিত না, তাই এইরূপ আয়োজন চলিতেছে। "স্বদেশী" আন্দোলনই বল বা "আত্মোন্নতি"র চেষ্টাই বল, সবই স্বদেশদ্রোহিদিগের অদম্য চেষ্টার ফলে নিবিয়া যাইত,—কিন্তু জাগাইয়া রাখিতেছে, বালকের পরামর্শে মূর্খ ভীত ইংরাজগণ। তবে বুঝি সুদিন আসিতেছে।

একখানি বোঝাই নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদী বহিয়া যাইতেছিল। প্রবল স্রোতে পড়িয়া হঠাৎ নৌক খানি জলমগ্ন হইয়া যায়। তাহাতে সব লোক মারা যায়। মহাজনের সব মাল জলসাৎ হয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে একজন সন্তরণ-পটু লোক তীরে উঠিতে পারিয়াছিল। সে তীরে উঠিয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া একমনে কি যেন ভাবিতেছিল। হঠাৎ সেই স্থলে একজন পথিক উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা ডুবিয়াছে, তুই এরূপে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিস্?" সে উত্তর করিল—"নৌকা ডুবিয়াছে, তাহা ভাবিতেছি না। মহাজনের মাল গিয়াছে, তাহাও ভাবিতেছি না। এতগুলি লোক মরিল, তাহাও ভাবিতেছি না। কেবল ভাবিতেছি—এ হলো কি?"

আমরাও দিবা রাত্রি বিস্মিত হইয়া ইংরাজের নিষ্পেষণ-লীলা দেখিয়া ভাবিতেছি, এ হলো কি? লাজপত রায় ও অজিত সিংহ নির্ব্বাসিত হইলেন, সে কিছু না। ভূপেন্দ্র নাথ, বিপিনচন্দ্র ও আরো কত কত সহৃদয় ভারতবাসী জেলে গেলেন, সেও কিছু না। পঞ্জাবে অমানুষী অত্যাচার হইতেছে, সেও কিছু না। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সুশীল কুমার অম্লানচিত্তে বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন, সেও কিছু না। দিবারাত্রি কেবল ভাবিতেছি, এ হলো কি? মেষে শার্দ্দূলে সংগ্রাম,—জগতে চির দিনের অসম্ভব ব্যাপার, কিরূপে ভারতে ঘটিতেছে? এ কথার সদুত্তর কোথায়?

বিজ্ঞেরা বলেন, এজগতে অসম্ভব কি? কত কত স্থানে সাগর ছিল, আজ তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; কত কত স্থানে পাহাড় ছিল, আজ সেখানে মহাসাগর উর্ম্মিলীলা খেলিতেছে। এ জগতে অসম্ভব কি? আলেকজান্দার, সিজার ও নেপোলিয়নের দুর্জ্জয় প্রতাপ আজ কোথায়? এক সময়ের অসভ্য বৃটন ও জাপান আজ জগতে শ্রেষ্ঠ কিরূপে? এজগতে অসম্ভব কিছুই নাই। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকিতে উন্নীত হইবেন, সল পল হইবেন, আগষ্টাইন সেণ্ট হইবেন, কে জানিত? অসভ্য জাপান আজ দিগ্বিজয়ী হইবে, কে পূর্ব্বে জানিত? মেষই এক সময়ে শার্দ্দূলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অসম্ভব এ জগতে কিছুই নাই।

তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, আট শত বৎসরের পরাধীনতা এদেশ-

বাসী মানুষকে একেবারে পশুর ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, ইঁহাদের জাগরণ সম্ভব কি? আটশত বৎসরের অত্যাচারে অত্যাচারে ভারতের মনুষ্যত্বের যাহা কিছু ছিল, সব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ধার আশা কোথায়? বিজ্ঞেরা বলেন, দুর্দ্দম্য বলির দর্প এবং দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার এবং দর্পী রাবণের সতী-পীড়ন কিরূপে প্রশমিত হইয়াছিল? বিজ্ঞেরা বলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য ভগবানের অবতরণ, এ জগতের প্রত্যক্ষ ঘটনা। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদের অবতরণ মিথ্যা বা কল্পনার লীলা নয়।

বাস্তবিকই বারম্বার বলিতেছি, বর্ত্তমান ঘটনানিচয়কে যাঁহারা মানবীয় ইচ্ছাচালিত ঘটনা বলিয়া বুঝিতেছেন, তিরস্কার, গালাগালি এবং ভর্ৎসনা করিবার তাঁহাদের অনেক কথা আছে; কিন্তু যাঁহারা নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিবেন যে, ইহা ভগবানের বিধান, তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে, নিষ্কাম ধর্ম্মের জয় হইতেছে দেখিয়া, নীরবে ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইবেন এবং বলিবেন, নির্জ্জনতা এবং সজনতা, সম্পদ এবং বিপদ, পুষ্পশয্যা এবং কণ্টকশয্যা, আলিঙ্গন এবং প্রহার নির্য্যাতন—সকলই বিধাতার অযাচিত দান, তাহাতে উল্লাস বা ভয়, আনন্দ বা ক্রন্দনের কিছুই নাই। তাঁহারা বলেন—"ঘরও যাঁহার, জেলও তাঁহারই; হরি যদি মারেন, কে রাখিতে পারে?" ভগবৎ-প্রেরণায় যাঁহারা কাজে লিপ্ত, এ সংসারের কোন্ অবস্থা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে?

ভীত কে? যে রিপুর তাড়নার অধীন। আর ভীত সে, যে স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া, পদ্মপত্রের জলবৎ অস্থির ও চঞ্চল এই সংসারকে সারজ্ঞান করিয়াছে। আর ভীত সে, যে পাপে তাপে জর্জ্জরিত,—বিলাস সুখে নিমজ্জিত, যাহার পরার্থ-জ্ঞানে আজও দীক্ষা হয় নাই। বিশ্বপ্রেমিক যে, সে চিরনির্ভয়;—সে সংসারকে জয় করিয়া সংসারের উপর ভগবানের ঘর বাঁধিয়াছে;—সে চির উদার, সে চির অমর। সকল অবস্থাকেই সে ভগবানের বিধান মনে করে, এবং সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হয়। এ হেন ভক্তকে যে মারিতে যায়, সে আপনি মরিয়া যায়। খ্রীষ্টকে যাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়, আর খ্রীষ্টই বা কোথায়? মহম্মদকে যাহারা নির্য্যাতন করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায় এবং মহম্মদই বা কোথায়? মানবজগতে কে রাজত্ব করিতেছে, ভাই, বুঝিতেছ কি? খ্রীষ্ট আপনি মরিয়া তবে জগৎকে জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অম্লানচিত্তে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাই আজ সুমহান মানবরাজ্যে তিনি সিংহাসন পাইয়াছেন। ভয়কে জয় করিয়া অমর মানব সন্তানেরা, ভগবৎ-প্রেরণায়, কি অসাধ্য কার্য্য সাধিত করিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া একবার তাহা চিন্তা কর, বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইবে।

যাহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছে, তাহারা নিজেরা কিন্তু ইতিহাসের কথা ভুলিয়া যায়; ইহা না হইলে এ জগতে পতন এবং উত্থান কখনও হইতে পারিত না। পতঙ্গ অগ্নিতে ভস্ম হইবার পূর্ব্বেও বুঝিতে পারে না, কি কাজে সে লিপ্ত হইতেছে। প্রতিদিন কত লোক মরিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহা দেখি না;—তবুও আমরা বিলাস উল্লাসে প্রমত্ত! এক বাড়ীতে ক্রন্দন হাহাকার, আর এক বাড়ীতে আন-

ন্দোৎসব।। "ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে।" অন্যের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া যিনি উল্লসিত, তিনি জানেন না, তাঁহার মস্তকও একদিন ছিন্ন হইতে পারে? হায় আওরঙ্গজেব, হায় সিজর, হায় নেপোলিয়ন! দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাময় মানব-নিয়তির দুরবগাহ্যতা কে ভেদ করিতে পারে? ইংলণ্ডের ইতিহাস কে না জানে? তাহারা যেমন ইতিহাস ভুলিয়াছে, এমন আর কেহ নয়। তাহারা মনে করে, এইরূপেই মহাসুখে সময় চলিয়া যাইবে। "চিরসুখী জন, কভু কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?" বিশেষতঃ পরের ধনে যাহারা পোদ্দারী করিতে শিখিয়াছে, যাহারা চির-অন্ধ। ক্লাইবের স্মৃতি-সংরক্ষণে আজ তাই তাহারা বদ্ধ-পরিকর। ক্লাইব কি করিয়া রাজ্য লাভ করিল, সে ইতিহাস কে না জানে? কিন্তু নীতিধর্ম্মের গৌরবকারী ইংরেজ তাহা আজ ভুলিয়া যাইতেছে, একটুও লজ্জিত হইতেছে না। পলাসীতে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অলীক অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, এখন ক্লাইবের স্মৃতি-সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে! এত মুসলমান-বিজয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণ-কুহকের দিনেও, মুসলমান ভ্রাতারা ইংরাজের চাতুরী বুঝিতে পারিতেছেন না! শত পদাঘাত করিয়া, একটু মিষ্ট কথা বলিলেই তাঁহারা গলিয়া যান! সর্ব্বত্রই ইতিহাসের কাহিনী আজ স্বপ্নের ন্যায় অবহেলিত হইতেছে! যদি এরূপ না হইত, তবে এ দেশ জাগিবে কেমন করিয়া? এ দেশকে জাগাইবার জন্যই, বুঝি বা, এসব অচিন্ত্য ঘটনার সমাবেশ ও আয়োজন। মুসলমান-বিজয়ী ক্লাইবের সঙ্গী স্ক্রাপটন সাহেব মুসলমান-নিষ্পেষণ সম্বন্ধে সানন্দে কি লিখিতেছেন, দেখুন, শুনুন—

"The frist fruit of our success, was the receipt of near a million sterling, which the Soubah paid us on the 3rd July, which was laden on board two hundred boats (part of the fleet that attended us in our march up) escorted by a detachment from the army, which, as soon as they entered the great river, were joined by the boats of the squadron: and all together formed a fleet of 300 boats, with music playing, drums beating, and colours flying; and exhibited to the French and Dutch, by whole settlements they paffed, scene far different from what they had beheld the year before, when the Nabob's fleet and army paffed them, with the captive English, and all the wealth and plunder of Calcutta. Which gave them most pleasure, I will not presume to decide: nor will I attempt to convey an idea of the vast joy of our countrymen at Calcutta, when they heard of our victory." Reflections on the Government of Hindustan with a short sketch of the History of Bengal from the year 1739 to 1756 and an account of the English affairs of 1758 by Luke Scrapton Esq., page 98. M. DCC. LXIII.

ইহাপেক্ষা মুসলমান-বিজয়-মূলক বিদ্বেষ-কাহিনী আর কোথায় পাওয়া যায়? নির্ম্মমরূপে হত সিরাজের সমধর্ম্মী মুসলমানগণই আজ নাকি ইংরাজের পরম বন্ধু! সিরাজের হত্যার অত্যাচার ও প্রায়শ্চিত্ত এ জগতে আজও হয় নাই, তাই তাঁহারা এত উল্লাসে প্রমত্ত! মুসলমানদের বাধ্যতা দেখিয়া তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞান-হারা। কিন্তু সময়ের গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, কে জানে?

তাঁহাদের উল্লাস ও আনন্দের কারণ কত, কত, কত, ভাবিলেও বিস্ময় জন্মে। তাঁহারা এদেশে কজন? কিন্তু আমাদের দ্বারাই তাঁহারা আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছেন! নন্দকুমারের দেশের লোকই আজ তাঁহাদের প্রধান সহায়! আমাদের অর্থবলে তাঁহারা রাজবংশীয় (?) বণিকশ্রেষ্ঠ, আমাদের লোক-বলে তাঁহারা বাদসা, আমাদের পদলেহনে তাঁহারা আজ সম্রাট-চূড়ামণি মহাসম্রাট! আমাদের অযাচিত বিবিধ প্রকার সাহায্য পাইয়া তাঁহারা আজ রাজার জাত

বলিয়া কত অহঙ্কারই না করিতেছেন! আমাদের দেশীয় রাজারা তাঁহাদের সিংহাসন বহিতেছেন, আমাদের অনিন্দিতা সতীরা তাঁহাদের কত সেবা ও অনুকরণ করিতেছেন, আমাদের দেবপ্রতিম ভ্রাতারা তাঁহাদের পদধৌত করিতেছেন! কাজেই তাঁহাদের আস্ফালন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আর বলিব কি? আমাদের ভ্রাতাদের দ্বারাই তাঁহারা কতরূপে আমাদিগকে পদাঘাত করিতেছেন!! সকল কথা ভাবিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়;—আমাদের ভ্রাতারাই, যে অর্থ দশ দিন পর ভস্মে পরিণত হইবে, যে চাকরী অচিরাৎ চলিয়া যাইবে, সেই অর্থ ও চাকরীর মায়াতে, না করিতেছেন, এমন জঘন্য কাজ নাই? কেহ অর্থের খাতিরে, কেহ সম্মানের খাতিরে, কেহ উপাধির খাতিরে, কেহ চাকরীর খাতিরে, ভ্রাতৃবধে আজ উল্লসিত! আমাদের ভ্রাতারাই ঘরের টাকা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহাদের পোদ্দারীর সহায়তা করিতেছেন! তাঁহাদের উল্লাসের ও আনন্দের কারণ আছে বই কি? আমাদের উন্নতির বোঝাই নৌকা আমাদের লোকেরাই ডুবাইয়া দিতেছে!! কাহাকে কি বলিব, আমরা দেখিয়া শুনিয়া মরিয়া রহিয়াছি। কাহাকে কিছু বলিতে হইলে, নিজেকেই অগ্রে বলিতে হয়। উর্দ্ধে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে নিজের মুখেই তাহা পড়ে। কই আমি ত আজও "খাঁটী স্বদেশী" হই নাই, ফিরিয়া ঘুরিয়া নিত্যই ত বিদেশী জিনিস কিনিতেছি। চতুর্দ্দিকের বাজার যে বিদেশী জিনিসে ভরা! কলিকাতায় ৬/৭ খানি বই স্বদেশী চিনির দ্বারা প্রস্তুত করা মেঠাইর দোকান নাই! এত দোকান কিরূপে চলিতেছে? আমরাই ত চালাইতেছি। কাহাকে কি বলিব! যাঁহারা দেশের নেতা, তাঁহারাও, এতদিন পরও, "খাঁটী স্বদেশী" হন নাই, তাঁহারাও কত কত বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেছেন! কাহাকে আর কি বলিব? আমরা দেখিয়া শুনিয়া মরিয়া রহিয়াছি, তাঁহাদের আনন্দ ও উল্লাসের কারণ আছে বই কি? যাহারা মরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের আবার মৃত্যুর ভয় কি? "সমুদ্রে যার শয্যা, শিশিরে তার কি করিবে?" তাঁহাদের উল্লাসের কত কত কারণ আছে!! আমাদের দেশে সমবেদনার আজও জন্ম হয় নাই;—এক দলের নিষ্পেষণে অন্যদল হর্ষোৎফুল্ল! রাজভক্তদের "পাতিতে" বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই;—কিন্তু তাঁহারা কাহারা?—তাঁহারা আমাদেরই নন্ কি? আমরা কেন আজও তাঁহাদিগকে আমাদের করিতে পারিলাম না? তাঁহারা কেন আমাদের পর রহিলেন? দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়, এদেশে জাতীয় "একতা" আজও সুদূরে রহিয়াছে!

কিন্তু এ দুর্দ্দিন থাকিবে না;—আমাদের ভ্রাতারা আবার আমাদের হইবেন এবং তাঁহাদের উল্লাস এবং আনন্দ একদিন নিশ্চয় বিধাতার বিধানে নিরানন্দে পরিণত হইবে। যে কারণে তাহা হইবে, তাহার আয়োজন হইয়াছে। সে কারণ আর কিছুই নয়;—সে কারণ কেবল—অত্যাচার। বিনা দোষে ভারতের নরনারীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইতেছে, এ জগতের নিয়ন্তার নিরপেক্ষ ন্যায় বিধানে কখনও তাহা অবিচারিত থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। এইরূপ অত্যাচারে বিধাতা চটিবেন, ভ্রাতারা চটিবে, যাহারা আজ ইংরাজের পা চাটিতেছে, তাহারাও ক্রমে ক্রমে চটিবে; এবং এই অত্যাচারের পথ ধরিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে;—নিষ্কাম স্বদেশানুরাগ। যখন নিষ্কাম স্বদেশানুরাগ অবতরণ করিবে, তখন 'সব ভাই এক ঠাঁই' হইবে এবং ইতিহাস রূপান্তরিত হইবে। দুঃখী ভাই, তুমি আজ বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইও না;—"চিরদিন সমান না যায়,"—চিরদিন একই ভাবে থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও—এ দুর্দ্দিন নিশ্চয় চলিয়া যাইবে। জান না কি, এলবা হইতে নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে পুনঃ প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কত হাজার হাজার সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল? কিন্তু—ইতিহাস সাক্ষী দিতেছে, কোন সৈন্য দেশের অকৃত্রিম সুহৃদের বুকে শেল বা আগ্নেয়াস্ত্র চালিত করে নাই! ভাবিতেছ কি? কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটী স্বদেশ-প্রেমিক-স্বর্ণের আবির্ভাব হইলে, দেশদ্রোহী লক্ষ লক্ষ পা-চাটার-দলভুক্ত সৈনিকেরাই, ঐরূপ স্বদেশ-প্রেমিকদের জন্য রক্তদান করিবে। সহস্র "গুপ্ত," "লাহিড়ী" এবং "মহাপাত্র" তখন,

কাণ-কাটার ভয়ে নহে, স্বেচ্ছায়, মস্তকে স্বদেশের উন্নতির সিংহাসন ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন;—তখন অর্থ বা চাকরীর মায়া ও কুহক ত দূরের কথা, শত নির্য্যাতন ও অত্যাচারেও তাঁহারা আর স্বদেশদ্রোহিতা করিবেন না। এখন যে তাঁহারা বিপক্ষে রহিয়াছেন, কালাপাহাড়ের ন্যায়, সে কেবল পবিত্র খাঁটি স্বদেশপ্রেমের স্রোতকে দেশে প্রবাহিত করিবার জন্য। তাহারা ইংরাজের সাহায্য না করিলে, ইংরাজ-অত্যাচার থামিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে এ ভারত চিরকালের জন্য মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িবে। তাহাদের দেশ-দ্রোহিতা দেখিয়া ভয় পাইও না। বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু প্রকৃতপক্ষে অধিক উপকারী, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, নিষ্কাম ব্রত-সাধনে বদ্ধপরিকর থাকিবে। মনে রাখিবে, —তাহাদিগকে "স্বদেশী"তে দীক্ষিত না করিতে পারিলে, কিছুতেই "একতা" এদেশে আসিবে না। বড় শক্ত কথা বলিতেছি? সত্যই শত্রুকেও মিত্রবৎ জ্ঞান করিতে হইবে এবং ভ্রাতাদের পদাঘাতের পরিবর্ত্তে, পিতা মাতা যেমন সন্তানের শত অপরাধ, শত পদাঘাত মার্জ্জনা করিয়া কোলে তুলিয়া লয়েন, সেই প্রকার, আলিঙ্গন দিতে হইবে। স্বদেশের জন্য, —কেবল স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, এইরূপ অহেতুকী প্রেমের সাধনায় যখন সন্তানবৃন্দ সিদ্ধি লাভ করিবেন;—তখন দলে দলে স্বদেশদ্রোহী লোকেরা "স্বদেশী"র পুণ্য-গঙ্গা-তীরে সম্মিলিত হইয়া পূত-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে এবং মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আকাশ কাঁপাইয়া, এক-জ্ঞান, এক-ধ্যান, একব্রতধারী হইয়া—"মহা একতা"কে আনয়ন করিবে! তারপর?—তারপর আর কি, পূর্ব্বেও যেমন লিখিয়াছি, এখনও তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছি,—বিনা দেহপাতে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত হইবে। কঠোর ব্রত, কঠোর সাধনা ভিন্ন তাহা হইবে না; নিশ্চয় জানিও। নিশ্চয় জানিও, অপ্রেম, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ—সব নির্ব্বাণ করিয়া, লক্ষ্মণের ন্যায়, "অজপায়" সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। জানিও, নিশ্চয় জানিও, ভক্তবৎসল দয়াল হরি, অত্যাচারিত ধ্রুব প্রহ্লাদকে ভুলিয়া থাকিবেন না—থাকিতে পারেন না। সাধক হও, তবে ত দেশ জয় করিতে পারিবে? দেশ জয় করা বালকের নৃত্য নয়, জানিও, নিশ্চয় জানিও।

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৮। ফলশ্রুতি। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ১৲। ইহা একখানি মৌলিক গ্রন্থ; কোন কোন অংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ণ বাবু একজন চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা এবং ভাষানুরাগের বিশেষ পরিচয় এই পুস্তকে পাইয়াছি। তাঁহার সমতুল্য গদ্য-লেখক এদেশে বড় অধিক নাই। ফলশ্রুতি অতি সুন্দর পুস্তক হইয়াছে।

৯। ময়না শ্রীতারকনাথ সান্যাল বি-এ প্রকাশক, মূল্য ৸০; আসামের চিত্র লইয়া এই নাটকখানি লিখিত। গ্রন্থকারের চিত্র আঁকিবার ক্ষমতা বেশ আছে। ময়নার সুচিত্রিত কাহিনী পাঠ করিলে অনেক সুশিক্ষা পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের মহৎ উদ্দেশ্য সুফল-প্রসূ হউক।

১০। চিন্তা নির্ঝরিণী। শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৸০। লেখকের বাঙ্গালা লিখিবার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম, কিন্তু চিন্তার তেমন পরিচয় পাইলাম না। সাধনায় রত থাকিলে গ্রন্থকার কালে একজন আদর্শ-গদ্য-লেখক হইতে পারিবেন।

১১। উপনিষদের উপদেশ। শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত, মূল্য ২।০। উপদেশগুলি নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণ অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই গ্রন্থের অবতরণিকা এক অপূর্ব্ব জিনিষ; গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা এবং প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এরূপ অবতরণিকা বাঙ্গালা ভাষায় আমরা আর পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোকিলেশ্বর বাবুর নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এদেশ বিশেষ রূপ ঋণী হইলেন। এ গ্রন্থ ঘরে ঘরে অধীত হইলে আমরা সুখী হইব।

# ভারতের বহিরাষ্ট্রনীতি

ভক্ত কবি কবির বলিয়াছেন :—

কাল্ করে সো আজ কর,
আজ করে সো অব্
পলমেং পরলে হোয়েগো
বহুরি করগো কব্ ?

অর্থাৎ কাল যাহা করিবার, তাহা অদ্যই কর এবং অদ্য যাহা করিবার, তাহা এই মুহূর্ত্তেই কর। কারণ পলকে প্রলয় হইতে পারে ; অতএব সৎকার্য্যাদি করিবে কবে ?

মনীষীগণ যাহা তড়িৎবেগে উপলব্ধি করিতে পারেন, স্থূল জগতে তাহা অত সহজে হয় না। অনেকে দৈনন্দিন জীবনে কোন রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, বা ধর্ম্মনৈতিক কোন বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিবার অবসর পান না। কাজেই মেষযূথের ন্যায় উর্দ্ধ এবং পরিতঃদৃষ্টি পরিহার করতঃ একে অন্যের পশ্চাদ্‌গমন মাত্র করিতে তৎপর হয়।

এই শান্ত, নির্ব্বিঘ্ন অথচ বিপদ্‌সঙ্কুল ক্ষুদ্র-দৃষ্টি আপাতমধুর জীবনযাত্রার পথ সরল করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা জাতীয় বহুমুখী কল্যাণের দ্রষ্টা, তাহারা উর্দ্ধতর পাদ-পীঠ হইতে ঈশানকোণে পুঞ্জীভূত মেঘখণ্ড দেখিবা মাত্রই দেশকে সচকিত করিয়া দেয়। সে জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত বা তির-স্কার করা বিরল ব্যাপার নহে, পরন্তু এই ভগ্ন-স্বপ্ন, অলস-মন্থর জীবরাজ্যের অভিশাপকে তুচ্ছ না করার দৃষ্টান্তই বিরল।

কোন্ মুহূর্ত্তে, কোন্ শুভলগ্নে বিধাতার অদৃশ্য ইঙ্গিতে জাতীয়চিত্ত উন্মত্ত, চঞ্চল, ভীম-ভীষণ হইয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে নূতন-তর কোন মিটিরিয়লজিকাল সায়েন্স অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই ; কিন্তু আগ্নেয়গিরির ন্যায় হঠাৎ শান্ত পল্লীরাজ্যেও বিদ্যুৎমালা-জড়িত বিশ্বগ্রাসী-বহ্নির লেলিহান রসনা ভৈরবমন্ত্রে অপ্রত্যাসিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতে পারে, ইহা গত দু' হাজার বৎসরের ইতিহাসে বহু সহস্রবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত যাহা নহে, তাহা সহজে কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠে না। মানবেতিহাসের মূল তথ্যও ঢক্কানিনাদের সহিত অবিরত প্রচার করিতে হয়। মোট কথা, মানুষের একটা অনির্ব্বচনীয় নেশা আছে, জগতের উদ্‌গ্র-অন্তস্তল প্রবাহিত বিরাট ভাব-স্রোত তাহার সব সময় মনে আসে না। একবার ষ্টীমের ধাক্কায় রেল-গাড়ী যেমন প্রথমতঃ খানিকটা বেশ সতেজ ভাবে চলে, তারপর আবার মন্থরগতি অব-লম্বন করে, মানব-সমাজও, তেমনি, জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের ভাবপুঞ্জের সংঘর্ষে জাগ্রত হইয়া কিছুকাল প্রবলবেগে বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখে চলিতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা স্খলিত হইয়া দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন বিচারহীন জীবের ন্যায় আহার বিহারের কলনাদে মাত্র সকলে ডুবিয়া থাকে।

এই আলস্য-সুখটীর উপর বহুকাল পরে

আজ হঠাৎ একটা আঘাত লাগিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ইহা সামাজিক হৃদ্‌পিণ্ডের একটা সাময়িক বিকার মাত্র; কিন্তু বিষয়টা যে এত সহজ নহে, ইহার পরিণাম কেবল দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র নহে, তাহার প্রমাণ অল্পবিস্তর বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে।

জগতে পলকে অনেকবার প্রলয় হইয়াছে, এই সহজ কথাটী বিশ্বাস করিলে, আমার বক্তব্য কথাটী অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে।

জগতের ইতিহাসে রাজ্যলাভ অপেক্ষা রাজ্যরক্ষা ব্যাপারটীই গুরুতর। রাজ্যলাভ সহজ কথা, কিন্তু দীর্ঘ কাল উহা অক্ষুণ্ন রাখা এত দুরূহ যে, বহু বহু অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি হইতে নানা মৌলিক তথ্য প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা উহার বহুমুখী পন্থা ও প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে অনেক ভাবুক এবং দার্শনিক চেষ্টা করিয়াছেন, যুগাগত ইতিহাসলব্ধ এই জ্ঞানকে ক্ষমতামদে উন্মত্ত রাজপুরুষদের অবজ্ঞা করা আশ্চর্য্য নহে, বরং না করাটাই বিস্ময়জনক হইবে, কারণ এরূপ দিকভ্রম না হইলে সাময়িক ভাবে অধঃপতিত জাতিরা দাঁড়াইবে কিরূপে?

যতদূর দেখা যাইতেছে, সাম্রাজ্য রক্ষার মূলভিত্তি, শাসনের ন্যায়পরায়ণতা, বিচারের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, যে দিন সাধারণের চক্ষে ইহা মলিন হইয়া আসিবে, যে দিন অন্যায় এবং অবিচার আরম্ভ হইবে, সেদিন নিঃশঙ্কোচে সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রীয়ভিত্তি উৎপাটিত, স্খলিত এবং চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—রাষ্ট্রীয় নৃপতি-হর্ম্ম্যের মরীচিকা কলেবর পতনোন্মুখ হইয়া টল্‌মল্ করিতেছে।

ইতালীর ইতিহাসে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্যের অধঃপতনের কথা মনে হইতেছে। ইতালীর স্বাধীনতা-বৃত্তির সূত্রপাত ফরাসীদের সংসর্গে আসিয়া ঘটে। ঐতিহাসিক—J. H. Symands বলেন:—

From the period of French rule we may date a new sense of nationality among Italians generated by the military services of recruits drawn together from all districts in Napoleon's armies, by the temporary obliteration of most ancient boundaries by the dethronement of alien and unloved Princes, by the equal administration of one code of laws and by the spirit of revolution which animated all French institutions.

ভিয়েনার কংগ্রেসে ফরাসীর ক্ষমতা ইতালী হইতে অন্তর্হিত হইলে ইতালির রাজবর্গ নিম্নলিখিত ভাবে সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করে:—

Elementary education was narrowed in its limits and thrown into the hands of the clergy. Professors suspected of liberal views were expelled from the universities and the Press was placed under the most rigid supervision. All persons who were known to entertain patriotic opinions found themselves harassed, watched, spied upon and reported. The cities swarmed with Police agents and spies.

ইহার ফল কি হইয়াছিল, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে শাস্ত্রকার শাসন প্রণালীর এই গূঢ় কথা সম্বন্ধে বলেন:—

"বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃসপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥"

কত কত রাজা অবিনীততা দোষে দূষিত হইয়া, তুরঙ্গমাদি ধর্ম্মসম্পন্ন হইয়াও নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কত কত লোক চিরবনগামী হইয়াও বিনয়ের বলে অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রকার উদাহরণ দিতেছেন:—

বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ
সুদাসোযাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।৪১

বেণরাজা, নহুষ রাজা, যবনকুলসম্ভূত সুদাস, সুমুখ ও নিমি, ইঁহারা সকলেই অবিনয় দোষে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রকার যেন ঐতিহাসিকের ন্যায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক একটী করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাটগণের নাম উল্লেখ করিয়া ভবিষ্য নৃপতিগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

Tiger qualities লইয়া যাহারা অবিরত বালকের কোলাহল করিতেছে, বিরাট জগদিতিহাসের কলেবরে লোষ্ট্রকরকার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তিধারী নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকার বলিতেছেন ঃ—

বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ" ।৩৯

বিনীতাত্মা নৃপতি কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ন্যায়দণ্ড-স্খলন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন—

দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ
ধর্ম্মাৎ বিচলিতংহন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ।২৭

যেহেতু মহাতেজস্বী দণ্ডশাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য নৃপতির ধারণের অযোগ্য। যাহার সদসদ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি দণ্ড বিধান করিবেন না। কেন না, রাজধর্ম্ম-রহিত নৃপতি এইরূপে দণ্ডবিধান করিলে পুত্র বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

সৎ অসৎ বিবেচনা বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের এই তীক্ষ্ণবিচার অমূলক নহে। জগতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের উৎসমুখে দেখা গিয়াছে, যে পরিমাণ অত্যাচার, অধর্ম্ম, রক্তপাত, লুণ্ঠন প্রভৃতির কলঙ্কিত সাহায্যে সাম্রাজ্য লাভ করা যায়, সেই পরিমাণ অকলঙ্ক বিচার, সত্য-নিষ্ঠতা, কোমলতা এবং হৃদয়বত্তা উহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন। ভিত্তিমূল কখনও অন্যায়ের দ্বারা পুষ্ট হইয়া জীবন লাভ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্য স্থাপনের কালে এবং সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে অতীত এবং বর্ত্তমান এই উভয়ের দিকে সমভাবে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। অন্যায়ের বীজ যদি কখনও অলক্ষ্য ও দুর্লক্ষ্য অবহেলার ফলেও উপ্ত হয়, তবে প্রজার সাময়িক বিশ্বাস হইতে কেবল রাজা যে বঞ্চিত হয়, এমন নহে, উহার অন্তস্তলে ঐ বিষ-বৃক্ষের বীজ এমন সতেজ ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে যে, শেষে রাজার প্রাণপণ চেষ্টাও উহার ভিত্তি উৎপাটনে অসমর্থ হইয়া ওঠে, এই জন্য মনুসংহিতাকার কহিয়াছেন—অর্থাৎ সকল কার্য্যের উত্তর কালে কি গুণ কি দোষ, ইহা বিচার করিতে হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সমাগত প্রাচ্য নৃপতি আমীর হাবিবুল্লার উচ্চারিত একটা উক্তি অনেকের মনে থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে পদার্পণের অব্যবহিত পর হইতেই তিনি অনেকবার এই কথাটী বলিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান হর্ম্ম্যে, কুটীরে, রাজপথে এবং সঙ্কীর্ণ গলিতে নির্ব্বিবাদে আনন্দের সহিত কালযাপন করিতে পারে। তিনি এই কথাও বলেন যে, আফ্‌গানিস্থানে তাহার হিন্দু প্রজাও আছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ ধর্ম্মগত এবং রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাচ্য নৃপতি ও এসিয়ার অন্যতম শক্তি কেন্দ্ররূপী রাষ্ট্রীয় যজ্ঞের হোতারূপে ঐ সনাতন সত্য অনুভব করিয়াছেন। এই ন্যায়পরায়ণতার উপর অধিষ্ঠিত থাকাতেই বর্ত্তমান আফগান্ রাজ্য উত্তরোত্তর শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে।

কিছুকাল হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার এই মৌলিক উপাদানটী ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় নৃপতির ক্ষমতা পরিধির মাঝে অবহেলার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; এই কথা অনেকেই দেখিয়াছেন।

কাজেই ইহা কল্পনা করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে যে, হয়ত অলক্ষ্যে এই অবহেলার আনুকূল্যে উর্ব্বর রাষ্ট্রকলেবরে এমন কিছু জন্মগ্রহণ করিতে পারে, যাহা পলকে দেশে প্রলয়ের তোলপাড় উপস্থিত করিবে।

আগ্নেয়গিরির বহিঃপ্রকাশের পূর্ব্বে তেমন কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু ভিতরের পুঞ্জীভূতশক্তি এমন অন্তর্গূঢ় দিনব্যাপী ক্ষমতার বীজ ধারণ করিয়া বাড়িয়া উঠে যে, উহার উপর কোন কবিরাজের প্রলেপ দিয়া কিম্বা কোন অদ্ভুত রসায়ন প্রয়োগ করিয়া উচ্ছ্রিত নভোমুখীগতি নিরুদ্ধ করা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

সত্যের বিরাট ভাবস্রোতকে যদি কোন উপায়ে প্রতিহত করা যায়, তবে উহা দুর্ব্বলতার কোন ক্ষুদ্র রন্ধ্রও অবলম্বন করিয়া বিরাট অন্যায়ের গর্ব্বিত মূর্দ্ধাকে ধূলিসাৎ করিবে।

পুরাণ-কথিত দময়ন্তী-পতি নল নৃপতির কলেবরে শনির প্রবেশের ন্যায় অধর্ম্ম প্রবেশের যাবতীয় পন্থা অর্গলরুদ্ধ না করিলে বিবাদ ঘটে এবং যে রাজ্য অবিনশ্বর অক্ষয় বলিয়া মরীচিকা সৃজন করে, তাহা মুহূর্ত্তের মাঝে হাওয়ায় উড়িয়া যায়।

Aristotle উঁহার বিশ্ববিশ্রুত Politics নামক গ্রন্থে tyranny সম্বন্ধে যে কয়েকটা মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি tyrannyকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তৃতীয় বিভাগের সম্বন্ধে তিনি বলেন—

> There is a third species of tyranny which seems to be most properly so called the counter part of kingly path; and this monarchy must needs be a tyranny where one rules over his equals and superiors without being accountable for his conduct and whose object is his own advantage, and not the advantage of those whom he governs, thence he rules by compulsion for no freeman well ever willingly submit to such a government.

এই জন্য সর্ব্বত্র নৃপতিরা স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়া দার্শনিক এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে স্ব স্ব রাজ্যকে সংনীতি এবং সৎ আদর্শমূলক বলিয়া ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। এইজন্য বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়, কোন ক্ষুদ্র রাজ্যকে করতলগত করিয়া সংবাদ পত্রে এবং সাহিত্যে এই ভেরীনিনাদ ধ্বনিত করা হয় যে, সভ্যতা এবং ধর্ম্ম বিস্তৃতির জন্যই ঐ রাজ্যটীকে হস্তগত করা হইয়াছে।

অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই। অবশ্য এই সভ্যতা ও ধর্ম্ম যে কি, ইহার ভিতরে কতটুকু বাণিজ্যের দ্বারা, কি পরিমাণ অর্থ লুণ্ঠন, কিম্বা কতখানি হস্তীদন্তখচিত সোফার (sofa) প্রলোভন বা কোহিনুরের আকর্ষণ কিম্বা উপঢৌকনীভূত স্বর্ণ মুদ্রার অপহরণ লুক্কায়িত আছে, সংসম্বন্ধে কোন বুলেটিন্ বাহির হইতে শুনা যায় নাই। ধর্ম্মজগতের একমাত্র আশ্বাস এবং আনন্দের কারণ যে, এই হিংস্রবৃত্তির উপরে অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাবশতঃ হইলেও ধর্ম্মের পর্দ্দাখানি সরাইয়া এই রক্তগৃধ্নু পিপাসাকে উলঙ্গ করা হয় নাই।

এই সত্য এবং নীতির শুভ্রকঞ্চুক রাখার কারণ আর কিছুই নহে। অন্যায় যদি করিতেই হয়, অথচ অন্যায় যদি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে, তবে ইহা হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা হচ্চে, অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া ঘোষণা করা। অবশ্য ইহার ফল দূরগামী হয় না। এসিয়া এবং ইউরোপ, এই উভয় মহাদেশে জলবুদ্বুদের ন্যায় অনেক রাজ্যের বিধাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তলে পুনঃ পুনঃ উত্থান পতন দেখা গিয়াছে।

কামন্দকীয় নীতিসার নামক প্রাচীন

রাষ্ট্রতন্ত্রীয় গ্রন্থেও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গোড়াকার কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, এতকাল পর্য্যন্ত এই অভ্রান্ত সত্যটী প্রমাণিত হইলেও বার বার ইহা হইতে সম্রাটগণ স্খলিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকে আছে যে সংযমী নৃপতি যেমন সাংসারিক এবং পারমার্থিক—অভ্যুন্নতি সাধনার্থ শুধু নিজের নহে, প্রজাবৃন্দেরও প্রতিভূ, তখন তাঁহাকে দণ্ডীর ন্যায় অপক্ষপাত দোষগ্রস্ত ভাবে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করিতে হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর ন্যায়ের মাঝে মৎস্য ন্যায় নামক ন্যায়ের অর্থ হচ্ছে খাদ্যখাদকের ন্যায়। অর্থাৎ এক মৎস্য যেমন ভিন্ন মৎস্যকে ভক্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করে না, তেমনি জগতে মানুষ মানুষকে কিম্বা জাতি জাতিকে এইরূপভাবে মৎস্যের ন্যায় সদাচরণ করিতে অনেক সময় ইতস্ততঃ করে না। এইজন্য এই ন্যায়কার বলিয়াছেন যে, বিচারে ত্রুটির সাহায্যে সাম্রাজ্য রচনা করার চেষ্টা ছিপের সাহায্য ব্যতিরেকে মৎস্য লাভের চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল। কামন্দকীয়নীতি-রচয়িতা আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন, প্রজাবৃন্দের উৎপীড়ন কখনও সম্পদের সূচনা করে না; ইহাতে যে পাপের সৃজন হয়, তাহাতে নরপতির বিলোপ ঘটে। চৈনিক ধর্ম্মগুরু কনফুসিয়স্ কেবল ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহার্হ উপদেশের অন্তস্তলেও দেখিতে পাই যে, সত্য এবং নীতি বিচার এবং ধর্ম্ম যিনি অবহেলা করিয়াছেন, তাহার পতন ঘটিয়াছে।

Teze-chang এক সময় কনফুসিয়স্‌কে প্রশ্ন করেন, সম্রাট কি কার্য্য করিলে উঁহাকে সুশাসন বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিম্নলিখিত পাঁচটী উৎকৃষ্ট কার্য্যকে সুশাসনের অন্তর্ভূত বলিয়া সম্মাননা দরকার।

(১) ক্ষমতাবান শাসনকর্ত্তা সাধারণের উপকার করিবেন, কিন্তু ব্যয়বাহুল্য হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

(২) এমন কার্য্যভার তাহাদের স্কন্ধে দিবেন না, যাহা তাহাদের মর্ম্মন্তুদ হয়, অর্থাৎ ন্যায়ের পথ তাহাদের পক্ষেও মুক্ত রাখা দরকার।

(৩) অর্থলোভী না হইয়া শাসনের সৌকুমার্য্য রক্ষা করিবেন।

(৪) অবিনীত না হওয়া চাহি, ক্ষমতামদমত্ততা না থাকা চাহি। জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা কিম্বা অসম্মান না দেখান চাহি।

(৫) নৃশংস বা অত্যাচারী না হওয়া চাহি। তাহাকে দেখিলে যেন ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের উৎপন্ন হয়; ব্যাঘ্র-প্রবৃত্তিসঞ্জাত ভয় নহে।

তিনি এতদ্ব্যতীরিক্ত নিম্নলিখিত চারিটী অপকৃষ্ট কার্য্য বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন।

(১) মৃত্যুভয় না দেখানো এবং নরহত্যা না করা, বিচার না করিয়া প্রাণদণ্ড না করা।

(২) অত্যাচার না করা।

(৩) অলস এবং অনাবশ্যক ভাবে আইন রচনা করিয়া কঠিন এবং দৃঢ়ভাবে উহার ব্যবহার করা।

(৪) সৎকার্য্যকে পুরস্কৃত করা।

এই উপরোক্ত ব্যবস্থা হইতে স্বতঃই ধারণা হয় যে, যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বহুমুখী নীতি-পরম্পরার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত উক্তি এবং শাস্ত্রকারগণের মন্তব্য এতদ্ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে, তাঁহাদের উক্তি পলিটিক্যাল্ সায়েন্স নহে, একটা মত প্রকাশ মাত্র। ঐ রূপ উক্তির সাহায্য নেওয়া argumentu m ad hominum মাত্র। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, generalisationএর ক্ষমতা পর্য্যবেক্ষণ হইতে জন্মে। কাজেই observation এবং experiment এর কর্ত্তা উপেক্ষার বিষয় নহে। যুগে যুগে যাহা অহরহ দেখা গিয়াছে, তাহা হইতেই সায়েন্সের জন্ম হয়, কাজেই মহাপুরুষদের কথার পশ্চাতে syllogism এর সুদীর্ঘ ধূমকেতু-পুচ্ছ না থাকিলেও বিশেষ হানি হয় না।

দ্বিতীয় কথা, মহাপুরুষদের সহজ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভৈরব রবের মাঝেও পৃথিবীতে অবজ্ঞাত হয় নাই।

ইংরেজ-রাজ্য চিরস্থায়ী থাকিবে,যাহাদের শিশুপ্রকৃতি এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতেছে, আশা করি, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সত্য নীতিতে আস্থাপন্ন হইলে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইবেন। রাওলপিণ্ডি বা ফোর্ট উইলিয়মের মর্ম্মর দুর্গ, শিম্‌লা এবং কলিকাতার রাজপ্রতিনিধির বিপুল প্রাসাদ-চূড়াবলম্বিত শ্বেতকেতু মূর্ত্তি, রেলওয়েরূপী ভারতবক্ষে রচিত-নীড় উর্ণনাভের বিক্ষিপ্ত লৌহতপ্তজালের ঘর্ঘরধ্বনি, বাষ্পীভূত ও মন্দীভূত হইয়া আসিবে।

রক্তকেতু সৈনিকদলের উল্লম্ফন প্রাভাতিক মেঘাড়ম্বর অজার যুদ্ধ কিম্বা ঋষির শ্রাদ্ধে পরিণত হইবে এবং যে ফরাসি রাজনৈতিক বলিয়াছিল, সম্মিলিত ভারতবাসী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে এমন সলিল প্রবাহ হইবে যে,বিদেশীদের ঐ পরিমাণ তরলপদার্থে ভাসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, তাহার উক্তি নিতান্ত অসময়োপযোগী বলিয়া বোধ হইবে না।

ভারতবর্ষে এইরূপ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে, একথা বিশ্বাস করিলে চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা জন্মে, কারণ পৃথিবীতে প্রত্যন্তবাসী বিভিন্ন রাষ্ট্রতন্ত্রের মাঝে সামাজিকতা তুচ্ছ করার বিষয় নহে। এমন কি,সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জের সহিত কোন সামঞ্জস্য স্থাপন না করিলে কখনও চলিবে না।

এতদিন ইহা করা সম্ভব হয় নাই, কারণ দেশ আত্মবিস্মৃত ছিল। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের ভার ভারতের বিজেতৃশক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল। আমরা অবকাশ এবং অবসরও পাই নাই এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত না হওয়াতে, আত্মশক্তির উপরও তেমন বিশ্বাস জন্মে নাই। আজ ভারতের অন্তর্প্রদেশ এক বিরাট আন্দোলনে সিংহের ন্যায় রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার দৃষ্টি পদতল-দলিত স্পষ্ট তৃণমাত্রে বদ্ধ না হইয়া সুদূরে প্রসারিত হইয়াছে। ভারতবাসীকে আজ জগতের রাষ্ট্রশক্তি এবং রাষ্ট্রীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত সামাজিকতায় প্রবৃত্ত হইতেছে। ষ্টাটগার্টের কনফারেন্সেই হউক কিম্বা কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চেই হউক, সর্ব্বত্র ভাবের আদান প্রদান করিতে হইতেছে।

এই শক্তির আতিশয্য এবং কুলপ্লাবী ভাব স্রোতের বহুমুখী তরঙ্গ আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন হইতেছে।

ভারতের ভিতরের দিকে দৃষ্টি পর্য্যাপ্ত নহে, বাহিরের দিকেও দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কারণ আমরা কেবল ভিতরকে লইয়া জগতে দাঁড়াইতে পারিব না, বাহিরের সঙ্গে বোঝা পড়াও দরকার।

বহুপূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন তাঁহার স্বভাব-সুলভ-চাপল্যে উচ্ছ্বসিত এক বক্তৃতায় ভারতের প্রত্যন্ত দেশবর্ত্তী ভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিচারচর্চ্চা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহা ইংরেজের দিক হইতে দেখা; ইংরেজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নবতর ফন্দি খোঁজা মাত্র। কিন্তু তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়,স্বাধীনতার আস্বাদ যাহারা পাইয়াছে, ক্ষমতার মদমত্ততা যাহারা উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদের ঘ্রাণশক্তি কি তীক্ষ্ণ এবং পিপাসা কি খরতর! অক্ষক্রীড়ায় রত চতুর খেলোয়ার যেমন পূর্ব্বাহ্নে বহুদূরবর্ত্তী সঞ্চালনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হয়, তেমনি জগতের বক্ষের উপর দেশবিদেশ লইয়া যে রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জ অভিনব অক্ষক্রীড়ায় লুপ্তজ্ঞান হইয়াছে, তাহারা, তেমনি, ইতস্ততঃ এবং দূরতঃ, দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারে না।

বর্ত্তমান জগতের "International law" Balance of Power প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে শঠে শঠে যে বোঝা পড়া হইয়াছে, অভাগা আমাদের তাহাতে কোন স্থান নাই। কারণ ত্রিশ কোটী হইলেও জগৎ আজ আমাদিগকে অস্বীকার করিতেছে।

আমাদের শক্তির যতই উপচয় হইবে, ততই আমাদিগের চোখে বর্ত্তমান কুহেলিকাচ্ছন্ন জীব-জগত স্পষ্টতর এবং স্ফুটতর হইয়া উঠিবে। তখন বেলুচিস্থানের শৈলসঙ্গম, মক্কি অন্তরীপের জনসঙ্ঘ, আমাদের চোখে পড়িবে এবং General John Jacob এর সহিত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে মিরনছির খাঁর সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা অজ্ঞাত থাকিবে না। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেলুচিস্থানে ইংরেজের কীর্ত্তিকথা ধরা পড়িবে। বেলুচিস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম উৎসভূমি পারস্য ভূমিতে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হইবে এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, Sir F. Goldsmid সাহেবের নির্ণীত সীমানার কথাও মনে পড়িবে। তখন পারস্যের ভেলভেট মসৃণ গালিচায় অঙ্কিত গোলাপ কিম্বা আঙ্গুরগুচ্ছ কিম্বা কূজন-মুখর পেলবকায় বুলবুলের চিত্র মাত্র চোখে পড়িবে না। ধনকুবের প্রাচীন Crocsus এর জন্মভূমির গ্রীকদেশের সহিত যুদ্ধ, Cyrus এবং Cambysus এর সমরের কথা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে; Xerxes এবং Darius এর মূর্ত্তি স্বপ্নের ন্যায় ভাসিয়া উঠিবে। তখন পারস্য সম্রাটের প্রাচ্যসুলভ বিরাট হৃদয়ের শরীরী ভাব নির্ঝররূপী পার্লিয়ামেণ্ট মাত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, উহা অপেক্ষা নিবিড়তর, ঘনতর, যোগবন্ধন সহজেই এসিয়াবাসী আমাদের মাঝে নবতর জীবন্ত আত্মীয়তা ঘনাইয়া তুলিবে।

কাজেই কার্জ্জন সাহেবের মিশনের উপর আমরা নির্ভর করিয়া থাকিব না। আমাদের যুবকগণের মাঝেও অনেককে পারস্য সভ্যতার মহার্ঘ সম্পদ লাভের জন্য এবং নব আত্মীয়তার বীজ বপন করিবার জন্য ইরাণভূমিতে পদার্পণ করিতে হইবে।

রুষরাজ্যও আমাদের কাছে সুদূরে অঙ্কিত দংষ্ট্রা-ভীষণ ভল্লুকমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত না হইয়া ভ্রাতৃভাবের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে। যদি বর্ত্তমান সময়ে আত্মীয়তা সম্ভব না হয়, পিতা কর্ত্তৃক ত্যক্ত পুত্রের ন্যায় ভ্রাতারা যদি অস্বীকার করে, তবে অন্ততঃ ঘনপরিচয়-জাত প্রেমবন্ধন অসম্ভব হইবে না। এবং আমাদের ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান শক্তি ভবিষ্যতে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার করিতে অসমর্থ

হইবে, মনে হয় না। অবশ্য সকলেই জানে, জগতে দৌর্ব্বল্যের সহিত কেহই সম্পর্কবন্ধনে আসিতে চাহে না।

প্রাচ্য জগতে আরও অনেক কুতূহল-জনক জাতি সম্প্রদায় রহিয়াছে। জাপানের সঙ্গে অল্পদিন হইতে আমাদের সমাজিকতা সুরু হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, চীন আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত দেশ। সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে ইংলণ্ড-জর্ম্মণী-ফরাশী মার্কিন ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ চীনকে ঘন-আলিঙ্গনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু চীনের প্রতিবাসী আমরা বৌদ্ধযুগের পরে কখনও ত চীনের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। অথচ ভবিষ্যতে এসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব-গগনে চীন এবং ভারতের যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতেছি না। আমি মনে করি, জাপান অপেক্ষা চীনের দিকে নজর আমাদের অধিক কর্ত্তব্য।

ফরাশীর Indo-chinaর রাজত্ব এবং ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার কোলাহল আমাদিগকে ফরাসী এবং মার্কিন, এই দুইটী সাধারণ-তন্ত্রবাসী রাজশক্তির সান্নিধ্যে আনয়ন করিবে।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদিগকে সমর-সজ্জায় সাহায্য করার জন্য ইহাদের সহিত আমাদের সামাজিকতা প্রয়োজন মনে করিতেছি। উহা অসম্ভব না হইলেও সম্প্রতি আমাদের সেরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত এবং অন্যায়। কারণ কোন জাতি আত্মশক্তি ব্যতিরেকে জগতে আসন লাভ করিতে পারে নাই। ইহাও ধ্রুবসত্য যে, যাহা স্বহস্তে অর্জ্জন করা যায় নাই, তাহা স্বহস্তে রক্ষা করাও অসম্ভব। কাজেই স্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চিরকাল আমাদিগকে আত্মশক্তির উপর আস্থাবান থাকিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্ব্বল জাতি কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। কাজেই বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ইংরেজের সহিত বন্ধুতা ঘুচাইয়া দুর্ব্বল আমাদের সহিত নূতন সম্পর্ক রচনা করিতে স্বার্থের হানি হইবে বলিয়া অগ্রসর হইবে না। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, আমরাও শক্তিমান। তবে এ সামাজিকতা কেন? এই সামাজিকতার অর্থ হচ্ছে প্রথমতঃ জগতকে বোঝান যে, আমরা নেহাৎ অপদার্থ, প্রতিভা-বিহীন, নির্ব্বাপিত-জ্যোতি পঞ্চ সহস্র বৎসরের পুরাতন মৃত্তিকা-প্রদীপ নহি; ভালমন্দ বিবেচনা করার অধিকার আমাদেরও কিছু আছে; ধর্ম্মসমাজ ইতিহাস বিজ্ঞান আমাদের কাছে নিতান্ত হেঁয়ালি নহে। জগতের বিরাট ভাব-স্পন্দনের সহিত আমাদেরও কিছু যোগবন্ধন আছে। দুর্ব্বল হইলেও আমরা সবলতার আকাঙ্ক্ষা করি, পরাধীন হইলেও স্বাধীনতার বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, অধঃপতিত হইলেও গৃহকোণের পঙ্ককুণ্ডকে সৌরজগৎ মনে না করিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিয়া আসিয়াছি। যদি পলে পলে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে এইরূপে ত্যাগ এবং আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া ভারতের স্বভাবসুলভ প্রতিভার কনকদীপ্তি জগতের সম্মুখে উন্মোচিত করিতে পারি, তবে বঙ্গবিহার, পঞ্জাব গুজ্জর, মহারাষ্ট্র রাজপুতগণের সহিত বহির্জগতের কিঞ্চিৎ নৈতিক এবং ধর্ম্মগত সহানুভূতি জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নহে, আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ যদি কুজ্ঝটিকা-

ছন্ন না হয় এবং উহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোন স্থায়ী-চিত্র মনে জাগে, তবে ভারতের বহির্রাষ্ট্র-নীতির চর্চ্চা এত প্রয়োজনীয় যে, এ পর্য্যন্ত ভাব-জগতে উহার অনুপস্থিতি বিস্ময়জনক। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিও জটিল বলিয়া ভ্রম হয়, অথচ হয়ত তাহা নিতান্ত সহজও নহে। ফলতঃ স্বাধীনরাজ্য, করদরাজ্য এবং মিত্ররাজ্য, দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যের সহিত ভারতের প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক বিচার অনিবার্য্য। এই দূরগামী এবং কষ্টসাধ্য বিচারের সূত্রপাত এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে।

বিভিন্ন রাজ্যের সম্পর্ক বিচারকালে বর্ত্তমানযুগে প্রথমতঃই বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কারণ রাজ্য ও বাণিজ্য, এই তুইটী ব্যাপার বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া আছে। কোন রাজনীতিবেত্তা বলিয়াছেন, বাণিজ্যের অবসান রাজ্যলোভের নামান্তর মাত্র এবং রাজ্যের অবসান ও বাণিজ্যলোপের সূচনামাত্র। কাজেই আমাদিগকে গোড়াতেই বহির্বাণিজ্যের আলোচনা আরম্ভ করিতে হয়। এসিয়ার বাণিজ্য-জগতে ইংলণ্ড, মার্কিন এবং ফরাশীর প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিছুকাল হইতে জাপানও মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কাজেই ভারতের বহির্সম্পর্ক-বিচারে ইহাদের বাণিজ্যব্যাপারে অবহেলা করা যায় না; কারণ বাণিজ্যগত স্বার্থের উপর রাজ্যস্পৃহা নির্ভর করিতেছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার শক্তিপুঞ্জের সহিত আমাদের সম্পর্ক-বিচারের পূর্ব্বে,জাপান, চীন এবং আফগানিস্থান এবং পারস্য প্রভৃতির সহিত আমাদের বন্ধন চর্চ্চা করা প্রয়োজন।

চীন-জাপান যুদ্ধে ভারতের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল না। অনেকে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, একি আরম্ভ হইল? এসিয়ার সভ্যতাও কি এতদিনে বর্ব্বরপাশ্চাত্য হিংস্র নীতির সম্পর্কে আসিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? পরে বোঝা গেল, হয়ত ইহার ফল অশুভ হইবে না। চীন হয়ত ক্ষুদ্র মূষিকের নখাঘাতে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ফলে তাহাই হইয়াছে। চীনে বিগত দশ বৎসরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা কল্পনাতীত ছিল। চীনের বয়কট এবং বহির্বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, তাহা সকলেই জানেন। চীন মনে করে, তাহার জনসংখ্যা এত অধিক যে, নিজের দেশ কলেবরে উৎপন্ন দ্রব্যের বাহিরে রপ্তানি হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, দেশবাসীরা ব্যবহার করিলেই যথেষ্ঠ।

জাতীয় উত্থানের সূচনায় সর্ব্বপ্রথমেই আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়ে, আত্মবিস্মৃতির তুঃস্বপ্ন কেহ দেখে না,China for Chinese, Egypt for Egyptian, India for Indians এই কথা গুলির অর্থ আর কিছুই নহে, ইংরাজ কখনও বলে না, England for English, ফরাশী কখনও বলে না, France For French people. তাহারা মনে করে, সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিই তাহাদের সুখ-সম্পদের জন্য। ইংরেজ লেখকগণ ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে "the Empire on which the sun never sets" বলিয়া গৌরব অনুভব করে এবং সল্‌সবেরী বা রোজবেরী-প্রমুখ মন্ত্রীগণ এই বিরাট-সাম্রাজ্যের অধিপতির উপাধি খুজিয়া হয়রাণ হয়।

চীনকে এইজন্য প্রথমতঃ China for Chinese এই রব ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে।

আমরা চীনের জন্য ব্যস্ত নই, জাপানের জন্যও ব্যস্ত নই, নিজেদের লইয়াই ব্যস্ত। চীন যখন China for Chinese এই ধ্বনি ত্যাগ করিয়া Asia For Chinese এই নবতর রাগিণী সংগ্রাম ভেরীর রবমুর্চ্ছনায় ঝঙ্কারিয়া তুলিবে, তখন আমরা যাইব কোথায়? আমাদের বাণিজ্যের গতিই বা হইবে কি?

কিছুকাল পূর্ব্বে Central News নামক পত্রিকায় শাঙ্ঘাইপ্রদেশস্থ সংবাদদাতার পিকিনস্থ ইংরাজ-দূত Sir Earnest Sato মহাশয়ের সহিত নিম্নলিখিত আলাপ হইয়াছিল।

There is no doubt that the Chinese have been fired by the example set there by Japan. These two last years more specially large numbers of intelligent or quasi-intelligent Chinese youths have been sent over to Japan by the Government for the purpose of studying Japanese methods not only as regards their naval and military arnaments but also their system of Government and administration. These youngmen have also seen that the Japanese do not permit the foreigner to exploit their country by means of mines and railways and naturally they have asked the reason why China cannot do likewise and construct railways and mine materials for her own accounts. One result is the Commissions at present in Europe, appointed for inquiring into various forms of Government existing and to draw up a scheme containing the best principles of all. As regards army there is no doubt that it has been organised on Japanese lines. The cry of China for the Chinese is the natural corolary to the events of the past.

উপরোক্ত উক্তিটী China এর অভ্যুন্নতি এবং নবতর জীবনমার্গে অভিযানের প্রমাণ। কিছুকাল পূর্ব্বে চীন Free Primary Education গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার সংখ্যাহীন মন্দির-শ্রেণীকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যে পরিমাণে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে শুধু আশার কথা নহে, আশঙ্কার কথাও বটে।

নাইন্‌টিন্‌থ সেনচুরী পত্রিকায় ১৯০৬ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে Mr. Gibs চীনের জাগরণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় জনৈক চৈনিক Nationalist কর্ত্তৃক রচিত রাস্তার লগ্ন একখানি Placard এর ইংরেজী অনুবাদ। উহার ভূমিকায় চৈনিক লেখক অধঃপতিত ভারতবর্ষের জন্য আক্ষেপ করিয়া তাহার দেশবাসীর চক্ষে ইহার দুর্দ্দশা-চিত্র দৃষ্টান্তরূপে ধরিয়াছে।

স্বদেশ-প্রেমিক এই চৈনিক রচয়িতা চীনের অভ্যুন্নতির জন্য সাত আটটি পন্থা নিরূপণ করিয়াছে।

১। দেশ-হিতৈষণার চর্চ্চা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ।

২। পাশ্চাত্য প্রণালী-শিক্ষা। পাশ্চাত্য প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-শিক্ষা।

৩। চীনের সমর-শক্তি বৃদ্ধি করা। প্রত্যেক চীনবাসী যেন সমর-নিপুণ হয়।

৪। স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান প্রণালীতে জুতো ব্যবহার না করা, ইহাতে বিশকোটী স্ত্রীলোকের কার্য্যকরী-ক্ষমতা নষ্ট হয়।

৫। অহিফেন-সেবন পরিত্যাগ।

৬। বিদেশী কর্ত্তৃক চীনের খনি লুণ্ঠন করিতে বাধা দেওয়া।

৭। দেশ-কলেবরের মধ্যে ভাবেরও শক্তির বিক্ষেপ নিবারণ করিয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, চীন আর কিছুতেই বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় থাকিতে রাজি হইবে না। জগতের শ্রেষ্ঠতম

জাতি সম্প্রদায়ের পার্শ্বে স্বকীয় আসন গ্রহণ করিবে।

ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ পারিপার্শ্বিক রাজ্য সমূহের শক্তির উপচয় অপচয় সম্বন্ধে এত সূক্ষ্মদর্শী যে, এক রাজ্যে একটী কামান বৃদ্ধি কিম্বা একখানি রণতরী নির্ম্মাণ, হুলস্থূল উপস্থিত করে, তখন অন্যান্য রাজ্যেও ঐ পরিমাণে সমরাস্ত্র-বৃদ্ধির ধুম পড়িয়া যায়।

ইহা অস্বাভাবিক নহে। যখন জগতে নিতান্ত ভালমানুষের মত কেহ নিজের দেশ-কলেবরের মাঝে চুপ করিয়া থাকিতে চাহে না, শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ-মাংসাসী বঙ্কিম-দৃষ্টির কবল হইতে তখন পরস্পরের মুক্তির চেষ্টা দোষাবহ নহে।

কোন প্রলয়ঙ্কর শক্তিবীজ গঠিত হইয়া উঠিলে তাহার জন্য যথাসম্ভব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপ এ কথা বেশ বোঝে। এসিয়াতেই কেবল পরস্পরের ধর্ম্ম-নীতির উপর অখণ্ড বিশ্বাস এতদিন রাজ্য গুলিকে বহির্দৃষ্টি বিবর্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি যখন পরস্পরের ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে,তখন আমাদিগকে প্রত্যন্তবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের অব-স্থার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া সেই অনুসারে আত্মগঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

জাপান সম্বন্ধে বেশী কিছু উদ্ঘাটন করা নিষ্প্রয়োজন।

এসিয়ার সভ্যতার ফলে ইউরোপের ন্যায় উহার আন্তরিক-বর্ব্বরতা নাই সত্য, কিন্তু ইউরোপীয় Diplomacy ষোল কলায় উহার মন্ত্রীদের দেহ পুষ্টি করিতেছে।

অল্পদিন হইল, কোরিয়ার সহিত জাপা-নের ব্যবহারে উহার বহির্রাষ্ট্র-নীতিতে তীব্র-ভাবে ইউরোপীয় ঘ্রাণ পাওয়া গিয়াছে।

জাপান যেরূপ শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে এসিয়াবাসী প্রথমতঃ উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি সে উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়িতেছে। জাপানে ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থীরা টের পাই-তেছে যে, জাপান ঠিক আমাদের বন্ধু নহে। জাপানীরা আমাদিগকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। জগতে দুর্ব্বলকে শ্রদ্ধা করিতে, দুর্ব্বলের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে কেহই চাহে না, কারণ তাহাতে কোন লাভ নাই। লাভ ছাড়া কেহ কোন কাজ করিতে চাহে না। জাপা-নির এই ক্রমবিবর্দ্ধমান শক্তি দেখিয়া ইংরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য ইংরাজ এবং জাপানে অর্থাৎ তস্কর এবং মাতালে একটা বোঝা পড়া হইয়া এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্রে ব্যাঘ্রেই আলিঙ্গন সম্ভব, এবং সেইটা যতদিন থাকে, ততদিন ইতর জন্তুর কথা মনে না নিলেও চলে।

তেমনি ইংরেজ এবং রুসিয়ার সহিত ইংরেজ এবং আফগানিস্থানের সহিত দলিল রচনার সুরু হইয়াছে। এই সন্ধিপত্র গুলি আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। এই কথা সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন, এই সন্ধি-পত্রের মাঝে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কথা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপান চাহে, এসিয়ার মাঝে ইংরেজের অধিকৃত ভারতবর্ষে তাহার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ বাণিজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের স্বার্থের সহিত উহার স্বার্থ জড়িত হইয়া গেলে অনেক সুবিধা আছে।

ভারতবর্ষের দিক হইতে এই সন্ধিপত্র গুলি এই প্রবন্ধে আংশিক ভাবে আলোচিত না হইয়া স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র আলোচনার

যোগ্য। কাজেই উহার বিস্তৃত পর্য্যালোচনা পরিহার করিয়া কেবল মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জাতি-কলেবরে শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারিলে আমাদিগের স্বার্থের দিকে কেহ ভ্রুক্ষেপও করিবে না। কাজেই এই দলিল রচনাটী সুদূরপ্রদেশ হইতে আমরা উপনিষদোক্ত এক শাখার উপরি সমাসীন বিহঙ্গমদ্বয়ের অন্যতমের ন্যায় দ্রষ্টামাত্র।

দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

রুষিয়ার সম্রাট তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের রাজ্যকালে Penjdeh নামক স্থানে প্রথমতঃ রুসিয়া এবং আফগানিস্থানে বোঝাপড়া হয়। সেইখানে একটী ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া যায়। এতদিন বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সেণ্টপিটাস্‌বর্গের কেবিনেটের সহিত রুসিয়া এবং আফগানিস্থানের সীমা নির্দ্দেশের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই সূত্রে তাহারা হঠাৎ রণঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং হিরাটের অভিমুখে রুসিয়ার অগ্রগতি বিরুদ্ধ হয়।

কিন্তু এই কার্য্যেও ব্যাপারটী শেষ হয় নাই। ১৮৯৫ সালে পুনরায় ইংরেজ এবং রুসিয়াতে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় নিকলসের রাজ্যকালে রুসিয়া পূর্ব্বদিকে আত্মবিস্তৃতির চেষ্টা করিয়াছে এবং চীন জাপান যুদ্ধের পরে Shimonoseki সন্ধির মাঝে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। ইহার পরে রুষিয়া সম্রাটের শান্তিনীতি ঘোষণার কথা অনেকের মনে এবং পরিণামে রুষ-জাপানযুদ্ধে রুসিয়ার পরাজয় অনেক মর্ম্মের কথা Tsushima উপসাগরের অতল জলে ডুবাইয়াছে। ইহার পরেই ইংরেজের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে সেই দিনকার নূতন সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সন্ধিগুলির আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই, তবে উহা আলোচনার সূত্রপাতরূপে প্রসঙ্গত দুই এক কথা উল্লেখ করা যাইবে।

স্থানান্তরে বলিয়াছি, জাপান আমাদের বন্ধু নহে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বন্ধু হইতেও পারে না। আমাদের নিজের কল্যাণ নিজকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। জাপান এসিয়ার প্রতি কিরূপ খরতর দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না বটে, কিন্তু ইংরাজ বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। এবার চতুরে চতুরে কোলাকুলি চলিতেছে।

একই পথ অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমে ধর্ম্মের দোহাই, মিসনারির দোহাই এবং প্রচারকের দোহাই, তৎপর অবস্থা জ্ঞান, প্রতারণা, মুখব্যাদান, সর্ব্বশেষ উদরপূর্ত্তি। জাপানের অনেক বৌদ্ধ মিসনারি ভারত, চীন, শ্যাম, রুসিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিতেছে। কিছুদিন হইল একজন জাপান মিসনারিকে ইংরেজ তিব্বতে প্রবেশের অধিকার দেয় নাই। এরূপ ঘটনা আরও ঘটিয়াছে। কিন্তু সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াও জাপানের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ এবং এসিয়ার মানচিত্র খানি তাহাদের কিরূপ ঘনপরিচিত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত কৌতূহলজনক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

এসিয়ার মানচিত্র হইতে সহজেই দেখা যাইবে, ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত এবং চীনের পশ্চিম-সীমান্ত সঞ্জীবিত এসিয়ার ভাগ্যচক্র গণনার দিনে শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিবে। জাগ্রত চীনের দৃষ্টি ভস্মলোচনের ন্যায় প্রথ-

মতই চীনের পশ্চিম-সীমান্তে প্রসারিত হইবে। এই কথা জাপান বিলক্ষণ জানে।

অল্পদিন হইল একজন জাপানী পরিব্রাজক চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্টের পূর্ব্বসীমান্ত অবস্থিত Chittagong Hill tracts এর রাজধানী Rangamatiতে উপস্থিত হইয়াছিল। এই চট্টগ্রাম হিলট্রাক্ট হইতে চীনের সীমান্ত বহুদূর নহে। এই হিলট্রাক্টের পূর্ব্ব এবং চীনের পশ্চিমে কতকটা স্থান আছে, যাহাতে পার্ব্বত্য জাতিরা বাস করেন। ইহা যথার্থত ইংরেজের দখলেও নাই, চীনের দখলেও নাই। ইংরেজ কেবলমাত্র বৎসর বৎসর একখানা পরোয়ানা বাহির করিয়া নিজের প্রভুশক্তির অদ্ভুত নিদর্শনরূপে নিজের কাগজের পুঁটুলির মাঝে বাঁধিয়া রাখে। এই জাপানা পরিব্রাজক গোপনে আসিয়া বলে যে, তাহার এই সীমান্ত স্থানটুকু পদব্রজে পার হইবার খেয়াল হইয়াছে। এইজন্য সে নৌকা, মাঝি, জিনিষ পত্র বাঁধিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উহার স্থানত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই খবর পাইয়া পরিব্রাজকের যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবাসী, এমন কি বাঙ্গালীও, যে সমস্ত স্থানের খোঁজ লইতে ইচ্ছা করে না, সুদূরবাসী হইয়াও জাপান তাহা অধ্যয়ন করিয়াছে। আমরা স্বদেশী হইয়াও যেন বিদেশী হইয়া পড়িয়াছি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিমাত্র। যে শমীবৃক্ষের কোটরে অন্তর-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, উহার বাহিরে, দিগন্তবিস্তৃত বিপুল বিশ্বের দিকে না হইলেও, প্রতিবাসীদের দিকেও াত করিবার অবসর পাইতেছি না। কাজকর্ম্ম, নৃত্যগীত, অনশন-দুর্ভিক্ষ সমাজকে বহির্জ্ঞান-বর্জ্জিত করিয়া তুলিতেছে।

পৃথিবীর পূর্ব্বগোলার্দ্ধের পশ্চিম প্রান্তরস্থিত ইউরোপ, কল্পনায় যে ভৈরব রূপধারী Yellow Peril কল্পনা করিয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, সে Yellow Peril ভারতবর্ষের পক্ষে কি কম মারাত্মক? কাজেই বন্ধুতা কিম্বা শত্রুতা উভয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্মশক্তি সংগ্রহ আমাদের করিতেই হইবে। সম্প্রতি এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ আছেন, যাহারা জাপানকে ব্যাখ্যা করিতে করিতে হয়রান হন্। এই প্রশংসা যদি আমাদের ভারতের স্বার্থে কোন হানি না করিত, তবে আমরা বিশেষ আপত্তি করিতাম না, কিন্তু একটু নিবিড় চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বাহির হইয়া পড়িবে।

অনেকে বলেন, জাপানী শিল্পজাত কারুকার্য্য আমাদের ক্রয় করিতে কোন আপত্তি নাই। এই স্বদেশী এবং স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিশ্বাসটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাতে যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তাহা স্বরাজ আন্দোলনকারীগণ বোঝেন না।

ইঁহারা এই কথাও মনে করেন যে, ইংরেজ এবং জাপানের সন্ধিটা ভারতের পক্ষে কিছুই নহে, একটা বাহিরের ব্যাপারে মাত্র। এসিয়াবাসী জাপান ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম এবং কর্ম্মলীলার স্থল ভারতকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না।

আমাদের এই বালকোচিত বিশ্বাস বর্ত্তমান স্বাধীন রাজ্যের পাকা মন্ত্রীদের গুম্ফতলে কিঞ্চিৎ স্মিত হাস্যের সঞ্চার মাত্র করিতে পারে, তদতিরিক্ত কোন প্রলয় ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিবে না। আমাদের

অতিরিক্ত বিশ্বাসই অতিরিক্ত অনিষ্ট ঘটাইয়া তুলিতেছে।

ঐ ইংরেজ-জাপান সন্ধির সাহায্যে জাপান ভারতবর্ষে আত্মবাণিজ্য বিস্তৃত করিতে চাহে। ইংরেজ ইহাতে যেমন বাধা দিতে পারে না। কাজেই নিরাপদে বাণিজ্য বিস্তৃতির জন্য সৎ অসৎ যাহাই কর্ত্তব্য হয়, জাপান তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। অর্থাৎ ভারতের এই অক্ষম, রুগ্ন, অচল, অব্যয়, মেরুদণ্ডহীন তথা-কথিত শান্তিরক্ষা করিতে জাপান প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। কারণ রাজ্যে শান্তি না থাকিলে বাণিজ্য চলে না। মূলধন খরচ করা যায় না। টাকার সুদ বাড়িয়া যায় এবং পণ্য দ্রব্যেরও মূল্য হ্রাস হয়। শাসন শক্তির চপলতা কিম্বা দুর্ব্বলতা বাণিজ্যের পক্ষে চিরকাল মারাত্মক। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভারতের দলনে এবং পীড়নে জাপান ইংরেজকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।

এসিয়ার ভাগ্যের আবার বোঝা পড়া হইবে। অক্ষম হইলেই ধর্ম্ম উপদেশের দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু ক্ষমতা জাগ্রত হইলে উহা আত্মবিস্তার না করিয়া পারে না। উহার প্রবল সংঘর্ষ পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রশক্তি মাত্রকে সহ্য করিতে হয়। অতএব আমাদের বোঝা দরকার, ভারতের পক্ষেও এই অনুপাতে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সমাগত প্রায় অদূরের সেই বিপুল সংঘর্ষ-সাগরে ইংরেজের Sense of Justice এর উপর সীমাহীন বিশ্বাস, ইংরেজ আদালতের বারান্দায় গাউন কিম্বা চোগা পরিধান করিয়া চলা ফেরা, সাহেবদের মৃদু হাস্য-সঞ্জাত পুলক, বেলবেডিয়ার প্রাসাদে সেলাম চালান, দিল্লি দরবারের হস্তী আরোহণ, কিছুতেই ঠাঁই পাইবে না, তখন উপাধি ও খেতাবরূপী ইংরেজের ফুৎকার-রচিত কাগজের নৌকায় ঝুলিয়া আত্মরক্ষা সম্ভব হইবে না।

হয়ত মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম ভুলিয়া ইংরেজের নাম জপ করিতে করিতে ডুবিতে হইবে।

জাপান কিম্বা চীনের ক্ষমতা সহজ নহে। দুঃখের বিষয়, এই সব কথা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। ইংরেজ হইতে বরং স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, কারণ ভারতে ইংরেজের সংখ্যা কম এবং ইংরেজকে বহুদূর হইতে ভারতে আসিতে হয়। কিন্তু জাগ্রত চীন কিম্বা জাপান যদি এক কোটী লোক লইয়া ভারতের বক্ষের উপর তাঁবু ফেলে, তখন ব্যাপার কিরূপ জটিল হইবে, কল্পনাও করা যায় না।

কাজেই জাপানের বাণিজ্য যাহাতে ভারতে বর্দ্ধিত না হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা প্রয়োজন। জাপান যেন ভারতের শান্তির পক্ষপাতী না হয়।

শান্তির পক্ষপাতী না হওয়াই যদি জাপানের স্বার্থ হয়, তবে আমাদের স্বার্থ এবং জাপানের স্বার্থ এক হইবে। অশান্তির মাঝে এক শ্রেণীর ব্যবসা চলে, যাহা গত বুয়র যুদ্ধে বিখ্যাত ইংরেজ ধনীগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কথা যেন কেহ মনে না করেন, আমি অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয়ের কথা মাত্র বলিতেছি। তাহা নহে, এই অশান্তির সময় জাপানী Capitalistএর স্বার্থ যদি আমাদের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, তবে বড়ই সুবিধা হয়। কিন্তু যদি আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া জগতের শ্রদ্ধা এবং কিঞ্চিৎ ভয় সঞ্চয় করিতে না পারি, তবে আমাদের প্রতি কেহ দৃক্‌পাতও করিবে না।

চীন এই পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আত্ম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া ইংরেজের সহিত কোন বিশেষ সন্ধিজালে আবদ্ধ হয় নাই। ক্ষমতার উপচয় দেখিলে ইংরাজ খোসামুদী করিয়া সন্ধি করিতে যাইবে।

ইংরেজের কথা উল্লেখ করার আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, আমার উদ্দেশ্য এই, কথা বোঝান যে পারিপার্শ্বিক শক্তি সমূহের উপচয় অপচয়ের প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং ঐ দৃষ্টির সাহায্যে নিজেদের মাঝে শক্তির সঞ্চয় করিয়া সকলের শ্রদ্ধা এবং moral support অর্জ্জন করা মাত্র।

আমার বিশ্বাস, শুধু ভিতরের দিকে চাহিয়া নহে, বাহিরের দিকে চাহিয়াও আত্ম গঠন করা দরকার। বহির্জগত যে পরিমাণে ভিতরের পক্ষে প্রয়োজন, এমন আর কিছুই নহে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রতন্ত্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক বিচার করা গেল না। এসিয়ার দুইটী শ্রেষ্ট ধর্ম্ম শক্তির কথা মাত্র উল্লেখ করা গেল।

অন্যান্য আলোচনা পরে করা যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য যে, সকলে যেন এই নবোদ্গত রাষ্ট্রশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। এবং ইহার জীবন পুষ্টির জন্য ইতি মধ্যে যদি আমরা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি, তবে আমাদের প্রতি ব্যবহার ঠিক উল্টা হইবে। এই কথা যেন কেহই ভুলিয়া না যান যে, ইংরেজের হাত হইতে বরং আমাদের রক্ষা আছে, কিন্তু জাপানের হাত হইতে নাই। ইংরেজ বহুদূর হইতে আসিয়া রাজকার্য্য চালাইতেছে, এই দূরদেশে তাহাদের অভাব অসুবিধা অনেক বেশী, ভয় এবং আশঙ্কাও অধিক এবং ইংরেজের সংঘর্ষে সেই পরিমাণে আমাদের সুযোগ ও সুবিধা বেশী এবং সাহস শক্তিও অধিক। কিন্তু জাপানের পক্ষে একথা খাটে না। ভারতে কোন অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইংরেজকে দুই দিকে দেখিতে হইবে। ভিতরের সংঘর্ষ এবং বাহিরের সংঘর্ষ। ইংরেজ যদি ভিতরের দিকে দেখে, তবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ জাপান বাহিরের দিকে দেখিবে। কিন্তু দেশ শক্তিমান হইলে সমগ্র বিরাট ভারতবর্ষকে শাসন করিতে যাওয়া বিপ্লবের দিনে কেবল ইংরেজ কিম্বা কেবল জাপানের কর্ম্ম নহে। উভয়েরই অল্প বিস্তর সমবায়ের সহিত কাজ করিতে হইবে। আমরা যদি ক্ষমতাবান হইয়া উঠি, তবে এই হট্টগোলে বাহির হইতে রুষিয়া, আফ্‌গান্‌ কিম্বা চীনও যদি অল্প বিস্তর ঘটনাস্থলে সাক্ষী হয়, তবে সম্মিলিত ভারতের শক্তিকে কেহ অস্বীকার এবং নগণ্য মনে করিবে না। সেই সন্ধিকালে আমাদের দাবী এবং স্বত্ব সকলকে শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হইবে। নচেৎ ইংরেজ এবং জাপান ভারতবর্ষকে বিভাগ করিয়া দখল করিবে মাত্র। জাপান যেরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতেছে, চীনও যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, দশ বার বৎসরের মধ্যে, ভিতর হইতে না হইলেও, বাহির হইতে ভারতে বিপ্লব ঘটিবে। ইহা অনিবার্য্য। ইহার সম্ভাবনা বিস্মৃত হওয়া মারাত্মক। এই জন্য সকলেই যেন যথাসম্ভব জ্ঞান এবং শক্তি আহরণ করতঃ জাতি কলেবরে এমন স্বাস্থ্য সঞ্চার করেন, যেন যথাসময়ে আমাদের দৈন্য না দেখিয়া দেশকে এবং নিজকে অভিসম্পাত দেওয়ার পরিশ্রমটুকু করিতে না হয়। আমাদের উল্লম্ফন যেন প্রজাপতির নৃত্যে পরিণত না হইয়া যথার্থ বীরজয়স্তিকার অনল-তরঙ্গ লাভ করে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

# শঙ্করাচার্য্যের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম।

নির্গুণ ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা শঙ্কর বারম্বার বলিয়াছেন। জগতের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি শঙ্করের ভাষায় 'কারণ ব্রহ্ম' বা 'সদ্‌ব্রহ্ম' বা 'সগুণ' ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম কিসের দ্বারা 'কারণ ব্রহ্ম' হন্? অব্যক্ত শক্তি দ্বারাই তিনি জগতের কারণ। * শঙ্করাচার্য্য বলেন, এ শক্তি অবশ্যই ব্রহ্মে স্বীকার করিতে হয়; নতুবা শক্তি না থাকিলে জগৎ সৃষ্টি কিসের দ্বারা সম্ভব হইবে? এ শক্তি যে অনাদি ও নিত্য, তাহাও শঙ্কর বলিয়াছেন। "প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎশক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব প্রসঙ্গাৎ" (শারীরক ভাষ্য, ১।৩।৩০ )।পাঠক আবার শুনুন্—"অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া……সা চ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ" (শারীরকভাষ্য, ১।৪।৩)। এ শক্তি যে অচেতন, জড়,—তাহা শঙ্কর ও তাঁহার টীকাকারেরা নানা স্থলে বলিয়া দিয়াছেন। আমরা একটীমাত্র স্থল উদ্ধৃত করিব। বেদান্ত ভাষ্যের প্রসিদ্ধ রত্নপ্রভাটীকাকার এই অব্যক্ত বা মায়াশক্তির বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—"নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং 'জড়ত্বাৎ,' নাপীশ্বরাদন্যত্বং কল্পিতস্য পৃথক্‌সত্তাস্ফুর্ত্ত্যোরভাবাৎ" (২।১।১৪)। এ স্থলে এই শক্তিকে স্পষ্ট 'জড়' বলা হইয়াছে। এই জড়শক্তিই জগতের উপাদান কারণ। এই জড়শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলা যায়। পাঠক আনন্দগিরির কথা শুনুন্—"সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমব্যক্তং; তস্য পরমাত্মপারতন্ত্র্যাৎ পরমাত্মন উপচারেণ 'কারণত্ব' মুচ্যতে, ন তু অব্যক্তবদ্বিকারিতয়া।" শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ, উভয়ই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত ভাষ্যের ১।৪।২৩—২৬ সূত্রে ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই,—তাহা শঙ্কর বুঝাইয়াছেন। জড়শক্তিকেই যদি শঙ্কর স্বীকার করিলেন, তবে আর ব্রহ্মকে কিরূপে উপাদান কারণ বলা যায়? এই তত্বটা অনেকে বুঝিতে চাহেন না। তাই, শঙ্করকে মায়াবাদী প্রভৃতি নানা বিচিত্র আখ্যায় বিভূষিত করিয়া থাকেন! শঙ্কর 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' শব্দদ্বারা এই জড়শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষ্যগুলিতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। আমরা টীকাকারের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্য—'অজ্ঞান' 'অবিদ্যা' ও 'মায়া'—এই সকল শব্দ সেই জড়শক্তির প্রতিই প্রয়োগ করিয়াছেন। "কার্য্যাত্মনা প্রধীয়তে ইতি প্রধানমজ্ঞানমেব" (রত্নপ্রভা, ১।১।২২)। "অজ্ঞানমব্যাকৃতমেবাকাশঃ প্রধানশব্দিত ইতি" (১।৩।১১)। "আত্মাবিদ্যৈব তচ্ছক্তিরিতিসিদ্ধান্তঃ" (১।৩।৩০) "বিচিত্রকারিত্বাৎ মায়া" (১।৪।৩)। "মায়া-

---

* জগৎ—বিকারি ও পরিণামশীল; সুতরাং ইহার অবশ্যই পরিণামি-উপাদান আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। এই অব্যক্ত শক্তিই জগতের পরিণামি-উপাদান। ইহা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত।

বং পরতন্ত্রা ইতি মায়াময়ীতি"। "মায়াং সত্ত্বাদি গুণবতীং" (১।৪।৯)। এই সকল উদ্ধৃতাংশ হইতে পাঠক বুঝিতেছেন যে, অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ 'শক্তির' সহিত একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শক্তির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা ও ক্রিয়া নাই, এই জন্যই ইহাকে অনেক স্থলে 'কল্পিত' বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়াই, এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; এ শক্তি ব্রহ্মই। এইজন্যই, ব্রহ্মই জগতের উপাদান। শঙ্কর বারংবার বলিয়াছেন যে, কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। "কার্য্যং ..কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যং। "কারণাৎ ব্যতিরেকেন অভাবঃ কার্য্যস্য" (শারীরক ভাষ্য ২।১।১৪)। এই জন্যই, যদিও শক্তিদ্বারাই ব্রহ্ম জগৎকারণ, তথাপি ব্রহ্মই জগৎ-কারণ হইতেছেন। এই ভাবেই ব্রহ্মকেই উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। "অব্যক্তস্য পারতন্ত্র্যাৎ পৃথক্‌সত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, আত্মসত্ত্বয়ৈব সত্তাভাবাচ্চ, অতো ব্রহ্মণঃ নাদ্বিতীয়ত্ববিরোধঃ" (আনন্দগিরি)। "যদি বয়ং 'স্বতন্ত্রাং' কাঞ্চিৎপ্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন অভ্যুপগচ্ছেম, প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদং" (শারীরকভাষ্য, ১।৪।৩০)। শঙ্কর বলেন—এই অব্যক্তশক্তির ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই; উহা ব্রহ্মই। এইজন্য ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও প্রকৃতি-কারণ (উপাদানকারণ)।

পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, শঙ্কর শক্তিকে উড়াইয়া দেন নাই। তিনি কেবল মাত্র শক্তির পৃথক্-সত্তা বারণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে এই শক্তি অপ্রধান, ব্রহ্মই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথাটা ভুলিয়া লোকে মনে করে যে, "শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন না।" "শঙ্কর মায়াবাদী।" "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থে আমরা শঙ্করের এই সকল অপবাদ ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তদ্দ্বারাও কেহ কেহ ভ্রমশূন্য হন নাই। আশ্বিনের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ নামক একজন ব্যক্তি এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া, যাহা যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যকে প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে পারেন নাই। অনেকেই এইরূপে শঙ্করকে না বুঝিয়াই, একটা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের দুর্ভাগ্য, না ব্যক্তিবিশেষের দুর্ভাগ্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক্, প্রিয় পাঠক উপরি-উদ্ধৃত স্থলগুলি হইতে দেখিতেছেন যে, নির্গুণব্রহ্মই শক্তিযোগে 'কারণ-ব্রহ্ম'। কেহ কেহ আবার মনে করিয়া থাকেন যে, নির্গুণব্রহ্মে এই শক্তি নাই; এই শক্তি সগুণব্রহ্মের শক্তি। ইহা অতিশয় হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত। সগুণব্রহ্ম কি নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন ব্রহ্ম নাকি? নির্গুণ-ব্রহ্মই যে শক্তিযোগে সগুণব্রহ্ম, ইহার প্রমাণের জন্য আমরা নিম্নে কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিব। (১) শঙ্করাচার্য্য, বেদান্ত-দর্শনের ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে নির্গুণব্রহ্মই যে জগৎস্রষ্টা—একথা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। "সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্‌সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে" ইত্যাদি। (২) ঐতরেয়ভাষ্যে (৫।৩), শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জগতের বীজভূত 'অব্যাকৃতশক্তি' নির্গুণব্রহ্ম হইতেই প্রবৃত্তি পাইয়া থাকে। সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং......সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং।" ব্রহ্মকে "প্রাণের প্রাণ" বলা যায়। প্রাণশক্তিই জগতের অব্যাকৃত-

বীজ,—এ কথা শঙ্কর মাণ্ডুক্যভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম, এই প্রাণশক্তিরও প্রাণ। এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, প্রাণশক্তির ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে। প্রাণস্য প্রাণমিতি দর্শনাৎ এজয়িতৃত্বমপি পরমাত্মন এব উপপদ্যতে" (শারীরক ভাষ্য, ১।৩।৩৯)। (৩) শঙ্কর নানাস্থলে ব্রহ্মচৈতন্যকেই মায়াশক্তির অধিষ্ঠান বলিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন যে, অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে মায়ার সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই। "অধিষ্ঠানাতিরেকেণ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ।" এই কথাটা বুঝা আবশ্যক। গীতাভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরিও বলিতেছেন যে, সত্তাস্ফূর্ত্তিদত্বেন চ সন্নিধির্বা অত্রোচ্যতে।" নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কোন প্রকার ক্রিয়া নাই। এইজন্যই তিনি সন্নিধি মাত্রেই শক্তির প্রেরক;—অন্য কোনরূপে তিনি প্রেরক নহেন। কিন্তু আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকারেরা যে বলিলেন যে, সন্নিধি অর্থ এই যে, ব্রহ্মই মায়াশক্তির সত্তা ও স্ফূর্ত্তিদাতা—ইহার অর্থ কি? বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব কিসের দ্বারা সিদ্ধ হয়? কোন বস্তু, কোন বস্তুর 'কারণ' হইলেই তাহার অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি। অগ্নি —জলের কারণ; সুতরাং অগ্নির অস্তিত্ব আমরা বুঝি। কিন্তু কারণের এই অস্তিত্ব শক্তির উপরেই নির্ভর করে। অতএব শক্তিদ্বারাই বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। শঙ্কর তৈত্তিরীয়ভাষ্যে এ তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন দেখিত হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম মায়ার সত্তাপ্রদ'—এ কথার অর্থ এই যে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত, উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই জন্যই, ব্রহ্মকেই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মই মায়ার স্ফূর্ত্তিদাতা। এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ মায়ার ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত। এই জন্যই ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং, মায়ার কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে। অতএব পাঠক দেখিতেছেন যে, "ব্রহ্মকে মায়ার সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ" বলাতে, ইহাই আমরা পাইতেছি যে, মায়াশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং মায়াশক্তির ক্রিয়া তাহা হইতেই প্রাপ্ত। (৪) শঙ্কর সর্ব্বত্র এ কথা বলিয়াছেন যে, কার্য্য কদাপি কারণ হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র হইতে পারে না; কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম, শক্তিদ্বারাই জগতের কারণ। শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে পৃথক্। পৃথক বলিয়াই ব্রহ্ম এই শক্তির কর্ত্তা বা জ্ঞাতা। কেননা, স্বতন্ত্র না হইলে কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, শক্তি হইতে যখন ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, তখন ইহা অবশ্যই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। শক্তি-সংবলিত ব্রহ্মকেই সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ ব্রহ্ম বলা যায়;—কিন্তু সেই ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে যখন শক্তি হইতে স্বতন্ত্র,—তখন উহা নিশ্চয়ই নির্গুণ ব্রহ্ম। এই স্বতন্ত্রতার জন্যই ব্রহ্মের নিরবয়বত্বের ব্যাঘাত হয় না,—এ কথা বেদান্ত দর্শনের ২।১।২৭ সূত্রে বালা হইয়াছে। টীকাকার সে স্থলে এই কথাই বলিয়াছেন—"ঈক্ষিতৃত্বেন ব্যাকর্ত্তৃত্বেন চ ঈক্ষনীয়-ব্যাকর্ত্তব্যপ্রপঞ্চাৎ 'পৃথক্' ঈশ্বর সত্ত্বশ্রুতেঃ ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মই--কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন। (৫) ঐতরেয় শ্রুতিতে "আত্মা বা ইদমেক এব অগ্রআসীৎ নান্যৎকিঞ্চন মিষৎ"—ইহার ভাষ্য ও টীকাটী

বিশেষ ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। সে স্থলে নির্গুণব্রহ্মে শক্তির সত্তা থাকা সত্ত্বেও কেন বিজাতীয়ভেদ ও স্বগতভেদ নাই, তাহাই দেখান হইয়াছে। শক্তির ব্রহ্ম নিরপেক্ষ পৃথক্ সত্তা নাই; উহার সত্তা ব্রহ্মের উপরেই একান্ত নির্ভর করে। সুতরাং (স্বাধীন সত্তা নাই বলিয়া) শক্তি,—ব্রহ্মই। যাহা ব্রহ্মই,—যাহা ব্রহ্মেরই 'আত্মভূত', তাহা দ্বারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ আসিবে কিরূপে? টীকাকার জ্ঞানামৃত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে "অভিন্নাধিষ্ঠানোপাদনকারণ" বলা হয়। অতএব, শক্তি-সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্গুণত্বের ব্যাঘাত হইল না।

শঙ্করাচার্য্য এইভাবে, পরমার্থ দৃষ্টিতে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এই ভাবেই রত্নপ্রভা-টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন যে, "মায়াব্রহ্মণোরনির্ব্বাচ্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধঃ" (২।২।৩৮) এই জন্যই, শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"নামরূপাভ্যমন্য ঈশ্বরঃ"। শক্তি হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র;—কিন্তু শক্তির কোন স্বতন্ত্রতা নাই। শঙ্কর ২।১।৩১ সূত্রে বলিয়াছেন—"প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ"। টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন—"নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্যৈব মায়াধিষ্ঠানত্বঃ"। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এই শক্তির দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মই জগৎ-কারণ। . .

এখন, এই নির্গুণব্রহ্ম জিনিষটা কি, আমরা তাহাই দেখিব। এ বিষয়েই বা শঙ্কর কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। বেদান্ত-ভাষ্য বুঝাইতে গিয়া রত্নপ্রভাটীকা বলিতেছেন,—"কল্পিতাজ্জগতো ব্রহ্মস্বরূপমনন্তমস্তি"; আবার—"পুরুষস্ত পূর্ণব্রহ্মরূপঃ, অতঃ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্ অধিকঃ" (১।১।২৪)। অতএব শঙ্কর মতে নির্গুণ ব্রহ্ম—পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ। বৃহদারণ্যকভাষ্যে, শঙ্কর নিজেও বলিয়াছেন যে,—"ন বয়মুপহিতেন রূপেণ ব্রহ্মণঃ পূর্ণত্বং বদামঃ, কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণ" (৪।১)। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নির্গুণব্রহ্মকে কোথাও নিঃস্বরূপ বা অসৎ বা শূন্য বলেন নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইহার ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন। তবেই তাঁহার মতে নির্গুণব্রহ্ম—অনন্ত পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ হইতেছেন। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সময়ে আমরা যে অখণ্ড নিত্য জ্ঞানের আভাস পাই, ব্রহ্ম সেইরূপ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ,—এ কথা কেণোপনিষদের "প্রতিবোধবিদিতং মতং" ইহার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। আবার, প্রাণ ও অপাণশক্তির মূল-প্রেরক যে আত্মা, তাহাও শঙ্কর বলিয়াছেন;—"যস্মিন্ এতৌ (প্রাণাপাণৌ) প্রের্য্যত্বেন স্থিতৌ" (রত্নপ্রভা, ১।১।৩১)। ইহারা প্রের্য্য এবং ব্রহ্ম ইহাদের প্রেরক। সুতরাং ব্রহ্ম পূর্ণ অনন্তশক্তি-স্বরূপ, ইহাও আসিতেছে। আমরা ইতঃ-পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নির্গুণব্রহ্মই মায়াশক্তির প্রেরক ও প্রবর্ত্তক। সুতরাং নির্গুণব্রহ্ম পূর্ণশক্তি-স্বরূপ হইতেছেন। গীতাভাষ্যেও আনন্দগিরি এ তত্ত্ব বলিয়া দিয়াছেন। "সর্ব্ব বিশেষরহিতস্য অবাঙমনসগোচরস্য ব্রহ্মণেঃ শূন্যত্বে প্রাপ্তে, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যাদিহেতুত্বেন, কল্পিতদ্বৈতসত্তাস্ফূর্ত্তিদত্বেন চ সত্ত্বং দর্শয়ন্ দেহাদীনাং...চেতননাধিষ্ঠিতত্বং" (১৩।১৩)। ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি চেতন হইতেই আইসে এবং জগতের উপাদানশক্তিরও প্রবৃত্তি (স্ফূর্ত্তি) ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত,—এই কথাই ত টীকাকার বলিলেন। সুতরাং নির্গুণব্রহ্ম—অনন্ত, পূর্ণ শক্তিস্বরূপ। আবার তিনি যে পরমানন্দ-

স্বরূপ এবং মনুষ্যাদিজীবেরা যে সেই আনন্দেরই অংশভোগ করিয়া থাকে,—এ কথা শঙ্কর তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষ্যে (৭।১) স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা পাইতেছি যে, নির্গুণব্রহ্ম—অনন্তপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।

এ স্থলে আর একটী কথা আছে। এই জগৎ,—ব্রহ্মেরই বিভূতি, ঐশ্বর্য্য। জগৎকে ব্রহ্মদর্শনেরই সহায়রূপে, অনুকূলরূপে ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।—এই মতটী শঙ্করের অনুমোদিত কিনা, ইহা দেখা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রবাসীতে বলিয়াছেন যে, এই মতটী শঙ্করের নহে। জগৎ—ব্রহ্মের আবরক, ইহাই নাকি শঙ্করের মত। লোকে এইরূপেই না দেখিয়া, শুনিয়া, শঙ্করের উপরে দোষারোপ করিয়া থাকে!!! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শঙ্কর পরমার্থ-দৃষ্টিতে ভাষ্যরচনা করিয়াছেন। পরমার্থ-দৃষ্টিতে,—কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং এই জগৎও ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নহে। যিনি এইরূপ দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়াছেন, তিনি জগতে ব্রহ্মদর্শন করেন নাই,—একথা হাস্যাস্পদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই পরিণামি জগতের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই;—ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য ফল। পাঠক শঙ্করের নিজের কথা শুনুন—"যত্তত্র অফলংশ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার পরিণামিত্বাদি, তৎব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ" (শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৪। জগৎকে ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি সম্ভবে কি? টীকাকার বলেন—"কার্য্যেণ লিঙ্গেন কারণ-ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বং সৃষ্টিশ্রুতীনাং (১।৪।১৪। এ জগৎ ব্রহ্মের লিঙ্গ' অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন। শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণরূপে —অর্থাৎ ক্রম-উচ্চ তারতম্যে জগতে শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করিয়াছেন (শারীরক ভাষ্য ১।৩।৩০)। "জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি।" "সগুণং নির্গুণত্বেন বিদ্বান্ অমৃতো ভবতি (রত্নপ্রভা ১।১।১১)। অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করাচার্য্য জগতে ব্রহ্মদর্শনের বিরোধী নহেন। আরো কথা আছে। "পাদোঽস্যবিশ্বা ভূতানি"—এ বিশ্ব নির্গুণ-ব্রহ্মের এক পাদ বা অংশ মাত্র। আবার, আকাশ, মন, প্রভৃতিকে শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই লিঙ্গ বা পাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষেই, প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং জগতে ব্রহ্মদর্শনের শঙ্কর বিরোধী হইতে পারেন না। গীতায় "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা"—প্রভৃতি দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মেরই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য বলা হইয়াছে। শঙ্কর এই ভাবেই তাহার ভাষ্য করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থে টীকাকার "ব্রহ্মধী জন্মনে" এই অর্থ করিয়াছেন। অতএব, জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়, ইহাই আসিতেছে। অজ্ঞানাবস্থায়, এ জগৎকে ব্রহ্মের আবরক বলিয়া মনে হয়, এই মাত্র। পরমার্থদৃষ্টিতে, এই জগৎ ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং ব্রহ্মই। শঙ্করের ইহাই সুস্পষ্ট অভিপ্রায়।

সগুণব্রহ্ম সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকে শঙ্করকে এই বলিয়া দোষারোপ

করেন যে, শঙ্কর ঈশ্বরকে মায়াময়, অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যাবস্থায় প্রতীত হয়, সুতরাং ঈশ্বরও পরমার্থতঃ মিথ্যা,—শঙ্কর ইহা বলিয়াছেন বলিয়া, অনেকে শঙ্করের উপরে বড়ই নারাজ! আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহাও শঙ্করকে না বুঝিবার ফলমাত্র। শঙ্কর পরমার্থদৃষ্টিতে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এ কথা আমরা বলিয়াছি। তিনি কি অর্থে ও কি অভিপ্রায়ে 'অসত্য', 'কল্পিত', 'মৃষা', প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন? যাহার সত্তা ও ক্রিয়া অন্যের উপরে একান্ত নির্ভর করে,—যাহার স্বাধীন-সত্তা নাই, তাহাই শঙ্করের মতে 'কল্পিত' বা 'মিথ্যা'। "বিকারোঽয়ং বস্তুতঃ কারণাদ্ভিন্নো নাস্তি, তস্মান্মৃষৈব।" "তয়োঃ (নামরূপয়োঃ) আত্মমাত্রত্বেন মৃষাত্বাৎ।" "তস্যাঃ (মায়ায়াঃ) স্বতন্ত্রত্ব নিরাসেন কল্পিতত্বং।" "কল্পিতানামধিষ্ঠানাতিরেকেন সত্তাস্ফুরণয়োরভাবাৎ"। পাঠক দেখিতেছেন, শঙ্করের 'কল্পিত', 'মিথ্যা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ একেবারে অলীক, বা শূন্য নহে। কার্য্যের, কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই, সুতরাং উহা কল্পিত বা মিথ্যা। পরমার্থদৃষ্টিতে, কার্য্য—কারণ হইতে পৃথক্ নহে, উহা কারণই। যতদিন পরমার্থদৃষ্টি না জন্মে, ততদিন কার্য্যকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। এই কথাগুলি মনে রাখিলে, শঙ্করকে বুঝিতে আর কোন গোল হইবে না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, নির্গুণব্রহ্মই শক্তিদ্বারা জগৎকারণ হন। পরমার্থতঃ এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র না হইলে তাঁহাকে শক্তির কর্ত্তা বা জ্ঞাতা বলা যাইতে পারিত না। কথাটা এই যে, ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ হইতে কতকশক্তিকে কিছু 'পৃথক্' করিয়া দিয়া জগৎসৃষ্টিতে নিযুক্ত করেন। আপনা হইতে পৃথক্‌কৃত * এই শক্তির তিনি কর্ত্তা বা দ্রষ্টা। রত্নপ্রভা বলিয়াছেন—"নিত্যস্যাপি জ্ঞানস্য ব্রহ্মস্বরূপাদ্ 'ভেদং' কল্পয়িত্বা কার্য্যত্বোপচারাৎ ব্রহ্মণস্তৎ-কর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ" (বেদান্তদর্শন, ১।১।৫)। পাঠক, এখন একটী কথা বিবেচনা করুন্। ব্রহ্মের যে কয়েকটী শক্তি জগতে নিযুক্ত রহিয়াছে, উহাই কি যথেষ্ঠ? উহা ছাড়াও তাঁহার কত অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং কারণব্রহ্ম যথেষ্ঠ নহেন। শক্তির উপলক্ষেই ত ব্রহ্মকে কারণব্রহ্ম বলা যায়। এই শক্তি ত কারণব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে; উহা ব্রহ্মই। কিন্তু এই যুক্তির অপর অংশের কথা ভুলা উচিত নহে। শক্তি স্বতন্ত্র নহে বটে,—কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে এই স্বতন্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মই প্রকৃত তত্ত্ব। শক্তিকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়া লওয়াতেই ত নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা 'কারণব্রহ্ম' বা জগতের স্রষ্টা পাতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু পরমার্থতঃ শক্তি ত তাঁহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, উহা ব্রহ্মই। সুতরাং পরমার্থদৃষ্টি না জন্মা পর্য্যন্তই, 'কারণব্রহ্ম' বা ঈশ্বরকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এরূপ বোধ অজ্ঞানতার ফল। কেননা, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ; জগৎপাতৃত্ব ও জগৎস্রষ্টৃত্বই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ নহে। সুতরাং পরমার্থদৃষ্টিতে 'কারণব্রহ্ম' চিরদিনই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং স্বতন্ত্র বলিয়া 'কারণ-

* এ শক্তি ব্রহ্মে একাকার ভাবেই অবস্থিত ছিল। সৃষ্টিকালে ইহার সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়। এই আগন্তুক পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই 'পৃথক কৃত' বলা হয় (রত্নপ্রভা, ১।২।৩)।

ব্রহ্ম' বস্তুতঃ নির্গুণব্রহ্মই। এই জন্যই, পরমার্থদৃষ্টিতে ঈশ্বর ও জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই অসত্য ও কল্পিত। কেননা, নির্গুণ-ব্রহ্মেরই উহা আগন্তুক অবস্থাভেদ মাত্র;—এই অবস্থার বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। "কল্পিতাৎ......চিন্মাত্র ঈশ্বরঃ 'পৃথক্'অস্তীতি ন মিথ্যাত্বং" (রত্নপ্রভা, ১।১।১৭)। কথাটা এই যে, শক্তির হিসাবেই নির্গুণব্রহ্মকে 'কারণব্রহ্ম' বলা হইলেও, শক্তির যখন জগদাকারে বিকার হইতে থাকে, তখনও নির্গুণ ব্রহ্মের বা কারণব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণই থাকে। এই জন্যই, অজ্ঞানাবস্থায় শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করাতেই ব্রহ্মকে কেবল কারণব্রহ্ম বলিয়া মনে হইলেও,—কারণব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণব্রহ্মই। কেননা, ব্রহ্ম শক্তি হইতে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ ঈশ্বর অসত্য নহেন। কেননা, উহা নির্গুণব্রহ্মেরই শক্তি সম্বলিত অবস্থা বিশেষ মাত্র। "নচ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি"।

আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে যাহা প্রতিপাদিত করিলাম, ইহাই শঙ্করের মত। ইহা শঙ্করের মত নহে, যদি কেহ তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে বিশেষ বাধিত হইব। "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থে আমরা শঙ্করকে এই ভাবেই বুঝাইয়াছি। এই প্রবন্ধে আমরা কি কি পাইয়াছি, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

**(১) শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করেন। শঙ্কর, শক্তিকে উড়াইয়া দেন নাই।**

**(২) নির্গুণব্রহ্মই এই শক্তির প্রবর্ত্তক।**

**(৩) শঙ্কর পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে পরিণামবাদের প্রাধান্য নাই। কেননা** তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করদর্শনে জগতের স্থান আছে। তিনি জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই।

(৪) শক্তি, নির্গুণব্রহ্মেই একাকার হইয়া অবস্থিত ছিল। সৃষ্টির প্রাক্কালে, এই শক্তির একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়। এই আগন্তুক পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই, উহার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলা হয়। সুতরাং ঈশ্বর নির্গুণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য আর কেহ নহে। অতএব ঈশ্বর অসত্য নহেন।

(৫) নির্গুণব্রহ্মে একাকার ভাবে অবস্থিত শক্তির সৃষ্টিকালে একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়। কিন্তু পরিণাম উপস্থিত হওয়াতেই, শক্তি অন্য একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না। পরমার্থদর্শীর চক্ষে তখনও উহা শক্তিই থাকে। এই জন্যই শঙ্করদর্শনে পরিণামবাদের অপ্রাধান্য।

(৬) সৃষ্টির পূর্ব্বেও শক্তি ব্রহ্মে একাকার ভাবে থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে উহার যে পরিণাম আরম্ভ হয়, তদ্দারা উহা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে না। পরমার্থদৃষ্টিতে উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে; উহা ব্রহ্মই। সুতরাং শক্তিসত্ত্বেও, নির্গুণব্রহ্মে কোন বিজাতীয়ভেদ বা স্বগতভেদ হয় না। সুতরাং শক্তিসত্ত্বেও, ব্রহ্মের তুরীয়াবস্থার হানি হয় না। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

(৭) সৃষ্টির প্রাক্কালে ও সৃষ্টির পরেও শক্তি বা শক্তির পরিণাম,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলিয়াই শক্তির বিকার দ্বারা শক্তিমান ব্রহ্মের কোন বিকার হয়না। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

**(৮) ব্যবহারিকভাবে অর্থাৎ যতদিন পরমার্থদৃষ্টি না জন্মিতেছে, ততদিন এই জগৎ**

সত্য। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলে এ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকিবে না; এই ভাবে জগৎকে কল্পিত বা মিথ্যা বলা যায়। জগৎ শঙ্করের মতে অলীক বা মিথ্যা নহে। শঙ্করদর্শনে জগতের স্থান আছে।

(৯) এ জগতে ব্রহ্মেরই মহিমা, বিভূতি, ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেছে। ক্রম-উর্দ্ধ তারতম্যে এই বিকাশ হইতেছে। জগৎ ব্রহ্মদর্শনের সহায়। শঙ্করের ইহাই সিদ্ধান্ত। শঙ্কর ক্রম-বিকাশবাদ মানিতেন।

(১০) শঙ্করের নির্গুণব্রহ্ম—পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণানন্দ স্বরূপ।

(১১) এই পরিণামিনী শক্তিকে শঙ্কর—জড় ও অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শঙ্কর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের বিরোধী। এই জড়শক্তির সংসর্গে আত্মায় বিবিধ বিজ্ঞান উপস্থিত হয়; শঙ্কর এইরূপ 'বিজ্ঞানবাদ' মানিতেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# হিমাচলে

(১)

উর্দ্ধাকাশে অভ্র ভাসে;
ঝরে গেছে জলের কণা।
তুষার ঢালা শৈলমালা
কভু রূপা কভু সোণা।
নিম্ন ভাগে বিশ্ব জাগে,
গায়ে ভানু-কিরণ-ছড়া;
নীলে মাথা তৃণে ঢাকা,
যেন মরকতে গড়া।
উচ্চে নীচে সাম্‌নে পিছে
দেখ্‌ছি সবি শোভায় মোড়া,—
রূপের গাছে ফুটে আছে
একটী পুষ্প বিশ্বজোড়া।

(২)

থাকে থাকে থাকে থাকে
উর্দ্ধে উর্দ্ধে রাজে গিরি;
ঘন পর্ণে সবুজ-বর্ণে
কানন আছে চরণ ঘিরি।
বনের তলায় গলায় গলায়
লতিকারা বিজন্ দেশে,
মাথি ফুলে আলো গুলে
বাঁধে চুলে হেসে হেসে।
দূরে দূরে মৃদু স্বরে
পাখী ডাকে পাতার-তলে,
আসে-পাশে কিরণ ভাসে
নেচে দুলে ঝরণা-জলে।

(৩)

নর নারী সারি সারি
দাঁড়াও এসে শৈলতলায়,
গিরির মত বনের মত
লতার মত গলায় গলায়।
শিরে তোমার ঝল্‌বে সোণার
দীপ্তি-মালা তুষার-স্নাত;
থাকে থাকে থাকে থাকে
তুল্‌বে মাথা মহিমা ত।
তোদের হাসি খেল্‌বে ভাসি,
যেন শুভ্র অভ্র তারা;
পরাণ ফুটে চল্‌বে ছুটে
বিশ্বপানে প্রীতির ধারা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# রাখি-বন্ধন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী জর্ম্মন যুদ্ধের পর Alsace Loraine ফরাসীদের হস্তভ্রষ্ট হইয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইলেও, কাগজে কলমে সেইটীই লেখা থাকিলেও, যেমন, ফরাসীর হৃদয়রাজ্য হইতে Alsace Loraine চলিয়া যায় নাই, ফরাসীরা যেমন কখনও মনে করে না যে Alsace Loraine চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে,সেইরূপ,বিদেশী,বিধর্ম্মী প্রজাপালন-বিমুখ রাজার কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ থাকিলেও, বাঙ্গালী কখনই বঙ্গ বিভাগ স্বীকার করিবে না। বাঙ্গালী বঙ্গ বিভাগ দিনে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, রাখি-বন্ধন তাহারই স্মারক মাত্র। পাছে আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাতৃবক্ষ এখনও বিদীর্ণ, তাই সকলে মিলিয়া বৎসরান্তে সে কথা স্মরণ করি। Alsace Loraine পরহস্তগত, এ কথা স্মরণ করিবার বা করাইবার একটী প্রথা ফরাসীদেশে বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক ফরাসী-বালক যখন এরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় যে, তাহার স্বদেশের কথা চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, মনে করা যায়, তখন তাহাকে Alsace Loraineএর প্রতি-মূর্ত্তির নিকট লইয়া গিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান হয়, যাহাতে Alsace Loraine আবার মাতৃভূমির সঙ্গে একত্রিত হয়, সে জন্য সে প্রাণপণ করিবে। আমাদের দেশে যাহারা কলেজে Burke,Milton অধ্যয়ন করে এবং যাহাদিগকে ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতার মহাসংগ্রামের মূলতথ্যের সমালোচনা করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়, তাহাদেরও পক্ষে স্বদেশের কথা আলোচনা করা মহাপাপ! আর ঐ স্বাধীন দেশ ফ্রান্স, ওখানে অতি অল্পবয়স্ক বালকও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অংশভাগী, এবং স্বাধীন দেশের কোন রাজনীতিজ্ঞ তাহাতে কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করেন নাই। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। অধীনতারূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় সকলই অস্বাভাবিক। বিদেশীর কথা দূরে থাকুক, আমাদেরই ঘরের ঢেঁকী বিদেশীর পদানত গোলামগুলি যখন ঐ মত প্রকাশ করে,তখন বুঝা যায়,পরাধীনতা আমাদিগকে কোন্ নরককুণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে! জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জন্য জাতীয় সাধনা চাই। সে সাধনা বাল্যেই আরম্ভ হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য সাধনা বাল্য হইতেই সূচনা করিতে হইবে। সেই সাধনার জন্য রাখিবন্ধনের ন্যায় অনুষ্ঠান অতীব প্রয়োজনীয়। এইরূপে, ধীরে ধীরে, আশৈশব আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিতে না পারিলে, কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই। Alsace Loraine প্রতিমূর্ত্তির কাছে বিশেষ দিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ফরাসী বালক যে বল হৃদয়ে লাভ করে, তাহার হৃদয়ে যে অমোঘ সঙ্কল্পের আবির্ভাব হয়, কেতাবের শত শিক্ষাতেও এরূপটী হইতে পারিত না। ইহা জর্ম্মাণ বিদ্বেষ নহে,স্বদেশ-প্রীতি। বিদেশীর হস্ত হইতে Alsace Loraineকে উদ্ধার করিতেই হইবে, ইহাই সঙ্কল্প। মহারাণা

প্রতাপ একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, চিতোরে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতেই হইবে। তিনি সে প্রতিজ্ঞা কেবল নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি স্বজাতিকে এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া সঙ্কল্প লওয়াইয়াছিলেন যে, যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন রাজপুত তৃণ-শয্যায় শয়ন করিবে এবং পত্র-পাত্রে অন্ন গ্রহণ করিবে। মহারাণা চিরজীবন এই ব্রত পালন করিয়া, অমর হইয়া গিয়াছেন এবং পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে এই ব্রত উদ্যাপনের ভার স্বজাতির উপর দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যতদিন মায়ের বুক জোড়া না লাগে, ততদিন তাহার সোয়াস্তি নাই। রাজদ্বারে ক্রন্দনের সময় নাই, কেন না, রাজায় প্রজায় সমপ্রাণতা নাই। রাজা আট কোটী প্রজার মস্তকে পদাঘাত করিয়া মাতৃবক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে,বাঙ্গালী কি এ অপমান নীরবে সহ্য করিবে? বাঙ্গালীকে নীরব করিবার প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালী নীরব হইবে—কর্ম্মদেব আগমন করিলে বাগ্দেবীর আত্ম-সম্বরণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হইবে না! তাই তাহার প্রতিজ্ঞা বিলাতী-বর্জ্জন। অপমানের প্রতিশোধ—বিলাতী-বর্জ্জন। অনেক তথাকথিত, হয়তো-স্বার্থ-প্রণোদিত, সাধু-পুরুষ (!!!) বিদেশ-বিদ্বেষ স্বদেশপ্রেম নহে বলিয়া একটা হট্ট-গোল করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিদ্বেষ সব সময় প্রেমের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয় না, সেই জন্যই "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"! এসিয়াবাসীর প্রতি শ্বেতকায়গণের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া আজ যদি এসিয়াবাসী "বিদেশী-বর্জ্জন" প্রতিজ্ঞা করে এবং সে সঙ্কল্প ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে পালন করে, তবে কি উহাতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে না? শ্বেতকায়েরও মোহ ছুটিবে, এসিয়া-বাসীও স্বস্থান লাভ করিবে। রাজপুরুষ-গণের মোহ ছুটাইবার জন্যই বিলাতী-বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা, ইহা পুণ্য-প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পালনে, হে বাঙ্গালি, তোমাকে হয়তো তৃণ-শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু এই রাখি-বন্ধনের পুণ্যময় দিনে জাতীয় অপমানের কথা স্মরণ কর এবং এই সঙ্কল্পের মধ্যে জাতীয় জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহা একবার ধারণা কর; এবং প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব বুঝিয়া ব্রত উদ্যাপনের দিকে অগ্রসর হও—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।" তোমার এ মন্ত্র যে অমোঘ, তাহার প্রমাণ কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছ; নহিলে হঠাৎ শত্রুর এমন গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে কেন? এ মন্ত্র অমোঘ, এ মন্ত্র ধরিয়া থাকিতে পারিলে, শত্রুজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই মোয়া দিয়া আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা হইতেছে। বৃন্দাবনে ব্রজবাসীর বড়ই উৎপাত। 'ব্রজ-বাসী' যখন কাহারও কিছু হস্তগত করে, তখন দুটী লাড্ডুর ব্যবস্থা করিতে হয় এবং ব্রজবাসী ভায়া ধনরত্ন ফেলিয়া ঐ লাড্ডু লইয়াই প্রস্থান করেন। মর্লী সাহেব এখন দুটী লাড্ডু লইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত। সাবধান, কেহ ভুলিবেন না। সর্ব্বদাই ভয় হয়, আমাদের মধ্যে 'ব্রজ-বাসী'র অভাব নাই। এতদিন লাঠি দ্বারা শাসান হইয়াছে, তাতে ফল হয় নাই, তাই লাড্ডু। এতদিন বলা হইয়াছে যে, তোমরা যদি গোলমাল না থামাও তো ঐ দিল্লীকা লাড্ডু পাবে না! একবার এক সাহেব ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যস্ত হইয়া আমেরিকার এক আদিম অধিবাসীর গৃহে আশ্রয় লয়, ঘরে মুষল-

ধারে জল পড়িতেছিল। সাহেব বলিলেন, ঘর সারাও না কেন?" "জল পড়ছে সারাব কিরূপে।" "জল ছাড়লে সার না কেন?" "তখন তো আর ঘরে জল পড়ে না, সারাবার দরকার কি?" মর্লীর যুক্তিটা ঠিক তাই। কিয়ার হার্ডি আমাদের অবস্থাটা বেশ বুঝেছেন, এতকাল সহিষ্ণুতার জন্য কষ্টভোগ করেছি। এখন অসহিষ্ণুতার জন্য বিপদাপন্ন হয়েছি। আমাদের আর এখন ঐ দিল্লীকা লাড্ডুর প্রয়োজন নাই। আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞার জোরে কিছু করিতে পারি, তবে করিব, ও লাড্ডুর ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছি। আজ রাখি-বন্ধনের দিনে বাঙ্গালীর ইহাই চিন্তার বিষয়। আজ শোকের দিন তত নয়, যত পুণ্য সঙ্কল্পের দিন। এক দধীচি বীর অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেবতাদের মঙ্গল-সাধন করিয়াছিলেন, আমাদের মাতৃভূমিও স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। আজ জাতীয় জীবনের দিন। সকলে জাগ্রত হও, সকলে উদ্বুদ্ধ হও, মাতৃ-সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। ইহাই রাখিবন্ধন দিনের সার্থকতা।

বাঁকুড়া, ৩০শে আশ্বিন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# পরবশতা। (২)

জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চিরাতীত কাল হইতেই এক সমাজ অন্য সমাজকে আত্মবশ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছে। যখন এই শেষোক্ত সমাজ স্বাবলম্বন-পরায়ণ হইয়া প্রথমোক্তের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন তাহার আবার অভ্যুত্থান হইয়াছে, আর যখন প্রথমোক্ত সমাজ সর্ব্ব বিষয়েই শেষোক্ত সমাজকে নিজের সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছে, তখন সে স্বাবলম্বন হারাইয়া দেহে ও মনে একবারেই অধঃপতিত হইয়াছে। কখন বা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, কখন বা ধ্বংসের পথে যাইতে যাইতে প্রথমোক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ফলতঃ যদি এক সমাজ অন্য পরাক্রান্ত সমাজ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে দলিত হয় যে, উহার কোন বিষয়েই স্ববশতা থাকে না, সকল বিষয়েই ঐ পরাক্রান্ত সমাজের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তখনই উহার পরপুষ্টের ন্যায় দুর্দ্দশা আসিয়া উপস্থিত হয়। তদবধি সেই সমাজস্থ জনগণের দেহ ও মন ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্য পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়াছে।

দেহ ও মনের শত্রু অনেক। আত্মবশতা গেলে অনেক শত্রুই আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের প্রধান শত্রু নিশ্চেষ্টতা ও নিরানন্দ। আত্মবশে সকল কর্ম্মেই জীবন্ত উৎসাহ ও নির্ভীকতা থাকে। সুতরাং মনও প্রফুল্ল থাকে। আর পরবশ হইলে ভয়ে ভয়ে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। কর্ম্মের সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে না; প্রত্যেক কর্ম্মেই পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতে মনের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যম একবারেই চলিয়া যায়। মন ক্রমে অবসন্ন হয়, দেহও দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সমাজ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অসভ্য সমাজের কথা আলোচনা করিতে

মহাত্মা ডারউইন এই বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহারা পরাক্রান্ত বিজেতৃ সমাজের সংঘর্ষে একবারেই নির্ম্মূল হইয়াছে, অথবা হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ "Dullness of mind" অর্থাৎ মনের নিরুৎসাহ। * সভ্যাবস্থায় কোন অধীন সমাজ সহজে নির্ম্মূল হইতে স্বীকার করে না। তথাপি যখন সেই সমাজ আত্মবশে কোন গুরুতর কর্ম্মই করিবার সুযোগ ও ক্ষেত্র পায় না, তখন তাহার মন অবশ্যই অল্লাধিক জড়তাপ্রাপ্ত হইবেই; দেহও অল্লাধিক অবসাদগ্রস্ত হইবেই।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয়গণের দেহ ও মনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। প্রায় প্রতি পল্লিতেই ম্যালেরিয়া আপন ধ্বংসক্রিয়া বিস্তার করিতেছে। গত ১৯০৬ সালে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্ব প্রকারে ১১৩২৫৭৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; তাহার মধ্যে শতকরা ৬২·২৯ জন কেবল জ্বর রোগেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। জন্মের সংখ্যা ১৯০৫ সালে সহস্র জনে ৩৯·৫৫ ছিল; কিন্তু ১৯০৬ সালে ৩৭·২ হইয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, জন্মের সংখ্যা কমিতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে যাহারা মরে, তাহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাহারা বাঁচে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ দেখা যায়? তাহারা প্লীহা ও যকৃতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। ইহাদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা সমাজের কোন গুরুতর কার্য্যই হওয়া সম্ভবপর নহে। তারপর, আর এক কথা। ম্যালেরিয়া জ্বরের শক্তিই এই যে, উহাতে অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে।* তবেই জন্মের সংখ্যা কমিতেছে এবং আরও কমিবার আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, এতদ্দেশে মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি হইতেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে দেখিলেই বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়গণ প্রায় মরিয়াই গেল। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও অন্নাভাবে ও পীড়ায় মৃতবৎ হইয়া গিয়াছেন। আর সে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ নাই; গ্রাম্য ক্রীড়া কৌতুক গান বাজনা আনন্দ উৎসব প্রায় কিছুই নাই। "Dullness of mind" অর্থাৎ মনের অবসন্নতা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছে। তাহার উপর এতদ্দেশীয়গণের কতিপয় সামাজিক দুর্নীতি, এই মরণের খেলা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। এই বাল্যবিবাহ কত মৃত্যুর জন্যই যে এই প্রথা দায়ী, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাতে সন্তান অল্পায়ুঃ হয়, এবং বাল্যবিবাহিত নর-নারীও অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। † কর্ম্মে উৎসাহ নাই, কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ; সর্ব্ব কর্ম্মই পরায়ত্ত; সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমন কি, অনেক পারিবারিক কর্ম্মও স্ববশে নাই। সুতরাং মনের নিষ্কর্ম্মাভাব হইতে জড়তা ও অবসাদ অবশ্যই আসিবে এবং প্রকৃতপক্ষেও আসিয়াছে। তাহার পর দেহ নানা রূপ পীড়ায় অবসন্ন ও মৃতপ্রায়। জন্মের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে; মৃত্যুর

* Descent of Man (1900) Ch VII. part I p. 285—286.

* Inhabitants of districts subject to malaria are apt to be sterile. Macnamara quoted in Descent of man. p. 293.

† With women, marriage at too early an age is highly injurious. * * * The mortality also of husbands under twenty is excessively high.

Decent of Man, p. 213—214.

সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার পরিণাম কি? দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত। আর বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,আমাদিগের চরিত্র-বল, নীতি-বল, ধর্ম্ম-বলও পরবশতায় অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মানব সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ এই সকল। * জন সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে; সমাজস্থ জনগণের শরীর ও মন প্রফুল্ল এবং সুস্থ থাকিবে; তাহাদিগের আবশ্যকীয় সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম আত্মবশে থাকিবে; তাহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে অলঙ্কৃত হইবে; এবং ধর্ম্ম বলে ও চরিত্র বলে বলীয়ান হইবে,--ইহাই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ। এই সকল গুণ না থাকিলে কোন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এ সকল গেলে পরিণাম ফল কি? প্রশ্নের উত্তর অতীব সহজ। উত্তর--ধ্বংস। কিন্তু সভ্য মানব কখনও ধ্বংসের মুখে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে নাই। জগতের ইতিহাসে কি এতদ্দেশেই এই ধ্বংস লীলার প্রথম অভিনয় হইবে? তাহা হইতেই পারে না। ইহার এক মাত্র মহৌষধ, আত্মবশতা। জাতীয় জীবন ব্যাপারের কর্ম্ম সকল স্ববশে আনিতেই হইবে। তাহা হইলেই মনের জড়তা বিদূরিত হইবে। তাহা হইলেই সামাজিক চেষ্টা ও উদ্যম আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেহের প্রফুল্লতা ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। চরিত্র বল ও ধর্ম্মবল স্বাবলম্বনের সহচর; অথবা ধর্ম্মবলই চরিত্র বল ও স্বাবলম্বনের মূল। পরমুখাপেক্ষীর এ সকল কিছুই থাকেনা।

কিন্তু স্বাবলম্বন চেষ্টা সাপেক্ষ। কেবল বুঝিলে হইবে না; চেষ্টা আবশ্যক। কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিবেচ্য। কর্ম্ম ভাবের দাস। যেখানে একাগ্রভাব আছে, সেখানে কর্ম্ম হইবেই। ভাব না থাকিলে কর্ম্ম থাকে না। সমাজ মধ্যে ভাবের বিস্তৃতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; কর্ম্ম তাহার অনিবার্য্য ফল। * কোন বাধাই তাহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। কোন সমাজে কর্ম্ম প্রতিহত হইতেছে, দেখিলেই বুঝিতে হইবে, সে সমাজে ভাবের বিস্তৃতি হয় নাই। ভাবের বিস্তৃতিতেই কর্ম্ম; কর্ম্মই স্বাবলম্বনের মূল; এবং স্বাবলম্বনই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির একমাত্র কারণ। আত্মবশ না হইলে জগতে সে জীবের স্থান নাই। তাই ভগবান মনু বলিয়াছেন,

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

যাহা চাই, কর্ম্মকে সেই পথে চালিত করিতেই হইবে। নচেৎ জাতীয় অধঃপতন কখনই নিবৃত্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। যে প্রতিকূল সমাজ অপর সমাজকে দলিত করে, স্বাবলম্বন হইতে চ্যুত করে,—হয় তাহাকে আত্ম অনুকূলে আনিতে হইবে, নতুবা তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা কাল সাপেক্ষ, কিন্তু ইহাই আত্মবশতার মূল সূত্র। ঐ প্রতিকূল সমাজ শেষোক্ত সমাজের অনুকূল হইলে, তাহার আত্ম-বশতার বিঘ্ন উৎপাদন না করিলে, উভয় সমাজই এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন পরস্পর পরস্পরের উন্নতির সহায় স্বরূপ হয়। কিন্তু এই অবস্থা সহজে আশা

* We can only say that it (progress) depends on an increase in the actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral qualities as well as on their standard of excellence. Ibid p. 216.

* Wherever puplic opinion is strongly roused, it will lead to action. Galton's Probability, the foundation of Eugenics. p. 29.

করা যায় না। এই নিমিত্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদিগের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। লক্ষ্য সেইদিকেই থাকে, পরে ঘটনা চক্রে সামাজিক বিবর্ত্তন ঈপ্সিত পথে স্থায়ীত্ব লাভ করে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ জানে না; অন্য কোন উপদেশ দেয়ও না। ইহাই প্রথম কথা, ইহাই শেষ কথা।

শ্রীশশধর রায়।

# ব্যবহারিক।

দিন দিন দেশের সমস্যা কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে;—সভাসমিতি ও সংবাদ-পত্র বন্ধ করার জন্য নূতন২ সিদিসান আইন বিধিবদ্ধ হইতে চলিতেছে, এবং মর্লি সম্প্রতি আরবথে (অক, ২১,১৯০৭) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তীক্ষ্ণ হস্তে আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার নানা বাল-কোচিত কথায় পূর্ণ। তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এমন কোন লোক নাই, যিনি মনে করিতে পারেন যে, মর্লির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে নাই। * মর্লির তীব্র উক্তি পাঠ করিয়া, আবেদন-নিবেদন-ব্যাধিগ্রস্ত মধ্যপন্থীর লোকদিগেরও, বোধ করি, চক্ষু স্থির হইয়াছে। এ দলকে সংহত করার আর উপায় ছিল না, সুতরাং বিধাতা এই উপায়ে তাহা সুসাধিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে যেরূপ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ব প্রকারেই বুঝা যাইতেছে যে, এই মৃত দেশকে জাগ্রত করিবার জন্য বিধাতা অবতীর্ণ হইয়াছেন! নচেৎ এত ভ্রান্তি, এত বালকোচিত ব্যবহার, এত মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় কখনও পাওয়া যাইত না। তাঁহারা এ জাতিকে নির্ব্বাপিত করিতে বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই এ দেশ জাগরণের পথে চলিয়াছে, মধ্যপন্থীদের কথা শুনিয়া বঙ্গ-বিভাগ রহিত করিলে সব আন্দোলন অচিরে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। বিধাতা কি অপূর্ব্ব অলৌকিক বিধানে ভারতকে জাগরিত করিতেছেন!

সর্ব্ব দেশের ইতিহাস ঘোষণা করিয়াছে, অত্যাচারই মৃত জাতির জাগরণের কারণ,কিন্তু অত্যাচার যদি দাঁড়াইবার শক্তিকেও বিনাশ করে,তবে কি হইবে? "রাখে হরি মারে কে?" অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত নদীর স্রোতকে রোধ করিতে পারে,সাধ্য কাহার? যত রোধ করিবে, ততই জোরে সে প্রবাহিত হইবে। নবোদ্গত বৃক্ষের শাখা যত কর্ত্তন করিবে, ততই নবশক্তি স্থানান্তর হইতে,জোরে, বাহির হইবে। ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। কিন্তু নদীর মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে আর জোর থাকে না। বিজ্ঞান এ জগতে অনেক অসাধ্য সাধিত করিতেছে, এই বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া, ইংরাজ আজ প্রবাহিত নদীর

* "Does any one want me to telegraph to Lord Kitchener to disband the Native Army and send home the British contingent and bring away the whole of the civil servants? How should we look in the face of the civilized world if we turned our back on our duty? How should we bear the stings of conscience when we heard through the dark distances the roar of confusion and carnage in India?

Some are angry because I will not give them the moon. I have got no moon, and if I had I would not give it." &c, &c.

মূলোচ্ছেদ 'করিতে সচেষ্ট! তাই লিয়াকত হোসেনকে দমন করিতে এত চেষ্টা !! পৃথিবী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছেন, ভারতের লিয়াকত-হোসেনরূপী জাতীয় জীবন-স্রোতের মূলোচ্ছেদ হয় কিনা? তাহা অসম্ভব, তাহা অসম্ভব; কেন না, "রাখে হরি মারে কে?"

ভারতের পক্ষে যে জীবন-মরণের কঠিন সমস্যা উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্টের বিভাগ-নীতি চতুর্দ্দিকে সুফল-প্রসূ হইতেছে, আমরা ভাই ভাই মারামারি, কাটাকাটি করিয়া মরিতেছি। দেখনা, নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন লইয়া দুইদলে কত কি গোল চলিতেছে! দেখনা, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর মধ্যে কত মত-কাটাকাটি, কত নিন্দা-চর্চ্চা চলিতেছে! সব কথা ভাঙ্গিয়া ও খুলিয়া বলিলে ভাল শুনাইবে না,—রাখি-বন্ধন উৎসব করি বটে, কিন্তু আমরা "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই",—হিংসা বিদ্বেষের রাজত্ব সমানভাবে চলিতেছে।

"Be men. Be patriots. Be brothers. All history shows that a united nation cannot be oppressed; and it has plainly declared that disunion is the certain herald of failure and defeat." Myron H. Phelps B.A., LL.B, of the New York Bar.

—হিতৈষীর এইরূপ উপদেশবাণী শুনিয়াও, আমরা, সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া, কত ঝগড়া বিবাদ করিয়া মরিতেছি। তাঁহারা বলেন, "দলাদলি সব দেশেই আছে, উহাতেই উন্নতি হইবে।" অন্যত্র দলাদলি আছে, অন্যত্র দলাদলি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কি? আমাদের দেশ দলাদলিতেই অধঃপাতে গিয়াছে, জাতিভেদের তীব্র দাহনেই প্রেম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে;—এত পরাধীনতা, এত গোলামগিরি ভারতের ন্যায় দর্শন-বিজ্ঞান-শ্রেষ্ঠ আর কোন দেশে দেখিতে পাইবে না। এই দেশে আবার ভেদাভেদ যাঁহারা সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। এ ভারত যদি জাগে, তবে একতাতেই জাগিবে; নচেৎ কিছুতেই জাগিবে না, নিশ্চয় জানিও। গবর্ণমেণ্ট ভেদাভেদ জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলে, নিশ্চয় জানিও, আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

ভারতের পক্ষে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের জীবন-মরণ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইবে, ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণ-সংগ্রামে। দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণের উপায়—স্বদেশী-গ্রহণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতেছি, নিষ্ঠার সহিত, ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া, কেহই, ব্যবহারিক জীবনে স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন করিতেছেন না। বক্তৃতা করা এক কথা, জীবনে কাজ করা অন্য কথা। যাঁহারা খুব বক্তৃতা করেন, "স্বরাজ" "স্বাধীনতার" পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহারাই কাজের বেলায় স্বদেশী-বর্জ্জন ও বিদেশী-গ্রহণ করেন! কত নিরীহ ব্যক্তি উপদেশ শুনিয়া জেলে গেলেন, কিন্তু সুবিদাবাদী উপদেষ্টাদের তবুও চৈতন্য হইল না। ব্যবহারিক জীবনের সুদৃষ্টান্তের অভাবে, বক্তৃতা-আন্দোলিত কলিকাতা স্বদেশী-গ্রহণে কত পশ্চাৎপদ! এবার কালাপাহাড়দের লুট-তরাজের ফলে স্বদেশী-গ্রহণ কলিকাতায় কতক সাফল্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কত দিন ইহা থাকিবে, জানি না। কেন না—সুদৃষ্টান্ত কোথায়? সুবিধাবাদিদের রাজত্ব যে ষোল আনা!! ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে, চরমপন্থীদের পরিচালিত প্রায় সকল সংবাদ-পত্র আজও বিদেশী কাগজে ছাপা হইতেছে! তাঁহারা বলেন যে, "ইংরাজের সহিতই তাঁহা

দের বিবাদ, অন্য দেশের সহিত নহে; দেশী কলও ইংরাজের, সুতরাং ইংরাজের কলের কাগজ কিনিবেন না।" এ কথা যে বিদ্বেষ-মূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলাম; অন্যান্য বিদেশীর সব জিনিস-ব্যবহার যদি এইরূপে অবাধে চলিতে থাকে, তবে এ দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণের আর আশা নাই। দেশে হাজার হাজার মণ দেশী চিনি মজুত, কিন্তু বিদেশী চিনি সস্তায় পাওয়া যায় বলিয়া তাহা কাটিতেছে না। ২৫ বৎসরে যদি দেশী তাঁতির অন্ন যাইয়া থাকে, ১৫ বৎসরে স্বদেশী চিনির কারবারী লোকের, কাঁসারী, কর্ম্মকার ও কুম্ভকারের অন্ন গিয়াছে। সহস্র সহস্র খর্জ্জুর বৃক্ষ কাটিয়া লোকেরা পাট চাষ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইক্ষুর চাষ প্রায় উঠিয়া যাইতেছিল, স্বদেশী আন্দোলনে কিছু ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের সমস্ত চাষী জমির তুলনায় তাহা আবার কমিতেছে।* বাজারে ইংলণ্ডের জিনিস আর কয়টা পাওয়া যায়?—বাজার হইতে ইংলিস জিনিস একরূপ বিতাড়িত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের বাজার জর্ম্মান ও অন্যান্য বিদেশী জিনিসে পূর্ণ। এই যে শীত-কাল আসিয়াছে, দেখ, বাজারের অধিকাংশ শীতবস্ত্রই অন্যান্য দেশের। যদি ভারতের কলকে স্বদেশী বলিয়া গ্রহণ না কর, তবে "বিদেশী-গ্রহণ" স্রোতকে কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে না। চরমপন্থীদিগের স্পষ্ট করিয়া মত ঘোষণার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উত্তর চাই,—তাঁহারা ইংরাজ দ্বারা পরিচালিত কলের উৎপন্ন বস্ত্রকে দেশী বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না?—ত্রিহুতে সাহেবেরা চিনির কল করিয়াছেন এবং ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। উত্তর চাই, তাহা কি বর্জ্জন করিবেন? মূলধনের সুদ ইংলণ্ডে গেলেও, শ্রমজীবীরা এদেশের, দ্রব্যাদি এদেশের, ইহা কি আমাদের পরম লাভ নয়? কাগজের কলে হাজার হাজার দেশী লোক খাটিতেছে, দেশের চিরপরিত্যক্ত ঘাসের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, ইহাতে কি আমাদের লাভ নাই? যদি কখনও দেশী কল হয়, তখন এই সব লোকের দ্বারাই কল চলিতে পারিবে, লোকের অভাব হইবে না; ইহাও কি লাভ নয়? কিন্তু একটা কথা আছে, "সস্তার কথা।" কত দরিদ্র বেশী মূল্য দিয়া স্বদেশী-গ্রহণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু নেতারা পারিলেন না! দেশী জিনিসে যদি বেশী মূল্যে দেই, তাহা দরিদ্র পোষণের জন্য দিতেছি, একথাও কি ভাবা উচিত নয়? কিন্তু তাঁহারা ভারতের দারিদ্র্যের কথা গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। তাঁহাদের ধারণা, দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণ না হইলেও দেশ জাগিবে। তাঁহাদের অন্যতর সুযোগ্য নেতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় রাখিবন্ধনের দিনে (৩০শে আশ্বিন, ১৩১৪) ফেডারেশন মাঠে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন, দরিদ্র্যসমস্যা আশু পূরণের জন্য কৃষি ব্যাঙ্কের কথা তাহাতে স্থান পায়

* বিগত দুই বৎসর হইতে এদেশে ইক্ষুর চাষের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত ১৮৯১ সাল হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এবং বঙ্গদেশে ইক্ষুর অবনতি ক্রমেই ঘটিতেছিল, ১৯০৬ সাল হইতে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গদেশে ১২ লক্ষ ৬২ হাজার বিঘা জমিতে; ১৯০৬-৭ ১২ লক্ষ ৭৩॥০ বিঘা জমিতে এবং ১৯০৭-৮ সালে ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯০৪-৬ সালে ৬৪ লক্ষ ৮৫ হাজার বিঘায়, ১৯০৬-৭ সালে ৬৯ লক্ষ ৮৪ হাজার বিঘাতে এবং ১৯০৭ সালে ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে।

নাই। * যদিও তিনি স্বদেশী প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এদেশে ইংরাজের কলে প্রস্তুত-করা দ্রব্য তাহার মধ্যে ধরেন কিনা, তাহা জানি না। যদি ধরিতেন, তবে অমৃতবাজার ও আনন্দ-বাজার পত্রিকা বিদেশী কাগজে ছাপা হয় কেন? আমরা আশা করিয়াছিলাম, নিম্নশ্রেণীর জলচল সম্বন্ধে ও কৃষিব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার ন্যায় মহারথীর নিকট শুনিব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটী কথাও সে সম্বন্ধে নাই।

দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণের প্রধান উপায়—কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুমূর্ষু কৃষকশ্রেণীকে মহাজনদিগের হস্ত হইতে আশু রক্ষা করা। টাকায় টাকা সুদ, এদেশের জন সাধারণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিতেছে। নিম্নশ্রেণী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। থানায় থানায় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে এবং নিম্নশ্রেণী রক্ষা পাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিতে না পারিলে এদেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই। তাহারা দলে দলে যদি মরিয়াই গেল, তবে তোমার বক্তৃতা, বা উপদেশ বা পুস্তিকা কে শুনিবে, বা পাঠ করিবে? পেটে অন্ন নাই বলিয়াই তাহারা জীর্ণ শীর্ণ, সুতরাং রোগ-বিষ প্রতিরোধের শক্তি-শূন্য। সেই জন্যই প্লেগে এবং ম্যালেরিয়াতে দলে দলে লোক চলিয়া যাইতেছে। সকল সংস্কারের প্রধান সংস্কার—লোক-রক্ষণ। যদি লোকই না বাঁচাইতে পার, তোমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

এদেশের নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিতে কোন সভা বা কোন নেতা চেষ্টা করিতেছেন না! এদেশের পনর আনা লোক মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, হায়, হায়, হায়—কেহ দেখিবার নাই, কেহ এক বিন্দু জল বা দুটী অন্ন মুখে দিবার নাই!!

বক্তৃতা ত ঢের করিয়াছ এবং শুনিয়াছ, ভাই, তুমি একবার দরিদ্রদিগের জন্য কিছু কর না কেন? বক্তৃতা এবং লেখা বন্ধ হইলই বা, তাহাতে কি? অনন্ত কার্য্য-ক্ষেত্র ত পড়িয়া রহিয়াছে;—আজীবন লক্ষ লক্ষ লোক খাটিলেও তাহা সমাপ্ত হইবে না, সেদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না কেন? দরিদ্র-ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া, জলচল করিয়া, তোমরা অনন্ত নিম্নশ্রেণীর ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, আবার একতা জাগিয়া উঠুক। একতা নাই—একতা সাধনা হয় নাই—ঘৃণা বিদ্বেষ সমভাবে রহিয়াছে, কি ছাই পেচকের নৃত্যের ন্যায় আস্ফালন করিতেছ?

মহামতি বিদ্যাসাগর বলিতেন,—"এদেশের নিম্নশ্রেণীকে এদেশের যে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা মানুষ মনে করে না, তাঁহাদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর কি উপকার হইবে? তাহারা চির-উপেক্ষিত, চির-ঘৃণ্য—কিসের সভা সমিতি ও জাগরণ?" বাস্তবিকও তাই। কেহই দরিদ্র ভাইকে ধরিল না, রাখিল না, তুলিল না।

* (1) The spread of Swadeshi or national feeling; the purchase of India-made things even at a sacrifice; the encouragement and development of indigenous industries and agricultural reforms.
(2) Education of the masses by pamphlets, speeches and conferences.
(3) The stopping, as far as that is possible, of internecine quarrels by arbitration courts, as well as by the efforts of missionaries, honorary or paid, appointed for the purpose of preaching nationalism.
(4) Education, both general and technical, on national lines, as far as that is possible.
(5) Sanitation.
(6) Instruction for economical living.
(7) Possible social reforms.
(8) Promotion of good feelings between Hindus and Mussalmans.

তাঁহাদের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। ব্যবহারিক জীবনে, "ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে !" তাঁহারা ইংরাজ-নিন্দা করিয়া নাম কিনিয়া দিগ্বিজয়ী হন, কিন্তু ফিরিঙ্গির স্কুলে ছেলে মেয়েকে পড়িতে দিন! তাঁহারা ভাইকে তোলেন না; ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন না;—দলে দলে লোক মরিয়া যায়, সেদিকে ফিরিয়াও চাহেন না! হায়রে দেশ-উদ্ধার!!

তবে আশা কোথায়? যাহা তোমরা দূর করিতে চাহ, আমরা তাহার মধ্যেই আশার বীজ নিহিত দেখিতেছি। তাহা এই যে, দুষ্ট-বুদ্ধি ইংরাজের স্কন্ধে চাপিয়াছে এবং ইংরাজ অদম্য ভাবে ভারতকে নিগৃহীত করার ব্রত গ্রহণ করিতেছে। রেগুলেসন লাঠী লইয়া দলে দলে পুলিস যখন সংবাদ-পত্রের আফিস আক্রমণ করিতে যায়, তখন আমাদের হাসি পায়! সামান্য লোক মৌলবী লিয়াকতরূপ-সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তাহাতেও হাসি পায়।* আমরা এত সামান্য লোক, আমাদিগকে এত ভয়? কোথাও কিছু বিদ্রোহের আয়োজন নাই, তবুও এত ভয়? আমাদের মনে হয়, আমাদের স্বদেশের বহু কালাপাহাড় ইংরাজকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছেন। ইংরাজ-অত্যাচার থামিলে পাছে দেশের আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, তাই তাঁহারা ইংরাজকে সমানভাবে ক্ষিপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া রাখিতেছেন। আমাদের দেশের কালাপাহাড়গণ, বিধাতার কৃপায়, বুদ্ধিতে এবং কৃতীত্বে ইংরাজের উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, নচেৎ তাঁহারা এই মহৎ কাজে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। অসংখ্য "গুপ্ত", "মহাপাত্র" এবং "লাহিড়ী"—এই ব্রত গ্রহণ না করিলে এতদিন সমস্ত স্বদেশী আন্দোলন নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। গুপ্ত শত্রু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু সহস্র গুণে ভাল। আমরা আজ দেশের কালাপাহাড়গণকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতেছি;—তাঁহারা আজ প্রকাশ্য শত্রু বলিয়া উপেক্ষিত ও ঘৃণিত, কিন্তু কালে তাঁহারাই, কর্জ্জনের ন্যায়, এ জাতির প্রকৃত বন্ধুরূপে প্রতিপন্ন হইবেন। ইংরাজ মহামূর্খ যে, মহাচক্রীর মহাবিধান না বুঝিয়া, কালাপাহাড়গণের হাতের ক্রীড়নক হইলেন—এবং আমাদের ভ্রাতার দ্বারা ভ্রাতাকে প্রহার করিয়া আপন পায়ে ভাবী কুঠারা-ঘাতের কারণ হইলেন। আমাদের সকল আশা—মহাচক্রীর মহা বিধানের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আমরা জানি, তাঁহাদের দলের অনেক লোক বাহিরে জাতীয়তার শত্রু, কিন্তু ভিতরে পরম বন্ধু। আমরা বাহিরে জাতীয়তার বন্ধু, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে জাতীয়তার শত্রু;—গোপনে গোপনে বিদেশী গ্রহণ করি, ইংরাজের পা চাটি,—নিম্নশ্রেণীকে দেখিলে ঘৃণা করি, অস্পৃশ্য বলিয়া দূর করিয়া দি, মূর্খ দেখিলে তুচ্ছ করি, দরিদ্র দেখিলে কষাঘাত করি,—কিন্তু প্রকাশ্যে লিখি এবং বক্তৃতা করি, "আমরা সব ভাই এক ঠাঁই।" আমরা প্রকাশ্যে বলি, "স্বদেশী গ্রহণ কর," কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিদেশী গ্রহণ করি, সকল প্রকার "স্বদেশী-দ্রব্যকে" উপেক্ষা ও তুচ্ছ করি! নচেৎ এত লোক রাখিবন্ধনের দিনে মিলিত হইল, কই কলিকাতার বিদেশী চিনির দ্বারা প্রস্তুত করা একখানি মেঠাইর দোকানও ত বন্ধ হইল না? কিসের পিকেটিং এবং কিসের সামাজিক নির্য্যাতন?—ঘরে ঘরে বিদেশীর রাজত্ব অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে! দোকানের

* বিনা অপরাধে ৬ মাস জেল দিয়াছেন!

ফুলরী, বেগুণী, কচুরী ও নিমকি কি বিলাতী লবণ দ্বারা প্রস্তুত হয় না? অসংখ্য মোদকের দোকানে কি বিদেশী চিনি ব্যবহৃত হইতেছে না? কে মেঠাই সন্দেস খায় না, বলত? সুতরাং আমরা নিজেরাই দেশের প্রকৃত শত্রু। আমরা নিষ্ঠার সহিত কোন কাজ করি না, কোন কাজ ধরি না, কেবল বালকের ন্যায় হাসি, গাই এবং নাচি। হায় রে হায়, এমন লোকদের হাতে এমন জাতির উদ্ধারের ভার !! চা-পানে কোন্ নেতা বিলাতী চিনি ব্যবহার করেন না? আর বলিব কি? "যুগান্তর" বাদে চরমপন্থীর কোন্ সংবাদপত্র বিদেশী কাগজে ছাপা হয় না? কিন্তু তবুও নাকি তাঁহারা দেশের নেতা, দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, দেশের রক্ষাকর্ত্তা—সকলই! আমরা এহেন নেতাদের উপর কোনই আস্থা রাখি না। দেশের প্রকাণ্ড শত্রু যাঁহারা;—অর্থাৎ যাঁহারা বাহিরে শত্রু কিন্তু ভিতরে ব্যবহারিক জীবনে নিষ্ঠার সহিত স্বদেশী গ্রহণ করিয়া দেশের রক্ষার জন্য মহা তপস্যা করিতেছেন, আমাদের আশা ভরসা তাঁহাদের প্রতি। বিধাতা, এদেশকে,বাহির-সর্ব্বস্ব, অন্তর-সার-শূন্য নেতাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বদেশীর মন্ত্রণায় দীক্ষিত করুন। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করিয়া, তাহাদের হস্তে দেশের উদ্ধারের নিশান তুলিয়া দিয়া—এদেশে মহা কল্যাণের বীজ বপন করুন। এই করুন—এদেশ ভিতরে ভিতরে ষোল আনা স্বদেশী হইয়া যাক্‌,—সকল কপটতা ভণ্ডামি নির্ব্বাপিত হইয়া যাক্‌;—দেশে জাগিয়া উঠুক—পূতচরিত্র নিষ্কামব্রতধারী খাঁটী স্বদেশসেবকের দল এবং তাঁহাদের সুদৃষ্টান্তে জাগিয়া উঠুক, মহা একতা, যাহা এদেশের চিরকল্যাণ-সাধনে সমর্থ হইবে। মা আনন্দময়ীর অজস্র কৃপা বর্ষিত হউক।

# উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।*

তিনি ছিলেন এক সোণার চাঁদ,—যিনি আপনার ভাবে চলিতেন, আপনার ভাবে মাতিতেন, আপনার ভাবে গাইতেন, আপনার ভাবে লিখিতেন। তিনি মায়া মোহের দাস ছিলেন না, আজীবন কুমার,—আজীবন নিষ্কলঙ্ক সেবক। তিনি অন্যকে গণিতেন না, অন্যকে মানিতেন না, কাহারও ভালবাসায় অন্ধ হইয়া কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাতে মতের চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু কপটতা বা ভণ্ডামি কখনও দেখা যায় নাই—তিনি ছিলেন খাঁটী স্বদেশভক্ত। অন্যের দোষ দেখিলে দিশাহারা হইয়া, তিনি কত গালাগালি করিতেন, কিন্তু বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করিতেন না। তিনি ছিলেন অকপট,সরল সংসারজয়ী বীর-সন্ন্যাসী। তিনি আজীবন খাটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই,খাটিয়া খাটিয়া সারাজীবন দেশের জন্য পাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণের মর্য্যাদা, প্রতিভার আদর, সেবার গৌরব—এদেশের এই আত্মসর্ব্বস্বময় এযুগে কখনই সম্ভব নয়। তিনি যে অনিন্দিত পূত-

* মৃত্যু—ক্যাম্বেল হাসপাতাল ১০ই কার্ত্তিক, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা, ১৩১৪।

চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অবহেলার যোগ্য নয়;—তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে, অক্ষয় কবচের ন্যায়, ধারণার যোগ্য। তিনি ত মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেবশক্তি! কিন্তু আজ কোথায় তিনি?

এক ছিলেন রমাকান্ত, আর ছিলেন কাব্য-বিশারদ কালীপ্রসন্ন, আর ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব;—সোণার বাঙ্গালার নিরুপম স্বদেশ-সেবা-সাগর সেঁচিয়া আমরা এই তিনটী প্রচারক-রত্ন পাইয়াছিলাম। রমাকান্ত ছিলেন সেবক, কাব্যবিশারদ সাধক, উপাধ্যায় মহা-যোগী। তিনের সেবা, যোগ এবং সাধনার বিষয় কেবল "স্বদেশ।" তিন জনই নির্ভীক এবং সাহসী। স্বদেশের জন্য ইঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, যখন ব্যক্তিত্বের ভুলভ্রান্তি লোকেরা ভুলিয়া যাইবে, তখন, তাহা স্মরণ করিয়া লোকেরা অশ্রুবর্ষণ করিবে এবং সবিস্ময়ে বলিবে,—"চরিত্রের কি মাধুর্য্য দেখিলাম গো!" তোমরা স্বদে-শের জন্য আত্মত্যাগ করিতে কাহাকেও দেখিয়াছ কি? রমাকান্ত, বিশারদ এবং উপাধ্যায় স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

"যুগান্তর" এবং আরো কোন কোন পত্রিকা ভ্রূকুঞ্চনের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উপাধ্যায় এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেদিন ভক্ত কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হন, সেই দিন হইতেইত তাঁহার অনিন্দিত পুণ্যময় জীবনের আরম্ভ। তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? তিনি ব্রাহ্ম হউন, বা খ্রীষ্টান হউন, বা হিন্দু হউন—আমরা সে সকল কিছুই গণনা করি না, আমরা কেবল গনিতেছি যে, তিনি খাঁটী স্বদেশসেবক ছিলেন। তাঁহার "কন্‌কর্ড" তাঁহার "সোফিয়া," তাঁহার "টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি" তাঁহার সিন্ধুদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার, তাঁহার ইংলণ্ড গমন, তাঁহার বেদান্ত প্রচা-রের চেষ্টা, তাহার "সন্ধ্যা"—সব এক বাক্যে ঘোষণা করিতেছে, তিনি খাঁটী স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশভক্ত, স্বদেশসেবক। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, গমন উপবেশনে সদা তিনি ভাবিতেন—কেবল স্বদেশের উদ্ধারের কথা। তাঁহার কামনা, জল্পনা, কল্পনা সবই কেবল "স্বদেশ," তিনি, ম্যাটসিনির ন্যায়, স্বদেশকে বিবাহ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এরূপ নিষ্কাম স্বদেশ-যোগসিদ্ধ ব্যক্তি এদেশে বড় অধিক জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাঁহার বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি,—তাঁহার নিষ্কাম ব্রতপরায়ণতার জন্য অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পূজা করিয়াছি। এই ভক্তির দায়ে, উপাধ্যায়ের সহিত ঝগড়া বিবাদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে, একদিন, করযোড়ে কাব্যবিশারদকে অনুরোধ করিয়া-ছিলাম। উপাধ্যায়ের সমতুল্য ব্যক্তি এদেশে আর আছে কিনা, জানি না। তিনি চরিত্র-মাধুর্য্য ও স্বদেশসেবার অপরাজিত বীর।

এহেন ব্যক্তি, এই নির্য্যাতনের দিনে, এ বঙ্গ, স্বেচ্ছায়, পরিত্যাগ করিলেন কেন? ভয়ে কি? না, তাহা নয়; তিনি বড়ইই নির্ভীক ছিলেন। স্বেচ্ছা বলি এই জন্য—যদি তাঁহার পীড়া হইল, তিনি যে "ফিরিঙ্গিকে" এত ঘৃণা করিতেন, সেই ফিরিঙ্গির হাঁসপাতালে গেলেন কেন? বন্ধুরা কি অন্যত্র তাঁহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না? ধিক, শত ধিক! "সন্ধ্যা" তাঁহার তিরোধানের কারণ সম্বন্ধে নানা সন্দেহ করিতেছেন। ভিতরের সংবাদ কে জানে? চতুর্দ্দিকে যেরূপ ঘটনা

সর্ব্বদা দেখিতেছি, তাহাতে ইংরাজের অসাধ্য কি আছে, তাহা জানি না। এহেন ইংরাজের হাঁসপাতালে গমন—স্বেচ্ছামৃত্যুর কারণ। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার অযোগ্য ভাই, এদেশ তাঁহার অযোগ্য স্থান ;—বুঝিয়াছিলেন,জেলে নির্য্যাতনে, অত্যাচারে পচিয়া মরিলেও এদেশ সেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না, যাহাতে নবজীবনের অভ্যুত্থান হয়। রক্তদানে রক্তবীজের উদয় হইবে না, তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ ভাবিলেন,কাহার জন্যখাটিব, কাহার জন্য কষ্ট সহিব,কাহার জন্য থাকিব? তাই তিনি আজ লজ্জা লুকাইবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। যখন শুনিলাম, তিনি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে গিয়াছেন, তখন কি জানি কেন, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রে ঘুম হইল না! ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিল! যাহা ভাবিলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই সে সর্ব্বনাশ ঘটিল! প্রাণ অস্থির হইল—নগ্নপদে ছুটিয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান দেখাইতে চলিলাম। তাঁহাকে শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া যে যাতনা পাইলাম, এক মাত্র সর্ব্বদর্শী বিধাতাই তাহা জানেন। অনাহারে রজনী কাটাইলাম, চক্ষের জলে শয্যা ভিজাইলাম। যে অমূল্য রত্ন হারাইলাম, এ জীবনে তাহা আর পাইব না। যেমন রমাকান্ত, তেমনি কাব্যবিশারদ,তেমনি তিনি। বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পরিণাম রমাকান্তের উজ্জ্বল ললাটে বিষাদের রেখাপাত করিল, "সারদাকান্তের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার" উপাধ্যায়ের প্রশস্ত ললাটে ঘোর বিষাদের রেখাপাত করিল ;—দুই নিষ্কলঙ্ক মহারথীই স্বদেশসেবার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন! যদি এদেশের জীবন্ত ভাবের পরিচয় পাইতেন,—এই সোণার ভারতের অজেয় এই দুই কুমারের কেহই আত্মাহুতি দিতেন না। আত্মাহুতি হইল—কিন্তু তবুও ত দেশ জাগিল না! আর কাব্যবিশারদ বড় আশায় জাপানকে বন্ধু ভাবিয়া যখন বুঝিলেন যে জাপান ভারতের বন্ধু নয়, তখন লজ্জায় অমূল্য জীবন সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন! কিন্তু হায়, সে কথা স্মরণ করিয়াই বা এদেশ কই জাগিল?—জন্মভূমি,তোমার সব সেবক, সব সাধক ও মহাযোগীই যদি গেল, তবে তোমার পরিণাম কি? হায়, হায়, কে তোমাকে রক্ষা করিবে? তোমার সন্তানগণ কি ইংরাজের অত্যাচারে চিরদিনের জন্য গোলামীতে নিমজ্জিত হইবে?

# বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপ্রকাশিত ও বিধবা বিবাহের প্রথম পাতি।

কুলাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিবাস বিক্রমপুর বাইনখাড়া গ্রামে। পূর্ব্বে ইঁহার নিবাস অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে ছিল। সে আজ প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসরের কথা, যখন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-বিধবাগণের করুণ রোদনে ব্যথিত হইয়া তাহাদের ক্লেশ দূরীকরণ-মানসে ব্রতী হইয়াছিলেন, যখন কৌলীন্য-সংস্কার ও বহুবিবাহ প্রভৃতি সমাজের অনিষ্টদায়ক প্রথা গুলি সমূলে বিনষ্ট

করিবার জন্য উক্ত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মহৎ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই ন্যায়রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের ন্যায় কৌলীন্য-পরিপ্লাবিত দেশে সমাজের এ সমুদয় অমঙ্গলকারী প্রথা সমূহ দূর করিবার জন্য তাৎকালীন সামাজিকগণের বিদ্রূপ ও গ্লানি তুচ্ছ করিয়া যে সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যে বিশেষ গৌরবের, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে কন্যা বিক্রয় প্রথা এইরূপ ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, লোকে কন্যা বিক্রয় করিয়া টাকা দিবে,এই করারে গোয়াল,মুদী, জেলে প্রভৃতির নিকট হইতে ধারে জিনিস ইত্যাদি ক্রয় করিত; তৎকালে এইরূপ ভাবে ধারে বিক্রয় করিতেও কেহই ইতস্ততঃ করিত না। তিনি সমাজের এই প্রকার ঘৃণ্য ব্যাপার দর্শনে ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অনেকে তাঁহাকে বলিত যে, "তুমি কুলাচার্য্য, কেন তুমি এ সমুদয় সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতেছ? ইহাতে তোমার ধনে প্রাণে সর্ব্ববিধ বিষয়েই অনিষ্ট হইবে।" কিন্তু হৃদয়ে প্রেরণা আসিলে, তাহা কেহই দূর করিতে পারেনা। ভাগীরথীর স্রোতবেগে একদিন মত্ত ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ সাধু ইচ্ছার মহৎ শক্তিতে তাঁহার হৃদয়ে যে সাহস ও শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার নিকট বাধা বিঘ্ন পরাজিত হইল, তিনি সমাজ-সংস্কারে স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবর্গের সহিত একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পশ্চিম বঙ্গে (কলিকাতাতে) ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ সভা নামক দুইটী সভা ছিল,—এই সভায় সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলনী এবং নানাবিধ সমাজহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তন্নিমিত্ত আলোচনা ইত্যাদি হইত। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতার ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ১২৭৮ সালে বক্তৃতা ইত্যাদি করিয়াছিলেন। এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর আলাপ পরিচয় হয়। এই বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু চিঠি পত্রাদি লেখালেখি চলিত। ইহাঁর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত বহু চিঠি ছিল, তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে,কেবল একখানা চিঠি এখনও ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্ধের যষ্টির ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; অদ্য আমরা "নব্যভারতের" পাঠক পাঠিকাগণকে সেই চিঠিখানার অবিকল অনুলিপি ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রথম পাতির যে নকল দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলাম।

চিঠির অনুলিপি।

শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্।

সাদরসম্ভাষণমাবেদন মিদম্—

আপনকার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, আপনি নড়িয়াতে যে দশ খানি পুস্তক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন,প্রেরকদিগের অসাবধান দোষে তাহা পাঠান হয় নাই। অদ্যকার ডাকে রেজিষ্টারী করিয়া দশখানি পুস্তক প্রেরিত হইল তত্রত্য মহাশয়দিগকে পাঠ করিতে দিবেন। পূজার পরেই আমার ঢাকা যাইবার অভিলাষ ছিল,অসুস্থতা প্রভৃতি কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ যাইতে পারি নাই, অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্দ্ধে যাইব,

এই স্থির করিয়াছি। পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, আগমন কালে আনিবেন, ইহা অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। শ্রীযুত তারাপ্রসাদ রায় মজুমদার স্বাক্ষর করণ কার্য্যে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তিনি যেইরূপ প্রকৃতির মনুষ্য, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার সদৃশ লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। শ্রীযুত রায় কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকটও আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। ইতি ২৫শে কার্ত্তিক।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শিরোনামা।

নানাগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন

কুলাচার্য্য মহাশয়

মদনুগ্রাহকেষু।

নড়িয়া—

থানা মুলফত্‌গঞ্জ

ঢাকা।

বিধবা বিবাহের প্রথমপাতির অনুলিপি।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

পরম পূজনীয়

শ্রীযুত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ

সমীপেষু—

প্রশ্ন—নবশাখ জাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবা ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্যপাত্রে সমর্পণ করার বাসনা করিতেছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না, আর পুনর্ব্বিবাহনন্তর এ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কিনা, এবিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তরং। মন্বাদি শাস্ত্রেষু নারীণাং পতি মরণান্তরং ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ পুনর্ভবণা না মুক্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্ম্মতযাবিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্য সহমরণরূপাস্য কথদেয়ং সমর্থয়া অক্ষত যোন্যাং শূদ্র জাতীয় মৃত ভর্ত্তৃক বালায়াঃ পাত্রান্তরেণ সহ পুনর্ব্বিবাহঃ পুনর্ভবনরূপ বিধবা ধর্ম্মাত্মন শাস্ত্রসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয় ভর্ত্তৃ ভার্য্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্র বিদাং বিদাম্মতং।

অথ প্রমাণম্। মৃতে ভর্ত্তারি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণংবেতি শুদ্ধিতত্বাদিধৃত বিষ্ণু বচনং। যা পত্র্যা বা পরিত্যক্তা বা স্বয়েচ্ছায়া উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা সপৌনর্ভব উচ্যতে ইতি স চেদক্ষত যোনিঃ স্যাৎগতপ্রত্যাগতাপিবা। পৌনর্ভবো ভর্ত্রা সাপুন সংস্কারমর্হতীতি চ মনু বচনং। যা স্ত্রী যগ্যক্ষত যোনিঃ সত্যস্য মাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতীতি কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যানম্॥ নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎন বিবাহ বিধাযুক্তং বিধবা বেদনং পুনরিতি বচনস্ত দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যক্তিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতা বিগন্তব্যাসন্তানস্য পরিক্ষয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনানিয়োগাক্ষ বিবাহ নিষেধ পরং ন সামান্যতো বিধবাবিবাহ নিষেধক মন্যথা পুনর্ভবন প্রতিপাদক বচনায়া নিধিবন্ধাপত্তিঃ স্নিতি দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চেত্যুদ্বাহতত্বধৃত বৃহন্নারদীয় বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তকন্যা প্রদীয়তে ইতি উদ্ধৃতা-

দিত্য পুরানীয় বচনঞ্চ সময়ধর্ম্ম প্রতিপাদক তয়া ন নিত্যবদনুষ্ঠান নিষেধকং। মত্যামশ্বত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেঽকৃতয়োন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্বান প্রস্থাশ্রম গ্রহঃ। দত্তঃ ক্ষতয়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরশ্চ বৈ ইতি মদন পারিজাতধৃত বচনেন সহতয়ো রেকবাক্যত্বেঽক্ষেতযোন্যা বালায়াঃ পুনর্ব্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধুং শক্নুতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্যা বিবাহ নিষেধক তয়া ব্যতিরেক মুখেনাক্ষমতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিহমেব দ্যোতিয়ত ইতি॥

জগন্নাথঃ শরণং।

(স্বাক্ষর) শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাং।

শ্রীবিশ্বেশ্বর জয়তি।

(স্বাক্ষর) শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণায়।

শ্রীশম্ভুরোজয়তি।

(স্বাক্ষর) শ্রীহরনাথ শর্ম্মণা।

শ্রীরামঃ শরণং।

(স্বাক্ষর) শ্রীরামতনু দেবশর্ম্মণাং।

রামচন্দ্র শরণং।

(স্বাক্ষর) শ্রীযুক্ত মুক্তারাম শর্ম্মণাম্।

শ্রীহরিঃ শরণং।

(স্বাক্ষর) শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাং।

কাশীনাথ শরণং।

(স্বাক্ষর) শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্।

শ্রীরামঃ।

(স্বাক্ষর) শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাং।

(স্বাক্ষর) শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাং।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত গুলি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন খানার মধ্যেই এই পাতিখানা মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় ইহা মুদ্রিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য সম্বন্ধীয় গল্প শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। হায়, আর কি বর্ত্তমান যুগে এমন মহাপুরুষ জন্মিবেন? পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সহৃদয় শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত মহাশয় এ চিঠিখানা ও পাতিখানার সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
মূলচর পোষ্ট, ঢাকা।

# আমাদেরই দোষ

কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচার সম্বন্ধে এক সময়ে গগন মেদিনী কম্পিত করিয়া বাঙ্গালী আন্দোলন তুলিল, কত নাটক হইল, ফাটকও হইল। কিন্তু কুঠিয়াল কয়জন ছিল? তখনকার একজন ইংরাজের শরীরে না হয় দুইজন বাঙ্গালীর শক্তি ছিল, বন্দুক কামানে না হয় সে ১০ জনের প্রতিযোগী হইতে পারিত। তাহার সাধ্য কি ছিল যে, শত শত পল্লীবাসীকে উজাড় করিয়া দিবে? আমরাই সে সকলের মূল। ভজহরি বসু মহাশয় দেওয়ান হইলেন, কুড়রাম দত্ত তহশীলদার, রামদাস দালাল, নকড়ি সেখ পেয়াদা ও হীরামালিনী কুটনী। এই সকল দ্বারাই কুঠিয়াল সাহেব অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। কুড়রাম দত্ত বলিলেন, 'হুজুর, বাঙ্গালীদের স্ত্রীকে উলঙ্গ করিলে তাহারা বড় দুরস্থ হয়।' নকড়ি সেখ সকলের চাষকরা জমিতে নীলের বীজ রোপণ করিল, গ্রাম-

দাস সকলকে ২৫্ টাকার স্থলে ৫্ টাকা দাদন করিল। এইরূপে অত্যাচারের সূত্রপাত হইল। আবার, দুই একটা ঘটনা এমনও হইয়াছে, যাহাতে অত্যাচারী সাহেবও শিক্ষা পাইতেন। এক নূতন বিলাতী জজ আসিলেন, তিনি বাঙ্গালা বুঝিতেন না, তাই কখনও কখনও চণ্ডীমণ্ডপকে তলব দিতেন। তাহার আফিসে দুই ভাই সেরেস্তাদার ও পেস্কার ছিলেন, সাহেব রাগ হইলেই রুল ধরিতেন। একদিন এক ভাই সাহেবের এক বে-আইনী হুকুমের প্রতি-বাদ করিলেন, সাহেব অমনি রুল ধরিবার উপক্রম করিলেন; তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে বলিল, দেখ কি দাদা, বেটা বে-আইনী হুকুমও দেয়, আবার রুল ধরে। কথা শুনিয়া দাদা ভাইয়ে সাহেবকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া কাজ পরিত্যাগ করিলেন।

যখন পূর্ব্ব বঙ্গের অত্যাচারগুলির কথা মনে হয়, এবং এই কথা মনে হয় যে, প্রতি জেলায় ২৷৩ জন সাহেব, আর সব বাঙ্গালী, প্রায়ই হিন্দু, অল্প সংখ্যক মুসলমান, তখন মনে হয়, হায়, আমরাই ত আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যখন বরিশালে স্বনামধন্য ইমার্সন কেম্প মারিবার আদেশ দিল, তখন শুনিয়াছি, হিন্দুস্থানী নিরস্ত্রকে প্রহার করিল না, বাঙ্গালী কনষ্টেবলগণই এই অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন—দে। মনে হইল, হায় পৃথিবী, তুমি বিদীর্ণ হইলে না কেন? বেলফাষ্ট রায়টে আইরিস পুলিস আইরিসদের সপক্ষ হইয়া লড়াই করিয়াছিল। আমাদের সে নরাধমগুলি কি এ কথা বলিতে পারিল না, "হুজুর, আমরা এ সকল মুরব্বি লোককে মারিতে পারিব না।" তাহারা কেম্পের চাকর, না সাধারণের চাকর? পব্‌লিক সরভিস মানে পুলিস সাহেবের চাকর নহে, জনসাধারণের চাকর। তারা সাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য নিয়োজিত, শান্তি ভঙ্গের জন্য নহে।

ছোট লোকের কথা বলিব না। যখন ইমার্সন ডেপুটী বাবুকে বলিল, সুরেন্দ্র বাবুকে জরিমানা কর, তখন তিনি কি বলিতে পারিতেন না যে, এবিষয়ে আমি আমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার জন্য আমি ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন দিতে পারিব না? ৪০০্ টাকার জন্য কি তিনি উপবাস করিতেন?

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরী রূপ মেওয়া খান নাই, তাঁহারা অনেকে হয়ত এই প্রভুদের কীর্ত্তি জানেন না। সাহেবের বারান্দায় গিয়া ইঙ্গিতে আরদালীকে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুরের মেজাজ কেমন, পরে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। হায় মানুষ, এই কি তোমার মনুষ্যত্ব! মানুষ কি মানুষের নিকট এমনই বাঘ।

কুমিল্লায় অত্যাচারের সময় যখন নরাধম বলিল, তোমার বিপিন পালের নিকট যাও, বলিয়া অত্যাচারীর সঙ্গে আমোদ করিয়া চা খাইতে লাগিল, তখন সিনিয়র ডেপুটী কেন বলিলেন না, "এ তোমার ডিউটী নহে। তুমি না পার, আমি সহরের শান্তি রক্ষা করিতেছি।"

তদপেক্ষাও নরাধম ক্লার্ক যখন শান্তিরক্ষকদিগকে হাজতে দিয়া নিরপরাধ লোক ও অরক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের উপর দলবদ্ধ দস্যুদিগকে ছাড়িয়া দিল, তখন কি কোন বাঙ্গালী নিম্ন কর্ম্মচারী বলিতে পারিল না, সাহেব কর কি, "মবকে" এমন ক্ষমতা দিলে

ধন প্রাণ মান যাইবে, আহা, তখন বাবাজীর ওষ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, জিহ্বা দিয়া ছাতু উড়িতেছে. আর ভয়ে কাঁপিতেছেন। এদিকে নরাধমেরা সতীর অবমাননা করিল ! যে সতীর অবমাননায় রাবণ নির্ব্বংশ হইল,বৃত্রের অদৃষ্ট-লিপি অকালে খণ্ডিত হইল, সেই সতীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিল, লোকের ধন প্রাণ হরণ করিল! ক্লার্ক বোধ হয় তখন প্রাণে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিল। মানুষ হইলে তখন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী-গণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিত "সাহেব, You are wanting in your duty"তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে না, জেলার ভার আমার হাতে দাও।" হায়, এখন নরাধমও এদেশ হইতে প্রাণ লইয়া বিলাত যাইবে, এবং এই ঘোর অত্যাচারের পেনসনে শেষ জীবনে ভারতীয় নবাবের ন্যায় অবস্থিতি করিবে !

আজি বিপিন বাবু ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বাহ্যিক রাজশক্তির উপর বিবেকের প্রভাব দেখাইয়া লোকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কত সময় কত প্রকার অত্যাচার আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করি। মনে কর,এই অস্ত্র আইন। যে দেশে ব্যাঘ্র,কুম্ভীর, সর্প, শূকর, ভল্লুক প্রভৃতি শত শত বন্যজন্তু অনুদিন লোকের জীবন বিনাশ করিতেছে, যে দেশের লোক একটী পাখীকেও মারিতে ইতস্ততঃ করে, শাক্য সিংহ ও চৈতন্যের শিক্ষা ও জৈনধর্ম্ম প্রভাবে যে দেশে সামান্য কীটের জীবন বিনাশেও অন্তরায়, সেদেশে এ দুর্দ্দৈব কেন? অস্ত্র-আইন এই নিরীহ দেশে কি এক সম্প্রদায়ের অপরাধ অত্যাচারের সহায় নহে? বিপিন বাবুর মত একজন বাঙ্গালী কি আজি ইংরেজকে বলিবে না, "সাহেব, আমার বিবেক বলে যে, অস্ত্র আইন নিরপেক্ষ রাজশক্তি নহে, ইহা সম্প্রদায় বিশেষের অত্যাচারের বিশেষ সহায়, সুতরাং আমার বিবেক এই অস্ত্র আইন মানিতে বাধ্য নহে।" সে তেজ আমাদের নাই, যদি থাকিত, আমার কখনই জগতে এরূপ ঘৃণিত ও পদদলিত হইতাম না।

সেকথা যাউক, কলিকাতার শান্তিরক্ষক পুলিসের অত্যাচারের কথা। বিলাতের পুলিস, শুনিয়াছি, লোকের ধন প্রাণের রক্ষক। যখন পুলিসের কর্ত্তা বলিল, "ছাত্রদের উপর লাঠি চালাও, তখন বাঙ্গালী ইনস্পেক্টর কি বলিতে পারিত না, আমরা বে-আইনি কার্য্য করিতে পারিব না।" তাহারা আইনের ও জনসাধারণের দাস, তাহারা লাহিড়ী, মহাপাত্রের দাস নহে। ফলকথা, বিবেক জগতে আর নাই, অন্ততঃ বাঙ্গালী তাহার ধার ধারে না। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের নিয়ন্তা ব্যাঘ্রভীতি।

বাঙ্গালীর জাগরণের এক্ষণেও অনেক বিলম্ব। এক্ষণে আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। মানুষ মানুষকে এত ভয় করিবে কেন? কেন এত হৃৎকম্প, কেন এ শিরঃপীড়া, সাহেবের এত ভয় কেন? ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বরের আদেশে কার্য্য করিবে? মানুষের ভয় কেন? মানুষ, তুমি কাহাকে ভয় করিবে? তোমার ইংরাজী পুস্তকেই বলিতেছে, Fear not man, তুমি মানুষের ভয়ে কাঁপিবে কেন? তুমি যেমন সাহেবের ভয়ে কাঁপ, তোমার অধীন সাহেব কি তোমার ভয়ে এইরূপ কম্পিত হয়? না, সাহেবের বেলায় হস্তকম্পন,আমা-দের বেলায় হৃৎকম্প!

কত জাতি উঠিল, কত জাতি পড়িল, কিন্তু এমন হৃৎকম্প-রোগ-গ্রস্ত জাতির

উত্থান অতি সুদুর-পরাহত। যে দেশে শিক্ষকগণ অকারণ ছাত্রদিগের মস্তক ভক্ষণে প্রস্তুত, যে দেশে শিক্ষক পিতৃস্থানীয় না হইয়া হাকিম স্থানীয়, সে দেশে ছেলেদের উন্নতি হইবে কি? পুলিসের সরস্বতীদের বন্দেমাতরং কথাটীর অর্থ—"বান্ধ ও মার।" কিন্তু স্কুলের শিক্ষকেরা ত বুঝেন যে,ইহা মাতৃপূজার কথা। এই কথা লইয়া শিক্ষকগণ আতঙ্কে অস্থির! শিক্ষক, যাহারা ভবিষ্যৎ জাতির প্রবর্ত্তক, তাহারাই যখন কাপুরুষত্ব শিখায়, তখন ছেলেদের সাহস বীর্য্য কে শিখাইবে?

তাই বলি, নন-অফিসাল বা বে-সরকারী বাঙ্গালী উঠিতে চায়, অফিসাল বা সরকারী বাঙ্গালী, তোমরা প্রকৃত রাজভক্তি ও বিবেক বাণীর আশ্রয় লও। আইন যাহা বলে, তাই কর; রাজভক্তি তোমাদের কেম্পের নিকট নহে, রাজা এডোয়ার্ডের নিকট, ইংরাজ মাত্রের নিকটই নহে, ইংরাজের রাজার নিকট। কোথায় এক পাট-ক্রেতা সাহেবকে কে মারিল, মার খাইয়াই মারিল, আর তোমরা জগৎ মাতাইলে, একি? যদি বিচারাসনে আহুত হইয়াছ, মনে কর, মানুষ মানুষে বিভেদ করিও না, দোহাই ধর্ম্মের, পক্ষপাত করিও না। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে—

Ye shall do no unrighteousness in judgment; Thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty. But in righteousness shalt thou judge thy neighbour.

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

# স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী

অসীম অনন্তবিস্তৃত সংসার-সাগরে জল-বুদ্বুদের ন্যায় মানুষ উঠিতেছে, পড়িতেছে, লয় পাইতেছে! মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, দুদিনের খেলা খেলিয়া আবার কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাল-প্রবাহ কাহাকে কোথায় ফেলিয়া দিয়া গেল, তাহার খোঁজ নাই, তাঁহার মীমাংসা নাই। তাই বড় উচ্চকণ্ঠে কবি গাহিয়া গিয়াছেন, "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

যেখানে "দুদিন আগে দুদিন পাছে" সকলেরই এক গতি, যেখানে 'পদ্মপত্র মিবাম্ভসা' মনুষ্য-জীবন, জলবিম্বের ন্যায় জলে মিশিয়া গেলে আর তাহার চিহ্নও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সেই পৃথিবীতে যিনি লোকের মনোমন্দিরে নিভৃতে পূজা প্রাপ্ত হ'ন, তিনি নরকুলে ধন্য বই কি। অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের জন্য কেহ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মৃত হন, কাহারও চরিত্রের মহত্ব এবং জীবনের ঘটনাবলী চিরদিন দুঃখদুর্দ্দশা-পীড়িত জনগণের মুহ্যমান হৃদয়ে শক্তি প্রদান করে, শঙ্কট এবং কণ্টকময় সংসার পথে যথাযথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সাধু মহাত্মাদিগের জীবনাদর্শ আমাদিগকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করাইয়া দেয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। বহু কষ্ট এবং অস্বচ্ছলতার মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; হেয়ার সাহেবের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুকালেজে প্রবেশ করেন। ১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় তথায় পাঠ শেষ করেন এবং ঐ কলেজে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

তিনি কলিকাতা ছাড়াও,বরিশাল,কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাদান কার্য্যে-ব্রতী ছিলেন। যেখানেই গিয়াছেন, সেই-

স্থানেই বিদ্যার্থীগণ তাহার অমায়িক ব্যবহারে, মধুর আলাপে, সরলতা ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা এখনও বলিয়া থাকেন, অমন বিশুদ্ধ ইংরেজী এবং পরিশুদ্ধ উচ্চারণ অতি অল্প লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়।

লাহিড়ী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের প্রভাব তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। সে সাধুতা যিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। অমন জ্ঞানী, এত বড় পণ্ডিত অথচ অতি বিনয়ী। গুণরাশির কি মধুর মিলন হইয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল মিষ্টার এফ,জে,রো (Mr. F J. Rowe, M A.) লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আবেগপূর্ণ কথাবার্ত্তা, আগ্রহ ও বিনয় দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শেষ জীবনে দেশের গণ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। লাহিড়ী মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন এবং কি করিয়া যে উপযুক্তরূপে অভ্যাগত বন্ধুবর্গের সৎকার করিবেন, ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন।

মিষ্টার রো লিখিয়া গিয়াছেন—

"I am sure that Babu S. K. Lahiri will agree with me in attributing the success that has attended him in business to the high standard of morality which has always been set before him by his revered Father. I was glad to have the opportunity of allowing my wife to be introduced to this saintly old man. I trust that his declining years may continue to be comforted and cheered by seeing, in the respect and success that his descendants are earning, the good fruit of the example that he has shown and the training that he has given them."

মানুষ অনেক প্রকারে খ্যাতিলাভ করে। কেহ পরোপকারীরূপে, কেহ দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য, কেহ বা বিদ্যাধনমান-মণ্ডিত হইয়া, আবার কেহ স্বীয় ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে সাধুচরিত্রের জন্য ভগবৎ-প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের জন্য যাঁহার নাম, তিনি বোধ হয় বাস্তবিক শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র। তাই পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম শ্রবণে শরীর পুলক-কম্পিত হয়, তাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগের এবং পবিত্র ও মহৎ চরিত্রের ঘটনাবলী স্মরণে নিরাশ প্রাণে আশার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রতিভাত হয়।

ভগবান সংসারে নিত্যই নানা প্রকারে লোককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। নানারূপ বিপদের আবর্ত্তে ফেলিয়া দেখিতেছেন, এই সামান্য পার্থিব বিপদেই মানুষ তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতেছে কি না। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, ভগবান বলিয়াছেন—

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু যে না ছাড়ে পাশ আমি তার দাসের দাস॥"

সংসারেও এই পরীক্ষা নিরন্তর। পতির একান্ত ইচ্ছা প্রেমময়ী পত্নী তাঁহাকেই শুধু ভালবাসেন। প্রাণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ সব তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া আপনহারা হইয়া পতির মুখের দিকে তাকাইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। আবার পতিরতা পত্নীর মনেও সেই আশা, সেই ধারণা। স্বামী তাঁহাকে যেমন ভালবাসিবেন, আর কেহ যেন তেমন ভালবাসার অধিকারিণী না হয়। ভগবানকে যে ভাল-

বাসে, তিনি ধীরে ধীরে তাহার অন্য সকল ভালবাসার বাসা ভাঙ্গিয়া দিতে থাকেন এবং সকলদিক হইতে ভালবাসা গুটাইয়া আনিয়া এক লক্ষ্যে তাঁহার দিকে প্রধাবিত করিয়া দেন। যে বড় ব্যাকুল হইয়া প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহে দয়াময় দীনবন্ধু বলিয়া কাঁদে, জীবদুঃখ-কাতর পরমকারুণিক ভগবান্ তাহাকে আপনার অমৃতময় ক্রোড়ে তুলিয়া লন। ধার্ম্মিক জ্বালাযন্ত্রণাময় পৃথিবীর দুঃখ-শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া "দয়াল প্রভু, কোথায় তুমি" বলিয়া ক্রন্দন করে, প্রাণে বল পায়, হৃদয়ে শক্তি আইসে। "ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়।" বিপদে আপদে, দুঃখে সুখে ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে, করুণাময়ী জননী যেমন সন্তানকে বক্ষে লুকাইয়া রাখে, তেমনি, করিয়া রক্ষা করেন।

লাহিড়ী মহাশয় জীবনে বহুশোক সহ্য করিয়াছেন। পরম-ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন "যদিও তাঁহার চরণ পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু তাঁহার আত্মা—আশা ভরসা সকলি স্বর্গের দিকে উন্নত।" বাস্তবিক, ভগবানের বরাভয় পদে নিবদ্ধদৃষ্টি না হইলে কি অমন সাঙ্ঘাতিক শোক সহ্য করা সম্ভবপর? ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধীমান নবকুমারের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। ইনি মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভাগলপুর ডাক্তারী করিয়া অল্পদিনেই বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার বড় প্রিয় কন্যা ইন্দুমতী ভ্রাতাকে শুশ্রূষা করিতে যাইয়া সংক্রামক যক্ষ্মারোগেই অকালে জীবনলীলা শেষ করিলেন। একটী ফোটনোন্মুখ কমল কালের তীব্র উষ্ণনিশ্বাসে অকালে শুষ্ক হইয়া বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল।

ভগবান যাহাকে পরীক্ষা করেন, তাহাকে একেবারে বিপদের ব্যূহের ভিতরে নিক্ষেপ করেন। ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে খবর আসিল, লাহিড়ী মহাশয়ের জামাতা প্রখর-বুদ্ধি তারিণীচরণ ভাদুড়ী কোন অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদে পরিবারটী যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ইহাতেই কি শেষ হইল? ইহার পরেও আর একটী কন্যা কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইল! মানুষের সহ্য করিবার একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলেই কেহ সাররত্ন জ্ঞান-ধন হারা হইয়া পড়ে, কেহ বা আপনাকেই মৃত্যুর বজ্রসার হস্তে সমর্পণ করে। একমাত্র ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি দ্বারাই এই দারুণ শোকসিন্ধু পার হওয়া যায়, নচেৎ মানুষের জ্ঞান এখানে অকিঞ্চিৎকর, শাস্ত্র এখানে মূক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা ধীশক্তি অকার্য্যকরী।

এত পারিবারিক দুর্ঘটনা যাঁহার ঘটে, সাধারণতঃ দেখা যায়, তিনি সব ছাড়িয়া কোন এক নিভৃত প্রদেশে জীবন শেষ করেন। লাহিড়ী মহাশয় ইহার মধ্যেই সমাজ সংস্কার, স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা (লেফ্‌টেনেণ্ট গভার্ণর) C. C. Stevens. মহোদয়ের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছেন—

"Whenever the history of social reform in Bengal is adequately written, your father's name will have an honourable and conspicuous place in it. He was a reformer in days when reform was novel and unfashionable, and to preach it, and still more to practise it, involved serious sacrifices. The social progress of late years must been satisfactory to him as both justifying and rewarding his efforts."

লাহিড়ী মহাশয় যাহা করিয়াছেন, প্রাণ লাগাইয়া করিয়াছেন। সংসারের গঞ্জনা বা যন্ত্রণার চিন্তা করিয়া প্রাণের বিশ্বাসের প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই প্রাণের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। বিঘ্ন যাহার পথ রোধ করে, তাহার প্রাণের ইচ্ছা প্রাণেই বিলীন হয়। ইহাঁর সব কার্য্যেই একটুকু বৈচিত্র্য ছিল। যতদিন কৃষ্ণনগর-বেলেডাঙ্গার বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন, তখন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং প্রভাত-রবির লোহিতোজ্জ্বল কিরণ মাখা প্রকৃতির বিচিত্র বেশ দেখিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এক বৃক্ষতলে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন এবং প্রার্থনান্তে "God save the Queen" বলিয়া উপসংহার করিতেন। যে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, কৃষ্ণনগর তাহার কোন কোণে! তাহারই এক জঙ্গলময় গ্রামপ্রান্তে এক বৃদ্ধ প্রতিদিন ভারতেশ্বরীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন! ইহা স্মরণ করিলে স্বতঃই মনে হয়,

"বিকসতি মরুবাতৈঃ শোষণায় প্রসূণম্।
সুরভি নিরভিযুক্তে প্রেক্ষণান্তে বনান্তে॥"

'লোকচক্ষুর অন্তরালে কত কুসুম ফুটিল, পৃথিবীকে ক্ষণিক তৃপ্তি দান করিল, আবার উষ্ণবায়ু লাগিয়া অজ্ঞাতসারেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল।'

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। "যেমন যায়, তেমনটী আর আইসে না।" মনীষি রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, ঋষি রামতনু, পরদুঃখকাতর বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধীমান মনোমোহন, আনন্দমোহন ক্রমে ক্রমে সকলেই চলিয়া গেলেন। ইহাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার উপযুক্ত কেহ হইয়াছেন কি? ভগবানই জানেন, ইহাঁদের স্থলাভিসিক্ত কেহ হইতে পারিবেন কি না?

সাধু মহাত্মাদিগের চরিত্র সর্ব্বদা অলোচ্য। তোমার আমার চরিত্রে শিক্ষণীয় কিছু নাই, ইহার খবর না রাখিলেও চলিতে পারে। যে কায়মনোচিত্তে ভগবানকে ডাকে, তিনি প্রথম ২ তাহাকে লোকচক্ষে একটু পীড়া দেন বটে, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার ভক্তকে লইয়া অশেষ লীলা করেন। কখনও বিপদে আপদে, কখনও দুঃখ দুর্দ্দশায়, কভু বা আনন্দের তরঙ্গে তুলিয়া দিয়া তাহার একাগ্রতা পরীক্ষা করেন। সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত ভক্ত ভগবানের নাম করিয়া যেমন ধীর স্থির ভাবে সহ্য করেন, আলোচনা করিলে প্রাণে বল আইসে, সংসারে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। তাই লোকে, এখনও রামসীতার বনবাস, নলদময়ন্তীর দুঃখগাথা, পাণ্ডবগণের নানা জ্বালা যন্ত্রণাময় জীবনী বড় আগ্রহে পাঠ করিয়া থাকে।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরে Mrs. Max Muller পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ীকে লিখিয়াছিলেন,—

"What a consolation it is in the hour of loss and sorrow, to know that the *world* is the *better* for the life and works of those we mourn."

বাস্তবিক,আমাদেরও মনে হয়, এই রকম সাধুপুরুষ যেথানে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ অতি পবিত্র।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক।

# শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির।(৫)

অনন্তর বৌদ্ধেরা নাস্তিকরূপে পরিণত হওয়ায়, তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহার মূলচ্ছেদ করিবার জন্য হিন্দু সকলে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে যে যে রাজার তত্ত্বাবধানে মন্দির ছিল, তাঁহাদিগের নাম মাত্র লিখিত হইবে। কেবল যাহার যাহার সময়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই রাজন্যবর্গের বিশেষ বিবরণ লেখা যাইবে। মাদলা পঞ্জিকাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে যে কয়জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, সে কয় জনের নাম লিখিত আছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ের অঙ্কও লেখা আছে। তন্মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা তদীয় রাজত্ব সঙ্গে মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সেই রাজাদিগের মধ্যে অশোক দেব নামধেয় একজন মহারাজা পূর্ব্ব মন্দির ভূমিসাৎ হওয়ায় ৪৫ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির সেইস্থানে নির্ম্মাণ করিলেন। এই খ্রীষ্টাব্দের নবম দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া মাদলা পঞ্জিকা প্রভৃতিতে অনুমিত হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের পর হইতে সশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় মধ্যে কোনও রাজা মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও উল্লেখ মাদলা পঞ্জিকাতে দেখা যায় না। সশোকের পর অনেক রাজার অধীনে মন্দির ছিল। তৎপরে ভোজ, তারপর বীরবিক্রমাদিত্য (ইহার বৎসরের নাম সম্বৎ) অনন্তর শালিবাহন (ইনি বৌদ্ধ কিম্বা শকধর্ম্মাবলম্বী, ইনি শকাব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন) পরে বিক্রমাদিত্য বংশীয় অনেক রাজার অধীনে মন্দির ছিল। ইহার পরে দিল্লি হইতে দক্ষিণ দেশ বিজয়াভিলাষে সমুদ্র পথে জলযানে পুরী অভিমুখে রক্তবাহু নামক যবন, বিক্রমাদিত্য-বংশীয় চন্দ্রবাহু নামধেয় রাজার রাজত্বকালে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে) যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া সেবকেরা রাজাজ্ঞায় সোনপুরে পৃথিগর্ভে প্রস্তরের সামান্য একটী মন্দির করিয়া তাহাতে জগন্নাথাদি বিগ্রহ রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত করিল এবং সেখানে চিহ্নস্বরূপ একটী বটবৃক্ষ স্থাপন করিল। বৃক্ষটীর নাম দেববৃক্ষ রাখিল। সেই দিন হইতে তাহার মূলে সন্ধ্যাকালে তত্রস্থ লোকে দীপদান করিতে লাগিল। পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তবাহুবংশীয়েরা প্রায় একশত বৎসরের অধিক সময় রাজত্ব করিল, সে সময়ে জগন্নাথের মন্দির শূন্য হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ইতিহাসে যবনদিগের ভারত আগমনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া কথিত আছে, কেবল মাত্র এখানে খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতে তাহাদিগের উৎকলে আগমন উল্লিখিত হইল। শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী এখন ইহার মীমাংসা করুন। কেবল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা যবন নামে অবিহিত হইতেছিল, এ কথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ রক্তবাহুর পূর্ব্বে, বৌদ্ধদিগের অবস্থান মাদলাপঞ্জিকাতে লিখিত

আছে। তবে তাহাদিগের নাম যবন বলিয়া কেন উল্লিখিত হইল না? এই হেতু রক্তবাহু বৌদ্ধ নহেন। ইহা হইতে বোধ হয়, যবন শব্দের অর্থ মুসলমান ব্যতীত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ম্লেচ্ছজাতি অর্থাৎ ভারতের আদিম জাতির মধ্যেও বুঝায়; সেই সময় ভারতের ম্লেচ্ছ জাতীয় রক্তবাহু নামক কেহ দিল্লিসিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনিও উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। ইহাই বা কেন অনুমান করা যাইবে না? বৌদ্ধেরা ম্লেচ্ছ নহেন, তাঁহারা আর্য্য, হিন্দু সম্প্রদায়ের এক শাখা অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্ব হইতে বলা হইয়াছে। সেই কারণ এক পক্ষের স্বমত-সমর্থনযুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

রক্তবাহু-বংশীয় যবনদিগের রাজত্বের এক শত ছয় বর্ষের শেষ সময়ে জন্মেজয়ের পুত্র যযাতিকেশরী উক্ত বংশীয় রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা স্বাধীন করিলেন? তিনি শৈব ছিলেন; তাহা হইলেও অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বিষ্ণুতীর্থ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, তদন্তবর্ত্তী-মন্দির এবং জগন্নাথদেবের বিষয় ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য ও ম্যাদলা পঞ্জিকা হইতে অবগত হইয়া, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সেবকেরা উত্তর করিল, আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, রক্তবাহুর অধিকার সময়ে জগন্নাথকে শোনপুরে প্রোথিত করা হইয়াছে। অনন্তর তিনি মধ্যপ্রদেশস্থ-সম্বলপুরের নিকটবর্ত্তী শোনপুরে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, যে বৃক্ষমূলে প্রত্যহ লোকেরা সন্ধ্যাকালে দীপ দেয়, সেই দেববৃক্ষ, তাহার নিম্নে জগন্নাথ থাকিতে পারেন। তাহাদিগের এই কথাতে আস্থা স্থাপন করিয়া সেস্থান খনন করিলেন, দেখিলেন যে, মৃত্তিকার ভিতরে মন্দিরমধ্যে মূর্ত্তিত্রয় জীর্ণবস্ত্রে বিরাজমান হইয়া আছেন এবং সুদর্শনচক্র প্রভৃতিও আছে। তাঁহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া অতি সমারোহে পুরীতে আনিলেন। অত্রত্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে বনযোগ বিধি দ্বারা অরণ্য হইতে দারু আনাইলেন এবং প্রাচীনমূর্ত্তির সাদৃশ্যে মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া নবনির্ম্মিত মূর্ত্তিত্রয়কে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্ব মূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। পূর্ব্বস্থানে ৩৪ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বস্থিত রত্নসিংহাসন মূর্ত্তিত্রয়কে অবস্থান করাইলেন। পূর্ব্ব রীত্যানুসারে সেবাদি কার্য্য সেবকদিগের দ্বারা চালাইলেন।

এই মহারাজার সময়ে ভুবনেশ্বর ইহা অপেক্ষা অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। হইবারই কথা, কারণ এই নৃপতি শৈব ছিলেন। ইনি প্রথমে কটক জেলার অন্তর্গত চৌদ্বারে রাজধানী করিলেন, পরে যাজপুর অর্থাৎ যজনপুর ইহার রাজধানী হইয়াছিল। এস্থানে ব্রাহ্মণদিগের অভাব না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাববশতঃ তাহাদিগের রীতির কতক অংশে বিশৃঙ্খলা ঘটায় কান্যকুব্জ হইতে অনেক ব্রাহ্মণনিগকে আনয়ন করা হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে প্রকাশ আছে। কতক আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন যে, যযাতি বৌদ্ধদিগের মতোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য প্রতিবাদনার্থ জগন্নাথের সঙ্গে মূর্ত্তিদ্বয় যোগ করিয়াছেন। এ কল্পনা, কতদূর সঙ্গত, ইহা স্থির করিতে পারি নাই। কারণ মাদলা

পঞ্জিকা লিখিত বিষয়কে বিশ্বাস না করিয়া অনুমানকে বিশ্বাস করা অনুচিত; অনুমান-কারীরও এই পঞ্জিকার স্থানে স্থানে বিশ্বাস করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। যদ্যপি শ্রীজগন্নাথদেব, বৌদ্ধদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন, তবে রক্তবাহুর সময়ে তাঁহাদিগের উচ্ছেদ হইয়াছিল কেন? রক্তবাহু যদি বৌদ্ধ, তবেই বা শ্রীজগন্নাথকে কেন অন্যত্র প্রোথিত করা হইয়াছিল? অতএব যাহা অনুমানিক কল্পনার উদ্ঘাটন করে, তাহা স্বমতস্থাপনের দূরীকরণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না। এখানে একটী কবিবচন মনে উদয় হইল। যথা—"অনুভবং বচসা সখি লুম্পসি" অর্থাৎ হে সখি! অনুভূত বিষয়কে তুমি বাগ্‌জালে ছাপাইয়া দিয়াছ। সেইরূপ, পাশ্চাত্য-বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা মাদলা-পঞ্জিকা-লিখিত সত্যাত্মক বিষয়কে কপোলকল্পিত কথাতে ছাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যমন্যত্ব ভিন্ন আর কিছু নহে।

কেহ কেহ বলেন, ইনি মগধ প্রদেশ হইতে নিজ বাহুবলে উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা ত মাদলা পঞ্জিকাতে লেখা নাই? ইহা তার্কিকেরা কোথা হইতে পাইলেন? বরং উড়িষ্যার একাংশের রাজা জন্মেজয়ের পুত্র বলিয়া তাম্রপটে কথিত আছে। তবে জন্মেজয় মগধ হইতে আসিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয় সন্দেহাপন্ন। যযাতির বিষয়ই বা কি বলিব? কিন্তু যযাতি উড়িষ্যা-জাত রাজপুত্র, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, উড়িষ্যা পূর্ব্বে এখনকার মত নানাভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন সামন্ত রাজা রাজত্ব করিত। ইহাদিগের উপরে চক্রবর্ত্তী রাজার আধিপত্য থাকে। চক্রবর্ত্তী রাজার বলহীনতা দেখিলে কোন প্রবলপ্রতাপশালী সামন্তরাজা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করেন। যযাতি ইহার অন্তর্গত, ইহা নিশ্চয়। ইহাঁর সময়ে উৎকলের প্রাকৃতিক সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মাদলা পাঞ্জকাতে দেখা যায় যে, এই মহারাজ দিল্লি-কেও বশতাপন্নে আনিয়াছিলেন। কারণ, রক্তবাহু বংশীয়েরা দিল্লির রাজা ছিল। ইহাঁ-দিগের দ্বারা তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছিলেন! "মূষিক মারিবার জন্য পর্ব্বত খনন করা" মত পথ অবলম্বন করিয়া, কেহ কেহ, কল্পনারথে আরোহণ পূর্ব্বক, এই যযাতিকে নবম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিবার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দেখুন, জন্মেজয়ের রাজত্বের সময় যুধিষ্ঠিরের ৭৫৬ খ্রীঃ বলিয়া স্পষ্টতঃ লেখা থাকা স্থলে, স্বীয় উপযুক্ত যুক্তি ব্যতিরেকে তাহাকে অসম্ভব বলিয়া স্থির করিয়া তাহাকে দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত শকাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পাঠক! অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষুতে এরূপ ধূলি নিক্ষেপ করা আজকাল আর অসাধারণ নহে! আরও কিরূপ সিদ্ধান্তে ইহা উপনীত হইয়াছে দেখুন, জন্মেজয়ের প্রচলিত তাম্রপাঠদিগের লিখিত অক্ষর সহিত সমস্ত প্রতিপাদন করিয়া যে ৭৩৫ খ্রীঃ রাজা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, ইনিও কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বলিয়া নিজেকে তাম্রপটে পরিচয় দিয়াছেন। এবং ইহাও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় বলিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। পুনরায় প্রকাশ করেন যে, শিবগুপ্ত এবং যযাতি সমসাময়িক লোক এবং শিবগুপ্তের পরে যযাতি জন্মেজয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন, এবং যযাতি নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। শিব-

সম্পাদক রূপে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু আতিথেয়তা করিলেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। রিসেফসন কমিটীর সভাপতিরূপে নিমন্ত্রণ পত্রে মহারাজা নাম স্বাক্ষর করিলে ভাল হইত না কি? এখানে কিছু কিছু আভিজাত্যের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা এই, বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ নেতা থাকিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আমাদের ঘোরতর আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সুধী জন হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তি। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন। ইহাতে বোধ হয়, কোন এক দলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই এই সম্মিলনের আয়োজন। কে জানে, এ কথা সত্য কি না?

আমাদের দুটী কথা মনে পড়িল। কোন সভায় সভাপতি হইবার জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এক সময়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সভাপতি করুন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।"

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এক সময়ে গ্লাডোষ্টোনের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞীত্বে উন্নীত করিতে আপত্তি করা তন্মধ্যে একটী কারণ। এই হেতু, সম্রাজ্ঞী তাঁহার কন্যার বিবাহে মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন না। ঘটনা-পরম্পরায় কয়েক বৎসর পর লিবারল পক্ষের যখন জয় হয়, তখন রাণী গ্লাডোষ্টোনকে প্রধান মন্ত্রীত্ব না দিয়া লর্ড হার্টিংটনকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রী সভা গঠনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা আজও জীবিত আছেন, তিনি এখন ডিউক অব ডিভনসায়ার হইয়াছেন। তিনি রাণীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, গ্লাডোষ্টোন জীবিত থাকিতে আমি প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিব না। এই কথার পর রাণী গ্লাডোষ্টোনকে প্রধান মন্ত্রী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কি বঙ্গের কোন সাহিত্য-রথীর জন্যই সভাপতিত্ব ছাড়িতে পারিতেন না? তিনি অল্প বয়স্ক, কত কতবার সভাপতি হইতে পারিতেন, কিন্তু প্রাচীনগণ আর কত দিন জীবিত থাকিবেন?

আমরা যদি আমাদের অগ্রণীদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করি, পরবর্ত্তী সাহিত্য-সেবকেরা কি শিক্ষা লাভ করিবে? এই কাজের মধ্যে কিছু অভিসন্ধির আভাস পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এবং সম্মিলনের নেতাদিগের বুদ্ধির অপরিমার্জ্জনীয় ক্রটীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বুঝি বা এই জন্যই, ইন্দ্রনাথ বাদে, আর কোন প্রাচীন সাহিত্য-রথী কাশীমবাজারে উপস্থিত হন নাই,--বুঝি বা এই জন্যই, আঠার শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে দুই শতের অধিক সাহিত্য-সেবী উপস্থিত হন নাই। আর একটী কথা, এদেশের সকল কৃষি-শিল্প মেলার মহৎ উদ্দেশ্য থিয়েটার এবং রং তামাসা বিনষ্ট করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, থিয়েটার যাত্রা রং তামাসার কি সময় আছে? কাশীমবাজারের পবিত্র অনুষ্ঠানে তাহাও হইয়াছে; এজন্য আমরা বড়ই দুঃখিত হই-

ছে। কালে কি সাহিত্য-সম্মিলন বারো-এয়ারীতে পরিণত হইবে?

এদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমরা বড় হইয়াই সকলে স্বাধীন হইয়া দাঁড়াই, পূজ্য অগ্রজ এবং গুরুস্থানীয়দিগকে সম্মান দিতে চাহি না। এজন্য আমাদের সকল কাজ পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বিলাতে দলাদলি আছে, স্বাধীনতার স্ফুরণ আছে বটে, কিন্তু নেতৃত্বের প্রাধান্য কখনও তাঁহারা বিস্মৃত হয় না। মহতের পূজা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন দেশেরই উন্নতি হইতে পারে না। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিত কালে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্ব করিতে রাজি হইতেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে চন্দ্রনাথ বা হরপ্রসাদ নেতৃত্ব করিবার কল্পনাও মনে স্থান দেন নাই। আর আমরা?—দ্বিজেন্দ্রনাথ,চন্দ্রনাথ প্রভৃতি জীবিত থাকিতেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছি, ইহা কি কালের ধর্ম্ম? ডার্ব্বিতে গ্লাডষ্টোন সাহেবের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব অন্যতম মন্ত্রী সার ডবলিউ হারকোর্ট গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন,—

"That is the man and that is the spirit in which we are led; that is the man and that is the spirit in which we will follow him to the end. Whilst life remains with him we will follow in his steps, and when he is no more we will endeavour to follow his example."

কি উদারতা, কি নেতৃত্বের অনুস্মৃতির আকাঙ্ক্ষা। হাজার কৃতী হইলেও, সৎপুত্র পিতাকে উপেক্ষা করে না, সৎ শিষ্য দিগ্বিজয়ী হইয়াও গুরুকে অগ্রাহ্য করে না। শিষ্যানুশিষ্য আমরা কি সাহিত্য-গুরুদিগকে অমার্জ্জনীয় রূপে উপেক্ষা করিয়া কখনও বড় হইতে পারিব?

একটী আনন্দের কথা এই, আগামী বৎসর রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনকে শ্রীযুক্ত নাটোরের মহারাজা আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যানুরাগী বলিয়া জানিতাম না। বহুদিন বাঙ্গলা পত্রিকা গ্রহণ করিয়াও মূল্য প্রদানে তাঁহার অভ্যাস নাই, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপোষণকে কর্ত্তব্য মনে করেন বলিয়া জানিনা। এবার তাঁহার এত অনুগ্রহ—ইহা সাহিত্য-সেবকগণের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন।

এইরূপ সম্মিলনের দ্বারা সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে এবং সেই পথ ধরিয়া জাতীয় একতা সমুপস্থিত হইবে। সকল ভাই এক-ঠাঁই হইয়া জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলে কি সুন্দর দৃশ্য হইবে, ভাবিলেও চক্ষের জল পড়ে। বিধাতা এই দরিদ্র দেশের উন্নতির সহায় হউন।

# কারা-সঙ্গীত।

করুণ কোমল সন্ধ্যা নেমে এস আজি
দিনের অন্তিম সাজে, এস এস সাজি
রজনীর সুমধুর শৈশব শোভায়—
নব বধুটীর মত, বিজন কারায়

তোমার ও হাসিটুকু স্নিগ্ধ সুমধুর
বিলাইয়া হেথাকার শ্রান্তি কর দূর
মঙ্গল আশ্বাসে।

নিভে গেছে দিবালোক,

গুপ্ত এবং যযাতি উৎকলীয় রাজা নহেন; মেকল বা কুশল হইতে উৎকলে আসিয়াছেন। নচেৎ ইঁহারা যদি কটক জিলা নিবাসী হইয়া থাকিতেন, তবে সম্বলপুর "কলাহাণ্ডি" প্রভৃতি স্থান হইতে কেবল কর আদায় করিয়া থাকিতেন, কিন্তু উৎকল ভাষা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া থাকিত না। ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ

# জননীর উত্থান।

কে তোরা ডাকিলে ওরে আজিকে আমায়?
কেন হায় অসময়ে এই আবাহন?
নিদ্রাকালে আছি বেশ,
দহিবারে মনোক্লেশ,
কেন সবে বৃথা মোরে কর জ্বালাতন?

আজি এ স্বরগ-ভূমি পতিতা তাপিতা,
সবায় হাসিছে বসি চির উদাসীন,
চারিদিকে শুন সব,
আনন্দ উৎসব রব,
আমি শুধু শুয়ে আছি ধূলি বিমলিন!

জাগিলে তো শুধু জ্বালা শুধু পাব তাপ,
তার চেয়ে আবাহন না শুনাই ভাল।
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়,
কোন্ ফল আছে তায়?
কেন এ ব্যথিত প্রাণে শোকানল জ্বাল?

আমি কি ঘুমাই সুখে ধূলি শয্যা'পরে,
নহেত এ শুধু ঘুম—এ যে বিস্মরণ,
সহোদরা ভগ্নিগণ
বিরাজিছে অঙ্কেন,
স্মরিলে সেকথা—বুকে জ্বলে হুতাশন।

তোমরা কাঁদিছ শুধু,—বৃথা এ রোদন!
রোদনে কি কভু হয় প্রাণের সঞ্চার?
আমার মলিন বেশ,
আমার এ রুক্ষ কেশ,
রোদনে কি দূর হবে পুঞ্জ শোকভার?

হা নির্ব্বোধ! উদ্ধার কি মুখের বচন,
বৃথা কেঁদে কেহ কভু পার নাই তায়,
সে যে ধন সাধনার,
নহে কভু বক্তৃতার,
মৌখিক চীৎকারে কেবা পেয়েছে তাহায়?

উদ্ধার সাধিবে যদি ফেল স্বার্থ-জ্ঞান,
ভুলে যাও আত্ম মান মর্য্যাদা বিচার,
ভাই বলি সর্ব্বজনে,
বাঁধ প্রীতি আলিঙ্গনে,
অকাতরে বলি দেও সুখ আপনার।

জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে কর কোলাকুলি।
এক লক্ষ্যে এক পণে বাঁধ সবে প্রাণ,
ভুলি শত ভিন্ন মতে,
মাতৃপূজা পুণ্যব্রতে,
আনন্দে মিলিত হও আমার সন্তান।

পুষিওনা হৃদয়েতে অভিমান দ্বেষ,
স্বার্থ লাগি ধর্ম্ম ভাব করোনা শিথিল,
বিবেক নির্দ্দেশ যাহা,
প্রাণপণে সাধ তাহা,
নৈতিক সাহসে নাশি অজ্ঞান পঙ্কিল।

বাক্য নহে রক্ত চাই আত্মবলিদান,
চাই প্রাণ চাই মৃত্যু কঠোর সাধন,
কথা নহে ভক্তি চাই,
পারিবে কি দিতে তাই,
পারিবে কি হেসে প্রাণ করিতে অর্পণ?

উদ্ধার কি শুধু কথা—নহে ছেলে খেলা,
চাই প্রাণ—চাই মৃত্যু কঠোর সাধন,
কত শত যাতনায়,
(সে) রতন পাওয়া যায়,
সাধনায় দিতে হয় ঢালি প্রিয় প্রাণ।

ভেবে দেখ বার বার আপন অন্তরে,
পারিবে কি এই ব্রতে সঁপিতে জীবন,
নতুবা এ আবাহন,
সব বৃথা অকারণ,
জীবন না দিলে কভু মিলে কি জীবন ?

ওই শুন কাঁপাইয়া অবনী বিশাল,
"প্রাণ চাই" প্রাণ চাই উঠে এই স্বর,
পারিবে কি দিতে প্রাণ,
দিতে স্বার্থ বলিদান,
স্থির চিত্তে দেখ খুজে আপন অন্তর।

তা যদি না পার, তবে বৃথা আবাহন,
আজন্ম-সঙ্কল্প যত, সকলি বিফল,
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়,
কোন ফল নাহি তায়,
কেন এ ব্যথিত প্রাণে শোকানল জ্বাল ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

# কাশীমবাজার সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও ব্যয়ে, সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। "সুধা" সাহিত্য-সম্মিলনের কথা প্রথম তোলেন, কিন্তু অর্থাভাবে কার্য্য হয় না। তৎপর বরিশালের উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমারের চেষ্টায় সাহিত্য-সম্মিলনের কথা উঠে এবং বরিশাল কন্‌ফারেন্সের অব্যবহিত পরে প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হয়। কিন্তু বরিশালের কনফারেন্সের পরিণাম দেখিয়া সকলে ভীত হন, সেবার আর অধিবেশন হয় না। তৎপর বহরমপুরে অধিবেশন হইবে, ধার্য্য হয়; কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় দারুণ শোকে মহারাজ কাতর হন, সেজন্য অধিবেশন হয় না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, যখন দেশ বিমুখ রাজা বিমুখ এবং বিধাতা বিমুখ, তখন বুঝিবা আর সাহিত্য-সম্মিলন হইবে না; কিন্তু ধন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, তিনি বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এজন্য বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণে আবদ্ধ হইলেন। তিনি সহৃদয় এবং মহৎ ব্যক্তি—তিনি সাহিত্য-সেবিগণের প্রতি অমায়িক ব্যবহারে কাশীমবাজারের সুনাম রক্ষা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বিধাতা মহারাজার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

আমরা বরাবর কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি যে, জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই। ক্রমে ক্রমে এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। সহস্র সহস্র লোকের অদম্য চেষ্টা ভিন্ন কখনও বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। মহারাজ বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। মহারাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক!

এই উপলক্ষে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দুই একটী অপ্রিয় কথা না লিখিয়া পারিলাম না, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। প্রথম কথা এই, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়

দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট-বক্তা এবং সুলেখক। এই আলেখ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে, কয়েকটী চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। "ঘুমন্ত শিশু"হইতে একটু তুলিয়া দিলাম,—

ধূলার প্রসাদ তৈর করে বাছার গরব ভারি,
নিজের বাহাদুরি টুকু কর্ণ্ঠে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙ্গা,
হাস্যে আরো মিষ্ট করে ওষ্ঠ দুটি রাঙ্গা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে,
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে মুখের হাসি মুখে ,
চক্ষু দুটি মুদে এল ;—শীতল শান্ত দুপর,
সোণার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

১৯। The Swami Vivekananda A Study. by Mana Mohan Ganguli, B, E. স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের এক গৌরব বিশেষ ছিলেন। এমন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ যোগী এদেশে বড় অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। মনোমোহন বাবুর এই "স্মৃতি" পুস্তক খানি এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-আলেখ্য হইলেও বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে।

২০। মানস-সরোবর। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য ॥০। পদ্য এবং গদ্যময় গ্রন্থ। মুনীন্দ্র বাবুর উভয় লেখাই বড় মিষ্ট। পিতৃ প্রতিভার পরিস্ফুট স্ফুরণে আজ কলিকাতা গৌরবান্বিত, সেই প্রতিভার একটী স্ফুলিঙ্গ মুনীন্দ্রপ্রসাদে সমাকীর্ণ। কালে তাঁহা দ্বারা বঙ্গভাষা উজ্জ্বল হইবে, আশা করি। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।

২১। কলিযুগ। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন প্রণীত, মূল্য ।৵০। সরল কবিতায় বিগত কয়েক যুগের বঙ্গ ইতিহাসের একটী স্ফুট চিত্র। গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত কৃতী লেখক, তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল এবং মধুর। পাঠ করিলে সকলেই সুখী হইবেন।

২২। বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা। শ্রীইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০। বলদেব পালিত, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমদাচরণ সেন, অধরলাল সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই সকল ব্যক্তির সকলেই তেমন বিখ্যাত নহেন, বিশেষতঃ তন্মধ্যে একজন জীবিত। এসকলের জীবনের কথায় বাঙ্গালা সাহিত্যের একপৃষ্ঠা পূর্ণ না করিলেই ভাল হইত। ৺বিহারিলালের নাম কি এই রূপ লেখকদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ?

২৩। Calcutta Medical School—Session 1907-8. History of Midwifery, An Introductory Lecture by S. M. Das M.B. এই বক্তৃতাটী বিশেষ:গবেষণার ফল। পড়িলে উপকার পাওয়া যায়

২৪। ওলাউঠা চিকিৎসা। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।৵০। সংক্ষেপে হোমিওপেথিক মতে ওলাউঠার চিকিৎসা বিবৃত হইয়াছে। চিকিৎকগণের বিশেষ উপকার হইবে।

২৫। মহাত্মা আনন্দমোহন বসু। শ্রীশরৎ কুমার সেন গুপ্ত ; মূল্য ॥০ আনা। এই সাধু মহাত্মার বড় কোন জীবনচরিত আজও প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত আছি। অভাবপক্ষে এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দমোহনের পূতচরিত্র ঘরে ঘরে অনুস্মৃত হউক।

২৬। সূত্রধর-তত্ত্ব। শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। জাতিতত্ত্বের যতই মীমাংসা হয়, ততই ভাল। আপন আপন জাতির উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপে সকল জাতি উন্নতি লাভ করিয়া এক মহান জাতিতে পরিণত হউক। সুন্দর পুস্তক।

২৭। ভিক্টোরিয়া মেলা। শ্রীবিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তি-প্রণীত, মূল্য ।৵০। ১৩০৯ সালের নোয়াখালীর কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মেলার আমূল বৃত্তান্ত। থিয়েটার ইত্যাদির বিবরণ না লিখিলে কি অপকার হয় ? উহাত আর কৃষি শিল্পের অঙ্গ নয় ? অনেক মেলায় অনেক টাকা এইরূপে অপব্যয়িত হয়, তাহার বিবরণ লিখিলে দেশের আরো অনিষ্ট হয়।

২৮। শিবাচার্য্য ঠাকুর। কাব্য। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲। ১৩১৪। বিলাতী কাগজে সুন্দর ছাপা। কুন্তলীন প্রেস বড়ই বিলাতী কালী ও বিলাতী কাগজের পক্ষপাতী ! স্বদেশী আন্দোলন সে

রাজ্যে এখনও মোটেই পৌঁছে নাই! ধিক্!

শ্রীশ বাবু একজন ভাল লেখক। পুস্তক খানির বিশেষ গুণ এই, অনেক সার কথা সুচিন্তিত হইয়া গ্রন্থিত হইয়াছে। বিস্তৃত সমালোচনার যোগ্য; কিন্তু স্থানাভাব। আমাদের বিশ্বাস, এ গ্রন্থ স্থায়ী-সাহিত্যে স্থান পাইবে।

২৯। অপর্ণা বা তপস্যান্তে উমার প্রার্থনা। মূল্য ॥৵০। ১৩১৩। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। আবার সেই বিলাতী কাগজ! কবে এদেশের চৈতন্যোদয় হইবে, জানিনা। এত লোক দেশের জন্য জেলে গেল—তবুও দেশের চৈতন্যোদয় হয় না। বড়ই দুঃখের কথা। লেখা ভাল; কিন্তু পূতিগন্ধময় আবরণে আবৃত!

৩০। সরল কৃত্তিবাস। অর্থাৎ কৃত্তিবাস প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ। মূল্য ১॥০। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ। সচিত্র। ইহাতে ৯৮ খানি সুন্দর চিত্র আছে। এই সুন্দর পুস্তকে অন্যের দ্বারা ভূমিকা লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাহাতে যে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, তাহা মনে করি না। যোগীন্দ্রনাথ কৃতীত্বের সিংহাসনে আরূঢ় ব্যক্তি, অন্যান্য লেখকের ন্যায় তাঁহার আবার প্রশংসা লইয়া অবতরণে প্রয়োজন কি? তিনি কাহাপেক্ষা হীন এবং দীন?

দ্বিতীয় কথা এই—অনেক চিত্র জাপানের ছাঁচে চিত্রিত। দেশী চিত্রে ও তাহাতে মিলে না। একই পুস্তকে বিভিন্ন দেশীয় শিল্পীর চিত্র সমাবেশ করা ভাল হয় নাই।

তৃতীয় কথা, কৃত্তিবাসের লেখার উপর যোগীন্দ্রনাথ নিজ লেখনী চালনা না করিলেই ভাল হইত। যাঁহার জিনিস তাঁহার নামেই বিকাইবে; ছাটিবার অধিকার প্রকাশকের থাকিতে পারে, কাহারও পরিবর্ত্তনের অধিকার নাই। বঙ্কিম বাবুর লেখার পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন। সেজন্য আমরা দুঃখিত। যোগীন্দ্রনাথ আবার সেরূপ অপরাধ করিলেন. ইহাতে বড় কষ্ট পাইলাম।

এসব গেল পুস্তকের দোষের কথা। যে পুস্তক দেশের আপামর সাধারণের কণ্ঠস্থ—তাহার গুণের কথা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। কৃত্তিবাসের ভাল সংস্করণ ছিল না, এতদিন পর সেই অভাব দূর হইল। যোগীন্দ্রনাথ এদেশের অমর লেখক,—এ কাজের দ্বারা আরো অমর হইলেন। এ পুস্তক খানি যে ঘরে ঘরে আদৃত হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া প্রথম সংস্করণ তেমন সুলভ হয় নাই; আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ আরো সুলভ হইবে। এ পুস্তক পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যোগীন্দ্রনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৩১। বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ২৲। ৩৬৮+৪৯০ মোট ৮৫৮ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত। এতদিন পর সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গীত একত্র পাওয়ার উপায় বিহিত হইল, এজন্য আমরা শ্রদ্ধেয় প্রসন্ন বাবুর নিকট বিশেষ রূপ ঋণী। প্রথম ভাগে বিবিধ ৬৯০টী ধর্ম্মসঙ্গীত, ৩৬৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, যথা ভক্ত রামপ্রসাদ, রাজা রামমোহন রায়, দাশুরায়, গোবিন্দ অধিকারী বদনের তুক্ক, মধুকাইন, বিষ্ণুরাম শর্ম্মা, ফিকিরচাঁদ, বাউল গান, ঐ ভাটিয়াল. সুর, পূর্ব্বকালের মহারাজা, রাজা, দেওয়ান প্রভৃতি বড় বড় লোকের গান, কবি ও পাঁচালী, ভক্ত মহিমা।

দ্বিতীয় ভাগে ৪৯০ পৃষ্ঠায় ৯১৭ গান। রাগ রাগিণীর বিবরণ সম্বলিত। এক সুরের গান গুলি পরস্পর সাজান আছে। একটী গাইতে পারিলে অপর গুলি গাওয়া যাইবে। কোন্ সময়ে কোন্ গান গেয়, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

জীবনব্যাপী সাধনার পর প্রসন্ন বাবু এক মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে এজন্য হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহার এই পুস্তক এ দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে, আশা করি।

একটী কথা। তিনি নিজ রচনায় শব্দের যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, অন্যের রচিত গানে সেরূপ না করিলেই ভাল হইত, কেননা, অন্যের লেখা যেরূপ ছিল, সেইরূপ রাখাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আশা করি, ভাল ভাবে কথাটী গ্রহণ করিবেন। এতদিন পর এদেশের সর্ব্ব শ্রেণীর অভাব দূর হইল।

দিক্‌বধূ তারি তরে করিয়াছে শোক,
তারপর অশ্রুময় রক্ত-আঁখি তার
আঁধার অঞ্চল দিয়ে ঢেকেছে আবার।
এস সতি, এস আজি তব প্রতীক্ষায়
বসে আছে একজন এই নিরালায়
তোমারি দরশ লাগি'। সারা দিনমান
তোমারি করেছে ধ্যান; ব্যাকুল পরাণ
তোমার পরশ শুধু পাইবার আশে
চেয়েছিল ঊর্দ্ধমুখে; সায়াহ্ন-আকাশে
তোমার অলক্তরাগে রঞ্জিত চরণ
ধীরে ধীরে ফেলি হেথা কর আগমন।

যে কারা-দুয়ারে আজি তোমার লাগিয়া
বুকভরা বেদনায় রয়েছে চাহিয়া
অর্দ্ধ শতাব্দীর সেবা, অর্দ্ধ শতাব্দীর
কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ—মূর্ত্তিমান স্থির
অসীম নির্ভয়ে,—সেই জীবন্ত কল্যাণে
এস সন্ধ্যা, তৃপ্ত কর শান্তিসুধা দানে!
সকল সেবার পর ক্ষুদ্র অবকাশ
সে কি সুমধুর! সকল কর্ম্মের ফাঁস
শিথিল করিয়া আজি বিশ্রাম-কারায়
ভক্তে রাখ বাঁধি; তব পূর্ণ মহিমায়
বেষ্টন করিয়া তারে, দেহমনে তার
অজস্র শান্তির ধারা ঢাল অনিবার।

তিমির-বসনা সন্ধ্যা নেমে এস ধীরে
ইন্দুর রজতরাগ তোমার শরীরে
ঢেলে দিবে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তরল;
কবরীর শোভারূপে তারকার দল
হাসিবে মধুর হাসি,—সুধীর সমীর
নর্ম্মচ্ছলে বারবার করিয়া অধীর
তোমার আঁচলখানি ফেলিবে খুলিয়া
তারপর চন্দ্রালোক উঠিবে ফুটিয়া,
তোমার যুবতীমূর্ত্তি গম্ভীর উজ্জ্বল—
স্থির ধীর, লজ্জানত, শুভ্র সুকোমল।
তখন নীরবে তুমি কারার দুয়ারে
পূর্ণ নিশীথিনীরূপে গুপ্ত অভিসারে
দাঁড়াইও আসি'। শুনিও শ্রবণ ভরি'
সে আঁধারে কার অশ্রু পড়িতেছে ঝরি
রুদ্ধ কারাগারে; সেই পূত অশ্রুধার
নহে আপনার লাগি—সেই হাহাকার,
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সেও নহে হায়
আপনার লাগি'। সেই সুপ্তির কারায়
সুপ্তিহীন যাতনায় লুণ্ঠিত যে জন
সে কি আপনারে চাহে? তার দেহমন
নহে তার আপনার;

তীব্র অভিমানে
জ্বলিছে হৃদয় যার, প্রতিহিংসাদানে
সে তৃষ্ণার অবসান; মাতৃ-অপমানে
যে জন উন্মত্ত হ'য়ে মৃত্যুর সন্ধানে
ছুটে যায়, মৃত্যুবাণ সর্ব্বাঙ্গে তাহার
ঢালি' দেয় অমৃতের নির্ঝর উদার।
ভীষণ মৃত্যুর মাঝে অমৃতের লাগি'
যে জন চাহিয়া আছে শয়ন তেয়াগি'
ঊর্দ্ধমুখে, সে অমৃত আসুক নামিয়া
আজি তার চারিপাশে; নরনারী হিয়া
সেই অমৃতের স্রোত সুমঙ্গল স্নান
করিবে নির্ভয়ে, গাহিবে বিজয় গান
কোটি কণ্ঠে, সেই সুধা-নির্ঝরের তীরে
এস সন্ধ্যা, তবে আজি নেমে এস ধীরে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
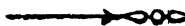
## প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১২। পদ্যকুসুম।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় বি-এ প্রণীত, মূল্য ।০, চতুর্থ সংস্করণ, সচিত্র। এখানি সুন্দর স্কুল-পাঠ্য পুস্তক।

১৩। রাখীবন্ধন।—শ্রীঅনাথবন্ধু সেন, মূল্য ৵১০। এই পুস্তক খানিতে গ্রন্থকারের প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন,—বড়ই মিষ্ট হইয়াছে।

—দৃষ্টান্ত—

হাতে রাখী পরি' আজি বেঁধে লই প্রাণ,<br>
একান্তে বিস্মৃত হও স্বার্থের সন্ধান।<br>
সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ,<br>
আনো প্রাণে অনুরাগ,<br>
বিরাগী সন্ন্যাসী সাজো—সাধক প্রধান।<br>
প্রকৃত ভক্তের ন্যায়,<br>
প্রেমানন্দ গরিমায়,<br>
করিও জীবন পণে যজ্ঞ সমাধান!<br>
হাতে রাখী বাঁধিয়াছ বাঁধ আজি প্রাণ।

১৪। অঞ্জলি।—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। গীতিকাব্য, মূল্য ॥০।

জীবেন্দ্রকুমারের কবিতা সাধারণত বড় মধুর। রুচি পরিমার্জ্জিত। ভক্তি, প্রীতি, প্রেম,—এই তিন ভাগে পুস্তকখানি বিভক্ত। অধিকাংশ কবিতাই সুন্দর হইয়াছে। একটী কবিতা হইতে একটু নমুনা তুলিয়া দিলাম; ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, জীবেন্দ্র বাবু কোন্ দরের কবি। আমাদের মনে হয়,মিষ্টতায় জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা ৺বিহারীলালের কবিতার যোগ্য।

উর্দ্ধে রহিল দেবতা আমার<br>
নিম্নে পড়িয়া আমি,<br>
ক্ষুদ্র হৃদির কামনা অপার<br>
জানেন অন্তরযামী।<br>
ঊর্দ্মির পর ঊর্দ্মি আসিয়া,<br>
যা' ছিল আমার লয় ভাসাইয়া,<br>
রহিতে জীবন হবে না মিলন।<br>
আসিবে না তরী নামি'।<br>
ক্ষুদ্র হৃদির কামনা অপার<br>
জানেন অন্তরযামী।"

১৫। শ্মশান-সন্ধ্যা। স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র সোম মহোদয়ের স্মৃতি। দ্বিতীয় সংস্করণ। দয়ালবাবুর স্মৃতি—বড়ই মধুর স্মৃতি। তাঁহার ন্যায় অশেষ গুণের আধার অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক স্বভাবের মধুরতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইত। তাঁহার এই মধুর স্মৃতি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। পরিপক্ক হাতের লেখা—বাঙ্গালা ভাষার জয় ঘোষণার জন্য ইহা অক্ষয় হইয়া রহিল।

১৬। অক্ষয়-চরিত।—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০। ১২৯৪। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ পুস্তকখানি আমরা পূর্ব্বে পাই নাই। অমর অক্ষয়কুমারের এই কাহিনী পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

১৭। মালদহের জাতীয় শিক্ষাসমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয়।—১৩১৪। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সকল শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তন্মধ্যে মালদহের জাতীয় শিক্ষাসমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় অন্যতর। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই বিশেষ রূপ আনন্দিত হইবেন। অনুষ্ঠাতাগণের স্বদেশানুরাগ অনুকরণের যোগ্য।

১৮। আলেখ্য।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মূল্য ॥০।

# শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির। (৬)

এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেককে ধরিয়া বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধ বড় হইবে এবং পাঠকদিগের বিরক্তিভাজন হইবার সম্ভাবনা; এ কারণ সাধারণতঃ সঙ্গতি অসঙ্গতি, সমালোচনা করা যাউক। প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির বিদ্যমান স্থলে অনুমানে মোহিত হওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। দেখুন, উৎকলের ধারাবাহিক ইতিহাসে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে যে যযাতিকেশরী উড়িষ্যাকে স্বাধীন করিলেন এবং ঐ শতাব্দির ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত বংশীয় ৪৪ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে উৎকলের দক্ষিণ সীমান্ত মহেন্দ্র পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী উড়িষ্যান্তর্গত একস্থানে গঙ্গাদেবীর গর্ভে গোকর্ণেশ্বরের ঔরসে চৌরগঙ্গা নামক এক জন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া উপর্য্যুক্ত বংশকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা নিজের অধীন করিলেন। মন্দির যে সময়ে উক্ত রাজাদিগের তত্বাবধানে আসিবার বিচার করা যাইবে সেই সময়ে রাজাদিগের বিষয়ে বিশেষ বিবরণ বিস্তৃতভাবে লেখা যাইবে। কেশরী বংশীয় ৬ষ্ঠ রাজা ললাটেন্দ্র কেশরী ৫৮৮ খৃঃ শ্রীভুবনেশ্বরদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা উক্ত পঞ্জিকাতে লেখা আছে। মন্দিরের মধ্যে যাহা সংস্কৃতে লেখা আছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—যথা—

"রাজাষ্টেন্দু মিতে জাতে
শকাব্দে কৃত্তিবাসনঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস
ললাটস্বেন্দু কেশরী"।

পাঠক, দেখুন কিরূপ পঞ্জিকার সহিত সমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আরও একাম্রমহাত্ম্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে "ললাটস্বেন্দু-কেশরী" ভুবনেশ্বর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন এ বিষয়ে শ্রীমুখাজ্ঞায় দেখা যায়। তাহা হইলে পঞ্জিকার সহিত প্রস্তর লিপির সাম্য দেখা যাইবে। মন্দির ললাটেন্দুকেশরী ভিন্ন অন্য রাজার দ্বারা নির্ম্মিত না হওয়া বিষয় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে প্রমাণ বিদ্যমান থাকা দেখিয়া প্রত্যক্ষভূত সত্যকে লুপ্ত করিয়া কে এই বিশ্বাস করিবে যে যযাতিকেশরী খৃষ্টীয় নবম শতাব্দির ব্যক্তি?

এ প্রমাণ ত গেল, বর্ত্তমান অন্য প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। উৎকল ইতিহাস সংগৃহিতা স্বর্গীয় প্যারিমোহন আচার্য্য মহাশয় কত গুরুতর প্রমাণাদির সাহায্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাম্রপট হইতে কতক প্রাপ্ত হওয়া যায়—যে জন্মেজয় কোশল রাজা। মহানদী তীরবর্ত্তী প্রদেশ পূর্ব্বে প্রাচ্য কোশল নামে অভিহিত হইতেছিল। একথা মিথ্যা নহে। মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোশল দ্বিবিধ; উত্তর কোশল এবং প্রাচ্য কোশল। উত্তর কোশল গঙ্গানদীর উভয় তীরবর্ত্তী, অযোধ্যা তাহার রাজধানী। ইহা স্পষ্টতঃ প্রকৃতিবাদ অভিধানে দেখা যায়, প্রাচ্য কোশল নামক দেশ অন্যত্র দেখা যায় না। অতএব মহানদী প্রদেশ অযোধ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহার নাম কোশল, এই হেতু প্রাচ্য

কৌশল মহানদী-প্রদেশ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। * সে সময়ে জন্মেজয়ের প্রাচ্য কোশল প্রদেশান্তর্গত চৌদার নামক নগর রাজধানী ছিল। পরে যযাতি যজনপুরে (যাজপুরে) রাজধানী স্থাপন করিলেন। উক্ত ইতিহাসে আরও লেখা আছে যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় রাজাদের দোয়াব (গঙ্গযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ) প্রদেশে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহারা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন কতক প্রদেশে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে মগধদেশের অন্ধ্রবংশীয় রাজারা হীনবল হইয়া পড়ায়, পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত-বংশীয় কোন রাজা মগধ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; মগধ দেশে গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের অত্যন্ত পরাক্রম হইয়াছিল শুনা যায়। তাঁহারা দূরদেশ জয় করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই কলিঙ্গদেশও (বর্ত্তমান উড়িষ্যা) তাঁহাদিগের অস্ত্রাঘাত হইতে মুক্তি পায় নাই। উক্ত গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে মহারাজ মহাভব গুপ্তের সৈন্যেরা কলিঙ্গ জয় করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল এবং সে সময়ে কোশলরাজ জন্মেজয়দেব তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই মহাভব গুপ্ত নিজে বিজয়দুর্গে এদেশের ব্রাহ্মণদিগকে দান দেওয়ায় তাম্রপট সকল মিলিয়াছে, সেই পটসমূহে মহাভব গুপ্ত এবং অন্যান্য গুপ্তবংশীয় রাজারা আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করেন দেখা যায়। আরও পটসমূহ হইতে জানা যায় যে তাঁহারা শৈব ছিলেন। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সাতিশয় ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণদিগকে যে সকল ভূমি দান করিয়াছিলেন সে সকল উভয়বিধ—নিষ্কর ও সল্পকর। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে এক এক গ্রাম "সন্নিধি,স্বপনিধি সর্ব্ববাধা-বিবর্জ্জিত সাম্র সগর্ত্তোগর" ইত্যাদিরূপ এককালে দান পাইয়াছিলেন। এরূপ দানশীল হিন্দুরাজাদিগের মত দাতা বর্ত্তমান পৃথিবীতে বিরল। পুনরায় মহাভব গুপ্ত এদেশ জয়লাভ করিয়া নিজে ও তাঁহার উত্তরাধিকারী শিব গুপ্ত প্রভৃতি এদেশ নিজে নিজে শাসন করিয়াছিলেন। যেহেতু জন্মেজয় দেব ও যযাতি এ দেশের শাসন-কার্য্য চালান ও নামমাত্র গুপ্তবংশীয় রাজার অধীন ছিলেন, ইহা জানা যায়। দান সকল কেবল গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের নামে হইতেছিল। এই মহাভব গুপ্ত মগধদেশের গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের অন্তর্গত ছিলেন। ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? ইহা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কেবলমাত্র মহাভবকে মগধদেশের গুপ্তবংশীয় রাজাদের অন্তর্গত বলিয়া নিম্নলিখিত কারণ সকল হইতে অনুমান হইতেছে। যথা, পঞ্চম শতাব্দিতে মগধ ব্যতীত এদেশের নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে গুপ্ত রাজারা পরাক্রমশালী ছিলেন না। পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইবার সময়ে মগধ হইতে কলিঙ্গতে আসিবার পথ সুগম হইয়াছিল। উক্ত গুপ্ত রাজারা শৈব ছিলেন। তাঁহাদিগের উড়িষ্যা জয় করিবার পর হইতে এদেশে বাহুল্যরূপে শৈবধর্ম্ম বিস্তার হইয়াছিল। বর্ত্তমান এ দেশে যেসকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও বংশীয় উপাধি সকল বিদ্যমান থাকা দেখা যায়, সে সকল অধিকাংশ বেরারে (অর্থাৎ মগধে) আছে। আরও গুপ্ত রাজদিগের নিজ দান ও উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজাদের নামের কুটিলাক্ষর

* পুনরায় অপরদিকে দেখা যায় যে যযাতি জন্মেজয়ের পুত্র ছিল।

লিখিত তাম্রপট সকল যে সকল লোকের দ্বারা খোদিত হইয়াছিল তাহাদিগের নামও সংজ্ঞা মগধীয় নাম ও সংজ্ঞার সহিত এক। পরিশেষে, মহাভব গুপ্ত নামে মগধের গুপ্ত বংশীয় রাজার নামের মিলিবার কথাও আমরা শুনিয়াছি।

পাঠক! তবে কোন বিষয় সত্য, কোন বিষয় কপোলকল্পিত তাহা পূর্ব্ব কথিত বিবরণ হইতে সহজেই প্রতীত হইতেছে। বিশেষ বিচার করা অনাবশ্যক। প্রত্যেক বিষয় সমালোচনা করিতে গেলে, প্রবন্ধ বৃহৎ হইবে। অধিকন্তু উক্ত বিষয় গুলি অনাবশ্যক। এজন্য বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল না। তথাপি কতক গুলি কথার বিবরণ না দিলে পাঠকদিগের সংশয় দূর হইবে না। এ কারণ সে বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি।

কোনও কোন লেখক পানিণি সূত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ-কোশলকে বিন্ধ্যা-পৃষ্ঠস্থ অর্থাৎ বিন্ধ্যা-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মহাভারতাদি গ্রন্থে আদৌ দক্ষিণ-কোশলের নাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবলমাত্র উত্তর-কোশল এবং প্রাচ্য-কোশলের নাম দেখা যায়। পানিণিতে ত এ বিষয়ের কোন উল্লেখ দেখিলাম না। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিন্ধ্যার পৃষ্ঠভাগস্থ অর্থাৎ বিন্ধ্যার পশ্চাদ্ভাগস্থ প্রদেশের কেবল কোশল নামে উল্লেখ দেখা যায়। দক্ষিণকোশলের নাম দেখা যায় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কোশল বিন্ধ্যা-পৃষ্ঠস্থ বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে ভারত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বহু ভাগে বিভক্ত ছিল অর্থাৎ উত্তর, মধ্য প্রদেশ অর্থাৎ বিন্ধ্য এবং দক্ষিণ-প্রদেশ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত ছিল। উক্ত পুরাণে উত্তর বিভাগে এক কোশলের নাম বিন্ধ্য-প্রদেশ বিভাগে অন্য কোশলের নাম দেখা যায়। তবে মহাভারত আদির সহিত উক্ত পুরাণ কথিত কোশলের কোন অংশে প্রভেদ দেখা যায় না, বরং সমতা প্রতিপন্ন হইতেছে। দেখুন, ভারতাদিতে প্রাচ্য-কোশল ও উত্তর-কোশল নামে প্রভেদ প্রদত্ত হইয়াছে। উপরোক্ত পুরাণে কেবল কোশল বলিয়া দুই বার উক্ত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, কথনও বিলাসপুর জেলার অধিকাংশ রায়পুরের উত্তর-পশ্চিম সীমার অত্যল্পাংশ দক্ষিণ-কোশল নামে অভিহিত নহে। বিন্ধ্যপৃষ্ঠ পদস্থপৃষ্ঠ শব্দের বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে মহাভারতাদি প্রমাণিক গ্রন্থের সহিত বিরোধ সংগঠিত হইবে। সম্বলপুরের অরণ্য-পরিবৃত প্রদেশকে রামায়ণ চিহ্নিত কিষ্কিন্ধ্যার সহিত যোগ করা স্বমত-পোষণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না।

জন্মেজয়ের ও যযাতির সময়ের প্রভেদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিয়া পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। এখন ভবগুপ্তের বিষয় আলোচনা করা যা'ক। দেখুন, যে লেখক উৎকল যযাতিকে নবম শতাব্দির রাজা বলিয়া অমূলক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি প্রথমে শিবগুপ্তের পরে ভবগুপ্তের নাম লেখেন। ইহাঁরা মেকল বা কোশল এবং উৎকল ও অন্যান্য স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং জন্মেজয়ের প্রাধান্য রাখিয়া শিবগুপ্ত এবং ভব গুপ্ত—তাম্রফলক সকল করিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছেন। কেবল মাত্র ইতিহাসে জানিতে পারা যায় যে গুপ্ত

বংশীয় রাজারা "দ্বারা" প্রদেশে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ মগধ অধিকার করেন। মগধরাজদিগের নাম-তালিকাতেও ভব গুপ্তের নাম উল্লেখ আছে এবং উৎকল তাম্রপটে জন্মেজয় প্রথমে ভবগুপ্তের, পরে যযাতি কিয়ৎকাল শিবগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাম্রপট সকল প্রদান করার বিষয় জানা যায়। তৎপরে যযাতি উড়িষ্যাতে স্বাধীন রাজা হইলেন বলিয়া মাদলা পঞ্জিকাতে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক! দেখুন, উৎকলীয় যযাতিকে যে লেখক নবম শতাব্দির রাজা বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহার প্রমাণ কি? আমাদিগের মধ্যে সেরূপ অনুমান প্রমাণমূলক বলিয়া বোধ হয় না। কিষ্কিন্ধ্যাতে জন্মেজয় নামে প্রাচীন রাজা থাকিতে পারেন। তিনিও গুপ্ত উপাধিধারী হইয়া থাকিবেন। যযাতিও সেই উপাধি ভূষিত হইয়া থাকিবেন। হয়ত বা তিনি ত্রিকলিঙ্গ জয়ী হইতে পারেন। কোশল ও উৎকল প্রভৃতি কতক গুলি দেশ জয় করাতে যে ত্রিকলিঙ্গ অধিপতি বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেতে এবং ইতিহাসে ত্রিকলিঙ্গের বিবরণ অন্য প্রকারে লিখিত হইয়াছে। উৎকলীয় জন্মেজয় একজন শামন্ত রাজা, কারণ সমস্ত উৎকলের একজন রাজা ছিলেন না। প্রাচীন আর্য্যবর্ত্তের কোন কোন বীর আসিয়া সময়ে সময়ে উৎকলের কোন কোন অংশ অধিকার করেন ইহাই সম্পূর্ণ অনুমেয়। এখন দেখুন উড়িষ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু নৃপতিদিগের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী।

একথারও প্যারীমোহনের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। পুনরায় সময়ে সময়ে সেই শামন্ত রাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ উৎকলীয় অন্যান্য রাজাদিগের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাও সম্পূর্ণ সঙ্গত। জন্মেজয়ও সেই রাজাদিগের মধ্যে একজন প্রতাপশালী রাজা। তাঁহার পর যযাতিও তাদৃশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। শেষোক্ত জনও কেশরী উপাধিধারী; তবে উৎকলীয় যযাতি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ মতে কদাচ লেখকদিগের যযাতি নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভাবে জানিবেন।

আমাদের যযাতির পর তদ্বংশীয় ৪৪ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা হইয়াছিলেন। এক সহস্র শকাব্দ পর্য্যন্ত মন্দির ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে ছিল। ইঁহারা সোমবংশীয় রাজা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে ছিলেন। তৎপর এই বংশীয় রাজগণ হীনবল হওয়ায় উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী "মহেন্দ্র পর্ব্বত" নিকটস্থ উৎকলের কোনও অংশে গোকর্ণেশ্বরের ঔরষে গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌরগঙ্গা নামক একজন প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত রাজবংশকে পরাস্ত করিয়া ৯৩১ শকাব্দ হইতে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হয়েন। এই মহারাজা ত্রিকলিঙ্গকে পরাজয় করিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। গৌর, অঙ্গ ও বঙ্গপ্রদেশকে পরাজয় করায় তদ্দেশীয় রাজগণ ইহাকে কর প্রদান করিলেন। ইহার প্রস্তর লিপিগত সংস্কৃত পদ্য হইতে জানিতে পারা যায়। যথা:—গঙ্গান্বয়ে চৌরগঙ্গো রাজাপী-ত্রিকলিঙ্গজিত, বঙ্গাঙ্গ গৌড়কতোয়ো নত্যাহাস্মৈ দত্তঃ করম্"। সেই দিন হইতে নির্ব্বিবাদে মন্দির ইঁহাদের অধীনে আছে। এই বংশের ৬ষ্ঠ রাজা অনঙ্গভীম দেব প্রবল প্রতাপশালী এবং বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। কৃষ্ণানদী হইতে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে, বঙ্গোপসাগর হইতে "রায়পুর"

পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ স্বীয় অধীনে রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরাজিত নবকোটি, কর্ণাট, কলবলক প্রদেশকে করদরাজ্য রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মহারাজার সময়ে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উচ্চতা ৯৩ হস্ত এবং প্রোথিত ৩০ হস্ত। পরমহংস বাজপেয়ীর হস্তে ১১১৯ শকাব্দে ইহার নির্ম্মাণ ভার প্রদান করা হইয়াছিল। ইহার সময়ের স্থিরতা প্রতিপাদনার্থে এই মন্দিরের উর্দ্ধভাগস্থ প্রস্তরে সংস্কৃতে যে পদ্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত হইল।

"শকাব্দেরন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্র নায়কে প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীম দেবেন ধীমতা"।

জগন্নাথ মন্দিরের, ভুবনেশ্বরের এবং কণারকের কারুকার্য্য এবং উচ্চতা বোধ হয় ভারতের কোনও স্থানে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মন্দিরের সর্ব্ব-গাত্রে নানাবিধ প্রস্তর নির্ম্মিত ছবি, তরু, লতা নরনারী ও পশু প্রভৃতির প্রতিকৃতি সমূহ মনোহর শোভা প্রতিপাদন করিতেছে। প্রস্তর সকল এতদূর মসৃণ করা হইয়াছে যে চুণের চিহ্ন নাই বলিলেও হয়। শ্রীমন্দিরে অশ্লীল ছবি নাই জগন্নাথের গঠন অতি রমণীয়। ইহাতে শ্রীমন্দিরবৎ পূর্ব্বোক্ত ছবি সকলের অভাব নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ।

# চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৈচিত্র্য।

রাজতন্ত্রের চানক্য লর্ড কর্জ্জনকে আমার কোন ব্যবহারজীবি বন্ধু (স্বীয় স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে) তাঁহার পদ ত্যাগের দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখেন—তদুত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন—তোমার জন্মভূমি চট্টগ্রাম অতীব সমুন্নত হইবে, এবং আমি সুদূরে অবস্থিতি করিয়া সেই উন্নতি দর্শন করিব।

বোধ হয় নব্যভারতের পাঠকগণ অবগত আছেন, এই দুই বৎসর যাবৎ চট্টগ্রামের বাণিজ্য কিরূপ দ্রুত বেগে বর্দ্ধিত হইতেছে ও কালে জাপান ও চীনের সহিত ইউরোপের বানিজ্য কেন্দ্রে যে চট্টগ্রামের অবস্থিতি হইবে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

চট্টগ্রামের প্রতি বণিক সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই এই বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতির লীলা ভূমির বিবরণ জানিতে যে ইচ্ছুক, সে বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিবরণ প্রকাশ করিব। যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পর এই সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে; ইহাতে যদি কোন রূপ ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয় তাহা পাঠকদের মধ্যে কেহ জানাইলে সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

বাংলা দেশের মানচিত্রে চট্টগ্রাম সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ইহাকে "পার্ব্বতী মা" বলিয়া বলিয়াছেন। আর এক কবি লিখিয়াছেন

"সমুদ্র শৈলের হেথা
অপূর্ব্ব মিলন—শান্তিময় স্থান
বিশ্বখানি বিস্মরিয়ে
উঠে উর্দ্ধ দিকে, জীবনের ধ্যান"

বাস্তবিক এমনি সুন্দর দেশ ও এত বৈচিত্র্য সমাবেশ একাধারে আর কোথাও লক্ষ্য করি নাই।

একথায় বলিতে গেলে জগতে যাহা যাহা আছে, সমস্তই যেন একা চট্টগ্রামে পরিদৃষ্ট হয়।

অত্যুন্নত পর্ব্বত চন্দ্রনাথ ইহার শীর্ষ দেশে অবস্থিত, প্রকাণ্ড বঙ্গসাগর ইহার চরণ ধৌত করিতেছে। সুরম্য রাঙ্গামাটীতে 'বড়কল' নামক সুবৃহৎ জল প্রপাৎ রহিয়াছে।

বাড়বকুণ্ড নামক অতীব মনোহর উষ্ম প্রস্রবণ ইহার নাভি মূলে অবস্থিত।

সীতাকুণ্ড পাহাড়ে আগ্নেয় গিরির আভাস দৃষ্ট হয়; কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুড়ী প্রভৃতি নর্ত্তণচঞ্চলা নদী মহার অসংখ্য ঝরনা ইহাকে বিপুল নৈসর্গিক ধনে ধনী করিয়াছে। কুতুবদিয়া ও সোনাদিয়া পোপাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপ সমুদ্র পরিবেষ্টিত হইয়া চট্টলার অনুপম শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

এইরূপে উপত্যকা, আধিত্যকা, পর্ব্বত, নির্ঝর, দ্বীপ, উপদ্বীপ, জলপ্রপাৎ উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি একদিকে যেমন রহিয়াছে, অপরদিকে হস্তী, গণ্ডার গয়াল নানা শ্রেণীর ব্যাঘ্র, হরিণ বানর, হনুমান, উল্লুক, ভল্লুক শৃগাল, ময়ুর সারী, শুক, ভৃঙ্গরাজ, নানারকমের ময়না, বুল্‌বুল্‌, শ্যামা, দয়েল, প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী ইহার অঙ্কদেশের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

জলতলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীর, কচ্ছপ, গোসাপ প্রভৃতি সরীসৃপ এবং জঙ্গলে অজাগর, শঙ্খচূড়, গোখুরা, প্রভৃতি নানাবিধ সর্পও রহিয়াছে; সমগ্র ভারতে প্রাণী রাজ্যে রাজ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ একাধারে এই চট্টগ্রামেই পরিদৃষ্ট হয়। দেশের উল্লিখিত বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে জল বায়ুর বিচিত্রতাও পরিলক্ষিত হয়। কুতুবদিয়া অঞ্চলে অবস্থিতি করিলে পুরী, ওয়াল-টেয়ারের মত শারীরিক স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। কাক্স বাজার নামক স্থানে সমুদ্রের উপর যে সমস্ত পর্ব্বতমালা আছে তাহাতে ভারতীয় ইংরেজদের এক স্বাস্থ্য নিবাস নির্ম্মিত হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।

সহরের কোন কোন পর্ব্বত খুব স্বাস্থ্যকর। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পার্সিভোলের জন্মস্থান চট্টগ্রাম সহরে। তিনি একবার জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিবর্ত্তনে প্রতীকার হইবে ভাবিয়া দারজিলিং যান, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন ফল হইল না। শেষে চট্টগ্রাম আসিয়া তাঁহার পিতার এক উন্নত শৈলে বাস করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব শারীরিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বের Reportএ দৃষ্ট হয় সার উইলিয়ম জোন্‌স, যিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, তিনি চট্টগ্রামে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া বিশেষ স্বাস্থ্যলাভ করেন।

কথিত আছে, যখন সুন্দর বন খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ সুন্দরবন বাসীগণকে উৎপীড়িত করতঃ তাহাদের সঞ্চিত ধন রত্ন লুট করিয়া চট্টগ্রাম সহরেই অবস্থিতি করিত। তৎকালে ইহা Senitariumবা স্বাস্থাবাস বলিয়া প্রসিদ্ধছিল। বাস্তবিক ইহার অন্তর্গত রাউজান পাটীয়া ও সাতকানিয়া এবং কাউখালী প্রভৃতি স্থান এখনও মধুপুর ও গিরিধি হইতে অনেক ভাল বলিয়া মনে হয়। ঐ সব স্থানের লোকেরা ম্যালেরিয়া কাহাকে বলে জানে না, তাই এখানে লোকেরা সহরে বাড়ী করে না। শনিবাসরীয় ছুটিতে প্রায় সকল লোকই পল্লী বাসাভিমুখে ছুটীয়া আসে।

সহরের সমভূমি পল্লীর তুলনায় কিছু অস্বাস্থ্যকর। তাহার প্রধান কারণ মিউনিসিপালটীর বেবন্দোবস্থ ও সহরের ছোট খাট দরিদ্র লোকদের অপরিচ্ছন্নতা। তাই বলিয়া, কলিকাতা ব্যতীত, বাঙ্গালা দেশের অপরাপর জিলা অপেক্ষা ইহাকে স্বাস্থ্যকর বলা যায়।

চট্টগ্রামে এই পর্য্যন্ত দুইটী ভয়ানক ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। একটী ১৮৭৬ অব্দে হয়; তখন হইতে সহরের বায়ু কিছু অস্বাস্থ্য জনক হয়। আবার ঠিক তার ২০ বৎসর অন্তর, ১৮৯৬ সালে, অপর এক ঝটিকাবর্ত্ত হয়। এই ঝটিকাবর্ত্তের পরও সহরের স্বাস্থ্য কিছু খারাপ হইয়াছিল, বিশ্বপিতার অনুগ্রহে আবার ভাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বিষয় কিছু কিছু বলা হইল কিন্তু ইহার আর এক বিরাট-বৈচিত্র্য এই যে পৃথিবীর চারিটা বিরাট ধর্ম্মকেন্দ্র ও এই চট্টগ্রামে রহিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এই চারিটী বিরাট ধর্ম্মের সমন্বয় বাঙ্গালা দেশের আর কোন জেলাতে নাই।

শৈশবে প্রীতির ক্রোড়ে এই চারি ভ্রাতার একত্রে মিলন হইয়া থাকে, যৌবন-কর্ম্মক্ষেত্রে এই চারি ভ্রাতা ভ্রাতৃভাবের পোষণ করে। এই সম্মিলন কত সুখের তাহা আর কি বলিব।

এদেশে জন্মিয়া শৈশবে অহোরাত্র "গোঁসাইর ঠাকুরের নামের সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রত্যেক ভদ্রলোক বাড়ীতে ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ "ওঁ জনার্দ্দন মধুসূদন" বলিয়া উচ্চৈ স্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন। নামের সঙ্গে মুসলমানের "আল্লা হো আকবর" শুনিয়াছি। আবার বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মন্ত্র "পানাদি পন্থা (প্রাণী হত্যা করিও না) প্রভৃতি ও শুনিয়াছি। এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের পর চট্টগ্রাম যুগধর্ম্মে ও পশ্চাদপদ নহে। এই স্থানে একটী সাধারণ বিধান ও একটী নব বিধান ব্রাহ্মসমাজও স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই স্থানের এক যুবক আর্য্য-ধর্ম্মের সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। স্থানীয় কয়েকজন উকীল ও দেশীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক "রাধাস্বামী" মতের ধর্ম্ম বা সপ্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই ধর্ম্মের এক মন্দির ও নির্ম্মিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের গিরিমালা ও সমুদ্র-সৈকত সাধনমার্গের অনুকূল-বিধায় এখানে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করিতেন, অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ তীর্থ তন্মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। চন্দ্রনাথ-তীর্থ সম্বন্ধে তন্ত্রে উক্ত আছে "বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে"। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, বিশেষতঃ আমি কলিযুগে চন্দ্রশিখরেই বাস করিব।

চন্দ্রশিখর পর্ব্বত এরূপ মনোরম যে, তথায় উঠিলে শিব বাক্য যেন সত্য মনে হয়। একেত পর্ব্বত অতীব সমুন্নত; তথা হইতে অদূরে বঙ্গসাগর পরিদৃশ্যমান হয়। তখন বিপুল বিশ্বরাজ্য বিস্মৃতির গর্ভে লুকাইয়া যায় ও বিশ্ব-পিতাকে স্মরণ হয়। প্রাচীন সাধকগণ প্রকৃতির লীলা নিকেতন গুলিকে ভগবান প্রাপ্তির সানুকূল মনে করিয়াই যেন তীর্থধাম গুলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আমি চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে উঠিয়া যখন তাহার পাদদেশে সমুদ্রের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলাম তখন যে কি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তখন মনে করিলাম যেন ভগবৎ বাক্য, যথার্থ—

"লোকানাঞ্চহিতার্থায় চট্টলে চন্দ্রশেখরে ময়া সহ বসিশ্যামি সত্যং সত্যং বরাননে।"

বাস্তবিক যেন হর গৌরীর মিলন-ক্ষেত্র সেই চন্দ্রনাথ গিরি! বাস্তবিক যেন প্রকৃতি পুরুষের মিলন-ক্ষেত্র সেই চন্দ্রনাথ পাহাড়!

পুনশ্চ এক স্থানে আছে—

"চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

বাস্তবিক উক্ত পাহাড়ে উঠিতে কি কষ্ট, কত সঙ্কট, ভুক্তভোগী মাত্রই জ্ঞাত আছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে যে খুব প্রশংসার বিষয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গভীর নিষ্ঠা ছাড়া উক্ত পাহাড়ে উঠা যায় না। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, শত শত বৃদ্ধা ১১০০ শত ফিট উচ্চ সেই পর্ব্বতোপরি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উঠিতেছে!

তৎপর আদিনাথ তীর্থ ইহা সমুদ্রোপরি অবস্থিত। কথিত আছে, আদিনাথ পাহাড়ই মৈনাক পর্ব্বত। ইহার নিকটে মূত্রখালী নামক একটী ছড়া আছে। লঙ্কাধিপতি শিবকে স্কন্ধে করিয়া আনয়ন করিবার কালে সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন। তাই মূত্রখালী নদীর স্থষ্টি। যাহা হউক, আদিনাথ যে একটী ভারত খ্যাত তীর্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপর আর একটী তীর্থ,রামকুট। ইহাও অনেক প্রাচীন তীর্থ। অনেক সন্ন্যাসী ইহা দর্শন করিয়া থাকেন।

তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে মহা মুনি মার্কাণ্ডয়ের আশ্রমও চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শীতলাকান্ত বেদানন্দ স্বামী নামক এক সন্ন্যাসী এই তীর্থের আবিষ্কারক। গৌরী তন্ত্রের কামাখ্যা নটল হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—"প্রশস্ত শ্বাপদাকীর্ণ মুনি-শিষ্যোপসেবিত মেধসমর" আশ্রম এই চট্টগ্রামে "কর্ণফুলী নদীতত্র গো-পর্ব্বত সমুদ্ভূতা" প্রভৃতি শ্লোকের অনুসরণ করিয়া বেতসা নামক নদীতীরে ভারতোদ্ধারের মূল-ক্ষেত্র মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আশ্রম উক্ত বেদানন্দ স্বামী আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত আশ্রম ভারতে এখনও তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। কিন্তু ইহার অনুপম নৈসর্গিক শোভা দর্শনে বোধ হয় চণ্ডীর মত মহা গ্রন্থ রচনার স্থান এইরূপ নিভৃত নিকুঞ্জই হইবে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সুরথরাজকে প্রবোধ দিবার জন্যই মহামায়ার লীলা চণ্ডী কাব্যে বর্ণনা করেন। এই চণ্ডী সমগ্র ভারতে প্রচারিত একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই সপ্ত কল্পান্ত চিরজীবি মহর্ষি এই চট্টলের শৈল নিকেতনেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

উক্ত বেদানন্দ স্বামী বলেন, চট্টগ্রামে অনেক গুলি লুপ্ত তীর্থ আছে; বোধ হয় কালক্রমে সমস্ত প্রচারিত হইবে। কেবল যে মনোহর হিন্দুতীর্থ ও হিন্দু সাধক-মণ্ডলী ইহার অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করিত তাহা নয়। ইহার নৈসর্গিক শোভা নিতান্ত নাস্তিক প্রাণেও ভগবদ্ভক্তি আনিয়া দেয়; তাই চট্টগ্রামের মত ফকির বঙ্গের আর কোন স্থানে জন্মে নাই। চট্টগ্রাম ১২ বার আউলিয়ার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রথমতঃ, বদর সাহেব নামক এক ফকির সহর প্রকাশ করে বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, যেই স্থানে চট্টগ্রাম সহর অবস্থিত তথায় অনেক দেও ও পরী ছিল। মহাত্মা বদর তাহাদের নিকট একটী প্রদীপ প্রদানের স্থান প্রার্থনা করেন। উক্ত দেও-পরীরা তাঁহাকে সেই প্রদীপ প্রদানের স্থান দান করিলে, সেই দীপালোকের সাহায্যে

মহাত্মা বদর দেওপরী গুলিকে তাড়াইতে সমর্থ হন। প্রদীপকে যাবনিক ভাষায় চাটি বলে। চাটির প্রভাবে ঐ স্থান হইয়াছে বলিয়া উহাকে চাটিগাঁ বলে। প্রাচীন গ্রন্থে চট্টল,চট্টগ্রাম প্রভৃতি শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। বারাহি-তন্ত্র প্রভৃতিতে"চট্টলে চন্দ্রশেখরে" ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব,
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব"

ভারতচন্দ্র কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এই নাম লিখিয়া থাকিবেন। যখন ভবানীকে একান্ন খণ্ড করিয়া কাটা হয়, তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের অর্দ্ধেক চট্টগ্রামে নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি।

কথিত আছে, কর্ণফুলীর এক অংশে ভগবতীকে কাটিবার পর ঐ চক্র ধৌত করা হয়। সেই অংশের বর্ত্তমান নাম চক্রতোয়া বা চাকৃতাই। চাকতাই কর্ণফুলী নদীর এক অংশ, সহরেই অবস্থিত।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন, —চিটাগাংই প্রকৃত শব্দ। গাং—অর্থ নদী বা সমুদ্র, চিটা অর্থ চাটি বা প্রদীপ, অর্থাৎ চিটা গাং অর্থ সমুদ্রের উপকূলস্থ আলো অর্থাৎ প্রধান বন্দর।

এই বাক্যের সমর্থনে ইহা বলা যাইতে পারে, পর্ত্তুগীজেরা ইহাকে পোর্ট গ্রাণ্ডো অর্থাৎ প্রধান বাণিজ্য-বন্দর আখ্যা দিয়াছিলেন। এককালে চট্টগ্রাম জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তৎকালে রোমান সম্রাটেরা ভাল ভাল জাহাজ চট্টগ্রাম হইতে তৈয়ার করাইয়া নিতেন, এইরূপ বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চট্টগ্রামের নাম প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু তিব্বত দেশে চট্টগ্রামের এক সুন্দর নাম আছে, তাহা "রম্য"। এই নামটী বাস্তবিকই "রম্য" ভূমি চট্টগ্রামেই প্রয়োজ্য। চট্টগ্রামে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশাল স্থান ছিল। তিব্বত দেশে চট্টগ্রাম হইতে প্রচারকগণ গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, ইহা রায় শরচ্চন্দ্র দাস C.I.E. মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, তিব্বতের অনেক গ্রন্থে তাঁহাদের নাম ও গুণাবলীর ব্যাখ্যান আছে বলিয়া শরৎ বাবু বলেন।

আরবেরা ইহাকে সহরে সব্জে নাম দিয়াছিল। অর্থাৎ সবুজ বর্ণ সহর। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যই এই নামের হেতু। বোধ হয়, আরবদের বাণিজ্য জাহাজ আদেন হইতে সোজাসুজী চট্টগ্রাম আসিত, চট্টগ্রামে যে সব মুসলমান বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশ আরব জাতিরই বংশধর। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার অপরাংশে যে সব মুসলমান বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে বদর সাহেব ব্যতীত "পীর বাহুর বত্তানি" নামক একসাধক ফকির ছিলেন, তাহা ছাড়া সাহা আমানৎ সাহা সাহেব, সুলতান সাহেব প্রভৃতি শত শত প্রাতঃস্মরণীয় ফকির এই স্থানকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এত ফকির, আওলিয়া ও সাধুর সমাবেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ও ৩।৪ জন সুপ্রসিদ্ধ ফকির ইহার অঙ্কদেশ সুশোভিত করিতেছে। বিগত বৎসর ফকির আয়ুদল্লা নামক এক দরবেশ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি রাজর্ষি জনকের মত একাধারে যোগী ও ভোগী ছিলেন, তিনি কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতেন। মহাত্মা

রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি হইতেও বিশেষ সম্মানিত হইতেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কি গভীর প্রেম, কি গভীর ভগবন্নিষ্ঠা! ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার বিষয়ে বারান্তরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এইমাত্র বলিলে চলিবে, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই দেবতার মত তাঁহার নামে মানত রাখিত। আমার স্মরণ হয়, আমার মাতা ঠাকুরাণী আমার রোগ মুক্তির কামনায় তাঁহার নামে বাতাসা ও দুগ্ধ মানত করিয়াছিলেন। এ কি সামান্য প্রভাব। এদেশের অনেক লস্কর ইয়োরোপ, এমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করে, কিন্তু যাত্রার আগে ১ম আয়ের টাকা এই ফকিরের নামে মানত করিয়া যাইত, ছেলে বেলা শুনিয়াছিলাম—

"No man is prophet in his own country" কিন্তু এই ফকিরকে মুসলমানেরা মহম্মদের মত, হিন্দুরা মহাদেবের মত মান্য করিয়া এই বাক্যের অন্যথা প্রতিপাদন করিয়াছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যের সময়ে চট্টগ্রামের দুই তিন জন ভক্ত তাঁহার শিষ্য দলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহাদের নাম ও কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখনও পুণ্ডরীকের বংশধরেরা মেখলে গ্রামে বাস করিতেছেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, চৈতন্যদেব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। পুণ্ডরীক অসাধারণ লোক ছিলেন, বাহ্য দৃষ্টে তাঁহাকে ফুলবাবু বলিয়া মনে হইত, তাঁহার সাজ গোজ ও পোষাক পরিচ্ছদ খুব পরিষ্কার, কিন্তু অপর দিকে তিনি অসাধারণ যোগী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল,

"অর্থা পাদো রাজোপমা
গিরিনদী যোগাপমং যৌবনম্।

তাহা ছাড়া চট্টগ্রাম নাথযোগী নামে এক যোগী ছিলেন, তাহার বংশ ধরিয়া চট্টগ্রাম নাথ বা যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা খুব শান্তিপ্রিয় ও বৈষ্ণব দলভুক্ত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, চট্টগ্রামে চারি বিশাল ধর্ম্মের একত্র মিলন হইয়াছে, চারি জাতির কীর্ত্তিকাহিনী দেশের নামের সাক্ষ্য দিতেছে, চট্টগ্রামের অপর এক নাম ইস্‌লামাবাদ। ইস্‌লামখাঁর নামানুসারে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া চট্টগ্রামের পল্লী গ্রাম গুলিতে অনেক মোগল কীর্ত্তি লক্ষিত হয়। যথা—ফতেয়াবাদ, মীর্জ্জাপুর, ইছাপুর, ফতেপুর, মাহাদাবাদ ইত্যাদি। আবার কাঞ্চনপুর কানুরখিল, সরকারের বিল, বিশ্বিস্তপাড়া প্রভৃতি হিন্দুকীর্ত্তির পরিচায়ক।

তৎপর (১) মঘদাই খাল্ (২) নোয়াপাড়া, (৩) কুয়েপাড়া প্রভৃতি মঘ কীর্ত্তির পরিচায়ক গ্রামও আছে।

কেহ কেহ চিটাগং না বলিয়া চট্টগ্রামকে চিত্তোগং বলে। ইহা মঘ ভাষায়, যুদ্ধ থামাও, এই অর্থ হয়। যখন চট্টগ্রাম আরকানের অধীন ছিল, তখন আরকান রাজের সহিত মোগলদের সমর হইলে সন্ধির প্রস্তাব হয়। সন্ধির প্রস্তাবের পর এইরূপ নিশান প্রদর্শন

(১) মঘ=:
দাই=ধাইধ,াইয়া গিয়াছে।
যেই খান দিয়া মঘ জাতি ধাইয়া গিয়াছে।

(২) মঘভাষার নায়া=গরু; পাড়া,
যেইস্থানে গরু রাখা হইত।

(৩) কুয়ে=মহিষ পাড়া,
যেইস্থানে মহিষ রাখা হইত।

করাইলে যুদ্ধ থামান হয়, সেই সময় হইতে দেশের নাম চিত্তোগং বা চিটাগং হয়। ইহাতে আবার দোহাজারি, সাতহাজারী, প্রভৃতি কয়েকটী স্থান আছে। দুই হাজার সেনার নায়ক যেখানে অবস্থিতি করিতেন, তাহাকে দোহাজারী এবং সাত হাজার সেনার নায়ক যেখানে অবস্থিতি করিতেন, তাহাকে সাতাজারি চলিত কথায় হাতাজারী বলে। এই নাম গুলি মোগল রাজ্যের সময়ের নাম।

চট্টগ্রামের উত্তরে ফতেয়াবাদ নামক এক গ্রাম আছে। তথায় নসরৎ বাৎসার দীঘী বলিয়া এক প্রকাণ্ড দীঘী দৃষ্ট হয়। ঐ দীঘী উত্তর দক্ষিণে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ, কত লোক যে এই দীঘী খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বিশেষরূপে প্রতীত হইবে। সেই দীঘীর নিকটে "পিটাখাবানীর পুকুর" নামক একটী পুকুরও আছে, সেই পুকুর প্রস্তুতের কিংবদন্তী এইরূপ। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দীঘী-খনক কুলীগুলিকে এক এক কোদালী মাটীর জন্য এক একটী পিটা দান করে, তাহাতে এই প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায়ের নামানুসারে মুকুট রায়ের দীঘী নামক এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। তা'ছাড়া এত দীঘী ও জলাশয় বাঙ্গালা দেশের কুত্রাপি পরিদৃশ্যমান হয় না। ভূতপূর্ব্ব কমিসনার স্ক্রিন সাহেব লিখিয়াছেন—

"The country is honeycombed with ponds."

বাস্তবিক চট্টগ্রামকে একটী পুষ্করণী ও দিঘীর মৌচাক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

চট্টগ্রাম Ship-building এর জন্য এককালে যেমন প্রসিদ্ধ ছিল, এখানকার বর্ত্তমান লস্করেরা তেমন পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ব্রহ্মদেশে ইহারা একরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। সমগ্র ব্রহ্ম-রাজ্যে ইহাদের বসতি বিস্তার হইতেছে। চট্টগ্রামের রেঙ্গুন প্রবাসী মোগল ভ্রাতাদের সাহায্যে রেঙ্গুনে "বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী" স্থাপিত হইয়া দুই খানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষ্টীমার চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশে এই কার্য্যের পথপ্রদর্শক চট্টলের মোগল ভ্রাতাগণ। * এই ষ্টীমারের ভাড়া ৫৲ টাকা মাত্র। তাহারা বিলক্ষণ সাহসী ও কর্ম্মনিষ্ঠ। নিম্নলিখিত কাহিনী হইতে তাহার আভাস পাঠকগণ পাইবেন। একবার একটী জাহাজ বঙ্গসাগরের মধ্যে প্রবল ঝটিকায় নিপতিত হয়, হঠাৎ একটী আয়ার কক্ষচ্যুত হইয়া কাপ্তানের অল্পবয়স্ক বালক বিশাল অম্বুধিগর্ভে নিপতিত হয়। ইহা দর্শনমাত্র চট্টগ্রামনিবাসী একজন লস্কর বালকের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করে; অতীব সৌভাগ্য প্রভাবে কাপ্তানের বালককে ও নিজ জীবন রক্ষা করে। এইরূপ নানাবিধ অসীম সাহসিকত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কাহিনী তাহাদের সম্বন্ধে কথিত হয়।

অল্প কয়েক দিন গত হইল, ইংলণ্ডে চট্টগ্রামের লস্কর সম্বন্ধে এক বিশেষ আপত্তি উথিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিলে সাদা গোরাদের ভাত মারা যায়, কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে অনেক কাপ্তেন বলিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গ খালাসীতে ব্যয় বেশী।

* এই কোম্পানীকে ফেইল করণার্থ ইংরেজষ্টীমার কোম্পানী বিনা ভাড়ায়, শেষে ১৲ টাকা ভাড়ায় লোক নিয়াছে, কিন্তু দেশীয় ষ্টীমারে ১২০০ লোক গেলে ইংরেজ ষ্টীমারে ১০০ হয় না, ধন্য স্বদেশী ভাব।

তাঁহাদের বিলাসিতা বেশী এবং অনেক সময়ে মদ্যপানে উহারা অস্থির থাকে। পক্ষান্তরে চট্টগ্রামের খালাসীর জন্য ব্যয় কম পড়ে এবং তাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ, সাহসী ও প্রভুভক্ত!

জন্মভূমির প্রতি উক্ত লস্করগুলির এক অপূর্ব্ব স্নেহ পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা নানা স্থানে যায় বটে, কিন্তু চট্টগ্রামকে অতীব উচ্চে আসন দিয়া থাকে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ একজন খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার চট্টগ্রাম কেমন দেশ? তদুত্তরে খালাসী বলিয়াছিল "বাবু, এরূপ স্থান জগতে আর নাই; মক্কামদিনার পরই আমরা চট্টগ্রামকে গণ্য করি।" খালাসীর কি জন্মভূমি-নিষ্ঠা! কবি বলিয়াছেন—

"ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন
নহে নহে তুল্য তার নন্দনকানন।
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোকে সার তার নাম,
ফলতঃ প্রকৃত স্বর্গ আপনার ধাম।"

বাস্তবিক রবি বাবুর মুখে খালাসীর এইরূপ জন্মভূমি-নিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা লজ্জায় অধোবদন হইলাম। আমরা কি স্বীয় জন্মভূমিকে এরূপ স্নেহ করি বা এরূপ উচ্চাসন দিয়া থাকি!

কথা প্রসঙ্গে রবি বাবুর একটী কবিতা মনে হইল—

বিদেশী জানে না তোরে,
অনাদরে তাই করে অপমান।
মোরা তার কাছে থাকি
যোগ দিতে চাই আপন সন্তান!

চট্টলমাতার সন্তানগণের কেহ স্বদেশতত্ত্ব না জানিয়া কি বিদেশীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়া মাতৃভূমির নিন্দা করে নাই? যদি করিয়া থাকে, তবে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হও। চট্টগ্রামের লস্করেরা যেমন প্রসিদ্ধ, হাতীখেদার লোকেরাও তেমনই প্রসিদ্ধ। এখানকার অনেকে মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে হাতী ধরিতে যায়। হাতীখেদা এক বিপুল ব্যাপার। ইহা চট্টগ্রামের মুসলমানদের অনেকেই অবগত আছে, সমগ্র বঙ্গদেশে হাতী ধরিবার জন্য চট্টগ্রামের লোকেরাই প্রসিদ্ধ। এই কার্য্যের জন্য বহু সহস্র লোক প্রতি বৎসর চট্টগ্রাম হইতে বিদেশে যাত্রা করিতেছে। পাঠক! চট্টগ্রামের মোগলেরা যেরূপ জাহাজ পরিচালনে পারদর্শী, হস্তীধৃতকরণে সুসমর্থ, সেরূপ বৌদ্ধবড়ুয়াদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাচক পরিলক্ষিত হয়।

বড় লাটের পাচক একজন চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়া। তাহা ছাড়া বড় বড় সমস্ত ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীদের পাকক্রিয়াতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়াগণ নিযুক্ত হয়। তাহারা সুপাচক বলিয়া শ্বেতাঙ্গমহলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি যে দেশকে এত সম্পদের অধিকারী করিয়াছে, সে দেশে যে উৎকৃষ্ট পাচক, উৎকৃষ্ট জাহাজ-চালক, উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক, উৎকৃষ্ট সাধু, উৎকৃষ্ট কবি জন্মগ্রহণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি!

রায় শরচ্চন্দ্র দাসের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি তিব্বতে যখন প্রবেশ করেন এবং যে উপায়ে প্রবেশ করেন, তাহা তাঁহার Journey to Lassa নামক পুস্তকে সবিস্তার বর্ণিত আছে। অন্য কোন বাঙ্গালী এতাদৃশ কার্য্যে সাহসী হইত কিনা, সন্দেহ!

তৎপর কাব্য ও কাব্য-জগৎ। স্কট লিখিয়াছেন—

'O Calidonia's stern wild
Meet nurse for a poetic child'

বাস্তবিক চট্টগ্রামের মত এত কবিত্বের বিকাশ কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমার এক

বঙ্কু বলিয়াছিলেন, চট্টগ্রামের সকল লোকই যেন কবি। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কবি গাইয়াছেন—

"চিরকাল, তোমার আকাশ
তোমার বাতাস আমার
প্রাণে বাজায় বাঁশি"

চট্টগ্রামের আকাশ ও বাতাস, চট্টগ্রামের উন্নত ভূধর ও নর্ত্তন-চঞ্চলা নদী, প্রকাণ্ড সাগর প্রতি চট্টগ্রামবাসীর প্রাণে যেন বাঁশি বাজাইয়া থাকে। তাই চট্টগ্রামে পদ্মাবতীর লেখক আলীওয়াল কবি জন্মগ্রহণ করেন।

বাবু দীনেশচন্দ্র সেন ভ্রমক্রমে আলীও-য়ালকে ফরিদপুরের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে চট্টগ্রামের লোক, তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ আছে। চট্টগ্রামের প্রতি পল্লীতে পদ্মাবতী পুথি পাওয়া যায়, প্রতি গৃহে উহা পাঠ হয়। আলীওয়ালের বাড়ী ফতেয়াবাদ নামক গ্রামে অবস্থিত, এখনও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন।

ফতেয়াবাদে আলীওয়ালের দীঘী নামক একটী দীঘী আছে। আলীওয়ালের লিখিত পদ্মাবতী ব্যতীত সতী ময়না ও অন্যান্য পুথিও এখানকার মুসলমান অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ প্রসিদ্ধ ও আদৃত।

আলীওয়াল আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়া-ছেন—

"পথেতে হার্ম্মাদ হস্তে বহু কষ্ট পাইনু"

চট্টগ্রামের এখনও হার্ম্মাদের মুল্লুক শব্দটী প্রসিদ্ধ। পর্ত্তুগীজ জল দস্যুগুলিকে হার্ম্মাদ বলা হইত।

অতি পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামে মঘ জাতিরই বসতি ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুরা এখানে আসিতে থাকে। হিন্দুদের অনেকে ইসলাম সা প্রভৃতির অধীনে আসেন। তন্মধ্যে হিন্দু কবি মাধবাচার্য্যের লিখা হইতে ইহা প্রমাণ করিব, তিনি জাগরণ নামক চণ্ডী কাব্যের রচনা করেন। তাঁহার লিখিত জাগরণ কবিকঙ্কণের চণ্ডী অপেক্ষা ন্যূন নহে, মাঝে মাঝে বরং অনেক সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থকার প্রথমে বোধ হয় জীবনের অর্দ্ধ-ভাগ রাঢ় বা বর্দ্ধমান অঞ্চলে কাটাইয়া পরে চট্টগ্রামে আসেন। গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার,
একাব্বর বাৎসা অর্জ্জুন অবতার।
পরম প্রতাপি রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি,
কলিযুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি।
সেই পঞ্চগোর মাঝে সপ্তদীপস্থল,
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বয় জল"

সেই স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী নদী আমরা দেখিয়াছি। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের অধিকাংশ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য রাঢ়ীয়, কায়স্থগণ সকলেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এতদ্ভিন্ন একশ্রেণীর কায়স্থ আছে, তাহারা বঙ্গজ। বঙ্গজকায়স্থ গুলিকে এদেশে বঙ্গ দেশী বলিয়া বলে, তাহাদের সহিত এতদঞ্চলের কায়স্থগণের কোনরূপ বৈবাহিক মিলন নাই। তবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, এখানে বৈদ্য-দের সহিত কায়স্থদের কন্যা আদান প্রদান করা চলে, ইহা বোধ হয় হিন্দু সংখ্যার ন্যূনতা বশতই হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির দিনে, জাতীয় উন্নতির ঊষাকালে এইরূপ মিশ্রণ বাঞ্ছনীয়।

এ দেশের আর একটী কথা হইতেও এদেশীয় লোকগণ যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদেশের এক শ্রেণীর লোককে কায়স্থ

ও ব্রাহ্মণগণ "বাঙ্গাল" বলিয়া ডাকে, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের লোক পূর্ব্ববঙ্গের লোককে যেই কারণে বাঙ্গাল ডাকিয়া থাকে। সেই অর্থেই এই বাঙ্গাল শব্দ, বোধ হয়, প্রযুক্ত হইত। কালক্রমে বাঙ্গালেরা রাঢ়ীয়দের কথা অনুকরণ করিলেও তাহাদের নাম ঘুচে নাই। তাহারা হলকর্ষণ ও ভদ্রলোকদের ভৃত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

অনেকে ভদ্রলোকদের দাসত্ব স্বীকার করিত। যদিও ক্রীতদাসের প্রথা এখানে ছিল না, তবুও কতকটা ক্রীতদাসের ন্যায়ই ঐ সমস্ত দাস ছিল। ঐ দাসত্ব প্রথার মূল মুসলমানদের অনুকরণ মাত্র। চট্টগ্রামে খাঁ, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধির অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিল, তাহাদের আরব দেশীয় প্রথামতে দাস দাসী প্রচুর ছিল। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাও সেই প্রথার অনুকরণ করিয়া অনেক দাস দাসী রাখিত। দাসগণকে গোলাম বলে। বিবাহের সময় কন্যা ও বরকে কক্ষে লইয়া প্রদক্ষিণ করা, গোলামদের এক বিশেষ কার্য্য। ইহা ছাড়া প্রভুর কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে নিয়া যাওয়া ও নিয়া আসা এবং পারিবারিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করাই তাহাদের কর্ম্ম। এদেশে মেয়েকে পিত্রালয়ে আনিতে যাওয়াকে খোজা যাওয়া বলে, বোধ হয় মোগল ক্রীতদাস খোজাগুলি এই কার্য্যে যাইত বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে।

চট্টগ্রামে একটা উৎকৃষ্ট প্রথা ছিল, পুষ্পাঞ্জলী বিবাহ। কোন কোন রূপসী দাসনন্দিনীকে তাহার মনিব উপপত্নী রূপে রাখিয়া দিতেন। কিন্তু তাহার সন্তান গুলিকে নষ্ট করা হইত না। তাহারা পুষ্পাঞ্জলী বংশধর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, একটী পুষ্পমাল্য রচনা করিয়া মনিবের উরুদেশে ও কন্যার গলদেশে লম্বমান করিয়া দিয়া এই গন্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পাদিত হইত।

বর্ত্তমানে সেই প্রথার লোপ হইয়া অনেক কুফল হইতেছে। এইরূপ কোন কোন বিধবা দাসীকে উপপত্নী রূপে ব্যবহার করিলে তাহার গর্ভজাত সন্তানগুলিকে সাঁওটিয়া ( সাঙ্গা হইতে জাত ) বলা হইত।

এই পুষ্পাঞ্জলী বিবাহ প্রথা ও সাঁওটিয়া বংশধর সৃষ্টিরপ্রথা চট্টগ্রামে নূতন মনে হয়। বর্ত্তমান কালে এই প্রথা লোপ পাইয়া ভ্রূণহত্যার পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

কবি মাধবাচার্য্যের জাগরণে বিরচিত হয়—

"ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শাকনিরূপিত
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত"

এই গননানুসারে ১৫০১ শকে, ইহা ছাড়া শ্রীকর নন্দীর ভারত পরাগণী ভারত (১) সঞ্জয় রচিত ভারত, জগন্নাথ মঙ্গল, বাইস কবির মনসা, ষট্ কবির মনসা প্রভৃতি কবিত্বের নিদর্শনপূর্ণ অনেক গ্রন্থ চট্টগ্রামে আছে। বর্ত্তমান সাহিত্য পরিষদের কল্যাণে সেই সমস্ত প্রচারিত হইবার আশা করা যায়। তৎপরে চট্টগ্রামের আর এক বিশেষ শক্তিশালী কবি ছিলেন, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ খাস্তগিরি। তিনি ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির ছোট ভাই। ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগিরি বাঙ্গলা দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষ গৌরবের কথা, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয় বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীনা।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতেও চট্টগ্রাম কাব্য-জগতে নিতান্ত পদানত নয়, চট্টগ্রামের

(১) কাশী দাসী ভাবাবহ পূর্ব্বে পারাগণী ভারত চট্টগ্রামে বিরচিত হয়।

নবীনচন্দ্র সেন,কবিত্ব জগতে যে আসন লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, নবীনচন্দ্র দাসেরও কবিত্ব ভাব ক্রমশঃ বিকসিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মাঝিদের সারি গান, কবি গান, যাত্রা গান,বারমাস, ও ভট্টের কবিতায় কত মধুময় কবিত্ব রস প্রবাহিত, তাহা আর কি বলিব।

এই সমস্ত কবিত্বের অধিকাংশই আধ্যাত্মিক ভাব মূলক, যথা মাঝিদের সারিগানের একটী লাইন—

"বন্দা, কার লাগি বাঁধরে সোণার ঘর"

যখন চন্দ্রমা-শালিনী যামিনী যোগে মৃদু দাঁড় ক্ষেপণে মাঝিগণ গান গাইয়া যাইতে থাকে, তখন প্রাণ কি মধু বর্ষণ করে, তাহা শ্রোতা মাত্রেই অবগত আছেন। ভট্টগণ সুন্দর ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাহাদিগের দ্বারা এদেশে ভাব প্রচারের কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব, যখন ভট্টগণ গান করে—

"দেশের দুঃখের কথা,
এ দেশের দুঃখের কথা প্রাণের ব্যথা
কবিব প্রচার—
বিদেশের পণ্য কিনে দেশের হাহাকার
হে ভাই বঙ্গবাসী!
হে ভাই বঙ্গবাসী,—
মুখে হাসি, রাখ্‌ছ কোন লাজে,
কোন লাজেতে মুখ দেখাব স্বদেশী সমাজে
পরি মাল বিলাতী :—
পরি মাল বিলাতী ধূতি ছাতি জুতা আদি সব
সাজিয়াছ মাতৃহন্তা বাবু অভিনব।"

তখন শত শত বক্তার বক্তৃতা অপেক্ষাও সুফল হয়। তাহারা উচ্চৈস্বরে গীতচ্ছন্দে উক্ত রূপ কবিতা আবৃত্তি করে।

কোন দেশকে দেখিতে হইলে, তাহার সাহিত্য-সম্পদের ভিতর দিয়া দেখিতে হয়। চট্টগ্রামের গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলী ছাপা হইলে এক বিরাট ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে।

ভট্টগণের কবিত্বশক্তি অসাধারণ। তাঁহারা যখন তখন ব্যক্তি বিশেষের সুযশঃ কিম্বা কুযশঃ কীর্ত্তন করিয়া কবিতা রচনা করিতেন।

চন্দ্রনাথে গণ্ডীবন নামক এক মোহান্ত ছিলেন। তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণদাস ভট্ট নামক এক ব্যক্তি কবিতা রচনা করিতে গিয়া বলিতেছে—

ভট্ট কৃষ্ণদাস ভিক্ষার আশে করিছে রচন
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা গণ্ডীবন।

যে কবিতাটী উল্লেখ করা গেল, তাহা বাস্তবিক খুব সুন্দর, পদের গাঁথুনি ও শব্দচাতুর্য্য এবং বর্ণনা-কৌশল অতীব মনোহর। একজন ভিক্ষুকের এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করা আশ্চর্য্যের বিষয়।

কবিতার প্রথমাংশ এই—

দেখ্‌লাম আদি ধাম, চট্টগ্রাম
ধন্য পুণ্য দেশ,—
আছেন চন্দ্রশিখর পর্ব্বতজুড়ি
পার্ব্বতী মহেশ।

এইরূপ অনেক কবিতা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ভট্টগণ রচনা করিয়াছেন। রাজকুমার বাবু নামক এক ব্যক্তিকে উল্লেখ করিয়া এক ভট্ট এক কবিতা লিখিয়াছে—

কবিতা প্রসঙ্গে কিছু করিব প্রচার
কীর্ত্তিবাসা গ্রামে ছিলেন বাবু রাজকুমার।
বাবুর কীর্ত্তি যত,বল্‌ব কত শুন্‌তে চমৎকার
ধর্ম্ম শাস্ত্রে সদায় মতি অতি সদাচার,

ইত্যাদি। কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, এই ভট্টগণ স্বদেশী ভাব প্রচার করনার্থ নোয়াখালী, কুমিল্লা,সন্দীপ, হাতিয়া, এমন কি, বরিশাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন এবং তাহা-

দের যত্নে স্বদেশী ভাব এখনও বহু ভাবে বিস্তৃত হইতেছে। তাঁহাদের রচিত কবিতাবলীর সংখ্যা করা সুকঠিন।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিও কম নহে। আওরঙ্গজেবের পুত্র সুজা আরকানাভিমুখে প্রস্থান কালে চট্টগ্রাম সহরে অবস্থান করেন, সুজার রঙ্গমাহাল ছিল বলিয়া উক্ত পর্ব্বতকে রঙ্গমাহাল শৈল বলা হয়। এতদ্ব্যতীত সুজার একটী মস্‌জিদ ঘরও ঐখানে রহিয়াছে। শেষে চট্টগ্রাম হইতে সুজা কিরূপে আরাকান যায় ও কিরূপে প্রাণ হারায়, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

পূর্ব্বে বদর সাহেবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ বদর সাহেবকে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এক ভাবে মান্য করিয়া থাকে। তাঁহাকে মানত না দিয়া ও সম্মান না দেখাইয়া সহরের উপর কোন লোক কোন কর্ম্ম করেন না। পল্লী নিলয় হইতে সহরে নবাগত হইলে আগে বদর সাহেবকে মানত দিতে হয়। এই দৃশ্য বাস্তবিক সুখকর যে, ব্রাহ্মণ-তনয়গণ গললগ্নীকৃত বাসে বদর সাহেবের চরণে প্রণত হইতেছে। আজ সমগ্র ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলন মন্ত্রের যে রব উঠিয়াছে, তাহার মিলন-কেন্দ্র বদর সাহেবের পাদপীঠ হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

যখন হিন্দুভ্রাতাগণ মুসলমানদের ভক্তি-ভাজন ফকিরের উদ্দেশে প্রণাম করে, তখন মুসলমানগণ তাহাদিগকে কতই আপনার লোক মনে করিয়া থাকে। চট্টগ্রামে মঘদের প্রতিও স্নেহ প্রদর্শিত হয়, তাহাদের দেবতা মগধেশ্বরীর উপলক্ষে চট্টগ্রামবাসী হিন্দু মাত্রেই সেবা দিয়া থাকে। এই সেবা দেওয়ার প্রথা অতীব সুন্দর; ইহাতে কোনরূপ পূজা ইত্যাদি নাই। কেবল একটী ছাগ বা ছাগী কর্ত্তন করিয়া তাহার মাংসে পিয়াজ ইত্যাদি মাখাইয়া সেবাখানা নামক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গৃধিনীগণকে উপহার প্রদান করা হয়। কোন কোন সময়ে কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে গৃধিনীরা উক্ত সেবা-স্থানে নিপতিত না হইলে গৃহস্থ নানাবিধ অকল্যাণ ভাবিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই সেবা প্রদান প্রথা যে মগজাতিদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। মগধ অর্থাৎ বিহার হইতে আগত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীকে মঘ বা ঘগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রামাঞ্চলে যে সব বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী লোক আসিয়াছেন, তাহারা সম্ভবতঃ বিহারাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। তাহাদিগকে পূর্ব্বে মগধবাসী বলা হইত, এখন তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া মগ বলা হয়।

যখন চট্টগ্রাম আরাকাণ রাজের অধীন ছিল, তখন আরাকাণীরা চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে অনেক গুপ্ত ধন প্রোথিত করিয়া যায়। এখনও কোন কোন স্থান হইতে গুপ্ত ধন পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত স্থানকে সচরাচর ধনপোতা বলে।

চট্টগ্রামে সচরাচর ৪র্থ শ্রেণীর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখা যায়। একশ্রেণী মগধদেশ হইতে আগত, তাহাদিগকে বড়ুয়া বলা যায়। তাহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর, তৎপর আরাকাণী মঘ বা তাহাদের বংশধর, ইহারা রামু, কাক্স বাজার ও চকরিয়া অঞ্চলে বাস করে, তাহারা পরিণয়-সূত্রে এখনও আরাকাণীদের সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার অবিকল আরাকাণী মগধের মতই রহিয়াছে।

বড়ুয়াগণ অবিকল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের নামও বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের মতন। তাঁহাদের অনেকে বাঙ্গালা ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত।

তৎপর আর এক শ্রেণীর বৌদ্ধগণ চাকমা বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের বাসস্থান পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বা রাঙ্গামাটীতে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেরূপ সুন্দর, চাক্‌মা জাতির অন্তরও সেইরূপ মনোহর। চাকমাদের কথাবার্ত্তা প্রায় বাঙ্গালীদের মত। তাঁহাদের অধীশ্বরী স্বর্গীয়া কালিন্দী রাণীকে দেশের সকল লোক শ্রদ্ধা করিতেন।

তৎপর কালিন্দী রাণীর পুত্র স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রাজা হন, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ভুবনমোহন বর্ত্তমান চাকমা রাজা। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ কালীপূজা প্রভৃতি করিতেন। রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ ইঁহাদের এক নরপতিকে দীক্ষাদান করেন। রাজাকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহার গুরু হওয়াতে মহারাজ ভট্টাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিপুল সম্মান ছিল এবং আয়ও যথেষ্ট ছিল, তাহার পুত্রেরাও লাট দরবারে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর এক ভাগ 'যুমিয়া'। যুমিয়ারা পর্ব্বতে বাস করে, আরাকাণী মঘদের সহিত তাহাদের ভাষার কতক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহারা সরল প্রকৃতি ও খুব সাহসী। তাহাদের রমণীগণ স্বাধীন ভাবে পর্ব্বতে বিচরণ করে, তাহাদের সম্বন্ধে এক কবি লিখিয়াছেন—"অতিথি সেবায় রত

সতীলক্ষ্মী শ্রমশীলা,
বনাশ্রম আলো করে—
যেন শত শকুন্তলা।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"

ইচ্ছা হয় * * যুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী জীবনে।

আমার আর এক বন্ধু লিখিয়াছেন—

কমলা সমনা হয়ে—
বাঙ্গালীর অযতনে
যেন আসি বাস করে যুমিয়ার এভবনে।

আর এক স্থানে তাহাদের গৃহ-বর্ণনায় বলিয়াছেন— কি সুন্দর বংশ দিয়া

বাঁধিত সে মঞ্চখানি,
পোষা গরু মহিষেরে
দেখিয়া বিস্ময় মানি।

বাস্তবিক স্বাধীন যুমিয়া জাতির স্ত্রী-স্বাধীনতা, দাম্পত্য-প্রেম, বনের আশ্রম বর্ণনা করিলে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ হইয়া উঠে।

এই সকল সুস্থ পার্ব্বত্য যুমিয়া ও চাকমা জাতি এখন পাদ্রী-কবলে পড়িয়া অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ বা অন্য সমাজ চেষ্টা করিলে সবল সুস্থ প্রকৃতির প্রিয় শিশুগুলিকে ভারতের নবযুগে অনেক সাধু কাজে নিয়োগ করিতে পারেন। তাহাদের স্ত্রীলোকগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, পুরুষগুলিও তদ্রূপ। সকলেই স্বীয় স্বীয় বস্ত্র বয়ন করে। চাকমা রমণীরা বস্ত্র বয়ন করিতে বেশ পটু। কথিত আছে, বস্ত্র তৈয়ার করিতে না জানিলে তাহাদের বিবাহ হয় না।

এইস্থানে বলা উচিত—আরকাণী শ্রেণীর মঘ রমণীরা অতীব উৎকৃষ্ট বসন তৈয়ার করে। চট্টগ্রামে ১১ লক্ষ মুসলমান, তাহারা সাধারণতঃ যুগী ও জোলার কাপড় পরিধান করে। কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান ও বড়ুয়াদের জন্য স্বদেশী আন্দোলন আবশ্যক হইয়াছিল।

বোধ হয়, পাঠকগণের অনেকেই অবগত

আছেন, চট্টগ্রাম Hill-tract বা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম তুলার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম হইতে বিস্তর কার্পাস রেলী ব্রাদার্স কোম্পানী খরিদ করিয়া বিলাতে চালান দেয়। এই তুলার চাষ করে, পার্ব্বত্য যুমিয়া ও চাকমা জাতি। তাহারা পর্ব্বত গাত্রে দাও সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, অগ্নি সংযোগে সেই কর্ত্তিত জঙ্গল দাহ করিয়া, সেই ভস্মরাশিতে একসঙ্গে যখন ভুট্টা, ধান্য ও কার্পাসি প্রভৃতি বপন করে, তখন পর্ব্বতের কি শোভা আবার অর্দ্ধস্ফুট মুকুল লইয়া যখন শস্যক্ষেত্র বায়ু প্রভাবে নৃত্য করে, তখন তাহার দৃশ্য প্রাণোন্মাদক হয়!

পার্ব্বত্য জাতিরা এক পাহাড়ে বার বার চাষ করেনা. এই বৎসর যে পাহাড়ে চাষ করিল, তাহাকে ২।৩ বৎসরে জন্য ত্যাগ করে। তাহাদের খাজনা দম্পতী ঠিকা পাঁচ টাকা, অর্থাৎ এক স্ত্রী ও পুরুষের জন্য মোট পাঁচ টাকা খাজানা দিতে হয়। তাহারা যতদূর ইচ্ছা জমী চাষ করিতে পারে, যতটা ইচ্ছা গরু, মহিষ, কি গয়াল রাখিতে পারে।

এইস্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি, গয়াল এক প্রকারের মহিষ জাতীয় জন্তু, কিন্তু উহার দুগ্ধ মহিষের দুগ্ধ হইতেও গাঢ়, কোন কোন যুমিয়া উহা পালন করে।

চট্টগ্রামে আর এক জাতীয় লোক ফটিকচাড়ির রায়গড় অঞ্চলে বাস করে, তাহারা ত্রিপুরা বলিয়া পরিচিত। তাহাদের আকৃতি প্রায় যুমিয়া জাতির মত, কিন্তু তাহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, স্বাধীন ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে তাহারা এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।

কুকী জাতী। চট্টগ্রামে সভ্যতম জাতি যেমন রহিয়াছে, অর্দ্ধ বর্ব্বর যুমিয়া জাতি এবং বর্ব্বরতম কুকী জাতিও রহিয়াছে।

কথিত আছে, কুকী জাতি মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, লেঙ্গটা ও মিলা। মিলা কুকীরা যুমিয়া ও চাকমাদের মত জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। লেঙ্গটা কুকীরা এখনও উলঙ্গ থাকে, কথিত আছে, ইহারা নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিত। ইহাদের মত ঘোর বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর জাতি খুবই কম পরিদৃষ্ট হয়। কুকী জাতির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অংশে লুংলে প্রভৃতি স্থানে ঘোরতর জঙ্গলে ইহাদের বসতি। লুসাই পর্ব্বতেও ইহাদের বিস্তর লোক বাস করে। কথিত আছে, ইহাদের অসভ্য শ্রেণীর লোকেরা বৃদ্ধকালে মাতাকে কোন উচ্চ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বিনাশ করতঃ ভক্ষণ করিত। তাহারা বলিত "মাতা যেমন আমাকে উদরে রাখিয়াছিল, আমিও তেমন তাঁহাকে উদরে রাখিব।"

ইহাদের প্রধান উৎসব কেঁরো পূজা। ইহাদের কোন রূপ ধর্ম্ম নাই, পার্ব্বত্য দৈত্য প্রভৃতির উপাসনাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। কেঁরো দেবের পূজার জন্য ইহারা হস্তী, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি সমস্ত জন্তু এবং মনুষ্য পর্য্যন্ত বলী দিয়া থাকে। মনুষ্য বলী না দিলে কেঁরো পূজা হয় না।

কুকীরা আগে সমভূমিতে আসিয়া লোক সকলকে আক্রমণ করিত এবং ধন রত্ন যাহা পাইত, লুটিয়া লইয়া যাইত। আমার মনে আছে, বাল্যকালে কুকীর নাম শুনিয়া আমরা ভয়ে অস্থির হইতাম। ১২।১৪ বৎসর হইল, ইংরাজের চেষ্টায় কয়েকজন কুকীরাজ ধরা পড়িয়াছে। তাহারা সচরাচর উলঙ্গ থাকে, কতগুলি লতাপাতা ও চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদন করে মাত্র।

কুকীরা আর একটী উৎসব করে বলিয়া শুনিয়াছি, কুকুরকে নানাবিধ তরকারী ও ভাত প্রভৃতি খাওয়াইয়া কিছুক্ষণ পরে তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় ধরিয়া অনেকক্ষণ ঘুড়ায়। সেইরূপ ঘুড়াইবার পর কুকুরটীর যথেষ্ট বমন হইলে কুকীরা পরম উপাদেয় পদার্থ জ্ঞানে তাহা ভক্ষণ করে।

উপরে কুকী জাতির কথা যাহা লিখিত হইল, তাহা চির-প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে। তাহাদের বিবরণ (লেংটা কুকীদের) বিশেষ রূপে সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। মিলা কুকীদের অনেকেই রাজা ভুবনমোহনের প্রজা ছিল। বোধ হয় এখনও আছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কুকীগণ কর্ত্তৃক বৃটিশ ত্রিপুরার অন্তর্গত খণ্ডন পরগণায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। সিপাই বিদ্রোহের সময় কানপুরে যেরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এই হত্যাকাণ্ড তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা প্রকাশ —"১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১ম ভাগে চট্টগ্রামে এইরূপ রিপোর্ট আসিল যে, চারি পাঁচ শত কুকী ফেণী নদীর মুখে একত্রিত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, তাহারা অনেকগুলি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে ও বিস্তর মনুষ্য হত্যা করিয়াছে, তাহারা ১৫ খানি গ্রাম ভস্মীভূত,১৮৫ জন বৃটিশ প্রজাকে হত্যা ও ১০০ লোককে ধৃত করিয়া নিয়াছিল।" রাধামোহন নামক জনৈক ভট্ট ইহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছে—

"শুন সর্ব্ব সাধুজন ইহার নির্ণয়
যেন মতে খণ্ডনেতে কাটাকাটি হয়,

* * * *

হেন কালে প্রমাদ ঘটিল
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকী আসি দেখা দিল।
তারা,দাও শেল হাতে,বন্দুক কাঁধে, দেখিতে ভয়ঙ্কর,
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কাল ভুজঙ্গর।
রণে প্রবেশিল, যারে পায় কাটিয়া ফেলায়,
অবনীতে কাটা পড়ি ধূলায় লুটায়।
রুধির আকর্ষণে আকাশেতে উড়িল শকুন,
ঘরের জিনিস লুট করি জ্বালি দেয় আগুন,
তারা খন্তা নিল,কুড়াল নিল,আর নিল দাও কাঁচি,
সিন্ধুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাছি।"

অনেকে অনুমান করেন, খ্যাতনামা কুকী-সর্দ্দার রতন-পুইয়া এই ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন।

তৎপর কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানি গ্রাম কুকীরা দগ্ধ করে। অতঃপর কুকীদিগকে বিশেষ রূপে দমন করিয়া চট্টগ্রামের তাৎকালিক কমিসনার মিঃ বক্‌লাণ্ড গ্রেহাম সাহেবকে ত্রিপুরাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রেহাম কুকী সর্দ্দার রতন-পুইয়াকে ৪০০৲ টাকা, হাউলাং নামক কুকী সর্দ্দারকে ৮০০৲ এবং "সাইনো" দিগকে ৮০০৲ টাকা বার্ষিক দিবার প্রস্তাবে সন্ধি করে। তৎপর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কুকীদের এক উপদ্রব হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে প্রায় অসংখ্য কুকী চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব প্রান্তে সৈন্য স্থাপন করাতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

চাকমা রাজা ভুবনমোহন ব্যতীত মুঘিয়াদের দুইটী রাজা আছে। চট্টগ্রামের উত্তর ভাগে যে রাজা আছেন, তাহার নাম মান্‌রাজা, তাঁহার রাজধানী মানিকছড়ি। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী, মাসিক শতাধিক তঙ্কা ব্যয় করিয়া তাহার একমাত্র কন্যাকে সুশি-

ক্ষিতা করণার্থ চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভাগে যে রাজা আছেন, তাহার নাম বোমাং রাজা। বোমাং রাজা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মানভাজন।

যুমিয়ারা সমতলবাসীদের নিকট সূতা, ভুট্টা, কামিন ধান্য (খুব সূক্ষ্ম একরূপ ধান্য) সারিপাখী ও অজাগর সাপের পিত্ত, গয়ালের সিং, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, ব্যাঘ্র দুগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয় করে। গয়ালের সিং গৃহ-সজ্জার এক বিশেষ উপকরণ ও ব্যাঘ্র দুগ্ধ কাণ পাকার মহৌষধ। মিন কুকীরা পাহাড় হইতে হস্তী দন্ত সংগ্রহ করিয়া সমতলবাসীদের নিকট বিক্রয় করে। চট্টগ্রামে বিস্তর বন্য-হস্তী পাওয়া যায়, অজাগরের বিষয় কিছু বলা উচিত মনে করি। চট্টগ্রামে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অজাগর সর্প পাওয়া যায়। শুনিয়াছি,কোন ২ সাপ ৫০।৬০ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহারা শ্বাসে খাদ্য আকর্ষণ করে। গোবৎস, হরিণ-শিশু ও শূকর ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেনা।

অজাগরের পিত্ত শিশুদের মহৌষধ, এক একটী পিত্ত ৫।৬ টাকাতে গৃহস্থেরা ক্রয় করে।

চট্টগ্রামের বন্য বরহ অতীব ভয়ানক। ইহাদের দন্তাঘাতের রোগী প্রতিবৎসর ২।৩টী চট্টগ্রাম হাঁসপাতালে আনীত হয়। চট্টগ্রামে সুন্দর বন অঞ্চলে বড় ছোট ও নানা রকমের ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত ব্যাঘ্র পার্ব্বত্য জাতিরা বধ করিয়া সময়ে সময়ে পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে সহরে আনয়ন করে।

চট্টগ্রামে কুকী ছাড়া অপর দুই শ্রেণীর অসভ্য লোক দৃষ্ট হয়, এক জাতীয় লোককে মুরু বলে, অপর জাতীয়কে খেয়ং বলে। রিয়ং বলিয়াও একজাতি অসভ্য পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের বিবরণ বিশেষ জ্ঞাত না থাকার দরুণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যুমিয়াদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাদের পূত তীর্থ "মহামুনির" কথা বর্ণনা করা প্রয়োজন। মহামুনি তীর্থ পাহাড়তলীতে অবস্থিত। তাহার অনতিদূরে (১) পূর্ণানন্দ স্বামী নামক জনৈক সন্ন্যাসী "জগৎপুর" আশ্রম নামক বদরিকাশ্রম বৎ এক আশ্রম করিয়াছেন। মহামুনি বোধ হয় বৌদ্ধ দেবের নামান্তর গুরু মাত্র। এই মহামুনি ছাড়া"করাতারা""চাঁইদামুনি" নামক দুইটী বিগ্রহ দুই মন্দিরে অবস্থিত। মোট মন্দির সংখ্যা ৩টী। বিষুব সংক্রান্তিতে ৭দিন ব্যাপিয়া সমগ্র চট্টগ্রামের দৃষ্টি ঐ মেলার দিকে আকৃষ্ট হয়।

কুসুমকুন্তলা শকুন্তলার ন্যায় সহস্র সহস্র যুমিয়া যুবতী যখন পার্ব্বত্য নিলয় পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ দেবের চরণ তলে উপনীত হয়, ধর্ম্মোৎসাহ-প্রদীপ্ত তাহাদের উন্মদ নৃত্য ও গীতে তখন প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ আনয়ন করে। মধুক্য বর্ত্তিকার আলোরাশিতে গগনমণ্ডলের শত শত নক্ষত্রের ন্যায় মন্দিরগাত্র তখন রঞ্জিত হয়। মন্দিরে শত শত হিন্দু রমণী ও পুরুষ বর্ত্তিকা প্রদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে প্রয়াসী হয়। এই প্রকাণ্ড মেলায় বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়। কিন্তু সেই বন-কুসুমশোভনা, সুঠামগঠনা যুমিয়া রমণীগণকে দর্শন করিলে মনে হয় কি অপূর্ব্ব স্ত্রী-স্বাধীনতা! সেই স্বাধীনতার মধ্যে কি দেখি?

(১) পূর্ণানন্দ স্বামীর আশ্রম মনোহর শৈলোপরি অবস্থিত। তাহার অনেক শিষ্য ও শিষ্যা আছেন, তাঁহারা লবণ বর্জ্জনে আহার করেন। ৮।১০টী মেয়ে বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এই আশ্রমের সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে।

"স্বাধীন সর্ব্বত্র গতি; অথচ সংযত"
আর দেখি—

শ্রম-পুরস্কার স্বাস্থ্য তোমার ভূষণ,
যদিও শরীরে নাহি বহু আভরণ।

তখন শিক্ষা হয়—

তোর মত সুসংযত স্বাধীনতা পেয়ে
বঙ্গনারী আসে যদি বাহিরেতে ধেয়ে,
নিরন্তর শ্রমকর কাজ যদি করে,
দেখিবে,তাহারা আরও বেশী শোভা ধরে।

বাস্তবিক দুই তিন মাইল দূরবর্ত্তী শৈল-সঙ্গিনী যুমিয়া রমণীগণ কেমন স্বাধীন! আর সমভূমি-নিবাসিনী তাহাদের ভগিনীগণ কিরূপ পরাধীনা ও ভগ্নদেহা! ইহা ভাবিলে আমাদের শিক্ষা দীক্ষায় শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে।

কাকস্‌বাজার অঞ্চলে আরাকাণী মঘ-রমণীগণও স্বাধীন। কিন্তু তাহারা মহামুনি তীর্থে আগমন করে না।

বিষুব পর্ব্বের সময়ে চট্টগ্রামে আর এক মহোৎসব সম্পাদিত হয়, তাহা বলীখেলা।

এককালে বাঙ্গালা "অধম জাতি" ছিলনা, এককালে বাঙ্গালা দেশ পালোয়ানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রামে ৩০শে চৈত্র হইতে সমস্ত বৈশাখ ব্যাপী এই বলীখেলার অনুষ্ঠান হয়। বলীগণ কাপড়, রুমাল এবং টাকা পারিতোষিক পায়। চট্টগ্রামের প্রতি গ্রামেই চড়ক পূজা হয়; পূর্ব্বে চড়ক পূজাতে শিব-গাছের একপ্রান্তে একটী লোকের পৃষ্ঠদেশ লৌহ-কড়াবিদ্ধ করিয়া তাহাকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া পাক দেওয়া হইত; সে প্রায় ভূমি হইতে ৪০ হস্ত উর্দ্ধে তীরবেগে ঘুরিত। বর্শার মত প্রকাণ্ড লৌহশলাকাতে তাহার পৃষ্ঠের এক অংশ বিদ্ধ করিয়া তাহার বক্ষ-দেশে কাপড় বাঁধিয়া সজোরে তাহাকে পাক দেওয়া হইত। আজ প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইল, গবর্ণমেণ্ট সেই প্রথা রহিত করিয়াছেন। এখন সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে পুতুল পাক দেওয়া হয়।

কিন্তু চড়ক পূজার আমোদ অপেক্ষা বলীখেলার আমোদ প্রশস্ত। অক্ষয় বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অশ্বমেধ, সর্পসত্র, ধনুর্ভঙ্গ যাহাদের নিত্য ক্রীড়ার মধ্যে পরি-গণিত ছিল, সেও হিন্দু,আর এখন এইহিন্দু!" এই দিনেও চট্টগ্রামে বলীখেলা রহিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শুনিয়াছি, তৎকালে বলীরা দেহের বল রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিত। তৎ-কালে বলীদিগের কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আলোচিত হইত। যাহারা কুস্তীতে অনেক লোককে ভূতলশায়ী করিতে পারে, সচরাচর তাহাকে বলী আখ্যান প্রদান করা হয়। বলীদের মধ্যে যিনি আবার খুব বেশী বলশালী,তাহাকে"মাল"আখ্যা দেওয়া হইত। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে যেরূপ বলী ছিল, আধুনিক সময়ে সেরূপ বলী একটীও দেখা যাইতেছে না। তৎকালে অনেক বলী চট্টগ্রামকে উজ্জ্বল করিয়াছিল। আধুনিক বলী-দের মধ্যে সুন্দর বলী ও হোচন বলী নামক দুই প্রসিদ্ধ বলী ছিল। ইহারা নিরক্ষর ছিল, কিন্তু অসাধারণ শারীরিক বলের অধি-কারী ছিল। সুন্দর বলী সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনা যায়। একবার নাকি একজন নৌকার মাঝির সহিত বচসা হওয়াতে ৪০।৫০ জন আরোহী সহ তাহার নৌকা খানা ডাঙ্গার উপর উঠাইয়া রাখে। শেষে অনেক বিনয় করাতে আবার জলে নামাইয়া দেয়।

এই সব বলশালী লোকের কীর্ত্তি রক্ষায় আমাদের যত্ন কর উচিত। ইহারা জাতীয়

ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ইহাদের বলের সম্মান না করিলে আমরা কালে ইহা অপেক্ষাও অধঃপতিত হইব। কথিত আছে, সুন্দরের এক ভগ্নী ছিল—সে ষোল আড়ি ধান্য মাথায় করিয়া নিতে পারিত। একদিন অপর এক বলী সুন্দরবলীর সহিত কুস্তী করিতে আইসে, তখন সুন্দর বাড়ী ছিল না। তাহার ভগ্নী বলিল "দাদা বাড়ী নাই, আপনি কেন আসিয়াছেন?" সে বলিল, আমি সুন্দরবলীর সঙ্গে কুস্তী করিতে আসিয়াছি।" তখন সুন্দরের ভগ্নী বলিল, "আপনি স্নান আহার করুন, তিনি দ্বিপ্রহরে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।" এই বলিয়া একটী তৈল বাটীতে করিয়া কতক শস্য তাঁহাকে আনিয়া দিল, শস্য দেখিয়া নবাগত বলী বলিল ইহা"এ কেন? "সে বলিল, "স্নানার্থ তৈল বাহির কারিয়া গায়ে দিবার জন্য।" ইহাতে সে বলিল,"তাও কি সম্ভব!" তখন উক্ত রমণী হাতে টিপিয়া শস্য হইতে তৈল বাহির করিয়া দিল এবং নবাগত বলীকে বলিল, "আপনি শস্য হইতে তৈল বাহির করিতে পারেন না—আমার দাদার সঙ্গে কুস্তী খেলিতে চান? আমার দাদার বল চতুর্গুণ।" শুনিয়া সে বলী আস্তে আস্তে পলায়ন করিল। এইরূপে হোচন বলী ও অন্যান্য বলী সম্বন্ধে নানাবিধ সত্য ঘটনা আছে, যাহা শুনিলে আমাদিগের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিতে হয়।

যাহা হউক, বৈশাখ মাস ব্যাপী ৫০০।৬০০ স্থানে প্রায় বলী খেলা হয়। এই বলীখেলার প্রভাবে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, ডোম হাড়ি শ্রেণীতে এখনও কয়েকজন বলী দৃষ্ট হয়।

ইহাদের কুস্তী করিবার পূর্ব্বে শরীর যেমন, থাকে কুস্তীর সময়ে তাহার অনেক প্রবর্দ্ধন হয়। তাহাদের মাংসপেশীগুলি যখন স্ফীত হইতে থাকে, তখন বাস্তবিক দেখিতে আনন্দ হয়। সময়ে সময়ে তাহারা শরীরের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হস্তের কনুই দ্বারা শুষ্ক মৃত্তিকা ভেদ করতঃ গর্ত্ত করিতে থাকে। যাহা হউক, এই বলীখেলা চট্টগ্রামের এক বিশেষ সম্পত্তি।

তৎপর লাঠীখেলা। চট্টগ্রামে কাঁহার নামক এক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বাস করে, তাহারা লাঠীখেলাতে বিশেষ দক্ষ। লাঠী খেলাতে দেহরক্ষা করা, এবং বিপক্ষকে লাঠীর আঘাত করা, এই দুইটীতে ইহারা খুব ক্ষিপ্রহস্ত। তবে ইহারা বর্ত্তমান প্রণালীর লাঠীখেলা জানে না। শিক্ষাদান করিলে যে ইহারা উৎকৃষ্ট লাঠীক্রিড়ক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ রাওনিদের অনেক ধর্ম্মমঠ ও মুসলমানদের অনেক মসজিদ ও দর্গা আছে। এতদ্ভিন্ন কুতুবদিয়া নামক বঙ্গসাগর মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে একটী Lighthouse বা বাতিঘর আছে, ইহার আলো প্রায় ১৬ মাইল হইতে দেখা যায়।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে একটী প্রতিধ্বনি-শৈল আছে, ইহাকে সচরাচর কুড়ালিয়া মুড়া বলে। আমরা বিগত স্বদেশী-আন্দোলনের সময় নৌকা-পথে সেই প্রতিধ্বনি-শৈলের নিকট গমন করিয়াছিলাম। আমার এক সঙ্গী বলিল "জয় দেশীয় শিল্পের জয়, তখন গভীর জীমূতমন্দ্রে শৈলের প্রতিধ্বনি পাইলাম"জয়,দেশীয়-শিল্পের জয়!" এরূপ ভীষণ শব্দ, এরূপ গভীর আহ্বান ভারতবাসীকে শুনাইতে বড় ইচ্ছা হয়। যিনি চট্টগ্রাম পরিদর্শন করিত

আসেন, তিনি যেন একবার এই প্রতিধ্বনি শৈলের শব্দ শুনিয়া যান। আমার আর এক সঙ্গী বলিল, "জয়, সুরেন্দ্রনাথের জয়" তখন প্রতিধ্বনি শত গুণ জোরে সেই শব্দ ধ্বনিত করিল; পর্ব্বতের সেই ধ্বনি এখনও যেন আমার কর্ণপটহে নিনাদিত হইতেছে।

আমেরিকাতে নায়াগ্রার জলপ্রপাতের সাহায্যে যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চালান যাইতেছে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের "বড়কন" নামক জলপ্রপাতকে সেরূপ চট্টগ্রামের বৈদ্যুতিক ট্রাম, আলো প্রভৃতির ব্যবহারে নিয়োগ করার চেষ্টা হইতেছে এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের ভাষা ও শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, এক চট্টগ্রামে নানা জাতি ও নানা ভাবের লোকের সমাবেশ হইয়াছে। যে সমস্ত ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান, হুগলী ও সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন, এখনও কেহ বিশুদ্ধ কথায় আলাপ করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে লোকে ঠাট্টা করিয়া বলে—"সাতগেঁয়ে বলিতেছ" অর্থাৎ সপ্তগ্রামের কথা বলিতেছ? তবে চট্টগ্রামের কথায় অনেক যাবনিক শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের মত চট্টগ্রামের কথার টান নাই।

যাবনিক শব্দগুলি হিন্দুস্থানীর মত অবিকল রহিয়াছে। যথা—

| বাঙ্গালা | চট্টগ্রাম |
|---|---|
| কাক | কাউয়া |
| প্রাতে | বেহানে |
| ঘটী | লোটা |

ইত্যাদি কথা আপাততঃ বিকৃত শুনায় বটে, কিন্তু যাহারা হিন্দী জানেন, তাঁহাদের তেমন বিকৃত বোধ হয় না। জলকে চট্টগ্রামে সচরাচর পানি বলা হয়। এতদ্ভিন্ন কথার তাড়াতাড়ির গতিকে অনেক স্থানে দুর্ব্বোধ্য বোধ হয়।

চট্টগ্রামে যাঁহারা ভদ্রলোক, তাঁহাদের কথা অনেক বিশুদ্ধ, সর্ব্বদেশীয়েরা যেমন কলিকাতার ভাষা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছে, চট্টগ্রামও তাই করিতেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বাসীরা বিনা ক্লেশে কলিকাতাবাসীর ন্যায় কথা বলিতে পারে। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের কথা সচরাচর অবোধ্য, তবে তাহাদের কথা মূল উর্দ্দু-ভাষার সহিত মেলে।

শিল্প সম্বন্ধে চট্টগ্রামের স্থান অনেক উচ্চে, চট্টগ্রামে সাম্পল নামক একরূপ ছোট নৌকা আছে। তাহা একজন পরিচালনা করিতে পারে। নৌকা অপেক্ষা অনেক বেগে চালিত হয়। অথচ ভয়ানক তরঙ্গেও তাহার ভয় নাই। বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও সেরূপ সাম্পল দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চট্টগ্রামের জাহাজ নির্ম্মাণ-কীর্ত্তির কাহিনী পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে।

গৃহ নির্ম্মাণ। চট্টগ্রামের বাঁসের গৃহ খুব সুন্দর হয়, অনেক ইংরাজ পাকা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বংশ-নির্ম্মিত উক্ত সুরম্য গৃহে বাস করে। সহস্র সহস্র জানালা বিশিষ্ট ঘরের মত উক্ত গৃহ যেরূপ স্বাস্থ্যকর, যেরূপ সুদৃঢ়, আরণ্য-সম্পদ চট্টলবাসীর বুদ্ধির প্রভাব এরূপ সুন্দর গৃহের সৃষ্টি করিতেছে। চট্টগ্রামের বাঁসের ঘরগুলি বাস্তবিক মনোহর। কঠোর কাজে, রাজমিস্ত্রীর কার্য্যে ও বস্ত্র বয়নে চট্টগ্রাম অন্যান্য স্থান হইতে পশ্চাৎপদ নহে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও নারায়ণ-হাটে উৎ-

কৃষ্ট পাটী তৈয়ারি হয়। উক্ত পাটী শ্রীহট্টের পাটী অপেক্ষা ন্যূন নহে।

মৎস্যধৃতকরিবার যন্ত্র। চট্টগ্রামে "চাই" ধর্ম্মযান, প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার নানাবিধ উপাদান আছে।

ছোট শিল্প বস্তু। এতদ্ব্যতীত কুরুপ পত্রের ছাতা (মূল্য ছয় পয়সা) জোমির নামক (মূল্য তিন পয়সা) দুইটী দ্রব্য আছে, দুইটীই রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষা করণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এতাদৃশ সুলভ মূল্যের স্বদেশী পদার্থের আদর বৃদ্ধির প্রয়োজন।

করুপ পত্র নামক (ভুর্জ্জ পত্র জাতীয়) এক প্রকার পত্র কৌশলে বংশ দণ্ড সাহায্যে ছত্রাকারে রচনা করা হইয়াছে। জোমির বৃষ্টির সময়ে দেহ রক্ষার বিশেষ সহায়, বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষা করণার্থ যেদিকে ইচ্ছা, সেদিকে ফিরাণ ঘুরাণ যায়। বৃষ্টিকালে দেহ রক্ষার্থ এমন সুবিধার জিনিষ এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে আর নির্ম্মিত হয় নাই। আমি আশা করি, এই পত্রিকার পাঠকগণ অনেকে এই দ্রব্য লইয়া লেখকের কথার পরীক্ষা করিবেন।

চট্টগ্রাম হইতে অনেক বংশ দণ্ড আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে নীত হইয়া ছাতার বাঁট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইতেছে। চট্টগ্রামে খুব উৎকৃষ্ট লাঠী পাওয়া যায়। সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথের মেলায় নানা রকমের সুন্দর লাঠী উঠিয়া থাকে। শঙ্খের গহনাও এখানে তৈয়ার হয়; তবে ঢাকার মত বালা তৈয়ার হয় না। ডালা, ছাতা, কুলা ধুচনী, ডোলা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবহার-দ্রব্য বংশ সাহায্যে নির্ম্মিত হয়।

খাদ্য দ্রব্য। চট্টগ্রামে নানাবিধ রকমের কচু পাওয়া যায়,তন্মধ্যে হাতীর মাথা ও পুতি কচু আর কোথাও দেখি নাই। এখানের 'ওল' অতীব উৎকৃষ্ট। এক একটী ওজনে দুই তিন মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামে নানাবিধ সমুদ্র মৎস্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'লটিয়া' মৎস্য বা ললিতা মৎস্যে ফসফরাস বেশী থাকাতে খুব মস্তিষ্ক-পোষক হয়। ইহা খুব কোমল ও সুখাদ্য। ইহা ব্যতীত ফাঁসীয়া (বোধ হয় কাঁটা বেশী বলিয়া গলার ফাঁসীর মত বোধ হয়, তাই এই নাম দেওয়া হইয়াছে,অলুয়া বা অলৌকিক মৎস্য, রূপচাঁদা (শ্বেত বর্ণ বলিয়া) পোঁপা (বা পেঁপেঁ মৎস্য, খুব কোমল বলিয়া) এই সমস্ত মৎস্য আর কোথাও খাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এইস্থানে খুব বৃহৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ কাকড়া পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তপ্‌শে মৎস্য,ইলিশ মাছ, মাগুর, কৈ, সিং প্রভৃতি নানাবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। যাহা বঙ্গের অপর স্থানে পাওয়া যায়, তা এখানে মিলে, কিন্তু অতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়,সমুদ্র মৎস্য ও পার্ব্বত্য তরকারী, তাহা অন্য স্থানে কম পাওয়া যায়।

এখানকার নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা শুষ্ক মৎস্য, লোনা ইলিশ ও লোনা ইলিশ মাছের ডিম খাইয়া থাকে। উহারা ঐ সমস্ত দ্রব্য সুস্বাদু, উপাদেয় ও মুখরোচক বলিয়া উহার প্রসংশাও করিয়া থাকে। Oyster বা কতুরা নামক সামুদ্রিক পদার্থ ইয়োরেশীয়দের খুব প্রিয়, তাহা বিস্তর পাওয়া যায়।

পার্ব্বত্য যুমিয়া প্রভৃতি জাতির লোকেরা বড় বড় বেঙ ও সাপ প্রভৃতি আহার করে। মোট কথা, জগতের সমস্ত বস্তরই এখানে ব্যবহারের উপযোগীতা রক্ষা হয়। এদেশে শটির পালো ও কামিন ধান্য নামক জলযোগ করার দুইটী উৎকৃষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়।

এদেশের হুকার খোল বিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের মুরগী খুব উৎকৃষ্ট। লর্ড মেকলে এদেশের এয়াছিন নগরের মুর্গীর কথা স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে ফাল্গুন চৈত্র মাস বন্য মধু সংগ্রহ করিবার সময়। এখানে বিস্তর মধু পাওয়া যায়। একটী মৌচাক হইতে ৮।৯ বার পর্য্যন্ত মধু সংগ্রহ করা হয়। এখানে বড় বড় চা বাগিছা আছে, তথায় চা পাওয়া যায়। মহিষখালীতে মুক্তা পাওয়া যায়। ককস্‌বাজার, কুতুবদিয়া অঞ্চলে নানাবিধ সামুদ্রিক ঝিনুক ও কড়ি পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে হস্তী-দন্ত পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম। চট্টগ্রাম সাক্ষাৎ তীর্থ ক্ষেত্র। প্রকৃতির বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এই স্থানের নরনারী ধর্ম্ম ক্রিয়াতে বিশেষ আসক্ত ছিল। যখন ইংরেজী শিক্ষার ঢেউ আসিয়া অন্য স্থানে নাস্তিকতার সূত্রপাত করিয়াছিল, তখনও চট্টগ্রামে ধর্ম্মের নিয়মগুলি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিপালিত হইত। এখন যেন সে ভাব কিছু শ্লথ হইতেছে, শিক্ষা রূপ বিষ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মেরও অনুবর্ত্তন করিতে পারেন না, নূতন ব্রাহ্ম নাম ধারণেও আপত্তি, সুতরাং বস্তুগত্যা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইতেছেন। কিন্তু প্রাচীন নরনারীদের ধর্ম্মানুষ্ঠান এখনও খুব বেশী। মুসলমানগণ ৫ পাঁচ বেলা নমাজ পড়ে, তাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই নেত্রপথে নিপতিত হয়। হিন্দুদের আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড ব্যতীত ইচ্ছামতীর মানতরাখা, মহীর প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষেত্রপালের মেলা, কাঞ্চনপুরে কাঞ্চন্নাথ ব্যতীত শিবপূজার্থ যাওয়া ও মন্দাকিনীর মেলায় যোগদান করা প্রসিদ্ধ।

প্রতি হিন্দু বাড়ীতেই প্রতি রবিবার মঙ্গলচণ্ডীর এক ব্রত অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনাতে যেরূপ কার্য্য হয়, ইহাতেও সেরূপ সুফল হয়। প্রত্যেক রবিবারে ব্রত অন্তে ব্রত কথা পাঠ হয়, সন্ধ্যাবেলাই ব্রত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে ব্রত বৃত্তান্ত এই—

"অবন্তী নগরে বৈশে সাধু হরিহর
অপার মহিমা তান সংসার ভিতর
শুভক্ষণে তাঁর ঘরে জন্মিলেক কন্যা
শুদ্ধমতি সতী যতী রূপে গুণে ধন্যা—

* * * *

সপ্তম বর্ষীয় যদি সেই কন্যা হৈল,
দৈবের নির্ব্বন্ধ তান মাও স্বর্গ পাইল,
আর এক বিবাহ করিল সদাগর,
দুর্ম্মুখা, অপ্রিয়বাদী, কুটীল অন্তর,
অবিরত বাদ করে কমলা সহিত,
তাহা দেখি সাধুর বিস্ময় হৈল চিত।
রাত্রি দিন ভাবে সাধু কন্যার কারণ
বিবাহ দিতে উপস্থিত নহে যোগ্য জন।"

তৎপর সওদাগর বিদেশে চলিয়া যায়, স্ত্রীকে বলিয়া যায়—

"কমলা জানিও সাধুর পুত্রের সমান
কদাচিৎ তাহানে না দিবা অপমান,
কমলার দুঃখ যদি ঘরে আসি শুনি
তোমা লইয়া গৃহবাস না করিব পুনি।"

এই বলিয়া সাধু চলিয়া যায়, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর প্রকৃতির সৎ মা—

"ঘরে আসি কাড়ি লৈল যত অলঙ্কার
ভগ্নবস্ত্র দুইখান দিল পরিবার,
বাসী অন্ন খাওয়াইল তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া
ছাগলের সনে দিল বনে পাঠাইয়া।"

এবং বলিল—

"বাপের আদেশ তোর ছাগল চড়াইতে"

শেষে চিরকাল সুখের অঙ্কে প্রতিপালিতা সদাগর-কন্যা কিরূপে ছাগল চড়াইবে? ছাগল গুলি এদিকে ওদিকে চলিয়া গেল, তখন কন্যা ভাবিল—

"আজিকে হারাই চেড়ী যদি যাই ঘরে
শত মায়ে মারিবেক দারুণ প্রহারে"

পরে অনেক ঘটনা হয় ও সংমা নানারূপ অত্যাচার করে, শেষে ভগবতী তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন।

"নিকটে মঙ্গলচণ্ডী দেখিয়া কন্যারে,
ইহারে প্রসন্না হইলে পূজিবে সংসারে"

এই ভাবিয়া তিনি অনুগ্রহ করেন, কন্যার পিতাকে আনিয়া দেন

"শিয়রে বসিয়া সাধুর স্বপ্ন দেখায়
তুমি হেথা রয়েছ কমলা দুঃখ পায়"

ইত্যাদি, শেষে সদাগর দেশে আসিয়া কন্যা-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্ত্রী ত্যাগ করতঃ কন্যাকে সুপাত্রের হস্তে ন্যস্ত করে। প্রতি রবিবারে কন্যা কিন্তু সেই অভীষ্ট দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে নাই। তিনি তাহার প্রভাবে,

"দূরের অভীষ্ট কার্য্য নিকটে আসি ঘটে
কাটা মরা জীয়াইতে পারে তাহান প্রভাবে'

শেষে সেই চণ্ডীর বরে—

"পঞ্চপুত্র পাইলা তিনি হৈলা ধনেশ্বরী"

প্রতি সপ্তাহের রবি বাসরীয় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ব্যতীত শনিবারে শনির পূজা হয়, তবে ইহা প্রত্যহ হয় না, ইহাতে সিন্নি তৈয়ার করা হয়, সিন্নি তৈয়ারের প্রণালী এই—

"সোয়া সের আটা সোয়া সের গুড়
কলা নারীকেল তায় দিবেক প্রচুর"

ফলশ্রুতিতে আছে—

শনি সেবা করি যেবা বাণিজ্যেতে যায়
* * বহু লভ্য পায়॥

শনির কোপ সহজ কথা নহে, অতএব শনি পূজাতেও অনেকের আশঙ্কা দৃষ্ট হয়। তাছাড়া নিত্য বিষ্ণু পূজা, গ্রহ পূজা, চণ্ডী পাঠ, স্বস্ত্যয়ন, ললিতা সপ্তমী, দুর্গাষ্টমী, তাল নবমী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, দীপ মালা, পঞ্চদ্বাদশী, সাবিত্রী ব্রত, প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান রমণীদের নিত্য ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। প্রতি পরিবারে কোন না কোন ব্রত বা পূজা যেন লাগাই রহিয়াছে। ভদ্র লোকেরা সহরে প্রায় বাড়ী করে নাই, মফঃস্বলে এই সব ধর্ম্মানুষ্ঠান এখনও সুফল প্রদান করিতেছে।

গান প্রভৃতি আমোদের মধ্যেও ধর্ম্ম ভাব রহিয়াছে। প্রবন্ধ অনেক বড় হইল, পাঠকগণ মাপ করিবেন। এইরূপ বিবিধ ভাব-সংঘের মধ্যে ধর্ম্ম যে উচ্চাসন পাইয়াছে, তাই আমার আনন্দ। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এতাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান না দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা অনেক ভাল, ইহা অনেকে স্বীকার করিবেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া মনসা পূজা হইয়া থাকে, আশ্বিন মাসে ঘট ও প্রতিমা, দুই রূপে দুর্গার পূজা হয়। আশ্বিনে আশ্বিন-কুমারীর ব্রত হয়। বৈশাখে বেলকুমারের ব্রত হয়।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বঙ্গের অপরাংশের লোকদিগকে কিছু আভাস দেওয়ার জন্য অনেক কথা লিখিলাম, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।

# শঙ্কর-মতে জগৎ সত্য না অসত্য ?

বিদেশীয় পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যকে যে বুঝিতে ভুল করিয়া থাকেন, তাহা কতকটা ক্ষমার্হ। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতেরাও যে শঙ্করকে বুঝিতে পারেন না কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। মায়াবাদ কথাটা কি এতই শক্ত যে, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারা যায় না? এই মায়াবাদ লইয়াই শঙ্করকে কত জনে কত দোষ দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মায়াবাদটা কি, শঙ্কর ও শঙ্করের মতের ব্যাখ্যাকারক টীকাকারগণ কি অর্থে এই মায়াবাদটা বুঝিতেন, আমরা তাঁহাদের উক্তি হইতে অদ্য তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম নিরবয়ব এবং সর্ব্ব প্রকার বিকারবর্জ্জিত। এই জগৎ সাবয়ব এবং বিকারী। ব্রহ্ম চেতন, শুদ্ধ, একরস। এই জগৎটা অচেতন, জড়, অশুদ্ধ এবং বিবিধ পরিণাম বিশিষ্ট। অথচ এ জগৎ ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত। নিরবয়ব, চেতন, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সাবয়ব, জড়, বিকারী জগৎ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহা একটা ইন্দ্রজালের মত বিস্ময়কর ব্যাপার, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কিন্তু তথাপি ইহার একটা মীমাংসা আবশ্যক। শঙ্কর ইহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন?

শঙ্কর ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ, দুই-ই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম না হয় জগতের নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার স্বতন্ত্র থাকিয়াই মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি দ্বারা ঘট নির্ম্মাণের কর্ত্তা হইয়া থাকে। ব্রহ্মও স্বতন্ত্র থাকিয়া, কোন উপাদান দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন,—একথাটা বুঝিতে কোন গোল হইতে পারেনা। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইবেন কিরূপে? যাহা উপাদান, তাহা জড়, বিকারী ও অচেতন। এ জগৎটাও জড়, বিকারী ও অচেতন। সুতরাং ইহা যাহা হইতে জন্মিয়াছে, সেই উপাদানটাও নিশ্চয়ই জড়, বিকারী ও অচেতন। ব্রহ্মচৈতন্য এরূপ উপাদান হইবেন কিরূপে? অথচ শঙ্কর ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন! শঙ্কর কি যাদুকর যে, তিনি অসাধ্য সাধন করিতে উদ্যত হইলেন?

শঙ্করের পক্ষে গত্যন্তর ছিলনা। তিনি শ্রুতিতে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ, উভয়ই পাইয়াছিলেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যেমন নিরবয়ব বলা হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্ম হইতে বিকারী, পরিণামী জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে —একথাও আছে। এই পরস্পর বিরোধী কথার একটা সামঞ্জস্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাই শঙ্করনামক যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে সেই সামঞ্জস্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! তাঁহার সামঞ্জস্য কি প্রকার?

শঙ্কর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রহ্মে একটা 'শক্তি' স্বীকার করিয়া ফেলিলেন! তিনি তখন জানিতেন না যে, এই শক্তি লইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কালের স্বদেশীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে "মায়াবী ময়দানব" বলিয়া নির্দ্দেশ

করিবে!—তাঁহাকে "বিকৃত ব্যাখ্যাকারক" বলিয়া উপহাস করিবে! আমরা তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে, তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতাম ;— আমরা তাঁহাকে বলিতাম'প্রভো! আপনি সন্ন্যাসী মানুষ ;—আপনার এ 'শক্তিকে' লইয়া কাজ কি ঠাকুর?' তাঁহার তৎকালবর্ত্তী শিষ্যেরা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন নাই, ইহা আশ্চর্য্য!! বরং আনন্দগিরি প্রভৃতি বড় বড় সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী শিষ্যবর্গ অবনত মস্তকে শঙ্করের এই শক্তিকে লইয়াই ব্যবহার সম্পন্ন করিয়াছেন! অত বড় বড় সন্ন্যাসীরা যাহাকে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না, তবে ত বোধ হয় যে 'শক্তি' ঠাকুরাণীর কোন দোষ নাই!! শঙ্কর নিজে এই শক্তিকে কি চক্ষে দেখিতেন? পাঠক বিরক্ত হইবেন না ; আমরা কিছু সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিব।

(১) "সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতনব্যাকৃত নামরূপসতত্বং সর্ব্বকার্য্যকরণ শক্তি সমাহার-রূপং অব্যক্ত মব্যাকৃতাকাশাদিশব্দবাচ্যং পর-মাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণি-কায়ামিব বটবীজশক্তিঃ" (কঠোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য)।

(২) "অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তি রব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী ......সা চ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ" (শারীরক ভাষ্য, ১।৪।৩)।

(৩) "সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেন। ..... পারমেশ্ব-র্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপ-ক্রমে অবগমাৎ" (শারীরক ভাষ্য, ১।৪।৯)।

পাঠক ক্ষমা করুন, আর উদ্ধৃত করিব না। প্রত্যেক উপনিষদের ভাষ্য হইতেও এই 'শক্তি' সম্বন্ধে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পাঠক দেখিতেছেন যে, এই জগদ্বিকাশের পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যক্ত শক্তিরূপে ব্রহ্ম-চৈতন্যে ওতপ্রোত ভাবে--একাকার হইয়া বর্ত্তমান ছিল, শঙ্কর এই কথাই বলিতেছেন।

এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। 'সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা-বিদ্যাকল্পিতে নামরূপে ...সংসার প্রপঞ্চ-বীজভূতে মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ..... তাভ্যামন্য ঈশ্বরঃ" (শারীরক ভাষ্য ২।১।১৪)।

টীকাকার আনন্দগিরি আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই পরিণামিনী শক্তিই জগতের প্রকৃত উপাদান কারণ; ব্রহ্মকে এই শক্তিদ্বারাই উপচার বশতঃ জগৎ-কারণ বলা হয়। "সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমব্যক্তং তস্য পরমাত্মপারতন্ত্র্যাৎ পরমাত্মন উপ-চারেণ কারণত্বমুচ্যতে, ন তু অব্যক্তবদ্বি-কারতয়া"।

শঙ্কর নিজে এবং টীকাকারেরা এই শক্তিকে অচেতন ও জড় বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শক্তি ব্রহ্মে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত, ইহাও শঙ্কর-শিষ্যবর্গের মত।

শক্তি পরিগ্রহ করিলে সংসারী লোকে-রাই যে কেবল গোলে পড়ে, তাহা নহে। সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা শক্তি স্বীকার করিলে, তাঁহাদের বিপদ আরো বেশী হয়। তাই, এখনও গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না। আরো গোল বাধিয়া উঠিল। মানিলাম, ব্রহ্ম এই শক্তিদ্বারাই জগতের কারণ। কিন্তু ব্রহ্ম ত অদ্বিতীয়; তাঁহাতে শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হইল। সুতরাং ব্রহ্মকেই উপাদান কারণ বলাও ঘটে

না। এ বিপদের উপায় কি নাই ? আমরা বলিয়াছি, শঙ্করাচার্য্য জবরদস্ত যাদুকর, এই যাদুকর এক ভেল্কী ছাড়িয়া, অন্য ভেল্কী দ্বারা লোকের চিত্ত-মোহনে বড়ই মজবুৎ। এবার, শঙ্কর কি প্রকার ভেল্কী প্রয়োগ করিবেন ?

ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিলে আর একটা গোল হয়। শঙ্করের ব্রহ্ম—সজাতীয়, স্বগত ও বিজাতীয় ভেদ শূন্য। যদি শক্তিই স্বীকার করা যায়, তবে তাহারই বা কি গতি হইবে ? শঙ্কর কোন্ যাদুবলে এ সকল আপত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ?

প্রথমতঃ, এই দুরূহ আপত্তি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার টীকাকারগণের উত্তর শুনাইব। আনন্দগিরি কঠভাষ্যের টীকায় শঙ্করের "বটকণি কায়ামিব বটবীজশক্তিঃ"—এই উক্তির ব্যাখ্যায়ে বলিতেছেন "ভাবিবটবৃক্ষ-শক্তিমদ্বটবীজং স্বশক্ত্যা ন সদ্বিতীয়ং কথ্যতে, তদ্বদ্ব্রহ্মাপি ন মায়াশক্ত্যা সদ্বিতীয়ং"। বীজে অবস্থিত শক্তিদ্বারা কি একটা বীজ দুইটা হইয়া যায় ? তদ্রূপ শক্তি-সত্ত্বেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। ঐতরেয় ভাষ্য ব্যাখ্যায় টীকাকার জ্ঞানামৃতের উত্তর আরো সুস্পষ্টতর। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন চেতন না থাকায় সজাতীয় ও স্বগতভেদ তাঁহাতে সম্ভব হয় না। কিন্তু শক্তি স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মে ত বিজাতীয় ভেদ রহিল। টীকাকার একথার দুইরূপে উত্তর দিয়াছেন। এক উত্তর এই যে, মায়ার অস্তিত্ব থাকিলেও তৎ-কালে মায়াশক্তির কোন ব্যাপার না থাকায় বিজাতীয়ভেদ রহিল না। "নমু জড়প্রপঞ্চস্য কারণীভূতা জড়া মায়া বর্ত্ততে ইতি কথং বিজাতীয়নিষেধ ইত্যত আহমিষদিতি।" অপর উত্তর এই যে, "অব্যক্তাবস্থায়াং মায়ায়া আত্মতাদাত্ম্যেনোক্ত্যা সাংখ্যাদিবৎ স্বতন্ত্রত্ব-নিরাসঃ"। অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মায়া-শক্তির স্বতন্ত্রতা না থাকায়, ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না। এইটীই প্রকৃত উত্তর। যখন শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হয়, যখন নানা বিকারাকারে শক্তির পরিণাম হয়,—তখনও বস্তুতঃ এই বিকারগুলির পৃথক্ সত্তা বা স্বতন্ত্রতা নাই। এই ভাবে টীকাকারেরা এই বিষয়টী বুঝাইয়াছেন।

এখন, এ বিষয়ে শঙ্করের আসল কথা কি, তাহা দেখা যাউক্।

শঙ্কর দুই প্রকারে এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেনঃ—

(১) এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে,—ইহা ব্রহ্মই।

(২) এই শক্তি সত্য নহে। এ শক্তি ব্রহ্মে কল্পিত।

প্রিয় পাঠক! এই দুইটী উত্তরের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। এ দুইটীর তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। ইহা হইতেই এ জগৎটা সত্য না মিথ্যা, তাহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। ইহা হইতেই শঙ্করের অভিপ্রায়টাও ব্যক্ত হইবে। সুতরাং আমরা এই দুই উত্তরে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি-তেছি।

শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বত্র বারংবার বলিয়াছেন যে, কারণ হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না; কার্য্য—কারণেরই রূপা-ন্তর। রূপান্তর হইলেই যে বস্তুটা একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে তাহা নহে। সুতরাং কার্য্য যাহা, তাহা কারণই। "কার-ণাৎ ব্যতিরেকেন অভাবঃ কার্য্যস্য" (শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৪)। "কার্য্যাকারোপি কারণ-

আত্মভূত এব,......নচ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তন্যত্বং ভবতি" (২।১।১৮)। সুতরাং শঙ্করের মতে, এই শক্তির ব্রহ্ম হইতে স্বাধীন সত্তা নাই ;—শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, —উহা ব্রহ্মই। জগদ্বিকাশের পূর্ব্বেও শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ছিল না ; জগদ্বিকাশের পরেও, এই কার্য্য-জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে। এই জন্যই, শক্তিকে ঐতরেয় ভাষ্যে 'আত্মভূত' এবং 'আত্মৈকশব্দবাচ্য' বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়াই, শক্তিদ্বারা ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইলেও,—ব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে জগৎ-কারণ। এই ভাবেই ব্রহ্মকে উপাদান-কারণ বলা হয়। নতুবা ব্রহ্মই যে জড়শক্তিতে পরিণত হন, তাহা নহে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ নহে বটে, কিন্তু কার্য্য হইতে কারণের পৃথক্‌সত্তার কদাপি ব্যাঘাত হয় না। "কারণং কার্য্যাদ্ভিন্ন-সত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নং।" "কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎ ভেদেপি অধিষ্ঠানস্য ততোভেদঃ।" অতএব পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্ম হইতে শক্তির পৃথক্‌সত্তা নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে নিত্য স্বতন্ত্র। অতএব, পরমার্থদর্শীর চক্ষে,—শক্তি এবং জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। শক্তি এবং জগৎ উভয়ই—ব্রহ্ম ; অর্থাৎ পরমার্থদর্শী শক্তিকে এবং জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই অনুভব করেন, —ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু ব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না ;—কেন না ব্রহ্ম এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্যই টীকাকার বলিয়াছেন,— "ন ব্রহ্ম তদাত্মকং অজড়ত্বাৎ, তৎ পরিহারেণাপি সিদ্ধিসম্ভবাৎ...কিন্তু আত্মতাদাত্ম্যেনৈব নামরূপয়োঃ সিদ্ধিঃ" (ঐতরেয় ভাষ্য টীকা)। সুতরাং এই বিকারী জগৎদ্বারা ব্রহ্মের নিরবয়বত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। *

তবেই আমরা পাইতেছি যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও তাঁহার শক্তিদ্বারা এই বিকারী জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। এই শক্তি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা তিনিই। অতএব ব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারিলেন। কেমন পাঠক, উত্তর হইল ত ? শঙ্করাচার্য্য কি কম যাদুকর !!

এখন, এই জগৎটা মিথ্যা না সত্য ? এ বিষয়ে যাদুকরটী কি বলেন ? পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারাই যাদুকরের মনের গতিটা অনেকটা টের পাওয়া গিয়াছে। তথাপি আর দুই একটী কথা বলা যাউক্।

শঙ্করাচার্য্য,—কল্পিত, অসত্য, মিথ্যা প্রভৃতি শব্দগুলি কিরূপ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই দিকে লক্ষ্য না করাতেই তাঁহাকে আমরা মায়াবাদের অপবাদ দিয়া থাকি।

আমাদের চক্ষে কি এ জগৎ অসত্য ? কদাপি নহে। শঙ্করও বারংবার বলিয়াছেন যে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এ জগৎ সত্য। ব্যবহারিক দৃষ্টি কাহাকে বলে ? যতদিন পরমার্থ-দৃষ্টি না জন্মিতেছে, ততদিনই ব্যবহারিক-দৃষ্টি থাকে। পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মিলে কি হয় ? তখন, এ জগতের ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রতা-বোধ থাকে না। পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলে, এ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ জন্মে। তখন আর সুখ-দুঃখে; হর্ষবিষাদে পীড়িত হইতে হয় না;—কেন না তখন

* এই জন্যই শক্তির বিকারে,শক্তিমানের বিকার হয় না।

সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদকে ব্রহ্মানন্দেরই বিকাশ বলিয়া ধারণা জন্মে। অজ্ঞানাবস্থায় এখন যেমন আমরা বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি,—পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলে বস্তুর এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ লোপ পাইবে; তখন বৃক্ষকে ব্রহ্ম-বোধেরই অনুকূলরূপে বোধ করা যাইবে। একথা শঙ্কর বারংবার বলিয়াছেন। পাঠক, এ কথায় কি জগৎ উড়িয়া যায়? জগৎ অলীক হয়? কদাপি নহে। তথাপি কেন লোকে শঙ্করকে দোষ দেয়, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য !!

পাঠক রত্নপ্রভা নামক বেদান্তভাষ্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারের সিদ্ধান্ত শুনুন :—

"বিকারো বস্তুতঃ কারণাদ্ ভিন্নো নাস্তি তস্মান্নৈব সঃ। বিকারস্য মিথ্যাত্বে তদ্‌ভিন্নকারণস্যাপি মিথ্যাত্বমিতি নেত্যাহ;—কারণং কার্য্যাদ্ ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ ভিন্নং" (১।১।৮)।

পরমার্থতঃ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়া কার্য্যকে 'অসত্য' (মৃষা) বলা যায়। জগৎই বল বা শক্তিই বল, ব্রহ্ম ভিন্ন ইহাদের কাহারই পৃথক সত্তা নাই; সুতরাং এ জগৎ পরমার্থদর্শীর চক্ষে 'অসত্য' বৈ কি? 'মায়ায়াঃ আত্মতাদাত্ম্যোক্ত্যা স্বতন্ত্রত্বনিরাসেন তত্র 'কল্পিতত্বং' সিধ্যতি" (ঐতরেয় টিকা)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মায়াশক্তির যখন স্বতন্ত্রতা নাই, তখন পরমার্থদর্শীর চক্ষে মায়া 'কল্পিত' বৈ আর কি হইতে পারে? কিন্তু যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি জন্মে নাই, তাহাদের চক্ষেও কি জগৎ অসত্য বা কল্পিত? কখনই নহে। পাঠকের নিকটে আমরা শঙ্করোক্তি উদ্ধৃত করিব। "সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতা-বিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ" (শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৪)। "ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনাং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্য আভা-বাৎ"। এই জন্যই, শঙ্করাচার্য্য এই বিকারী জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। এই জগৎকে ব্রহ্মদর্শনেরই উপায়রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—"যত্তত্র অফলং ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্ম-দর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে...... নতু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে" (বেদান্তদর্শন ভাষ্য, ২।১।১৪)।

শঙ্কর পরমার্থদর্শীর চক্ষে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষ্য পরমার্থ-দৃষ্টির প্রাধান্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পরিণামবাদকে বা জগৎকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শঙ্কর ও টীকাকারেরা যাহা বলেন নাই, লোক না বুঝিয়া, তাহাই তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় !! "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থে আমরা শঙ্করের এই সকল অপবাদ ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছি। ইহাই শঙ্করের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। যদি কেহ, ইহা শঙ্করের মত নহে, তাহা দেখাইতে পারেন, তবে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে।

শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়া-চরণে নম্রশির,
ডরিনা রক্ত ঝরিতে, ঝরাতে, দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর.
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির!

জননী মোদের জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী,
ঈপ্সিত-বর-অভয়-দাত্রী,
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর!

আবাহন যার—যুদ্ধ-ঝননে,
তৃপ্তি—তপ্ত-রক্ত-ক্ষরণে,
পশুবল আর অসুর দলনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্রাধীর!

সূর্য্য-খচিত অতুল আস্য,
নিরাশা-ধ্বান্ত-বিনাশি হাস্য,
রাতুল-চরণ দেব-উপাস্য
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল-স্থির!

কিরীট-দীপ্তি-ক্ষুব্ধ গগনে
দ্রুত-বিদ্যুৎ স্ফুরিছে সঘনে,—
যেন বা বহ্নি জলধি মথনে
জন্ম হতেছে জয়শ্রীর!

করে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি,
ভরিয়া আশীষে নিখিল সৃষ্টি,
সার্থক করি মানব দৃষ্টি,
রচি রোমাঞ্চ ধরিত্রীর!

গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য!—
উচ্ছ্বাস-ভরে স্তব্ধ বিশ্ব!—
ভরা বিশ্বাসে, শক্তি-শিষ্য,
ধরায় লুটাও স্বশরীর!

মায়ের আরতি, অরাতি-নাশন;
পদে অঞ্জলি, বাঞ্ছা-পূরণ;
দুর্থনিশিহরা সোণার বরণ
ঊষা জাগে শিরে হোমার্চ্চির!

মায়ের করুণা বড় নির্ম্মম,
আহুতি-তৃপ্ত হুতাশন সম;
হস্তে নির্ম্মল, দহন প্রথম,—
অন্তে বিশ্ববিজয়ী বীর!

কর পদাঘাত বিপদ-মাথায়,
ভর ধরাতল বিজয়-গাথায়,
হর হর হর!—বিঘ্ন কোথায়?—
শমন ভৃত্য জননীর!

দর্পে উড়িছে রক্ত নিশান;
ক্রূর বিজলি ঝলসে কৃপাণ,
নিদ্রা বিদারি সমর-বিষাণ
ঘোষে "দ্বিষো জহি" মথি সমীর!

অভয়োল্লাসে জননীদত্ত
হৃদে কল্লোলি ছুটুক্ মত্ত,
বহ্নি-সদৃশ শোণিতাবর্ত্ত
রক্ত আঁখিতে ভক্তি-নীর,—

স্বার্থ ও রিপু নির্দ্দয়ে দলি,
দাও যুগপৎ ও শ্রীপদে বলি,—
রুধির-ধারায় চরণাঙ্গুলি
রঞ্জি, লুটুক্ ছিন্ন-শির!
মাগো, জবার বদলে ছিন্ন শির!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

# সেকাল ও একালের চরকা

আমার বয়স নিতান্ত অল্প নয়। আমি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাটিয়ে দিলুম। আমি আমার বাল্য কালে ঠাকুর মায়ের কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, আগেকার ভদ্র লোকের মেয়েরা টেকো আর চরকায় সুতো কেটে বেশ এক রকম সুখ শান্তিতে সংসার চালিয়ে দিতেন। একটী পয়সাও সঞ্চয় না ক'রে যদি অপোগণ্ড ছেলে পুলে রেখে স্বামী ইহলোক থেকে চ'লে যেতেন, তাহ'লে সেই সকল বিধবারা ছেলে পুলেদের ডাক ছেড়ে অভয় দিয়ে বল্‌তেন, "ভয় কি বাবা! চরকা কেটে তোদের পার্শী পড়াবো, সংসার চালাবো, আর আমার অনন্ত ব্রতটী উদ্‌যাপন কোর্ব্বো।" তখনকার গুণপুরুষ কুলীনের ছেলেরা (প্রায়ই স্বকৃত ভাঙ্গা) অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, কেবলমাত্র কৌলীন্যের গর্ব্বে ধরাখানাকে শরা খানার মত দেখে পঁচিশটী, এমন কি, দু কুড়ি আড়াই কুড়ি পর্য্যন্ত বি' পূর্ব্বক 'বহ' ধাতু 'ঞ' কোরে ফেল্‌তেন। সেই বিয়ের রাত্রি ছাড়া অনেক স্থলে সেই সকল পত্নীদিগের সঙ্গে "মহারথী" কুলীন-কুল-পাবনদিগের প্রায়ই "চোখের দেখা" পর্য্যন্ত ঘটে উঠতো না। কিন্তু সেই সকল সাধ্বী কুলমহিলাগণ রাত দিন কেবল চরকা কেটে অনেক স্থলে বুড়ো মা বাপের অন্নের সংস্থান কারিতেন, ভাই ভগ্নী গুলিকেও খাইয়ে মানুষ করিতেন। আবার যদি কালে ভদ্রে কখনও সেই সকল বিবাহ-ব্যবসায়ী "ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগীরা" টাকা পয়সা আদায় করবার জন্যই পত্নীদের কাছে, শুক্লপ্রতিপদের চাঁদের মত, ক্রমে উপস্থিত হতো, তাহলে কায়মনোযত্নে সাত্বিক ভাবে স্বামীর সেবা ভক্তি কোরে মুটোভরে টাকা দিয়ে বিদায় করিতেন।

পাঠক পাঠিকা, এই স্থলে একটী ব্রাহ্মণ-বিধবার অধ্যবসায়ের কথা (যাহা ঠাকুর মায়ের কাছে শুনেছিলুম) বলিতেছি। এটী মন দিয়ে পড়িলেই বুঝতে পারিবেন যে, সেকালে আর একালে এদেশে কতদূর প্রভেদ হইয়াছে। প্রায় একশ বৎসর হইল, নদে জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামে (এখন গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণার সামিল হইয়াছে) হরিহর বাড়ুয্যে নামক এক গরীব কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কুলীনের ছেলে বলিয়া অল্প বয়সেই তাঁর একটী বিয়ে হয়। যথা সময় সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভে একটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মে। কন্যাটীর নাম মহাদেবী আর পুত্রটির নাম রামকুমার রাখা হইয়াছিল। ক্রমে মহাদেবীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। গরীব ব্রাহ্মণ একে পরিবারদের পেটের ভাত পরণের কাপড় জোগাড় করিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হন,তাহার উপর মেয়েটীর বিবাহের সময় উপস্থিত হওয়াতে একেবারে যেন দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণ ঠাকুর পুত্রীকে পাত্রস্থা করিবার অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া, অনেক জায়গায় বেড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকার জোগাড় করিলেন। টাকা যদি অনেক কষ্টে স্বষ্টে মিলিল, কিন্তু পাত্র মেলা ভার

হইয়া উঠিল। শেষ কালে অনেক অর্দ্ধশতাব্দীদর্শী এক "মহারথীর" সঙ্গে যুগৈকবর্ষীয়া মহাদেবীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু বিবাহের মাস কতক পরেই মহাদেবী বিধবা হইলেন। সেই সময় থেকে তিনি পল্লীর মধ্যে "দেবী বামুণী" বলিয়া পরিচিতা হইলেন। মেয়েটীকে বিধবা হইতে দেখিয়া, নিদারুণ শোকতাপে কাতর হইয়া মহাদেবীর প্রসূতি অতি অল্প দিনের মধ্যেই গতায়ুঃ হইলেন। সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের পর, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী বৎসর মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। এক্ষণে পাঠিকা মহাশয়া ও পাঠক মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন, মাতৃপিতৃহীন হইয়া রামকুমার ও মহাদেবীর কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিল! তখন মহাদেবী সংসার-জ্ঞান-শূন্যা ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, আর রামকুমারের বয়স নয় বৎসরের বেশী হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাদেবী সংসার-ধর্ম্মের কিছুই জানেন না; কেবল নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতে জননীর সাহায্য করিয়া করিয়া কাট্‌না কাটিবার বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর রামকুমার দুই বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, দশটী খেজুর গাছ, আর একটী বক্‌না বাছুর রূপ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। মহাদেবী রোরুদ্যমান্ ভাইকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"ভাই, তুমি ভয় পেয়ে বুকভাঙা হোয়ে পোড়ো না। আমি সূতো কেটে আমাদের দুই ভাই বোনের পেট ভরাতে পার্ব্বো। তুমি এখন বক্‌না বাছুরটী যত্ন কোরে পালন কর। এটী দুধ দিতে আরম্ভ কোল্লে আর আমাদের কোনও কষ্ট থাকবে না"।

সেই অবধি মহাদেবী দিবারাত্র চর্‌কা কাটিতে আরম্ভ করিলেন, আর রামকুমার গো-পালনে মন দিল। ক্রমে গ্রামের কোনও সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহিণী রামকুমারের উপনয়ন দেওয়াইলেন। এইরূপে রামকুমার 'বামুণ' হোয়ে পল্লীর চারি পাঁচ বিশিষ্ট কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণের ঘরে শালগ্রাম শিলার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুর সেবার ছোলা কলাতেই ভাই বোনের ভাল রকম জলযোগ হইতে লাগিল। আর এক ঘর ব্রাহ্মণের ঘরে ঠাকুর পূজা করিয়া প্রতিদিন যে আধসের আন্দাজ আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য পাওয়া যাইত, সেই আলোচালগুলিতেই বিধবা মহাদেবীর এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান হইয়াছিল। এই রকমে দশ বৎসর গত হওয়ার পর, কোনও আকস্মিক রোগে মহাদেবীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে সেই দেবী প্রকৃতি বিধবা, স্নেহের ভাই রামকুমারকে বলিলেন,—"এই ঘরের দক্ষিণ কোণ খুঁড়িলেই তুমি কিছু টাকা পাইবে। দেখিও ভাই, সে টাকাগুলি যেন জুওচোরে ঠকিয়ে না নেয়, অতি সাবধানে রাখিবে; আমি অনেক কষ্টে টাকা গুলি সঞ্চিত কোরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর, তুমি একটী বিবাহ কোরো এবং এই টাকা গুলির অল্পই বার কোরে নিয়ে চাস বাস কোত্তে আরম্ভ কোরো, তাহ'লে অনায়াসেই তোমার ভাত কাপড় জুটে যাবে।"

এই মাতৃস্বরূপা জ্যেষ্ঠা সহোদরার মৃত্যুর পর, রামকুমার শোকে দুঃখে মাসাবধি শয্যাশায়ী হইয়াছিল। শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইবার পর, মহাদেবীর আদেশমত রামকুমার একদিন ঘরের দক্ষিণ কোণ গুপ্তভাবে খুঁড়িয়া তিনটী খেজুরে গুড়ের পুরাণো নাগরী

পাইল। তার পর, তার মুখের ঢাকা খুলে দেখিল, সেগুলি টাকায় পরিপূর্ণ! একাল পর্যান্ত রামকুমারের বর্ণপরিচয় হয় নাই; অন্য কথা কি, সে একশত অবধি গণিতে পারিত কি না সন্দেহ। কেবল ভগিনীর কাছে গণ্ডা, বুড়ী,পণ গণিতে শিখিয়াছিল। সেই প্রকারে টাকাগুলি গণিয়া দেখিল যে, ভগিনী উনিশ পণ এক গণ্ডা এক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। রামকুমার সেই টাকা হইতে একপণ মাত্র বাহির করিয়া লইয়া বাকী টাকাগুলি আবার নাগ্‌রীতে পূরিয়া পুতিয়া রাখিল। সেই এক-পণ টাকায় খেজুরে গুড়ের ব্যবসায় করিয়া রামকুমার অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিল।

রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বড় মানুষ হইয়া উঠার উপায় একমাত্র চর্‌কা। সেই চরকা কাকে বলে, এই স্বদেশী আন্দোলনের কিছু আগে, কলিকাতা অঞ্চলের বড় মানুষের মেয়েরা দূরে থাকুন, গৃহস্থঘরের বৌ ঝীরা অবধি কিছু জানিতেন কি না সন্দেহ! যে সূতা কাটিয়া এই বাঙ্গালা দেশের কত হাজার হাজার লোকের গুজরাণ চলিত, বিলাতী সূতার আম্‌দানী আরম্ভ হওয়া অবধি সেই ব্যবসায় একেবারেই যেন লোপ পেয়ে গিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের টাট্‌কা টাট্‌কি উত্তেজনার সময় লোকের ঘরে ঘরে চরকার আমদানী হওয়ায়, বিশেষতঃ আমাদের কুললক্ষ্মীদের কার্পেট ফেলিয়া একেবারে চরকায় সূতা কাটিতে উদ্যত দেখিয়া,আমাদের মনে কতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভেবেছিলাম,—আর কি! এইবার হইতে আর এ দেশের ত্রিসীমানায় বিলাতী সূতা ঘেঁসিতে পারিবে না। দেখিতে দেখিতে আবার এই চরকার সূতায় ঢাকাই মস্‌লিন অবধি তৈরি হইতে আরম্ভ হইবে। ওমা! আমাদের সেই আশালতার অঙ্কুর না গজাইতে গজাইতেই চুঁয়ে পুড়ে গেল। হুজুকে পড়িয়া গৃহলক্ষ্মীরা কাট্‌না কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে,তার পর "কে বাপু! অত ঝুকি সয়!" সুতরাং সেই বড় সাধের চরকা—একদিন যার শুইবার ঘরের সুন্দর টেবিলের উপর স্থান হইয়াছিল, এখন তাহা মরিচা ধরিয়া কাঠ কয়লার ঘরের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। আর মাকড়সারা তাতে মনের সাধে জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

আমরা খুব সজোরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমরা বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ ইউরোপীয়দের তৈরি কোনও জিনিস ব্যবহার করিব না। সেই জন্যে আমরা প্রধানতঃ বিলাতী কাপড় পরা ছাড়িয়া দিয়াছি। দেশী তাঁতের—দেশী মিলের কাপড়ই পরিতেছি। কিন্তু সেই সমস্ত কাপড়ের সূতার জন্য বিদেশীয়মুখের দিকেই আমাদিগকে পূরা মাত্রায় চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে। আজ যদি বিদেশীয়েরা বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা, আমাদের মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে, ভারতবর্ষীয়দিগকে আপাততঃ কিছুদিন আমাদিগের কলের তৈরি সূতা ও কাপড় বোনার কল কবজা বিক্রয় করিব না, তাহা হইলেই ত আমাদের চক্ষুঃস্থির! তাহা হইলে আমাদের হাওয়ার প্রতিজ্ঞ হাওয়াতেই উড়িয়া যাইবে কি না, পাঠক পাঠিকাগণ একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের মা লক্ষ্মীদের বলি যে আপনারা কার্পেট টার্পেট ফেলিয়া দিয়া সেই "দেবী বাম্‌নীর" মত মন দিয়া ভাল কোরে কাট্‌না কাটিতে আরম্ভ করুন। দরকার কি আমাদের বিলাতী কলের বিলাতী সূতাতে?

আমাদের ছেলেবেলা ত আমরা বিলাতী কাপড় কিম্বা বিলাতী সূতায় বোনা এখনকার মত দেশী কাপড় পরি নাই। সে সব কাপড় ঐ কাট্‌না কাটার সূতাতেই হইত—আর এখনকার 'বর্গীদের' মিলের কাপড়ের অপেক্ষা ঢের শস্তাও ছিল। এখনও তা খুব হইতে পারে, মা-লক্ষ্মীরা আবার যদি কাট্‌না কাটায় মন দেন, আর কাট্‌না কাটাকে "ছোট লোকের কাজ" মনে না করেন। এই কাট্‌না কাটার সূতাতেই তখন বাঙ্গালার ভিতর শান্তিপুর, কাল্‌না, কৃষ্ণদ্বীপপুর, সিঙের কোণ, বোড়াই, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা, বরাহনগর, কলিকাতার সিম্‌লে প্রভৃতি স্থানের—বিশেষতঃ সকলের চেয়ে ঢাকা অঞ্চলের কাপড় বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। শান্তিপুরের কাপড়ের থান-কাপড় ইউরোপের নানা স্থানে রপ্তানী হইত। ঢাকার সুবিখ্যাত "জগন্নাথ মস্‌লিলে" যে রোমীয় সম্রাট্ পত্নীদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত, এ কথা কে না জানেন? সে সব সূতা কলে তৈরি হইত না—এদেশের তূলায় আর এদেশের মেয়েদের কাট্‌না কাটার সূতাতেই তা বোনা হইত; তবে তা এখন বোনা হইবে না কেন?

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বদেশী আন্দোলনের গরম্ গরম্ ভাবের সময় লোকে যখন বিলাতী আলু, বিলাতী কুম্‌ড়ো, জাহাজী সুপারির অবধির সংস্পর্শ ছাড়িয়া দিলেন, যখন আমাদের সব মা লক্ষ্মীরা হাতের পশম ও নবেল ছুঁড়ে ফেলেটেলে দিনরাত চরকা ঘুরাইতে লাগিলেন, এই জাত্যভিমানীদের দেশের যখন দেশশুদ্ধ লোক অর্থাৎ টোলের ভট্টাচার্য্য হইতে 'মধো' বাগ্‌দীর নাতি রামচন্দুরে পর্য্যন্ত তাঁত বুনিতে মন দিল; অন্য কথা কি, কোনও কোনও বড় ঘরের বড় বড় কবি, তাঁহাদের "কমলাকান্ত পদাবলী" লেখা ফেলিয়া রাখিয়া, কবিত্বের "গহন-কুসুম-কুঞ্জবন" থেকে বাহির হইয়া এত সাধের ব্রাহ্মণত্ব অবধি "জাহ্নবী যমুনা"তে ডুবাইয়া রাখিয়া বোঁকা তাঁতী সাজিতে লালায়িত হইলেন; বলিতে কি, সেই সব নব-যুগের নূতন ধরণের সখের যুগী জোলাদের তাঁতের ঠক্‌ঠকানীতে যখন লোকের কাণ ঝালাপালা হইতে লাগিল, তখন আমাদের মনে কতই আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছিল। বাস্তবিকই তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই বার সব ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকিবে, আর জগতের লোক আমাদের ক্যারামত দেখিয়া—বিশেষতঃ আমাদের বক্তৃতার তরঙ্গ-খাইয়া তুফানে নাকানী চোপানী খবরের কাগজে "নিধিরাম সর্দ্দারদের" লেখার ভণিতা পড়িয়া, অবাক্ হইয়া বলিতে বাধ্য হইবেন যে, হাঁ! বাঙ্গালী "শ্রীযুতদের" যে কথা, সেই কাজ বটে! ও মা! তার পর কোথা গেল সেই সব আলোক-প্রাপ্ত তাঁতী! আর কোথায় বা লুকাইল তাঁদের সখের তাঁত! এই সব দেখিয়া শুনিয়াই ত কবি লিখিয়াছেন—

"আমরা বক্তৃতায় যুঝি,
আর কবিতায় কাঁদি;
কিন্তু কাজের বেলায় কেবল ঢুঁঢুঁ!"

শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

# ভূপেন্দ্রনাথ।

(১)

ধন্য তুমি হে ভূপেন্দ্র, ধন্য তুমি আজ,
তোমা লাগি ওই শোন শঙ্খ উঠে বাজি
মায়ের মন্দিরে। দুর্দ্দিনের অমানিশা
মেলিয়াছে কৃষ্ণপক্ষ তার ; তাই দিশা
হারায়েছি সবে। শব্দ নাই সাড়া নাই,
আশা নাই কোন। হে অগ্রণী-দূত, তাই
এলে তুমি, কণ্ঠে নিয়ে এ উদাত্ত বাণী,
হস্তে ধরে ভবিষ্যের দৃপ্ত-ধ্বজা খানি।

যে পথে বাহির হ'লে ওগো মহাপ্রাণ,
সেত নয় কুসুমে কোমল। পরিত্রাণ
খুঁজে নর যুগে যুগে এই পথে ধায় ;
মহা দুঃখে করিয়া অর্জ্জন ছুটে যায়
উন্মাদের মত। গাত্রে ধূলি, চক্ষে নীর,
ছিন্ন আবরণ, তবু তারা রহে স্থির
নির্ভীক নির্ম্মম। অতীতের কত পান্থ
গেছে এই পথে, কত বাধা ছিল, ক্ষান্ত
তবু হয়নিত তারা! তারাত ছিল না
কভু অক্ষম দুর্ব্বল, অপরে দিলনা
বলি শুধু অশ্রুজল ফেলেনিত তারা ;
এ পথের ধূলি তাই আজো বহ্নি ভরা,
ক্ষুরধার শাণিত দুর্গম। সনাতন
রীতি এই —আসে নেমে আঁধার ভীষণ
প্রতিপদে কুশাঙ্কুর বাজে। এই পথে—
স্বামী যায় ভার্য্যারে ফেলিয়া। রাজ্য হ'তে
রাজপুত্র ছুটে আসে ; কি আগুনে জ্বলে!
কুণ্ডল কিরীটদণ্ড নিক্ষেপি ভূতলে!
হে পথিক এই সেই পথ ; নাই ভয়
নাই মৃত্যু, তাই বসে গাহি তব জয়।

স্তব্ধ চরাচর। ঝটিকার পূর্ব্বাভাস
কোথায় দেখিলে তুমি ? ঘন নীলাকাশ,
অন্ধ মোরা কিছু নাহি বুঝি, কোন দিকে,
আরো কতদূরে ? ওগো কি অদৃষ্টে লিখে
কে পাঠাল কারে ? এযে আঁধার শ্মশান,
শুধু মৃতের কঙ্কাল, বাজায়ে বিষাণ,
জ্বালিয়ে মশাল তার এল কি পাগল ?
প্রকট সংহার লীলা,—পিশাচের দল।
ধর্ম্মেরে করিয়া দূর, সত্যেরে করিয়া
ম্লান, ন্যায়ের আসনে বসেছে জুড়িয়া
ওই গর্ব্বে অন্ধ অত্যাচার। তারি পাশে
চোরের মতন (উর্দ্ধে দেবতারা হাসে)
আসিয়া দাঁড়ালে তুমি, হে বন্দী নূতন!
নহ, নহ হে সন্ন্যাসী, হে রিক্ত ভীষণ,
বিশ্বের দুয়ারে কভু বন্দী নহ তুমি,
তোমা তরে আছে মুক্ত সে উদার ভূমি।
রাজা হ'তে রাজা যিনি, দণ্ডে কাঁপে ভব ;
হে বরেণ্য তাঁর কাছে বহু মান তব।
সত্যরে বলেছ সত্য ; নিখিলের কাছে,
তাই সে যে গন্ধে মাল্যে পূর্ণ হয়ে আছে।
ওরে লোহার নিগড়, বাঁধিতে কি চাও ?
প্রভাত যে হয়ে এল, অনন্তে উধাও
হয়ে উড়িবে যে পাখী, কণ্ঠ যার শূন্য
ব্যেপে' ফিরিবে কাঁপিয়া ; দিবে গড়ে পুণ্য
যার, মহাভাগ্য পতিত জাতির ; তার
তরে নাইরে বন্ধন, নাই কারাগার।

হে ভূপেন্দ্র, সিংহ সম উত্তরিলে যবে
সহস্র নপুংস মাঝে,—কি শুনিল সবে!
"মাতৃভূমি কল্যাণ আশায়, সত্য যাহা
বুঝিয়াছি মনে, সত্যই করেছি তাহা।"
কি সরল সহজ উত্তর! মর্ম্ম মাঝে
বিপুল ঝঙ্কার, কি গম্ভীর বাজে।

এযে ওগো জীবিতের ভাষা, কোথা পেলে
তুমি? হে অমর প্রাণ, প্রাণ তাই ঢেলে
দিলে আকুল আগ্রহে। মুহূর্ত্তের তরে
বিচার আসন কাঁপেনি কি শঙ্কাভরে?
মিথ্যা কি পায়নি লাজ আপনার মনে;
ছুটেনিকি ও নির্ঘোষ ভৈরব গর্জ্জনে
সিন্ধুপারে? স্বর্গে বাজেনি দুন্দুভি কিরে,—
মর্ত্ত্যে উঠেনি রোমাঞ্চ—জাতীয় শরীরে?
আছে—আছে, রহিয়াছে নিগূঢ় বারতা,
এর মাঝে শতাব্দীর অকথিত কথা।
সত্য যবে মাথা তুলে প্রতিষ্ঠার তরে,
জগতের কোন শক্তি নারে রোধিবারে।

জ্বাল, জ্বাল, যে হোমাগ্নি জ্বেলে দিলে আজ
সেত কভু নিভিবার নয়। নাশি লাজ
ক্ষুণ্ণ অতীতের, কা'ল সে যে ভাত হবে
প্রদীপ্ত শিখায়;—তারে হেরি বিশ্বরবে
বিস্ময়ে চাহিয়া। পূণ্যভূমি বসে আছে;
ঝঞ্জনা বাজিয়ে বীর, চল তার কাছে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

(২)

দেব,
জ্যোতির্ম্ময় তেজপুঞ্জ
মূরতি মোহন,
সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল
কান্তি সুশোভন।
বীরতা ধীরতা ধৈর্য্য
সর্ব্ব গুণাধার,
লভেছ অক্ষয় কীর্ত্তি
পথ অমরার।
আজ লভিয়াছ যেই যশঃ
পূর্ণ প্রতিভায়,
সমস্ত ভারত ব্যাপি
সে শোভা ছড়ায়।
পরিয়াছ লৌহ-হার
শোভন সুন্দর,
উঠিতেছে তাই হের
জয় জয় স্বর।
ধর দেব ধর ধর
শৃঙ্খলিত ভার।
শুভাশীষ মাথা ওযে,
পূত অলঙ্কার।
তোমার জীবন হের,
মোহন সৌরভ,
আনিছে বহিয়া দুর,
স্বরগ বিভব।
তুমি দেব পূর্ণকাম,
লভিয়া অভীষ্ট স্থান।
মোরা হব পূর্ণ দেব,
তোমায় স্মরিয়া।
হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি
উঠিবে জাগিয়া।
লুক্কায়িত যেই বহ্নি
ছিল ভস্মাবৃত,
উৎসাহ-ইন্ধনে তব
হলো প্রজ্জ্বলিত।
তুমি দিলে যেই পথ
নিজে দেখাইয়া,
সহস্র হৃদয় তাহা,
লইল ধরিয়া।
প্রাণ হতে প্রিয়তম
'মরণ' সে আজ,
অত্যাচারী অত্যাচারে
নাহি কোন লাজ।
সহস্র হৃদয় ভেদি
উঠিছে উচ্ছ্বাস।
এক হতে সংখ্যাতীত
হইয়া উত্থিত।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব
করিবে স্তম্ভিত।
বসুধার বুকে বুকে,
তব জয় গীতি।
ধ্বনিয়া উঠিছে শুনি,
পুলকিছে হৃদি।
আনন্দে কম্পিত করি
সহস্র হৃদয়।
কে তুমি উদিলে আসি
মঙ্গল উষায়।
(আজ) শুভাশীষ প্রীতিমাখা,
জয়মাল্য গলে,
হে দেব ফিরিয়া এস
মায়ের কুটীরে।
অভীপিত দেব সম
পূজিব তোমায়
নিয়ত জাগিবে তুমি
সবার হিয়ায়।
শ্রীচিন্ময়ী রায়।

(৩)

হৃদয়ে আসীনা যার কান্তি-কিরীটিনী,
প্রদীপ্ত প্রতিভাময়ী বিশ্ব বিমোহিনী
স্বাধীনতা,—কোথা ভয় তার!
ডরে কি শমনে শিশু পেলে কোল মার?
ভাঙ্গি যদি হিমগিরি মস্তকে তাহার
নাচায় তরঙ্গ সঙ্গে ঘোর পারাবার,
খসে যদি ভীম দরশন
উগারি' অনলরাশি বজ্র বিভীষণ;
অথবা উড়ায় শূন্যে ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন
ছিন্ন দ্রুম পত্র সম পরশি' গগন,
আছড়য়—অকম্পিত বেগে
অম্বর-চুম্বিত-ভাল ভীম-শীল-হৃদে।
অভয়া বরদা যার কোথা ভয় তার?
অচল অটল সদা জিনি গিরিবর,
ঊর্দ্ধদৃষ্টে—হেরে মাতৃরূপ;
ফুৎকারে উড়াতে আশা শত শত ভূপ।
লভিতে "ভূপেন্দ্র' নাম জগত-বিজয়ী,
আচমি' রুধির স্রোতে পূজি কীর্ত্তিময়ী,
মুণ্ডমালা—সপি মাতৃগলে;
যাচিবে খড়্গ মার; জাগি বন বলে—
স্থাপিতে শান্তির রাজ্য, করিয়া মোচন
দুখিনী তাপিনী মার কঠিন বন্ধন;—
প্রক্ষালিতে হৃদয়-বেদন,
দিয়া লোল-রক্ত-বারি কস্তুরি চন্দন!
ধর্ম্মপথ কণ্টকিত—দুর্গম ভীষণ;
রোধে পথ শত ভীতি—ভীম দরশন;
তাই আজ—"ভূপেন্দ্র" ভূষণ
অবিচার, অত্যাচার সহে অনুক্ষণ!
তাই আজ—দেখ চেয়ে বঙ্গ-সুত-গণ!
হাসিমুখে—যায় কারাগারে,
প্রভাত তপন যেন অস্তাচল-চুড়ে।
দীপিছে ললাটে যেন মধ্যাহ্ন তপন,
জ্বলিছে উজল আঁখি উছলি কিরণ;
হৃদিস্থল—প্রশান্ত সাগর,
পুণ্যক্ষেত্র, বীর্য্যভূমি দয়ার আকর।
দলিয়া চরণ তলে ইংরাজ বিচার,
দেখাইতে জগজনে মাতৃভক্তি সার,
দেখাইতে—ধর্ম্মের গরিমা;
যায় বীর হাসিমুখে কিবা মধুরিমা!
যাও বীর! পদস্পর্শে তুচ্ছ কারাগার
হউক পবিত্র-ক্ষেত্র পুণ্য-ভূমি-সার!
তব পূত-পদ রজ কণা
জাগাক্ কারার হৃদে স্বর্গীয় বাসনা;
জানিও বীরেন্দ্র স্থির, লাঞ্ছনা রবির
পামর রাহুর হস্তে, পদ্ম-পত্রে নীর!
যথা পুনঃ বিমল প্রভায়
তপন তরল রশ্মি-জগত ভাসায়;
তেমতি উদিবে পুনঃ ভারত-গগনে,
প্রক্ষালিয়া নরনারী তোমার কিরণে
ভীতিছায়া—দরশ-বিষম্;
গাহিবে গগন ভেদি "বন্দেমাতরম্"!

শ্রীত্রিগুণাচরণ বসু।

# ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

## প্রথম প্রপাঠক।

### প্রথম খণ্ড

ওঁ। নমঃ পরমাত্মনে। ওঁ হরি। ওঁ

ওঁ এ অক্ষর কর উপাসনা
এ অক্ষর কর গান। ১
উপাসনা হয় মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে
গানে হয় উচ্চ তান। ২

সর্ব্বভূতের রস † এ পৃথিবী
পৃথিবীর রস জল
জলের ওষধি, ওষধির রস
হয় পুরুষ নিষ্কল।
পুরুষের বাক্, বাক্য-রস ঋক্
ঋক্ রস হয় সাম,
সামের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের
উদ্গীথ পরিণাম। ৩।

এই যে উদ্গীথ, শ্রেষ্ঠ রস ইহা
পৃথিবী হ'তে অষ্টম *
উদ্গীথ ওঁকার পর † অর্দ্ধ ‡ ইনি,
পরমাত্মা স্থান সম। ৪।

ঋক্ বলে কা'রে? সাম উদ্গীথ কি?
তাহাই বলিব এবে। ৫।
ঋক্ হয় বাক্য, সাম হয় প্রাণ,
উদ্গীথ ওঁকার—রবে।
বাক্ আর প্রাণ হতে ঋক্ সাম,
দুই হ'তে দুই হয়। ৬।

এই দুই মিথুন ওঁকারে মিলিত
তাহে সর্ব্ব উপচয়।
ওঁকাররূপী বাক্য আর প্রাণ
আত্মাতে সঙ্গত হ'লে,
উভয়ের আশা, পরিপূর্ণ হয়,
সর্ব্ব সিদ্ধি তাহে ফলে। ৭।

ওঁকার অক্ষর, জানেন যে জ্ঞানী,
পূর্ণ তাঁর সর্ব্ব কাম।
তাই ওঁকারে কর উপাসনা,
উদ্গীথ পরিণাম। ৮।

এই ওঁকার অনুজ্ঞা অক্ষর,—
ওজনে অনুজ্ঞা সিদ্ধি,
ইঁহার ভজনে সিদ্ধ হয় সদা
সাধকের সমৃদ্ধি।
যে জন ইঁহারে জানেন বিধান
পূর্ণ তাঁর সর্ব্ব কাম।
তাই ওঁকারে কর উপাসনা
উদ্গীথ পরিণাম। ৯।

ওঁ উপাসনা ত্রয়ীবিদ্যা * মূল,
ওঁকার শুনিবে তাই।
ওঁকার স্তুতিবে, ওঁকার গাইবে,
ওঁ-এর সমান নাই।
ওঁ-এর প্রভাবে রস হয় জাত, †
এ তত্ত্ব জানেন যিনি,
তিনিই বিদ্বান সর্ব্বসিদ্ধি লাভ
করেন জগতে তিনি। ১০।

জানেন অথবা না জানেন, তবু ‡
করেন যোগস্থ কর্ম্ম,
বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান,
এই ত ইহার মর্ম্ম!—
জ্ঞান সহ কর্ম্ম হয় বলবান,
সমধিক ফল তাহে।
জ্ঞানের অভাবে করম দুর্ব্বল,
কিন্তু নিষ্ফল নহে।
জ্ঞান কর্ম্ম দুই-ই হয় ওঁ-এর মহিমা,
উদ্গীথ ওঁ এর ব্যাখ্যা কর উপাসনা॥ ১১।

ইতি প্রথম খণ্ড॥

শ্রীশশধর রায়।

† উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

* পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্য, ঋক্, সাম, উদ্গীথ...এইরূপ পর্য্যায়ে গণনা করিলে পৃথিবী হইতে গণনায় উদ্গীথ অষ্টম হয়।

† পর = শ্রেষ্ঠ।

‡ অর্দ্ধ = স্থান।

* ঋক্, সাম, যজু, এই তিন বেদ-বিদ্যা।

† ওঁ দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে ব্রীহি যবাদির রস স্বরূপ হবিঃ উৎপন্ন হয়; ব্রীহি যবাদিই অন্ন, তাহা হইতে প্রাণ উদ্ভূত হয়। এইরূপ ওঁকার হইতে রস ও প্রাণ জাত হইয়া থাকে।

‡ তথাপি।

# বীরপূজা। (১)

ব্যক্তির জীবনের মত জাতির জীবনেও ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জীবের জন্ম হয়—কৈশোর যৌবন জরায় সে অনেক কাজ করে, অনেক চিন্তা করে, তারপর মরিয়া যায়। জীবনে মরণে, অভ্যুদয়ে পতনে, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার বিশেষত্বের বিকাশ হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। যে উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্টি, লোকসমাজের জন্য যে কর্ম্ম ও চিন্তা করার ভার তাহার উপর ন্যস্ত, পৃথিবীর যতটুকু কাজ করিতে সে উপযুক্ত, সেই পরিমাণ কাজ করিতে পারিলেই, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য সফল হয়। এইরূপে নানাপ্রকার কাজ করিয়া, তাহার মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ করিতে হইলে তাহাকে অশেষ ঘটনা ও কার্য্যাবলীর মধ্যে পড়িতে হয়, কোন সময় ফললাভ কিছু বেশী, কোন সময় হয়ত কম। কিন্তু দিনের পর দিন, অবস্থার পর অবস্থা, সুফলের পর কুফল, অসুবিধা সুবিধা, বাধা বা সাহায্যের ভিতরেই ক্রমশঃ তাহার কর্ম্মের শেষ হয়। জাতীয় জীবনেও ঠিক সেই ভাব। এক এক জাতি অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, এক এক সময়ে এক এক প্রকার কাজ করিয়া, সমগ্র লোকসমাজের, সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যে তার যতটুকু দান করিবার আছে, ততটুকু দান করিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সফলতার পরিচয় দেয়। এই বিশেষত্ব বিকাশেই জাতীয়-জীবনের সার্থকতা এবং ভগবানের অসীম ঐশ্বর্য্য ও মহিমার পরিচয়। তবে এই শেষ লক্ষ্যসাধনের পথে অনেক দুর্যোগ সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই জন্য পৃথিবীতে জাতির উন্নতি অবনতি। কিন্তু যে অবস্থাই হউক্, শেষ পর্য্যন্ত জাতিগত চরিত্রেরই বিকাশ হইতেছে। ভগবান্ যে জন্য যে জাতিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারই সমাধা হইতেছে। বেষ্টনীর প্রভাবে বা পারিপার্শ্বিক যত শক্তি ও ভাবসমষ্টি আছে, তাহাদের অনুকূলতায় বা প্রতিকূলতায় স্বকীয়-শক্তির যে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহাও বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মেই। তাই জীবের জীবনের মত মরণেও, সমাজের অভ্যুত্থানের মত অধঃপতনেও ভগবদিচ্ছারই কাজ হইতেছে। মৃত্যুতেই পুনর্জ্জীবনের বীজ রহিয়াছে, মানুষ মরিয়াই বাঁচিতেছে, পুনরায় নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া, নূতন উদ্যম ও নূতন সাহসে সেই জীবন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। সেইরূপ সমাজও এক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, নূতন কলেবরে সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত জীবনের কর্ম্ম শেষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অথচ অপরাপর সমাজকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়া তাদের দ্বারা কর্ম্ম-সূত্রের দীর্ঘতা বৃদ্ধি করিতেছে। অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, অনুষ্ঠানেরই রূপান্তর দেখা যায়, ভাবের লয় হয় না। চিন্তা অবিনাশী। যে কর্ম্মের মধ্যে ইচ্ছা বা চিন্তা প্রবেশ করিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, অথবা যে উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নিজকে প্রকাশিত

করে, সেই কর্ম্ম বা উপলক্ষ, সেই আন্দোলন বা সেই প্রতিষ্ঠানেরই ধ্বংসে এবং বিস্তৃতিতে, উন্নতি এবং অবনতিতে, উভয়েই ভগবানের শক্তির এবং ইচ্ছার সফলতা। অনন্ত মঙ্গলময়ের বিধানে মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র, অমঙ্গলজনক নয়। ব্যক্তির জীবনীর মত, জাতীয় চরিত্রের ইতিহাসেরও এই উপদেশ। উন্নতি অবনতি, পতন উত্থানের মধ্যে সমাজ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

সমাজ-জীবনের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। জাতিগত চরিত্রের উন্নতি অবনতি, চিন্তা ও কর্ম্ম স্রোতের পরিবর্ত্তন, ভাবগঙ্গার জোয়ার ভাটা, সামাজিক জীবনের অশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন,প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান, ভাষা বা সাহিত্যের বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মসমাজ বৃদ্ধি অথবা অজ্ঞান, অন্ধকার, অধর্ম্ম,অত্যাচার,দারিদ্র্য,দুর্ভিক্ষ, প্রজাপীড়ন, রাজ্যধ্বংস প্রভৃতির কাহিনী যে ইতিহাস,তাহা একপ্রকার নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ইতিহাসের বিষয়ীভূত এই নানা রকমের অবস্থার মধ্যে, নানা রকমের কাজের মধ্যে ভগবানের হাত দেখা যায়। একদিকে যেমন এক এক জাতির জীবনে এক এক কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ঈশ্বরের অসীমতার এবং বৈচিত্র্যের চিহ্ন,এই বিশাল নরসমাজের মধ্যে এক একটী সম্প্রদায় বা জাতি এক একটী অঙ্গের মত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অনন্ত জ্ঞানীর কার্য্যবিভাগের শৃঙ্খলা ও নিয়মের পরিচয় দিতেছে এবং এই উপায়ে সকলের সমবেত চেষ্টায় এক প্রকাণ্ড বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্ববিজ্ঞান সৃজন করিয়া তাঁহার শক্তির প্রমাণ করিতেছে, তেমনি, অপরদিকে,এই সুশৃঙ্খলা,সুবন্দোবস্ত এবং বিশ্বমানবের ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কার হইতে হইতে যত সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, যত বিজ্ঞানালোক ও অজ্ঞানান্ধকারের বিরোধ হয়,যত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কলহ আসিয়া জুটে, যত মতভেদ অনৈক্যের গোলমাল হয়, যত উৎপাত উপদ্রব পীড়নের অবতারণা হয়, সমস্ত ঘুচিয়া যাইয়া মহাসত্যের যে বিকাশ, মহাদেশ ও মহাজাতির যে সৃষ্টি এবং প্রকৃত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির যে উন্মেষ হইতেছে, তাহাতে সত্যেরই জয়, অসত্যের পরাজয়, অবিশ্বাসের নাশ এবং বিশ্বাসের সামর্থ্য, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ এবং মিথ্যা ও অবিদ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই উপদেশের,এই তত্ত্বের প্রচার করায় ইতিহাস জাতীয় জীবনের কেবলমাত্র উন্নতি অবনতির ছবি বা প্রতিকৃতি নয়, এই উন্নতি অবনতির মধ্যে যে ঐশী শক্তির যে জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেছে, তাহারও পরিচায়ক। ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করিতে যাইয়া, তাঁহারই প্রেরিত লোকসমাজ যত প্রকার সাহিত্য, বিজ্ঞান, যত প্রকার কাব্য-মাহাত্ম্য, যত প্রকার ধর্ম্ম ও স্বার্থত্যাগের নিদর্শন প্রদান করিতেছে, অথবা যত প্রকার অধর্ম্ম, পাশবিকতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিয়া কষ্ট ও অত্যাচারের কারণ হইয়া বিদ্যা ও সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইতেছে, এই সমস্ত ব্যাপারের কার্য্যপরম্পরা ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথা ইতিহাসই হউক বা সমাজনীতিই হউক,ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক অধ্যায়। আর বাস্তবিক যে ইতিহাসে এই ভগবৎপ্রেরণার উল্লেখ নাই, অথবা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং বিনাশের যে বিবরণ পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট না

হয়, অথবা ধন সম্পদের বৃদ্ধি বা হ্রাসের যে কাহিনীতে এই পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব এবং বৈষয়িক উন্নতির অকিঞ্চিৎকরতার উপদেশ পাইয়া নিত্য অবিনাশী আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা না জন্মে, সেই আখ্যায়িকা কেবল মাত্র মারামারি কাটাকাটির বা কলকারখানার কোলাহলের অথবা কুসংস্কারপূর্ণ বাহ্যাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য বিবরণ মাত্র। তাহাতে মানুষের আত্মার কথা নাই, মানুষের হৃদয়ের উল্লেখ নাই, মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের কোন চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না, মানুষের গন্তব্য স্থান কোথায়, কি উপায়ে কতদিনে তাহার লক্ষ্য সাধিত হইবে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বাহ্য জগতের স্থূল দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায়, তাহার কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা আছে। অন্তর্জগতের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের কোন উল্লেখ নাই। এই আংশিক সত্যে জগতের নিয়ম বুঝা যায় না, জীবতত্ত্ব পরিষ্কার ভাবে মনে স্থান পায় না। প্রকৃত ইতিহাসে সমাজের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ হইতেছে, এই শিক্ষাদান করিয়া মহাসত্যের ক্রমবিকাশের নিয়মগুলি চোখের সাম্‌নে ধরিয়া দেয়। এবং এই উপায়ে মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া জীবনের পথপ্রদর্শক হয়। ইহাতে ভগবানের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য স্থাপিত হওয়ায় মানুষ বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে একমত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলজনক কর্ম্মে সহায়তা করিতে পারে।

বাস্তবিক নরসমাজের ক্রমোন্নতির উপদেষ্টা যে ইতিহাস বিজ্ঞান, তাহা বিশ্বনৈতিক জীবনের একটী মহান্ নাটক। এই পৃথিবী এক বিশাল রঙ্গক্ষেত্র। এই মঞ্চে মানুষ বাল্য যৌবনে জরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনের নাটক অন্যান্য ব্যক্তি এবং অপর সকল শক্তির সঙ্গে আদান প্রদানে সমাপ্ত হয়। ইহার এক একটী দৃশ্য এবং অঙ্ক এই উপায়ে বিকশিত হয়। সমাজের চিত্রে যে নাটক অভিনীত হয়, তাহার চরিত্র এক একটী জাতি বা আন্দোলন। জাতির সম্মিলনে এবং আন্দোলনের সংঘর্ষণে কর্ম্মের ও চিন্তার যে উদ্রেক হয়, তাহারই ক্রমবিকাশে এই কাব্যের পূর্ণতা। নাটকের ব্যক্তিগণ যেমন নিজে নিজের কর্ম্ম শেষ করিয়া নাটককারের রচনাকে সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করে এবং এই উপায়ে তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে ফুটাইয়া তুলে, পৃথিবীতেও যত সমাজ বা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেকেই, সেইরূপ, নিজ নিজ কাজ করিয়া জগতের জ্ঞান ও সভ্যতা-ভাণ্ডারে স্বীয় দাতব্যদান করিয়া অপরের সহায়তা করে এবং এই উপায়ে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করে। এই বিশ্বনাটকের দৃশ্য ও অঙ্গ, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের এক এক পরিচ্ছেদ। কবি তাঁহার রচিত চরিত্র ও ভাবের সমাবেশে একটী সত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সেই সত্য দ্বন্দ্ববিরোধ, প্রতিযোগিতা, অথবা মিলন সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্দের ভিতর দিয়া পরিশেষে লোকের উপলব্ধি হয়। কবির বিচারে ন্যায়ের কৃতকার্য্যতা এবং অত্যাচারীর দণ্ড, প্রেমের জয় এবং হিংসাদ্বেষের পরাজয় ইত্যাদি পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের নৈতিক সত্যগুলি সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্ব-কবির রচিত এই মহান্ গ্রন্থে অনেক সময়ে পাপের আস্ফালন, নাস্তিকতার অপ্রতিহত গতি, ও সয়তানের অবাধ

রাজ্যভোগ দেখা যায় বটে; কিন্তু সমস্তই মঙ্গলময়ের ইচ্ছার অধীনে থাকায়, এই সব অসত্য অবিদ্যা মোহ তিমিরই ভবিষ্যৎ উন্নতির এবং সত্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস এইরূপ আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, বর্ব্বরতা ও সৌজন্য, ইহাদের বিরোধরূপ মহা অসত্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইতেছে। ক্রমশঃ বিজ্ঞান, নীতি এবং ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, ক্রমশঃই লোক পরোপকার, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবানের ভক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমশঃই বাহ্য ও মনোজগতের নিয়মগুলি মানুষ করতলগত করিতেছে এবং জাতীয়তা, প্রজাতন্ত্রশাসন, পরিশ্রমজীবীদের রাজ্যশাসনে অধিকার ইত্যাদি তত্ত্বের আবিষ্কার মানুষের কাজের ও চিন্তার মধ্যে দিন দিনই হইতেছে। কিন্তু উন্নতির প্রত্যেক ধাপেই এক একটী সংগ্রাম, সভ্যতার প্রত্যেক স্তরেই মানুষকে মঙ্গল ও অমঙ্গল, বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বন্দ্বের সমন্বয় করিতে হইতেছে। শুভ এবং অশুভের এই চিরন্তন বিবাদ ঘুচাইয়া দিয়া মনুষ্যসমাজ ক্রমে শুভের পথেই যাইতেছে এবং মঙ্গলেরই জয় ঘোষণা করিতেছে বলিয়া সভ্যতার ইতিহাস একটী বিমল নীতিনাটক। "অসতোমা সৎগময় তমসোমা জ্যোতির্গময়" —শ্রুতির এই বচন ইতিহাসের প্রতি পর্য্যায়ে, জাতির সঙ্গে জাতির প্রত্যেক আদান প্রদানে, প্রত্যেক গৃহবিবাদ, মতভেদ, প্রত্যেক বৈজ্ঞনিক আবিষ্কারে এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে কার্য্যে পরিণত হইতেছে বলিয়া এই নাটক ধর্ম্মগ্রন্থেরই এক অংশ।

কিন্তু এজগতে কেন যে অমঙ্গল, অসত্যের সৃষ্টি হয়, বলা কঠিন। ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য, তবে এত দাসত্ব পরাধীনতা কেন? এত অহঙ্কার, এত অনৈক্য, এত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি কেন? অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারই মনকে অনেক সময় ভরিয়া রাখে কেন? এক একটী ফুল ফুটিতে বা প্রাণীর সৃষ্টি হইতে অসংখ্য বাজের নাশ হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কোন উত্তরই শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারে না। হয়ত এক মঙ্গল বিধানই চিরকাল এক ভাবে থাকিলে অমঙ্গলজনক হইয়া সংসারের ও সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করে, আবার তার সংশোধন না হইলে চলেনা। শুভই পরে অশুভের কারণ হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় পূর্ব্বের সন্তোষজনক ব্যবস্থাই বিষময় ফল প্রদান করে। অথবা কোন এক সম্প্রদায় বা সমাজ বা ব্যক্তি কিছুকাল সমগ্র নরসমাজের উপকার করিয়া যে শক্তি বা অধিকার প্রাপ্ত হয়, পরে সেই অধিকারের এবং সেই প্রভুত্বের অহঙ্কারেই অত্যাচার বা ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করে। তখন অধিকারের এবং শক্তির পুনরায় বিভাগ বাঞ্ছনীয় হয়। এইরূপে সমাজের নূতন অবস্থানুযায়ী নূতন ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য কার্য্যকরী হইয়া থাকে। যে কারণেই হউক, অমঙ্গল, অসত্য আসিয়া জুটে, আমরা তাহাদের পূর্ব্বাপর অবস্থাই দেখিতে পাই এবং তাহাদের ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্যই বর্ণনা করিতে পারি, তাহাদের মূলে পৌছিতে পারিনা। এই এই অবস্থার পর এই এই ঘটনা হওয়ায়, এই এই হইয়াছে, অথবা এই সমাজ পূর্ব্বে জ্ঞানে ধর্ম্মে এত উন্নত ছিল, তারপর অধর্ম্মে মূর্খতায় একেবারে মজিয়া আছে, অথবা অমুক স্থানে অনেক দলাদলি গৃহবিবাদের পর জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনা ও চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র আমরা নির্দ্দেশ

করিতে পারি। অধীনতার ভিতরে শিক্ষা করিয়া কেন সমাজকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, অথবা সয়তানের পরামর্শে কিছুকাল ভুলে থাকার পর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা বলা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে পাপ পুণ্য দুইই ভগবানের ইচ্ছার অধীন—দুইই ভগবানের সৃষ্ট, দুইই সনাতন এবং বিশ্বের সৃষ্টিকালাবধি জগতে বর্ত্তমান, তবে তাঁহারই বিধানে, তাঁহারই বন্দোবস্তে মিথ্যা এবং অসত্য, সত্য এবং পুণ্যের অধীনে সর্ব্বদা পরাজিত হইয়া, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। জ্ঞান এবং ধর্ম্মের গতি অনেক সময় বাধা প্রাপ্ত হয় বটে, দুষ্টের প্ররোচনায় অনেক সময় মন কুসংস্কারে পূর্ণ হইতে পারে বটে, এবং মায়াজালে বদ্ধ হয়ে চিত্ত অনেক সময় স্বাধীনতা হারায় বটে, কিন্তু এসংসারে পাপের আধিপত্য অল্প কয়েক দিনের জন্য, অচিরেই অধর্ম্মের রাজ্য লুপ্ত হয়ে যায়। বর্ষাকালে যখন বন্যার সময় জোয়ার আসে, তখন যেমন নদীর জল বৃদ্ধি একেবারেই ক্রমাগত হয় না; নদীকূলবাসী সকলেই দেখেন যে, কিছুদিন ক্রমাগত বৃদ্ধির পর হঠাৎ হয়ত দুচার দিন কিছু হ্রাসই হইল, কিন্তু তারপর বৃদ্ধি হ'তে থাকে। এইরূপে হ্রাসের পর বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর হ্রাস হ'তে হ'তে শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকে। তেমনি পুণ্যের অপ্রতিহত গতি-রোধ কখনই হতে পারেনা। রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রম- বিস্তার মাঝে মাঝে দুটা একটা যুদ্ধে পরাজয় এবং কিছুকালের মত বিফল প্রয়াসের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইয়া সমস্ত সভ্য জগৎ ছেয়ে ফেলেছিল। পৃথিবীতে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের সাম্রাজ্য ও পাপ এবং অবিদ্যার দ্বারা মাঝে মাঝে হতশ্রী হইলেও, কখনই বিনষ্ট হইবার নয়, বরং অজ্ঞান এবং অধর্ম্মকে পদানত করিয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবেই। তাই দেখা যায়, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, মায়া, মূর্খতা, গোলামী এবং সন্দিগ্ধচিত্ততার ভিতরে রাখিয়া ভগবান্ মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে গড়িয়া উন্নত করিয়া তুলেন। ইহাই ইতিহাসের উপদেশ। বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপু ভগবানেরই কাজ করিতেছিলেন—ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁহার স্রষ্টা। বিষ্ণুপুরণে আছে—

দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ॥

ব্রহ্মার বরেই বলীয়ান্ হইয়া দৈত্য হিরণ্যকশিপু এত অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যত দৈত্য দানব অসুর প্রভৃতি দেব-কার্য্য-বিঘাতক সমাজের কথা আমরা জানি, প্রত্যেকেই ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারই কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলেন। কংসের উপদ্রব ভগবানের অবিদিত ছিল না। আবার দেবগণ যখন রাবণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া উদধিতীরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, ভগবানের সেই সময়কার কথায়ও বুঝা যায় যে, যাকে আমরা অমঙ্গল ও অশুভ বলি, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনের জন্য তাহারও দরকার। তিনি বলেন—

জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভাবপরাক্রমৌ।

* * *

বিদিতং তপ্যমানং চ তেন মেভুবনত্রয়ং।
কার্য্যেষু চৈককার্য্যত্বাদভ্যর্থিতোস্মি ন বজ্রিণা

* * *

স্রষ্টুর্বরাতিসর্গাচ্চ ময়া তস্যদুরাত্মনঃ।
অত্যারূঢ়ং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেনেব ভোগিনঃ॥

ধাতারং তপসা প্রীতং যযাচে সহিরাক্ষসঃ।
দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্ত্যেভ্যস্থাপরাঙ্মুখঃ॥

রাবণ বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া এরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন যে, কোনও দেবতা তাঁহাকে নিধন করিতে পারিবেন না। তাই তাঁর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সে জন্য ভগবান্ স্বয়ং দাশরথি হইয়া তাঁহার উচ্ছেদের কারণ হইলেন। এই উপায়ে সমস্ত অমঙ্গল ভগবানের কার্য্যেরই সহায়তা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মানুষের সসীম জ্ঞানের পরিধি অতি অল্প বলিয়া দূর-ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার শক্তি না থাকায় সম্পূর্ণ ভাবে সমস্ত নিরীক্ষণ করতে পারা যায় না। একটী নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই কোন্ সত্যের প্রচারের জন্য কবি অভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, বুঝা যায়, কিন্তু বিশ্বকবিবরের কোন্ মহামন্ত্র জগতের ইতিহাস রচনার মূলে, সভ্যতার শেষ অঙ্ক কোথায় এবং শেষ দৃশ্যে কোন্ সত্য কোন্ বিদ্যার প্রচার হইয়া কোন্ অসত্যকে দখল করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অসীম অনন্ত শক্তির কৃতিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে কত যুগান্তরের সৃষ্টি দেখিতে হইবে, কত বিশ্বের লয় দেখিতে হইবে, কত জাতির পতনোত্থান দেখিতে হইবে, জানা নাই। যে দুএক দৃশ্য স্মৃতিপথে আছে বা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যের পর বৃহত্তর সত্যের বিকাশ হইয়াছে, দেখা যায় এবং ইহা হইতে এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, ক্রমশঃ মহাসত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথেই মানব জাতির চিন্তা ও কর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয় ইতিহাসের রচয়িতা যে দুচারি জন অধর্ম্মের অবিদ্যার বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের এবং জ্ঞানের বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ জ্ঞানে আমরা পূজা করিয়া থাকি। কোন এক জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে যত চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান হয়, সমস্তই এই পাপ ও পুণ্য, মিথ্যা ও সত্য, জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব সমন্বয় করিয়া সত্য এবং বিজ্ঞানের বিস্তৃতিই করিতেছে। সর্ব্বদা সকল স্থানেই এই বিরোধ এবং এই সমন্বয় চলিতেছে, প্রত্যেক মানুষই এক একটী বীর, অসত্যের পরাজয় করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জগতে প্রেরিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই এই কার্য্য। তবে অনেক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর বা সমস্ত জাতির চরিত্রই অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নাস্তিকতা এবং পার্থিব সুখপ্রিয়তার দিকেই ধাবিত হয়, সে সময়ে "ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ" "অভ্যুত্থান অধর্ম্মস্য" হইয়াছে, বলা যায়—সমাজের শৃঙ্খলা আর নাই—দুষ্টের পালন এবং শিষ্টেরই দমন হইতেছে, সর্ব্বত্র অবিচার অন্যায় হইতেছে, এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপ্লবের সময় যে দু একজন কাণ্ডারী আসিয়া দেশতরণীকে প্রকৃত সত্যের পথে চালাইতে সক্ষম হন, তাঁহাদিগকেই বিশেষ ভাবে আমরা বীর বা মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বলিয়া থাকি। তাঁহাদেরই মধ্যে ভগবানের শক্তি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, তাঁহারাই বিশ্বনিয়ন্তার পরিচিত প্রিয়জন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম বা চিন্তা বা প্রেমের দ্বারা ঝড়-তুফানের সময় শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভক্তি বিস্তার করিয়া অসুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেবতার রাজ্য গড়িয়া তুলেন। খণ্ড সত্যের স্থানে মহাসত্যের আবিষ্কার করেন, ক্ষুদ্র স্বার্থ সমাহিত করিয়া জাতীয়তার সৃষ্টি করেন। এরূপ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তিনি বিশেষ ভাবে ভগবানের লোক বলিয়া অবতার নামে

জনসমাজে খ্যাত হন। সমাজ এবং ধর্ম্ম তাঁদের অন্তর্ধানের পর যে পথে চলেন, সে পথ তাঁদেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহারা যে ভাবে জ্ঞানার্জ্জন, সাহিত্যানুশীলন, ধর্ম্মচর্চ্চা, নৈতিক জীবন গঠন, পারিবারিক এবং সামাজিক কার্য্যকলাপ ইত্যাদি সকল প্রকার চিন্তা কর্ম্মের পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া যান, সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী সমাজে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকে এবং সেই মহাপুরুষ বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তিগণের নামে সেই যুগ অভিহিত হয়। এজন্য বীরের জীবনীই জাতির ইতিহাস, কারণ পূর্ব্বাপর সমস্ত বীরগণের কার্য্যের সন্ধান যদি আমরা পাই, তাহা হইলে অনায়াসেই বীরপ্রসূ জাতির সমস্ত কার্য্য-কলাপের বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়। অবশ্য প্রকৃতিপুঞ্জের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালীর ইতিহাস যে একেবারে নগণ্য,ইহা দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। বীরেরা সাধারণ-জনসমাজের নেতা এবং শিক্ষক, নূতন আলোক লইয়া আসিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার একমাত্র উপায়—নূতন সত্যের আবিষ্কার-কর্ত্তা। কিন্তু সাধারণ সমাজ যদি একেবারে স্পন্দনহীন অচেতন পদার্থ হয়, তা'হলে তাঁহাদের সে শিক্ষা-দান বিফল হয়। সে জন্য সকলকে সেই শিক্ষার অধিকারী করে লওয়াও তাঁহাদেরই কাজের মধ্যে। আর এ উপায়ে মহাপুরুষেরা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের স্বভাব এবং অভাবের অনুরূপ কর্ম্ম ও চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন বলেই তাঁদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে তাৎকালীন সমগ্র সমাজের বিবরণ পাওয়া যায়। বীরের সঙ্গে সাধারণ-জন-সমাজের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁহাদের কাজে জগতের মঙ্গল বেশী হইত না এবং তাঁহারা ইতিহাসের স্রষ্টা হ'তে পারিতেন না। বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উন্নতির ভিত্তি যে মহাপুরুষগণ, তাঁহারা সাধারণ লোক-সমাজের অনুগমন করিবার শক্তি ও সহানুভূতির জন্যই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে সমর্থ হন বলে, জগতের ইতিহাস একদিকে যেমন বীরদেরই বীরত্ব-কাহিনী, অপরদিকে জন-সাধারণেরও অভ্যুত্থানের কথা। সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কর্ম্মী কেবল বীরেরা নন—সাধারণ-লোকেরাই ইহার প্রধান অবলম্বন। তবে বীরদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের, তাৎকালীন সমাজের এবং পরবর্ত্তী সমাজের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারা যায়। কোন্ সময়ে কোন্ সত্যের আবিষ্কার, কখন কোথায় কোন্ ভাবের লোপ হইল—ইত্যাদি ভাবের ও কর্ম্মের ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিতে পারা যায়।

জগতের ইতিহাস সর্ব্বদা এক ভাবে চলে না। বিশ্বনাটকের কোন এক অঙ্ক বা দৃশ্য অপর অঙ্ক বা দৃশ্যের অনুরূপ নয়; অবস্থাভেদে কার্য্যের ও চিন্তার, বিদ্যাভ্যাস এবং ধর্ম্মানুশীলনের ব্যবস্থার বিভিন্নতা। সেইজন্য লোক-সমাজের এবং বীরপুরুষদের কার্য্যও দেশ কাল পাত্রানুসারে পৃথক্। এক এক সময় এক এক কাজের জন্য ভগবানের লোক প্রেরিত হন। অসত্য এক এক সময়ে এক এক আকার ধারণ করে। কখনও প্রজাপীড়ন এবং অরাজকতা, কখনও অসাম্য এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, কখনও নাস্তিকতা এবং যথেচ্ছাচার। এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসত্য নাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের দরকার। এজন্য পৃথিবীতে যত বিপ্লব, যত যুগান্তর, যত প্রলয় হয়, প্রত্যেকটীই ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা, কোন দুই "রিভলিউশনের" প্রকৃতি একরূপ নয়। আর বাস্তবিক পৃথিবী অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, জগতের, কি বাহিরের, কি ভিতরকার অবস্থার স্থিরতা নাই বলিয়া

সর্ব্বদা রূপান্তরই হইতেছে—ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া বিশ্ব নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সেজন্য পৃথিবীতে হঠাৎ কোন এক বিপ্লব হয় না। যাকে আমরা বিপ্লব বলি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রমবিকাশ। অনেক দিনের চেষ্টার ফলে অনেক শক্তির সমুচ্চয়ে, অনেক কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাভাবিক আন্দোলনে যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। তবে অনেক সময়ে ঘটনা-স্রোত ও চিন্তার পূর্ব্বাপর অবস্থা জানা থাকে না বলিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তত অবগত না থাকায়, বিশ্বব্যাপী কয়েকটা আন্দোলনকে বিপ্লব বলিয়া থাকি। এই যে ডিমক্রেসি সায়েন্স, সোস্থেলিজ্‌ম ইত্যাদি কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীর অভ্যুদয় আজকাল জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই লক্ষিত হয়, তাহা অনেক শতাব্দীর অনেক অধিকারচ্যুতি, অবিচার, উৎপীড়ন, কুসংস্কার প্রভৃতি বিনাশের বহু সমবেত চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল। পৃথিবীর এরূপ ক্রমোন্নতির জন্যই সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন যত বিপ্লবের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার শক্তির বিকাশ করে। প্রত্যেক আন্দোলনই সময়োপযোগী হওয়ায় বিভিন্নরূপ। গ্রীক-জাতির অভ্যুদয় কালে রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে শাসন প্রণালীর সংস্কার উদ্দেশ্যে যে যে আন্দোলন হইয়াছিল, অথবা চিন্তাজগতে সত্যের অবিষ্কারের যে যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, সে সব আন্দোলন, রোমের অন্তর্দ্দেশিক সংগ্রাম বা রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং ধ্বংসরূপ যে মহাবিপ্লব হয়েছিল, তাদের মত নয়। তাহার পর মধ্যযুগের পোপের অত্যাচার এবং কুসংস্কার ও মূর্খতার বিরুদ্ধে যে ভেরী নিনাদিত হইয়া নবীন যুবকদিগকে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সাধনা, নূতন শিক্ষা এবং নূতন কর্ম্ম-প্রণালীর জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে রণবেশে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাও অন্য কোন বিপ্লব বা বিকাশের অনুরূপ নয়। এইরূপে ইংলণ্ডের গৃহ-বিবাদ, রাজাপ্রজার কলহ, কনষ্টিটিউসনেল আন্দোলন, ফরাসী-দেশের রাজ্যবিপ্লব এবং প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। প্রত্যেকটীই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে চালিত। কর্ম্মীদের স্বভাব ও চিন্তা এক এক সময়ে এক এক প্রকারের। কোন বিপ্লব প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতিই মূল-উদ্দেশ্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস আনয়নই প্রধান লক্ষ্য। কোন কোন সময় শিল্প-বাণিজ্যের এবং অর্থ সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে জাতীয়শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কখনও রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে প্রজার অধিকার স্থাপনই প্রধান লক্ষ্য থাকে। কখনও বা সমাজসংস্কার, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর উপযোগিতানুসারে কর্ম্মের অধিকার এবং সমাজে মান ও খ্যাতির সুবিধা ইত্যাদিই লোকের চিন্তার বিষয় হয়। কখনও বিদ্যাশিক্ষার প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনই প্রধান উদ্দেশ্য হয়। অবশ্য, মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম যখন পরস্পর সম্বদ্ধ, তখন ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতিতে, অথবা দেশের ধনসম্পদের হ্রাসে বা বৃদ্ধিতে সমাজের রাজনীতির এবং অপরাপর সকল-বিষয়েরই উন্নতি অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিকই বটে। ফরাসী-বিপ্লবে কেবল প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—ভাষা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রত্যেক বিষয়েই স্বাধীন-চিন্তার ঢেউ সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন আসিয়া আঘাত করিয়াছে। ষড়োশ শতাব্দার ধর্ম্মের আন্দোলন কেবল ধর্ম্মজীবনেরই উৎকর্ষ বিধান করে নাই, তাহার ফলে রাজার কর্ত্তব্য, জাতীয়তা, বিদ্যাশিক্ষা, জাতির সঙ্গে জাতির আদান প্রদানের নিয়ম পদ্ধতি, ইত্যাদি সকল বিষয়ই রূপান্তরিত হইয়া নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়াছিল। উইক্লিফ, লুথার, ক্রেন্মার, প্রভৃতি কেবল ধর্ম্ম-বীর নন, তাঁহারা সমাজসংস্কারক, নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তকও ছিলেন। ভল্টেয়ার, রুসো প্রভৃতি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্রের প্রধান অবলম্বন ছিলেন না; চিন্তা-জগতে, শিক্ষা-বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান, সমাজ নীতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও অধিকার তাঁহাদের বেশ ছিল। ক্রমশঃ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

# পারমার্থিক

তাঁহারা বলেন, এই সংসারের কার্য্যাদি ধূলিখেলাবৎ ক্ষণস্থায়ী,—প্রাতে আরম্ভ,সন্ধ্যায় পরিসমাপ্ত। জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা-প্রসূত নিষ্কাম ব্রতপরায়ণতার পরিণামও তাই কি? আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তিই কি সকলের পরিণাম? জীবনের অসমাপ্ত ইচ্ছার উত্তেজনাও কি ক্ষণস্থায়ী? তাঁহারা আশা করেন,—সকল উত্তেজনার পরিণামই শূন্যময় ধূলিখেলা। জ্ঞানপিপাসুদিগের বিমুগ্ধ চিত্তের কি সম্মোহন!

শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আশা করেন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের কতিপয় নেতাকে ধরিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট জেলে পূরিতে পারেন, তবেই সব আন্দোলন নির্ব্বাপিত হইবে। তিনি অনরেবল্ হইয়া এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে, ইংলিস-ম্যানের সম্পাদকের ন্যায়,এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী পরামর্শ দিয়াছেন কিনা, শুনি নাই, কিন্তু ইহা শুনিয়াছি, তিনি, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া, কোন লোককেই গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না এবং সকলকেই তুচ্ছ এবং অগ্রাহ্য করেন। এ সকল কথা সত্য কিনা, জানি না; তবে কিছু অন্যমনস্কতার ভাব তাঁহাতে যে সংক্রামিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আরো কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু সে সকল উপেক্ষা করাই ভাল। তাঁহার নিকট এদেশ ঋণী, যে গরু দুধ দেয়, তাঁহার লাথি সহ্য করিতে হয়। সুতরাং এসম্বন্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আন্দোলনের প্রয়োজন কেবল এই, কেবল তিনি নহেন, এদেশে, অনেক কৃতবিদ্য ঘোষ, বসু, মিত্র, সেন, লাহিড়ী আছেন, যাঁহারা প্রতিনিয়ত ইংরাজের পা চাটিতেছেন এবং চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে বিদেশী জিনিস এদেশে পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে পারে;—কেবল তাহা নহে, তাঁহারা সকল আন্দোলন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তলে তলে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন। ইংলিসম্যান, পাওনিয়র যাহা লিখিতেছেন, তাহা তাঁহাদেরই উদ্গীরিত বমন মাত্র। এহেন স্বদেশদ্রোহীরা এদেশের নিরন্নশ্রেণীর দুঃখের কথা মনেও স্থান দিতে পারেন না! আমেরিকার সহৃদয় পেল্লস্ সাহেব বলেন—

"Let none of you then forget that by the use of any foreign-made article which you wear or use, instead of which an Indian-made article might be worn or used, 'you are taking the bread from the mouths of some of your countrymen, and causing some of your countrymen to die of starvation?" Is it Humanity, Is it Justice?."

আমরা জানি, অনেক পোষ্যপুত্র, ভরণ পোষণ দূরের কথা,আপন পিতা মাতার নাম শুনিলেই বিরক্ত হয়, পাছে সম্মানের লাঘব হয়, সে জন্য ক্রোধে অধীর হয়! তাহারা দরিদ্রদের কথা ভাবিবে কেন? ইংরাজের এ হেন কুলাঙ্গার পোষ্যপুত্রগণ যে স্বদেশদ্রোহী হইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, এহেন লোকদিগের ব্যবহারে এবং কথায় বিরক্ত হইলে চলিবে না, হাতে পায়ে ধরিয়া বুঝাইয়া তাহাদিগকেও স্বদেশভক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কথা এই,তাঁহারা যে মনে করেন, অল্পেই সমস্ত আন্দোলন নির্ব্বাপিত হইবে,

একথার মূলে কোন সত্য আছে কিনা, ধীর চিত্তে সকলেরই তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত।

প্রকৃত পক্ষে, এ জগতের কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হয় না, এবং কোন কার্য্যই শূন্যে বিলীন হয় না। যাহা একবার ঘটিয়াছে, অনন্ত কাল তাহার কার্য্য চলিবে;—যাহা একবার উক্ত হইয়াছে,চিরকাল তাহার স্রোত বহিবে। তোমরা বল, পতন বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; আমরা বলি, কোথাও পতন বা মৃত্যু নাই;—বস্তু সকল রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু কিছুরই ধ্বংস নাই। বালকের হাস্য বা ক্রন্দন, নৃত্য বা উল্লম্ফনেরও পরিণতিতে জগতের উন্নতি সাধিত হয়। কারলাইল বলিয়া গিয়াছেন,—

"How true, that there is nothing dead in this Universe; that what we call dead is only changed, its forces working in inverse order! 'The leaf that lies rotting in moist winds', says one, 'has still force; else how could it rot?,* * "The thing that lies isolated inactive thou shalt nowhere discover; seek everywhere,from the granite mountain,slow-mouldering since Creation, to the passing cloud vapour, to the living man; to the action, to the spoken word of man. The word that is spoken, as we know, flies irrevocable: not less,but more, the action that is done. 'The Gods themselves,' says Pindar,'cannot annihilate the action that is done.' No, this, once done, is done always;cast forth into endless time; and,long conspicuous or soon hidden, must verily work and grow forever there, an indestructible new element in the Infinite of Things.

* * *

How often must we say, and yet not rightly lay to heart: The seed that is sown, it will spring! Given the summer's blossoming, then there is also given the autumnal withering: so is it ordered not with seed-fields only, but with transactions, arrangements,philosophies,societies,French Revolutions,whatsoever man works in with this lower world. The beginning holds in it the End, and all that leads thereto; as the acorn does the oak and its fortunes".

'French Revolution, Vol II, P 86 & 7.

শিশু হাসে, নাচে, গায়, তোমার ইচ্ছায়, না আর কাহারও ইচ্ছায়? যে ভূতদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞানী,সে শিশুর হাস্য নৃত্যে প্রতি মুহূর্ত্তে এক অলক্ষিত দেবতার হাস্য নৃত্যের আভাস পাইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানে বিভোর হয়! আহা, নয়ন থাকিতে সর্ব্বঘটনায় যে বিধাতার ইঙ্গিত পাঠ করিল না, বৃথা তাহার জীবন ধারণ!

তবুও তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, স্বদেশ-ভক্তের কাজে বিধাতার ইঙ্গিত; স্বদেশ-দ্রোহীর কাজে কি বিধাতার ইঙ্গিত নাই? আমরা স্বীকার করি, আছে বই কি। আছে—শক্তি বৃদ্ধির জন্য। নির্ঝরের বুকে পাষাণ চাপা না থাকিলে এত জোরে তাহার প্রবাহ ছুটিত না;—তরঙ্গে প্রতিঘাত না হইলে সাগর এত গর্জ্জিত না। দেবকীর বুকে কংসকর্তৃক পাষাণ চাপা না থাকিলে অসুর-বিনাশন শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইত না;—কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় রামের বনবাস না হইলে, দুর্জ্জয় দশানন বিনষ্ট হইত না। তাঁহার ইঙ্গিত সব কাজে;—ক্লাইবের ষড়যন্ত্রে, সিরাজের পতনে যেমন তাঁহার ইঙ্গিত, বাবা নানাসাহেবের মন্ত্রসাধনায়ও তাঁহার ইঙ্গিত;—এবং তাঁহার ইঙ্গিত—বুদ্ধিমান, গর্ব্বিতমস্তক ইংরাজের কুবুদ্ধিতে এবং ভারতের অসংখ্য দরিদ্র-নিপীড়ন, নির্য্যাতন এবং নিষ্পেষণে! এবং তারপর? তারপর এই সুবিশাল স্বদেশী আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্যই বিধাতার এরূপ বিধান। তুমি এবং সে, ইনি এবং তিনি, ফুলার এবং হেয়ার, মিণ্টো এবং মর্লী—অত্যাচার-পাষাণ চাপা দিয়া নির্ঝরের বেগ থামাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আন্দোলন থামিয়াছে কি? ভস্ম চাপা দিয়া কি প্রজ্জ্বলিত দাবানল নির্ব্বাপিত করা যায়? তোমাদের এবং তাঁহাদের অমানুষী কাজে—স্বদেশী আন্দোলন, আরো, আরো, আরো বাড়িয়া

চলিয়াছে। ইহার গতিরোধ করে সাধ্য কাহার? ইহা যে বিধাতার দুর্জ্জয় বিধান।

জাতীয়তার ইতিহাস, সর্ব্বদেশেই মহা প্রহেলিকাময়;—প্রথমে সামান্যে আরম্ভ, শেষে অসামান্যে পরিণতি;—যেমন শিশুর পরিণতিতে—নেপোলিয়ন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজের পরিণতিতে মহা বটবৃক্ষ, অথবা যেমন পরমাণু-সমষ্টির পরিণতিতে হিমাচল, ক্ষুদ্র বারিকণার সমষ্টির পরিণতিতে বঙ্গোপ-সাগর। প্রথমে দেখা যায় না, ধরা যায় না, —অনুভূতি হার মানে, কল্পনা পরাস্ত হয়, চিন্তা উড়িয়া যায়, শেষে বিশালতায় জগৎ মুগ্ধ,—মনে করে, কি দেখিলাম! কথিত আছে, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ম্যাটসিনির প্রেমের টানে ভূতদর্শী বৃদ্ধ ভিক্ষুকের নয়নে জল আসিয়াছিল, কিন্তু গর্ব্বিত অষ্ট্রীয়া সে শক্তিকে স্বীকার করে নাই, পরন্তু সে শক্তি বিনাশে বহু চেষ্টা করিয়াছিল! শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদকে অস্বীকার করায় দস্যুকুলে কি বিষম ঘটনা ঘটিয়াছিল, ভারতের সকলেই তাহা জানেন। উদাহরণের বাহুল্যের প্রয়োজন নাই;—স্বর্গ হইতে দেবদূত "স্বদেশ-প্রেম" যখন বঙ্গে অবতরণ করিল, তাহাকে উপেক্ষা করে নাই, ঘৃণা করে নাই, তুচ্ছ করে নাই, ঠাট্টা করে নাই কে? কে ভাবিয়াছিল —শিশু আজ এত বড় হইবে? উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা,—অত্যাচার, অত্যাচার, অত্যাচার বর্ষণ করিয়া শিশুকে আজ বিধাতা কত বড় করিয়া তুলিতেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত যাহাকে সদা রক্ষা করিতেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাগর যাহাকে সর্ব্বদা প্রতি-পালন করিতেছে,সেই দেশ তুচ্ছ,নগণ্য, পরি-ত্যক্ত, নির্ব্বিত্ত—গোলামীতে পচিয়া মরিবে, যাঁহারা ভাবেন, জাতীয়তার ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাঁহাদের অধিগম্য হয় নাই তাঁহারা চিরভ্রান্তিতে মুহ্যমান।

তাঁহারা বলেন, আমরা রাজদ্রোহী! আমরা রাজদ্রোহী নহি, আমরা স্বদেশ-দ্রোহী। তাহা না হইলে, এমন করিয়া কি এদেশ ডুবিত? আমরা স্বদেশদ্রোহী, সত্যই বলিতেছি তাঁহারা রাজদ্রোহী! তাঁহারা, যাঁহারা ভিতরে একটা বাহিরে আর একটা পোষণ করেন, যাঁহারা সর্ব্ব ঘটনায় বিধাতার হাত দেখেন না, যাঁহারা ইন্দ্রিয়লালসায় বিভোর, যাঁহারা স্বার্থের তাড়নায় বিভ্রান্ত, যাঁহারা জড়বাদ ও পরিণামবাদের ধান্দায় পড়িয়া আত্মহারা;— সুতরাং সর্ব্বস্বহারা! তাঁহারা, যাঁহারা চিন্ময়কে চির-উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া সুখী,— যাঁহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থান এবং পতনে পরিতুষ্ট। আর আমরা?—যাঁহারা ভিত-রের কথা বাহিরে প্রকাশ করে, এবং মনে করে, সুরেন্দ্রনাথ, বা অশ্বিনীকুমার, ভূপেন্দ্র-নাথ বা লিয়াকত হোসেনের ব্যক্তিত্ব বহুদিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে,—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমিতে জাগিয়া উঠিতেছে, কেবল চিন্ময়ের অক্ষয় রাজত্ব! আমরা?—যাঁহারা সকল পার্থিব শক্তির মধ্যেই চিন্ময়ের শক্তি স্বীকার করে—স্বীকার করে, সর্ব্বঘটে কেবল মহা-রাজাধিরাজ চিন্ময়ের একাধিপত্য! সত্যই বলিতেছি, আমরা রাজদ্রোহী নহি, আমরা আত্মদ্রোহী। আর তোমরা? তোমরা কি ছাই, জেলের ভয়, বা মৃত্যুর ভয় দেখাও? জেলও তাঁহার,এই বাড়ী ঘরও তাঁহার; যদি তাঁহার ভক্ত হই—সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। কেহ জেলে যাইয়া কাতর হইতে পারেন, সারদাচরণ বা অশ্বিনীকুমার ক্ষমা-রূপ পুরীষ-রাশি ক্ষালিত করিতে

পারেন, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ বা অজিত সিং, লিয়েকত বা লাজপত রায় সদা নির্ভীক, সদা প্রফুল্ল ;--তাঁহারা সংসার-পণ্যবীথিকার ক্ষতিলাভ গণনার মধ্য দিয়া এ পুণ্যময় ধামে অগ্রসর হইতেছেন না, তাঁহারা অজেয় পরমার্থ জ্ঞানকে সকল অসারের সার ভাবিয়া, এই পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভয় সেখানে আপনি ভীত,—প্রলোভন সেখানে আপনি কম্পিত,তোমাদের সম্মান-লাভালাভ-গণনা সেখানে আপনি লজ্জিত! গোখলে এবং মেটা ভয়ের ভ্রুকুটীতে আত্মহারা হইতে পারেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজের চেলা তিলক বা লাজপত রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বা লিয়াকত হোসেন বিচলিত হইবার নহেন। যাহা আসিবার আসুক, যাহা ঘটিবার ঘটুক—ম্যাট্‌সিনি বিশ্বজননীর মহা ইঙ্গিতে অবিচলিত-চিত্ত ;—সকল পরামর্শ তাঁহার নিকট তুচ্ছ ও ব্যর্থ ;—সকল গণনা তাঁহার নিকট নিরর্থক ;—সকল অত্যাচার তাঁহার নিকট পুষ্পবর্ষণ—পরিণামে নামিয়া আসিল ইতালীর পূত-স্বাধীনতা! হায় আল্পস্, হায় ভূমধ্যসাগর,—তোমরা কি হিমাচল এবং ভারতসাগর বা বঙ্গোপসাগরকে পূত-স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে না? হায়—ম্যাট্‌সিনির বিধাতা—তুমি কি চিরদিন এই নির্ঘিত, পরপদ-দলিত ভারতকে ভুলিয়া থাকিবে? থাকিতে পার কি? তাহা অসম্ভব বলিয়াই,—আজ ভারত মহাজাগরণের পথে আসিয়াছে ;—আজ ভারত তোমাকে ধরিয়া একাকারা—সাকারে নিরাকারা,—মৃন্ময়ে চিন্ময়ীর মহামিলন দেখিয়া ভক্তি-গদগদ-চিত্তে আজ সন্তানগণ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে "বন্দে মাতরং"বলিতেছে এবং কি তেজ, কি শক্তি যে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহা জান কেবল অন্তর্যামী তুমি। আজ ভারত-ভূমি দেবভূমি মহাস্বর্গে পরিণত হইয়াছে ; সকল সন্তান আজ মাতৃনামে বিভোর! তুমি জান, আমরা রাজদ্রোহী নই, আমরা তোমার ভক্ত সন্তান, সকল অসত্য ও অসারের ভিতর তোমার পবিত্র ও দুর্জ্জয় শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই লালায়িত। এদেশ মরিয়া যায়, তোমার অভিপ্রায় নয়,ইহা বুঝিয়া আমরা তোমার সেবাকে জীবনের সার করিয়া দেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়াছি! বিশ্বজননি, তুমি কি অবতীর্ণ হও নাই? অবিশ্বাসী আমাদের চক্ষু তুমি ফুটাও ;—আমরা তোমার প্রকট-লীলা দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হই,—আমাদের পাষণ বক্ষ প্লাবিত করিয়া ভক্তির অশ্রু নিপতিত হউক! তুমি এবং স্বদেশ একাকার হউক, আমরা ভাই ভাই—সব মিলিয়া এক মহাশক্তিতে মাতিয়া যাই! তোমার শক্তি অজেয় হউক, দুর্দ্ধর্ষ হউক—ঘরে ঘরে, ঘটে ঘটে প্রতিষ্ঠিত হউক।

## তর্পণ।

হিন্দু-শাস্ত্রে তর্পণ-স্নানের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্নানান্তর আর্দ্র বস্ত্রে (অথবা বাস পরিবর্ত্তনানন্তর সুখাসীন হইয়া) স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের ও অন্যান্য মহাত্মার উদ্দেশ্যে অঞ্জলিপূর্ণ জল উৎসর্গ করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করিবে। যত জনের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ জলের অঞ্জলি দিবে, চতুর্থ শ্লোকটী ততবার

পাঠ করিতে হইবে ও প্রত্যেক বার পাঠের সময় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। ঐ শ্লোকের তৃতীয় চরণের প্রথম দুইটী কথাও প্রত্যেক বার যথোপযুক্ত ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে; যথা:—মাতঃ প্রীতা দয়য়া মদ্‌গৃহাণ, দেব প্রীতো দয়য়া মদ্‌গৃহাণ, দেবি প্রীতা দয়য়া মদ্‌গৃহাণ ইত্যাদি।

মধ্যে ঘোরং তিমিরং লোকয়োর্যং
ভিত্ত্বা তাবৈ স্তদিদং তার তুল্যৈঃ।
ঊর্দ্ধ্বং চাধঃ পরিত শ্চান্তরে মে
পশ্যন্তী ড্যাঃ সকৃপং কে ভবন্তঃ ॥১॥

কিং লো যূয়ং পিতরো মে পরেতাঃ
তৃষ্ণৌৎ সুক্যাৎ তনুজং প্রেক্ষমাণাঃ।
সংসারাট্টে স চিরং বঃ কৃতজ্ঞঃ
শ্রদ্ধাং ধত্তে হৃদয়ে বা ন বেত্তি ॥২॥

কায়ঃ প্রাণামম যৎ কিঞ্চিদন্যৎ
ধর্ম্মঃ পুণ্যঃ সুকৃতং সৌখ্য কীর্ত্তি।
যুষ্মদ্দেবা নিখিলং তৎ সমগ্রং
মূঢ়োপ্যন্ধঃ কিমিদং বিস্মরামি ॥৩॥

স্নাতাং শুদ্ধাদ্ধৃদয়ে ধ্যায়তস্তে
মূর্ত্তিং দিব্যাং সুগুণাং শ্চাতিপূতান্।
তাত প্রীতো দয়য়া মদ্ গৃহাণ
তোয়াকারাং গলিতাং ভক্তিধারাম্ ॥৪॥

এতত্তোয়ং জড়তায়া ন শক্তং
প্রাপ্তুং যুষ্মান্ পিতর শ্চিৎ স্বরূপান্।
মৈবং মুক্তা সহতেনাত্ম ভক্তিঃ
দীনাচ্চিত্তাৎ প্রবলা সা স্পৃশেদ্বঃ ॥ ৫ ॥

যে ভীষ্মাত্মা ভুবি বীরাগ্রগণ্যা
ধর্ম্মস্থার্থে জগজশ্চোপ কুর্ত্যৈ।
প্রেতাঃ কুর্ব্বন্নমলং ব্রহ্মচর্য্যং
তেভ্যো প্যেষাহস্তুতবন্তো মেমাহা ॥৬॥

প্রীতাঃ স্নিগ্ধাঃ সুখতৃপ্তাঃ সহাস্যাঃ
সর্ব্বে সন্তু প্রতিঘা সর্ব্বলোকে।
পূর্ণঃ শাস্ত্যা শর্ম্মদো ভাতু বিশ্বঃ
ছায়েবাস্তা শতধা নন্দ মূর্ত্তেঃ ॥ ৭ ॥

এবং বুদ্ধি স্মৃতি দানাদ্বিষাদং
শ্রেষ্ঠাদৃষ্ট্যা জনিতং যো হরন্মে।
সম্পূর্ণো যৎ কৃপয়া পিতৃযজ্ঞঃ
পুণ্যো দেবং করুণার্দ্রং ত মীড়ে ॥ ৮ ॥

## তর্পণ। (বাঙ্গালা)

জীবন মরণ মাঝে যে গভীর অন্ধকার
ভেদি তায় তারা সম জ্বলে ও নয়ন কার?
ঊর্দ্ধ্ব অধঃ শত ঠাঁই, অন্তরে হৃদয়ে প্রাণে
কে তোমরা চেয়ে আছ একনেত্রে মোর পানে?

তোমরা কি পরলোক-বাসী পূজ্য পিতৃজন
সতৃষ্ণ উৎসুক ভাবে নেহারিছ এ ভুবন?
সংসারের কোলাহলে এত দীর্ঘ দীন পরে,
সন্তান কৃতজ্ঞ-চিতে শ্রদ্ধা করে কিনা করে!

যা কিছু আমার বলি দেহ, বল, মন, প্রাণ
ধর্ম্ম পুণ্য শান্তি সুখ সব তোমাদের দান;
যদিও অজ্ঞান আমি বিমূঢ় অধর্ম্মাচারী
পিতৃ-পুরুষের ঋণ কভু কি ভুলিতে পারি!

স্নান করি শুদ্ধ চিতে স্মরি মনে বার বার,
পুণ্য-মূর্ত্তি তব পিতঃ করি তাই নমস্কার,
স্মরি তব গুণাবলি ভক্তি-প্লুত এ হৃদয়
লও সেই পুণ্য-ধারা সলিল অমিয়-ময়!

চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা বিহরিছে অমরায়
এই জড় জলাঞ্জলি কেমনে তুষিবে তায়!
এ সংশয় অমূলক ভক্তির অমিয় ধার
দীনের হৃদয়ে উঠি স্পর্শে পদ দেবতার।

ভীষ্ম আদি এ জগতে তেজস্বী যে বীরগণ
জিনি আত্মা পালিলেন ব্রহ্মচর্য্য আজীবন;
ধর্ম্মের রক্ষার তরে, জগতের হিত তরে
মরিলেন অপুত্রক এ ধারা তাদেরও তরে।

প্রীত হোক, স্নিগ্ধ হোক সুখ-তৃপ্ত হাস্যময়
সর্ব্বলোকে সর্ব্বজন ত্যজুক বিষাদ ভয়!
শান্তি-পূর্ণ বিশ্বধাম আনন্দে হাসুক সবই
সহস্র দর্পণে যেন আনন্দময়েরই ছবি!

যাঁহার কৃপায় লভি বুদ্ধি স্মৃতি ভক্তি লেশ,
ভুলিতেছি প্রিয়জনে পূজিয়ে বিচ্ছেদ-ক্লেশ,
যাঁহার কৃপায় ক্ষুদ্র পিতৃযজ্ঞ সমাপন
হল মোর ভক্তিভরে পূজি তাঁর শ্রীচরণ।

শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ।

# পাপের ভয়

"ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়।"

ইংরাজের নিজের কথায়ও আছে,

"A red sky in the morning,
Is a shepherd's warning;"

ইংরাজের সাধের ভারতসাম্রাজ্যে—যেখানে তাহারা উদারান্ন সংস্থানের নিমিত্ত আসিয়া পিধানগুপ্ত অসিবলে (!) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং কালক্রমে যেখানে বিলাতী লর্ড হইতে কুকুরপালক (Dog-keeper)টী পর্য্যন্ত শরাজ্ঞানে চলিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই; আজ সেই হতবল দেশে মদবলদৃপ্ত স্বৈরাচারী ইংরাজ শয়নে স্বপনে জাগরণে নিরন্তর রক্ষী-পরিবেষ্টিত থাকিয়াও এত সন্ত্রস্ত কেন, তাহাদিগের দুষ্কর্ম্ম-কলুষিত হস্ত পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করিতে করিতেও কাঁপিতেছে কেন, আরও কি বুঝিতে বাকী? ইংরাজ যতই কেন আত্মশক্তিতে অন্ধ থাকুক না, রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট—সেই যে সর্ব্বান্তর্যামী একজন আছেন, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত কালে তাঁহার কথা মনে হইলেই যে প্রাণ দুরু দুরু করিয়া উঠে! মর্লিই বল, আর মিণ্টোই বল, কি কমিংবল অথবা কিংসফোর্ডই বল, যখনই যে অত্যাচার বা অবিচার করিতে গিয়াছে, অন্ততঃ সেই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মনোশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, স্বার্থও স্বজাতিপ্রেম তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। এইরূপ প্রতি কার্য্যে—প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাদিগকে পাপের ভয় বিচলিত করিতেছে!

নতুবা মহাসভার বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া ব্রিটিসের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অধীনতম রাষ্ট্র-কর্ণধার কিরূপে এই প্লীহাভারাক্রান্ত নেটিব গুলাকে "শত্রু" পদবাচ্য করিলেন? এরূপ জবরদস্ত সাম্রাজ্যাধিনায়ক হইয়াও কেনবা পাটোয়ারী, এমন কি, সত্যের অপব্যবহারও করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। বস্তুত মর্লিকে আমাদের স্বার্থ সংস্পর্শে পাইয়া ইংরাজ চরিত্রের যথার্থ সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। অহো, তাঁহার ব্যবহার-বৈচিত্র্যের কথা মনে হইলে, নির্ব্বোধেরও হাসি পায়! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজদ্বেষ-প্রচারক কার্টরাইটকে স্থানান্তরিত করা হইলে, তিনি তদানীন্তন সমর-সচিব মিঃ ব্রড্রিককে যে প্রশ্ন করেন, তাহার জবাব পাইয়া এই মহাসভাতেই বলিয়াছিলেন,

"the most outrageous and indefensible answer ever given within these walls since Simon de Montfort invented Parliaments; * * illegal, unconstitutional, tyrannical and arbitrary, impudiently absurd and prepos-

terous to the action of the Government in detaining a man for some other reasons which they do not disclose,"

আর আজ লালা লাজপত রায় প্রভৃতির বেলায় ততোধিক নিন্দনীয় উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। ধন্য তাঁহার "সাধু আখ্যায়! ইহাই যদি সাধু প্রকৃতি হয়, তবে হে ভগবান, আমাদিগকে কদাপি তাদৃশ সাধুতা লাভের নিমিত্ত লালায়িত করিও না। বুঝিয়াছি মর্লি, তুমি ঐ মালা-তিলকের ভড়ং দেখাইয়া আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলে, তাই তোমার নির্ব্বাচনে ভারতবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল, আর এখন যে সেই গৈরিকবসনের ভিতর হইতে এসম্প্রদায়ের প্রাণে মিছরীর ছুরী বসাইতেও এদিক ওদিক তাকাইতেছ, তা' কেবল পাপের ভয়ে!!*

ইংরাজ বণিক তুলাদণ্ড ছাড়িয়া রাজদণ্ড ধরিয়াছে, তাই বাট্‌খারার দিকে টান্‌টা সামলাইতে পারিতেছে না---পারিবেও না। কথায় বলে,

যদি হয় জাত বেণে,
ভাইয়ের সদাই ও রাখে টেনে।"

সুতরাং তাহাদের হইতে ন্যায়বিচার—নিরপেক্ষতা পাইবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি যে আমরা এতদিন ধরিয়া আবেদন-নিবেদন, কান্না-কাটি কত কি করিতেছিলাম, সে কেবল স্বভাবসুলভ সরলতা এবং আত্মশক্তি-বিশ্বাস-হীনতায়! আজ দুর্দ্ধর্ষ শাসনকর্ত্তা লর্ডকর্জ্জনের ভৈরব গর্জ্জনে মোহের ঘোর টুটিয়াছে। যে হস্তকে পক্ষাঘাত দুষ্ট বিশ্বাসে এতকাল নাড়িতেও চেষ্টা করি নাই, আকস্মিক বিপদ পাতে তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ চালাইতেই যে অমিতবিক্রমের পরিচয় পাইতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া নিজেদেরও বিস্ময় আসে। বস্তুত আজ ভারতের প্রত্যেক নরনারী ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বকীয় বল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাই ইংরাজের ভয়। "ভীরু" "কাপুরুষ" "দুর্ব্বল বাঙ্গালি আমার" প্রভৃতি রূপ সুমধুর ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইতে গাইতে এতদিন যে ইংরাজ এদেশবাসীকে তন্দ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সম্প্রতি তাহারা আমাদের জাগরণ-সাড়া পাইয়া একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা রাজবণিকের উপাসনা ছাড়িতেছি, 'স্বদেশীকে' চিনিয়াছি; তাই রাজভক্তির বাগুরা গুটাইতে এত তৎপরতা—প্রাণের এত অস্বাভাবিক স্পন্দন। হায়, পাপের ভয়!!!

বলিতেও লজ্জা হয়, আমরা এমন ক্ষমতাশালী রাজার আশ্রয়ে আছি, যাহারা অধীন প্রজার—হর্ষভাব-ব্যঞ্জক সামান্য কণ্ঠধ্বনিতেও ভয় পায়। জানিতাম 'রাম' নামে ভূত ছাড়ে, কিন্তু মানুষভূত যাহারা, তাহাদিগকে পাশ ছাড়াইবার কোন অবধৌতিক ব্যবস্থা এযাবৎ শুনিয়াছিলাম না। সুখের বিষয় বই কি, আজ তাহা হাতে হাতেই পাওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে একটী বহু পুরাতন কথা মনে পড়ে। একদা কোন বোকা হাবড়া এক সাঁকোর কাছে মনের সখে খেলিতেছিল; সেই সময় বিপরীতাভিমুখ হইতে আগত এক সাঁকো-আতঙ্কগ্রস্ত পীবরকায় ব্যক্তি সাঁকোয় উঠিতে উঠিতে সম্মুখীন বালককে পাগল ঠাওরাইয়া মনে করিলেন, হয়ত এখনি সে সাঁকো খানি নাড়িয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবে। তাই

* কোন প্রসিদ্ধ কলেজের উচ্চশিক্ষিত একজন প্রধান অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) সেদিন বলিতেছিলেন, মর্লির সমস্ত পুস্তক একসঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিবার একটী অনুষ্ঠান করিলে ভাল হয়। ন. স।

তিনি কড়া সুরে বলিলেন "ওরে পাগলা, সাঁকো নাড়িস্‌নে।" সেও এই সুযোগে আমোদোপভোগ লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। সাঁকোখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ভালই মনে করিয়াছ, ফলে যাহা হইবার, এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না, তিনি সাতচুবুক্‌ খাইয়া অতিকষ্টে পৈত্রিক প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিলেন। আজ ভারতভূমিতে ইংরাজদের অবস্থাও প্রায় ততদূর। তাহারা নিজেদেরই পাতক-মন্ত্র নিজেরা খুলিয়া দিতেছে। তাহাতেই ভারতের বালবৃদ্ধ বনিতা-মুখ হইতে প্রতিক্ষণে "বন্দেমাতরম্‌" মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্বাস, ইহাতেই মানুষভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে। ইংরাজ, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, হয় কিনা ইহা তোমাদের পাপের ভয় !!!

বাস্তবিক ইংরাজ তুমি দেশ হাসাইলে। এই অপোগণ্ড বালকগুলিকে তোমার এত ভয়? তাহারা পাছে দেশ কাড়িয়া লয়, এইজন্য তোমাকে কত ছারকুলা (চা) র ( circular ) ব্যবস্থা করিতে হইল! তদপেক্ষা তোমার পুরুষত্ব প্রকাশ পাইতেছে, নিরীহ শিক্ষক-মণ্ডলীর নিপীড়নে। কিন্তু তুমি এ সকল করিয়াও ক্ষান্ত নহ। ভারতের যন্ত্রবল, অস্ত্রবল, অগ্নিবল ইতিপূর্ব্বে সকলি তোমাদের করতলগত। এমন কি, কুকুর তাড়াইবার লাঠী-গাছটীতে পর্য্যন্ত তোমাদের নজর পড়িয়াছে। তথাপি তোমাদিগের কতিপয় অবিমৃশ্য কর্ম্মচারী এবং খয়েরখাঁ পত্রিকা-সম্পাদক, কামলা-পীড়িত রোগীর ন্যায় সবুজে দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে বিদ্রোহাশঙ্কা বিঘোষণ করিতেছে। আর তোমরা সেই কল্পিত বিভীষিকায় অধীর হইয়া সদসৎবিচার ব্যতিরেকেই নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন, নিষ্পীড়ন ও নিঙ্গারণ-নীতি গ্রহণ করিলে! যাঁহারা তোমার রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদিগকেই শত্রু মনে করিতেছ এবং তাঁহাদিগকেই কল্পিত-বিপ্লবের কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। তাই বলিতেছিলাম, ইংরাজ, একদিন তোমারই টোটার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল বলিয়া আজ বালারুণদীপ্ত সিন্দূরে মেঘ দেখিতেই ভয়ে অস্থির হইয়াছ। নিশ্চিতই তোমাদের পাপের ভয় !!!

শ্রীস্মর-হরেন্দু ঘোষ।

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩২। **পাচালী** —৺সীতারাম মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দুর্গাসুরের যুদ্ধ, ধ্রুব চরিত্র, গুবরে ও পাহুরে। মূল্য ৵০। প্রথমতঃ কবির জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশক শেষে পাঁচালী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুস্তকখানি বেশ কবিত্বপূর্ণ।

৩৩। **আল্লার শতনাম ও আরবী অক্ষর বর্ণন**।—মূল্য।০। নামেই এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকের বিষয় বিবৃত। বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই।

৩৪। **রাখী-কঙ্কণ**।—শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ ; মূল্য ৷৵০। স্বদেশী উপন্যাস। নূতন লেখক ; কিন্তু হইলে কি হয়, লেখার পারিপাট্য আছে। স্বদেশী-উপন্যাস বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম।

৩৫। **শিবাজীর ভবানীপূজা**। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ ; গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকখানি বীরভাবে পূর্ণ। লেখা সুন্দর। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে সকলের পাঠ্য।

# পরমহংসস্বামী শ্রীমৎব্রহ্মানন্দপুরী।

নদীস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া, একটী সুরভি-কুসুম যেমন সহসা সৈকত ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া কিছুকাল স্বভাবসুলভ সৌরভ-রাশির বিস্তার দ্বারা সেই স্থানটী আমোদিত করিয়া কালবশে শুকাইয়া তীরস্থ বালুকা-রাশিতে বিলীন হইয়া যায়, এই মহা পুরুষও, তেমনই, অপর এক প্রদেশ হইতে কালস্রোতে আনীত হইয়া, বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট-অঞ্চলে জীবনের শেষার্দ্ধ কাল অবস্থান পূর্ব্বক আপন প্রতিভা দ্বারা তৎসমাজস্থ আপামর সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানেই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

পরমহংস স্বামী শ্রীমৎব্রহ্মানন্দপুরীর জন্মস্থান উড়িষ্যা-অঞ্চল এবং এইরূপ প্রবাদ যে তিনি উড়িষ্যার রাজগুরু ছিলেন ; যৌব-নের প্রথম ভাগেই স্ত্রী-পুত্রাদি শমনরাজ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে পাশ-মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় তিনি বৈরাগ্যের উন্মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে জীবনী সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানা যায় নাই। সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু বলেন না ; সুতরাং শ্রীহট্টে কি অন্যান্য যে সকল স্থানে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ অবস্থান করিয়া গিয়াছিলেন, তত্তৎস্থলের অনেকেই তদীয় অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, শিষ্যবৎ ভক্তি সহকারে সতত তাঁহার সমীপে অবস্থান করিলেও, তাঁহার জনকের নাম, কোন্ গ্রামে বসতি ছিল, শিক্ষাদীক্ষা কোথায় কতদূর হইয়াছিল, ইত্যাদি জীবনীর আবশ্যক কথা কেহই জানিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। ঐ সকল উড়িয়া অক্ষরে লিখিত দেখিয়া, তিনি যে উড়িষ্যা-দেশজ ছিলেন, ইহারই মাত্র স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীহট্টে তাঁহাকে আনুমানিক ১২৬৭ সালে সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছিল। শ্রীহট্ট সহর হইতে অনতিদূরবর্ত্তী গোটাটিকর নামক জনপদে তিনি বহুদিন অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তখন তাঁহার নাম "পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম-চারী" ; তান্ত্রিক বীরাচারী সাধকের রীতি অনুসারে তাঁহার সঙ্গে প্রাচীন-বয়স্কা একজন ভৈরবীও ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ—তদানীন্তন পূর্ণানন্দ—সর্ব্বদা কারণবারি-সমাশ্রয়ে নিত্যা-নন্দে বিভোর থাকিতেন। যে স্থানটী সম্প্রতি শ্রীহট্টের মহাপীঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে, তিনি সেই স্থানেই তখন সাধন-ভজন করিতেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্য একরূপ অতলস্পর্শী ছিল। এতৎসম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে ; এস্থলে একটী মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎকালে শ্রীহট্ট-অঞ্চলে ৺রাজগোবিন্দ সার্ব্ব-ভৌম মহাশয় একজন মহামহোপাধ্যায়-প্রতিম ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। একদা কোনও নিমন্ত্রণে এই সার্ব্বভৌম মহাশয় গোটাটিকরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকের বাড়ীতে আসিয়া এই মহাত্মাকে দেখিতে পান এবং মদ্যপ-ভৈরবী-সহচর

গৈরিকধারীকে একজন পূতাচারী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সচরাচর যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনিও ইহার প্রতি সেইরূপই কতকটা ঔদাস্য ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ইহাতে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গে শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হন। রামরাবণের যুদ্ধের ন্যায় বহুক্ষণ উভয়ের মধ্যে নানা শাস্ত্রের বিচার চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ সার্ব্বভৌম মহাশয় নিস্তেজস্ক হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা ভদ্র-লোক আসিয়া উভয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া এই দ্বৈরথ-তর্কযুদ্ধের অবসান করাইয়া দেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণের ছেলে * সন্ন্যাসী হইয়া উড়িষ্যা গিয়া তত্রত্য রাজগুরু সার্ব্বভৌমকে বিচারে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন; আর এই উড়িষ্যার রাজগুরু বলিয়া খ্যাত এই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী-রূপে শ্রীহট্টে আসিয়া অত্রত্য পণ্ডিতরত্ন সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি ৺কামাখ্যা মহাপীঠে চলিয়া যান। কামাখ্যায় অবস্থান কালে তদীয় সাধনসহচরী ভৈরবীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। এই স্থলেই তিনিও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ-পুরী এই সংজ্ঞা ধারণ করেন। অতঃপর প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীহট্টস্থ বানিয়চঙ্গ নগরে যে ৺কালী-বাড়ী আছে, তাহাতে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

বানিয়াচঙ্গ এক অতি সুবৃহৎ স্থান। এই নগরের পরিমাণ-ফল প্রায় ৮ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ হইবে। এই বানিয়াচঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী ৺কাত্যায়নী মাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা কাত্যায়ন বংশীয় রাজা কেশব মিশ্র কর্ত্তৃক তদীয় পূর্ব্বাবাস (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) হইতে আনীতা। এই কালীর কোনও প্রতিমূর্ত্তি ছিল না; পিত্তল-নির্ম্মিত সিংহাসনে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরই দেবীর যন্ত্র। কথিত আছে, কেশব মিশ্র একদা নৌকায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে এই অঞ্চলে আসিয়া অত্রত্য প্রকাণ্ড হাওরের মধ্যে হঠাৎ একটুকু স্থলভাগ দেখিতে পাইয়া এই স্থানে সিংহাসন সহ প্রস্তরটী অবতারণ করেন। পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক যখন উহা পুনশ্চ নৌকায় উঠাইতে যান, তখন উহা কোনও ক্রমেই নড়াইতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া দেবীর প্রত্যাদেশের জন্য হত্যা দেন। স্বপ্নে আদেশ হইল যে, দেবী ঐ স্থানেই থাকিবেন এবং কালে এই স্থান প্রসিদ্ধ জনপদে পরি-ণত হইবে। রাত্রি প্রভাতে দেখা গেল, সমস্ত হাওর যুড়িয়া প্রকাণ্ড চর পড়িয়াছে। কেশব তখন দেশ হইতে স্বীয় আত্মীয়স্বজন আনিয়া এই স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া এই অঞ্চলের রাজা হন। এই কেশবমিশ্রই বানিয়াচঙ্গের রাজবংশীয় কাত্যায়নদিগের আদি পুরুষ। কালক্রমে কেশবের বংশধর-গণের মধ্যে একজন ঘটনাচক্রে মুসলমান হইয়া মোগলের করদাতা-রূপে সমস্ত রাজত্বে অধিকার-লাভ করেন। এই মুসলমান রাজারাও ৺কাত্যায়নী মাতার সেবা পূজার জন্য বৃত্তি এবং প্রচুর জমিজমার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। •

সচরাচর একজন সন্ন্যাসী এই কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়কতা করিয়া থাকেন; বোধ হয়, পূর্ব্বে রাজবংশীয় কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই কালীবাড়ীর অধিনায়ক সন্ন্যাসী হই-

* শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী।

তেই তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। যাহা হউক, ৺ ভৈরবানন্দ গিরি সন্ন্যাসীর সময়েই কালীবাড়ীর বিত্ত বিভবের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়; তিনি ৺ কালীমাতার একটী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্ত্তমান ইষ্টকালয় নির্ম্মিত করিয়া যান। ভৈরবানন্দের সমাধি লাভের পর যখন বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ ভদ্রগণ অপর একজন সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দ ৺ কামাখ্যায় থাকিতেন। গৌহাটিতে তখন কাত্যায়ন বংশীয় স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস-প্রমুখ বানিয়াচঙ্গ-নিবাসী অনেকে রাজকার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেন; তাঁহাদের নিকট হইতে বাণিয়াচঙ্গের কালীবাড়ীর অবস্থা অবগত হইয়া এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যাদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মানন্দ আনুমানিক ১২৭০ সালের বাণিয়াচঙ্গে গমন করেন এবং মানবলীলার অবশিষ্ট সময় এই স্থানেই অবস্থিতি করেন। কিন্তু বাণিয়াচঙ্গ নিয়ত বসতির স্থান হইলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট সহরে বিশেষতঃ তৎসন্নিকৃষ্ট গোটাটিকর অঞ্চলে পদার্পণ করিয়া তদীয় পূর্ব্ব-পরিচিত অনুরক্ত ব্রাহ্মণ-ভদ্রাদিকে চরিতার্থ করিতেন।

বাণিয়াচঙ্গ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বহুল স্থান; এই স্থানে আসিয়া পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বীয় অগাধ শাস্ত্রজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সর্ব্বদা প্রাহ্ণে অপরাহ্ণে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া পণ্ডিত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু জনগণের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। তখন কালীবাড়ীর কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। একে দেবাধিষ্ঠিত পবিত্র স্থান; তাহাতে সাক্ষাৎ মহাদেব স্বরূপ এই সিদ্ধ মহাপুরুষ সদানন্দে বিরাজমান; আবার গুণমুগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দ সর্ব্বদা সদালাপে সেই স্থানটী গুলজার করিয়া রাখিতেন। এইরূপ শোভা সচরাচর দেখা যায় না; কেবল আর একবার অন্যত্র ঈদৃশ রমণীয়তা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যখন পরমহংস শ্রীমদ্রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরস্থ ৺রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঐ স্থানটীর কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য হইয়াছিল! হায়, দক্ষিণেশ্বরের ন্যায় বাণিয়াচঙ্গে তখন যদি একটী "শ্রীম—"* থাকিতেন, তবে পরমহংস ব্রহ্মানন্দের আনন-বিনিঃসৃত কত তত্ত্বকথা, তৎসম্বন্ধীয় কত কৌতুকাবহ কাহিনী, তাঁহার নিকটে আগত কত জ্ঞানী ও ভক্তের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়া অধ্যাত্ম সাহিত্যের এক বিশিষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হইত। আজ অনেক অনুসন্ধানেও মোটামুটি দুই একটী কাহিনী ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও কথা জানা যাইতে পারিতেছে না, ইহা কি বিষম পরিতাপের কথা!

দুঃখের কথা আরও একটু আছে। তন্ত্রানুসারে পূর্ণাভিষিক্ত ব্রহ্মানন্দ কারণ-বারি দ্বারা সর্ব্বদা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত রাখিতেন, তাঁহার অন্য পানাহার প্রায় ছিল না। হীন ব্যক্তিরা তাহার সার-ভাগ গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু খোসাটিতে অর্থাৎ মদ্যপানে দীক্ষিত হইয়া নিজেদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিল। মহাপুরুষগণের বাহ্য অনুকরণকারিদিগের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে।

পরমহংস ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হইলেও, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ তাঁহার প্রধানতঃ অবলম্বনীয় হইলেও, তাঁহাতে ভক্তিভাবের স্ফুরণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হইত। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অনবরত দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইত। অথচ তাঁহাকে সর্ব্বদাই এক জন

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের রচয়িতা।

আনন্দময় পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি যেন সতত সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমজ্জমান থাকিতেন; অথচ শাস্ত্রকথা পাড়িলে তিনি পঞ্চানন-কল্প হইয়া অনর্গল সরল সংস্কৃতময়ী বক্তৃতায় তাহা বুঝাইয়া দিতেন। তিনি যে কোন্ শাস্ত্র জানিতেন, কোন্ শাস্ত্র জানিতেন না, তাহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারিত না। যে কোনও শাস্ত্রের কথা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। বানিয়াচঙ্গে তখন ৺গদাধর সিদ্ধান্তরত্ন, ৺শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি কতিপয় অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন; আবার সন্নিকটস্থ জলসুখা নামক গ্রামে ৺রাজকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন, ৺উমাকান্ত তর্করত্ন প্রভৃতি বৃহস্পতিকল্প অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা প্রায়শঃ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন, কিন্তু তদীয় পাণ্ডিত্যের তল স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। ফলতঃ স্বয়ং মহাবিদ্যা যাঁহাতে জাগ্রত ভাবে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার বিদ্যার পরিমাণ কে করিবে? আবার, শাস্ত্রকথা বলিতে বলিতে যখন মধ্যে মধ্যে সহসা অট্টহাস্য করিয়া অমনি গভীর ভাবরাশিতে নিমগ্ন হইয়া নিস্তব্ধভাব ধারণ ও নয়ন জল বর্ষণ করিতেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। কখন কখন বা সংস্কৃত তোটক বা পজ্ঝটীকা ছন্দে স্বরচিত সঙ্গীত সুমধুর কণ্ঠে গান করিয়া সকলের মনোহরণ করিতেন। আহার নিদ্রা এক প্রকার ছিলনা বলিলেও হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ-বারি পান * দ্বারা তিনি সতত কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত রাখিতেন।

এবম্প্রকার মহাপুরুষের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বাঞ্চলের বড় বড় বংশীয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণবর্গের অনেকে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার কথা সুদূর মণিপুর রাজ্য পর্য্যন্ত পৌছিল।

তখন মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুর রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত, মণিপুরের মহারাজগণ বংশপরম্পরা বৈষ্ণব। তথাপি কি ভগবদিচ্ছা! মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কোনও ধর্ম্মতত্ত্বমীমাংসার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যখন কান্দিগ্ভূত হইয়াছিলেন, তখন স্বপ্নে পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শরণাপন্ন হইতে আদিষ্ট হন। ব্রহ্মানন্দপুরীকে স্বীয় রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত মহারাজ নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ জানাইলেন, তিনি তন্ত্রাচারী,"কারণ" না হইলে তাঁহার চলেনা। বৈষ্ণব মহারাজ যদি তাহার ব্যবস্থা না করেন, তবে তিনি মণিপুর যাইতে পারিবেন না। তখন পিপায় পিপায় কারণ সংগৃহীত হইল; ব্রহ্মানন্দ কতিপয় অনুচর সহ মণিপুর গিয়া কিয়দ্দিবস সেই স্থলে অবস্থান করিয়া মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। এরূপও প্রবাদ আছে যে, মণিপুরে দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি ছিল, ব্রহ্মানন্দ জলে নামিয়া তপস্যা করিয়া বৃষ্টিপাত করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে মণিপুরে বিল্ব বৃক্ষ ছিল না; ব্রহ্মানন্দপুরী একটী বেলের চারা নিয়া তথায় রোপণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মানন্দ যখন ফিরিয়া আইসেন, তখন মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র একটী নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি বহু অলঙ্কার সমেত উপহার প্রদান করেন এবং বার্ষিক একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়া দেন।

* ঈদৃশ মহাপুরুষের পেয় পদার্থকে "সুরা" বা "মদ্য" প্রভৃতি নামে সংজ্ঞিত করা নানা কারণে অসঙ্গত।

ঐ মূর্ত্তি ভৈরবানন্দ স্থাপিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বাণিয়াচঙ্গের কালীবাড়ীতেই স্থাপিতা হন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় নাই। ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে মূর্ত্তিটী ভূমিসাৎ হইয়া ভগ্ন হওয়াতে তৎস্থলে সম্প্রতি পাষাণময়ী প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছেন। মণিপুরের বৃত্তিটীও ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দপুরী প্রকৃত ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন; তাই বৃত্তি বিষয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। ৺কালী মাতার সম্পত্তি তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ভৈরবানন্দ গিরির সময় যে ভাবে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার সময় তদ্রূপত হয়ই নাই; প্রত্যুত কোনও বিষয়ে কিছু কিছু হানিও ঘটিয়াছিল। মুসলমানের আমল হইতে কালীর বার্ষিক প্রায় ৫০৲ টাকার একটী বৃত্তি ছিল. ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলেও, ভৈরবানন্দ গিরি পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ কালী বাড়ীর অধিনায়ক হইয়া আইসা অবধি ঐ বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। * তথাপি তাঁহার সময়ে ৺ কালীমাতার সেবার্চ্চনা প্রভৃতি বেশ জম্‌কাল ভাবেই চলিয়াছিল। কেননা তাঁহার দর্শনার্থ সর্ব্বদা কালীবাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইত এবং কেহই রিক্তহস্তে দেবতা বা সাধু দর্শন করিতে আসিত না। মাকরী সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবসে, বর্ষে বর্ষে কালীবাড়ীর একটী মেলা হইবার ব্যবস্থা ব্রহ্মানন্দই করিয়াছিলেন—তাহাতেও দেবালয়ের আয়ের এক নূতন পথ হইয়াছিল। এই মেলাটী এখনও হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই ব্রহ্মানন্দের কীর্ত্তি কতকটা বজায় রহিয়াছে।

আনুমানিক দশ বৎসরকাল বাণিয়াচঙ্গে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মানন্দ পুরী, ১২৮১ সালে সমাধি লাভ করেন। এই বৎসর নারায়ণী যোগে করতোয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তে তিনি ৺ কাত্যায়ণী মাতার সাক্ষাৎ উপবিষ্ট হইয়া স্তবস্তুতি করিলেন, তৎপর যোগমগ্ন হইয়া নশ্বর দেহ হইতে মুক্ত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাঁহার দেহ কিরূপে সমাহিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্যও হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি-স্থলটীতে একটী স্মৃতি-ফলক স্থাপনের জন্য সম্প্রতি চেষ্টা করা হইতেছে।

পরমহংস ব্রহ্মানন্দ পুরীর ন্যায় মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার কথা প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা পাড়িয়াছিলাম। উভয়েই সন্ন্যাসী—সাক্ষাৎ সদাশিব অথবা নারায়ণ; তাঁহাদের পরস্পর তুলনা করা অনুচিত—এবং তুলনা হইতেও পারে না। একজনের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্ম্মক্ষেত্র ভারতব্যাপী, নাম জগদ্ব্যাপী, আবাল্য জীবনীর প্রত্যেক ঘটনা শত-মুখে প্রচারিত হইয়া আছে; অপরের কার্য্য, জীবন, সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, নামও এক প্রকার বিস্মৃতির স্তরে ঢাকা পড়িতে বসিয়াছে, জীবনীর

* এই অবস্থায় বৃত্তিটীর লোপই ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ বাণিয়াচঙ্গ নিবাসী (অধুনা কাশী প্রাপ্ত চন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় শ্রীহট্টের ডিপুটি কালেক্টার হইয়া আসিয়া ১২৯০ সালে ঐ বৃত্তি পুনর্জীবিত করিয়া দেন। ব্রহ্মানন্দ-লব্ধ মণিপুরের বৃত্তিটি যে লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হয় নাই। এখন আর হইবেই বা কি? মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের বংশধরগণের মধ্যে কেহ আজ সিংহাসনারূঢ় থাকিলে বরং ব্রহ্মানন্দের কীর্ত্তিসূচক এই বৃত্তির উদ্ধার সাধন হয় কিনা দেখা যাইতে পারিত।

প্রায় কোনও কথাই কেহ বলিতে পারেন। একজন যেন প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় বিশাল, অপর যেন একটী উপসাগরের ক্ষুদ্র ফাঁড়ি। কিন্তু ইহাও ঠিক যে উভয়েই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ মহার্ণবেরই অংশ। পরিমাণের ন্যূনাধিকতায় সম্পূর্ণরূপে তুলনার বিষয়ীভূত না হইলেও, উভয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন স্থলে এস্থলে, আরও দুই একটী কথা বলা বোধ হয় অন্যায় বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় ইনিও ইষ্ট কথার প্রসঙ্গ মাত্রেই অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন। প্রসিদ্ধ বিথঙ্গলস্থ আখড়ার জনৈক ধার্ম্মিক বৈষ্ণব, * তাঁহাকে দর্শন করিতে যান; তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। পরমহংস ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে গান করিতে বলায় তিনি, "কর তাঁর নাম গান—যত দিন দেহে রবে প্রাণ" এই তদানীন্তন নূতন গানটী ধরিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দের আনন্দ-তরঙ্গ দেখে কে, সেই হাহা করিয়া অট্টহাসা, তারপর গায়কের গলা জড়াইয়া অজস্র প্রেমাশ্রু-ধারা বর্ষণ! মহাপ্রভুকে যেমন তদনুরাগী ভক্তগণ স্বয়ং নারায়ণ ভাবিতেন, ব্রহ্মানন্দকেও তদ্‌ভক্তেরা "সাক্ষাৎ মহাদেব" মনে করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। মহাপ্রভু যেমন, বঙ্গদেশ হইতে গিয়া উড়িষ্যায় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুরীতে জীবনের শেষাংশ কাটাইয়া গিয়াছেন, পুরী পরমহংসও উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া রাজা কেশব মিশ্র পূজিত শ্রীশ্রীকালীমাতার নিকেতনে জীবলীলার শেষ অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু যেমন লুপ্ত বৃন্দাবন তীর্থের পুনরুদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া, বৈষ্ণব জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দও শ্রীহট্টস্থ লুপ্ত মহাপীঠের পুনঃ প্রকাশের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া, শাক্ত জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। *

শ্রীহট্ট সহর হইতে ক্রোশৈকমাত্র দক্ষিণ পশ্চিম স্থিত গোটাটিকর নামক স্থানে, ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া অবস্থিত হন, সেই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তত্রত্য শৈলপ্রান্ত-স্থিত প্রস্তর বহুল যে স্থানটীতে তিনি প্রায়শঃ বসিয়া সাধন ভজন করিতেন, সেই স্থানটী "ভৈরবী বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল। একদা তদানীন্তন ভূম্যধিকারী দেবীপ্রসাদ দাস, একটী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য এই জায়গাটুকু পরিষ্কার করাইতেছিলেন; কথিত আছে, নিযুক্ত ব্যক্তি এই স্থানের এক টুকরা প্রস্তর কাটিয়া ফেলাতে ঐ স্থান হইতে সহসা এক কন্যামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে ঠোকর মারেন; এবং দেবীপ্রসাদ সেই রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন, "আমি ভৈরবী এখানে গুপ্তভাবে ছিলাম; এখন হইতে সেবাপূজার ব্যবস্থা করিবে।" বলা বাহুল্য, তদবধি এই স্থানে পূজার্চ্চা হইতে

* পণ্ডিত কবীরদাস বাবাজী; তিনি স্বয়ং এই গল্প বলিয়াছেন। এই বিথঙ্গল আখড়ার বিষয় জগন্মোহন-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রসঙ্গে ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত "উপাসক সম্প্রদায়ে" উল্লেখ আছে।

* এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী দেবীযুদ্ধ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, মহোদয় ১৯০৩ সালের ১৬ই জুন তারিখের 'পরিদর্শক' পত্রে লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ ("শ্রীহট্টস্থ মহাপীঠের প্রকাশ") পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার শ্রীযুক্ত বিরজানাথ ন্যায়-বাগীশ মহাশয় "সর্ব্বানন্দ প্রকাশ" এই নাম দিয়া সানুবাদ সংস্কৃত একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

লাগিল, সেই পীঠাকার স্থলীর দেবতাও "ভৈরবী" এই প্রচ্ছন্ন সংজ্ঞায় পরিচিতা হইলেন। ব্রহ্মানন্দ (তদানীং পূর্ণানন্দ) কোথা হইতে আসিয়া, সংসারে যেন আর স্থান পাইলেন না, এই জায়গাটীই সাধনার স্থান মনোনীত করিলেন। একদা খুব আনন্দ হইয়াছে; ভক্তগণ সহকারে চক্রে বসিয়া ব্রহ্মানন্দ তত্ত্বালাপ করিতেছিলেন। সহসা কি জানি কি ভাবে মতোয়ারা হইয়া, সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থান হইতে উঠিয়া, সোজা ঈশান কোণে চলিয়া অল্পদূরবর্ত্তী শিবটিলা নামক একটী অনুচ্চ শৈলে আরোহণ করিলেন, এবং সঙ্গিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই স্থান অতি মহিমান্বিত; এখানে অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন, ইনি ভৈরবীর ভৈরব, একদিন প্রকাশ পাইবেন, ইত্যাদি।" যদিও আবহমান কাল যাবৎ এই ক্ষুদ্র পাহাড়টী শিবটিলা নামে পরিচিত ছিল, তথাপি "শিব' যে এখানে আছেন, একথা কেহই জানিত না। কিন্তু শৈলোপরি একটা ঢিবির মত বন জঙ্গলাবৃত স্থান ছিল, তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীরা, ভক্তিসহকারে দুগ্ধাদি ঢালিত। এই শিবের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃকই খ্যাপিত হয়। কেবল এইটুকুই নহে।

গোটাটিকর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরজানন্দ ন্যায়বাগীশ মহাশয় শ্রীহট্টের মধ্যে একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণ এবং ইষ্টনিষ্ঠতা দ্বারা আপামর সাধারণের সাতিশয় ভক্তিভাজন। তিনি যখন বাল্যাবস্থায় টোলে পড়িতেন, তখন ব্রহ্মানন্দ সেই অঞ্চলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র দেখিয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন; স্বরচিত শ্লোকাদি শিখাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তত্ত্বোপদেশও দিতেন। ১২৮৬ সালে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের ৫ বৎসর পরে, যখন ন্যায়বাগীশ মহাশয় সবে মাত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে টোল করিয়াছেন, জনশ্রুতি এইরূপ, তখন একদা রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন যে ব্রহ্মানন্দ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "চল তোমাকে শিবটিলার শিব দেখাইব।" এই কথা শুনিয়া যেন তিনিও ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি লইয়া তাঁহার সঙ্গে শিবটিলায় গেলেন এবং ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশ অনুসারে সেই ঢিবির উপর হইতে বৃক্ষাদি জঙ্গাল সরাইয়া কিঞ্চিৎ খুঁড়িয়া লিঙ্গরূপী মহাদেবের আবিষ্কার করিলেন। স্বপ্নাবসানে "কি দেখিলাম" এই চিন্তায় নিমজ্জমান হইয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় প্রত্যূষে যখন বহির্ব্বাটীতে আসিতেছিলেন, তখন অচির-জাগ্রত ছাত্রগণের মধ্যেও তাদৃশ স্বপ্নব্যাপারের আলোচনা হইতেছে শুনিয়া সমধিক বিস্মিত হইলেন। তৎপর গ্রামস্থ সমস্ত লোক সহকারে সংকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে সশিষ্য ন্যায়বাগীশ মহাশয় শিবটিলায় গিয়া স্বপ্নাদৃষ্টানুরূপ কার্য্য করিলেন, এবং তখন প্রকৃতই প্রস্তরময় প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের আবিষ্কার হইল। এই অনাদি শিবলিঙ্গই অধুনা শ্রীহট্টস্থ গ্রীবাপীঠাধিষ্ঠাত্রী "ভৈরবী" মহালক্ষ্মীর "ভৈরব" সর্ব্বানন্দ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জীবিত কালে শিবের আবিষ্ক্রিয়া বুঝি বিধিলিপি ছিলনা, তাই দেহত্যাগের পরে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া শিব স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ শিবটিলাস্থ সর্ব্বানন্দের প্রকটন ব্যাপারের অধিনায়কত্ব করিলেন।

পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কবিত্ব শক্তিও বিলক্ষণ ছিল; সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত ও শ্লোকাবলী রচনা করা তাঁহার একটা অনা-

য়াস-সাধ্য কাজ ছিল। তিনি বহু শ্লোকাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকৃত "মোহ-চপট" নামক নানা ছন্দোময় সপ্তবিংশতি শ্লোকাত্মক একখানি খণ্ডকাব্য ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব সংবাদ জানা যায় নাই। এই গ্রন্থখানি, হস্তলিখিতাবস্থায় প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট আছে। * তন্মধ্য হইতে যদৃচ্ছাক্রমে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

"শম্পাস্ফালন জাত লোভচপলা যদ্বদ্বনাস্ত মৃ´গাঃ
ত্যক্ত্বা যান্তি নরাশ্রমান্তিক মহো দৈবেন সংমোহিতাঃ।
নাশং যান্তি শরেন বিদ্ধহৃদয়া স্তদ্বচ্চিদাত্মাস্পদং
হিত্বা পুত্রকলত্র লোভ মনসো হাহা বিনষ্টাবয়ম্॥"
"যদাত্যাদূরং প্রিয়তরতনো নে´ষ্যতি বলা
দরে চেতো বদ্ধা স্বকৃত ফল ভোগায় শমনঃ।
তদাতুত্বাং রক্ষিষ্যতি নহি কলত্রাদি বিভবঃ
ততস্ত্বক্তো সর্ব্বং ভজ পরমজং চিৎসুখকরম্॥

তৃণ লোভে মৃগ ত্যজি গহন কানন
লোকালয় কাছে গিয়া হারায় জীবন।
সেইরূপ হায়, মোরা ছাড়ি তত্ত্ব স্থল
সুতদারা ধনে ম'জে হারাই সকল॥
অরে চেতঃ, যবে প্রিয় এদেহ হইতে
বেঁধে নিবে যম তোরে অদৃষ্ট ভুঞ্জিতে।
রাখিতে নারিবে তোরে তদা দারা-বিত্তে
ছাড়িয়া এসব রাখ পরব্রহ্মে চিত্তে॥

নূতন কোনও বিদ্যার্থী বা অধ্যাপক তাঁহার নিকট গেলে, তিনি মধ্যে মধ্যে কূটার্থক অথবা দুরূহ শব্দাত্মক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উহাদের বিদ্যা পরীক্ষা করিতেন; ঐ সকল শ্লোক তাঁহার স্বরচিত কিনা বলা যায় না। "ব্যাঘ্রের দ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়নের" ন্যায় ঐ সকল শ্লোকের চোটে অনেকে তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া পড়িত—বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া সুতরাং কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে সাহসী হইত না। ঐরূপ শ্লোক দুইটী এস্থলে উদাহৃত হইল; আশা করি, পাঠক সাধারণ মহাত্মা পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুরীর শুভাশীর্ব্বাদ সূচক শ্লোকদ্বয় সমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন:—

"অধুনা মধুকর পতিনা গিলিতোঽপ্যপকারদম্পতী যেন
ত্রাতঃ স পাতু নস্ত্বাং বিগতবিকারো বিনায়কো মায়াঃ।"
"রাশ্চারেড়্ ধ্বজধগ ধৃতোড়্‌বধিপতিঃ কুধ্রেড়্‌জ জানির্গণেড়্
গোরাড়াক্ষড়্‌রঃ সরেড়্‌ক্ষতর গ্রৈবেয়ক ভাড়রম্।
উড়্‌বীড়্ দৃঙ্‌নরকাস্থিধৃক ত্রিদৃগিভেড়াদ্র´াজিনাচ্ছচ্ছদঃ
সোঽস্তাদস্ম্যদস্ম্যদালিগলরুগ্ দেবো মুদে বোমৃড়ঃ॥

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

# শঙ্কর কি জগতের ব্রহ্ম-দর্শনের বিরোধী?

আমরা নব্যভারতে বিগত দুইটী প্রবন্ধে † শঙ্করাচার্য্যের মতের সমালোচনা করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন এবং শঙ্করাচার্য্য যে এই জগৎকে অলীক, অসত্য বলেন নাই, ইহার আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু অদ্যও এই বিষয়টী সম্বন্ধেই আর একটু বিচার করিয়া দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি। বিষয়টী বড়ই গুরুতর। এই বিষয়টী লইয়াই শঙ্করাচার্য্যকে অনেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাই এই বিষয়টীর জন্য আমাদের এত নির্ব্বন্ধাতিশয়।

* ইহার সানুবাদ প্রকাশার্থে যত্ন করা যাইতেছে।

† "শঙ্করাচার্য্যের নিগু´ণ সগুণ ব্রহ্ম" এবং "শঙ্কর-মতে জগৎ সত্য না অসত্য"।—এই দুই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্গুণ ব্রহ্ম যে অনন্ত, পূর্ণস্বরূপ, তাহা সেই দুইটী প্রবন্ধে শঙ্করমতেরউক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নির্গুণব্রহ্মই শক্তি দ্বারা জগৎ-কারণ। এই শক্তিকে শঙ্কর 'অব্যক্ত,' 'অক্ষর,' 'অব্যাকৃত' ও 'প্রাণশক্তি' প্রভৃতি বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শক্তিকে শঙ্কর ব্রহ্ম-চৈতন্যের অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত বলিয়াছেন। শঙ্করের মত এই যে, ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। এই কথাটা পাঠক ভুলিবেন না। এই শক্তি যে 'বিজ্ঞানবাদের' (Idealism) বিজ্ঞান নহে, ইহা যে ত্রিগুণাত্মক জড়শক্তি, তাহাও পাঠক ভুলিবেন না। শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার আনন্দগিরি, এ শক্তি যে বিজ্ঞান নহে, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। "মায়াশব্দস্যাপি 'প্রজ্ঞা'নামসু পাঠাৎ বিজ্ঞানশক্তির্বিবক্ষিতেত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি"(গীতাভাষ্যের টীকা ৪।৬)। এই শক্তিকে সেই স্থলেই মায়াশক্তি বা অপরাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে অচেতন (জড়) বলা হইয়াছে (৭।৬)। এই সকল সুস্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও, গত আশ্বিনের প্রবাসীতে, মহেশচন্দ্র ঘোষ নামে একজন পণ্ডিত আমাদের 'উপনিষদের উপদেশ' গ্রন্থের বিকৃত সমালোচনায়, প্রাণশক্তিকে বিজ্ঞান বলিয়া শঙ্করের নামে নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। যাহা হউক, এই জড়শক্তি হইতে ব্রহ্ম-চৈতন্য যে স্বতন্ত্র, * এখন আমরা শঙ্করোক্তি দ্বারা তাহাই দেখাইব।

(১) "সর্ব্বমহত্তরঞ্চ 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তিসমাহাররূপং অব্যক্তমব্যাকৃতাকাশাদিনামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবীজশক্তিঃ। তস্মাদব্যক্তাৎ পরঃ······পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ" (কঠভাষ্য, ৩।১১)।

জগতের যাবতীয় পদার্থের বীজশক্তিস্বরূপ এই অব্যক্তশক্তি হইতে পুরুষ (ব্রহ্ম-চৈতন্য) স্বতন্ত্র।

(২) "নামরূপ বীজভূতাৎ 'অব্যাকৃতাৎ' স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ 'অক্ষরাৎ' পরং, অক্ষরস্যৈব স্বরূপং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং" (মুণ্ডক ভাষ্য, ২।১।২)।

সমুদয় নামরূপের বীজশক্তি স্বরূপ এই 'অক্ষর'শক্তি হইতে ব্রহ্ম-চৈতন্য স্বতন্ত্র।

(৩) "অক্ষরাৎ পরঃ নিরুপাধিকঃ পুরুষঃ, যস্মিন্ আকাশাখ্যং তদক্ষরং ওতঞ্চপ্রোতঞ্চ" (মুণ্ডকভাষ্য)।

এই অক্ষর, যাহাকে 'আকাশ' শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।

(৪) "সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ 'প্রাণত্ব'-ব্যপদেশঃ সর্ব্বশ্রুতিষুচ কারণত্ব ব্যপদেশঃ। অতএবাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ; নেতি নেতীত্যাদি বীজবত্ত্বাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তাং তুরীয়াবস্থাং·········পারমার্থিকীং বক্ষ্যতি" (মাণ্ডুক ভাষ্য)।

সকল পদার্থের বীজভূত এই প্রাণশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে জগৎ-কারন বলা হয়। এই অক্ষর বা প্রাণশক্তি হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই ব্রহ্মের অবস্থাকেই তুরীয়াবস্থা বলে।

(৫) "তস্মাৎ পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোম্নি 'আকাশে' অব্যাকৃতাখ্যে, তদ্ধি পরমং ব্যোম।

* সৃষ্টির পূর্ব্বে শক্তি ব্রহ্মে একাকার ভাবে থাকে, কিন্তু সৃষ্টিকালে এই শক্তির সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়। এই পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই, ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র বলা হয়। ব্রহ্ম যেন শক্তিকে আপনা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া দিয়া সৃষ্টিকার্য্যে উহাকে নিযুক্ত করেন।

'এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতঞ্চ-প্রোতঞ্চ। অব্যাকৃতাকাশমেব গুহা” (তৈত্তিরীয় ভাষ্যে, ২।১)।

এই অব্যাকৃত শক্তিকে শ্রুতিতে 'আকাশ' শব্দেও বলা হইয়াছে। এই অব্যাকৃত আকাশ ব্রহ্মে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। ব্রহ্ম এই আকাশ হইতে স্বতন্ত্র।

অব্যক্ত, অব্যাকৃতাদি শব্দগুলি যে এক পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ, তাহা পাঠক উদ্ধৃত ভাষ্যগুলি হইতেই বুঝিয়াছেন। তথাপি, আনন্দগিরির কথা শুনুন্—

“তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ, এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ, স প্রাণমসৃজত, মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ— ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধেশ্চ অব্যক্তস্য” (কঠ ভাষ্যটীকা)।

তবেই আমরা দেখিতেছি, শঙ্কর মায়া, প্রকৃতি, প্রাণ, আকাশ, অক্ষর, অব্যাকৃত ও অব্যক্ত—এই শব্দগুলি দ্বারা জগতের উপাদান-কারণ জড়শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই শক্তি দ্বারাই যে ব্রহ্ম জগতের কারণ, তাহাও শঙ্কর বেদান্তদর্শনে বলিয়া দিতেছেন—

“প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি” (১।৩।৩০) “অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্ত শব্দনির্দ্দেশ্যা……সা চ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা, নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি” (১।৪।৩)।

এই শক্তিকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই শক্তি ব্যতীত ঈশ্বর সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? জড়জগতের বীজ বলিয়া, এই শক্তি যে জড়, তাহাও এস্থলে পাওয়া যাইতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম-চৈতন্য, তাঁহার জড়শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই জড়শক্তি ব্রহ্মে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। “নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ, নাপীশ্বরাদন্যত্বং পৃথক্ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোর ভাবাৎ” (রত্নপ্রভা, ২।১।১৪)।

এখন, শঙ্করাচার্য্যের অপর একটী সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। শঙ্করের একটী গুরুতর মীমাংসা এই যে, এই শক্তির ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ সত্তা নাই; এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মের সত্তাতেই ইহার সত্তা; ব্রহ্মের স্ফুরণেই ইহার স্ফুরণ। যাহার সত্তা ও স্ফুরণ, অন্যের উপরে একান্ত নির্ভর করে, তাহাকে কল্পিত ও অসত্য শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং এই শক্তি, কল্পিত এবং অসত্য। পূর্ব্ব এক প্রবন্ধে, আমরা এ বিষয়ে শঙ্করের উক্তি এবং টীকাকারগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি; সুতরাং এ প্রবন্ধে আমরা আর সংস্কৃত উদ্ধার করিব না।*

“আত্ম-তাদাত্ম্যেন মৃষাত্বাৎ”। “মায়ায়াঃ আত্মাতাদাত্ম্যোক্ত্যা স্বতন্ত্রত্বনিরাসঃ”। “স্বতন্ত্রতা নাস্তি অতঃ মৃষাত্বমপি”। “আত্মসত্তয়ৈব সত্তা-ভাবাচ্চ ব্রহ্মণো নাদ্বিতীয়ত্ববিরোধঃ”। “কল্পিতস্য অধিষ্ঠানোঽভেদেপি, অধিষ্ঠানস্য ততোভেদঃ”। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ, এই প্রকার উক্তি দ্বারা এই মায়াশক্তির ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রসত্তা নিষেধ করিয়া, এই স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়াই ইহার কল্পিতত্ব ও মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। অনেকে এই মহৎতাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই, মায়াশক্তিকে একটা শূন্য, অলীক বলিয়া

* “শঙ্কর-মতে জগৎ সত্য না অসত্য” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ধারণা করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ মায়াশক্তিকে ও উহার বিকার জগৎকে এই ভাবেই শঙ্করাচার্য্য অসত্য ও কল্পিত বলিয়াছেন।

অচেতন জড় প্রকৃতির এই 'স্বতন্ত্রতা' লইয়াই শঙ্করাচার্য্য, সাংখ্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াছেন। সাংখ্যকার একভাবে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, এই অংশ লইয়াই সাংখ্যকে আক্রমণ করিয়াছেন। নতুবা, উভয়ই জড় প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া থাকেন। টীকাকারের কথা শুনুন্ —

"কিমনুমানৈঃ অচেতনপ্রকৃতিকত্বং জগতঃ সাধ্যতে, স্বতন্ত্রাচেতন প্রকৃতিকত্বং বা ; আদ্যে সিদ্ধ সাধনতা, অস্মাভি রনাদিত্রিগুণমায়াঙ্গী-কারাৎ দ্বিতীয়ে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরিত্যাহ" ( রত্ন-প্রভা, ২।১।১ )

টীকাকার বলিতেছেন, 'আমরাও জগতের অচেতন প্রকৃতি বা মায়া নামক উপাদান স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ইহার ব্রহ্ম হইতে স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা স্বীকার করি না। আমরা ইহাকে চেতনের অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত বলিয়া থাকি এবং ইহার সত্তা ও স্ফুরণ, চেতনেরই সত্তা ও স্ফুরণ সাপেক্ষ বলিয়া মনে করি।'

পাঠক, তবেই দেখুন, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ হইতেছেন ;— কেননা, ব্রহ্ম হইতে শক্তির কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা নাই। শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটাও মনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা দুইটী মুখ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। (১) ব্রহ্ম এই মায়াশক্তির অধিষ্ঠান এবং মায়াশক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (২)ব্রহ্ম হইতে মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা ব্রহ্মই।

এতদ্দ্বারা আমরা শঙ্করের অন্য একটী সিদ্ধান্তও প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রহ্ম এই জগৎ-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি স্বতন্ত্র বলিয়া, তাঁহার নিরবয়বত্বের কোন হানি হইতেছে না। তিনি নিমিত্ত-কারণরূপে মায়া হইতে স্বতন্ত্র ; কিন্তু (মায়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া) উপাদান-কারণ রূপে তিনি জগদাকারে পরিণত। "ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, সর্ব্বব্যব-হারাতীতমপরিণতং চ অবতিষ্ঠতে" (শারীরক ভাষ্য, ২।১।২৭)। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে শঙ্কর-মতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ,— এই জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপাভিব্যক্তির ক্ষেত্র। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, অন্যস্থলে এই জগৎকে ব্রহ্মের স্বরূপের আবরকও বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রবাসীতে বলিয়াছেন যে, এই শেষোক্ত মতটাই শঙ্করের, এবং পূর্ব্বোক্ত মতটা নাকি শঙ্করের ঘাড়ে চাপা-ইয়া দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য পরমার্থ-দৃষ্টিতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানাবস্থায় আমরা জগৎকে শব্দস্পর্শরূপ-রসাত্মক, স্বতন্ত্র পদার্থরূপেই বোধ করিয়া থাকি, সুতরাং জগৎ তখন ব্রহ্মস্বরূপের আবরক হয়। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলে, এ জগতে ব্রহ্মেরই বিকাশ দৃষ্ট হইতে থাকে। তখন, এ জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর বোধ থাকে না; —তখন এ জগৎ ব্রহ্ম হইয়া যায়। কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তা থাকিতে পারে না। এ জগৎ কার্য্য ; অতএব জগতের ব্রহ্মাতি-রিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু নিমিত্ত-কারণ-রূপে—অধিষ্ঠানরূপে—ব্রহ্ম নিত্যই স্বতন্ত্র।

"অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ, কার্য্যস্য

কারণাত্মত্বং, ন্ন কারণস্ত কার্য্যাত্মত্বং" ( শারীরক ভাষ্য, ২।১।৯ )।

"কারণং কার্য্যাদ্ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নং" (রত্নপ্রভা, ১।১।৮ )।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। নতুবা তিনি কথনও জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই, বা অলীকও বলেন নাই।

কথাটা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে। শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ হইলেও, বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে শক্তির কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা না থাকায়, ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। আবার, শক্তিই এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগৎ যখন কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তখন ব্রহ্মই বস্তুতঃ জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতাও অক্ষুণ্ণ রহিল, কেননা ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মই যখন জগদাকারে পরিণত, তখন এ জগৎ যে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বা বিকাশ, ইহাতে কি শঙ্করাচার্য্যের অসম্মতি থাকিতে পারে? এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, 'এই পরিণামি জগৎকে যদি স্বতন্ত্র বলিয়া মনে কর, তবেই অজ্ঞানতার কার্য্য হইল। এই পরিণামি জগতের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই; ব্রহ্মদর্শনই ইহার একমাত্র মুখ্য ফল। অতএব, জগৎকে ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপে, দ্বাররূপে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য; এই জগৎ সেই উপায়ের দ্বার মাত্র।' যত্তুব্রাহ্মণং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার পরিণামিত্বাদি, তদ্ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে···নতু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে" ( শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৪ )। বেদান্তদর্শনের ১।৪।৪ সূত্রের ভাষ্যেও অন্যরূপে এই তত্ত্বই বলা হইয়াছে। সে স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন,—'স্বতন্ত্ররূপে প্রকৃতি—'জ্ঞেয়' হইতে পারে না। ব্রহ্মের পরমপদই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞেয়; সেই পরমপদ প্রাপ্তির দ্বাররূপেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য'। "বিষ্ণোরেব পরমংপদং দর্শয়িতুমযমুপন্যাসঃ।" এই জন্যই "হিরণ্যগর্ভপর্য্যান্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী" ( বেদান্ত ভাষ্য, ১।৩।৩০ ) বলিয়া শঙ্কর এই জগতে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতাভাষ্যেও আনন্দগিরি, প্রকৃতি বা মায়াকে ব্রহ্মেরই "ঐশ্বর্য্যভূতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর জগতের উপাদান জড়শক্তিকেও উড়াইয়া দেন নাই এবং এই জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই। অথচ, নিরবয়ব ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল এই শক্তির ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রতা নাই, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ লোকে মনে করে যে, শঙ্কর জগৎকেও উড়াইয়াছেন! শক্তিকেও মানেন না!! মানেন কেবল তুরীয় ব্রহ্মকে!!!

আমরা এই তিনটী প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মতের যে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থে আমরা এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে আমরা মুখ্যরূপে, শঙ্কর-মতে, তিনটী সিদ্ধান্ত পাইলাম—

(১) ব্রহ্ম,—শক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

(২) কিন্তু, এই শক্তির ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রতা নাই।

(৩) এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# প্রদর্শনীর আনন্দোৎসব।*

স্বস্তি!

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদকারের অমৃতময়ী রাগিণী গীতির ছন্দে অদ্য এই তরুণার্করক্ত উষামুখে যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যস্মাৎ পরং না পরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়ো স্তি কিঞ্চিদ্।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।

যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছু নাই, যাহা হইতে ক্ষুদ্র বা মহৎ কিছুই নাই, যে দেবতা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পূর্ণ রহিয়াছে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, অজ্ঞান গহনের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক রূপধারী, বিশ্বের পরিবেষ্টিতা মঙ্গলস্বরূপকে জানিয়া প্রাণী চিরকালের জন্য শান্তিলাভ করে।

অদ্যকার কার্য্যে তিনিই আমাদের সহায়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া চলুন, শিল্প প্রদর্শনীর বিচিত্র কলেবরে প্রয়াণ করি। মানবের হস্ত প্রসূত চিন্তা ও কল্পনার হেমশৃঙ্খলে গ্রথিত দ্রব্যাদি, শুধু আনন্দ নহে, সকলের শ্রদ্ধা এবং নিবিড় ভক্তি আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

ভারতে সমাগত কোন আমেরিকাবাসিনী মহিলা স্থানবিশেষে একবার লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুক্তরাজ্যের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে হস্তশিল্পের প্রতি সকলের একটা বিশেষ আকর্ষণ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেখানকার কলেজ এবং স্কুলে কেবল যে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়, এমন নহে, লৌহ, কাষ্ঠ, পিত্তল প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে পাঠার্থীরা স্বহস্তে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে; কারণ, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কেবল মানসিক চর্চ্চা, মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণীকরণে পর্য্যাপ্ত নহে, ইন্দ্রিয়গ্রামের বিশেষ ক্ষমতা, দ্রব্যজগতের সহিত ঘনপরিচয়ে পরিপক্ক হয়। এজন্য হস্ত-শিল্প শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। একথা বিদ্যালয়ের কথা নহে; বহির্জগতের একটা নিতান্ত সত্য ঘটনা। কাজেই, প্রত্যেকের কোন না কোন শিল্প দ্রব্য স্বহস্তে তৈয়ার করিবার ক্ষমতা থাকা, সভ্য জগতে একান্ত অপরিহার্য্য। ইউরোপে প্রায় সকলেই একটী শিল্পবিদ্যার প্রতি মনোযোগ দিয়া থাকেন। সকলেই জানেন, ইংরাজরাণী স্বহস্তে সূচী-কার্য্য করিতেন। পিটার দি গ্রেট জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

* চট্টগ্রামে বর্ত্তমান-বর্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী এবং প্রসিদ্ধ হিতসাধিনী সভার তিন দিবসের বার্ষিক সূচনা উপলক্ষে লিখিত।

সেই দেশে কায়িক শ্রম অপমানের বিষয় নহে, শ্রদ্ধার ব্যাপার। শ্রমজীবীর পক্ষে, রাষ্ট্রজগতে যে কোন শ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

এই মৌলিক কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিলে, রাজকীয় চাকুরী-জগৎ হইতে আমাদের দৃষ্টি স্খলিত হইয়া সমাজের এবং পল্লীর অনাদৃত এবং উপেক্ষিত কোণে সহসা পতিত হইবে। তখন দেখা যাইবে, হতভাগ্য আমাদের সমাজদেহের অঙ্গে অঙ্গে এমন উজ্জ্বল মহার্হ ধনসম্পদ রহিয়াছে,যাহা লইয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি। এই সম্পদ যে আমাদের নিজের অর্জ্জিত, তাহা নহে। আমরা যেন কোন প্রাচীন দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য, বিচিত্র পঙ্কহৃতজ্যোতিঃ অট্টালিকার মধ্যে বাস করিতেছি। উহার কড়িবড়্গা স্খলিত হইয়া গিয়াছে; ঊর্ণনাভের কৃষ্ণতন্তুজালের ভিতর, কার্ণিসে খোদিত ডায়মণ্ডকাটা লতাপাতা মুছিয়া গিয়াছে; তাহার কারিগরী তথাপিও আমাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। ছাদের বক্ষে আশমানী রঙ্গের চিত্রকলা ম্লান হইয়াছে, স্ফটিকঝাড়গুলি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ঝুলিতেছে। এই হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষের মাঝে যেন আমরা বাস করিতেছি এবং সুদূর পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে আগত বাঁশীর আওয়াজ শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছি। এই সঙ্গীতবর যতই আমাদের শিরায় উপশিরায় প্রবেশ করিতেছে, ডাকিনীর মায়াপাশের ন্যায়, এই ঝঙ্কারসূত্র উত্তরোত্তর আমাদিগকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। হায় ভগবান! কবে আমাদের স্বদেশকে এই মায়াজাল হইতে মুক্তি দিবে?

প্রতীচ্যপুরীর অধিবাসীদের সহিত এ কোন্ সমরে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি? যাহারা বলে, এই সংগ্রাম,রাজ্য লইয়া, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ নহে; যাহারা বলে, ইহা বাণিজ্য লইয়া মারামারি, তাহাদের কথাও পর্য্যাপ্ত নহে। যদি বলা যায়,এই সংগ্রাম সভ্যতা সঙ্ঘর্ষমূলক জ্ঞানগত ও ভাবগত মানস-সংগ্রাম, তবে অনেকটা ঠিক বলা হয়। আমাদের জনসাধারণের বিজাতীয়ের মন্ত্রৌষধিমুগ্ধ মনকে উহার সনাতন সিংহাসন প্রদান করিতে হইবে। আমাদের ব্যাধি মানসিক এবং ভেষজও মানসিক, সন্দেহ নাই।

আমাদের সভ্যতার যাবতীয় আদর্শ আমরাই অবহেলাভরে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি এবং তাহাকে হৃদয় হইতে এত দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি যে,উহার বিরাট সত্ত্বা দৃষ্টপথে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। আমাদের মনের বল কমিয়াছে; সর্পের মোহিনী দৃষ্টিতে আবদ্ধ জীবের ন্যায়, স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বকার্য্যে— সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যায়ামে, ক্রীড়ায়—এই মনোমগ্না-শক্তি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশের হৃৎপিণ্ডের সহিত আমাদের শোণিত প্রবাহ বজায় রাখিতে হইবে।

আবার বাদসাহ কহিয়াছেন:—

প্রাণ গয়ে পৎ যো রহে
রহে প্রাণ পৎ যায়
ধিক্ জীবন অ্যায়সা নরনকো
কহতে আকনর সায়!

যে মানবের প্রাণ যায় অথচ সম্মান থাকে, সে ধন্য; আর যাহার অভিমান যায় ও প্রাণ থাকে, এবম্ভূত মানবের জীবনে ধিক্।

আমাদের সম্মান কোথায়? যথার্থতঃ, তাহা আমাদের স্বদেশের গৌরব এবং স্বজাতির মুক্ত প্রতিভার অখণ্ড প্রতিষ্ঠায়

বিদ্যমান রহিয়াছে। চট্টগ্রামের এই শ্যামল-সুন্দর উপত্যকার অধিবাসী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ আমরা সকলে যদি এই বিস্ময়জনক শৌর্য্যমহান্ ভূখণ্ডের ইতিহাস উপলব্ধি করিয়া ইহার সাহিত্য, শিল্পকলা, বাণিজ্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির অন্তরালে আমাদের ঐক্যতা অনুভব করি, তবে ইংরাজী শিক্ষাজাত গিল্টিকরা একতার প্রয়োজন হইবেনা। চট্টলমাতার হৃদয়চুম্বকের আকর্ষণই আমাদের সম্মিলনের পক্ষে যথেষ্ট।

আমি প্রদর্শনীর কৃত্যের এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অধিক সময় লইব না। দ্বার উদ্ঘাটকের মঙ্গলশঙ্খধ্বনিরূপে আমি দুই একটা কথার রেখাপাত করিতেছি মাত্র। বিশেষ বক্তব্য পরে হইবে।

কোয়েপাড়া গ্রামবাসীর অফুরন্ত উৎসাহের ফলে, বয়স্কদের চিন্তা, যুবকদের চেষ্টা এবং বালকদের আনন্দে, এই যে আমাদের সম্মিলন ঘটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে ভগবানের যে অঙ্গুলিসঙ্কেত রহিয়াছে,কে তাহা অবিশ্বাস করিবে? কর্ণফুলীর শুভ্র বঙ্কিম তীরে তীরে কুলে কুলে এক সময় এইরূপ আনন্দ সঙ্গম-জালে মুখরিত হইয়া উঠিবে, ইহা কি আশা করিতে পারি না? আজ যে গ্রাম এই পুষ্প-বৃষ্টিপুলকিত ভবিষ্যপথের প্রদর্শকরূপে হাতে হাতে দীপালী রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমার একান্ত নিজের পল্লী এবং পিতৃপুরুষদের জন্মভূমি ইহা ভাবিয়া আমি উচ্ছ্বসিত হইতেছি। কিন্তু আত্মবিস্মৃতির সুযোগ নাই, আনন্দ প্রকাশের সময়ও নাই। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে আমাদের এই আলোকময়ী, বৈচিত্র্যময়ী,সৌন্দর্য্যময়ী, চট্টল নগরীর লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়-বনস্থলীতে যতদিন স্বাস্থ্য, শৌর্য্য এবং জ্ঞানে আত্মশক্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন আমাদের শান্তি কোথায়?

অহরহ পরের দিকে চাওয়া ছাড়িতে হইবে, ধর্ম্মেকর্ম্মে ভিক্ষুকবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। কথায় কথায় রাজপুরুষদের কৃপার ভিখারী হওয়া, সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক। আমরা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকলেই ধর্ম্ম অপেক্ষা জগতে কিছুকেই বড় বলিয়া স্বীকার করি না। এবং, সুখ দুঃখের সহায় সমাজবদ্ধ সাধারণের পারস্পরিক মঙ্গলময় অনুশাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অনুশাসন বুঝিনা। আমাদের ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ নহে, এক ঘণ্টার কার্য্য মাত্র নহে; তাহা আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। দেশের সুখ স্বাস্থ্য সাধন করা, প্যাট্রিয়টিজম্ মাত্র নহে; তাহা হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মের একান্ত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এজন্য আত্মচেষ্টা-প্রসূত এই প্রদর্শনী বহুমুখী মঙ্গল সূচনা করিতেছে। ইহাতে রাজন্যের কৃপাপ্রদত্ত হস্ত নাই, কিন্তু সাধারণ ধনী দরিদ্র, কৃষক বিদ্বানের হৃদয়ের স্নেহ ধারায় ইহা অভিষিক্ত হইয়াছে।

নিজের চেষ্টার উপরে বিশ্বাস নিজের দেশবাসী জনসাধারণের উপরে আস্থাই যথার্থ জাতীয়তার ভিত্তি। উচ্চৈঃস্বরে বিজাতীয় ইতিহাসের কথায় বুলি গাথা নহে। স্বদেশবাসীদের শিক্ষায় অন্নে বস্ত্রে স্বাস্থ্যদান করার অধিকার আমাদের নিজের, পরের নহে। পরকে আমাদের এই কর্ম্মসীমার ভিতরে আসিতে প্রাণপণে দিব না। পরিবারের রুগ্ন শিশুর বা আত্মীয়ের সেবা করা যেমন ভ্রাতা ভগ্নী বা পিতা মাতার কৃত্য, ইহাও তেমনি। বাহিরের লোকের এই গণ্ডীর ভিতর আসিবার অধিকার নাই।

সমাজের স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও পূর্ব্বপুরুষদের হৃদয়রক্তের উষ্ণতা বজায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের নিজের চেষ্টায় জাতীয়-শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। আমাদের বিবাদবিসম্বাদ দূরীকরণার্থ, পল্লীতে পল্লীতে শালিসী আদালত গঠন করা প্রয়োজন। আমাদের পরিবার ও পল্লীর আত্মরক্ষার্থে আত্মরক্ষা-সমিতি ও ব্যায়ামাগার প্রয়োজন। পুলিশ পঞ্চাইতের হাতে আত্মরক্ষার ভার অর্পণ করা, কাপুরুষতা এবং নির্লজ্জতা। লাঠিখেলা, কুস্তিখেলা, অশ্বারোহণ, নৌকা-সন্তরণ, লক্ষ্যবেধ প্রভৃতির চর্চ্চা প্রয়োজন। জগতের সভ্যজাতি মাত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

কাজেই ইহা আমাদের নিজের এবং সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। কবে গ্রামে গ্রামে জাতীয় শিক্ষামন্দির এবং জাতীয় ব্যায়ামমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে? সেই দিন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমাদের সাধারণের হস্তশিল্প এবং নানাবিধ কারুকার্য্যের জন্য প্রদর্শনীর সূচনা একান্ত শুভজনক, সন্দেহ নাই। আমরাই আমাদের শিল্পীদের পুরস্কার দিব, সেই পুরস্কারের বিদেশীর উৎকট ঐশ্বর্য্য ঝঙ্কার না থাকিতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত স্বদেশীয়ের হৃদয়ের উদ্বেলিত আনন্দস্রোতঃ উহাকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইবে। কেন আমরা পরকে ডাকিয়া নিজের গলায় ফুলের-মালা ভ্রমে অজগরকে কণ্ঠে ধারণ করিব? বিদেশীদের করতালি যাচ্ঞা করিলে আমরা নিজেদের শক্তিই বুঝিবনা। গ্রাম্য কথায় বলে, খাল কাটিয়া কুম্ভীর আহ্বান কেন?

আজ এই প্রদর্শনীর সংযতসজ্জা এবং নম্রঐশ্বর্য্য আমার চক্ষে প্রগলভতাজাত অনেক বৃহৎ প্রদর্শনীর ঢক্কানিনাদ মুখর সাজসজ্জাকে ম্লান করিয়া দিতেছে। এইত চাই! আজ এই ঋজুশুভ্র সুন্দরশান্তশীতল প্রভাতে পল্লীর মঙ্গলশিল্পসম্ভারকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বালক বালিকা, যুবক প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের এই সম্মিলন কি মধুর, কি হৃদ্য, কি সরল ও সৌম্য!

শ্রমশিল্পের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও আসক্তি কি আনন্দ-প্রলয়ের সূচনা করিতেছে? এই ঊষা কীর্ত্তনের অনবদ্য রাগিণী যেন কোন লোকাতীত জগতের শুভবার্ত্তা বহন করিয়া বনপুষ্পগন্ধের ন্যায় দিকে দিকে বিস্তৃত হইতেছে। আজ চারি দিকের ঊষালোকে যেন এই শুভকৃত্যে সহস্র রশ্মিকর হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরোপরি অনুভব করিতেছি। আমাদের সর্ব্ব ত্রুটী ইহাতে শোধিত হইয়া যাইবে! গীতাকার বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা॥

হে কৌন্তেয়, স্বভাবজ কর্ম্ম সামান্য দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই সামান্যত দোষাবৃত থাকে।

আজ লুপ্তানন্দপল্লীর মাঝে উচ্ছ্বাসের কলধ্বনি আবার সকলে শুনিতে চাহি। আবার মৃদঙ্গের গম্ভীর রণন এবং নহবতের মাধুর্য্যবৃষ্টিতে শুষ্ক দেশ-হৃদয় মঞ্জুরিত হইয়া উঠুক! পুরন্ধ্রীর হুলুরবে প্রতিগৃহ ধ্বনিত হউক! শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠুক! চলুন যথার্থ স্বদেশ এবং স্বদেশীকে এইরূপে আমরা বরণ করিয়া লই।

এই প্রদর্শনীতে আমাদের বিশেষ আনন্দ কোথায়? শুধু দ্রব্যসম্ভার পুঞ্জীভূত করিলে

আজ এই সম্মিলন হইত না। এই প্রদর্শনী সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় বলিয়া আজ ইহাতে গৌরব করিবার বিষয় আছে এবং বাঙ্গালা দেশের সম্মুখে ইহাকে আদর্শরূপে ধরিবার অধিকার আমাদের আছে। দ্বিতীয়তঃ নগরের কোলাহল এবং দম্ভের মাঝে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংরেজী বক্তৃতার শরশয্যার উপর ইহা আশ্রিত নহে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, আমাদের সকলেরই ইহা যেন নেহাৎ অন্তঃপুরের ব্যাপার। ইহার অনুষ্ঠানে আমাদের কোন সঙ্কোচ নাই। দেশলক্ষ্মী মুক্ত হৃদয়ে এই কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই অগুরুধূপপূত শিল্পমন্দিরে তাঁহার আগমন সহজ হইয়াছে। কবির কথায় আমরাও আশা করি, আমাদের মাঝে চিরকাল যেন—

> রম্যান্তরঃ কমলিনী হরিতৈঃ সরোভিঃ
> ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ
> ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
> শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।

পারস্য কবি হাফেজ বলিয়াছেন, ধৈর্য্য আশ্রয় করিলে শ্বেতমৃত্তিকাও ক্রমশঃ মহার্হ লোহিত মণিতে পরিণত হয়, কিন্তু অনাবিল হৃদয়ের শোণিতেও উহার কলেবর রক্তিমাভ করা অসম্ভব নহে। আমরা শুধু অদূরাগত ভবিষ্যতে স্বদেশের ঐশ্বর্য্য কল্পনা করিব না। স্বদেশের জন্য স্বায়াত্ত হৃদয় শোণিত তিল তিল ব্যয় করিয়া বর্ত্তমানকে সার্থক করিয়া তুলিব। ইহার জন্য যে ত্যাগ প্রয়োজন, তাহা শুষ্ক ব্যাপার নহে। তাঁহা প্রেমময় ত্যাগ; তাহাতে আনন্দ আছে। কবি বলিয়াছেন,"আগমপন্থ হৈঁয় প্রেমকো" অর্থাৎ প্রেমের পথ অনির্ব্বচনীয়। এই প্রীতির চক্ষে আমরা এই উৎসবের সুদীর্ঘ দিনত্রয়ের কার্য্যাবলী দেখিব।

হিন্দু সভ্যতার"পুষ্পপুর", খ্রীষ্টীয় সভ্যতার "পোর্ট গ্রেণ্ড", মুসলমান সভ্যতার "সহরে-সবজে" এবং বৌদ্ধ সভ্যতার "রম্য"ভূমি আমাদের এই বিচিত্র দেশের ভবিষ্যৎ অতি বিরাট। এই স্থানে চারিটী বিরাট ধর্ম্ম ও সভ্যতার অপূর্ব্ব সঙ্গম হইয়াছে। ইহার ফল দূরগামী না হইয়া পারেনা। আমরা যেন কিছুতেই দেশের এই বিশেষত্ব না ভুলি। এই ভাব হইতেই আমাদের সম্মিলন হইবে। এই জন্য দূরে যাইতে হইবে না। স্বদেশের হৃদয়কে অস্বীকার করিয়া, ইতিহাসকে অবজ্ঞা করিয়া, বালকের ন্যায় যাহারা বড় বড় পরের মুখের কথা বলে, তাহাদের কৃপাযোগ্য ছবি দেখিয়া কোন ভক্ত কবির কথা মনে হয়—

> "দওড়ো কোশ হাজারো
> বসে লছ্‌থি পাশ"—

সহস্র ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিলে কি হইবে? লক্ষ্মী নিকটেই আছেন। দেশের যাবতীয় কার্য্য পল্লীর হৃদয় হইতে সূত্রপাত হইবে। বাহিরের আড়ম্বর হইতে চক্ষু ফিরাইতেই হইবে, তবেই দেশলক্ষ্মীর মুদিত কনকগৌরীশ্রী বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

# পরবশতা। (৩)

এই কথাই এখন অন্য ভাবে বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জীব-রাজ্যে পরবশতার যে শোচনীয় ফল, তাহা দেখিলাম। ইহাতে কি উদ্ভিদ কি জন্তু, সকলেরই দেহ ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে লতা স্বচেষ্টায় জীবন ধারণ করে, সে পত্রপুষ্পে সুশোভিত; যে লতা পরপুষ্ট, তাহার এ সকল কিছুই নাই; তাহার দেহ ক্ষীণ এবং শীর্ণ। যে জন্তু স্বাবলম্বী, তাহার দেহ ও মন পুষ্ট; কিন্তু পরপুষ্ট জন্তুর হস্ত, পদ, মুখ, উদর, স্নায়ু, শিরা, মস্তিষ্ক সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (১) পরপুষ্টের এতই মানসিক অবনতি হয় যে, তাহার আহার-গ্রহণ-বৃত্তি এবং বংশরক্ষণ বৃত্তিও পরিণামে লোপ হইয়া যায়। (২) দেহের সহিত মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে দেহ অবসন্ন ও ধ্বংসাভিমুখ হইলে মন অবসন্ন হইবেই। এ সকল আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি। জীববিজ্ঞানের ইহা বহু প্রমাণিত সত্য, মানব-ইতিহাসের ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। আত্মবশতা গেলে অধঃপতন অনিবার্য্য। (৩) পরবশতার প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত আছে। ইহাতে প্রথমতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক জীবের অধোগতি হয়, পরে তাহার বংশশ্রেণীও অধঃপাতে চলিয়া যায়। (৪) যে পরবশ ও যে অপরকে পরবশ করে, উভয়ই ক্রমে ক্রমে দৈহিক ও মানসিক দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়। অন্য জীব অপেক্ষা মানব অধিকতর দ্রুতবেগে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল, তাই যেমন অন্যাপেক্ষা অল্প সময়ে উন্নতি লাভ করে, তেমনই অল্প কালেই অবনতিও প্রাপ্ত হয়।

দেহ ও মন অবসন্ন হইলেই অবনতি। কিন্তু দেহ ও মনই মানবের ধর্ম্ম সাধনের উপায়, তাহার আর কোন সম্বল নাই। মানবজীবনের প্রধান কর্ম্মই ধর্ম্মসাধন, অন্য সকলই তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরিবার, সমাজ, রাজ্য—যাহা কিছু বল, সকলই মানবের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত। এতদ্দেশে এ তত্ত্ব এত প্রাচীন যে, ইহার পুনরাবৃত্তি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য দেশেও এ তত্ত্বের এক্ষণে ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে। ধর্ম্মসাধনই যখন মানবজীবনের একমাত্র কর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনই যখন মানবজন্মের একমাত্র সফলতা, তখন দেহ-মনের সম্পূর্ণ অবসাদক পরবশতা ধর্ম্মবিরোধী; ইহা

(১) Ray Lankester, Degeneration P, 33.

(২) Ency. Brit. 9 Ed, Vol, 18, P, 268.

(৩) আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত ক্যানাডার প্রতি লক্ষ্য করুন। যুক্তরাজ্য স্বাবলম্বী ক্যানাডা একাংশে পরাপেক্ষী। উভয়েরই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান, অধিবাসিগণও প্রায় সমশ্রেণীর, দেশদ্বয়ও পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। তথাপি যুক্তরাজ্য সভ্যতায় ও কর্ম্ম-কুশলতায় কত উচ্চ; ক্যানাডা তাহার কত নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে।

(৪) So it not only amongst men that there is a curse upon slavery, even animals become degraded by it *** Retrogression in an organ, which degenerates from disuse, takes place first in the mature stage, and does ** extend to the embryogenic stage ** much later.

Weismane. Heredity, Vol II, P 27-28.

স্বীকার করিতেই হইবে। সুস্থ ও সবল দেহ, দীর্ঘ-আয়ু ক্ষোভহীন প্রশান্ত, নির্ম্মল মন—এ সকল না থাকিলে ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। যাহার দেহ রুগ্ন, মন উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত, ধর্ম্মসাধন তাহার অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ, ধীসম্পন্ন মনীষিগণ ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পুনঃপুনঃ উপদেশ করিতেছেন। কবি বলিতেছেন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং, শরীরই প্রধান ধর্ম্মসাধন। শ্রুতি বলিতেছেন, সযোবলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্যগতং তত্রাস্য ·····। (১) যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, যাবতীয় পদার্থই তাহার বলগত হয়। বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। দৈহিক ও মানসিক বল পৃথক নহে; বল এক বল, বল অদ্বিতীয়। সেই এক শাশ্বত মহাশক্তি জগতের ধারক। ইহাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিবে। বলকে বিস্মৃত হইলে কোন ব্যক্তিই, কোন জাতিই, কোন সমাজই অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। দেহের বল, মনের বল, দুই-এ সমন্বয় করিতে হইবে। বরং দেহের বল অপেক্ষা মনের বলই শ্রেষ্ঠ। (২) মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন, বলদ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করা যায়। (৩) কিন্তু সে অধর্ম্মমূলক বল নহে; বলকে ব্রহ্মবোধে আপনার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। নচেৎ অধঃপতন অনিবার্য্য।

বলহীন পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না, সে ধর্ম্মে পতিত; এ মর্ত্ত্য-জগতেও বলহীনের স্থান নাই। যে জাতি ক্রমে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও জীবন্মৃত হইতেছে, সে জাতি ধর্ম্মে পতিত। যাহার মনে হর্ষ নাই, সে জাতি তিষ্ঠিতে পারে না। (৪) মানবের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষলতাদিও হর্ষে জীবন ধারণ করে। স এষ (বৃক্ষ) * * * * * মোদমানস্তিষ্ঠতি।" (৫) যাহার জাতীয় জীবনে আনন্দ নাই, জাতীয় ক্রীড়াকৌতুক নাই, রোগে শোকে যে জাতি প্রায় শয্যাগত (৬) যাহাদিগের সহস্র সহস্র ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যাহাদিগের জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মে পতিত। ধর্ম্মই ধরাধারক। সুতরাং এই প্রবলাভিমুখ-গতি প্রতিরোধ করিতে না পারিলে ধরিত্রী তাহাদিগকে বহুদিন ধারণ করিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

সকল ধর্ম্মের সার উপদেশ আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানাই বন্ধন-মুক্তির একমাত্র উপায়। কি ঐহিক কি পারত্রিক, সর্ব্বত্রই আপনাকে জানিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে আপনাকে চিনিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের সফলতা। অন্য জীবেরও তাই। যে হস্তীকে এক সামান্য বালক অঙ্ক কুশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আজ্ঞাবহ করিতেছে, সে

(১) ছান্দোগ্য, ৭।৮।২

(২) মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া। ধম্মপদ
মনঃ পূর্ব্বঙ্গমাঃ মনঃশ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ। অর্থাৎ মনই ধর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্ম মনোময়।

(৩) And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of Heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Matthew Ch II. 12.

(৪) Descent of Man Part I. Ch VII, P 285-6

(৫) পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলিতেছেন "স এস বৃক্ষ * * * মোদমানো হর্ষং-প্রাপ্নুবং স্থিষ্ঠতি।" সেই বৃক্ষ * * আমোদ সহকারে জীবিত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য ৬।১১।১

(৬) পল্লীতে প্রায় আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এক-জ্বর রোগেই।

আপনাকে চিনে না। যে মুহূর্ত্তে সে আপনাকে চিনিতে পারে, ঐ বালকের ন্যায় শত শত বালকের সাধ্যও নাই যে, আর তাহাকে তিলার্দ্ধও পরবশে রাখিতে সক্ষম হয়। যে মানব নীচপ্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া ঘৃণ্য পতিত জীবন যাপন করিতেছে, সে যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে যে, সে-ই শুদ্ধমুক্ত নিত্য বস্তু, তন্মুহূর্ত্তেই তাহার প্রবৃত্তির দাসত্ব-শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে। জীব জগতে যে দিকেই দেখ, ঐ এক কথা,—আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে চিনিতে পারিলেই সব হইল। কিন্তু যে পরবশ, যাহার দেহ ও মন পরবশতার ফলে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, সে আপনাকে চিনিবে কেমন করিয়া? সে যে অমৃতের অধিকারী, সে যে নিত্য মুক্ত, তাহা সে বুঝিতেই পারে না, তাহা সে জানিতেই পারে না। যে পরবশ, সে ভয়ে ভয়ে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে; তাহার আত্মার বিকাশ হইতেই পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতেই স্বাবলম্বনবৃত্তি জাগিয়া উঠে*। যাহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রায় নাই বলিলেই হয়, যাহার জাতীয় জীবনের কর্ম্ম সকল প্রায় সম্পূর্ণ পরায়ত্ত, সে জড়, সে ধ্বংশাভিমুখ। (৭) তাহার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হইবার উপায় নাই। তাই সে আপনাকে প্রকৃত পক্ষে চিনিতেই পারে না। সে একবার প্রবৃত্ত হইলে যে কর্ম্ম অনায়াসে করিতে পারে, তাহা সে চিন্তা করিতেও বিভীষিকা দেখে; আর আপনার অক্ষমতা কল্পনা করিয়া নিরুদ্যম হয়। আপনাকে সে প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করিতে জানে না। তাহার আত্মপ্রত্যয় নাই। যে বিশ্বাসী, যাহার কণা মাত্রও আত্ম প্রত্যয় আছে, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বত উড়াইয়া দিতে পারে; তাহার কিছুই অসম্ভব নাই। (১) সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে মনীষিগণ এই কথাই বলিতেছেন। আত্ম-প্রত্যয়, আত্ম-জ্ঞান থাকা চাই, নচেৎ জীবের ধর্ম্মহানি হয়। পরপুষ্টের আত্ম-প্রত্যয় থাকিতেই পারে না; কারণ তাহার দেহ ধ্বংসাভিমুখ, মন অবসন্ন। সুতরাং পরপুষ্টের জগতে স্থান নাই, তাহাকে ধরিত্রী ধারণ করেন না, তাহার বৃথা ভার তিনি বহন করেন না। ধর্ম্মোধরা ধারকঃ; যাহার ধর্ম্মহানি হইল, তাহাকে ধারণ করিবে কিসে? তাই সে নির্ম্মূল হয়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে না পারিলে, পরিণামে ধ্বংসের মুখ হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যদি কোন জাতিকে দেহে ও মনে অবসন্ন দেখা যায়; আর সেই অবসন্নতা, সেই জড়তা, সেই কর্ম্মহীনতা হইতে ক্রমে ধর্ম্মহানি হইতে থাকে, তবে তাহার পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকে না। তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দেহের ও মনের, বিশেষতঃ মনের বলে বলীয়ান হইতে হইবে; কারণ বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি * * * বলেন লোকস্তিষ্ঠতি, বলমুপাস্বেতি। (২) বলের সাধনা করিতে হয়। ইহারই মহিমায় ধর্ম্মহানি হইবার পর আবার যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতেছে। ইহাই জীবকে স্ব-ভাবে স্ব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জগতের কর্ম্ম-মঞ্চে এ অভিনয় পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। ইহার সাধন দেহ ও মন, বিশেষতঃ মন। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয়। যাহারা ব্যক্তিগত

* Descent, Part 1. Ch VII. P 283.

(১) Matthew 17, 23.

(২) ছান্দোগ্য ৭।৮।১।

অথবা জাতীয় ধ্বংসাভিমুখগতি প্রতিরোধ করিবে, তাহাদিগকে মনের আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। (৩) মন সঙ্কল্প করিবে, বুদ্ধি তাহার (৪) দাসের ন্যায় উপায় উদ্ভাবন করিবে, চিত্ত তাহাকে আত্মসাৎ করিবে, অহং জ্ঞান পরিপূর্ণ হইবে, তখনই কর্ম্মের পূর্ণ সফলতা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চতুষ্টয় মিলিয়া জীবকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহারই নাম একাগ্র সাধনা। ইহাতে তিলমাত্র পশ্চাৎপদ হইলেও ধ্বংস হইতে অব্যাহতি নাই। পণ্ডিত রে ল্যাঙ্কেষ্টার সত্যই বলিয়াছেন, মানব প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। (১) মানবকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই নৈতিক বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবেই। আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র উপায়। যে পরবশ, তাহার আত্মরক্ষার ইহাই একমাত্র পন্থা। এ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবেই। বর্ত্তমান অবসন্নতার পদে অবনত মস্তকে আপনাকে ঢালিয়া দিলে কিছুই হইবে না; তাহার প্রতিকূল কর্ম্ম করাই যথার্থ ধর্ম্ম। (৫) জড় প্রকৃতির সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য, সমাজবদ্ধ জীবের সম্বন্ধেও তদ্রূপই। আত্ম-প্রতিষ্ঠাই এ যজ্ঞের মূলমন্ত্র। পরবশতার অবসাদ, অবসাদে ধ্বংস; আত্ম-প্রতিষ্ঠাই একমাত্র মহৌষধ। জীবের ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্রীশশধর রায়।

# স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে? এ দেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে, এ দেশ তোমার নয়!

২

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটী ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাওনা একটী মুষ্টি, মরুছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, ছোট লাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!

৪

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরুছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়;

---

(২) এই নিমিত্তই মনকে বংশানুক্রমে নির্ম্মলভাবে গড়িয়া তুলিতে হয়।

(৩) সঙ্কল্পের।

(১) Man is natures' rebel, * * her insurgent son. Nature & Man, P. 22-23

(৫) The trust piety seems to me to reside in taking action and not in submissive acquiescence to the routine of Nature,
Galton, The Herbert Spenser's Lecture. 1907, P. 9.

একশ রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা
গাধা'র কাছে বাঁধার বল বাঘের করে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ' কারে,এদেশ তোমার নয়!

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে,তারাই তাদের বল্‌তে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ' ব'লে দাবি কর্লে নাকি বিলাত পাবি?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠি তোরা নাইক লজ্জা ভয়!
এই যদিরে 'বৃটিশবরণ' মরণ কারে কয়?

৬

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম-অন্ধ কাণা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা পাখাকুলী—পীলা কাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
'যাহার লাঠী, তাহার মাটী' চিরদিনের কথা খাটি,
এতো নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়!
দেখ্‌তে যারা কাঁপে ডরে,মার্‌বার আগে আপ্‌নি মরে,
ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
সোণার বাঙ্গলা সোণার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে, এই কি মনে লয়?
'সোণা' 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়!
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়!

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়!
তাদের কলে তোরাই কুলি,তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়!
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়!

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে,এ দেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়!
অই যে ওদের 'কাটামুণ্ড' সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয়!
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয়!

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা অজার মাথা বয়,
ও গুলা সব মানুষ হলে, কোন দিকে কে যেত চলে,
টেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারত ভূমি লয়?
মরুদেশের গরুকাটা ভারত করে জয়?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
যখন বাদসা মুসলমান, তখন তাদের "হিন্দুস্থান",
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়!
অযোধ্যা কই—'আউধ'এযে,দাক্ষিণাত্য—ডেকান সে যে,
'সিলনে' গিলেছে লঙ্কা—মুক্তামণিময়!
ডমাউন আর ডিউ গোয়া,চুণি পান্না সোণার মোয়া,
যায়না তাদের ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
'দিল্লী'র পরে 'ডৌল্লি' হলো, আরো বা কি হয়!
স্বদেশ বলে কর্লে দাবি,আর কি তোরা এ দেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির দুর্গময়!

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে,এ দেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য,অসীম ধৈর্য্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্য্যে-বীর্য্যে অসুর পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চম্‌কে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়!

প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে,
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্ত বিন্দু,
পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারত ভূমি প্রথম করে জয়!
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

# ভারতীয় অর্থনীতি।

নবযুগে নবশক্তির বিকাশে ভারতের নবোদিত উষায় এক মনোপ্রাণহর যে দৃশ্য দেখা দিয়াছে, ইহার আরম্ভ ভবিষ্যতের সাক্ষীরূপে আমাদিগকে আর্য্য মনীষীদের বেদমন্ত্র স্বরের গম্ভীর স্বরে বলিতেছে "মাভৈঃ, ভারতের সুপ্রভাত দেখা দিয়াছে, ভারত আবার সমুন্নত হইবে।"

এই দৈববাণীর মেঘমন্দ্র ভারতের প্রত্যেক নরনারীর কর্ণে বীণাধ্বনির মত নিপতিত হইতেছে। কোটী কোটী নরনারী আশায় বক্ষ বাঁধিয়া ঐ শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে, এই শ্রুতিসুখকর বার্ত্তা তুষার ধবল হিমাচলের উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে কন্যাকুমারীর প্রান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত, করাচী হইতে ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়া সমগ্র নরনারীকে হঠাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

এই শুভ ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের মূলমন্ত্রগুলির সাধনা চাই, নতুবা সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভারতের মুক্তির বীজমন্ত্র গ্রহণ করা; ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুরা বহু বৎসর হইতে মন্ত্রশক্তির বিষয় স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, একটী মন্ত্র জগতকে এক এক সময় কর্ত্তব্য পথে লইয়া গিয়াছে। ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লবের মূল মন "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" আজ জগতে বেদমন্ত্র ওঁঙ্কারের ন্যায় হইয়াছে। জগতের মানব মাত্রই এই মন্ত্রের উপাসনা করিতেছে। কিন্তু অধিকারী ভেদে মন্ত্রগুলি প্রচলিত হইতেছে। আমেরিকা আগে এই মন্ত্র সাধনের অধিকারী হইয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিল, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি এই মন্ত্রের উপাসনায় ছুটিয়াছে। শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা মানুষের মন যখন মন্ত্রলাভের উপযোগী হইয়া উঠে, তখন মানব মনে ভগবান সাক্ষাৎ গুরু হইয়া এই মন্ত্র প্রকাশ করেন, তখন মানুষ যেখানে বৈষম্য দেখে, অর্থাৎ সাম্য মন্ত্রের অভাব দেখে, তখনই অধীর হইয়া পড়ে, তখন জগৎকে মিত্র ভাবে আলিঙ্গন করিতে চায়। তখন স্বাধীনতার জয় পতাকা সর্ব্বত্রই অমল ধবল পক্ষ বিস্তার করিয়া পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হউক, এইরূপ ইচ্ছা করেন। তাহার দৃষ্টান্ত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি কোন দেশের স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া কিরূপ আনন্দিত হইতেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

অদ্য এই উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুন্নত ভারতীয় জাতির কর্ণে ভগবদ্দত্ত এই

মহা মন্ত্র বিশেষ ভাবে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের আজ হস্তপদ বদ্ধ ও ভারত আজ শৃঙ্খলিত, কিন্তু তাই বলিয়া আলেক্জেণ্ডারের আনীত দস্যুর মত ভারত কি বলিতেছে না ?—

"ইংরাজ, আমরা বন্দী—তোমার আইন ভয়ে যদিও সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু My soul is unconquered, আমি এখন চাই—এই মন্ত্র-শক্তি।" এই শক্তির প্রভাবেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আজ ভারতের প্রতি পল্লী মুখরিত। এই মন্ত্রশক্তির সাধনা চায় বলিয়াই ভারত আজ এত বিষন্ন।

প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া মন্ত্র দিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যেরা মন্ত্র জপ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের বসিবার আসন, পূজার বসন, ভোজনের উপকরণ সমস্তই অপহৃত। ভারতের ত্রিশ কোটী শিশু আজ রোগ শয্যায় নিপতিত, দুর্ভিক্ষগ্রাসে উৎপীড়িত, আশ্রয় ধরিয়া উঠিবার একখানি লাঠীও নাই !

আর কত ভাই গুরু-মন্ত্র গ্রহণের বিরোধী ! তাঁহারা যদিও মনে মনে এই মন্ত্র শক্তির প্রভাব স্বীকার করেন, কিন্তু কেবল সামান্য স্বার্থে অন্ধ হইয়া ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, "ভ্রাতৃগণ, তোমরা গুরু-মন্ত্র শুনিয়াছ বটে, কিন্তু তোমরা এখনও উক্ত মন্ত্র-সাধনের উপযোগী হও নাই। গুরু মন্ত্র গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে—যোগবলে বলীয়ান না হইলে, ধ্যান ধারণায় সক্ষম না হইলে, এই মন্ত্র আয়ত্ব করিতে পারিবেনা।" কি মূর্খের কথা ! স্বয়ং বিশ্বপিতা বিধাতা ডাকিয়া মন্ত্র দিতেছেন, আমি মন্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, তাহা বিচার করার তুমি কে ?

অতএব হে ভারতবাসী, মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দাঁড়াও। তোমাদিগকে সুসময়ে পিতা ডাকিতেছেন। এখনই মন্ত্র গ্রহণ করিবার প্রকৃত সময়। যদিও তোমরা অনেকে মুখে বন্দেমাতরম্ শব্দ উচ্চারণ করিতেছ, কিন্তু এখনও তাহার প্রভাবে শক্তি জাগরণ করা হয় নাই। এই মন্ত্র প্রভাবে শক্তি জাগরিত করার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যবহারিক দ্রব্যের অভাব। কিন্তু ভগবান যখন দয়া করিয়া মন্ত্র দিয়াছেন, তখন তাহার সাধনের উপকরণ তিনিই দিবেন, তাহা দৃঢ় রূপে বিশ্বাস কর।

এই মন্ত্র সাধনের প্রধান উপকরণ আমার মনে হয়, অর্থ। ভারতের এই অর্থাভাব না ঘুচিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। অর্থাভাব ভারতকে নিতান্ত নিস্তেজ ও হীন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহের বিশেষ দরকার।

আমরা মোটামুটী দেখি, ইংরাজের মত একটী জ্ঞানবিজ্ঞান-সমুন্নত জাতি আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের শিক্ষা দীক্ষার ভার লইয়াছিল, এই দেড়শত বৎসর যদি ইংরেজ প্রাণপনে চেষ্টা করিত, তবে ভারত কি হইত, কল্পনাও করিতে পারি না। অবশ্য অনেকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছে; কেহ বক্তৃতা দিতেও শিখিয়াছে, কিন্তু ন্যায়ত ও ধর্ম্মতঃ বলিতে হইলে—ইংরেজ হইতে ভারত আশানুরূপ উপকার পায় নাই, যাহা ইংরেজ ভারত হইতে নিয়াছে, তাহার দশমাংশও ভারত পায় নাই।

তবুও ভারত-কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই, তবুও আবেদন নিবেদন, তবুও—প্রভু আমার বিদ্যালয়ের দরকার, আমার কেরাণীগিরির দরকার, আমার ডেপুটী-গিরির দরকার, এই সব কাতর ক্রন্দন ও প্রার্থনা চলিতেছিল। এক দিকে কোটী২ মুদ্রা

ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতে লাগিল, আমাদের লক্ষ্য হইল, টাকা যায় যাউক, ক্ষতি কি, আমি যে কোনরূপে একটী চাকুরী ধরিয়া রাখিতে পারিলেই রক্ষা পাই। এইরূপ দাসত্বের ভাব জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়া জাতিকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিতে লাগিল। অবারিত শোষণনীতিতে শ্বেতাঙ্গদল ভারতের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত বাকী রাখিলেন না। লবণের টেকস্ এদেশীয় দরিদ্র লোককেও আক্রমণ করিল। অজ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল।

নীলকর, চাকর রূপ বিষধর আসিয়া নিষ্কর ভূমি ভোগ করতঃ এদেশের কুলী ও জনসাধারণের উপর ক্রীতদাসের অত্যাচার করিতে লাগিল। এই অত্যাচারের প্রবলতরঙ্গ দেশের শিষ্ট-শান্ত রাজভক্ত অসহায় দরিদ্রগণ অকাতরে সহ্য করিয়াছে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোর ডাকাত দমন হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বশোষক বিলাস বাসনা, বিদেশী দ্রব্য, এদেশ হইতে কোটী কোটী অর্থ চুরি করিতে লাগিল। লোকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত গুপ্ত শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রসুপ্ত হইল। মানুষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন হইয়া রাজদ্বারে আবেদন নিবেদন ভিন্ন জীবনের উপায়ান্তর দেখিতে পাইল না। নিজের নাভির কস্তুরী দেখিতে না পাইয়া মৃগ যেমন অকুল হইয়া ঘুরিয়া থাকে, সেইরূপ, দেশের ভূমিতে যে কি স্বর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া চাকুরী প্রত্যাশায় জীবন-স্রোত প্রধাবিত করিতে লাগিল। চাকুরীকে স্বর্গের সিঁড়ি মনে করিতে লাগিল। ক্রমে মনুষ্যত্বের সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। বাণিজ্যের প্রতিও অনেকের অবহেলা হইল, জাতিভেদ প্রথার প্রবল অত্যাচারে বিদেশে বাণিজ্য-তরী প্রেরণে বাধা উপস্থিত হইল। অর্থই সর্ব্ব-অনর্থের মূল। এই অর্থ-প্রভাবে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতিরা ধরাকে সরা মনে করিতেছে। স্বাধীনতা না থাকিলে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা হয় না, সুতরাং জাতীয় ধন বৃদ্ধিরও তেমন সুযোগ হয় না। এই কথা সত্য হইলেও, আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যে আমরা ক্রটী করিতেছি। তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে এক প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে —

নির্ধনঃ পুরুষ কুসাঃ

ইহা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে প্রযোজ্য, জাতীয় জীবনেও তেমনই প্রযোজ্য।

বাস্তবিক ভারতের ধন রত্ন অপহৃত হওয়াতে ভারত খুব দুর্ব্বল হইতেছে।

ছেলেবেলা ঋজুপাঠে পড়িয়াছিলাম, "অর্থেন বলবান্ সর্ব্বে অর্থাৎ ভবতি পণ্ডিত, পশ্যায়ং মূসিকং পাপং স্বজাতি সমতাং গতম্" তৎপর মুষিকের গর্ত্ত খুঁড়িয়া যখন সমস্ত ধন ( শস্য ) বাহির করিয়া ফেলিল, তখন মুষিকের অমিত প্রভাব অন্তর্হিত হইল।

"সংসারের মূল অর্থ ও শরীরের মূল রক্ত"। আবার অর্থই রক্ত বৃদ্ধিরও মূলে। অতএব অর্থ বৃদ্ধির জন্য ভারতের বিপুল আয়োজনের দরকার।

ভারতীয় অর্থ নীতির বিষয় আলোচনা করিতে গেলে ইহার এক শ্রেষ্ঠ অন্তরায়, হিন্দুর জাতিগত বাধা মনে হয়। হিন্দুর জাতি যাওয়ার ভয়—একটী বড় বিষম ভয়। এই ভয়ে আকুল হইয়া হিন্দুদের সর্ব্বস্ব গেল। বিদেশী বণিকেরা আসিয়া ভারত

হইতে কোটী ২ মুদ্রা অপহরণ. করিয়া লইতেছে, কিন্তু ভারত করিতেছে কি?

"ঐ ক্ষুদ্রতার গণ্ডী মাঝে বসায়ে আপনারে, আপন পদে প্রদানিছে অর্থ ভারে ভারে" ভারতের সঙ্কীর্ণতা দূর হইল না, ব্রাহ্মণগণের মোহিনী মায়ার মন্ত্র বিষম মন্ত্র, এই জাতির ভয়ে ভারত হস্তপদবদ্ধ কুষ্মাণ্ডের মত পতিত রহিয়াছে।

মুষ্টিমেয় পার্সী জাতি, জাতি-বন্ধন মানে না বলিয়া, ধনী হইতে পারিয়া, এখন মানব বলিয়া পরিচিত হইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুন্নত এই নব ঊষার অরুণালোকেও যদি এই জাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতবাসী হিন্দুগণ দিগ্‌বিদিকে আপনাদিগকে বিকীর্ণ করিয়া না দেয়, তবে কি আর ভারতের আশা আছে?

শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস
তাহার অর্দ্ধেক চাষ"—

ভারত কেবল চাষা হইয়া কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কি? সামান্য চাষা মাত্র। এখন কি ভারতের বাণিজ্য-তরী আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি প্রদেশ হইতে ধন রত্ন আহরণে বড় হইতে পারিয়াছে? পারিলেও তাহা অতীব নগণ্য।

বাস্তবিক উন্নতিশীল ইংরেজ জাতির একমাত্র উন্নতির হেতুর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, বাণিজ্যই এই জাতিকে বড় করিয়াছে। বহির্বাণিজ্য না করিয়া পরস্পরের রক্তশোষক অন্তর্বাণিজ্যে তেমন লাভ নাই। বিদেশ হইতে ধন রত্ন আনয়ন করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ কিসে হইবে?

নাবিক-বিদ্যালয়ে ভারতের অনেক ছাত্রের প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। চট্টগ্রামের লস্করগণ জাহাজ পরিচালনে প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহাদেরও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুবিধা নাই। জাপান, এমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ ও তাহাদের পরিচালনা প্রণালী শিক্ষা করা আমাদের নব্য যুবকদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আর কত কাল আলস্য ও ঔদাস্যে সময় ক্ষেপণ করিবে? আর কতকাল দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলার গল্প, গোপাল ভাঁড়ের রস-কাহিনীতে কিম্বা স্কট থেকারের নভেল, কিম্বা ১।৪।১০ টা আইন গ্রন্থ পড়িয়া মাথায় বক্র চক্র সংস্থাপন করিয়া, কিম্বা ডেপুটিত্ব ও মুন্‌সেফীত্ব করিয়া সময় কাটাইবে? প্রাণের একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কোন কার্য্যেই পারদর্শী হওয়া যায় না। যৌথ প্রথায় কারবার করিবার জন্য অগণ্য কোম্পানীর সৃষ্টি হওয়া দরকার। এক জাতিভেদ প্রথাতে ভারত এত নীচে পড়িয়া গিয়াছে! ধর্ম্ম মানুষকে ধরিয়া রাখিবার জিনিষ "ধর্ম্মেনধ্রয়তে লোকাঃ" সেই ধর্ম্ম যখন আমাদিগকে ধরিয়া না রাখিয়া মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত করিতেছে, তখন জাতি জাতি করিয়া চীৎকার করা কি আমাদের কর্ত্তব্য? আমার মতে জাতির সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

আমাদের দেশে অনেকের যথেষ্ট টাকা সত্বেও, বিলাত, এমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সুশিক্ষার জন্য সন্তানগণকে প্রেরণ করিতেছেন না। অথচ এই দেশে তেমন্ শিক্ষার সুবিধা নাই। আজ যদি ৫০০০ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বালক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিত, তবে আমরা আরও ২।৪ জন জগদীশ বসু কি পাইতাম না? যে জাতি যে উপায়ে ধনবৃদ্ধি করে, তাহার নিকট সে

উপায় শিক্ষা করাই দরকার। সে উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের কেহ২ যে ধন লাভ করিতেছেন, তাহাও দেখা যাইতেছে। তবুও সার্ব্বজনীন একটা সজীবতার ভাব লক্ষিত হইতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত ভারত বাণিজ্যের জন্য বদ্ধপরিকর না হইবে, ততদিন ভারতের উত্থান হইবে না। এখানে কেহ এই আপত্তি উত্থিত করিতে পারেন, স্বাধীন নহে বলিয়া ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের বাধা আছে। আমি পূর্ব্বেই এই কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। ভারতের অর্থ বৃদ্ধির দ্বিতীয় অন্তরায় ব্যবসাভেদ। এই ব্যবসা ভেদের প্রথা থাকাতে, একটী ব্রাহ্মণের পুত্র মনে করিলে উৎকৃষ্ট স্বর্ণকার হইতে পারিত, কিন্তু তাহাকে পূজা অর্চ্চনা করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইল, সুতরাং স্বর্ণ কার্য্যে তাহার প্রতিভার বিকাশের কোনরূপ সুবিধা হইলনা। পূর্ব্বে ব্যবসাভেদে কার্য্যের একটী শৃঙ্খলা ছিল বটে, কিন্তু জাতীয় উত্থানের দিনে ও বৈজ্ঞানিক যুগে সেই ব্যবসা সার্ব্বজনীন হওয়া উচিত। যে, যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-তনয় যদি উৎকৃষ্ট কৃষক হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে তাহাই হইতে হইবে। মোটামুটী এক কথায় বলিতে গেলে ইংরেজের দৃষ্টান্তে ভারতকে নূতন ভাবে গঠিত করিতে হইবে।

এদেশে ধন বৃদ্ধির তৃতীয় অন্তরায় কৌলীন্য প্রথা।

কুলীনের পুত্রগণ নবীন নধর তনু খানি লইয়া, মুখে এক গাল হাসি মাখিয়া, টেরি বাকাইয়া, এক গাছি ছড়ি হস্তে এদিক ওদিক ঘুরিয়া অনর্থক সময় ক্ষেপণ করিবেন, তিনি হল চালন করিতে পারিবেন না, বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিবেন না, মৎস্যের ব্যবসা করিতে পারিবেন না, তিনি কেবল পারেন সঙ্গীত ও পরচর্চ্চা করিতে ও মধ্যে মধ্যে বোতল সেবা, কুলটা নিলয়ে রাত্রি ক্ষেপণ করিতে! ইহারা ভিখারী অপেক্ষাও দেশের বিশেষ শত্রু।

তৎপর দেশের অন্যতম শত্রু ভিক্ষাব্যবসায়ী দল।

ভারতের ভিক্ষুকের ন্যায় এত ভিখারী আর কোন সভ্য জগতে পরিদৃষ্ট হয় না। অর্থনীতি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, ধনোন্নতির ত্রিবিধ সাধন, মূলধন, জমি ও শ্রম। সুতরাং ধনোৎপত্তির ত্রিশক্তি মধ্যে শ্রমরূপ একশক্তি, এরূপ জড়ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, সমাজের যে কিরূপ অকল্যাণ হয়, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুভব করা কর্ত্তব্য।

বৈরাগী ও সন্ন্যাসী দল কেবল কৌপীন ও রং বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কতকগুলি ভিখারী জাতির লোক সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতমাতা যেরূপ স্বল্পায়াসে শস্য সম্পত্তি দান করেন, তাহাতে কাহাকে ভিক্ষাজীবী হইতে হয় না। নেলসন যেমন বলিয়াছিলেন, "England wants every man to do his duty," সেইরূপ, প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ভারতের প্রত্যেকে যাহাতে স্বীয়২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তৎপ্রতি প্রণিধান করা। প্রত্যেক সভ্য দেশে এই নীতির বিকাশ হইতেছে। আপনি ব্যক্তিগত হিসাবে দয়াপরবশ হইয়া যদি আজ ভিখারীগণকে মুষ্টি ভিক্ষাদান করেন, তবে দেশের নিকট ও ঈশ্বরের নিকট আপনি সমান অপরাধী হইবেন। কেননা, আপনার দয়ার অন্তরালে

দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত আছে। আপনি সমাজ-চিন্তা করেন না।

আমার মতে, ইংরেজ তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন করা অপেক্ষা দেশের দুর্নীতি তাড়াইয়া দেশে স্বাধীনতাকে জাগরুক করা মহত্তর ব্যাপার। এ দেশের গাত্রে, এমন কি প্রতি রোমকূপে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? প্রথমতঃ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গিনী ভগিনীকুলকে আমরা অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাঁহারা যেন আমাদের ক্রীড়া-পুত্তল। যদি তাঁহারা সমুচিতভাবে শিল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমুন্নত হইতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের বৈধব্য দশায় জীবিকা নির্ব্বাহের তেমন কষ্ট হইত না। কেহ গ্রন্থকর্ত্রীরূপে, কেহ বা ধাত্রীরূপে, কেহ বা শুশ্রূষাকারিণীরূপে, কেহ বা চিত্র ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারিতেন। আমরা কবির ভাষায় বলিতে পারি—

"রমণী বধিলা পিশাচ হয়ে।"

বাস্তবিক সমাজের একাঙ্গকে আমরা একেবারেই অচল করিয়া রাখিয়াছি, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী লিখিয়াছিলেন,—

"ক'রে শুধু রন্ধন শয়ন
কেটে যাউক তাদের জীবন,
দুঃখিনী অবলাকুলে
সকলেই অবহেলে,
বলে শিক্ষা নাহি প্রয়োজন।"

প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদের সমক্ষে দেশের ধন বৃদ্ধি কামনায় অন্ততঃ স্ত্রীশিক্ষার উপযোগীতা রহিয়াছে। সেলাই কার্য্যে ও দোকানের কার্য্যে তাহাদিগকে অনায়াসে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থলে রমণীরাই ক্রয় বিক্রয় করে। এখন এমন দিন আসিয়াছে, একা পুরুষ আয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে না, তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহচরাকেও তাহার সহায় হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সংস্থান করিতে হইবে। ভদ্র মহিলাদের সেলাই কর্ম্মে, চিত্রে, গৃহের হিসাব রক্ষণে, বালকের প্রাইভেট শিক্ষকরূপে, স্বায় গৃহকার্য্যে স্বামীর সহায় হইতে হইবে; ইহা একটী অর্থনীতির ব্যাপার। নতুবা শতাধিক মুদ্রা উপার্জ্জনেও একটী ভদ্রলোক নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই ব্যয়-বাহুল্য মঙ্গলের কি অমঙ্গলের কারণ? আমি বলিব, মঙ্গলের হেতু। ইংরেজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "necessity is the mother of invention" প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তাহার উপায় চিন্তা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই যে ব্যয়-বাহুল্যের দিকে ভারতের গতি হইয়াছে, ইহা মঙ্গলের লক্ষণ। এখন একটী সামান্য লোকের পায়ে এক জোড়া চর্ম্ম পাদুকা চাই, আগে কয়জন ভদ্রলোক চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিত? যখন কলিকাতা সহরে চর্ম্ম-পাদুকা-পরিহিত নাপিত দৃষ্টি করিলাম, তখন আমার এক বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। কারণ পল্লীগ্রামে কখনও নরসুন্দরগুলিকে চর্ম্ম পাদুকায় বিভূষিত দেখা ভাগ্যে ঘটে না। যাহা হউক, এ যে বিলাস বাসনা, ইহা নিতান্ত বহির্জগতের ব্যাপার নয়, ইহা আত্মার ধর্ম্ম। অবশ্য যিনি সক্রেটীসের মত জ্ঞানী হইয়া অভাব-সঙ্কোচ-মন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত হিসাবে প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে অভাবের সৃষ্টি অলসতার নাশক। আমি পৃথিবীর বর্ব্বর

যুগের অসভ্য অধিবাসীদের প্রতি যখন নয়ন নিক্ষেপ করি, তখন দেখি, তাহাদের অভাব অতীব কম, সুতরাং তাহারা আলস্য ঔদাস্যে সময় ক্ষেপণ করে। সভ্য এবং অসভ্যের অভিধান যদি এক কথায় দেওয়া হয়, তবে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে, সভ্য—যাহার অভাব বেশী, অসভ্য—যাহার অভাব কম। শান্তিময় জীবনের পক্ষে কম অভাব প্রশংসার্হ, কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলের কথা মনে উদয় হইতেছে। ইহাদের জীবিকার জন্য ইহাদের পূর্ব পুরুষ কতকটা সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। গর্ভসঞ্চার হইতে মৃত্যুর পর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ইহাদের প্রতি কর দেওয়ার ব্যবস্থা করা, হইয়াছে।

এই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে এত শ্রুতি রহিয়াছে যে, এখনও ব্রাহ্মণগণ বিনা শ্রমে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে নানাবিধ সুসরস পথ পাইয়াছেন। এমন কি, সামান্য লোকেরাও ব্রাহ্মণের প্রশংসা গান করে যথাঃ—

ব্রাহ্মণ সামান্য নয় চারি বেদে কয়,
যার হস্তে তীর্থ পদে গঙ্গা, মুখে অনল রয়। আর এক ভণিতা যথা—
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য কিছু আছে মাত্র বেদেতে,
ভৃগু মুনির পদচিহ্ন আছে বিষ্ণুর বক্ষেতে।

কবিবর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,
"শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডুসে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অন্নজ্ঞান,"ইত্যাদি।

শঙ্করাচার্য্য তাহার লিখিত মণিরত্নমালায় প্রশ্নোত্তর স্থলে বলিয়াছেন—
"কে কে যূপাস্যা গুরুবিপ্র বৃদ্ধাঃ" অর্থাৎ পূজনীয় কে কে? গুরু ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধ। লোক এইরূপ সমাজে যখন ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রভাব লক্ষিত হয়, তখন লোকে কষ্টে স্বষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলে তাহা ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াই কৃতার্থ হইত। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দানের মন্ত্রে আছে—

"দক্ষিণাং কিঞ্চিৎ
কাঞ্চন মূল্যং
বিষ্ণু দৈবতং
যথা নামং ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

কাঞ্চন মূল্যের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা বিষ্ণুদেব স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি।

যাঁহারা যথার্থ সাত্বিক ব্রাহ্মণ ও সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী, ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে কিছু কিছু দান করা অবৈধ নহে। নিষ্কর্ম্মা গণ্ড মূর্খ, সমস্ত দুঃশীলতার আধার পল্লী-বাসী ঠাকুরসেবী ব্রাহ্মণকুল ভারতের দরিদ্রতার অপর হেতু স্বরূপ। অতি কষ্টে কোন সুখাদ্যের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আগেকার বৃদ্ধারা ব্রাহ্মণকে দিয়াই তাহা সন্তুষ্ট হইত। ব্রাহ্মণ জাতির কিরূপ ফলারের ব্যবস্থা ছিল, ইহার ফল কি বিস্ময়কর! ইহাতে ব্রাহ্মণ-নন্দনেরও অকল্যাণ, সমাজেরও অকল্যাণ।

আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ব্যবসা গুরুগিরি। তাঁহারা শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র দান করিয়া তাঁহা হইতে বংশ পরম্পরায় কিছু কিছু বার্ষিক টেকস আদায় করেন। আগে যাহা ঘনীভূত ধর্ম্মের মিলন-কেন্দ্র ছিল, প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন ছিল, তাহা এখন কেবল মাত্র স্বার্থ সম্বন্ধে জড়িত হইয়া গুরু ও শিষ্য উভয়ের অকল্যাণ করিতেছে!

এই সময়ে সর্ব্ব সংস্কারের মূলে সমাজ-সংস্কার দরকার। ব্রাহ্মণ শ্রেণী যেরূপ বুদ্ধিমান, অন্য শ্রেণীর মধ্যে তেমন লোক

অতি বিরল। তাহারা সুশিক্ষিত ও ব্যবসান্তরে নিয়োজিত হইতে পারিলে দেশের সমূহ কল্যাণ হইবে। দেশ হইতে এরূপ ব্রাহ্মণ-পোষণ বৃত্তি রহিত হওয়া দরকার। কাশী অঞ্চলে বড় বড় ছাত্র শতাধিক সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আহার করে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ফলশ্রুতি, কিংবদন্তী প্রভৃতি সমাজে ঐ রূপ ব্রাহ্মণ-ভক্তির বিকাশ করিয়া দেশকে অকর্ম্মণ্য করিতেছে।

আজকাল এক একটী শ্রাদ্ধে বহুল অর্থ রাশির যে ধ্বংস হইতেছে, উহাও ব্রাহ্মণ-পোষণে ব্যয়িত হইতেছে। তাহারাও সহজ-সাধ্য জীবিকা পাইয়া কোন রূপে আত্মোন্নতিতে তৎপর হইতেছে না। সমাজের এইরূপ ভাব দুরীভূত করিয়া বিলাত, এমেরিকার অনুকরণে (শ্রাদ্ধ বাসরে) স্বদেশ-সেবায় অর্থ দান করিতে হইবে। যে গ্রামে কোন বিদ্যালয় নাই, তথায় শ্রাদ্ধ-বাসরীয় অর্থে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ শিল্প শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতিতে উৎসাহ দানের জন্য শ্রাদ্ধের অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। এদেশের কোন ভদ্র লোককে যদি কোন সৎ কার্য্যের জন্য ২০০০৲ হাজার টাকা বাহির করিতে বলা যায়, তাহার সে ক্ষেত্রে কষ্ট হয়, পিতার শ্রাদ্ধ বাসরে অনায়াসে তিনি ৫০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। আমাদের পুণ্য গণনা, বিদ্যা বুদ্ধিতে নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান সমুন্নত মানব-প্রবৃত্তিতে নিবদ্ধ করিতে হইবে। মনে করুন, আপনি পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক ভোজ দিয়া ৫০ হাজার লোককে খুব চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খাওয়াইলেন, তাহাতে কি হইল? কিন্তু তাহা অপেক্ষা যদি ১০০ বালকের সুশিক্ষা বিধান করেন, কত মহত্তর ফল পাইবেন।

এই সূত্র ধরিয়া দেশের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। নর নারীকে কার্য্যতৎপর করিয়া তুলিতে হইবে, সর্ব্বত্র সবল, সুস্থ, উদ্যম ও উৎসহশীল লোকে যাহাতে দেশ পূর্ণ হয়, তাহা করিতে হইবে। দেশের সমস্ত রাজ্য সুন্দর সুন্দর ফল বাগানে শোভিত করিতে হইবে—তাহা হইলে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে।

তৎপর কথা হইতেছে, বিদেশ হইতে যে যে উপায় দ্বারা ভারতের ধন শোষিত হইতেছে, তাহা বন্ধ করা, জাতীয় ধন বৃদ্ধির এক প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায় সম্বন্ধে "বয়কট মন্ত্র" সাহায্য করিতেছে। স্বদেশী ভাব প্রচারে প্রত্যেক বিদেশী জিনিষের প্রতি তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হওয়াতে, দেশে ধন রক্ষার এক সুন্দর পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত দ্রব্য বিলাত ও জার্ম্মনী দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতকে যোগাইত, তাহার সমস্ত এদেশে সৃষ্টি করিতে হইবে। অবশ্য

"ছিনু ভাল, ছিনু মোরা কেবল আঁধারে
এল বিদেশের খদ্যোতিকা
চমকিল আলোক কণিকা"

অর্থাৎ আমরা যতদিন, কলার, সাবান, এনামেলের বাটী, গ্লাস, প্রভৃতি পাই নাই, তত দিন ভারত সব যোগাইতে পারিত, এখন আমাদের নানাবিধ বিদেশী দ্রব্য নয়ন পথে পতিত হইয়াছে, উহার কি সুবিধা অসুবিধা, তাহাও অনুভব করিয়াছি, অতএব আমাদিগের আর কিছুতেই সেই দ্রব্য ব্যবহারের লোভ সংবরণ করা যাইবে না। কিছু দিন করিয়া থাকিলেও তাহা মাতৃদত্ত অনুরূপ দ্রব্য প্রাপ্তির অপেক্ষা করা মাত্র।

এখন স্বদেশের দেশলাই চাই, স্বদেশের

এনামেল চাই, স্বদেশের সাবান ও রবারের ড্রেস চাই—অর্থাৎ যাহা ভারতে ছিলনা, অথচ বিলাত যোগাইত, সে সমস্ত দ্রব্যই আমরা চাই স্বদেশ হইতে। যদি স্বদেশ ২।৩ বৎসরের মধ্যে দিতে না পারে, পুনর্ব্বার আমাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্টও বোধ হয় হইতে হইবে। কিন্তু খুব আশা হয়, স্বদেশ সমস্ত দিতে সক্ষম হইবে।

তৎপর ভারতীয় অর্থনীতি আলোচনা করিতে গিয়া আর একটী কথা মনে হয়—"জাতীয় বিদ্যালয়"।

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে যে প্রণালীতে দেওয়া হয়, তাহার বিষম ফল সমস্ত জীবনে আমরা ভোগ করি। শিক্ষার অর্থ মানুষকে কার্য্যক্ষম করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া—কিন্তু আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে কি করে? অকর্ম্মন্য মনুষ্য-কুষ্মাণ্ড করে। আমরা সকলে বোধোদয়ের "পুত্তলিকার"মতই, আমাদের চক্ষু আছে, তাহাতে স্বদেশের কিছু দেখিতে পাইনা, দেখি বিলাতের সমস্ত। কর্ণ আছে, তাহাতে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের মহিমা, দেশের কথা এসব কিছু শুনিতে না পাইয়া শুনি কেবল গ্লাডষ্টোন ও ডিজরেলীর কাহিনী। নাসিকা আছে, দেশীয় দ্রব্যের আঘ্রাণ না লইয়া বিলাতী এসেন্সের ঘ্রাণ লই। আর হস্ত আছে, কিন্তু কোন কাজই করিতে পারিনা! আমরা বি-এ, পাশ করিয়া হল চালনা করিব? সুতারের কার্য্য করিব? দোকানদারী করিব? ইহাতে লোকে আমাকে কি বলিবে? একদা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু কলিকাতার কলেজের আইন সমূহের-পাঠার্থী ছাত্রগণকে লইয়া আমাকে একটী যুবক-সমিতি গঠন করিতে বলেন। আমি বলিলাম "তাহারা অনেকেই যোগ দেন না।" তিনি বলিলেন "বাস্তবিক আধুনিক যুবকমণ্ডলীর কিরূপ নিষ্প্রভ ভাব, সর্ব্ব বিষয়ে নিরুৎসাহ, এমন কেন দেখিতেছি, আমাদের সময়ে এভাব ছিলনা, আমরা প্রবল উৎসাহে কাজ করিয়াছি।" তিনি আরও বলিলেন, "গভীর বিষাদময়ী ছায়া যেন সকলের মুখমণ্ডল ঘেরিয়া বসিয়াছে।" আমি বলিলাম "অন্নচিন্তা চমৎকার। এই অন্ন-চিন্তাতে ইহাদিগকে এত বিষন্ন করিয়াছে। পূর্ব্বে বিদ্বান হইলে তাহার জীবনের উপায় হইত, এখন এম-এ, বি-এ, পাশ করিয়া হা অন্ন, যো অন্ন করিয়া ঘুরিতে হয়।" তিনি সর্ব্বতোভাবে আমার কথার অনুমোদন করিলেন। বাস্তবিক আমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাতে আমাদের আত্মগ্লানি ভিন্ন আর কোন লাভ নাই। "কেন পিতা মাতার অর্থ ধ্বংস করিয়া সময় নষ্ট ও অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, পরীক্ষা পাশ করিয়া পরমায়ু ক্ষয় করিলাম," এই চিন্তাতেই যুবকেরা অবশ হইয়া পড়ে। অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন "ঐ দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, একটী প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল, এক্ষণে যেরূপ স্থূলকায় হইল, বোধ হয়, বিশ্ব সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হইবে না, উহার নাম কি জান?—"লোভ"এই লোভ বাস্তবিক প্রত্যেক বিদ্বানের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে। তাঁহারা মনে করেন, উকীল হইলেই বুঝি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের মতন আয় হইবে, ব্যারিষ্টার হইলেই বুঝি W. C. বন্দ্যোপধ্যোয়ের মত রোজগার হইব, এই আশায় দিশাহারা হইয়া যান। অথচ বাড়ী হইতে গাড়ী ভাড়া, জল যোগের পয়সা লইয়া

অনেককে আফিস হইতে ভগ্ন-মনোরথে ফিরিতে হয়।

দেশে যাহারা শক্তি ও প্রতিভাশালী, তাহাদের লক্ষ্য, গোলামী নতুবা ওকালতী। এখনও দেশে শত শত অর্থাগমের সুলভ পন্থা আছে। তদনুরূপ শিক্ষা চাই। জাতীয় বিদ্যালয়ে আমরা সেই শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। প্রথমতঃ চট্টগ্রামে স্থাপিত ষ্টীমার কোম্পানী হইতে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। চট্টগ্রাম সহর হইতে পূর্ব্বে রেঙ্গুনে বুলক ব্রাদার্স কোম্পানীর ও টারনার মরিসন কোম্পানীর ষ্টীমার যাতায়াত করিত, তখন উহারা প্রত্যেক যাত্রী৹ হইতে ১ম ২৪৲ টাকা হারে ভাড়া লইত,শেষে উক্ত ভাড়া ১২৲টাকা করা হয়। উক্ত ষ্টীমারে এত যাত্রী হইত যে, তাহাদের বসিতে কষ্ট হইত, তদুপরি শ্বেতাঙ্গ কাপ্তান উহাদিগকে পদাঘাতে ব্যাকুল করিয়া দিত, এরূপ ঘোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা বিলাতী কোম্পানীর ষ্টীমারে যাতায়তে করিত, শেষে এক যাত্রায় এরূপ ভিড় করিয়া লোক লওয়া হয় যে, তাহাতে আরোহীদের বিষম কষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কাপ্তান তাহাদের কাতোরোক্তিতে আরোহীদের অনেককে প্রহার করে, ইহাতে নাকি এক আরোহীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রেঙ্গুণ-প্রবাসী চট্টগ্রামের মুসলমানগণ সমবেত হইয়া যৌথ প্রথার টাকা তুলিয়া দুই খানা ষ্টীমার আনয়ন করিয়াছেন। আরও ষ্টীমার আনিবার চেষ্টা হইতেছে।

বলিতে কি, এখন পাঁচ টাকা হারে ভাড়া লইয়াও এই ষ্টীমার কোম্পানী গত সন শত করা ৭৷৷০ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড দিতে সক্ষম হইয়াছে।

এখন বিলাতী কোম্পানীগুলি এই স্বদেশী কোম্পানীর বিনাশ বাসনায় ১৲ টাকা ভাড়ায় ও বিনা ভাড়ায় লোক রেঙ্গুণ নিতেছে, কিন্তু স্বদেশী ভাবের কি মাহাত্ম্য, তাহাদের উদ্যম একরূপ বিফল হইতেছে।

এইরূপ স্বদেশীর উদ্যমে বিদেশীরা বিশেষ ভীতও হইয়াছে। সেদিনকার একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় উকীল শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগিরি চট্টগ্রাম হইতে কাক্স বাজার যাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট চান, সেদিন একজন শ্বেতাঙ্গ প্রথম শ্রেণীতে যাত্রী হন। সুতরাং যাত্রামোহন বাবুকে ও ধীরেন্দ্র বাবুকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট প্রত্যাখ্যান করা হয়,সুতরাংঅগত্যা তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। তৎপর যাত্রামোহন বাবু উদ্যোগী হইয়া চট্টগ্রাম হইতে কাক্স বাজার পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ষ্টীমার করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ভীত হইয়া উক্ত ইংরেজ কোম্পানী তাঁহার নিকট যত খানা ইচ্ছা, প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ক্ষমা চান। এ বিষয়ে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিসনার মিঃ লুসন তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বদেশীর প্রাণে বন্যা যখন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন কি শ্বেত মুখের মিষ্ট কথাতে কেহ ভুলিতে পারেন ?

যাহা হউক,প্রতি লাইনে, ভারতের প্রতি কেন্দ্রে এরূপ ষ্টীমার কোম্পানী গঠন করিয়া দেশের লোক যেন তাহা পরিচালন করে। তদ্বিষয়ে সমবেত বিশেষ চেষ্টা চাই। সেই চেষ্টার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় করিয়া এদেশে নাবিক সৃষ্টি করিতে হইবে।

**পশু পালন।** ভারতের গোকুল নির্ম্মূল

হইতে চলিয়াছে, এদেশের শিক্ষিত লোকদিগকে, পশু পালন ব্যবসা শিক্ষা করিয়া তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। এক সহস্র হংস পুষিলে একটী ভদ্র লোকের যথেষ্ট হয়। সেরূপ গোপালনের কোম্পানী স্থাপন করিয়া সহরে সহরে দুগ্ধ দানের বন্দোবস্ত করিলে দেশের সমূহ কল্যাণ হইবে। কলিকাতার খড়ি-গোলা-জল যাঁহারা একবার খাইয়াছেন, তাঁহারা কি ইহার উপযোগীতা উপলব্ধি করেন নাই? যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি যৌথ প্রথায় ম্যানেজার রাখিয়া ৫০০০ পাঁচ সহস্র গাভী পোষণ করা যায়, তবে সমস্ত কলিকাতা সহরে দুগ্ধ দেওয়ার সুবিধা হয়। সেরূপ অন্যান্য সহরেও গাভী পোষণ করিয়া কোন কোন ভদ্র লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

তৎপরে পাঠা মহিষ প্রভৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করা দরকার। এই সব পশু পালনের জন্য মাঠ রক্ষা করিয়া তথায় যাহাতে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট পশু পাওয়া যায়, সেই বিষয়ের ভার বিদ্বান ব্যক্তির হস্তে নিয়োজিত করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ সমস্ত জন্তুদিগকে আহার দিতে হইবে। এই ব্যবসাতে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে; সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কল্যাণ করা যায়। এই সমস্ত জাতীয় শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে অনেকে মহিষ পুষিয়া বিস্তর লাভ করে। বাস্তবিক পশু পালন আর্য্যদিগের আদি ধর্ম্ম ছিল। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, পশু পালনের সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে সমস্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে যাহাতে ঐ সমস্তের পোষণ ও বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া উচিত।

এদেশে অনেকে কৃষি করে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে কৃষি কার্য্য এখনও হইতেছে না। ফলের বাগান করিলে, চাকুরী অপেক্ষা অনেক লাভ হয়, অথচ দেশের দুর্দ্দশা ঘুচে। আমাদের দেশে, বিদেশীয় চা-করেরা আসিয়া, কত পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়। যৌথ প্রথায় সে সব কারবার আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।

তৎপরে দেশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন। এদেশে অনেকে কুসীদ ব্যবসা করেন বটে, তাঁহাদের কষ্টের অবধি থাকে না। ব্যক্তিগত-ভাবে কর্জ্জ দিতে গেলে অনেক গোলে পড়িতে হয়। এ দেশে যদি স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, তবে দেশের লোকে কারবারের যেমন সুবিধা পাইবে, অতিরিক্ত ঋণজালে প্রজাকুলও নির্ম্মূল হইবে না। কূর্ম্ম পৃষ্ঠে যেমন এক খণ্ড প্রকাণ্ড চাল রহিয়াছে, ভারতীয় প্রত্যেক চাষার পৃষ্ঠে তেমনই ঋণভার রহিয়াছে। এই ঋণ যন্ত্রণায়ও ইহজীবনটা দুঃখে দুঃখেই অতিবাহিত হয়। ব্যাঙ্ক থাকিলে খুব কম সুদে টাকা পাওয়া যাইবে। প্রদেশের প্রত্যেক জিলায় ২।৩টা ব্যাঙ্ক স্থাপন করা দরকার।

প্রকৃত দেশহিতৈষীদের এসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। আমরা যদি প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, তবে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। ফরাসী ও ইংরেজ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বড় হইয়াছে, সেই একপন্থা "নন্যাপন্থাঃবিদ্যতে অয়নায়।"

কথাপ্রসঙ্গে একটু দূরে আসিয়া পড়িলাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল, জাতীয় শিক্ষাতে দেশের ধন-বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিক আধু-

নিক শিক্ষায় আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে পারিতেছি না, আমাদিগকে মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন শিল্পের শিক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই তাহা অবলম্বন করিতে পারি। যথা পশু-পালন, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ইহার কোন না কোন কলা বিদ্যা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। দরিদ্র দেশে ধনবৃদ্ধির শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, এই শিক্ষাদান কল্পে এদেশের ধনীরা স্থানে স্থানে অগণ্য বিদ্যালয় যাহাতে স্থাপন করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

যৌথ প্রথায় কারবার করিয়া ইংলণ্ড এত ধনী হইতে পারিয়াছে। এই সম্মিলিত কোম্পানীর কারবার যাহাতে ভারতের প্রতি গ্রামে হয়, তৎপ্রতি প্রণিধান করিতে হইবে। এমন কি, জুতার ব্যবসা, চামড়ার ব্যবসা পর্য্যন্ত অবলম্বন করা আবশ্যক।

মৎস্যের ব্যবসা। পল্লীগ্রামে অনেকের পুষ্করণী আছে, তাহাতে মৎস্য পালন করিয়া বিক্রয় করিলে অনেকে লাভবান হইতে পারেন। অথবা সমুদ্র কিম্বা নদী হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে। মাদ্রাজে একটী শ্বেত-পুরুষ এইরূপ কারবারে মনোযোগী হইয়াছেন, শুনা যায়। শ্রীযুক্ত কে, জি গুপ্ত মহাশয় বলেন, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে একটী লাভজনক ব্যবসা হইবে, সন্দেহ নাই।

মূল কথা এই, ভারতের জাতিভেদ প্রথা ভারতের অর্থ বৃদ্ধির বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। তৎপর ভারতের শিক্ষার বিশেষ দরকার। পৃথিবীর অপরাপর জাতিরা কিরূপে ধন-লাভ করিতেছে, অশিক্ষিত ভারতবাসীরা কয়জনে তাহা জানে? তাই তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দরকার। লোক যদি সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার অভাব বোধ হয়। অভাব বোধ হইলেই ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারে। ভারতের সমস্ত দুঃখের মূল, সুশিক্ষার অভাব। যে দেশ যত শিক্ষিত, ধন সম্বন্ধে সে দেশ তত উন্নত। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে খুব ধন আছে, শিক্ষিতের সংখ্যাও সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের প্রকৃত কল্যাণ যদি কেহ কামনা করেন, তবে ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা আগে করা চাই।

যে দেশ যত শিক্ষিত, সে দেশ তত সমৃদ্ধিসম্পন্ন। জাতি-ভেদ প্রথা বাড়িয়া গেলেও, শিক্ষার উন্নতি হইলে ভারত পৃথিবীকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যে আবার চমৎকৃত করিতে পারিবে।

তৎপর, এদেশের ধন-নাশের বা দরিদ্রতার অন্য আর এক পথ, বিচার আদালত। এক সময় ভারতবর্ষ বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। তৎকালে ভারতের লোকেরা মিথ্যা কাহাকে বলে, জানিত না। প্রাচীন গ্রীক ও চীনদেশীয় পর্য্যটকেরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলেই লোককে নানাবিধ মোকর্দ্দমায় জড়িত হইতে হয়। সালিসী প্রথার বিচার হইতে পারিলে, এদেশের এত অর্থ ধ্বংস হইত না। দেশীয় সালিসকারক প্রধান পুরুষগণ মোকর্দ্দমার সত্যাসত্য সহজে নিরুপণ করিতে পারিতেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগেও মোকর্দ্দমার সংখ্যা এত বেশী ছিল না। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ে মোকর্দ্দমায় ভারতকে চির-দারিদ্র্যে নিপতিত করিতেছে। এদেশের

অধিকাংশ হিতৈষী মোকর্দ্দমার পৃষ্ঠপোষক। বাস্তবিক যাহাতে মোকর্দ্দমার সংখ্যা কমে ও সালিসীতে সমস্ত বিচার নিষ্পত্তি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ব্যাধি নির্ণীত হইয়াছে, এখন যদি প্রতিকার করিবার চেষ্টা না হয়, তবে কি কখনও সুফল হইতে পারিবে?

আমাদের এক বন্ধু লিখিয়াছেন, দেশের কল্যাণ-কামনায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা চাই—

"বিদেশীর পরিহার, সালিসে বিচার,
স্বদেশের শুভ-শিক্ষা, দীক্ষার প্রচার,
বন্দেমাতরম্-ধ্বনি, স্বদেশের প্রীতি,
ক্ষুদ্রতা নীচতা হতে দূরে অবস্থিতি,
হবে এতে, * * * *
প্রতিগ্রামে শান্তির সংবাদ,
নবপুষ্করণী নব-প্রতিমা প্রসাদ,
জন্মভূমি জননীর কল্যাণ কারণ,
করিবেক নর-নারী দীক্ষার গ্রহণ।
আজীবন ব্রহ্মচর্য্য, স্বদেশ সেবনে
ভারতের দুঃখ দূর ব্রত স্থাপি প্রাণে,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমানে প্রীতির বন্ধন,
চাকুরীতে তীব্র ঘৃণা, শিল্প-কৃষিগণ।
স্বদেশের বস্ত্রনীতি, বাণিজ্য কৌশলে,
অনন্ত কল্যাণ লাভ হবে অবহেলে।"

বাস্তবিক সর্ব্বদেশে কল্যাণ-প্রসূ মন্ত্র একই, তাহা স্বদেশপ্রীতি। বাস্তবিক যদি দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা করি, তবে দেশের মধ্যে পরস্পরের শোণিত পানের পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য প্রভাবে ধন বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হওয়া, এদেশের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যিনি এদেশকে ধনশালী করিবার চেষ্টা করিবেন, তিনি প্রকৃত দেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের এক আলোচ্য বিষয় ছিল, এদেশীয়েরা এদেশে থাকিয়া যেন সিভিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত সিভিলিয়ানেরা যাহা আয় করে, এক একটী শ্বেত-বণিক তাহা অপেক্ষা অধিক আয় করিতেছে না কি? ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের, ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপনের, ব্যাঙ্ক স্থাপনের, ট্রামওয়ে কোম্পানী স্থাপনের কি কি উদ্যোগ হইয়াছে?

বাস্তবিক দেশের প্রকৃত উন্নতি অর্থেই হইবে, ভারতের ধন বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে দেশবাসীদের নয়ন আকৃষ্ট হইলেই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।

---

# শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির। (৭)

বিশেষতঃ প্রস্তরময় যুগল মূর্ত্তি (স্থানে স্থানে) ও অত্যন্ত অশ্লীল ছবি চতুঃপার্শ্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, দেবমন্দিরে অশ্লীল ছবি প্রদত্ত হওয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক। এ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মত এই যে, ছবিগুলি না থাকিলে মন্দিরে বজ্রপাত হইবে; এবং ইহার নিবারণোদ্দেশেই এগুলি নিহিত হইয়াছে। এ কথাও কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য কেহ বলিয়া থাকেন যে, কোনও শিল্প বিজ্ঞান শাস্ত্রে অশ্লীল মূর্ত্তির পোষক কোনও যুক্তি দৃষ্ট হয় না। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার সাধারণ স্থানে, ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিরোধী ব্যক্তিগণের দণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই প্রকার পূর্ব্বে বোধ হয়, মন্দিকে সাধারণ স্থান মনে করিয়া সেই স্থানে এই প্রকার অন্যায়-কারী ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি ন্যস্ত হইয়াছে। অপর কতক ব্যক্তি মত প্রকাশ করেন যে, একথা ততদূর যুক্তিযুক্ত নহে। তবে বৌদ্ধগণের মন্দিরে প্রবেশ এককালে বন্ধ করিবার জন্য ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত, অশ্লীল ভাবে প্রব্রজ্যার সহিত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগকে মন্দির-কলেবরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা মন্দিরে এখন পর্য্যন্তও দেখা যায়। ক্রমশঃ বোধ হয় এ ছবি সকল কু ছবি রূপে পরিণত হইয়াছে। আরও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, চিত্তস্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্য মন্দিরের বহির্ভাগে এই সমস্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া যাঁহাদিগের চিত্ত অস্থির হইবে, তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ অনুচিত। যাঁহা-দের চিত্ত স্থির, কেবল তাঁহারাই মন্দিরাভ্য-ন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দারুব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যেই মন্দিরের গাত্রে এই সমস্ত ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য কোন কোন উদারচেতা ব্যক্তি এই ভাবে মত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মত ভ্রমাত্মক। ছবি সকলের অভিপ্রায় এই যে, যে সকল কামুক ও সাংসারিক কুপথগামী ব্যক্তিগণ কুকার্য্যের জন্য আপনাদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য এই সমস্ত ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত সাংসারিক ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে, "অরে কামুক, পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা এ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করিও না। তোমরা পাপ-কর্দ্দমে যতদূর মগ্ন হও না কেন, এই মন্দি-রের দেবতা প্রভু জগন্নাথ তোমাদিগকে প্রেম দ্বারা উদ্ধার করিবেন। তোমরা পাপ-মুক্ত হইবে, আইস! মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেবদেব জগন্নাথকে দর্শন কর। সর্ব্ববিধ পাপতাপ হইতে মুক্তি পাইয়া, মরণা-ন্তরে চিদানন্দময় প্রভুর চরণতলে স্থান পাইয়া সেই পুণ্যালোকময় দেববাঞ্ছিত অনন্ত শান্তি ভোগ করিবে।" আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন যে, মন্দির এক সময়ে কোনও এক কামুক রাজার তত্ত্বা-বধানে ছিল। সে তাহার রুচি-অনুযায়ী এই সকল ছবি খোদিত করিয়াছে। অন্য কাহা-রও কাহারও মতে, আত্মা কূটস্থ, স্থূল দেহের পাপ পুণ্যাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, সেই প্রকার, এই মন্দিরের বহিঃসংলগ্ন অশ্লীল ও অন্যবিধ মূর্ত্তিদিগের সহিত ওঁকার রূপী মূর্ত্তিদের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই।

মন্দির সকলের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, উৎকলীয় শিল্পীগণের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় নাই। বিদেশীয় সূত্রধরগণের দ্বারা সম্পা-দিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তিগণ এই প্রকার বিকৃত মস্তিষ্কোপযোগী ভ্রান্ত মত জনসমাজে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা যে ভ্রান্তিমূলক মতের পোষণকর্ত্তা, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই মতটী অযৌক্তিক, কারণ উড়িষ্যার সমস্ত মন্দির একভাবে গঠিত। এই প্রকার গঠন ভারতের অন্যত্র দেখা যায়

না। উড়িষ্যা যে শিল্পবিদ্যায় পারদর্শীতা দেখাইয়াছিল, তাহা খ্রীঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে "ঐর" রাজাদিগের রাজত্ব কালে; খণ্ডগিরি প্রভৃতির অনুপম কারুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজে প্রমাণিত হইবে। এ সমস্ত সুদৃঢ় প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহাদের তৃপ্তি জন্মে না, তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন যে, রাজকৃপা ও অপরাপর উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই খ্রীষ্টীয় বিংশশতাব্দীতে পুরী ও ভুবনেশ্বরে উৎকল শিল্পীগণ কি প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। কে কহিবে যে, প্রাচীন উৎকলের, প্রাচীন জগন্নাথ দেবের মন্দির বিদেশীয় শিল্পীদের শক্তিসম্ভূত? তাহার পর, এ বংশীয় সপ্তম রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের রাজত্বকালে মন্দিরের অনেকাংশে উন্নতি হইয়াছে। এই সমস্ত সাময়িক উন্নতির কথা ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিতে হইলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি হইবে ও তৎসম্বন্ধে পাঠকগণেরও অশ্রদ্ধা জন্মিবে, এই বিবেচনায় সে সমস্ত পরিত্যাগ করা গেল। তথাপি ইঁহার রাজত্বের প্রধান কীর্ত্তি পুরাণ-প্রসিদ্ধ "কোণার্কক্ষেত্রের" "কনার্ক" মন্দির ১২০ শতাব্দীতে "শিবাই সামন্ত রায়" মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। তাহার পর দ্বাদশ পুরুষ নিঃশঙ্ক ভানুদেবের সময়ে শ্রীজগন্নাথ দেবের বালধূপর প্রচার হয়। এ কথা "মাদলাপাঞ্জিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে উক্ত বংশজ উনবিংশসংখ্যক রাজা "কপিলেন্দ্র দেব" রাজ্যবিস্তার সহকারে মন্দিরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি থাকিলেও, প্রসঙ্গোপযোগী কিছু না থাকাতে লিখিত হইল না। ইঁহার রাজত্ব সময়ে মন্দিরের বহির্বেষ্টন নির্ম্মিত হইয়াছে। নিজের প্রধান মহিষী, অশেষ-গুন-সম্পন্ন অষ্টাদশ পুত্র থাকা সত্ত্বেও, শ্রীজগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশে, কপিল দাসা-পুত্র পুরুষোত্তম দেবকে ১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। এরূপ উক্তি আছে যে, পুত্রগণ পুরুষোত্তমের প্রাণ-বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও জগন্নাথের কৃপাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। ইনি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। এই হেতু অষ্টাদশ পুরাণ উপনিষদ, ও তন্ত্র প্রভৃতি হইতে এতৎস্থান সমূহ একত্র করিয়া "মুক্তিচিন্তামণি" নামক গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। এই রাজাও "অনঙ্গভীম" দেবের মত সিংহাসন আরোহণ না করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথকে উড়িষ্যার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে "অন্তর্বেষ্টন বা "কুর্ম্মিবেড়া" অর্থাৎ ভিতর বেড়া সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয়। "কাঞ্চী বিজয়" সময়ে ইঁহার ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীবলভদ্র দেব উৎকল রাজার পক্ষে যথাক্রমে শুক্লকৃষ্ণবিশিষ্ট তুরঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন? উক্তি যে, উভয় দেব মাণিক্য নাম্নী গোপালিনীর নিকট হইতে দধি ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারস্থ মুদ্রিকা বন্ধক দিয়া পশ্চাৎ-আগমনকারী ব্যক্তি মূল্য দিয়া মুদ্রিকা লইবে বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা সেই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র গোপালিনীর নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া মুদ্রিকা গ্রহণ করিলেন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার নামানুসারে সেই স্থলে একটী গ্রাম স্থাপন করিলেন। তাহা অদ্যাবধি "মাণিক্যপট্টনা" নামে অভিহিত, ভগবানের

কৃপায় কাঞ্চী অথবা কর্ণাট প্রদেশ করিয়া রাজা পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর অনেক বিষয় থাকা সত্ত্বেও প্রসঙ্গোপযোগী না হওয়াতে এই প্রবন্ধে স্থান পাইল না।

যযাতির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত জগন্নাথের মন্দিরে বিধর্ম্মী বা যবনদিগের উপদ্রব ঘটে নাই; বরং মন্দিরের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। তাহার পর ইঁহার পুত্র সর্ব্ব গুণ-শালী, প্রজা-রঞ্জন, সুপণ্ডিত, প্রতাপরুদ্র দেব ১৫০৪ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া দেশ বিস্তার করণার্থ অগ্রসর হইলেন; বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত অস্ত্রসঞ্চালন হইয়াছিল। ইহার সময় দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তরদিকসমূহ হইতে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল।

এক সময় মহারাজ দক্ষিণ দিকে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধব্যাপৃত থাকার সময়ে বঙ্গদেশ হইতে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিল। রাজার অনুপস্থিতি হেতু সেবকগণ ভীত হইয়া জগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিসমূহকে উড়িষ্যার রমণীয় চিল্কা হ্রদ মধ্যস্থ "চড়েইগুহা" নামধেয় পর্ব্বত-কন্দরে গোপন করিয়া রাখিলেন। পরে এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র উক্ত রাজা এ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিগুলিকে স্বস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রত্নসিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইহার সময়ে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, ইহার চৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ আছে, পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যাজপুরবাসী ছিলেন; কোনও কারণে উৎকল রাজার বিরাগভাজন হওয়াতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্যানুরাগী জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া বাসারম্ভ করিলেন। এই খানে চৈতন্যের জন্ম। তিনি বাল্যকালে অতিশয় উদ্ধত ছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। অল্পকাল মাত্র "উত্তারে" সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সুমধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। জগন্নাথচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসের শিষ্য ও অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। স্মার্ত্ত-গুরু পরিহার করিয়া বৈষ্ণব-গুরু করা ইহার নিকট হইতেই সূত্রপাত হইল। ইহার সময় হইতে পুরীতে চৈতন্যমত প্রবল হয়, পুরীতে স্থানে স্থানে মঠ স্থাপিত হয়, চৈতন্যদেব অনেক দিন এখানে অবস্থান করিলেন, পরে এই স্থানেই মহাত্মার তিরোভাব হইয়াছে।

এ মন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজাগণের তত্ত্বাবধানে ৪০২ বৎসর ছিল। ইহার সময় হইতে গঙ্গাবংশের সৌভাগ্য-রবি অস্তাচলগামী হইল। হওয়াও স্বাভাবিক। তান্ত্রিক হওয়া ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, যদ্যপি বৈষ্ণব হয়েন, তবে অবনতি অবশ্যম্ভাবিনী। তাঁহার পুত্রদ্বয় এক এক বর্ষ রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, ক্রমশঃ রাজাগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেন এবং ইহাদের সন্তানাদি না থাকাতে "ভোই-পুল" ও তাৎকালীন মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে উড়িষ্যা সম্ভবতঃ আট বৎসর ছিল, তৎপর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত "ভোইবংশীয়দিগের" অধীনে মন্দির ছিল। পরে "অন্ত-বিদ্রোহ" আরম্ভ হওয়ার সময়ে "তেলেঙ্গা মুকুন্দ হরিচন্দন" নামক কোনও ব্যক্তি ইহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সে সুযোগ্য ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী হওয়াতে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট

হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। উক্ত মুকুন্দ সুচারুরূপে দেশ শাসন ও প্রজা পালন করিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গায় স্নান করিবার সুবিধার নিমিত্ত একটী প্রস্তরময় ঘাট নির্ম্মাণ করাইলেন। ইঁহার স্মরণীয় রাজত্ব কালে বঙ্গশাসনকর্ত্তা সেলিমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিবার জন্য দুর্দ্দান্ত সেনাপতি কালাপাহাড়কে প্রেরণ করিলেন। সে আক্রমণ করিয়া প্রথমবার মুকুন্দ দেবের দ্বারা পরাজিত হইল। পরে রাজাকে বিনাশ করিয়া ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যা অধিকার করে। এই সময় উড়িষ্যার স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। কালাপাহাড় প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে কোনও লাবণ্যময়ী মুসলমান-রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন সে হিন্দুবিদ্বেষী হওয়াতে,যেখানে হিন্দুদেবী দেখিতে পাইয়াছিল, সেখানেই নষ্ট করিয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দৃষ্ট হয়। ইহার ভয়ে সেবকগণ জগন্নাথ দেবকে পারিকুদ দুর্গ ভূমিতে প্রোথিত করিলেন। সে দুরাত্মা এই সংবাদ পাইয়া সেখানে যাইয়া ভূমি খনন করিয়া মূর্ত্তিকে বারণপৃষ্ঠে করিয়া লইয়া গেল। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরস্থ এক উদ্দীপ্তচিতার উপরে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত নিক্ষেপ করিয়া সেস্থান হইতে যাত্রা করিল। চিতাতে দগ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে বিশার মাহান্তি নামক কোনও উড়িষ্যাবাসী ভক্ত তথা হইতে প্রভুকে উত্তোলন করিয়া, তাঁহার নাভিস্থলের দারুকে উদ্ধার করিয়া কুজঙ্গরাজার নিকট লইয়া আসিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। সে রাজা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, নাভিস্থলে দারুখণ্ডকে রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করাইলেন ও স্বীয় রাজ্যস্থ মন্দিরে স্থাপন করাইলেন।

১৫৭৮ উড়িষ্যায় অরাজক হওয়া দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত প্রজাগণ একমত হইয়া পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী জনার্দ্দন বিদ্যাধরের পুত্র রামচন্দ্রকে উড়িষ্যার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় হইতে অদ্যাবধি ভোইবংশীয়গণের রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। এ বংশীয় ব্যক্তিগণ যদুবংশীয়গণের জ্ঞাতি। উড়িষ্যায় যে সকল ব্যক্তি কর আদায় করেন ও আয়ব্যয়াদির হিসাব করেন, তাঁহারা "ভোই" নামে আখ্যাত। গঙ্গাবংশীয় রাজত্ব সময়ে ইঁহারা ঐ কাজ করিবার জন্যই "ভোই" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা হইবার সময়ও তাঁহার সে উপাধি লুপ্ত হয় নাই। "ভোই" শব্দ জাতিবোধক নহে। রামচন্দ্র দেব কুজঙ্গ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথ দেবের "নাভিমূল" আনিয়া পুনর্ব্বার প্রতিমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক তন্মধ্যে উক্তমূর্ত্তির পূর্ব্বোক্ত নাভি নিহিত করিয়া পুরুষোত্তম মন্দিরে স্থাপন করিলেন। দিল্লির সম্রাট আকবরের বিজ্ঞ হিন্দু-সেনাপতি তোডরমল্ল মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া, খুর্দ্দায় রামচন্দ্র দেবকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরে উক্ত সম্রাটের সেনাপতি মানসিংহ ইহার সম্মান বাড়াইলেন। মানসিংহ, গঞ্জাম ও গড়জাত মহাল সমূহ ইহার অধিকার ভুক্ত করিলেন এবং ইঁহার "মহারাজা" উপাধি স্বীকার করিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ( বর্ত্তমান রাজা মুকুন্দ দেব পর্য্যন্ত) মন্দির "ভোইবংশীয়"দিগের অধীনে আছে। মধ্যে মারহাট্টারা (১৭৫৫ খ্রীঃ অঃ) উড়িষ্যার কতক অংশ মুসলমানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন। পরে, ভোইবংশীয়েরা

১৭৬১ খ্রীঃ অঃ ক্ষেমুণ্ডি রাজার সহিত যুদ্ধে মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গীকৃত অর্থদানে অক্ষম হইয়া "রাহাঙ্গ পরগণা" প্রভৃতি ও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে (অর্থাৎ ১৭৬১ খ্রীঃ অঃ হইতে) মারহাট্টাদিগের হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। ১৮০৩ খ্রীঃ অঃ ইংরেজেরা উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। তাঁহারা পুরীতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও সেবকদিগকে আহ্বান করিয়া উচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের জাতিসুলভ মহৎ গুণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ও সেবক সমূহ স্বেচ্ছাক্রমে, তাহাদিগের হস্তে মন্দিরের ভার অর্পণ করিলেন। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ভার হিন্দু সিপাহীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, ইংরেজেরা কটকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত উড়িষ্যা তাহাদিগের হস্তগত হইল। পরে "কালেক্টর সাহেবের" হস্তে কতক দিন পর্য্যন্ত মন্দির পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। অনন্তর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে "বক্সী গোলমাল" আরম্ভ হওয়ায়, খুর্দ্দারাজা ধৃত হইয়া কটকে নীত হইলেন, বিচারে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় তাঁহাকে মন্দিরের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পদে রাখা হইল এবং ২৩৩৩্ দুই হাজার তিনশত তেত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। তাঁহাকে কেবল পুরীতেই থাকিতে হইবে, এইরূপ গবর্ণমেণ্টই আদেশ দিলেন। বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সেই খুর্দ্দা রাজার তত্ত্বাবধানে কার্য্য চলিতেছে বর্ত্তমান রাজা মুকুন্দ দেব মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। স্থিরধী ও সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীমান রাজকিশোর দাস মহোদয়ের দ্বারা, বর্ত্তমানে, মন্দিরের কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে।

## পরিশিষ্ট।

শ্রীক্ষেত্রস্থ মঠ সমূহের বিষয় মন্দির সম্পর্কীয় থাকায়, এই প্রবন্ধে স্থান পাওয়া উচিত বোধ করি। কিন্তু প্রত্যেক মঠের বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে এক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পরিণত হইবে। সুতরাং সে সমস্ত বিবরণ লেখা হইতে বিরত হইলাম। পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার মানসে, পুরীর আদি মঠ শঙ্করাশ্রম-বিষয়ে কিঞ্চিত লেখা যাইতেছে। এই মঠকে গোবর্দ্ধন মঠ, বালিমঠ বা শঙ্করমঠ বলা গিয়া থাকে। রাজদত্ত সাহায্যে, ভারতবিখ্যাত পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করাচার্য্য দ্বারা ২২৫৫ যুধিষ্ঠিরাব্দে এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে "বিপ্রলাভ বা শরশঙ্খদেব" উড়িষ্যার রাজা ছিলেন বলিয়া "মাদলা পাঞ্জিতে" লিখিত আছে। ইহার পূর্ব্বে, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, দ্বারিকায় সারদামঠ, মহীশূরে শৃঙ্গবেরী মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। পুরীতে পূর্ব্বোক্ত শঙ্করমঠ স্থাপনের পরে তন্মঠস্থ স্বামীদিগের হস্তে, জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধান ভার বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। বর্ত্তমান ভোগ মণ্ডপ, মন্দিরের যে অংশে আছে, সেই অংশে আদি শঙ্করমঠ ছিল। বহুকাল পরে অর্থাৎ মার্হাট্টা রাজা রঘুজির আধিপত্য সময়ে রামানুজীয় মত প্রবল হওয়ায়, শঙ্করমঠ স্থানান্তরিত হইয়া সমুদ্র তীরে স্থাপিত হইল। ক্রমে ক্রমে রামানুজীয় মত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় রত্নসিংহাসনের নিম্ন প্রদেশস্থ ভৈরব মূর্ত্তি এই রামানুজীয়দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। তথাপি শঙ্কর মঠ স্মার্ত্তানুমোদিত থাকায় অদ্যাবধি মন্দিরে এই মঠের প্রাধান্য পূর্ব্ববৎ বিরাজিত। উপরোক্ত বিষয় সকলে আমার নিজস্ব কিছুই

নাই। বিদ্যা প্রকাশ স্বামীর সঙ্কলিত বর্ত্তমানে প্রকাশিত "বিদ্যা নাটক", শ্রীশঙ্করাশ্রম স্বামী কৃত "বিমর্থ" নামক গ্রন্থ এবং রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর ইতিহাসপ্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। নির্ব্বাচিত গ্রন্থ সমূহে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৩১ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত সময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কলির অতীতাব্দ ৩০৫০ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকিত এবং উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, শঙ্কর সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লোক। ইদানীং প্রচলিত "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" নামক মাসিক পত্রিকায় উক্ত পণ্ডিতগণের মতের প্রতিবাদ বহুবার আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, পরিশেষে উক্ত প্রতিবাদে পূর্ব্বসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেও দেখা গিয়াছে, এবং সংস্কৃত পত্রের রচিত পুরীস্থ শঙ্কর মঠের "গুরু পরম্পরা" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, শ্রীস্বামী শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান স্বামী মঠাধিপ শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী পর্য্যন্ত এক শত তেতাল্লিস (১৪৩) পুরুষ অতীত হইয়াছে। পদ্মপাদাচার্য্য স্বামীকে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানন্দ পর্য্যন্ত ১৯ ঊনিশ পুরুষ মধ্যে এ মঠের স্বামীরা "অরণ্য" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ শিষ্য না করিয়া মানবলীলা সংবরণ করায়, কিছুকাল এই স্থান শূন্য ছিল। অনন্তর তীর্থ নামক একজন স্বামী কাশী হইতে আসিয়া এই মঠের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই স্থানীয় স্বামীদিগের "তীর্থ উপাধি" হইয়াছে। এই মঠের পঞ্চম পুরুষ স্বামী "পঞ্চদশী" নামক গ্রন্থের রচয়িতা একাদশ পুরুষ স্বামী শ্রীধর, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, তেষট্টি পুরুষ স্বামী রামচন্দ্র তীর্থ "সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ব্যাকরণ" রচয়িতা ছিলেন বলিয়া "গুরুপরম্পরা" গ্রন্থে প্রকাশ। ইহার মধ্যে যতকাল শূন্য ছিল, তাহা দুই পুরুষ পরিমিত কালের কম হইবে না। তবে মঠ দুই সহস্র বৎসরের অধিক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বোধ হয়, এ সকল পুস্তক সময়-নির্দ্ধারক আধুনিক পণ্ডিতগণের হস্তাগত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত্যাগ করিয়া অনুমানকে স্থাপন করিবার জন্য ইহারা এতদূর বদ্ধপরিকর হইতেন না। কেহ কেহ বলেন যে "শঙ্কর দিগ্বিজয়" গ্রন্থে পুরীর নাম উল্লেখ নাই। এবং মহাভারতাদিতেও উৎকলের কোনও স্থান পবিত্র বলিয়া উল্লেখ নাই। অতএব উড়িষ্যা অনার্য্য সমূহের বাসস্থান ছিল। আমাদিগের বিবেচনায় উপরোক্ত মন্তব্য বাচালতা মাত্র। কারণ আমরা আনন্দকৃত গিরিকৃত "দিগ্বিজয় গ্রন্থ" পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন স্থানে মঠ স্থাপন বিষয় কিছু উল্লেখ নাই। মাত্র বোম্বাই প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, আর্য্যাবর্ত্তের কতক অংশস্থ তন্মতবিরোধী সুযোগ্য মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে পরাস্ত করিয়া, শঙ্কর কাঞ্চীনগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত নহে। এই জন্য তিনি যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের নাম তাহাতে উল্লেখ নাই। কেবল যে সকল স্থানে যাইয়া বিরোধী মত নিরাকরণ করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের নাম এই পুস্তকে দেখা যায়। যদিও এ গ্রন্থে উল্লেখ নাই, তথাপি অন্যান্য পুস্তক লিখিত বিষয় সমূহ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে

পারে। দিগ্বিজয় গ্রন্থে পুরী প্রভৃতির নাম লিখিত না হইলেও যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা সময়ে বৈতরণী নদীর পবিত্রতা মহাভারতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে; তবে যে উড়িষ্যার পবিত্র স্থান নাই, ইহা বলা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। উড়িষ্যা পূর্ব্বে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, উৎকল নগরীর নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ উৎকল নামে অভিহিত। মহানদী ও বৈতরণীর মধ্যবর্ত্তী দেশ সমূহ "প্রাচ্য কোশল" নামে পরিচিত। খুর্দ্দা প্রদেশস্থ উড্রদেশ নামে কথিত। উড়িষ্যার অন্তর্গত গড়জাত সমূহ অরণ্যময় ও অনার্য্যদিগের বাসভূমি ছিল। কোন কোন গ্রন্থে উড়িষ্যার অনার্য্যদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তদ্দারা আধুনিক গড়জাত বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকিবে। পাঠক! দেখিলেত একটা মঠের কথা সংক্ষেপে লিখিতেও প্রস্তাবিত বিষয় হইতে কতদূরে আসিতে হইল। এইরূপে সমস্ত মঠের বিষয় পরিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ৭৫২ মঠ পুরীতে আছে। সমস্ত মঠের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিতে হইলে, বহু পরিশ্রম ও সময়ের আবশ্যক। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয় লিখিবার মানস রহিল। অধুনা মন্দিরের সেবকদিগের বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে ৩৬ ছত্রিশটী সেবক ভিন্ন ভিন্ন ৩৬ ছত্রিশটী কার্য্যে নিযুক্ত আছে বলিয়া ইহারা "ছত্রিশ নিযোগ" বলিয়া অভিহিত। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান নিযোগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। "পান্তানিযোগ":—ইহা জগন্নাথ দেবের পূজা কার্য্য করেন।

২। "পস্তপালক নিযোগ":—অর্থাৎ ইহারা ভগবানের বেশ করিবার জন্য পুষ্পাদি রক্ষা করা প্রযুক্ত শুদ্ধভাষায় "পুষ্পপালক" নামে অভিহিত।

৩। "সুপ্রকার নিযোগ":—ইহারা প্রভুর পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৪। "প্রতিহারী নিযোগ":—বহিদ্বারের রক্ষণাবেক্ষণ ইহাদের কার্য্য।

৫। "ঘুন্টিয়া নিযোগ":—ইহারা মন্দিরান্তবর্ত্তী কবাট সকলের রক্ষক।

৬। "গরাঙ্কু নিযোগ":—ইহারা সমস্ত দেবতাদিগের আবশ্যকীয় জল যোগায়।

৭। "বিমানঙ্কু নিযোগ":—ইহারা প্রভুর যাত্রা সময়ে বিমান বহন করে।

৮। "দইতা নিযোগ":—ইহারা ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত বিশ্বা বসু বংশীয়। ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্ত্তন ও পহন্তিবিজয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৯। "বিদ্যাপতি নিযোগ":—ইহাদের নাম "ক্ষেত্রমাহাত্ম্য" গ্রন্থে লিখিত আছে। ইহারা দেবতার "দইতা"দিগের সহিত সমস্ত কার্য্য এবং অনবসর সময়ে পূজা সম্পাদন করে।

১০। "ভিতর ছেউ নিযোগ":—ইহারা মন্দিরের ভিতরের দ্বার সকল মুদ্রাচিহ্ন দ্বারা বন্ধ করে এবং সময়ে সময়ে কার্য্যবিশেষে দেবতার পূজাও করে।

১১। "মেকাপ নিযোগ":—এই নিযোগ যাবতীয় পদার্থ রক্ষক।

১২। "তটাউ নিযোগ":—এই নিযোগ মন্দিরের যাবতীয় কার্য্য লেখক।

১৩। "দেউল করণ নিযোগ":—ইহারা মন্দিরের আয় ব্যয় লেখক।

১৪। "উড়িষ্যার রাজ নিযোগ":—ইহা-

রাও একটী নিযোগ রূপে পরিগণিত। ইহারা স্নান পূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে প্রভুর কতক সেবা কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহ করে।

১৫। "মুদিরথ নিযোগ": —সংস্কৃত নাম "মুদ্রাহস্ত।" ইহারা রাজার অনুপস্থিতি সময়ে রাজকীয় কার্য্য সকল প্রতিনিধি স্বরূপ নির্ব্বাহ করে।

এইরূপে সমস্ত নিযোগ সমূহের কার্য্যাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমস্ত বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া এইস্থানে ক্ষান্ত হইতে হইল। পাঠকগণ! দেখুন আধুনিক গবর্ণমেণ্ট কার্য্য নির্ব্বাহের যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, অগ্য হইতে বহু বৎসর পূর্ব্বে পুরীস্থ মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ বন্দোবস্ত তদপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। আর একটা বিশেষত্বও দেখুন, অধুনা সকল রাজকীয় বিভাগে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু আবাহমান কাল হইতে তাহারা এইরূপ পরিপাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য্যে অনুরাগ সহকারে উপস্থিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কারণ যে ব্যক্তি যে যে কার্য্যে নিযুক্ত, তদ্ভিন্ন অন্য দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব সকলে নিজ নিজ কার্য্যে তৎপর থাকে। প্রবন্ধের শীর্ষ ভাগে নীতি বিবরণ, সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। পাঠকদিগের সন্তোষামৃত তৃপ্ত না হইবার আশঙ্কাতে অনন্তর মন্দিরের নীতিবিবরণ প্রসঙ্গাধীন বলিয়া বোধ হওয়ায় এই স্থলে তাহার বিবৃতি প্রদত্ত হইল। প্রত্যহ প্রথম একবার "বালভোগ" এবং শ্রীদেবের "অন্নভোগ" পাঁচবার অর্থাৎ প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতি (আরত্রীক্) অনুষ্ঠিত হয়, পরে বল্লভ নামে বালভোগ হয়, অনন্তর দিবাভাগে সকাল ধূপ এবং মধ্যাহ্নকালে দ্বিপ্রহর ধূপ, উপাধি ভোগ, অন্নভোগ ভোগমণ্ডপে দেওয়া হয়; তৎপরে দেবের "পঁহুড়" অর্থাৎ দিবা নিদ্রা হয়। দেবের সন্ধ্যা পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যা সময়ে সায়ংকালীন আরত্রিক হইবার পরে সায়ং ধূপে অন্নভোগ করা যায়। অতঃপর প্রভুর চন্দন লেপন হয়, নীলাদ্রি নাথ (জগন্নাথ) নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পমালায় ভূষিত হন। সে সময়ে "গীত গোবিন্দ" প্রভৃতি পাঠ হয়, সেই সময়ে কোন ভোগ দেওয়া যায় না। তৎপরে "বড়সিংহার" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেশ পরিহার করতঃ উৎকৃষ্ট বেশ পরিধারণ করেন। এই সময়ে নানাবিধ ঘৃতপিষ্টক ও "পথাল" অর্থাৎ পান্তাভোগ দেওয়া হয়। ইহার পর বীণাবাদন এবং প্রভুসন্নিধানে দেবদাসীদিগের গীত সমাপ্ত হইবার পর "রাত্রপহুড়" অর্থাৎ রাত্রনিদ্রা আরম্ভ হয়। মঙ্গলারাতি, সন্ধ্যারতি ও ধূপত্রয়ের শেষে সমস্ত যাত্রী ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ জগন্নাথ দেবের সমীপে যাইয়া নির্ব্বাধে দর্শন করিতে পারেন। ইহাকে "সাহান মেলা" বলে। ইহাত দৈনিক কার্য্য। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তদ্ব্যতীত অনেক উপাধি ভোগ দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেক যাত্রা দিনেও উপরোক্ত ভোগ ভিন্ন যাত্রার বিশেষ ভোগ হয়। যাহা যাহা স্থূলতঃ সাধারণ লোকদিগের বিদিত, সেই সকল প্রবন্ধস্থ হইল। আর যে সকল ঔপাধিক বিধি প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "মাদলাপঞ্জিকার" সাহায্য ব্যতীত অত্রত্য সেবকদিগেরও অবিদিত। আমরা সম্পূর্ণরূপে এবিষয়ে বিদিত নহি, ইহা

আশ্চর্য্যজনক কথা নহে। পূর্ব্বে যে যাত্রার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত পাঠকদিগের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার সম্ভাবনায় উক্তবিষয় প্রবন্ধস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি মদন মোহন দেব স্বয়ং জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে যখন "বিজয়" অর্থাৎ গমন করেন, তাহার নাম যাত্রা। এইরূপ যাত্রা দ্বাদশবিধ, যথা :—

১। স্নান, ২। গুণ্ডিচা(বা)রথ, ৩। শয়ন, ৪। দক্ষিণায়ন, ৫। উত্তরায়ণ, ৬। পার্শ্বপরিবর্ত্তন, ৭। উত্থাপন,৮। প্রাবরণ,৯। পুষ্যপূজা, ১০। দোল, ১১। দমনকমহোৎসব, ১২। চন্দন স্নান যাত্রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রাতঃকালের পূর্ব্ব হইতে স্বয়ং জগন্নাথ প্রভৃতি প্রতিমাগণকে পহুণ্ডী বিজয় করাইয়া স্নান-বেদীতে স্থাপন করান হয়। প্রাতঃকালে "নীলাদ্রিমহোদয়োক্তি" বিধি অনুসারে মুদিরথের দ্বারা পূর্ব্বদিনের বাসী জলে প্রভুর স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে হস্তী সমবেশ দ্বারা প্রভুকে ভূষিত করা হয়। উক্তবেশ অতি প্রাচীন নহে, প্রায় ৪০০ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। মাদলা পঞ্জিকা ও জনশ্রুতিদ্বারা জানা যায় যে, কাঞ্চীরাজা তাহার পদ্মাবতী নামা কন্যাকে পুরীর রাজা "পুরুষোত্তম দেবের" সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত স্নান যাত্রার সময় পুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনি গণপতি ভক্ত থাকায় জগন্নাথ দেবের প্রসাদ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু স্নানবেদিতে দর্শন করিবার সময় প্রভুকে গণপতিরূপে দেখিবার নিমিত্ত অন্ন প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত দিবসে উক্তবেশে ভূষিত হন। আরও সেই দিবসে পূর্ব্বোক্ত কাঞ্চীযুদ্ধের বীজ আরোপিত হয়। সেই দিবস পুরীর রাজা সুবর্ণমার্জ্জনিতে স্নান বেদী মার্জ্জন করেন। এই শাস্ত্রোক্ত বিধির বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষোত্তম দেব উক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময়, কাঞ্চীরাজা তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া, কন্যা সমর্পণ না করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুরীরাজ এই বিষয় জানিতে পারিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উক্ত বেদীতে প্রচুর অন্নপিষ্ঠকাদি ভোগ একবার দেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যাসময়ে মন্দিরাভিমুখে দেবতাকে বিজয় করাইয়া "অনবসর" পীঠে প্রভুকে উপবেশন করান হয়। আগমন, স্নান ও প্রত্যাগমনের সময় দর্শকদিগের যতদূর পুণ্য হয়, তাহা "ক্ষেত্রমাহাত্ম্য" ও নীলাদ্রিমহোদয়" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সেই দিবস হইতে আষাঢ় মাসের অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই পঞ্চদশ দিবস উক্ত পীঠে প্রভু উপবেশন করেন। প্রভুর চতুঃপার্শ্ব বংশ নির্ম্মিত পাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়। বহু প্রামাণিক গ্রন্থে এই সময় প্রভুর দর্শন নিষিদ্ধ। ১৫ দিবস মধ্যে এক এক দিবস "নীলাদ্রিমহোদয়ের" বিধি অনুসারে শ্রীঅঙ্গ ক্রমে ক্রমে সংস্কার করা হয়। নির্ব্বাচিত অমাবস্যার দিন "নবযৌবন" দর্শন হয় ; প্রতিপৎ দিবসে প্রভুর নেত্রোৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হয়, তৎপর দিবস দ্বিতীয়া তিথির প্রাতঃকালে "খেচরান্ন" ভোগ শেষ করিয়া রথাভিমুখে প্রভুর পহুণ্ডীবিজয় করা হয়। এইযাত্রার নাম "গুণ্ডিচা" যাত্রা। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ পট্টমহিষীর নাম গুণ্ডিচা থাকায়, সেই অনুসারে এই যাত্রার নামকরণ হইয়াছে। এই যাত্রার নামান্তর "নন্দীঘোষ" বা "পতিতপাবন"

যাত্রা। ইহা নব দিন যাত্রা অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতে দশমী পর্য্যন্ত স্থায়িনী। প্রথম দিন মূর্ত্তিত্রয় রথারূঢ় হইবার পরে রথত্রয় "বেঠিয়া" দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যজ্ঞবেদীর নিকট সায়ংকালে উপস্থিত হয়। সেই দিন রাত্রে প্রভূদিগকে পহণ্ডী করাইয়া যজ্ঞবেদীস্থ রত্ন সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। সপ্তদিবস পর্য্যন্ত দেব, যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করেন। নীলাদ্রিস্থ মন্দিরের নীতির ন্যায় এই স্থানের নীতি অবিকলরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্ত দিবস অন্নপিষ্টকাদি ভোগ দেওয়া হয়। ইতি মধ্যে রথ ত্রয়ের মুখ নীলাদ্রি দিকে স্থাপন করা হয়। ইহাকে দক্ষিণ মূর্ত্তি বলা যায়। নবম দিবসের প্রাতঃকালের পূর্ব্বে 'খেচারন্ন' ভোগ শেষ করিয়া দেবকে রথারূঢ় করা হয়। এই রীতি "ক্ষেত্রমাহাত্ম্য" প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িষ্যা হিন্দু রাজাদিগের অধীন থাকার সময়, কার্য্য এইরূপ সম্পাদিত হইত। উড়িষ্যা পরাধীন হইবার পরে এই রীতির বিশৃঙ্খলা ঘটে; অর্থাৎ একদিন মধ্যে রথ না যাইয়া ৪।৫ চারি পাঁচ দিনে রথত্রয় যজ্ঞ বেদীর নিকটে উপস্থিত হইত। যাহা হউক, নবম দিবস মধ্যে অতি কম এক দিবসও গুণ্ডিচাগৃহ মধ্যস্থিত সিংহাসনে প্রভুর উপবেশন হইবে এবং একবার অন্ন ভোগ হওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রথ যাত্রা বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সকল 'নীলাদ্রিমহোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে। গুণ্ডিচা যাত্রার প্রথম দিবসে সমস্ত রথ সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত রথের উচ্চতা যথাঃ— জগন্নাথদেবের রথ, ২৩ হাত উচ্চ; বলভদ্র দেবের রথ, ২২ হাত উচ্চ; এবং সুভদ্রাদেবীর রথ ২১ হাত উচ্চ। জগন্নাথদেবের রথের ষোড়শ চাকা, ইহাকে "নন্দীঘোষ" রথ বলা যায়; ইহার জন্যে ষোড়শত 'বেঠিয়া' আবশ্যক। বলভদ্র দেবের রথের চতুর্দ্দশ চাকা; ইহাকে "তালধ্বজ" রথ বলা যায়; সুভদ্রাদেবীর রথ দ্বাদশ চাকা; ইহাকে "দবদলন" রথ বলা যায়। পরোক্ত রথত্রয়ের আকর্ষণ নিমিত্ত, যথাক্রমে চতুর্দ্দশশত ও দ্বাদশ শত "বেঠিয়া" আবশ্যক হয়। প্রতিষ্ঠা বিধির পর সমস্ত রথ নানাবিধ পট্ট বস্ত্র ও ভূষণে সুসজ্জিত হয়। প্রত্যেক রথের চক্র সংখ্যানুসারে রথ রজ্জু ব্যবহার করা যায়। রজ্জু নারিকেল ত্বক অর্থাৎ কাতায় নির্ম্মিত হয়, ইহা লম্বা প্রায় ১০০ এক শত হস্ত, অধুনা বেঠিয়ার সংখ্যা অনেকাংশে কম হইয়াছে। স্নান যাত্রা হইতে গুণ্ডিচা যাত্রা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাবসু বংশীয় "দয়িতা নিযোগ" এবং তাতি বংশীয় ব্যক্তিরা ভোগ কার্য্য ভিন্ন সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। মাদলা পঞ্জিকায় প্রকাশ এবং অদ্যাপি কিংবদন্তি আছে যে "বড়দাণ্ডে" নদী থাকার সময় ছয়টী রথ নির্ম্মিত হইত। যেখানে "অর্দ্ধশনী" বিদ্যমান তাহা নদীর দক্ষিণ কূলে ছিল। গুণ্ডিচা মণ্ডল বাম কূলে ছিল। অতএব এই দুয়ের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইত। "অর্দ্ধ শনিকে" সাধারণ লোকে "মাসীমা" বলে। নদীর মোখনা অদ্যাপি বিদ্যমান। এবং বাঙ্কি মোহানা নামে আখ্যাত। সেই মোহানায় চক্রতীর্থ অবস্থিত। সিকতারাশির দ্বারা নদীর মুখ অবরুদ্ধ হওয়ায়, নদীর গতি ক্রমে মন্থরা হইল এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নদীগর্ভ উন্নত হওয়ায় পয়ঃপ্রবাহ ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিল। নদী লুপ্ত হওয়ায়, সেই সঙ্গে

সঙ্গে তাহা লোকের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। কেবল তাহার মনোরম সৈকত "সারধা' বালি বলিয়া পরিচিত। গুণ্ডিচা উৎসব সময়ে এই নামের সার্থকতা অনেকে অনুভব করিয়া থাকেন। নদীর এক পার্শ্বে তিনটী রথ, অপর পার্শ্বে তিনটী রথ থাকিত। মূর্ত্তিত্রয় রথে আরোহণ করিয়া নদীর এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, নদীতে নৌকা প্রস্তত থাকিত। তদ্বারা অপর কূলে উত্তীর্ণ হইয়া তৎকুলস্থিত রথে আরোহণ করিতেন। নদী লুপ্ত হওয়ায়, এই সকলের পরিবর্ত্তে কেবল তিনটী রথ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

"শয়ন-যাত্রা" আষাঢ় শুক্ল একাদশী রাত্রে সন্ধ্যা ধূপের শেষে শয়নোৎসব এবং পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধ শয়ন মূর্ত্তি হস্তিদন্ত পালঙ্কে চারি মাস শয়ন করেন।

দক্ষিণায়ণঃ—শ্রাবণ সংক্রমণ অর্থাৎ কর্কট সংক্রান্তি দিবসে এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমধূপ (ভোগ) অন্তে দক্ষিণায়ণ বিধি আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নধূপের পূর্ব্বে শেষ হয়।

পার্শ্বপরিবর্ত্তন :—ভাদ্র শুক্ল একাদশী দিবসে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন যাত্রা হয়। সন্ধ্যাধূপের শেষে এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে নানাবিধ নৈবেদ্য অর্পিত হয়। শয়ন প্রতিমার নিকটে অগ্নিশর্ম্মা অর্থাৎ "মুন্দিরথ" উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিবার পরে প্রতিমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

উত্থাপন :—কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী দিবসে প্রথম ধূপের শেষে উত্থাপন বিধি, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে উক্ত দেবকে শয্যায় উঠান হয়।

প্রাবরণ :—মার্গশির শুক্লপক্ষ ষষ্ঠীতে প্রাভাতিক ধূপ সমান করিয়া, প্রাবরণ যাত্রার পূজা প্রভৃতি উৎসব করা যায়, পরে প্রভুত্রয়ের অবয়ব নূতন পট্টবস্ত্রে আবৃত হয়। দেবদিগের অঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করা হয় বলিয়া ইহার নাম "প্রাবরণ" যাত্রা।

পদ্মপূজাঃ—পৌষমাস পূর্ণিমায় প্রাভাতিক ধূপের শেষে এই যাত্রার পূজা অভিষেক হয় এবং মূর্ত্তি সকল রাজোচিত বেশে মণ্ডিত হন।

উত্তরায়ণ :—এই যাত্রা মকরসংক্রান্তি দিনে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে তণ্ডুল প্রভৃতি কতক নৈবেদ্য দ্রব্য মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্ন পূজার শেষে দেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে মালা আনিয়া, সেই মাল্যকে "ছত্রকাহিনী" বাদ্যসহকারে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নয় বার প্রদক্ষিণ করা হয়। পর দিবস মধ্যাহ্ন পূজার শেষে উক্ত যাত্রাবিধি করা হয়। পূর্ব্ব দিবস আনীত তণ্ডুলকে জলে ধৌত করিয়া, সর প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ তাহার সহিত সংযোগ করা হয়। এই তণ্ডুল ও নানাবিধ ঘৃতপক্ক পিষ্টক প্রভৃতি মন্দিরের অন্তর্বেষ্টনে প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে, চতুরধিক অশীতিবার প্রদক্ষিণ করা করা যায়, পরে প্রভুর নিকটে আনিয়া ভোগ দেওয়া হয়। এই তণ্ডুলকে জনসাধারণ "মকর-চাউল" বলে।

দোলযাত্রা :—এই যাত্রা ফাল্গুন দশমী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা দিবসে শেষ হয়। প্রত্যেক দিবস সন্ধ্যাধূপের শেষে লোকনাথ, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, নীলকণ্ঠ এবং কপাল মোচনের পঞ্চবিমান সহিত ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি গোবিন্দ এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী মণিখচিত বিমানে বিরাজমান হইয়া জগন্নাথবল্লভের বল্লভ মঠের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত

বড় রাস্তায় যাইয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দোলমণ্ডপের আগ্নেয় কোণে "বহ্নিউৎসব" বিধি করা যায়। পূর্ণিমা দিবস প্রাতঃকালে শ্রী ও ধরা দেবীর সহিত গোবিন্দ দেব মণিবিমানোপরি আরূঢ় হইয়া মন্দিরের ঐশান্য কোণস্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত অত্যুন্নত অতি বিস্তৃত বৃহদ্বিতান্ শোভিত দোলমণ্ডপোপরি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দোলোপরি বিরাজমান হন। "ফল্গু" অর্থাৎ আবিরদ্বারা প্রভুর সর্ব্বাবয়ব সুরঞ্জিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম্রফল গোবিন্দের মস্তকোপরি অর্পিত হয়। মণ্ডপোপরি বালাভোগ অর্থাৎ চণক এবং শর্করা ও খই দ্বারা, ধূপত্রয় নির্ব্বাহ করা যায়। সায়ংকালে মণিবিমানোপরি বিরাজমান হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করেন।

দমনক মহোৎসব—

এই যাত্রা চৈত্র শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী প্রাতঃকালীন ধূপ শেষ হইবার পর পূজাদি মহোৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে "দমনক" বা "দমনামঞ্জরী" প্রভুকে অর্পণ করা যায়।

চন্দন যাত্রা ঃ—বৈশাখ শুক্লপক্ষ তৃতীয়া তিথিতে আরব্ধ হইয়া জৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে শেষ হয়। এই যাত্রা একবিংশতি দিবস স্থায়ী। প্রতিদিবস দুই প্রহর ভোগের শেষে যাত্রাভোগ করা যায়। পরে মহাপ্রভুর প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ পাল্কীতে মদনমোহন দেব, লক্ষ্মী ও ধরা দেবীর সহিত মণিবিমানে বিরাজিত হইয়া যথাক্রমে অগ্রপশ্চাতে নরেন্দ্র সরোবর-সমীপে গমন করেন। পশ্চাদ্ভাগে নির্ব্বাচিত পঞ্চমহাদেবের সহিত বিমান সকল যায়। সেই সময়ে "বড়দাণ্ডের" অপূর্ব্ব শোভা অনির্ব্বচনীয়। তথায় তাঁহার বিশ্রাম নিমিত্ত স্থানে স্থানে চালাঘর নির্ম্মিত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে "পংক্তিভোগ" অনুষ্ঠিত হয়। মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে ভোগ ভক্ষণ করিয়া সরোবর সমীপে উপস্থিত হন। দুটী নৌকাতে ১টী করিয়া "চাপ" নির্ম্মিত হয় এবং ইহার চতুর্দ্দিকে চারিটী স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ইহার উপর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হয়। চন্দ্রাতপ ও নানাবিধ বস্ত্র দ্বারা, চাপদ্বয় সুশোভিত হয়। ইহার ভিতর একটীতে মদনমোহনের চিহ্নস্বরূপ শুক্লবস্ত্র নির্ম্মিত মণ্ডন প্রদত্ত হয়। অপরটীরে রামকৃষ্ণের পরিচায়ক চিহ্ন রক্তবস্ত্র নির্ম্মিত মণ্ডন প্রদত্ত হয়। একচাপে মদনমোহন, লক্ষ্মী ও ধরাদেবী, অন্যচাপে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চমহাদেব বিরাজমান হন। প্রথম চাপে দেবদাসী ও দ্বিতীয় চাপে নর্ত্তক বালক নৃত্য করে। চাপদ্বয় দিবসে নরেন্দ্র সরোবরের চতুঃপার্শ্বে একবার এবং রাত্রিতে বারত্রয় পরিভ্রমণ করে। এই চাপদ্বয় সহিত এক নৌকাতে ত্রৈলঙ্গী বাদ্যবাদকগণ আরোহণ করিয়া বাদ্যবাদন করে। ভক্তগণ চামর ও ব্যজন হস্তে লইয়া চাপোপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুর সেবা করেন। দিবস চাপের পর মদনমোহন প্রভৃতি দেববৃন্দ স্ব স্ব চন্দনকুণ্ডে জলক্রীড়া শেষ করেন। প্রায় "৬" দণ্ড পর-সেবক পশুপালকগণ জলক্রীড়া শেষ করাইয়া প্রথম দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন পুষ্প ও হীরক সুবর্ণাদি-খচিত ভূষণসমূহের দ্বারা প্রভুকে সুশোভিত করিয়া রাত্রিচাপে লওয়া হয়। এই চাপের শেষে প্রভু পূর্ব্ববৎ বিমানোপরি আরূঢ় হইয়া মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রত্যাগমন সময়ে ভগবানের মার্গে স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া যাইবার সময়ে যে অলৌকিক শোভা জাত হয়, তাহা ভক্ত-হৃদয় ব্যতিরেকে অন্য

কাহারও অনুভব করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মার্গমধ্যে ৬টী স্থানে দেবদাসী ও নর্ত্তক বালক প্রভুর সমক্ষে নৃত্য করেন। এই যাত্রার একাদশ দিবস হইতে প্রভুর বেশ পরিবর্ত্তন করা যায়। এই সময় "কৃষ্ণাবতার" বেশে ভূষিত হন; অর্থাৎ পূতনা বধ, শকটা বধ, প্রভৃতি সম্পাদন করার সময়ে যে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সেই বেশ ধারণ করেন। এই যাত্রা মাধুর্য্য-রসোদ্দীপক, এবং বহুদিবস ব্যাপক। প্রভুর জলক্রীড়া সময়ে নগরবাসীগণ নরেন্দ্র সরোবরে অবগাহন করিয়া সুবাসিত চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরকে সুশোভিত করেন।

যাত্রার বিষয় সংক্ষেপতঃ সমাপ্ত হইল। বর্ত্তমান মুক্তিমণ্ডপের বিচার করা যাউক।

মুক্তিমণ্ডপ :—এই স্থান ব্রহ্মাসনের উপর ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে কথিত। ইহার নাম ভারত বিদিত। এখানে অত্রত্য শঙ্করমঠ প্রভৃতি সন্ন্যাসীমঠের সন্ন্যাসীগণ, ও ব্রহ্মচারীমঠের ব্রহ্মচারীগণ, এবং ষোড়শ ব্রাহ্মণ শাসনের ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কাহারও উপবেশন করিবার অধিকার নাই। এই স্থানে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং নির্ব্বাচিত শাসনের পণ্ডিতদের একটী সভা আবাহমান কাল হইতে অবস্থিত। মন্দিরের স্মৃতি বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য এই সভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবার পর মন্দিরে প্রচলিত হয়। উড়িষ্যা প্রদেশের স্মৃতি বিষয়ক যাবতীয় ব্যবহার এই সভার দ্বারা মীমাংসিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে অর্থাৎ বঙ্গে পাশ্চাত্য এবং দক্ষিণ প্রদেশ হইতে সময় সময় যে যে স্মৃতি বিষয়ক প্রশ্ন উপনীত হয়, তাহার মীমাংসিত উত্তর এই সমাজ হইতে প্রেরিত হয়। মন্দিরের পাণ্ডা সেবক প্রভৃতি এই সমাজ পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইলে যথাযোগ্য মহারাজের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সমাজ সংস্কার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন এই সভা দ্বারা করা যায়। অধুনা মুক্তিমণ্ডপের বিষয় সংক্ষেপতঃ সমাপ্ত হইল।

ভোগ :—এই মন্দিরের দৈনিক ভোগের নিমিত্ত পূর্ব্ব রাজাগণ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করিতেন। উড়িষ্যার স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটিবার পর, সামান্য পরিমাণে ব্যয় স্থির করা হইয়াছে। বর্ত্তমান একদিনে ১২৫ ব্যয় করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই টাকা অনেক দিন হইতে চালাইয়া আসিতেছিলেন। পরে "সাতাইশ হাজারি" নামক একটী মহলকে এই টাকার জন্য Superintendent (temple)র হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় সেই মহলের কর দ্বারা প্রভুর দৈনিক ভোগ চলিতেছে। ক্রমশঃ দ্রব্য সমূহের মহার্ঘতার জন্য ২০০ টাকা দ্বারা সেই ভোগ চালান দুষ্কর হইয়াছে।

প্রবেশ :—বিধি এই মন্দির হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য হইলেও, নীচ জাতি অর্থাৎ কণ্ড্রা, ( এক প্রকার নিম্নজাতি, ইহারা এই দেশে সাধারণতঃ চৌকিদারি কার্য্য করে) বাউরি, পাণ, ( যাহারা বংশের খাঁচা, ঝুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে ) মেথর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতি এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রবেশ বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ। দৈবাৎ প্রবেশ করিলে "লীলাদ্রিমহোদয়" বিধি অনুসারে মন্দির শুদ্ধ করা যায়।

## উপসংহার।

আমরা পুরী মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে সমাপ্ত করিলাম। ইহাতে আমাদের কিছু অভিনব সৃষ্টি নাই। সমস্ত, শাস্ত্র

ও মাদলাপাঞ্জী হইতে উদ্ধৃত। পুরীর প্রাচীনতা বা মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়া, নিজের গৌরব ঘোষণা করা আমাদের প্রয়াস নহে। এই বিষয়ে জনসাধারণের কৌতুক নিবারণই উদ্দেশ্য। পুরী প্রাচীন হউক বা নূতন হউক, ইহা হিন্দুগণের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মস্থান ও গৌরবনিকেতন। উড়িষ্যা কিম্বা ভারতবর্ষ যে শিল্পে উন্নত ছিল, তাহার মূল সাক্ষী জগন্নাথের মন্দির। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ক্রমে এই প্রদেশ এখন অধঃপতিত। এখন উন্নত ব্যক্তিগণের চক্ষে এই প্রদেশ অবজ্ঞাত। ফলতঃ দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি উড়িষ্যার নিন্দা রচনায় সুখানুভব করেন। কোনও কোনও ব্যক্তি উড়িষ্যায় কিয়ৎকালমাত্র অবস্থান করিয়া শূকরনীতিতে উড়িষ্যার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কণ করিয়া সাধারণকে যে কদাকার ও বিকৃত ছবি প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় হইতে পারে সত্য, কিন্তু সত্যের অপলাপ দ্বারা তাঁহারা নিজের নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। "বেদান্ত-শাস্ত্রোণি দিম্ ত্রয়াণি" অধ্যয়ন করিয়া ইঁহাদের বৈদান্তিক হওয়ার প্রয়াস। পূর্ব্বে কোনও কোনও সাহেব কতক দিন ভারতবাসী হইয়া, ভারতবাসীগণেকে যে বন্য জন্তুতে পরিণত করিয়াছেন, লোকে তাহাতে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হন কেন? উৎকলের অনেক ত্রুটি আছে, সত্য, সে সমস্ত সরল ভাবে ও সাধু উদ্দেশ্যে দেখাইয়া দিলে, এ প্রদেশবাসী তাঁহাকে প্রীতি ও হিতৈষণার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতেন। যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা দ্বারা, সত্য ও মিথ্যার "খিচুড়ি" প্রস্তুত করে, সংসারে তাহাকে কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? সেই "খিচুড়ি" পরিত্যাগ করিয়া মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও অন্যান্য নীচ ভাব অপসারিত করিয়া পবিত্র প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি জগন্নাথের বিশাল মন্দিরে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে চান, তবে আসুন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল করিবেন।

শ্রীসদাশিব মিশ্র।

# ভারতের বহির্রাষ্ট্রনীতি। (২)

ভারতের বহির্রাষ্ট্রনীতি আলোচনায় আফগানিস্থানের সহিত আমাদের সম্পর্ক বিচার করিতে হয়। যে প্রাচ্য নৃপতি হিন্দুস্থানে আসিয়া বলিয়াছিল—

"Will ye embroil me with those amidst whom I would wend my way in amity? Allah forefend. A hundred cows ye would slay in my honour. Ye shall not slay one cow. Not this or any other act of religious devotion that can cause pain or grief to the Hindu subjects of king Edward shall ye do in my honour at Delhi or elsewhere in India. What? Are there not goats enough? Are there not camels enough for the sacrifices to the Jumma Masjid of Delhi? I go to celebrate with you the glorious Id. Slay there goats if you will till the rivers run blood. The Hindus mind not that. But if so much as *one* cow be given into slaughter I shall turn my face from you and Delhi for ever."

এই রহস্যময় রাজ্যের নৃপতির আলিগড়ে প্রদত্ত একটী বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত

করিতে হইতেছে, পরে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

"I ask you this from this time forth not to believe that I am a Sunni-bigot. In Afghanisthan I have among my subjects Sunnis, Shiahs, Hindus, Jews and I have given to all of them full religious liberty. Is that bigotry?"

এবার ভারতে আসিয়া আমীর হবিবুল্লা বিশেষ ভাবে সকলকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সে অসভ্য নৃপতি নহে। তাহার বিবেচনা ও বুদ্ধির কৌশল রহিয়াছে। Diplomacy তাহার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য নহে। আমরা তাহাকে যতটা বুঝিয়াছি, ততটা হাতে কলমে প্রকাশ করা সম্প্রতি অনাবশ্যক। আমীরের চেষ্টা সফল হইয়াছে—হিন্দু মুসলমানের হৃদয় এত সহজে আর কেহই জয় করিতে পারে নাই। তাহার প্রতি ভারতের প্রীতি দেখিয়া ইংরাজ শিহরিয়া উঠিয়াছে। কোন ভারতবাসীকে তাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এত আতঙ্ক কেন? ইংরাজ কি আফগানিস্থান ও আমাদের মাঝে কোন গুপ্তমন্দির সম্ভাবনা কল্পনা করে? ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সহিত আফগানিস্থানের হিন্দু মুসলমানের সৌহৃদ্য কি নিবারণ সম্ভব? সে দিন দূরে নহে, যেদিন আমাদের কংগ্রেস কন্ফারেন্সে তথাকার প্রতিনিধি উপস্থিত হইবে। ইহা ত ফরাসী চন্দননগর নহে যে, ইউরোপীয় বর্ব্বরতা নির্লজ্জতার সহিত অবলম্বিত হইবে?

যতদিন আমীরকে সমগ্র সভ্যজগতের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, ততদিন আমীর ইংরাজের প্রতি বিমুখ ছিল। যে মুহূর্ত্তে Dane সাহেবের মিলনের ফলে His Majesty এই উপাধি তাহাকে দেওয়া হইল, তখন হইতেই আমীর ভবিষ্যতের তত্ত্ব ভিতরে-ভিতরে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মিঃ এ, এইচ গ্রাণ্ট Blackwoods Magagineএ ডেন সাহেবের সন্ধির বিবরণ দিয়াছিলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ, জানি না কেন, এক দোয়াত কালী সন্ধিপত্রের উপর পড়িয়া যায়। হয়ত ইহা ইংরাজের পক্ষে—কারণ ইংরাজই প্রার্থী, মঙ্গলজনক হইবে না, বিধাতা অলক্ষ্যে এই ইঙ্গিত করিলেন। বিবরণে আছে:—

"Treaty engrossed on parchment in duplicate had been duly laid before the Amir for signature when one of the attendant native gentleman in his officious anxiety to help the Amir, to write his name upset some ink over one of the parchment. Endeavours were at once made with chalk and blotting paper and penknives to run over the stain *but it remained.*"

এতদিন আফগানিস্থানকে protected state বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত এবং ভারতের 'স্বাধীন' ও করদ নৃপতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় ফেলিতে প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করা হয়। নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ আমীর হবিবুল্লা গ্রাহ্যও করে নাই। দিল্লীদরবারে আমীরকে যে কোন প্রকারে হাজির করিয়া, ইংরাজ-সম্রাটের যে কোন একটা উপাধি দিয়া জগতের সাম্‌নে তাহার বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য ক্লাইভের বংশধরেরা নানা প্রকার ফন্দী অবলম্বন করিয়াও সফল হয় নাই।

যখন বুঝিতে পারিল, হবিবুল্লা ব্রহ্মের রাজা 'থিব' এর ন্যায় সহজ-লভ্য মেওয়া নহে, তখন অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিতে হই-

য়াছে। Durand সন্ধির পর ডেন সাহেবের সহিত সন্ধি যদিও প্রাচ্য-নৃপতি হবিবুল্লার উজ্জ্বল উন্নত শীর্ষে নবকীরিট স্থাপন করিয়া দিয়াছে এবং যদিও ইংরাজ এখনও আফগান-ভূমিকে Buffer state বলিতে লজ্জা অনুভব করে না, তবুও সে Sir William Macnaghten এর ললাট-লিপি এখনও ভুলিয়া যায় নাই— আফগান জাতিকে ইংরাজ যথার্থই ভয় করে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান আফগান-ভূমিতে গোলা, বারুদ ও টোটার অভাব একেবারেই নাই।

একথা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করি না যে, আমীর হবিবুল্লার সহিত আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, সে সম্পর্ক কি, তাহা যতই অশান্তি এবং উপপ্লবের সূচনা হইবে, ততই স্পষ্ট এবং স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। কোন চিন্তাশীল বক্তা তাঁহার কোন বক্তৃতায় আমীরের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, তৎসম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করায় বিলাতের Times পত্রে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইংরাজ বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছে। হবিবুল্লা কাশ্মীর নৃপতি বা কর্পূরতলার মহারাজা নহে যে, হুকুমমত আমীর হইতে Royal Manifesto বাহির হইবে!

আমীর শুধু ইংরাজের দিকে চাহিয়া নাই। রুষিয়ার উক্ততাও সে অনুভব করে, কাজেই ইংরাজ এখন কথা বলিতে পারে না; যাহাতে আমীর বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বরাজপ্রীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে। বরং আমীর আসিয়া ভারতবর্ষের সকল জাতির সহিত এমন সহানুভূতি দেখাইয়াছে, যাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের একতম অংশ, তাহার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু আমীর তাহার উদারতায় তাহাদিগকেও জয় করিয়াছেন। I am not a Sunni-bigot, এ কথাটার ভিতর কি আদর আকর্ষণ রহিয়াছে, কি স্নিগ্ধতা, কি প্রেম উছলিয়া পড়িতেছে।

হিন্দুর প্রতি প্রীতি দেখাইয়া আমীর ইংরাজকে সাধারণের চক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছেন। ইংরাজ বাহাদুরী করিয়া বলিত যে, religious neutrality তাহার একটা বিশেষত্ব। উড়িষ্যার ব্যাপার এবং পরেশনাথ শৈলের কীর্ত্তি এবং এই শ্রেণীর বহু কথা ভুলিয়া গেলেও প্রাচ্য নৃপতি আমীর ইংরাজকে আমাদের চোখে বড়ই ছোট করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, মুসলমান হইলেই হিন্দুর গলায় ছুরি বসাইতে হয়; ইংরাজ ইতিহাসের এই স্বতঃসিদ্ধ কথা কপটতা মাত্র।

আমীর এখনও নিজের ক্ষমতা যে কতটুকু, তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই, এতদিন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লিপ্ত থাকার বিশেষ ভাবে আমীর হয়ত ভারতবাসীকে বোঝে নাই। হয়ত বুঝিয়াছে, কিন্তু এখনও এতটা ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন মনে করিতেছে না।

তবে একথা ঠিক, কিঞ্চিৎ সাহস জাগ্রত হইলেই আফগানিস্থানের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটী বন্দরের জন্য আমীর প্রাণপণে চেষ্টা করিবে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ কিম্বা দক্ষিণ এসিয়ার যে কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলেই ভারতবাসীর সাহায্যে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিবেই।

আমাদের পার্শ্বলগ্ন কেবল এই একটী

মাত্র যথার্থ স্বাধীন রাজ্য ও নৃপতি রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তার মতে আমরা তাঁহাকে ঠিক Dictator করিব কিনা, জানিনা, হয়ত অতটা ক্ষমতা বাহিরের কাহাকেও আমরা দিব না। কিন্তু তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে একটী বাহিনী গঠিত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের প্রমাণ নাই। এই বাহিনী সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়া করাচি বন্দরটী হস্তগত করিবে। শতদ্রু নদী বিখ্যাত শিখসমর ক্ষেত্র সোব্রাঁওর সন্নিকটস্থ হিরিকি নামক স্থানে, অমৃতসরের দক্ষিণে, বিপাসা নদীর সহিত মিথিত যে ধারা নদীকে সৃজন করিয়াছে, তাহা যে অতি সহজেই এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমানা হইতে পারে, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি খুলিলে অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। এই স্থানে সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে পাথুরে কয়লা এবং গন্ধকও পাওয়া যায়। এই ভূখণ্ডের চারিটী রেলওয়ে, যথা সিন্ধু-পাঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ে, পাঞ্জাব-উত্তর-ষ্টেট-রেলওয়ে, ইণ্ডস-ভ্যালি ষ্টেট রেলওয়ে ও রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে, এই নবগঠিত নব্যভারত বাহিনীর করতলগত হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই স্থানে ভারতের যাবতীয় যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা বাস করে—শীথ, জাঠ, গুর্জ্জর, রাজপুত, মোগল, পাঠান প্রভৃতির ইহাই কর্ম্মভূমি। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইস্থানে ইংরাজ প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

এসিয়ার মানচিত্র দেখিয়া অনেকের একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতিকে অনেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্থানকে অনেকে সুইজারল্যাণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর মনে করে না। তাহাদের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত তালিকাটী দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিলাম।

| দেশ | আয়তন—বর্গমাইল। |
|---|---|
| গ্রেটব্রিটেন— | ১২১,১৩৫ |
| ফ্রান্স— | ২০৪,০৬০ |
| জর্ম্মণী— | ২০৮,৮৩০ |
| আফগানিস্থান— | ৪০০,০০০ |
| পারস্য— | ৬৫০,০০০ |

কাজেই আফগানভূমির নৃপতি রাজ-সম্মানে ফরাসীনৃপতির অপেক্ষা কেন যে হীন হইবে, বুঝিনা। অবশ্য ইউরোপীয়েরা পৃথিবীর অন্যস্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, কিন্তু এসিয়ার পক্ষে এই বিস্তার সুদূরপরাহত নহে।

যুদ্ধাবসানে আমীর করাচী বন্দর এবং North West Frontier Province পাইলে তৃপ্ত হইবে। ইহার পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুনদীর পশ্চিম শাখা সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই ব্যবস্থায় কেবল আমীরের যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে, সমগ্র ভারতের পক্ষেও এই স্থানটী অশান্তির সময় Dynamoর ন্যায় কাজ করিবে। ইহাই ভারতের একটী প্রধান Strategic স্থান হইবে। একটু চিন্তা করিলেও এই স্থানের শক্তি-কেন্দ্র ( Strategic points ) গুলি নির্ণয় করা যাইতে পারে।

আমীরের সহিত এই সহযোগ ইতিহাসে একটা নূতন ব্যাপার হইবে না। ইতালীর মন্ত্রী Cavour ফরাসীর সহিত এইরূপ মিত্রতা বদ্ধ হইয়াছিল। এবং Piedmont এবং Lombardy এইরূপ strategic স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

পশ্চিম সীমান্ত এবং আফগানিস্থানের

সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচার শেষ করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্য ব্যবসা ব্যপদেশে আমাদের আফগানিস্থানের সহিত যে সম্পর্ক রহিত হইয়াছে, তাহার দুরীকরণঃসর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়োজনীয় মনে করি। যাহাতে আমীর ইউরোপীয় নৃপতির ন্যায় হইতে পারে, তজ্জন্য যুক্ত ভারতবাসী তাঁহার কল্যাণ কামনা করা উচিত, কারণ আমীরের স্বার্থ কিছুতেই ইংরাজের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। ইহাই মৌলিক কথা। এই প্রতিকূলতার বীজ আমীর আব্দর রহমান বপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত আফগানভূমি একটী বন্দর লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে। ক্ষুদ্রমনাঃ ইংরাজ কিছুতেই ইহা দিবে না, কারণ তাহাতে প্রেষ্টিজের হানি হইবে, এমন নহে, তদপেক্ষা বেশী কিছু হানি হইবে।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমীর মুসলমান-নৃপতি। রাষ্ট্র-কলেবরে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ মুসলমানসমাজ সহজেই হিন্দুর সহিত কৃত্রিম কলহ ভুলিয়া আমীরের সহিত সম্মিলিত হইবে।

দক্ষিণ এসিয়ার কোন বিপ্লবে পারস্য প্রদেশকে একেবারে অবহেলা করা যাইতে পারিবে না। নূতন পার্লিয়ামেণ্ট সৃষ্টির পর সম্প্রতি আভ্যন্তরীণ ছোট খাট মনোমালিন্য ঘটিতেছে বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মিছরীর দানার ন্যায় সম্রাট এবং মন্ত্রীসভাকে অবলম্বন না করিয়া পারস্যের সমগ্র শক্তি স্বচ্ছ বন্ধনে জমাট হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সম্রাটের প্রকৃতি আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে পারস্যের Charge de' Affairesএর সহিত রিউটার (Reuter) এর প্রতিনিধির যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা এসিয়াবাসী আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কুতূহলজনক।

"Although the new Shah has not been to Europe—as a rule the Crown Prince cannot leave the country—he is well-versed in the subjects taught in the universities of Europe. He speaks French particularly and has devoted considerable time to the study of political science and the political history of Europe. Among the literary men of Persia he has gained fame for his excellent caligraphy and elegant style two accomplishments much proved in Persia. His Majesty is, however, above all a military man and has a careful and thorough training in the art of war and has commanded serveral regiments. It may be interesting to Europeans to know that the Shah has not inherited from his royal ancestors the oriental love of pomp and display usually associated with Persian monarchs. He is fond of simplicity and the sumptuousness of his court does not exceed that which is absolutely necessary for the maintenance of his rank and dignity."

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, পারস্য সম্রাট বিলাতের কূট রাষ্ট্রনীতিজাল সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নহে। পারস্যভূমি সমুদ্রের উপর অবস্থিত বলিয়া ভবিষ্যতে এসিয়ার মানচিত্রের সর্ব্বদা উহার পরাক্রম অনুভূত না হইয়া পারে না।

এই প্রসঙ্গে কিছুকাল হইতে একটা Pan-islamic combination সম্বন্ধে সভ্যজগতে কিছু আলোচনা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে একটু মনোনিবেশ প্রয়োজন।

এসিয়ার সমগ্র মুসলমান শক্তিসমূহ যদি কোনরূপ offensive এবং defensive allianceএ আবদ্ধ হয়, তবে প্রাচ্যখণ্ডে ইউ-

রোপের চতুরঙ্গ ঠাঁই পাইবে না। আফগান, পারস্য এবং তুরস্ক সাধারণ ব্যক্তিগতভাবে একান্ত নির্ভীক, সবল, সুস্থ—কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রণালী তাহারা এখনও অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় নাই। একটী বিরাট আদর্শের মাদকতায় যদি তাহাদের এই আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদ-তন্তুগুলি ছিন্ন হয়, তবে এই মানব-সম্প্রদায়ের ক্ষমতার পরিধি নির্ণয় করিতে যাওয়া দুষ্কর হইবে। এই জন্য ইউরোপে এই পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। Anglo-Russian সন্ধি ইহার একটা দৃষ্টান্ত।

চতুর জাপান এই সমস্ত ভিতরের কথা সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়াছে। অল্পদিন হইল একটা জনরব উঠে, জাপান মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে,—আমাদের কোন কোন মুসলমান-ভ্রাতা বলিতেন, জাপান মুসলমান ধর্ম্মকে State religion বা রাজকীয় ধর্ম্ম করিয়াছে। Englishman পত্রিকাও এই সম্বন্ধে কলরব তুলিয়াছেন।

মুসলমান-ভ্রাতারা হয়ত মনে করিয়াছিলেন, মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া জাপান অজস্র ধর্ম্মভাব স্রোতে প্রবাহিত হইয়া এই কার্য্যে উদ্যোগ করিতেছে। কোন কোন বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, ইহাতে কিঞ্চিৎ মনোব্যথাও পাইয়াছিলেন, কারণ জগতে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতম মনে করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার দুরাশা নাই। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার ভার লওয়া অনাবশ্যক।

কিন্তু এ কথাটী বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, জগতে সকল সময় ধর্ম্মবুদ্ধিই যে মানব বা জাতিবিশেষকে পরিচালিত করে, এমন নহে। ধর্ম্মেতর নানা শ্রেণীর বুদ্ধি নানা কার্য্য সূচনা করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষুদ্র লৌকিক পরিধির বহু ঊর্দ্ধে জগৎ, ধর্ম্মের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে। এই জন্য এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইউরোপ, মিশনারী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া শনৈঃ শনৈঃ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে।

কাজেই জাপানও সেই পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে "শঠে শাঠ্যং"। সম্প্রতি এসিয়ার কোন প্রদেশে কর প্রসারণ করিতে ধর্ম্মের দোহাই না দিলে চলিবে না। কাজেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পশ্চিম এসিয়ার যাবতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার জন্মে। মুসলমান-শাসিত আফগান ভূমি, পারস্য, তুরস্ক, আরব, ঈজিপ্ত প্রভৃতি স্থানের কোনরূপ বৈদেশিক মন্দির সূচনায় জাপানের অনেক কথা বলিবার আবশ্যকতা জন্মিবে।

জাপান যে কেবল নিজের স্বার্থের দিকে চাহিয়া আছে, একথা অস্বীকার না করিলেও, এই স্বার্থে যে এসিয়ার শক্তিপুঞ্জের ক্ষমতা-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তাহা জাপানের অজ্ঞাত নহে। আপাততঃ জাপান ইউরোপীয় জাতির সহিত সন্ধিবদ্ধ, সন্দেহ নাই, কিন্তু জাপানও জানে, ইউরোপও জানে, কেহই কাহারও যথার্থ অনুকূল নহে, কেবল সাময়িক স্বার্থের আকর্ষণে এই বন্ধন ঘটিয়াছে। এই সময় ইউরোপের শক্তি বৃদ্ধি হইলে জাপানের পরাক্রম খর্ব্ব হইবে, অন্যপক্ষে এসিয়ার প্রাচীন শক্তিগুলি যদি পরাক্রমশালী হইয়া উঠে, তবে জাপানের

যে পরিমাণ সাহায্য ঘটে, সেই পরিমাণ ইউরোপের অব্যাহত গতির পথে কণ্টকও সঞ্চিত হয়। ইহাতে জাপানেরই লাভ।

মোট কথা ভবিষ্যতে জাপানে এসিয়াস্তর্গত রুসিয়ায় আত্ম বিস্তার করিতে চাহে। ইহা ছাড়া Philipine Islandsএর প্রতিও তাহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রহিয়াছে। এইজন্য জাপান, এসিয়ার শক্তি বৃদ্ধি সর্বান্তঃকরণে কামনা করে এবং যদি জাপানের আনুকূল্যে বিরাট এসিয়াস্তর্গত মুসলমান রাজ্যসমূহের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তবে সে গৌরবটুকু করিবার প্রলোভনও তাহার আছে।

তবে জগতের কোথাও নিতান্ত দুর্বল জাতির পরিত্রাণ নাই। কোরিয়ার অধঃপতন তাহার প্রমাণ এবং ভারতের দুর্দ্দশাও দুই শত বৎসর পর্যন্ত, তাহা জগতে প্রকাশ করিতেছে।

এইরূপ Pan-Islamic সমবায় যত শীঘ্র হয়, ততই এসিয়ার পক্ষে মঙ্গল। আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ইউরোপ এসিয়াতে কিরূপ ভাবে খেলিতেছে, তাহা কিছুকাল পূর্ব্বে Spectator পত্রে কোন বুদ্ধিমান লেখক সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করিতেছি। এই কালনেমির লঙ্কাভাগ ব্যাপার বড়ই কুতুহলজনক।

"When the arrangements are concluded, Great Britain, France, Russia and Japan will for certain purposes be allied. One of these purposes is *to guarantee each others possession* in Asia and another is to guarantee the integrity of China, thus preventing so far as the treaties extend any war of territorial ambition..... The treaties do not cover either Germany or America and both Germany and America have serious interest in the east which may in certain quite possible contingencies endanger the continuance of peace..........The Government of Germany to begin with will extremely dislike being left out in the cold. Apart from their suspicion that Great Britain wants to leave Germany isolated everywhere in the world—a suspicion which is enitirely baseless,—the ruling idea of that Government is that they are now entitled to a prominent place if not indeed the first place in that committee of seven—Great Britain, America, Germany, France, Austria, Russia and Japan, which now holds the general control of the world in its hands. Germany is certain sooner or later to make this idea manifest in some peremptory way. She did so in Morocco and the far east is much more important than Morocco."

তারপর লেখক জর্ম্মনীর স্বার্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে ওকালতী করিতেছেন :—

"The Japanese notion that Germany should be excluded because she possesses no territory in the Far East is not sound for she *owns the long lease of Kiochow*; and if it were sound, would be irrelevent, every great power being interested, if only for reasons of trade in the attitude and condition of every other."

তারপর ইউরোপের পক্ষ হইতে এই নূতন প্রণালীর স্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে, ইহাতে ধর্ম্মের দোহাই বা আবরণও নাই—

"China interests the traders of Berlin as much as those of London. Germany aught therefore to be asked to join the combination and it is by no means certain that Germany will agree."

ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জ মনে করে যে,

ইউরোপে তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণ কলহ থাকুক না কেন, এসিয়াতে তাহারা যেন এক হইয়া রাজ্য বিস্তার করে।

যে পরিমাণে ইউরোপে এই ইচ্ছা তীব্র হইয়াছে, সেই পরিমাণে এই তস্করের সম্মিলনকে ব্যর্থ করিবার জন্য এসিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্র শক্তির উদ্যোগী হওয়া উচিত; যেন যথাসম্ভব সত্বর এসিয়ার শক্তিপুঞ্জও কোন সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। Pan-Islmaic বন্ধনও এই জন্যই আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

ইউরোপে বর্ত্তমান সময়ে যেমন জর্ম্মনী, অষ্ট্রিয়া, এবং ইতালী একদিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এবং রুষিয়া ও ফরাসী * অন্যদিকে, তেমনি এসিয়ার শক্তিবৃন্দের মাঝে কোনও বন্ধনের সূচনা হইলে ইউরোপের রাজ্যবিস্তৃতির সুযোগ কমিয়া আসিবে। কারণ ইউরোপের নির্লজ্জতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের ঘটনা কোন ঐতিহাসিকের ভাষায় উল্লেখ করিতে হইতেছে:—

The important agreement of 1872—1873 was supplemented by the Protocol of 22nd July 1887 and the Pamir delimitation of 1895 so that the Russo-Afghan frontier which is the dividing line between the Russion and British spheres of influence has now been carried right upto the frontier of the Chinese Empire ··· ··· In 1885 France endeavoured to get a footing on the Upper Irrawaddy, the winter land of British Burmah and England replied in the following year by annexing the dominion of king Thebaw, including Shan States as fareast as the Mekong. Thereupon France pushed her Indo-Chinese Frontier westwards and in 1893 made an attack on the kingdom of Siam which very nearly brought a conflict with England. After prolonged negotiation an arrangement was reached and embodied in a formal treaty (Jan. 1896) which clearly foreshadows a future partition between the two powers, but guarantees the independence of the central portion of the kingdom, the valley of the Penam as a buffer state. Further north, in eastern China, the aggressive tendencies and mutual rivalries of the European powers have produced a problem of a much more complicated kind. Firstly Germany, then Russia, next England and finally France took portions of Chinese territory under the thin disguise of long leases. They thereby excited in the chinese population and Government an intense anti-foreign feeling, which produced the Boxer movement and culminated in the attack on the foreign legations at Pekin in the summer of 1900"

D. M. Wallace.

ইহার পরেই Russo-Japanese এবং ইউরোপের স্থগিত গতি!

ভারতের বহির্রাষ্ট্রশক্তি আলোচনায় ভারতের সীমান্ত এবং সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যসমূহের অনেক বিচার করিতে হয়। ভারতের সীমান্ত প্রায় ছয় সহস্র মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পারস্য, রুষিয়া, আফগানিস্থান, তিব্বত, চীন, শ্যাম এবং ফরাসী রাজ্য ইহার উপকণ্ঠে রহিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে Lord Curzon এবং বর্ত্তমান বৎসরে প্রদত্ত Frontiers সম্বন্ধীয় Romanes বক্তৃতার আলোচনা অনিবার্য্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই কুতূহলজনক বক্তৃতা পাঠের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে। ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

* ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভূমির প্রেসিডেন্ট M. Felix Faure মহোদয় রুষিয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যে বক্তৃতা করেন এবং রুষ-সম্রাটও যে প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভাব ব্যক্ত করেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

# ভারতে অন্নকষ্ট।

প্রকৃতির লীলাস্থল, লক্ষ্মীর বিলাস ভবন, অতুল সমৃদ্ধিশালিনী ভারতবর্ষে আজ ভারতীয় প্রজাবৃন্দ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। ধান, চাউল প্রভৃতি সমস্ত খাদ্যই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ এক বেলা এক সন্ধ্যা খাইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। কত গরীব দুঃখী লোকে যে না খাইতে পাইয়া জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। অসংখ্য ভিক্ষুক সারাদিন ঘুরিয়াও ভিক্ষা পাইতেছে না। অনেক হতভাগ্যই পেটের জ্বালায় উদ্বন্ধনে মরিতেছে, কেহবা বিষ খাইয়া ইহকালের মত ক্ষুধা মিটাইতেছে। ভবিষ্যতে আরও যে কি হইবে, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সকল স্থান হইতেই ভীষণ অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বাংলা ও উড়িষ্যার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অন্নপূর্ণা ভারতমাতার সন্তানগণ, অনশনে, অর্দ্ধাশনে, মায়ের কোলে শয়ন করিয়া মা অন্ন দে, মা অন্ন দে, বলিয়া রোদন করিতেছে। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! লক্ষ্মীকে পশ্চাতে রাখিয়া ভারতবাসী দীন সৈন্যগণকে ঘোর বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ভাই অন্নক্লিষ্ট ভারতবাসি! ভয় পাইওনা। মা অভয়া ভিখারিণী বেশে অন্নের স্বর্ণপাত্র হাতে লইয়া স্বদেশী-পণ্যের পশ্চাতে পশ্চাতে লক্ষ্মীসহ আগমন করিতেছেন। মায়ের আসিবার পথে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু ভাই! তোমরা যদি স্বদেশী পণ্যকে অগ্রাহ্য কর, তবে মা লক্ষ্মীও স্বদেশী পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইবেন। ভারতে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিরোধ না হইলে, কখনই ভারতবাসীর অন্নকষ্টের অবসান হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে—"বন্দেমাতরম্ করিয়াই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে"। আবার কেহ কেহ বলেন, "বাঙ্গালীরা বিলাতী জিনিষ কেনা বন্ধ করিয়াছে বলিয়াই, সাহেবেরা রাগিয়া বাঙ্গালীকে ধান, চাউল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।" সাধারণ অজ্ঞ লোকদের ঐ সকল ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসের যে কোন ভিত্তি নাই, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। "বন্দেমাতরং" অর্থে মাকে আহ্বান করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াই যে পৃথ্বীমাতার স্নেহময় কোলে আশ্রয় পাইয়াছি, যাহার শরীরোদ্ভূত শস্যে জীবনধারণ করিতেছি, যাহার অশ্রুসম নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করি এবং মৃত্যুর পর এই অনিত্য দেহ যাহাতে মিশিয়া যাইবে, সেই ভারত-মাতা বা বঙ্গমাতাকে মা, মা, বলিয়া, সম্বোধন করাতেই যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, একথা জ্ঞানহীন পশু ভিন্ন আর কে বলিতে পারে? এই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আর কখনও কি দুর্ভিক্ষ হয় নাই? বিগত ১০০ বৎসরের মধ্যেইত ভারতে ২৫ বার দুর্ভিক্ষপাত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে ১৫ লক্ষ এবং তাহার পর ২১ বৎসরে ৫০

লক্ষ, তাহার পর ১৫ বৎসরে ৭০ লক্ষ ও তাহার পরের ১০ বৎসরে ১ কোটী ৯০ লক্ষ ভারত-সন্তান অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িয়াছে কেন, তাহা কেহ জানেন কি? এদেশে ইংরেজ বণিকগণের পদার্পণের পর পর্য্যন্তও সাত আট পয়সায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, আর বিগত ১৩১২ সালের ২২ শ্রাবণের পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন বন্দেমাতরং ও স্বদেশী আন্দোলন বা বিদেশী বর্জ্জন লইয়া হৈ চৈ পড়ে নাই, তখন চারি টাকা, সতর সিকা করিয়া চাউলের মণ হইয়াছিল। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের এই দুর্ভিক্ষটাকে "বন্দেমাতরং ও স্বদেশী আন্দোলনের" কুফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বলুন দেখি, সাত, আট পয়সা হইতে চার টাকা, সতর সিকা পর্য্যন্ত চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল কেন? ইংরেজ রাজত্বে দুর্ভিক্ষ নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাজেই দুঃখী লোকেরা আর হাহাকার করে না। যে দুঃখ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটে, তাহার জন্য কে কত কাঁদিতে পারে? আর কাঁদিয়াই বা লাভ কি? দুঃখীর দুঃখের কান্না শুনবেই বা কে? কাজেই ভারতবাসী নীরবে অনশন ক্লেশ সহ্য করে এবং নীরবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করাই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দেশে মহার্ঘতা আনয়ন করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই। রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তিক্ত লাগে এবং সুখাদ্যও অরুচিকর হয়, সেইরূপ, কোন কোন বিকারগ্রস্ত ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ভিক্ষ রোগের অমোঘ ঔষধ "স্বদেশী"টাও বিষবৎ উপলব্ধি হইতেছে। দেহের উপর অত্যাচারের প্রবলতায় তেজীয়ান মানুষকেও যেমন রোগে জর্জ্জরিত করে, তদ্রূপ বিবিধ প্রকার অত্যাচারেই সোণার ভারতে দুর্ভিক্ষ রোগ প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীকে অন্ন চিন্তায় জর্জ্জরিত করিয়াছে। বিলাতে প্রতি বৎসর যে শস্য জন্মে, তাহাতে সেখানকার লোকের তিন মাসের খোরাকীও চলে না। যে দেশের লোক আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহারা আবার আমাদিগকে ধান, চাউল, আনিয়া দিবে কোথা হইতে? রেলিব্রাদার্স, গ্রেহেম, সাওয়ালিস প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানীরা চাউলের কারবার করে বটে, কিন্তু তাহারাও আর অন্য দেশ হইতে ধান, চাউল আনিয়া এদেশে বিক্রয় করেনা! বরং বিলাতী কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াই সেই টাকায় এদেশ হইতে চাউল কিনিয়া লইয়া গিয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া লাভ করে। এদেশে চিরকালই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। কলির প্রভাবে লোকে যত পাপাচারী হইতেছে, পৃথ্বীমাতাও দিন দিন তত শস্য হরণ করিতেছেন। হিন্দু দেব দেবীর আরাধনা করে না, মুসলমান নমাজ পড়ে না, কাজেই দৈব কোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতিবন্যা, উপড়া, কীট, পঙ্গপাল প্রভৃতির ভীষণ প্রকোপ ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইংরেজশাসনের ফলে ভারতবাসী স্বধর্ম্ম খোয়াইয়াছে, স্বদেশী ও স্বজাতি-প্রীতি ভুলিয়া, কুকুরের ন্যায় পরের উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন! করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরেজেরা বিলাত হইতে—বিলাসিতা ও অপকার্য্য সকল এদেশে আমদানী করিয়া মোহমুগ্ধ ভারতবাসীকে বিনি-

মন্ত্র দিয়া, ভারতের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটিয়া লইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পারে পাঠাইয়া দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেকালের ভিক্ষুকেরাও পরম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাল কাটাইত। আর এখন সুসভ্য ইংরেজ-রাজত্বে সুকুমারমতি বালকদিগকে পর্য্যন্ত প্রাণপণে খাটাইয়া, আবালবৃদ্ধ তিন গোষ্ঠি গোলামী করাইয়াও পেট পূরিয়া খাইতে দেয় না! রত্নগর্ভা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবাসী আজ উদারান্নের জন্য লালায়িত! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কবি গাহিয়াছিলেন—"ধন ধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধু পার।" যাদুকর জাতি—যাদুকরী মন্ত্র প্রভাবে এ দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া টাকা কড়ির লেনা, দেনা চলিত। আজকাল ইংরেজরাজ বিচার-বিক্রয়ের দোকান স্বরূপ আদালত খুলিয়া বসিয়াছেন, কাজেই নির্ব্বোধ ভারতবাসী বিচার ক্রয় করিতে যাইয়া, স্বদেশী ভাইকে সর্ব্বস্বান্ত করে এবং নিজেও সর্ব্বস্বান্ত হয়। আইন-আদালতের অনুগ্রহে ভারতবাসী যেমন একদিকে সুবিধা বোধ করিতেছে, অন্য দিকেও তেমনি বেমালুম রক্ত শোষণ করাইতেছে। মকর্দ্দমা করিবার প্রবৃত্তিটা এদেশের লোকের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল সালিশী পঞ্চাইতের দ্বারা বিচার-নিষ্পত্তি করিতে কাহারও আস্থা নাই। "যার শিল তারই নোড়া, ভাঙ্গছে তার দাঁতের গোড়া।" এমন না হইলে কি এদেশের দশা এমন হয়?

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ বণিকগণের শোষণই ভারতবাসীকে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অল্পদিন মধ্যে ইংরাজ-বণিকেরা যে ভাবে ভারতের রুধির শোষণ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে পুরাকালের রাক্ষসদের কথা মনে পড়ে, আর প্রাণের ভয়টাও বেশীতর উথলে উঠে। এদেশে শোষণমূলক বৃটিশরাজ-নীতি-প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন অভাবই ছিল না। তবে প্রভুদের দয়ায় ভারতবাসী যে ফন্দিবাজী ও বাবুগিরি করিতে শিখিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে লাভ করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সাবেক কালের সহিত তুলনা করিলে, এ কালের লোকের অবস্থা আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। তখনকার লোকে বাগানের আনাজ, পুকুরের মাছ, লোনা-মাটীর লুণ ও ক্ষেতের ধানে পেট পূরিয়া খাইতে পাইত, চরকার সূতার মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিত; এখন কিন্তু সমস্তই তাহার বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। আজকালের লোকে অত্যন্ত সৌখীন হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক বণিকেরা চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে সখের জিনিসের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। আর হতভাগ্য এদেশবাসী তাহাই অকাতরে শোণিতসম অর্থের বিনিময়ে খরিদ করিয়া বিলাস-ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। ঘরে অন্ন নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই, সংসারে সম্মান নাই, তথাপি বাবু সাজা চাই!

যাহারা অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি করে, লোকে তাহাদিগকে ছোটলোক বা ফতোবাবু বলে। পোষক পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখাইতে পারিলেই যদি সুসভ্য হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এমন অনেক বাবু আছে, যাহারা রেলির-

বাড়ীর মিহি ধুতিটী পরিয়া, অন্নশূন্য শীর্ণোদরটী জামার ভিতর লুকিয়ে, মচ্‌মচে জুতাজোড়াটী পায়ে দিয়ে, এসেন্স আতর মেখে, ঘড়ি, ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে, মদ খেয়ে, সিগারেট টানিতে টানিতে, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, আর মনে মনে ভাবে, "খাই না খাই মজায় আছি।" এই রকমের কত শত সাড়ে তিন টাকার বাবুকেই যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, বাবু হইতে গিয়াই কাবু হইয়া পড়িয়াছে। যখন দেশে বিলাসিতারূপী ফিরিঙ্গি-মায়া বিস্তৃতি লাভ করে নাই, তখন ভারতে লক্ষ্মী ছিল। ইংরেজরাজ ভারতে অবাধ বাণিজ্যের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন, বলিয়াই আমাদের এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। জাতভাই-গণকে বড়-লোক করাই ইংরেজের রাজধর্ম্ম। ইংরেজ-ব্যবসাদারের জাতি, আর ভারতবর্ষ তাহা-দের দোকান। দোকান হইতে কিসে দু' পয়সা লাভ করিবে, তাহাই ইংরেজদের প্রধান চেষ্টা। প্রতি বৎসর আমরা বিদেশী জিনিস কিনিয়া কোটী কোটী টাকা সাহেব-দের হাতে তুলিয়া দিতেছি, আর তাহারা সেই টাকাতেই এদেশ হইতে ধান, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্য খরিদ করিয়া, বিদেশে চালান দিতেছে। বিদেশী-ব্যবসায়ীরা বস্ত্র, লবণ, চিনি, সিগারেট, চুড়ি, চিরুণী, বোতাম, কাঁচের ও কলাইয়ের বাসন, জার্ম্মাণ-সিল্-ভারের গহনা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় ও স্বল্প-প্রয়োজনীয় বিলাসোপকরণ গুলি বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ টাকায় এদেশ হইতে ধান, চাউল প্রভৃতি জীবন-ধারণোপযোগী সার শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। বঙ্গে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-আন্দোলন বা বিদেশী-বর্জ্জন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসরেও ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬ কোটী মণ চাউল, ১৷৷ কোটী মণ গম ও ৭৫ লক্ষ মণ ডাউল কড়াই বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ১৩০৪ সালে ৩ কোটী ৭০ লক্ষ মণ এবং তৎপর বৎসরে ৫ কোটী ২ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে গিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে ১ কোটী ৩২ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানি বাড়িয়া-ছিল। বিলাতী কাপড় প্রভৃতির কাট্‌তি যত বেশী হইতেছিল, ধান্য, চাউলাদি খাদ্য-শস্যের রপ্তানির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইতে-ছিল। শুদ্ধ বঙ্গদেশ হইতেই বৎসরে প্রায় দেড় কোটী মণ চাউল বিদেশে চালান যাইত। আজকাল স্বদেশী-আন্দোলনের প্রভাবে বিদেশে চাউল রপ্তানি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরে রেলি-ব্রাদার্স প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানীরা চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছিল বটে, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা বেশী চাউল বিদেশে রপ্তানি হয় নাই। বাঙ্গালীরা বিলাতী জিনিস কেনা বন্ধ করিয়াছে বলি-য়াই যে ইংরেজেরা ধান চাউল কিনিতেছে, তাহা নহে। ইংরেজ কোম্পানী চিরকালই এদেশ হইতে ধান, চাউল বিদেশে লইয়া যায়। এখনও যেমন অনেক কুলাঙ্গার বিদেশী জিনিস খরিদ করিয়া স্বদেশদ্রোহীতা করিতেছে, সেইরূপ অনেক নরপিশাচরূপী কৃষক ও মহাজনেরাও ইংরেজ-কোম্পানীকে ধান, চাউল বিক্রয় করিয়া, স্বার্থপরতার পৈশাচিক অভিনয় দেখাইতেছে।

এদেশ হইতে যে চাউল বিলাতে যায়, তাহা যে শুধু বিলাতের লোকে খায়, তাহা নহে। ঐ সমস্ত চাউল অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করিয়া লাভ

করে। বিলাতে, কাপড়ে চাউলের মাড় দেয়। চাউল হইতেই মদ প্রস্তুত করিয়া নিজেরা খায়, আর ভুক্তাবশিষ্ট মদ ভারতবর্ষে পাঠাইয়া বৎসরে প্রায় দুই কোটী টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। যে সুরা পান করা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ. জৈন, প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ আছে, তাহাই আমাদের খ্রীষ্টশিষ্য রাজপুরুষগণের প্রণীত রাজকীয় শাস্ত্রে সুসিদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজেরা ব্যবসার খাতিরে সবই করিতে পারে। উঁহারাই জোর করিয়া আমাদের দেশের চরকা, তাত উঠাইয়া দিয়া. গো, শূকরের বসা-মিশ্রিত বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা চালাইয়াছিল। সেকালের লোকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, তাহাও আইনের বলে রহিত করিয়া দিয়া, শূকর ও গরুর হাড় মিশ্রিত 'লিভার-ফুলো' লবণ খাওয়াইয়া,এদেশ হইতে বার্ষিক ৭১ লক্ষ টাকা বিলাতে লইয়া যাইতেছে। এদেশের মা লক্ষ্মীরাও এমনি আয়েসী ও সৌখীন হইয়া পড়িয়াছেন যে, গুঁড়া করিয়া খাইতে হয় বলিয়া বিশুদ্ধ করকচ লবণ না খাইয়া,ঐ অপবিত্র স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মহানিকর বিলাতী লবণ খাইতেছেন এবং সধবার শাখা ছাড়িয়া, বিলাতী চুড়ী পরিয়া পতির অমঙ্গল করিতেছেন।

এক সময়ে যে দেশের স্ত্রীলোকেরা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া অভিহিত হইতেন, সময়ের বিপর্য্যয়ে তাঁহারাও. এখন স্বদেশী লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। আমাদের দেশে গুড়, চিনি, সবই জন্মায়, তবুও এদেশের লোকে সাদা ধপ্‌ধপে বিলাতী চিনির মিষ্ট দ্রব্য খাইয়া বৎসরে ৭ কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইতেছে। বিদেশী চিনি, শূকর ও গরুর রক্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, একথা ইংরেজেরাই তাহাদের কেতাবে লিখিয়াছে। ভারতবাসী এমনি ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই অস্পৃশ্য চিনির মিষ্টাদির দ্বারা ঠাকুর দেবতার পূজা করিতেছে, আর নিজেরাও তাহাই খাইয়া রসনা তৃপ্ত করিতেছে। এত পাপেও যদি দেশ উৎসন্ন না যাবে, তবে যাবে কিসে? ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে তুলা লইয়া গিয়া, কাপড় প্রস্তুত করিয়া আবার ভারতবর্ষেই আনিয়া বিক্রয় করে। বিগত ১৩০১ সালে ভারতবর্ষে ২১ কোটী টাকার এবং ১৩১১ সালে ৩৪ কোটী টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রয় হইয়াছিল। ১০ বৎসরের মধ্যে বিলাতী কাপড়ের কাটতী অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এদেশ হইতে তুলা লইয়া যাইতে এবং বিলাত হইতে কাপড় তৈয়ারী করিয়া এদেশে আনিতে, জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি বহু খরচ হয়,তাহা কি বিলাতী বস্ত্র-ক্রেতাদের নিকট হইতেই আদায় করিয়া লয়?

এদেশের তাঁতিদের অপেক্ষা বিলাতের তাঁতিদের বেতন ৪গুণ বেশী। তাঁতিদের মজুরি বাবত অসংখ্য টাকাইত, এদেশের অন্নহীন তাঁতিরা না পাইয়া, বিলাতের শ্বেতনন্দনেরা পায়। ইংরেজের ব্যবসা-চাতুর্য্য, শাঁখের করাতের মত যেতে আস্‌তে আমাদের গলা কাটিতেছে। যে সিগারেটের ধূম পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, কেবল ফুসফুসের রোগ জন্মে ও মস্তিষ্ক খারাপ করিয়া দেয়, সেই ধুঁয়া খাইয়াই এদেশবাসী বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা বিদেশে উড়াইয়া দিতেছে। আজ কালের ছেলেরা মায়ের দুধ ছাড়্‌তে না ছাড়্‌তেই সিগারেট খাইতে আরম্ভ করে। একেইত এদেশের ছোট ছোট ছেলেরা পেটের জ্বালায় খেটে খেটে

অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপরে আবার সিগারেটের ধূমা পেটে ঢুকিয়া শীঘ্রই যমের সদনে টানিয়া লইয়া যায়। এসব দেখিয়া শুনিয়াও লোকের চৈতন্য হইতেছে না। এদেশের লোকে অন্নাভাবে কষ্ট পায় বটে, কিন্তু মদ, তাড়ি খাইবার জন্য পয়সার অভাব ঘটে না। যে দেশের লোক বার্ষিক ৮ কোটী টাকার মদ খাইয়া মাতাল সাজিতে পারে, তাহারা লক্ষ্মীছারা হবেমাত হবে কাহারা? যে দেশের বাবু ভায়ারা বার্ষিক ২৭ লক্ষ টাকার বিলাতী সাবান মাখিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন, তাঁহাদের দেশের লোক না খাইতে পাইয়া মরিবেনা ত মরিবে কোন্ দেশের লোক?

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ হইয়া, হিন্দুত্ব ও ইস্‌লামত্ব হারাইতে বসিয়াছে। বিদেশীর প্রেমে মজিয়া ভারতবাসী এখন হাবুডুবু খাইতেছে। দেশের ভালমন্দে হিন্দুরও যতটুকু অধিকার, মুসলমানেরও ততটুকু অধিকার। দেশে এই যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি শুধু হিন্দুর জন্য? তাহা নহে। ইহার ভোগ মুসলমানকেও ভুগিতে হইতেছে। দেশে যদি কখনও খাদ্য শস্য সস্তা হয়, তাহা হইলে দেশের সকলেই সে শুভফল ভোগ করিবে। হিন্দুর সহিত মুসলমানের "ধর্ম্মমতের" মিলন না হইতে পারে, কিন্তু ঘরকন্না করিতে হইলে, হিন্দু মুসলমানে মেশামেশি না থাকিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। একই দেশে একই রাজার অধীনে বাস করিয়া, একই আইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ করিলে, এদেশের ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী। যাহাতে দেশের লোকের অন্নকষ্ট দূর হয়, সেই অভিপ্রায়েই আমাদের বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী নেতাগণ স্বদেশী প্রচলন ও বিদেশী বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও প্রায় আড়াই বৎসর কাল স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি খাদ্য শস্য সস্তা না হইয়া, মহার্ঘ হওয়ার অনেক কারণ আছে। গত বৎসর হাজাশুকায় অনেক দেশের ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এবৎসরেও কৃষিকার্য্যোপযোগী বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই হয়, ওদিকে আবার উড়িষ্যা প্রদেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বর ভারতবাসীকে শিক্ষা দিতেছেন। এখন যদি আমরা স্বধর্ম্ম, স্বজাতি, স্বদেশীকে গ্রহণ করি, তবেই মঙ্গল। গত বৎসরে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছিল, এমন কি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বরিশালেই লোকে না খাইতে পাইয়া মরিয়া উজড় হইয়া গেল। শাসন ও শোষণপ্রিয় রাজপুরুষেরা চিরদিনই যেমন বধির সাজিয়া থাকেন, তখনও সেইরূপ ক্ষুধিত প্রজার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াও বধির সাজিয়াছিলেন। আমরাও এমনি অধঃপাতে গিয়াছি যে, ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়া, পরের ঘরেই আবার ভিক্ষা করিতে যাই। আমরা সকল বিষয়েই ইংরেজের কৃপা-বারিবর্ষণে তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের এমন দুর্গতি। গত বৎসর সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে স্বদেশী-প্রচারক দলের অগ্রণী অনাথনাথ সুরেন্দ্রনাথ, দুর্ভিক্ষ রোগের অন্যতম চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার, অনশন-দুঃখকাতর লিয়াকৎ হোসেন, বিপন্নের বন্ধু দেবীপ্রসন্ন, স্বদেশ-দুঃখমোচন-প্রয়াসী বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি স্বদেশ হিতৈষীগণের দয়ায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রাণ পাইয়াছিল।

মা লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে বন্দেমাতরং মন্ত্রের প্রভাবে এবৎসর আর পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সে সময় দেবীপ্রসন্ন বাবুই ফরিদপুরবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিগত ১৩০৭ সালে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে জয়পুরের মহারাজ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া গরীব দুঃখীদিগের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ইংরেজ বণিকদের মহিমায় ভারতে দিন দিন শস্যের অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বকার মত আজকাল আর ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি নাই। পূর্ব্বে কৃষকেরা এক জমিতেই প্রতি বৎসর শস্য বপন করিয়া মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিত। আজকাল বরং এক জমি হইতেই বৎসরের মধ্যে দু তিন দফায় ফসল ফলাইয়া লয়। কৃষকেরা টাকার লোভে পড়িয়া, ধান, গমের চাষ না করিয়া পাট, শোণ, নীল প্রভৃতির চাষে মাতিয়া উঠিয়াছে। অনেকেই জমির পাট কাটিয়া লইয়া, সেই জমিতেই আবার ধান্য রোপণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে দুই চারি বৎসরের মধ্যেই সে জমি একেবারে অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। বিগত ১৩১০ সালে ভারতবর্ষে ৭৫ লক্ষ বিঘা, এবং ১৩১২ সালে ৯৪ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যেই ১৯ লক্ষ বিঘা জমিতে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুদ্ধ বঙ্গদেশেই ১৩১২ সালে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার বিঘা জমিতে এবং তৎপর বৎসরেই আবার ২৪ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। প্রতি বৎসর বৎসর যেমন পাটের চাষ বাড়িয়াছে, তেমনি ধান, গমের চাষও খুব কমিয়া যাইতেছে। ১৩০৬ সাল হইতে ১৩১১ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমির ধান চাষ এবং ১ লক্ষ বিঘা জমির গম চাষ ও ২ লক্ষ ৫০ হাজার বিঘা জমির সর্ষপাদির চাষ কমিয়া গিয়াছে। পাট ও নীল চাষের প্রভাবে দিন দিন ধান ও গমের চাষ কমিয়া যাইতেছে। যে পাট নীল প্রভৃতি খাইয়া মানুষের প্রাণ বাঁচেনা, সেই পাট নীলের চাষ করিয়াই এদেশবাসী নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতেছে। কৃষকেরা পাট বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পায় বটে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার সহিত তুলনা করিলে সে টাকা কিছুই নহে। বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি শস্য-প্রধান দেশেই কৃষকেরা ধান চাষ কমাইয়া দিয়া পাট চাষ বাড়াইয়াছে। আজকাল গোচারণ, গোভাগাড়, পতিত, বন জঙ্গল পর্য্যন্ত আবাদী জমি হইয়াছে, তবুও ধান, গম, সর্ষপাদির চাষ কমিয়াছে। ইহার কারণ কি? পাট ও নীল প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া ইহার প্রধানতম কারণ। একে ত ধান গমের চাষ হ্রাস পাইতেছে এবং আগেকার হিসাবে আজকাল তিন ভাগের এক ভাগ শস্যও জন্মেনা, তাহার উপরে আবার অযথা পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। দেশে লোক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, অথচ শস্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দিন দিন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের অধম সন্তানগণকে গ্রাস করিতেছে। মোহমুগ্ধ ভারতবাসী আর হেলায় সময় নষ্ট করিও না। ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশের দিকে তাকাও। যদি এই মহা বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাও,

তবে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার কর। দেশের শস্য দেশে রাখিতে প্রাণপণ কর। পাট, নীল চাষ না করিয়া, ধান গমের চাষ কর। মকর্দ্দমা করিয়া অনর্থক অর্থ নষ্ট করিওনা। বিলাসিতার প্রেমে মজিয়া অজস্র টাকা অপব্যয় করিওনা। বিদেশী সখের জিনিস কিনিয়া দেশের টাকা বিদেশে পাঠাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা করিও না।

শ্রীসূর্য্যকুমার ঘোষাল।

---

# তিন।

গণিত শাস্ত্রের প্রথম অঙ্কের নাম ১, দ্বিতীয়ের নাম ২ এবং তৃতীয়ের আখ্যা ৩। অনেক পাঠকের বোধ হয় জানা নাই, অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সভ্য ও অৰ্দ্ধ সভ্য জাতির মধ্যে গণিতের এই তিনটী অঙ্ক নানা প্রকারের ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। বহুবিধ সামাজিক, মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবের মুল কারণ এই তিনটী অঙ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই তিনটী অঙ্ক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া মানব জাতিকে নূতন অবস্থায় পরিণত করিয়া দিয়াছে। সভ্য ও অৰ্দ্ধ সভ্য জগতের সামাজিক ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত তিন অঙ্ক নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও নানা ভাবে গণ্য। ইহার মধ্যে তৃতীয় অঙ্কটী (অর্থাৎ ৩) প্রখ্যাততম। অনেক দেশ, জাতি ও সমাজের গার্হস্থ নিয়মাবলী এই সুপরিচিত অঙ্কের মাহাত্ম্য বা অপগুণের প্রবলতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অনেক দেশের সমাজ, ধর্ম্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক পারিবারিক প্রথা এই অঙ্কের দোষ বা গুণানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। কোন দেশে ৩ অঙ্ক অতীব পবিত্র ও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়, আবার কোন দেশে ইহা একেবারে অশুদ্ধ ও অশুভপ্রদ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। স্থান, কারণ এবং সময় বিশেষে ৩ অঙ্ক কখন শুদ্ধ এবং কখন অশুদ্ধ ভাবে গৃহীত হয়; কিন্তু যে কোন কারণেই ইহার শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হউক না কেন, ভাল ভাবেই হউক কিম্বা মন্দ ভাবেই হউক, ইহার আধিপত্য সর্ব্বত্র সমান। বৰ্ত্তমান প্রবন্ধে গণিতের এই কৌতুককর তৃতীয় অঙ্ক লইয়া কিঞ্চিৎ সময় আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, পারস্য দেশের প্রাচীন জাতিরা বৈদিক হিন্দুর ন্যায় অগ্নি উপাসক ছিল। মুসলমান বীরগণ পারস্য দেশকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে পারস্য আক্রমণ করিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়। প্রথম যুদ্ধে যবনেরা বিজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, সাহস, অধিকতর অধ্যবসায় ও অধিকতর উদ্যম দেখিয়া প্রাচীন পার্শীকেরা সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হয়, কিন্তু যবনেরা যে সকল সুকঠিন সর্ত্তে সন্ধি পত্র লিখিয়া দিয়া পার্শিক নরপতিকে স্বাক্ষর করিতে বলিল, তাহা কাহারও গ্রহণীয় বলিয়া গণ্য হইল না। অবশেষে স্থির হইল, পার্শীক

জাতি যদি তাহাদের প্রধান আচার্য্যকৃত শুভাশুভ গণনায় "যুদ্ধ করা সঙ্গত" বলিয়া দেখে, তাহা হইলে পার্শীক সেনাপতিগণ সমরক্ষেত্রে পুনরায় অবতরণ করিবেন, যদি গণনায় অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে পারস্যের নরপতি সমগ্র দেশ অর্পণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিবেন। পার্শীক পুরোহিত গণনায় দেখিলেন, একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আর একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত হইয়া যাহা ( বাকী ) অবশিষ্ট রাখিল, তাহার সংখ্যা ( ৩ ) তিন। সুতরাং পুরোহিত কহিলেন "যুদ্ধ করিলে যবন কর্তৃক পার্শীকগণ নিশ্চয়ই পরাজিত ও বিষম ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে।" প্রধান আচার্য্য বা পুরোহিতের গণনায় অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধনবল, বিদ্যা ও বুদ্ধিবল, লোকবল, সৈন্যবল, ও বাহুবল থাকা সত্বেও নির্ব্বোধ পার্শীকেরা যুদ্ধ করিল না, স্বাধীন পারস্যের কয়েকটী প্রধান প্রদেশ বিনাযুদ্ধে ( সন্ধিপত্রের মর্ম্ম অনুসারে ) যবনের হস্তগত হইল। এই গণনাই পরিণামে সমগ্র পারস্য দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই ৩ অঙ্কের উপরে অদৃষ্টের ফলাফল নির্ভর করিয়া পার্শীকেরা স্বাধীনতা ও স্বধর্ম্ম হারাইয়া মুসলমান হইয়া যায়। অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পার্শীকদিগের দুইটী উপাস্য দেবতা ছিল, একটীর নাম জোর্দ্দুস্ত ( অপর নাম জেরোস্তার ), এবং অপরটীর নাম আরিমান। শেষোক্তটী দেবতা না হইলেও, আমাদের দেশের বিষাক্ত সর্পের (নাগের) পূজার ন্যায় আরিমানকে সকলে ভয়ের সহিত পূজা করিত। আরিমান, খ্রীষ্টানদিগের সয়তানের ন্যায়। ইহা বিপদ, আশঙ্কা, অকল্যাণ ও অজ্ঞানের দেবতা। জোর্দ্দুস্ত এবং আরিমান এতদুভয় দেবতা প্রাচীন পার্শীকদিগের কল্যাণ ও অকল্যাণের দেবতা ছিল। উভয়েরই মন্দিরে ৩ অঙ্ক খোদা থাকিত; জোর্দ্দুস্তের "তিন" শুভফলপ্রদ এবং আরিমানের "তিন" অকল্যাণ জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হইত। আর একবার পারস্য যুদ্ধে আরিমানের "তিন" অঙ্ক গণনায় দৃষ্ট হওয়ায়, পার্শীকেরা নিরাশা হইয়া একেবারে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেইকাল হইতে হতভাগ্য পার্শীজাতি সম্পূর্ণরূপে বিধর্ম্মী, বিজাতীয় ও বিজিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। পুরাতন গ্রীশ ও রোমে গথ (Goths) নামে এক অর্দ্ধসভ্যজাতি বাস করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, মন্নাশ (Mannus) নামক দেবতা হইতে তাহারা উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, ভুবন-বিখ্যাত মনুসংহিতা নামক সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা-শাস্ত্রে লিখিত আছে "মনু" হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে; মনু + জ = মানব, ইহাই ঐ শব্দের বৈয়াকরণিক ব্যুৎপত্তি। মনুর অপর নাম মানস, সুতরাং গথদিগের মন্নাশ ও আমাদের মানস প্রায় সমতুল্য। গথেরা বিশ্বাস করিত, সম্বৎসর মধ্যে যদি দেশে তিনবার বা ততোধিক বার বজ্রপাত হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসরে ঐ দেশের কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের নিতান্ত আবশ্যক হইলে, যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিবাহ হইত। এবং মানস দেবতার মন্দিরে প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। প্রাচীন অষ্ট্রীয়া-হংগেরী রাজ্যে অদ্দিন (Oddin) নামক দেবতার সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। কোন প্রকার রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অদ্দিন দেবতার মন্দিরে গিয়া রাজা, সেনাপতি ও মন্ত্রীরা

পুরোহিতকে কহিতেন, "একবার অদ্বিন দেবতাকে তিন অঙ্কের সমাচার জিজ্ঞাসা করুন তো ?" আচার্য্য বা পুরোহিত, কয়েকটী পুষ্প ও কয়েকটী পত্র লইয়া দেবতার মস্তকে রাখিয়া দিত। যদি তিনটা ফুল বা তিনটা পাতা অথবা উভয়ে একত্রে ভূমিতলে পতিত হইত, তাহা হইলেই লক্ষণ শুভ বলিয়া গৃহীত হইত, নতুবা লক্ষণকে অশুভপ্রদ বিবেচনা করা হইত। এই বিশ্বাসে অষ্ট্রেয়া-হংগেরী রাজ্যে অনেকবার ভয়ানক বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে ; দেশের, জাতির ও সমাজের বহুপরিনাণে অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রোমক সম্রাট ডেলপো Delpho যুবাকালে দুইটী যুবতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েন। একটী যুবতী শিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, সুবুদ্ধিশালিনী ও সতী ছিলেন, অপরটী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সতী যুবতীর অপেক্ষা অসতী যুবতী সুন্দরী ছিল, সন্দেহ নাই। উভয় যুবতীর পিতা বিবাহের জন্য বিশেষ অনুরোধ করায়, রোমক সম্রাট বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল, প্রাচীন দেবমন্দিরে অঙ্ক পাতিয়া দেখা উচিত। সুন্দরী অথচ অসতী যুবতীর পিতা প্রচুর অর্থ দিয়া পুরোহিতকে হস্তগত করিয়া লইলেন। পুরোরিত কহিল "হে সম্রাটবর! তিন অঙ্ক ঐ সুন্দরীর নামেই দেখা যাইতেছে, এতএব উঁহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত।" সম্রাট তাহাই করিলেন, কিন্তু এই বিবাহের ফলে পৃথিবীর কি ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, রোমের ইতিহাস তাহার উৎকৃষ্ট সাক্ষী। ভুবনবিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন্ সাহেব তাহার জগৎপ্রসিদ্ধ "রোমরাজ্যের পতন" নামধেয় প্রকাণ্ড ইংরাজী ইতিহাসে এই ভয়ানক অনিষ্টের বিবরণ অমর অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। রাজপুতানার মাড়োয়ারীগণ কর্ত্তৃক সেকালে নদীর জলে পুত্র ও কন্যাকে শৈশবাবস্থায় ফেলিয়া দিবার কথা অনেকে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাহাদের ধারণা ছিল, তৃতীয় বারে ( অর্থাৎ বুধবারে ) কন্যা জন্মিলে সেই কন্যা কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইবে। তৃতীয় মাসের ( অর্থাৎ পৌষ মাসের * তৃতীয় বারে ( বুধবারে ) পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র কোন প্রকার উপকারে আসিবে না। এই সকল পুত্র ও কন্যাকে তাহারা জলে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। গণিতের "তিন" অঙ্কের শুভাশুভ ফলের উপরে ঐ দেশে অসংখ্যাসংখ্য বালক বালিকার মরণ ও জীবন নির্ভর করিত। কি আশ্চর্য্য সংস্কার!! পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, কাশ্মীর রাজার রাজ্যের অনেক অংশ এক্ষণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত। ইহার কারণ কি জানেন? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফরেণ আপীশ হইতে একদা কাশ্মীরের ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিকটে তার যোগে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত গোপনীয় সমাচার আসিয়াছিল। ঐ সমাচার সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কাশ্মীর রাজাকে বৃটীশ রেসিডেণ্ট ডাকিয়া পাঠান। কাশ্মীরাধিপতি তাঁহার জ্যোতিষি পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রেসিডেণ্ট সাহেব ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সময় শুভ কি না দেখুন ত?" জ্যোতিষি পণ্ডিত কহিল "তিনটা অপ-গ্রহের একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অতএব অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করা কোন মতেই

*মাড়োয়ার দেশে কার্ত্তিক মাসে দীপাবলীর ( দেওয়ালীর ) সময়ে নববর্ষ আরম্ভ হয়, সুতরাং পৌষ মাস তৃতীয় মাস বলিয়া গণ্য।

কর্ত্তব্য নহে।" পণ্ডিতের পরামর্শ শুনিয়া রাজা বাহাদুর রেসিডেন্সী অফিসে গেলেন না। আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব রাজ সকাশে পুনরায় লোক পাঠাইলেন এবং পত্রে লিখিলেন "আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ হইয়া গেলে আমি সিমলা পাহাড়ে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর-সমীপে ঐ সমাচারের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তার পাঠাইব।" রাজার তাহাতেও চেতনা হইল না, তিনি কেবল ঐ অশুভ "তিন" অঙ্কই ভাবিতে লাগিলেন। এই ভাবনার পরিণাম এই হইল যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পাঠাইলেন, এমন রাজাকে সিংহাসনে রাখা অকর্ত্তব্য, সুতরাং রাজার কনিষ্ঠ সহোদর অমর সিংহ বাহাদুরকে রাজ্য ভার দেওয়া হয় এবং চিত্রাল প্রভৃতি কয়েকটী স্থান কাশ্মীর-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করা হয়। অনেক বৎসর কাল পরে গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া পুনরায় রাজাকে রাজ্যভার দিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! "তিন" অঙ্কের এতই প্রভুত্ব! পঞ্জিকায় দেখা যায়, খণাকৃত বহুবচন, প্রবাদ ও গননায় "তিন" অঙ্কটা বড়ই প্রভুত্বশালী। অমুক অঙ্কের সহিত অমুক অঙ্ক যোগ, গুণ বা হরণ করিলে যদি ভাগফল "তিন" অথবা অবশিষ্ট "তিন" হয়, তাহা হইলেই বিষম প্রমাদ!! তাহা হইলে সবই অশুভ ও অশুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই কহিতেছি, গণিতের "তিন" অঙ্কটা অতি পুরাতন কাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেন শুভাশুভ অদৃষ্টের প্রধান জ্ঞাপক ও নিদর্শন।

৩ অঙ্কটা অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, পরীক্ষা, শপৎ ও বিশ্বাসের বস্তুও বটে। সেকালে আদালতে সাক্ষীগণ তিনবার এই বলিয়া শপথ করিত—"আমি এই মোকদ্দমায় সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না।" তিনবার এই শপথের পরে সাক্ষীরা অসংখ্য অসত্য বলিলেও হাকিমেরা স্বীকার করিয়া লইত, সাক্ষীগণ সত্যই কহিয়াছে। প্রাচীন এথেন্স নগরে মার্শ পর্ব্বতোপরে এক প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, খ্রীষ্টানদিগের নিউটেশটামেণ্ট নামক বাইবেলের দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ স্থানের নাম এরিওপেগস্ (Areopagus) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা হইত। তিনটীর অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত না, তিনটী প্রশ্নের পূর্ণ ও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেই উত্তরদাতা "পণ্ডিত" বলিয়া গণ্য হইতেন। তিন অঙ্কটা যেন পাণ্ডিত্যেরও পরিচায়ক!! বাইবেলে খ্রীষ্টের ভগবান পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন "আমি একবার, দুইবার, তিনবার চেতনা করিয়া দিই, ইহাতে যদি পাপীর বা ভ্রান্ত মনুষ্যের চৈতন্য সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সপ্তম পুরুষ অধস্তন পর্য্যন্ত আমি প্রতিহিংসা লইয়া থাকি।" মহম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম কোরিশ। এই বংশের প্রাচীন রাজাদিগের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করার পরামর্শ স্থির হইয়া গেলে, প্রথমে একজন লোক প্রেরিত হইত, তাহার পরে যুদ্ধের ধ্বজা আকাশে উঠাইয়া দিয়া তাহাতে লিখিয়া দিত "বার বার তিনবার।" ইহাতেও আততায়ী দমিত না হইলে, সমরসজ্জায় রাজারা নিষ্ক্রান্ত হইতেন। বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কয়েকবার মুসলমানদের হদিশ শরিফ্ গ্রন্থমতে এই

প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। য়িহুদীদিগের মতে তাহাদের জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের তিনটী উদ্দেশ্য আছে—কার্য্য, বাক্য ও শাসন—Ruling, acting and speaking. দায়ুদ রাজা শাসকের দৃষ্টান্ত, ইব্রাহিম কার্য্যের দৃষ্টান্ত এবং মোজেশ (মূসা) বাক্যের দৃষ্টান্ত। এই "তিন" অঙ্কটাই য়িহুদীর জাতীয় জীবনের ভিত্তি। বাইবেলে লিখিত আছে, পিতরের পরীক্ষার জন্য যিশুখ্রীষ্ট তিনবার কহিলেন, "পিতর! তুমি আমারে ভালবাস?" তিন বারই পিতর উত্তর দিয়া কহিলেন "হাঁ প্রভো! আমি তোমায় ভালবাসি।" এই তিন বারের উত্তর পরীক্ষার চরমসীমা। লোকে এখনও বলে "বার বার তিনবার" অর্থাৎ তিন অঙ্কটা যেন শুভাশুভ ফলের বিশিষ্ট জ্ঞাপক।

গণিতের "তিন" অঙ্ক ভয়, বিপদ, অকল্যাণ, রোগ, শোক, কুযাত্রা প্রভৃতিরও জ্ঞাপক। তিনবার হাঁচি হইলে লোকে বলে "যাত্রা শুভ নহে।" তিনবার হাই উঠিলে সেই দিনটা অশুভ বলিয়া গণ্য হয়। তিনবার শপৎ করা নিশ্চয়ই ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। তিন জন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুরুষের মুখ, প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া দর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। বেলা ৩টার সময় কোন প্রকার যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিবার নিয়ম নাই। তিন শূদ্র ও তিন ব্রাহ্মণ একত্রে গমন করিবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ। ঘরের প্রাচীরে ৩টা দাগ দিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এখনও নিষেধ করিয়া থাকেন। একেবারে ৩টা সর্প দর্শন মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। তিনটা শৃগাল দর্শন করিলে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। তিন জন বিধবা দাঁড়াইয়া থাকিলে, নববিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে দিতে নাই, "দিন" পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। সেকালে পত্রদ্বারা কাহাকেও আত্মীয়ের মৃত্যু সমাচার দিতে হইলে পত্রের শিরোদেশে "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং" লিখিয়া বড় অক্ষরে "তিন" লেখা হইত।

ধর্ম্ম-জগতেও "তিন" অঙ্কের অটল প্রভাব দেখ। হিন্দুর ত্রিত্ব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মুসলমানের ত্রিত্ব—খোদা, মহম্মদ ও কোরাণ। বৌদ্ধের—ধর্ম্ম, বুদ্ধ এবং সঙ্ঘ। খ্রীষ্টানের—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। পার্শীকের—জেরোস্তার, জেন্দাবস্তা ও অগ্নি (সূর্য্য)। বৈষ্ণবের—কৃষ্ণ, রাধা ও গোপিকা। ব্রাহ্ম-সমাজের—ব্রহ্ম, প্রচার ও কীর্ত্তন। আর্য্য-সমাজের—বেদ, হোম ও স্বদেশভক্তি। তিন আচার্য্য—বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য। তিন প্রভু—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং সনাতন। সুইডেন দেশে তিন চাকার গাড়ী, দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদিগের অসম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য পুরাতন প্রবাদে বলে—

"একে রুণু ঝুণু, দুইয়ে রোল্।
তিনে শত্রু, চারে গণ্ডগোল॥"

দেশ, কাল, পাত্র ভেদে "তিন" অঙ্কটা মিত্রও বটে, আবার শত্রুও বটে!! না জানি এই অঙ্কটার ভিতর কতই প্রভুত্ব, কতই অধিকার, কত বিশ্বাস্ এবং কত ধারণা নিহিত আছে!! লোকে কথায় বলে "তিন জুতা"। অর্থাৎ কোন লোককে তিনবার উপর্য্যুপরি জুতা প্রহার করিলে, অপমান ও আঘাতের চূড়ান্ত হয়।

"তিন" নামধেয় প্রসিদ্ধ অঙ্ক লইয়া কত প্রকার শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি হইয়াছে,

তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পাঠকদিগের কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে কতকগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিলাম।

নাড়ী—ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

দোষ—বাত, পিত্ত ও কফ।

সৃষ্টির ক্রম—উদ্ভব, স্থিতি ও প্রলয়।

ধনের গতি—দান, ভোগ ও নাশ।

জীব—জলচর, স্থলচর ও খেচর।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য।

শ্রেণী—উত্তম, মধ্যম, অধম।

ভক্তি—দেবভক্তি, গুরুভক্তি, দেশ-ভক্তি।

ভাব—মিত্র, শত্রু ও উদাসীন।

পূজার তিন দিন—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী।

বিধি—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

পূজ্য—মাতা, পিতা, গুরু।

লিঙ্গ—পুং, স্ত্রীং, নপুংসক।

স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত।

সঙ্গীতের গ্রাম—ষড়জ, মধ্যম এবং গান্ধার।

তিন দাতা—কর্ণ, বলী ও হরিশ্চন্দ্র।

পদার্থ—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ।

গণ—দেবতা, মনুষ্য, রাক্ষস।

অবস্থা—জাগ্রত, চেতন, সুষুপ্ত।

পাপ—কায়িক, মানসিক, বাচিক।

তাপ—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক।

বল—বুদ্ধিবল, তপোবল ও বাহুবল।

জ্যোতি—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি।

ঘরের মশালা—চূণ, শুর্কী, ইট।

ব্রাহ্মদের তিন সমাজ—আদি, সাধারণ ও নববিধান।

তিন বেদ (ত্রয়ী)—ঋক, যজু, সাম।

বেদের তিন অংশ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক।

তিন কাল—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত।

তিন বায়ু—প্রাণ, অপান ও উদান।

তিন বিকলাঙ্গ—অন্ধ, খঞ্জ ও বোবা।

আকাশের তিন শোভা—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র।

শ্রীকৃষ্ণের তিন নাম—যাদব, মাধব, কেশব।

তিন পবিত্রা নদী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী।

প্রণবের তিন অক্ষর—অ উ ম।

মুসলমানের প্রণব—আলিফ, লাম, মিম্।

ত্রিফলা—হরিতকী, বয়েড়া, আমলকি।

তিন গ্রহ (অশুভ)—বুধ, রাহু ও শণি।

তিন রাম—ভৃগুরাম, রঘুরাম, পরশুরাম।

তিন সখা—ধর্ম্ম, জ্ঞান ও চরিত্র।

লেখক—দোয়াৎ, কলম, মন।
লেখে তিন জন।

তিন পিতা—পরমেশ্বর, জন্মদাতা এবং শিক্ষক।

তিন মাতা—বিদ্যা, জননী ও মাতৃভূমি।

গ্রীষ্মকালে বাবুর তিন সখ্—সোডাওয়াটার, লেমনেড ও বরফ।

ধ্বংসের তিন পথ—মদ্য, মাৎসর্য্য ও মাগী।

যোগ—হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ।

গাছের তিন শোভা—ফল, ফুল, পাতা।

বাঙ্গালীর তিন শোভা—সাজা, বাজা, কেশ।

তিন মিথ্যাবাদী—দর্জ্জী, ধোব ও স্বর্ণকার।

লোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল।

বাদ্য—ঢাক, ঢোল, পাখোয়াজ।

তিন ধূর্ত্ত—বায়স, নাপিত ও শৃগাল।

এ সকল ছাড়া ত্র্যহস্পর্শ, ত্রিনেত্র, তিন ভদ্রা (নক্ষত্র) প্রভৃতি কত যে শুভ ও অশুভ লক্ষণের পরিচায়ক আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ?

অনেক কাল পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডের লোকদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল ছিল যে, সপ্তাহের তৃতীয়বারে (অর্থাৎ বুধবারে) পুত্র জন্মিলে সংসার দুঃখে পূর্ণ হয়। এ বিষয়ে একটা অতি প্রাচীন ইংরাজী প্রবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Monday's child is fair of face
Tuesday's child is full of grace
Wednesday's child is full of woe
Thursday's child has far to go. ইত্যাদি।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

# দুইটী কবিতা।

## মান্দ্রাজ হইতে মালাবার।

চির পরিচিত চারু চিত্র সারি সারি,
পথের দু'ধারে হেরি' বিমুগ্ধ নয়ন!
তুঙ্গ-শৃঙ্গে নীলমেঘ রৌদ্রতাপহারী,
কি শোভনা বনলতা—ঘন শ্যাম বন!
শুনি যে ত্রিদিব গীতি বিচিত্র মধুর,
নিবিড় নিকুঞ্জ বুকে বিহঙ্গ ঝঙ্কারে;
দক্ষিণে সৌন্দর্য্য প্রাণ করে ভরপুর!
কি স্নিগ্ধ শান্তির নীড় পল্লব মাঝারে!
সুতৃপ্ত রসনা মোর সুধা সম ফলে,
জুড়ায় দেহের তাপ শীতল সমীরে!
নিবারি বিদগ্ধতৃষা চিরহিম জলে!
বিরামদায়িনী নিদ্রা নায়ার কুটীরে!
জাগ্রত স্বদেশ-স্মৃতি এ দূর প্রবাসে,
শ্যামবঙ্গ সমুজ্জ্বল—শোভার বিকাশে।

## অতীত।

লয়ে কত সুখ দুঃখ গিয়াছ চলিয়া,
হে অতীত! আজি সব হয় কি স্মরণ?
যদি বক্ষে থাকে দাগ কে রবে ভুলিয়া,
জীবনের প্রতি স্তরে স্মৃতির বন্ধন!
রবেনা, রবেনা, কিছু মাটীর ধরায়,
রবে শুধু তব কথা থাকিতে জীবন!
রবে প্রাণে জড়াইয়া চির মমতায়,
দু'দিনের মধুহাসি মিষ্ট আলাপন!
ছিল কার মুখ মোর মরমে জাগিয়া,
কার সে আঁখির তারা আঁধারে উজ্জ্বল!
স্মৃতির অগাধ জলে কে ছিল ডুবিয়া।
ভাবিতে কার সে কথা এ চিত চঞ্চল!
অতীত! অতীত কথা বিস্মৃতি আঁধারে,
শয়নে স্বপনে দেখি সম্মুখে তোমারে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

# কংগ্রেস।

কংগ্রেশ ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন। শত্রুরা আক্ষেপ করিতেছেন বুঝিয়া, মিত্রেরা আক্ষেপ করিতেছেন না বুঝিয়া, এইমাত্র পার্থক্য। যাঁহারা এতকাল কংগ্রেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রতি কেবল অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু করিবার সুযোগ পান নাই, সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলি যখন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছে, তখন আক্ষেপের স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার যথেষ্ট কারণ জুটিয়া গিয়াছে। এই দ্বাবিংশ বর্ষ ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর সমগ্র ভারতের নেতৃবর্গ যখন সম্মিলিত হইয়া আপনাদের অভাব অভিযোগের বিষয় শান্ত শিষ্ট সমাহিত ভাবে আলোচনা করিতেছিলেন এবং সরকারের কার্য্য-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কংগ্রেশের কথায় সময়ক্ষেপ করাটা ও শক্তির অপব্যয় ছাড়া আর কিছু মনে করিবার অবসর পান নাই, কংগ্রেশ ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া তাহারা কাঁদিয়া আকুল কেন? গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই বাইশ বৎসর কংগ্রেশের কাজ কলের মত চলিয়া আসিয়াছে, ইহার যে প্রাণ আছে, বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। ত্রিশ কোটি লোকের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিতেছেন, শত শত রেজলিউশন পেশ হইতেছে, পাশ হইতেছে, কিন্তু বিতর্ক হইতেছে না, য়্যামেণ্ডমেণ্ট হইতেছে না। ইহাতে জীবনী শক্তির পরিচয় কোথায়? গ্রহণে ও বর্জ্জনে প্রাণের পরিচয়। এবার কংগ্রেসে ইহা বুঝা গিয়াছে যে, কংগ্রেসের মধ্যেও অমৃত গ্রহণ ও বিষ বর্জ্জনের সংগ্রাম রহিয়াছে. সে সংগ্রামে ক্ষণকালের জন্য রক্ত চলাচল স্থগিত হইয়াছিল মাত্র। কংগ্রেস মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে জীবিত! তাহার প্রাণ আছে। Long live the Congress! কংগ্রেসে যে জীবনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, ইহাতেই আমাদের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে তাঁহারা কাঁদিতেছেন কেন, তাহার কারণ পরে নির্দ্দেশ করা যাইবে। কংগ্রেস কেন ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার কারণ বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছেন। আসল কারণ ভিতরে, বাহিরে নয়। তারপর, কংগ্রেস কলিকাতায়, সুরাটে নয়। কলিকাতার ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া তাড়া দিয়া সুরাটে দাঁড় করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা টিকিল না। কংগ্রেসের বিনাশ-বীজ কংগ্রেসেই নিহিত ছিল, এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস যে প্রণালীতে আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহা একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি, একটা মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে মোহ, সে ভ্রান্তিটা এই যে, ইংরেজ জাতি এদেশে ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে। তাহারা যে এদেশের সম্বন্ধে অন্যায় অবিচার করে, তাহা কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর হইবে। তাই আমরা সমবেত হইয়া জগতের কাছে সরকার বাহা-

ত্তরের দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্যের ঘোষণা করিয়া আসিতেছি।' কিন্তু আমাদের এই ঘোষণার মধ্যে একটা মস্ত অসঙ্গতি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টকে যে রঙ্গে বিচিত্র করিতেছি, সে রঙ্গের গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ একই নিঃশ্বাসে আমরা এ কথাটাও বলিতে ভুলিনা যে, ইংরেজাধীনে আমরা এমন সুখ শান্তিতে আছি, যেমনটা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ছিলাম না। আমরা আমাদের এই অসামঞ্জস্য এতকাল বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বাহিরের লোকে কিন্তু বুঝিয়াছে। তাহারা বলে, তোমরা তোমাদের শাসন প্রণালী ও শাসনকর্ত্তাদের যেরূপ দোষ আরোপ করিতেছ, তাহারা যদি বাস্তবিকই সেইরূপ দোষী হয়, তবে তাহাদের অধীনে সুখ শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। সুতরাং তোমাদের নিজেদের আর্জ্জীর বর্ণনাতেই তোমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্থ হইলে, সুতরাং মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। বিলাতের সাধারণ লোক আমাদের আবেদনের মর্ম্ম এইরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। "সংখ্যায় ৩০কোটী যদি অত্যাচার দমন করিতে সমর্থ না হও, বরং এ অবস্থায়ও সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পার, তবে "Go and rot." কংগ্রেশের আন্দোলন প্রণালীর ইহাই যথার্থ পরিণাম। আসল কথাটা এই, যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহার নিদ্রাভঙ্গের যেমন কোনই সম্ভাবনা নাই, যে জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞানতার ভাণ করে, তাহারও জ্ঞান বৃদ্ধির কোন উপায় নাই। আমরা আমাদের আন্দোলনের এই মূলগত অসঙ্গতি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তাই, কংগ্রেশ ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ বুঝিয়াছি, কেহ বুঝি নাই, কেহবা বুঝিয়াও স্বার্থানুরোধে না বুঝার ভাণ করিতেছি, তাই ভাঙ্গিয়া গেল। নতুবা ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা ছিল না। বাহিরের কাঠাম বজায় রাখিয়া ভিতরের অসঙ্গতি দূর করিলেও বা চলিতে পারিত। অথবা পুরাতন বোতলে নূতন সুরা প্রবেশ করিলে বোতল ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম। সেই নিয়মে কংগ্রেশও ভাঙ্গিয়া গেল, সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? বিগত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেশ যে, নূতন পন্থার আভাস পাইয়াছে, সেই নূতন পথে নূতন কংগ্রেস আবার সেই চির পুরাতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। ত্রিশ কোটী প্রজার প্রতিনিধিগণ এতকাল পথভ্রান্ত হইয়া যে কেবল রাজ প্রতিনিধিগণের দরজায় মাথা ঠুকিয়াছেন, তাহার ফল স্বরূপ রক্তাক্ত মস্তকে এখন গৃহে ফিরুন, ঐ ত্রিশ কোটী প্রজার খবর লউন, তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করুন, আর রাজদ্বারে হত্যা দিতে হইবে না। ইংরাজ জাতি এমন মূর্খ নয় যে, তাহারা যদি কংগ্রেশকে ত্রিশ কোটী প্রজার প্রতিনিধি বলিয়া জানে, তবে উহাকে আর উপেক্ষা করিবার সাহস করিবে। তাহারাই তখন প্রজা-প্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে, তোমরা প্রজারপ্রতিনিধি, লবণ-স্পর্শ জোকের ন্যায়, রাজপ্রতিনিধিদিগের কলেবর সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। রেজোলিউশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেই প্রজা-প্রতিনিধি হওয়া যায় না, আরও কিছু চাই। এতকাল একটা মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়া জগতের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাই দ্বাবিংশ বৎসরের ব্যর্থ-শ্রম লইয়া গৃহে ফিরিতে হইল। ত্রয়োবিংশ বর্ষে

যে শিক্ষা হইল, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়। মিথ্যা একতার ভাণ চলিয়া গিয়াছে, এখন সত্য একতার দিকে অগ্রসর হও। এই একতা লাভ করিতে হইলে বস্তুতঃ প্রজার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, মুখের কথায় ফল ফলিবে না। সত্য সত্যই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যে কাজ চায়, তাহার ভিতর বাহির এক হওয়া চাই। যাঁহারা রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি যথেচ্ছাচারী হন, তবে তাঁহাদের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতায় লোকের বিশ্বাস থাকিবে কেন? কংগ্রেস যে নিজের ভারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা এখন সকলেই বুঝিতেছে। প্রজা-মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বের উপরেই যাঁহাদের পদ-ভার স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে যতেচ্ছাচারী হওয়া যে অপঘাত, তাহা নেতৃবর্গ এতদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণও ছিল। তাঁহারা একতার ভাণ করিয়া, প্রজা প্রতিনিধিত্বের দোহাই দিয়াই এক 'ধোকাতে' কার্য্য হাসিল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। প্রজা প্রতিনিধিত্বের সত্যিকার দাবী করিতে পারিলে কি ফল ফলে, সে সম্বন্ধে একটী সুন্দর ঘটনার বিবরণ বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটী সত্য কি না, জানি না, সত্য না হইলেও ব্রিটিশ রাজত্বে রাজা ও প্রজা-প্রতিনিধির মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান, গল্পটী তাহাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। একদিন মহামতি গ্লাডষ্টোন কোনও রাজকার্য্য উপলক্ষে মহারাণী ভিকটোরিয়ার দরবারে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন এবং কোনও কার্য্যের জন্য একটু পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। ইহাতে মহারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধভরে বলিলেন "আপনি জানেন, আমি ইংলণ্ডের রাণী।" গ্লাডষ্টোন তখন ধীরভাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনার কাছে ইংলণ্ডের রাণীর একজন ক্ষুদ্র প্রজা গ্লাডষ্টোন রূপে এখন উপস্থিত হই নাই; আপনি ভুলিবেন না, আমি চারি কোটী ব্রিটীশ প্রজার প্রতি-নিধি।" মহারাণীর আর উত্তর দিবার পথ রহিল না। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ ইংরেজ-রাজ যদি আজ ব্রিটিশ রাজধর্ম্ম ভুলিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার এক মাত্র উপায়, আমাদের নেতৃবর্গের পক্ষে ত্রিশ কোটী প্রজার সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ। তাই বলি, পণ্ড শ্রম পরিত্যাগ কর, রাজার গোলামী ছাড়িয়া প্রজার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ কর, সকল চিন্তা দূর হইবে, মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে, ভয় বিভীষিকা দূরে পলায়ন করিবে। মাভৈঃ।

জাতীয় মহাসমিতির এই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সুহৃদ্‌বর্গ কেন যে এই উপেক্ষিত বস্তুটীর প্রতি হঠাৎ এমন প্রেমের পরিচয় দিতেছেন এবং অযা-চিতভাবে ইহার সম্বন্ধে এত আদেশ উপদেশ লইয়া উপস্থিত হইতেছেন, এখন সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। কেবল এদেশে নহে, বিলাতের কাগজ পত্রেও একটু আলোচনা চলিতেছে। এক খানি কাগজ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় আন্দোলনকে খুব গুরুতর মনে না করিলেও, একবারে অগ্রাহ্য করা চলিবে না। ভার-তের শাসন-প্রণালীতে ধীরে ধীরে সংস্কার প্রবর্ত্তন না করিয়া বিপ্লবের অপেক্ষায় বসিয়া

থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। সুরাট কংগ্রেশ যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা আমরা সময়ে বুঝিতে পারিব, তবে আমাদের এই 'হঠাৎ' সুহৃদ্‌বর্গের উপদেশ কি ভাবে গ্রহণ করিব, তাহাই এখন বিচার্য্য। বিচার করিবার পূর্ব্বে একটী গল্প স্মরণ করা যাক্। এক গ্রামে এক মৌলবী ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি যাহাই থাকুক, প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে খুব সম্মান ছিল। তাই সকলে তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত। তিনি অনেক সময়েই বুঝিতে পারিতেন না, কি পরামর্শ দিবেন। কিন্তু তাঁহার একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল—হিন্দুর পক্ষে যাহা ব্যবস্থা, মুসলমানের পক্ষে তাহার বিপরীত। সুতরাং কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তিনি যে পরামর্শ দিতেন, মৌলবী সাহেব ঠিক তাহার বিপরীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। আমরাও আমাদের এই নব সুহৃদ্‌বর্গের উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে মৌলবী সাহেবের পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি। ইহারা আমাদের এমন সুহৃদ্ যে, ইহাদের পরামর্শের বিপরীত পন্থা-বলম্বনেই আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কংগ্রেস-শত্রুকে ইহারা মৃত বলিয়া এত দিন গ্রাহ্য করে নাই। এখন ইহার মধ্যে জীবনের সম্বাদ পাইয়া আর তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। যে শত্রুকে মৃত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেতো মৃত নয়। সুতরাং তাহাকে আর অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই, কংগ্রেস সম্বন্ধে ইহাদের আজ এত আগ্রহ। তবে, কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া, ইহারা আক্ষেপ করিতেছে কেন? আমরা ত বলিয়াছি, কংগ্রেস মরিয়া জীবনের পরিচয় দিয়াছে। কংগ্রেস ভাঙ্গার আর একটী অর্থ এই যে, পুরাতন নেতারা ইহাকে যেদিকে লইয়া চলিয়াছিলেন, কংগ্রেস সে-দিকে যাইতে না চাহিয়া পথে থামিয়াছে। তাই পুরাতন নেতারা "কংগ্রেস বন্ধ রহিল" ইহার অর্থ করিয়াছেন, কংগ্রেস মরিয়া গিয়াছে, এস আমরা কন্‌ভেন্‌শন করি। অর্থাৎ ভারতের রাজ-নীতি ক্ষেত্রে আবার ফিরে গণ্ডূষ করি। কেন না, বাইশ বৎসরের চেষ্টার ফলে আমরা এমন জায়গায় আসিয়াছি, যেখানে সরকারের সঙ্গে লাঠালাঠী অনিবার্য্য; সুতরাং এখান থেকে পিছাইয়া গিয়া আবার গোড়ায় আরম্ভ করিলে, বাইশ বৎসর অন্ততঃ ঘুমাই-বার সুযোগ হইবে। তারপর ২২ বৎসরের সাবালক পুত্র যখন সব কথা মানে না, তখন এক দুগ্ধপোষ্য নাবালক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা যাক্ এবং ব্যাপারটী উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনেই সংঘটিত হইয়াছে; কেন না, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ভারতের রাজ-নৈতিক-ক্ষেত্রে নাবালক মাত্র। তাই কন্‌-ভেনশনের আবির্ভাবে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ার এত আনন্দ। কিন্তু যাহাতে তাহাদের আনন্দ, আমাদের তাহাতেই সর্ব্বনাশ। এই স্বতঃসিদ্ধ কথা যেন আমরা না ভুলি। কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া কন্‌ভেনশন হইল, আবার কেঁচে গণ্ডূষ হইল; আবার শিশুর ছেলে-খেলা আরম্ভ হইল। ইহাতে আনন্দ আছে বটে; কিন্তু নিরানন্দেরও যে কারণ আছে, তাহাও তাহারা লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। এত কাল কংগ্রেসে যাঁহাদের হাতে ছিল; তাঁহারা হাতের লোক, তাঁহাদিগকে লাগাম ধরিয়া যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালান

যাইত, কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া প্রমাণ করিয়া দিল, কংগ্রেসের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে। ভারতের এক কোণে আপনার দুর্গমধ্যস্থ কংগ্রেসকে লইয়া যাইয়াও যখন মেটার কপালে মহারাষ্ট্রী বিনামা ছাড়া আর কিছু লাভ হইল না, তখন তো ব্যাপার সহজ নহে। তাহাতে আবার প্রমাণ হইল, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা সচেতন পদার্থ এবং ইহার উৎসাহ উদ্যম অন্ততঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অপেক্ষা ন্যূন নহে। কংগ্রেস ভাঙ্গার ইহাই আক্ষেপের প্রধান কারণ। কংগ্রেস যে মেটা ও তাঁহার দলের হস্তভ্রষ্ট হইল, ইহাতে ভয় না হইবে কেন? আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, সরকারেরর যাঁহারা বিশ্বাস-ভাজন, তাঁহারা দেশের নেতা হইতে পারেন না, তাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহার ভিতরে স্বদেশ-প্রীতি আছে, সরকার তাঁহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না, করা অসম্ভব। তাহা স্বার্থের সকল নিয়ম-বিরুদ্ধ। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। মিঃ আর, সি, দত্ত ও মিঃ কে, জি, গুপ্ত, উভয়েই কৃতী সিভিলিয়ান। অথচ দত্ত সাহেবকে কেন অকালে সিভিলিয়ান-লীলা সম্বরণ করিতে হইল, আর গুপ্ত সাহেবেরই কেন বা উত্তরোত্তর পদবী লাভ হইতেছে? অর্থাৎ গুপ্ত সাহেব কেন সরকারের বিশ্বাস-ভাজন, আর দত্ত সাহেব নহেন কেন? কেন না, স্বদেশপ্রীতি ও সরকারের বিশ্বাস এক-স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। দত্ত সাহেবের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি আছে এবং যতটুকু সাহস ও স্বার্থত্যাগ থাকিলে স্বদেশ-প্রীতি ভারতবাসীর মনে বাস করিতে পারে, তাহাও আছে, সেই জন্যই তাঁহাকে সত্বর পলায়ন করিতে হইয়াছে। আর গুপ্ত সাহেবের মধ্যে উক্ত বস্তুগুলির স্থিতি বিষয়ে কখনও সন্দেহ করিবার সুযোগ পান নাই, সুতরাং তিনি বিশ্বাসভাজন রহিয়াছেন। সরকার যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহার প্রজার প্রতিনিধি হইবার দাবী চলিয়া গিয়াছে। মেটা ও তাঁহার দলকে যদি সরকার বিশ্বাস করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের কংগ্রেসের নেতৃত্ব চলিয়া গিয়াছে। নরম দলকে বিশ্বাস কর বলিয়া যদি সুদূর সাগর পার হইতে ঘোষণা আসিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের স্থান কংগ্রেসে নাই। তাঁহারা প্রজার প্রতিনিধি হইতে অসমর্থ। তাঁহারা যে কনভেন্শন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।* নরম দলের হাতে কংগ্রেস থাকুক, গরম দলকে বাহির করিয়া দাও, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়া যদি এই চীৎকার উত্থাপন করিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, গরম দলের হাতেই কংগ্রেস থাকুক, নরম দল বাহির হইয়া গিয়াছেন, ভালই। একথা যদি দেশ বুঝিয়া না থাকে, তবে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বেশ হইয়াছে। কেন না, দুষ্ট বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। যাঁহাদের হাতে দেশের নেতৃত্ব থাকা সরকার ও সরকারী কাগজগুলির অভিপ্রেত, তাঁহাদিগকে দেশ, প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা যদি দেশ না বুঝিয়া থাকে, তবে দেশের ভরসা কোথায়?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

* বাবু সুরেন্দ্রনাথ ও লাজপত কনভেন্শনে যোগ দিয়া যে একটা খিচড়ী করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহারাও সত্বর বুঝিবেন।

# নীরবে যোগ শিক্ষা।

ভারত অন্তর্জগতে আধ্যাত্মিক যোগ শিক্ষায় পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বহির্জগতে বহির্যোগের বিন্দুমাত্রও শিক্ষার্থী নহে, বস্তুতই মানবীয় স্বাধীন বজ্র-শক্তির বিপর্য্যয়ে আত্মোন্নতির আভাস মাত্রও জানেনা। বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শনাদি জ্ঞানগর্ভ বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইলে কি হয়, বহির্যোগ শিক্ষার অভাবে দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সাংঘাতিক বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া একপ্রাণতার অমৃতময় ছায়ার আশ্রয় গ্রহণে চিরবঞ্চিত রহিয়াছে। যতদিন সার্ব্বভৌমিক স্বদেশপ্রেমের দৃঢ়বন্ধনে ভারত-প্রাণ নিবদ্ধ না হইবে, ততদিন যতই কেন উদয়-অস্ত-ব্যাপী আন্দোলন ও বক্তৃতা দ্বারা অনুকূল পথ প্রদর্শন করুন না, তাহা কুঞ্জর-গর্জ্জনের ন্যায় দিক্-নিনাদিত শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে; পরিণামে আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। কেননা, ভিত্তিশূন্য অস্থায়ী স্থানে দাঁড়াইলে গভীর মেধাবী হইলেও টলিয়া পড়েন। তাহার মূলকারণই যোগ শিক্ষার অভাব। তাই বলিতেছি,যোগের তত্ত্ব কি দুই-টীতে একত্র নহে? ঐ অন্তর্জগতেও পরমাত্মাতে আর জীবাত্মাতে "তুমি" "আমির"র যোগ, বহির্জগতেও আপনাতে ও আমাতে ঐ"তুমি" "আমির" যোগ। এই উভয়ের অভেদ মিলনই মহা মিলন। কি প্রাণী জগতে, কি উদ্ভিজ্জ জগতে, দুইটীর ভিতর দিয়া নীরবে যোগের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়। ঐ দেখুন, স্ত্রী-পুরুষে সৃষ্টির ভাব। এই দ্বিবিধ শক্তির প্রভাবে অসংখ্য প্রাণীপূর্ণ জগৎ। আবার একটী বীজের আবরণ ভেদ করিয়া দুইটী সৃষ্টি-ভাব বিকাশ পায়। একটী ভূগর্ভগামী, অপরটী আকাশোন্মুখ, কিন্তু উভয় বিভাগই বিস্তৃত ভাব অবলম্বন করে। মূলে বৃহৎ শিকড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরায় বেষ্টিত—ঊর্দ্ধে শাখা প্রশাখা-সমাচ্ছন্ন। ফলতঃ ভূগর্ভস্থিত সূক্ষ্ম শিরার সহিত পত্র-শিরায় অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়াছে। ভূভেদী শিরা সমূহে অনবরত রস যোগাই-তেছে, পত্র-শিরায় গ্রহণ করিয়া বৃক্ষটীকে সঞ্জীবিত করিতেছে, কালে বৃক্ষটী অমৃত ফল প্রসব করে। অতঃপর নীরব সাধনেই মানব প্রকৃতির স্বাধীন শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, গভীর গর্জ্জনে কিছু হয় না। বিধাতা দুইটী শক্তির একত্র সামঞ্জস্য সূত্রে কি যে অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, কে বুঝিবে? ভাবিয়া দেখুন ত, প্রাণী সমূহের দুইটী চক্ষুর প্রয়োজন কেন? একটী থাকি-লেও চলিত! বস্তুতঃই ইহার অন্তঃপ্রবিষ্ট চিন্তার অতলতলে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দুইটী চক্ষু দেখিতেছেন সত্য, ফলতঃ উহার দৃষ্টি শক্তি এক, এই উভয় শক্তির যোগে অতি সূক্ষ্ম পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই বলিতে পারা যায় যে, অক্ষ ক্রীড়ার গুটি যেমন দুইটীতে এক যোগে চলিয়া নিরাপদে শান্তি গৃহে শান্তি পায়, যোগবিচ্ছিন্ন ভাবে "ছয় তিন নয়ের" ভয় আর করে না, তেমনই, একতা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুইটীতে অকৃত্রিম প্রেমে মিলিত হইলে সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। অতএব নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, "তুমি"র—"আমি" উভয়ের

মিলনে সমস্ত ভারত একদিন একপ্রাণ হইয়া দুর্জ্জয় শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। তাহার নমুনা, সীমান্ত প্রদেশের বীরকেশরী-যুগল নিরপরাধে নির্ব্বাসন দণ্ডেও যোগ শিক্ষায় কেমন সিদ্ধিলাভ করিয়া নীরবে পুনরায় স্বদেশে আসিয়া স্বদেশ-সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। এই যুগল বীরমূর্ত্তির যোগ শিক্ষারঅমৃত উচ্ছ্বাসে কি ঐ রূপ আশা করা যায় না?

অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, নীরব যোগ শিক্ষা প্রভাবে "তুমি"—"আমি"র মিলনে দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে পদদলিত করিয়া, একপ্রাণতার বলে তৃণখণ্ড সংযোগে সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায়, ত্রিশ কোটি ভারতবাসী স্বদেশ-প্রেমে আবদ্ধ হইতে পারে। পরস্পরায় নীরব যোগ-শিক্ষার্থী হইলে, চারি দিকের ঘন চীৎকার হইতে শান্তি সম্ভাবনা থাকে, একতার মহামন্ত্র জীবন্ত হইয়া উঠে। ভীষণ অসনি সদৃশ নরহত্যা যন্ত্রের ভীম গর্জ্জনেও ভীত হয় না। তবেই বুঝিয়া দেখিবেন যে, অন্তঃপ্রবাহিনী ফল্গু নদী যেমন উত্তপ্ত বালুকা রাশির ভিতরেও প্রচ্ছন্ন শীতল সলিলের অমিয়ার উল্লাসে অসংখ্য মানবগণকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনই, আড়ম্বর-বিড়ম্বনা-ভোগ-বিরত হইলে সুখ শান্তির পরাকাষ্ঠা থাকে না। বস্তুতঃই দুইটী প্রাণের একপ্রাণতা বলে মিলনের বিপদ-সঙ্কুল প্রতিবন্ধক ঘুচিয়া যায় এবং রাজ-অনুচরগণ পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, ভীষণতর ভীষণ কারাগৃহের কঠোর কষ্টও ভোগ করিতে হয় না, নির্ব্বিঘ্নে যোগ সিদ্ধি হইয়া যায়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নির্ব্বাক সাধনকেই কি ফলপ্রদ স্বীকার করা কর্ত্তব্য?—কেনইবা বলিব না—রাজ-নিগ্রহ-সূচক তীব্র বক্তৃতাই কি শান্তির উৎস? আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, রাজা কেন, একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও কঠোর কষায়িত কথা বলিতে পারি না। তবে সত্য কথার অনুরোধে পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটকে, অবাধে,অবৈধ শাসনের বিচার বিভ্রাট এবং শোষণ পেষণে প্রজার স্বাধীন শক্তি নাশের বিষয় বলিতে বা নিবেদন করিতে পারি। কেননা, রাজন্যগণ কেবল প্রজার ধন, মান, জীবন রক্ষার জন্যই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থোদর পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নহে। তাঁহারা কখনই ভূগ্রাসিনী শক্তি প্রভাবে প্রজার শক্তি নাশ করিয়া চির পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। শিশু যেমন যৌবন প্রাপ্ত হইলে সংসার-ভার লইতে বাধ্য, তেমনই, প্রজাও সুশিক্ষিত হইলে স্বায়ত্ব শাসন ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, এটী ঈশ্বরের অব্যর্থ বিধান। আহা! ভারতে এমন দিন কি আসিবে যে, সকলের মৃদুসঞ্চারিত শীতল শোণিত উষ্ণ ভাবে একটুক চলিবে, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াও কি আনন্দে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে, ধনী দরিদ্রের সহিত মিলিত হইয়া কি মহাব্রত সাধনে উন্মত্ত হইতে পারিবে? ইহা সম্ভব হইলেও, অনেক বিলম্ব আছে। তাই বলিতেছিলাম, নীরবে যোগ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

এই যে "স্বদেশী" ও "স্বরাজ" দুইটী মহত্তত্ব লইয়া ভারতে তুমুল আন্দোলন হইতেছে, ইহার অভ্যন্তরে অমানুষী ঐশী-শক্তির কার্য্য অতি গূঢ় ভাবে চলিতেছে। ইহা রাজা প্রজা উভয়েই হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন না। উপর্য্যুক্ত দুইটী তত্ত্বই ভারতের মঙ্গলপ্রদ। "স্বদেশী" শরীর,

"স্বরাজ" প্রাণ। শরীর ও প্রাণ, মণি-কাঞ্চনের ন্যায় জড়িত রহিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত নিজ নিজ দেহ সম্বন্ধে বুঝুন। আপনার গাত্রে একটুক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৈবাৎ পড়িলে তখনি উঃ—শব্দে চীৎকার করিয়া উঠেন কেন? তবেই বুঝিবেন, শরীর ও প্রাণে এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। "স্বদেশী" ও "স্বরাজ"ও ঐরূপ অবিচ্ছিন্ন মিলনে নিবদ্ধ। ইহা না বুঝিয়া ব্যক্তিগত দলবদ্ধ ভাবে একতা ভঙ্গ করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? আরও বলি, রাজ-শাসন বিভাগে ভয়চকিত-চিন্তায় "মুখবন্ধ" বিধান প্রচলনই কি ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য হইয়াছে? বিধাতা গগনবিহারী গৃধ্রগণকেও শতাধিক সঙ্গীভাবে শ্মশানোৎসবে স্বাধীনতা দিয়াছেন। যাক্, এখানে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, তবে এটুকু বলা আবশ্যক যে, নিঃস্বার্থ নিষ্কলঙ্ক ভাবে প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম। ইহার ব্যত্যয়েই বিপ্লব বা অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়। রাজেন্দ্রবর্গকে সতত ঈশ্বর-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেননা, বিশ্বনিয়ন্তা অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন! তাঁহারা যদি আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি প্রবৃত্তির বশে শোষণ-শাসনে রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবানের বিধানে অপরাধী হন; এটী অব্যর্থ সত্য। এই যে "স্বদেশী" ও "স্বরাজ" লইয়া ভারতে মহা তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহার অভ্যন্তরের নিগূঢ় ভাবটীর প্রতি চিত্ত সংযোগ করিলে কেনই বা প্রজার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রাণ কাঁদিবে না? রাজা কাঁদিলেইত প্রজা কাঁদে? ভারতের দুরবস্থা দেখিয়াইত বিধাতা ঐ দুইটী তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "স্বদেশী" শিল্প-বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্য চায়, "স্বরাজ" স্বায়ত্ব-শাসন চায়। এই উভয় আবদারেই রাজার উদার ভাব থাকা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, শাসন-বিভাগের অধীনে জুস্তিকাটী ছাড়িতেও যদি উচ্চ অনুচরবর্গের অনুমতির সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ভারতের বীরকুল পর্য্যন্তকে এক প্রকার জন্তু মনে করেন, তাহা কে উপেক্ষা করিবে?

বড় দুঃখের সহিত বলিতেছি, এখনও ভারতবাসী "স্বদেশী" ও "স্বরাজের" প্রকৃত সেবা করিতে উদাসীন। উপর্য্যুক্ত উভয় তত্ত্বকে এক প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলে, বাঁকের কলসীর মত একটী ভাঙ্গিলে দুইটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেখিতেও পাই, সময়ে সময়ে ভীষণ তর্ক-যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার বীজ গজাইয়া থাকে. এমন কি, বৃদ্ধ পর্য্যন্তও মনোমালিন্য আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। বাক্-সংঘর্ষণে শনৈঃ শনৈঃ দুইটী পক্ষ বা দলের ভীষণ মূর্ত্তি যেন উঁকী মারিতেছে। দল সৃষ্টির অনুকূল উপাদান "সভাপতি" অমুক! না, না—অমুক! পরস্পরের ইচ্ছার অসামঞ্জস্য-জনিত যে মিলনরূপ কল্পবৃক্ষের মূলে কালকূট-কীট প্রবেশ করিতেছে, তাহা ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীগণও একবার ভাবিয়া দেখেন না। যাহা হউক, আমরা ইহার মূল-তত্ত্বের বিষয় যতটুকু বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা কিছু বলিব। "স্বদেশী"-মহত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে-ছেন, বলহীন বালকের মুখে বেদ-সঙ্গীত শ্রবণ ও সৈনিক-বলবীর্য্য প্রদর্শন মধুর হইতেও মধুর! ইহাতে কাহার না প্রাণে উল্লাস উচ্ছ্বাসের বেগ প্রবল হয়? কিন্তু ঐ বালকের ক্ষীণ-কণ্ঠ-নাদিত সঙ্গীত

ও বীরত্বের বিকাশ সৌন্দর্য্য দর্শন বহু দিন সাপেক্ষ। সেই জন্যই বলিতে চাই,ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সহিষ্ণুতা বলে মানুষ অসম্ভব কার্য্যও করিয়া তুলে। অধীরতাই অভীষ্ট সিদ্ধির অনিবার্য্য শত্রু। উহাতেই বিবিধ প্রকার বিঘ্নজনক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া মনের সাধু সঙ্কল্পকে ম্লান করে এবং মর্ম্মাহত নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত করিতে থাকে। তাই বলি, যে কোন শুভানুষ্ঠিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে ভবিষ্যতের চিন্তার প্রয়োজন। কেন না, ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবলের সম্পূর্ণ অভাবে সহসা কিছু হয় না। জ্ঞানীরা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, অসার চিন্তার উত্তেজনায় প্রমাদ উপস্থিত করেন না! শিশুর বাক্য স্ফুরণ না হইতেই কেহ তাহাকে দর্শন শাস্ত্র পড়িতে দেয় না। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, স্বদেশের উন্নতি-কল্পে রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রার্থনীয়। রাজানুগ্রহই প্রজার অভ্যুদয়ের একমাত্র ভিত্তি। এইত গেল "স্বদেশীর" কথা!

এখন "স্বরাজ" সেবকগণেরও মর্ম্ম-ভেদী কথা কিছু বলা আবশ্যক। ভারত ক্ষত্রিয়রাজ শাসনের পর হইতে বৈদেশিক রাজার অধীনতা শৃঙ্খলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দেশ বৈদেশিক রাজশক্তির স্বার্থ প্রণোদিত অবৈধ ও অবিচারে প্রজা সমূহ নাগ পাশে বদ্ধ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিম্বা স্বাধীন শক্তি হারাইয়া কিঞ্চুলুক-দর্পহারী বীর পুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে পরপিণ্ড-পোষিত হইয়া থাকে। এইত গেল বলের দিক—আবার আসঙ্গ-লিপ্সার দিক দেখুন। বৈদেশিক রাজ শক্তির সঙ্গে প্রজা শক্তির অভিন্ন যোগ হইলে কাহার আকর্ষণ প্রবল হয়? মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, রাজশক্তিরই বিজয় দুন্দুভি ঘন নিনাদিত হওয়া নিশ্চিত! বিশেষতঃ রাজ-ভাষা দূত রূপে এমনি সুকৌশলে আকৃষ্ট করিয়া তুলে যে, বৈদেশিক অনুকরণ-যন্ত্রে "সাটের" নাম মুদ্রিত করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃই ঐ মধুর আকর্ষণে প্রজা সমূহ যতই প্রচ্ছন্ন শান্তি লাভ করিতেছে, ততই ক্ষীণ ও অসার হইয়া পড়িতেছে। এবং নিশ্চেষ্টতা রূপ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলস্যের শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া, তাহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃঢ় করিতেও অধ্যবসায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন। রাজ শক্তির আশ্রয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাচ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া কোন সীমায় উপস্থিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ধন, মান, ধর্ম্ম সমস্তই রাজহস্তে দিয়াছি, স্বাভাবিক কার্য্যোপযোগী স্বাধীন শক্তিটুকুও তাহারই শাসনে রাখিয়াছি এবং উদার রাজনৈতিক বিধানের নিকট দয়ার ভিক্ষার্থী হইয়াওত "পাষণে নাস্তি কর্দ্দম" এক বিন্দুর আশা নাই। তবেই বুঝিবেন, ভুজঙ্গের সহিত ভেকের আনুগত্যে ভাবী-শান্তির আশা ত শোষণ দংশন? মুখের গ্রাসটীওত সিন্ধু পারে চলিয়া যাইতেছে!

এই উভয় পক্ষের আরও মতদ্বৈধ আছে। আমরা কোন পক্ষেরই দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ভারতের ঘোর দুঃসময়ে আত্মকলহ ভীষণ প্রমাদের

অনুষ্ঠানে কোন পক্ষ প্রবৃত্ত নহেন। কিন্তু সে আশাও যে সুদূরপরাহত। এক সময় গুণসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, ভারতভূমির দশ হাত মৃত্তিকা উঠাইয়া সমুদ্রে ফেলিলেও দ্বেষ, হিংসা ও মূর্খতা-জড়িত কুটিল দেশের মঙ্গল হইবে না। বস্তুতঃই সেই দেববাক্য অব্যর্থ! শুনিলাম, জাতীয় মহাসমিতিতে (কংগ্রেস) সভাপতি নির্ব্বাচন ও মতের অনৈক্যবাদে চর্ম্ম-পাদুকার তাড়না, অধিক বলিতে কি, রক্ত-পাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে! ধন্য ভারতবাসী! ইহাঁরাই কি স্বায়ত্বশাসনের ভার গ্রহণ করিবেন? "স্বদেশ" "স্বরাজ" লইয়া এত বৃথা আন্দোলন চীৎকার কেন? তাই বলিতেছিলাম, এখন নীরবে যোগ শিক্ষা করাই ভারতের মঙ্গলের একমাত্র উপায়।

যাহা হউক, আর একটী কথা না বলিয়া থাকা গেল না। ভবিষ্যৎদর্শী ও আপাত-দর্শীর বিষয় সংক্ষেপে এইটুক বলিয়া রাখি। ভবিষ্যৎদর্শীগণ অধঃ উর্দ্ধ দশ দিক দেখিতে দেখিতে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পড়িলে বিপদ সংঘটিত হয়। ঘরে আগুন লাগিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে ঘরখানি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পরিশেষে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে আর কি ফল হইবে? আপাত-দর্শীগণ ভবিষ্যৎ না দেখিয়া হঠাৎ কুচক্রীর কপট কথায় মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সাংঘাতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন, পরে অনুতাপানলে দগ্ধ ও ঘন অশ্রু মোচন, ইহাই ত লাভ! এইরূপ অবস্থায় উভয় ভাব-গ্রাহী মনস্বীগণের স্থির ধীর ভাবে কার্য্য পরিচালন করা উচিত। একটী দেশহিতকর শুভ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া শুভ পৃথিবী মধ্যে কলঙ্ক ঘোষণা কেন? অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করা অপেক্ষা নীরবে যোগ শিক্ষাই অনুকূল পরামর্শ।

হায়! হায়! হৃদয়ের অনিবার্য্য মর্ম্মভেদী কষ্টযন্ত্রণা ত আর রাখিবার স্থান নাই! যে কংগ্রেস দিগ্ব্যাপ্ত অমানুষী উজ্জ্বল কীর্ত্তির ভিত্তিরূপে ইয়োরোপ প্রভৃতি সুসভ্য দেশকে বিস্মিত করিয়াছিল, যাহার সখ্য বন্ধন ও মিলনের বিমল তরঙ্গের প্রখর গতি দেখিয়া রাজ-অনুচরগণও সতত সঙ্কিত ভাবে থাকিতেন, যাহার উন্নতির ক্ষিপ্র গতিতে বৈদেশিক বণিকগণ মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই ভাগ্যে লোক-নিন্দিত পৈচাশিক ঘটনা ঘটিল! এই বজ্রাহত দুঃখ-দলিত অবশ হস্তে লেখনী ত আর চলে না! অশ্রু সংযত করিতেও ত পারি না! কোথাও ত এরূপ অভিনব কুব্যবহার শুনা যায় নাই! হায়! আত্ম-সম্মান-লালসা কি ভয়ঙ্কর! মহাতেজস্বী অতি গম্ভীর ব্যক্তিকেও দেখা যায়, ঐ ভীষণ রোগে আক্রান্ত। হে ঈশ্বর! যদি ভারতের দুর্গতির প্রতিবিধানের বিধান কর, তবে উভয় পক্ষের নেতৃবর্গকে ও সুকুমারমতি যুবকগণকে সরলতা দাও। মিলনের মহা স্রোতে ধৌত করিয়া এমন ভাবে জাগ্রত কর যে, স্বদেশপ্রেমে ডুবিয়া সকলে যেন আত্ম-হারা হয়। ভারতের হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলনের অভিন্ন ভাবে, জগৎকে যেন স্তম্ভিত করে, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

# বীরপূজা। (২)

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক। আমাদের দেশের বীরেরা রাষ্ট্রনীতির প্রচারক এবং রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মী। ভারতবর্ষে এক সময়ে সমাজের আন্দোলন অত্যধিক ছিল। যখন পরাধীনতা স্পর্শ করে নাই, তখন স্বাধীন জাতির মত স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক কর্ম্মের প্রথা, সমস্ত গুলিই সুচারুরূপে সংস্কার করার আন্দোলন হইত। জাতিভেদ, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ, ধর্ম্মশিক্ষা, অধিকারী নির্ণয় ইত্যাদি সামাজিক এবং ধর্ম্ম জীবনের উন্নতিকল্পে সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা হইত। হিন্দুজাতি রাজনৈতিক বিষয়ে রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে অধিকারী করিয়া দিয়া, সমাজের, পরিবারের, গ্রাম্যজীবনেরই শৃঙ্খলা ও মঙ্গল কামনায় শক্তির প্রয়োগ করিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের তত বেশী ধার ধারিতেন না। তারপর মধ্যযুগে যে সমস্ত আন্দোলন হইত, তাহা প্রধানতঃ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ও প্রবৃত্তিই তখনকার ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে ছিল। রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতি জাতির অভ্যুত্থান, হিন্দুধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস এবং এই সেই সময়ের চিন্তার ও কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই ধর্ম্মগত বিরোধের ভিতর দিয়া, হিন্দু মুসলমানের জাতিগত ও ঐতিহাসিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া তখনকার দেশ-হিতৈষীরা স্বদেশসেবায় ব্রতী হইতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত বা খাজনা দেওয়ার নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া রীতিমত প্রজাতন্ত্রশাসনের ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা তখনও লোকের মনে উদিত হয় নাই। সেই হিন্দুর আধিপত্য কালে রাজতন্ত্র-শাসনের মধ্যেই যেরূপ প্রজাতন্ত্রের বীজ ছিল, প্রজার অধিকার যে যে পরিমাণে ছিল, প্রায় তদ্রূপ রক্ষা করিয়া, মুসলমানকে দেশ হ'তে বিতাড়িত করাই তখন স্বদেশ-প্রেমের উদ্দেশ্য ছিল। তাই ধর্ম্ম ও রাজনীতি, দুই মিলিত হইয়া যুগান্তর সৃষ্টির সহায়তা করিত। আমাদের দেশের মধ্যযুগের আন্দোলন ধর্ম্মের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য। দুইই প্রায় সমানভাবে বর্ত্তমান। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, পারিবারিক জীবনের এবং অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টাও হইয়াছিল। প্রতাপ সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, নানক, শিবাজী, রামদাস, কবির, চৈতন্য, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উন্নতি করিবার জন্য, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, অথবা সমাজে মুসলমানের প্রাধান্যে যে কুসংস্কার ও বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহাদের বিনাশের জন্য কর্ম্ম করিতেন। একদিকে বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে দেশ ও ধর্ম্ম উদ্ধার করা, অপর দিকে নূতন অবস্থার অনুযায়ী হিন্দুর স্বাভাবিক ভক্তি এবং প্রেমের রাজ্যবিস্তার করা, এই দুই লক্ষ্য ভারতীয় মধ্য-

যুগে হিন্দুর মন অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজ আগমনের পর নূতন ছাঁচে ঢালা ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে দেশের এবং সমাজের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হওয়ায় দেশহিতের চেষ্টা আর এক রকমের হইল। এখন বিদেশীয় বিজ্ঞান এবং শাসন-প্রণালী, জড়জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং রাজ্যে জাতি ও ধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক প্রজার অধিকার স্থাপন, কি উপায়ে আমাদের এতদিনকার সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া, দেশ ও সমাজকে আধুনিক ভাবসমষ্টির মধ্যে জীবন্ত রাখিয়া, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় নূতন এক সভ্যতা সৃজন করিয়া, বিশ্বের সভ্যতাভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে, এই দেড় দুশ বৎসরের স্বদেশপ্রেমিকদের এই ইচ্ছা। রাজনৈতিক আন্দোলনই প্রধান লক্ষ্য, ধর্ম্মের বৈষম্যে, ভাষার বিভিন্নতায়, দ্বন্দ্বকলহ আর বেশী ভীতিজনক নয়। সে জন্য ধর্ম্মের আন্দোলন বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা এখন বলবতী নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোককে নিজ শক্তি অনুসারে পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রদান না করিলে, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, প্রত্যেক বিষয়েই খর্ব্বতা, হীনতা এবং কুসংস্কার উপস্থিত হয়। অতএব দেশের মধ্যে প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার কর্ম্মক্ষেত্র চাই—এই ভাবই স্বদেশ-প্রেমিকদের চিত্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে আজ কাল কর্ম্মবীরেরই সংখ্যা অধিক, আমাদের নেতারা আজকাল সমাজনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ। ধর্ম্মের আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারের চেষ্টাও যে এখন দেখা যায় না, তাহা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রমাণ। তবে আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্ম্ম যে দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার প্রধান লক্ষণ প্রজাশক্তির উত্তোলন এবং দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার বিস্তৃতি। এই বৈষয়িক আন্দোলনের ভিতর দিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

আধুনিক ভারতে এক লক্ষণ যেমন বীরদের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকারস্থাপনের চেষ্টা, তেমনি, আর এক লক্ষণ এই যে, বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী জাতির কাজ করিবার সময় এখন আসিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজপুত, শিখ, মারহাট্টার বীরত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও বাহুবল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখনও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় নাই। মহারাষ্ট্রের সাম্রাজ্য হইয়া গিয়াছে, পঞ্জাবের স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস আছে, এই বিংশশতাব্দীতে বাঙ্গালীর শিবাজী এবং বাজীরাওয়ের আবির্ভাব হইয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস রচিত হইবে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় পৃথিবীতে একচ্ছত্র শাসন বা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিন আর নাই। প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্ত-শাসনই আজ কালকার একমাত্র শাসন প্রণালী। যে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির অভাবে মধ্যযুগে একীকরণ ও সমন্বয় সাধনের সুবিধা না থাকায়, মুসলমান সাম্রাজ্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিন্দুদের রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টা ক্ষণিক আশা সঞ্চারের মত অলক্ষ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, যে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, খবরের কাগজ, যাতায়াতের সুবিধার অভাবে জনসাধারণ রাজ্যশাসনের

ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ এবং অনুপযুক্ত হওয়ায়, সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা এবং স্থিরতা অসম্ভব হইয়াছিল, সেই পাশ্চাত্য বিদ্যা, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতে যে নূতন প্রথা, নূতন বীরত্বের ইতিহাস রচিত করিতে চলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীই অগ্রণী, পথপ্রদর্শক বটে, কিন্তু বাঙ্গালার সাম্রাজ্য স্থাপন এখনও পাগ্‌লামী। এখন বাঙ্গালী, মারহাট্টা, শিখ, রাজপুত্র, প্রত্যেকেরই সমবেত চেষ্টায় এক যুক্ত-রাজ্য মহাভারত প্রতিষ্ঠার সময়। এই নূতন ভাব যে বাঙ্গালারই প্রথম উদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। ভারতে এই নবজীবন আগমনের, নূতন আদর্শ স্থাপনের প্রধান কারণ, ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ইউরোপীয় বিদ্যা, সাহিত্য, সভ্যতা, চিন্তা এবং কর্ম্মই আমাদের দেশের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে মিলিত হইয়া নূতন এক সভ্যতার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। এজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষা যে সমাজে এবং যে প্রদেশে বেশী প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দেশই, সেই সমাজই নব্যভারত সৃজনের নেতা, সেই দেশের বীরই অপরের পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ। বাঙ্গালাদেশ অনেক দিন হইতে এই পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আছে। বিদেশীয় শিক্ষা, প্রথা, চাল চলন ভারতের অন্য সমাজ অপেক্ষা এখানেই অধিকার অধিক স্থাপন করিয়াছে। সমাজের অতি নিভৃত স্থানে এবং ধর্ম্ম জীবনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আধিপত্য বেশী। এইরূপে, দুই ভিন্ন পথাবলম্বী সমাজের সংঘর্ষণে প্রথম প্রথম যে বিপ্লব, যে আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী, সেই বিপ্লব বাঙ্গালী সমাজেই অধিক চলিতেছে। বিলাসপ্রিয়তা, সকল বিষয়ে বিদেশীর অনুকরণ, ইংরাজী শিক্ষা চাকরীর প্রবৃত্তি, বাহ্যচাক্‌চিক্যে মনোনিবেশ, এক কথায় পরের সঙ্গে সম্মিলনে, তাদের চরিত্রের বাহিক বিষয় গুলি অতি প্রবলভাবেই বাঙ্গালীর চরিত্র আক্রমণ করিয়াছে। এই জন্য, এই পরাধীনতার কুফল অত্যন্ত বেশী হওয়া নিবন্ধন, পুনরায় যে প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহারও সূচনা, এখানেই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রথমে দেখা গিয়াছে। বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে অত্যধিক পরিচিত থাকায়, ইহার প্রকৃত জোরের স্থান কোথায় এবং ইহার মধ্যে কি সত্য আছে এবং ইহার কতটুকু এ দেশ ও সমাজের উপযোগী বলিয়া গ্রহণীয়, সে ভাব এখানে আসিয়াছে। এজন্য বিদেশী সভ্যতার যাহা যাহা আমাদের পক্ষে উপাদেয়, কিছু কাল ভোগবিলাস চিত্তসম্মোহনের পর, নিজের মত করিয়া স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর চরিত্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মগত সামাজিক জীবনকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষার চেষ্টা এবং বিজ্ঞানালোচনার সঙ্গে ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার ইচ্ছা বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী। বিদেশী সভ্যতা এবং শিক্ষার সুফল এখানে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষয়িক উন্নতি, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালায়ই প্রবল। এই সকল ফলের প্রধান লক্ষণ, বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি। জাতীয়তা, জড়বিজ্ঞান ইত্যাদি নূতন বিষয়ের মূলমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য বাঙ্গালী বিদেশীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সকল প্রকার চিন্তা, সকল প্রকারের রচনা, বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালীর ভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞানের জটিল ভাবগুলিও সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায়। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি সকল বিষয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য এখনও অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। হিন্দীর এখন পর্য্যন্ত ভাষারই স্থিরতা নাই। একটী সাহিত্যিক ভাষার উৎপত্তি এখনও হইতে পারে নাই। তামিল, তেলুগু ভাষায় অতি সামান্য সাহিত্যই রচিত হইয়াছে। মারহাটী ভাষায় দুচারি জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। প্রেম-সঙ্গীত এবং ধর্ম্ম সাহিত্য ছাড়া অন্য প্রকারের চিন্তা মারহাটী ভাষায় বেশী বহির্গত হয় নাই। সকল দিক হইতে বাঙ্গালা দেশেই ইউরোপীয় সভ্যতার কাজ বেশী হইয়াছে। সেজন্য বাঙ্গালীই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পথপ্রদর্শক, ইউরোপীয় বিদ্যাকে ভারতের উপযোগী করিয়া চালিত করিবার পথে নেতা। সেজন্য বাঙ্গালী বীরই এখন ভারতে অধিক। একদিকে যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনই প্রধান, তেমনি, এই ভারতীয় আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীই অগ্রণী। বাঙ্গালী বীরেরই প্রাধান্য—বাঙ্গালীই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমগ্র ভারতকে স্বার্থত্যাগী করিয়া তুলিয়াছে। এই বাঙ্গালী বীরদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী। বীরেরা যেমন সকলেই একই অসত্য, একই অবিদ্যা নাশের জন্য আবির্ভূত হন না, সময় ও দেশ ভেদে এক এক প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হন, তেমনি, একই সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেও আবার ধাপ আছে, প্রণালী আছে—সকলকে একই কাজ করতে হ'লেও একই উপায় এবং একই প্রথা অবলম্বন করতে হয় না। আমাদের বাঙ্গালার রাজনৈতিক বীরপুরুষদের মধ্যে কেহ বা চিন্তায় প্রধান, কেহ বা কর্ম্মে প্রধান; কেহ বা নূতন ভাবের স্রষ্টা, কেহ বা ভাবগুলিকে সমুচ্চয় করিয়া গড়িয়া তুলিবার কর্ত্তা। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এই রাজনৈতিক জগতের চিন্তারাজ্যের শৃঙ্খলা আনয়নের সেনাপতি। বাঙ্গালাদেশে বিদেশীয় সভ্যতা যে যে শক্তির উদ্রেক করিয়াছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে পরাধীনতার ফলে যে যে বাসনা মনে উদিত হইয়াছে, তিনি সেই সমস্ত শক্তি এবং বাসনা সংযত ও সুসজ্জিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে সংঘটন করিয়াছেন। সকল প্রকার চিন্তার মধ্যে পরস্পর বিরোধীভাব ঘুচাইয়া, আধুনিক জগতের উপযুক্ত করিবার জন্য একীকৃত করিয়া একটী দানা বাঁধাইয়াছেন। এরূপে চিন্তার দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং ব্যাপকতা আসিয়াছে। এলোমেলো ভাব চলে গিয়ে আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তার সমন্বয় ও শৃঙ্খলা আসিয়াছে। অসম্বদ্ধতা আর নাই। এতদিন নানা প্রকার আন্দোলনের ফলে যে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে জাতীয় প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া, দেশের ও সমাজের সকল প্রকার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনার সম্পূর্ণতা দান করিয়া, সমগ্র জাতির আদর্শ স্থির করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে পূর্ব্ব হইতেই দেশের লোকের চিত্তে যে যে আশা ও ইচ্ছা স্থান পাইয়াছিল, সেই সব আশা এবং ইচ্ছাকে পরস্পরের সঙ্গে মিলাইয়া পুঞ্জীকৃত করায় যে বিশদ ভাবসমষ্টির সৃজন করিয়াছেন, তাহা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ।

নূতন ভাব প্রদান না করিলেও, বিদ্যমান চিন্তা-শক্তির যথাযথ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে যে আয়তন, আকার ও রূপ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই ইহাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। ভারতে ইংরাজ আগমনের পর অনেক নূতন ভাবের সৃজন হইয়াছে। ইংরাজের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া, ইউরোপের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে, বিদেশীর সহিত মেলা মেশায়, নূতন বিজ্ঞান, নূতন নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া, আমাদের দেশের লোকেরা এক অভিনব ভাবে সমাজ এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এক নূতন চোখে পৃথিবীর হাব ভাব, জগতের সমস্ত ব্যাপার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে, বিদেশী বণিকদের ব্যবহারে অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপদেশ বিশেষ ভাবে আমাদের লোকের হৃদয়ে কাজ করিয়াছে। এই নূতন বেষ্টনীর প্রভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নানা দিকে, নানা বিষয়ে আমাদের উদ্যম ও পরিশ্রম চালিত হইয়াছে। এইরূপে সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, ধনাগম ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েরই নূতন অবস্থানুরূপ কাজের আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাবলম্বনের চেষ্টায় প্রায় সকল বিষয়েই অশেষ রকমের তর্ক-প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকাল মৃত্যু, অত্যাচার, অবিচার, দাসত্ব, চিত্ত-সংযম, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা ইত্যাদি সমাজের অনৈসর্গিক ব্যাধির প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই সকল অসত্য দূর করিবার জন্য দেশে যত প্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে, যত অনুষ্ঠান, দলগঠন, সভাসমিতি, ফণ্ড, কংগ্রেস বক্তৃতা হইয়াছে, অন্ধকার নাশ করিবার জন্য আমাদের দেশহিতৈষীরা যত রকমের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত সত্য, প্রকৃত বিদ্যা, প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত রাজনীতি স্থাপনের পথে আমাদের সমাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা এত দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে হইতেছিল—পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রাখার, পরস্পর আদান প্রদানে উৎসাহিত এবং বর্দ্ধিত হইবার তত সুবিধা ছিল না। সকল প্রকার ভাবনা একত্র সন্নিবেশিত করিয়া দেখা হয় নাই, কেহই এতদিন পর্য্যন্ত এই চিন্তা ও কর্ম্ম রাশিকে ব্যাপক ভাবে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে প্রয়াসী হন নাই। ইহাদের শ্রেণী বিভাগ এবং একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। অরবিন্দ বাবুর বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই সমস্ত সত্য আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার ভাবে দেশের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, সমস্ত ব্যক্তিগত চিন্তাগুলিকে এক স্থানে দেশের যাবতীয় মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সন্নিবেশিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড চিন্তা-কলেবরের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। সকল প্রকার চিন্তা গুলিকে সাজাইয়া দলবদ্ধ করিয়া, জাতির আদর্শ সম্বন্ধে গোঁজামিলনের ভাব দূরীভূত করিয়াছেন। দেশের মহান্ অতীতকে না ভুলে গিয়ে বর্ত্তমান কালের ভাবসমষ্টির সঙ্গে সংযোগ রেখে ভবিষ্যতে কোন্ পথে চল্‌তে হবে এবং এজন্য রাজা প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ অধিকার, বিভাগ ও কর্ত্তব্য বিভাগ করা

উর্চিত, এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের কিরূপ রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, এবং কোন্ আন্দোলনের সঙ্গে কোন্ আন্দোলন করা যুক্তিসঙ্গত, এক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যের পরম্পর সম্বন্ধ এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে দেশের লোকের অস্ফুট এবং উড়ু উড়ু ধারণা গুলিকে একই কেন্দ্রে চালনা করিয়া এক চিন্তা-সংহতি সৃজন করিয়াছেন। দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে চিন্তার মধ্যে যে সমন্বয় এবং ঐক্য সাধন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব এবং বীরত্বের পরিচায়ক। এই চিন্তা-সংহতিকেই লক্ষ্য করিয়া দেশের লোক কর্ত্তব্য পথে চলিবে। এই ভাব-রাশিই ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজ সৃষ্টি করিবে। ইনি চিন্তা-বীর, ইঁহার কৃতিত্ব চিন্তার শৃঙ্খলা আনয়নে। দেশের চিন্তাভাণ্ডারে নূতন কিছু দান না করিলেও দেশের লোকেরা স্বাবলম্বন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর ক'রে সহরে এবং গ্রামে যে ভাবে যে কাজ ও চিন্তা করিতেছিল, তাহাদের কর্ম্ম এবং চিন্তার মধ্যে যে বিশেষত্ব, যে মৌলিকতা এবং যে তেজের চিহ্ন পাওয়া যায়, সেই বিশেষ তেজ, সেই নূতন ভাবকে যে গভীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের সহিত দেশের লোকের সম্মুখে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এক নূতনত্ব আছে। ইঁহার বক্তব্য অনেকেরই বিদিত ছিল, অনেকেরই মনের কথা, অস্ফুট বা অর্দ্ধ-প্রকাশিত হৃদয়ের ভাব-গুলিই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিংশ-শতাব্দী আমাদের দেশের লোককে যে ভাবে উৎপ্রাণিত করিয়া হৃদয়ে যে শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, এতদিন আমরা নীরবে বা অস্পষ্টভাবে যে আশার কথা ভাবিতেছিলাম ও বলিতেছিলাম, ইনি "স্বদেশের বাণী-মূর্ত্তিরূপে" সেই সমস্ত আধ আধ কথা "অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত "প্রদীপ্ত ভাষায়" ঘোষণা করিয়া নীরবতা ও ভীতির ভাব দূর করিয়াছেন। লোকের মনে অন্ধকার আর নাই, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোলমেলে অস্পষ্ট ভাব দূর হইয়াছে। দেশের এখন ভাবিবার শক্তি হইয়াছে, মুখ ফুটে কথা বলিবার সাহসও হইয়াছে।

নূতন আলোক নূতন ভাব দান করাই প্রতিভার এক মাত্র লক্ষণ নয়। অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মী এবং ভাবুকেরা যে উপকরণ, যে উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকেই নিজের মত করিয়া ব্যবহার করায়ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোক-সমাজে অবিদিত কোন সত্যের আবিষ্কার করার মত, যে সত্য লোক-সমাজে বিশেষ পরিচিত, তাহাকে নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন এক রূপ প্রদান করিয়া, তাহাকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করায়ও স্বাধীন চিন্তার এবং মৌলিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যা একে-বারে জানা ছিল না, এ রকম তথ্য প্রদান খুব কম ব্যক্তিই করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই বিদ্যমান শক্তি-নিচয়ের সম্যক্ ব্যবহার এবং প্রয়োগ করিয়াই লোকেরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ইউরোপে যত বীর পুরুষদের কথা আমরা জানি, যত কর্ম্মবীর ও চিন্তা-বীরের সন্ধান আমরা পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বগামী ব্যক্তিগণের কর্ম্মকেই সুসজ্জিত করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রথম এডোয়ার্ড, স্পেনের রাজ-দম্পতী ফার্ডিনাণ্ড এবং ইসাবিলা, ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই প্রভৃতি নরপতিগণ রাজ-

নৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে যে শক্তির ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বকালিক মন্ত্রী বা রাজা বা প্রজাদের আরব্ধ এবং অর্দ্ধ-সফলতাপ্রাপ্ত কাজ এবং চিন্তার ফলে। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরম্পর অসম্বদ্ধ চেষ্টা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের বিশেষত্ব এবং কৃতিত্বের প্রমাণ এই যে, তাঁহারা সেই সমস্ত শক্তিগুলিকে যথোচিত নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীতে অভিনব কর্ম্মের সৃজন করিয়াছিলেন। কবি সেক্সপিয়র সাহিত্যক্ষেত্রে যে অতুলনীয় যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহাও, তাঁহার পূর্ব্বগামী কবি এবং সাহিত্যসেবীদের প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক গণ্য মান্য উৎকৃষ্ট লেখকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। নাটকের সমস্ত উপকরণই ইনি উত্তরাধিকারীর মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটক রচনার প্রণালী, নাটকের চরিত্রসমূহ, নাটকের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়া চরিত্রবিকাশ, ব্যঙ্গরস, ইত্যাদি প্রায় কোন উপকরণই তাঁহাকে নূতন করিয়া সৃজন করিতে হয় নাই। নাটক কাহাকে বলে, তাঁহার দেশের লোকের তাহা অজানা ছিল না, নাটকের মধ্যে ইতিহাস রাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরিবার এবং সমাজচিত্র, কোন্ কৌশলে কি উপায়ে প্রকাশ করিতে হয়, নাটকের চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির মুখে কিরূপ কথা শোভা পায় এবং এজন্য ভাষার কিরূপ বৈচিত্র্য দরকার, এসমস্ত নাটকের রীতিনীতি, লিখন ও অভিনয় পদ্ধতি তিনি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ে তাহার মৌলিকতা প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবুও সেক্সপিয়র ইউরোপীয় কবিদের অগ্রণী। ইহার কারণ, ইনি যে সকল জিনিষ পাইয়াছিলেন, সেগুলিকে এরূপ ভাবে নিজের মত করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাদিগকে এরূপ ভাবে সাজাইয়াছিলেন, অনুপাত এবং উপযোগিতার তাঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যে, তাঁহার লেখনী-প্রসূত রচনাগুলি জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক আশ্চর্য্য পদার্থ, সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার বিশেষ সৃষ্টিরূপে এখনও বর্ত্তমান। এইরূপে নূতন কিছু প্রদান না করিয়াও, বিশেষ ভাবে সাজাইতে গুছাইতে জানিলে, অভিনব মৌলিকতার এবং শক্তির পরিচয় দেওয়া যায়। যে ভাব ও শক্তি সমষ্টির মধ্যে মানুষ নিক্ষিপ্ত, তাহাকে ব্যবহার করিতে যে জীবনী শক্তির দরকার, তাহা কম মহত্ত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় নয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের চরিত্র নূতন বিচার প্রণালী সৃজনে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভারতে হিন্দু মুসলমানের বিচার পদ্ধতিতে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, সে সকলগুলি সংশোধন করিয়া নূতন এক প্রথার আবিষ্কার করিতে যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অতুলনীয়। তাঁহার কর্ম্ম এতদিনের মধ্যেও পরিত্যক্ত হয় নাই। অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আমূল পরিবর্ত্তন হইল না। ডালহাউসিও ভারতে প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজশক্তিকে দৃঢ় করিয়া চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহাও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত শক্তি-সমষ্টির সুব্যবহার মাত্র। ওয়াসিংটন আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশ-প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু ঐক্য

এবং সমন্বয় সাধনের পথ এবং উপায় উদ্ভাবন অনেক আমেরিকাবাসীই তাঁহার পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। ইতালীর ম্যাট্‌সিনি ইউরোপে এক নূতন ভাব প্রদান করিয়াছিলেন, নূতন রকমের জাতীয়তার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অসংখ্য ভাষা ও ধর্ম্মভেদেও যে জাতীয়তা হয় এবং স্বজাতির উন্নতি সাধনে বিশ্বমানবেরই উন্নতি হয়, একথা ইউরোপের কাণে প্রথম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ভাবজগতের বীরপুরুষ, অপরদিকে কর্ম্মজগতেও পারদর্শী। একদিকে নূতন মন্ত্র প্রয়োগকর্ত্তা, অপর দিকে মন্ত্র শক্তিতে আহূত লোকসমাজকে দলবদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে দাঁড় করাইবার অধ্যক্ষ। কর্ম্মজগতে এবং ভাবজগতে অধিকার তাঁহার মত অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিন্তাজগতে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন পথের প্রদর্শক। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বলে আমাদের দেশীয় সমাজ বিকশিত হইয়া যে রূপান্তর গ্রহণ করিতে চলিয়াছে, বঙ্কিম বাবু ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে সেই নব্যভারতের গঠন-মন্ত্র "বন্দেমাতরং" মানস চক্ষে দেখিতে পাইয়া যখন তাঁর উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁহাকে কেহ বুঝে নাই। বাঙ্গালার মধ্যে সংস্কৃতের পদ দেখিয়া অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। আমাদের দেশহিতৈষণা পূর্ব্বকালে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, এখনকার নূতন অবস্থানুযায়ী দেশহিতৈষণা জাতীয়তা রূপ যে নূতন আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে, তাহা তিনি ঋষিতুল্য দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, তিনি সাধারণ জনসমাজের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। এরূপ নূতন মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং প্রয়োগ-কর্ত্তা [illegible]বিন্দু বাবু[illegible]। বঙ্কিম বাবু নূতন জাতিগঠনের কাল অদূরে দেখিয়া একটী একীকরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, মাতার আগমনী গাহিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহারও অনেক পূর্ব্বে ভারতীয় স্বরাজের পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এজন্য চৈতন্য, নানক, কবিরদের মত, হিন্দুসমাজকে বিজাতীয় ধর্ম্ম এবং সভ্যতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া ইহার এক স্বাভাবিক সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষদের মত, দেশে নূতন জাতীয়তার আবির্ভাব হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, দেশীয় শিক্ষা, দীক্ষা এবং সমাজ ধর্ম্মকে মধ্যযুগের অবস্থা হইতে আধুনিক যুগে আনয়ন করিতে যে দূরদৃষ্টি, প্রতিভা এবং স্বজাতি প্রেমের দরকার, তাহার পরিচয় দেন নাই, অথবা মায়ের আবাহন গান রচনা করেন নাই। তিনি এতদিনের পর জনসাধারণের মনে উদিত নব্যভারত-প্রতিষ্ঠার আশাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নবতন্ত্র সংগঠিত করিয়াছেন। এই নবতন্ত্রই লোককে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া বহুদিনের আশা এবং অভিলাষকে পূর্ণ করিবে।

নব্যভারতে যুক্তরাজ্যের স্বরাজ আনয়নের জন্য যে কার্য্যপ্রণালী এবং কৌশল অবলম্বন দরকার, তাহা পরিষ্কাররূপে দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য যেরূপ ব্যাপকভাবে এবং পূর্ণতা দান করিয়া নবতন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন, এই নবতন্ত্র প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ। পৃথিবীতে তাঁহার আগমন এই জন্যই। এই সত্য প্রকাশ করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক গুণের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

# হলাহল।

মানবের সুধাবর্ষী বদন হইতে কখনও কখনও গরল উদ্গীরিত হইয়া থাকে। তাহাতে জনসমাজ অস্থির এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেব-ভাবের পরিবর্ত্তে যখন আসুর-ভাব মানবে রাজত্ব করে, তখনই এরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় মানবে ও পশুতে কোন বিভিন্নতা থাকে না; মানুষ পশুত্বে অবনমিত হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় একটী কথা প্রচলিত আছে, কথাটী অশ্লীল, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—"কুলটা রমণীর গলার বড় শক্তি, সে খুব চীৎকার করিয়া অন্যের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে।" কথাটী কেবল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নয়, পুরুষ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। আমরা প্রতিনিয়ত, সংসার-রঙ্গালয়ে দেখিতেছি, যাহারা অপরাধী, তাহারাই বাহাদুর, তাহারাই দিগ্বিজয়ী, তাহারাই বাহ্যাড়ম্বরের জোরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে সক্ষম। "শূন্য পাত্র খুব বাজে"—এ কথাটার সার্থকতা তাহাদের জীবনে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন,—"যে নিজে বলে "আমি গুরু" সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিকটা উঁচু হয়। যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হাল্কা। সকলেই গুরু হ'তে চায়, শিষ্য পাওয়া যায় না।" যাঁহারা খাঁটী মানুষ, তাঁহারা আড়ম্বর-কোলাহল-নিরপেক্ষ হইয়া সদা নিভৃতে মহাসাধনায় তৎপর থাকেন। মানুষের মত মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা বাহ্যাড়ম্বর মোটেই ভালবাসেন না, নীরবতাই তাঁহাদের জীবনের অভিব্যক্তি। গভীরে, অতলে তাঁহারা সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকেন।

সংসারের সর্ব্বত্রই মেকীর আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম-সমাজে বহিরঙ্গ-সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তিরাই বাহ্য-পারিপাট্যের জোরে সর্ব্বত্র পূজ্য, অন্তরঙ্গ-সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তিরা উপেক্ষিত, নগণ্য এবং অগ্রাহ্য। যেখানে ধর্ম্ম ঠাঁই পায় না, সেখানে প্রভুত্ব, আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য্যের লীলা,—সেখানে সকল ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়, কেবল অর্থে এবং ঐশ্বর্য্যের জোরে। তাহারা তুরী ভেরী বাজাইয়া জগৎকে মোহিত করে। তাহারা কোন্ শ্রেণীর জীব, পৃথিবীর লোকেরা বড় কেহ জানে না। তাহারা 'ভিতরে'র কোন খোঁজ রাখে না, বাহিরটা বজায় থাকিলেই হয়। অতি পবিত্র স্বদেশী-আন্দোলনও, এহেন পেশাদারী হিতৈষী লোকদিগের ব্যবহারে, পণ্ড হইয়া যাইতেছে। তাহারা মুখে স্বদেশ-সেবক, কিন্তু ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারা খায় কেলনারের হোটেলে বা অন্যত্র বিদেশী চিনি * ও লবণ, পত্রিকা ছাপায় বিদেশী কাগজে, পরিধান করে বিদেশী কাপড়; অথচ ষোল আনা নিজ নিজ জেদ বজায় রাখিতে তৎপর, এবং দিক কাঁপাইয়া বক্তৃতা করে, যেন তাহাদের ন্যায় দেশহিতৈষী এ সংসারে আর নাই! হায়, এহেন লোক-

* সঞ্জীবনী বলেন, কাশীপুরের কলের চিনি স্বদেশী। এ কথা সত্য নয়, বিদেশী চিনি সেখানে দোবরা হইয়া থাকে।

দিগের বাক্‌পটুতায় এবং জেদে দেশের সকল উন্নতি পঞ্চাশৎ বৎসর পশ্চাতে সরিয়া পড়িতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিভাগ-নীতির এক মহা সাধক। এই এক মহা অস্ত্রবলে গবর্ণমেণ্ট এদেশে চিরস্থায়ীত্ব লাভের প্রয়াসী। তাহার প্রধান সহায়—দারিদ্র্য। দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া লোকদিগকে অধীনে রাখিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ, লোকভেদ, দেশভেদ—জাগাইয়া রাখিতে পারেন, তবেই ইষ্ট সাধিত হয়। গবর্ণমেণ্টের মহা সাধনার পথে যত অন্তরায় উপস্থিত হইতেছিল, আমরা নিজেরাই তাহা দূর করিতেছি। জাতিভেদকে আরো শক্ত করিয়া ধরিতেছি. ভাষাভেদকে আবার জাগাইতেছি, দারিদ্র্য-সমস্যা যাহাতে মীমাংসিত না হয়, তাহা করিতেছি,—আবার জেদাজেদি ও দলাদলির মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্স এবং সুরাটের কংগ্রেস এ কথার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না, কেন এরূপ হইতেছে!!

যাহার কোন কাজ নাই, তাহার অস্তিত্ব বহুকাল থাকে না, থাকিতে পারে না। কংগ্রেস কেবল আবেদন নিবেদন লইয়াই সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন; ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণে সমর্থ হন নাই; অপিচ চেষ্টাও করেন নাই। দারিদ্র্য-সমস্যা-পূরণের উপায় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-সাধন, স্বদেশী-গ্রহণ এবং কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপনে নিবদ্ধ। কংগ্রেস এ সকল কোন কাজেই হাতে দেন নাই। কোটী কোটী লোক, যদি প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তবে জাতীয় উত্থান কাহাকে লইয়া হইবে? দারিদ্র্য-সমস্যা-মীমাংসার জন্য, কংগ্রেস, সুদীর্ঘ কালেও, যখন কোন কাজে হাত দিলেন না, তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, আজ হউক, কাল হউক, কংগ্রেস মৃত্যুমুখে নিশ্চয় পতিত হইবে। যাহার কোন কাজ নাই, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ কি? রাখিতে পারেই বা কে? সামান্য ঘটনাতেই তাহা নির্ব্বাণ হয়। ইতালীর ক্যাভাগনারী সম্প্রদায়ের ন্যায় কংগ্রেসের মৃত্যুতে, সুতরাং, প্রকৃত দেশ-সেবকগণ খুব দুঃখিত হইতে পারেন না। একটু দুঃখের কারণ এই,—কংগ্রেস ভারতে যে সদ্ভাব আনয়ন করিতেছিলেন, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল; বিশেষতঃ কংগ্রেস ভঙ্গের দিনে যে জেদাজেদি ও দলাদলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ইহা ভারতের জাতীয় একতা বিনাশের এক অমোঘ অস্ত্র বিশেষ। গবর্ণমেণ্ট যাহা চান, আমরা কি তাহাই সুসিদ্ধ করিয়া দিব? ধিক্‌।

আমাদের এই সুবিশাল ভারতবর্ষে স্বদেশ-সেবকদলে অতি অল্প সংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ লোকই গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র। প্রতিভা এবং কৃতীত্ব, ঐশ্বর্য্য এবং পাশবশক্তি—সবই গবর্ণমেণ্টের দিকে। মুষ্টিমেয় স্বদেশ-সেবকদলের সম্বল কি? কেবল নৈতিক ও ধর্ম্মবল। এই বলেই তাঁহারা অশেষ নির্য্যাতন এবং ক্লেশ অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, কি জানি কেন, এই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেও, অল্প দিনের মধ্যেই, নৈতিক এবং ধর্ম্মবলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম চায়—ব্যক্তিত্ব ভুলাইতে; নীতি চায়, অহঙ্কার বিনাশ করিতে; কিন্তু দলাদলি-সাধকেরা চায়, ব্যক্তিত্ব জাগাইতে,

অহঙ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে। সুরেন্দ্রনাথ এবং তিলকের বিবাদে,—আর কোন কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না, পরিচয় পাওয়া যায় কেবল ব্যক্তিত্ব এবং অহঙ্কার প্রতিষ্ঠার অদম্য চেষ্টার। মায়ের সকল সন্তানই পূজ্য, কে বড় বা কে ছোট? মতগত পার্থক্যেই বা কি আসিয়া যায়?—অনন্ত মানবশ্রেণী অনন্ত প্রকার,—কাহার মতে কাহার মিল সম্ভব? সকলের বিশেষত্ব গ্রহণের প্রয়োজন বলিয়াই, এজগতে একতা সম্ভব। সকলকে লইয়া যখন সন্তান-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তখন বড়-ছোটত্বের বিচার এবং মত-দ্বৈধের ঝগড়া কেন? সকল সন্তানই মায়ের,—সকলেরই প্রয়োজন আছে, সমষ্টিগত সন্তানধর্ম্ম বাদ দিলে মাতৃত্বের অস্তিত্ব থাকে না। তুমি মনে করিতেছ, উঁহাকে বা তাঁহাকে বাদ দিয়াও, মাতৃনাম বজায় থাকিবে। না—তাহা কখনই সম্ভব নয়। "বাদ" শাস্ত্র, অহঙ্কারের গুপ্ত চর; উহা একতার বিরোধী। মনে রাখিও, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি দর্পে হত বলী, অতি দর্পে হত হিরণ্যকশিপু। অতি দর্পে হত সিজর, অতি দর্পে হত নেপোলিয়ন। সকল নীতির সার নীতি—ভ্রাতৃপ্রেম; সকল ধর্ম্মের সারধর্ম্ম,—মাতৃভক্তি। ভ্রাতৃপ্রেম যেখানে নাই, মাতৃভক্তি সেখানে কখনই থাকিতে পারে না, কেননা, ভ্রাতৃ-সমষ্টিতেই মাতৃত্বের গৌরব। ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করিয়া মাতৃত্ব ভুলিয়াছে;—সেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা জাগিয়াছে, পেশাদারী যজন যাজন চলিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, স্বদেশ-সেবক দলেও ভ্রাতৃত্ব অস্বীকারের বীজ রোপিত হই-তেছে! ইহার পরিণাম—আর কিছুই নয়, মাতৃত্ব অস্বীকার—এবং পরপদলেহন রূপ অম-ঙ্গল। যদি প্রেমের উদয় না হয়, কে জাতীয় একতা আনয়ন করিবে?, জাতীয় একতা না হইলে, পরপদ-হেলন-স্পৃহা কিসে ভারত যে তিমিরে ছিল, সেই ডুবিতে চলিয়াছে!!

মাতৃ-দ্রোহী অসুরের সংখ্যা বড় কম নয়। যাহাতে মাতৃভক্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য শত সহস্র প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে। মাতৃভক্তি বিনাশের জন্য কত দিকে কতরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহা গণনা করা যায় না। নির্ব্বাসন, নির্য্যাতন, নিষ্পেষণের অবধি নাই, —তদুপরি ভ্রাতার দ্বারা ভ্রাতার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা অবিরাম চলিতেছে। তোমাকে, তাহাকে, উহাকে ক্ষেপাইয়া, আসুর-শক্তি, প্রতিনিয়ত, মাতৃভক্তি বিনাশের চেষ্টা করিতেছে। ছিল কি এবং আছে কি?—ভাবিয়া দেখ ত! কত স্বদেশ-সেবক আজ জেলে, ভাবিয়া দেখ ত? কত ভাই দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, একবার স্মরণ করত? কত, কত, কত জন দুবেলা এক মুষ্টি অন্ন পায় না, চিন্তা কর। তারপর বল, অহং-শক্তি, জেদাজেদি, এহেন দুর্দ্দিনে, বিনাশ করা স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য কি না? দলাদলিতে যে "হলাহল" উদ্গীরিত হইয়াছে, উহা ভস্মীভূত না হইলে এদেশের আর মঙ্গল নাই।

কেহ কেহ বলেন, দলাদলি কোথায় নাই?—ইংলণ্ডেও দলাদলি আছে। যে ইংলণ্ড আমাদিগকে দাসত্বে চির নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চায়, সেই ইংলণ্ডই আমাদের আদর্শ! * ইংলণ্ডের আদর্শই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ইংলণ্ডে

---

* "The Bengali's leg is the leg of a slave. Except by grace of his natural masters, a slave he always has been and always must be." In India, by G. W. Steevens, P. 75.

দলাদলি আছে, মাতৃপূজার জন্য, মাতৃহত্যার [illegible]। যখন কোন দুর্জ্জয় শক্তি ইংলণ্ডের পড়িতে[illegible]কে বিনাশ করিতে অগ্রসর হয়, তখন গবর্ণ[illegible] আর দল থাকে না, তখন সেখানে সাধক। [illegible]ন্সারভেটিব একপ্রাণ, একমন। এদেশে চির[illegible]র সময় একথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রধান [illegible] গিয়াছে। আর জীবন্ত দৃষ্টান্ত করি[illegible]ওয়া গিয়াছে—ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে। ভারতের উন্নতিতে ডিজ্‌রেলী কিম্বা গ্লাডো-ষ্টোন—কেহই সুখী ছিলেন না। ভারতের উন্নতিতে ব্যালফোর বা ব্যানারম্যান, কেহই সুখী নহেন। এমন যে উদারনৈতিক মর্লি (!), তিনিও আজ বিকৃতিতে নিমগ্ন। তাঁহারা দলাদলি, বকাবকি করেন, মাতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য, বিরোধী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নয়। আমাদের দেশে, দলাদলিতে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে।—অথবা মুসলমান বিজয়ে!—অথবা ইংরাজ বিজয়ে! অপ্রেমে অপ্রেমে ভারত মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসের সমস্ত কাহিনী পাঠ করিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। ভারতে, শুভদিনের অভ্যুদয়ের দিনে, অপ্রেম জাগিতেছে, ইহাতে প্রাণ মন অস্থির! হায়, সকল সংবাদ পত্রে উদ্গীরিত হইতেছে কেবল অপ্রেমের কলহ-মূর্ত্তি—"হলাহল"। হায় প্রতাপ, হায় রণজিৎ, হায় সিরাজ,—তোমরা ঐ "হলাহল" পান করিয়া সেই যে দেহত্যাগ করিলে, আজও সে ভারতে হলাহল-সিদ্ধ মহাদেবের অভ্যুদয় হইল না! শ্মশান-জয়ী শিবের অভ্যুদয় ভিন্ন এ ভারতের রক্ষার আর উপায় নাই।

সংসারকে এক করার শক্তি—"প্রেম," সংসারকে জয় করার দৈবশক্তি "মঙ্গল"। এই "প্রেম" এবং "মঙ্গল" একই শক্তির দ্বিধারা। "প্রেম"—যখন অহং শক্তিকে বিনাশ করিয়াছে, "ভেদবুদ্ধি" ডুবাইয়াছে, তখনই চির "কল্যাণ" মানব-সমাজকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গৌরী জন্মিয়াছিলেন দক্ষ-সংসারের ঘরে, যখন তিনি হর-রূপ স্বর্গে সম্মিলিত হইলেন, তখন সংসার-বিজয়ী "হরগৌরী" মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল—তখন—"শিবম্ শিবম্" মন্ত্রে ধরা বিকম্পিত হইল। ইহাই সাধনা, ইহাই সিদ্ধি। সংসার-বিজয়ী কালকূট-সেবী শিবের অভ্যুত্থান ভিন্ন এ মহা ভারত-শ্মশানের আর মঙ্গল নাই।

হায়, কোথায় পাই সেই প্রেম, যাহা বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান জন্মায়, কলহ বিবাদ বিনাশ করে, ভাই ভাইকে এক-ঠাঁই করে! লাঠীর পরিবর্ত্তে লাঠী, তিক্ত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তিক্ত ব্যবহার, ইহা সংসারের কূট রাজনীতি; আর স্বর্গের ধর্ম্মনীতির আদেশ এই—"লাঠীর বদলে আলিঙ্গন, তিক্ত ব্যবহারের বদলে সাদর অভ্যর্থনা।" "মেরেছ মেরেছ কল্‌সীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"—এই অমূল্য কথা যে দেশে এক দিন ঘোষিত হইয়াছিল, সেই দেশে "কথার" পরিবর্ত্তে "জুতা" প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, একথা ভাবিলেও চক্ষে জল পড়ে! বিশেষতঃ, এই ঘটনা এমন দুর্দ্দিনে ঘটিল, যে দিন চতুর্দ্দিকে নিষ্পেষণ এবং নির্য্যাতন নীতি অবলম্বিত হইয়াছে! একটু সহিষ্ণুতা, একটু বিনয়, একটু স্বার্থত্যাগ, একটু কৃপারও প্রত্যাশা নাই? হায়, তবে এ দেশের আশা কোথায়?

জানি, নিশ্চয় জানি, এদেশে, আজও ম্যাটসিনির ন্যায় প্রেমিক-নেতার অভ্যুদয় হয় নাই। কিন্তু এত বকাবকি, এত আন্দোলন, এত আস্ফালনের পরিণাম কি ইহাই?

কোথায় স্বদেশ-হিতৈষণা লুকাইল? "কুলটা"-রমণীর গলাবাজি আর ভাল লাগে না!!

এদল বলে, ওদলের দোষ; ওদল বলে এদলের দোষ;—কতরূপ বিকৃত ব্যাখ্যাই শুনিতেছি! এক ঘটনার নানারূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রশ্ন উঠিতেছে, কোন্ দল সত্যবাদী? এ সব কথা ভাবিতেও কষ্ট হয়! এত কেলেঙ্কারী, পেশাদারী, কিছুতেই আর ভাল লাগে না। না—এ সকল লোকের দ্বারা কিছুতেই দেশ-উদ্ধার হইবে না। তাহারা কেবল "হলাহল" বমন করে। "হলাহল" হজম করিতে পারে, এমন আত্মত্যাগী, স্বার্থত্যাগী, মহাপুরুষের অভ্যুত্থান প্রয়োজন। এমন মহাপুরুষের প্রয়োজন,—যিনি কেবল আপন দোষ ত্রুটী দেখিবেন, অন্যের দোষ ত্রুটী দেখিবেন না; যিনি অন্যের মহত্ত্ব স্মরণে, চিন্তনেও, ধারণে—আপনাকে অন্যে বিলীন করিয়া দিবেন; এবং এইরূপে কোটীকে সম্মিলিত করিতে করিতে সনাতনধর্ম্মকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন সমর্থ হইবেন,—এমন এক শক্তি জাগাইতে, যাহা মায়ের পূত নাম স্মরণে অশ্রু-প্লাবিত কণ্ঠে নির্ভয়ে গাইবে—"মাভৈঃ"। সে শক্তি, মায়ের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের সময়, একটীবার দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিবে না; নীরবে—কর্ত্তব্য-সমাধান-মঞ্চে দেহত্যাগ করিয়া ধন্য হইবে। বাহাদুরীর বড়াই, বড়ত্বের গরিমা, জেদাজেদি, অহং প্রতিষ্ঠার নির্ম্মম চেষ্টা—সব নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, জাগিয়া থাকিবে, কেবল বিশ্ববিজয়িনী প্রেম। তখন সব ভাই একঠাঁই হইয়া, প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, মাকে দেহ-মন-চিত্ত অর্পণ করিয়া দিবারাত্রি খাটিতে খাটিতে গাইবে—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

তখন, অজেয় মাতৃধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া দেশের সকল অকল্যাণ বিনাশ করিবে, এবং মহা একতাকে আনয়ন করিবে।

হায়, সেই স্বর্গের দিন কবে আসিবে?

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

জীবদেহে দেবাসুরে (১) চলিছে সংগ্রাম,
প্রজাপতি উভয়েরই উৎপত্তি-নিদান।
ওঁকারের উপাসনা করে দেবগণ,
উভয়ের (২) পরাজয় উভয়ে চিন্তন। ১।

দেবগণ নাসিকাগ্রে প্রাণ করি স্থির,
উদ্গীথ ওঁকার ধ্যান করেন সুধীর।
অসুর পাপেতে বিদ্ধ করে সেই প্রাণে,
সুগন্ধ দুর্গন্ধ প্রাণ সেই হেতু জানে।২।

বাক্য উপাসনা করে উদ্গীথ ওঁকারে,
অসুর পাপেতে বিদ্ধ করয়ে তাহারে।
তাই বাক্য পাপ-বিদ্ধ হ'লে এই হয়,—
বাক্য সত্য মিথ্যা দুই রূপই কথা কয় (৩)।৩

(১) দেব—শাস্ত্রানুশাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি। অসুর—বিষয়াসক্ত বৃত্তি।

(২) দেবগণ অসুরকে এবং অসুরগণ দেবকে পরাজয় করিবার উপায় চিন্তা করে।

(৩) কহে।

চক্ষু উপাসনা করে উদ্গীথ ওঁকারে,
অসুর পাপেকে বিদ্ধ করয়ে তাহারে।
তাই চক্ষু পাপবিদ্ধ হ'লে এই হয়,—
দৃশ্য অদৃশ্য দুই-ই চক্ষু দেখে লয়। ৪।
শ্রোত্র (৪) উপাসনা করে উদ্গীথ ওঁকারে,
অসুর পাপেতে বিদ্ধ করয়ে তাহারে।
তাই কর্ণ পাপবিদ্ধ হ'লে এই হয়,—
শ্রাব্য অশ্রাব্য দুই-ই কর্ণ শুনে লয়।৫।
মন উপাসনা করে উদ্গীথ ওঁকারে,
অসুর পাপেতে বিদ্ধ করয়ে তাহারে।
তাই মন পাপবিদ্ধ হ'লে এই হয়,—
সৎ ও অসৎ চিন্তা মনেতে উদয়।৬।
মুখ্য প্রাণ উদ্গীথের উপাসনা করে,
অসুর নিষ্ফল হয় তাহার গোচরে।
পাষাণ খুঁড়িতে গেলে কোদালি যেমন,
অসুরও বিনষ্ট হয় এথানে তেমন।৭।
পাষাণে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র চূর্ণ হয় যথা,
প্রাণে জানি' (৫) পাপ করে, সেও হয় তথা।
পাপবিদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব যে করে
ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই মূঢ় হয় চিরতরে।
মুখ্য-প্রাণে জানি যেই সদা শুদ্ধ রহে,
সেইজন পাপবিদ্ধ কদাপিও নহে। ৮।
মুখ্য প্রাণ অনাসক্ত, পাপ-স্পর্শ হীন,
সুগন্ধ দুর্গন্ধ নাহি জানে কোন দিন।
নাসাবদ্ধ প্রাণ দোষী নাসিকার দোষে,
মুখ্যপ্রাণে কদাপিও দোষ নাহি বসে।
তাঁহার অশন যাহা, যাহা তাঁ'র পান,
প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে তিনি করে তাহা দান।৯।
মুখ্য-প্রাণ-বৃত্তি দুই, অন্ন আর পান,
এই দুই না পাইলে করেন প্রয়াণ।
মৃত্যুকালে এই দুই পাইবার তরে
মুখের ব্যাদান হয়, প্রাণ-ই তাহা করে।১০।

(৪) কর্ণ।

(৫) জানিয়াও।

উদ্গীথ অঙ্গিরা ঋষি কৈলা উপাসনা,
উদ্গীথ ওঁকার-ই প্রাণ, তাহার সাধনা
করিলেন ঋষি, তাই নাম অঙ্গিরস।১১।
অঙ্গ সকলের প্রাণ-ই মূলীভূত রস (৬)।১২।
বৃহস্পতি উদ্গীথের কৈলা উপাসনা,
প্রাণরূপী উদ্গীথের করিলা সাধনা।
বৃহতীর অর্থবাক্য, যিনি তা'র পতি
বৃহতীর পতি তিনি, তিনি বৃহস্পতি।১৩।
আস্য (৭) হ'তে বাহিরায় প্রাণ ; সে কারণ
প্রাণেরে আয়াস্য কহে। তাহার সাধন
করিলেন বলি' ঋষি আয়াস্য হইলা ;
প্রাণ ও উদ্গীথ, দুই-এ অভেদ মানিলা।১৪।
বক ও দালভ্য ঋষি জানিতেন প্রাণে,
উদ্গাতা হইলা তাই নৈমিষীয়গণে।
নৈমিষ অরণ্যবাসী ঋষি সকলের
ইচ্ছায় গাহিলা তাঁ'রা মহিমা প্রাণের।১৫।
প্রাণ আর উদ্গীথের অভেদ জানিয়া
কৃতকৃত্য হন জ্ঞানী, মহিমা গাহিয়া।
ওঁকারের আধ্যাত্মিক উপাসনা এই,
উদ্গীথের সেই গীত, ওঁকারেরও সেই।১৬।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীশশধর রায়।

(৬) অঙ্গ প্রত্যঙ্গই রূপ। অরূপ প্রাণ হইতে রূপ উৎপন্ন। "উৎপত্তির কারণ, স্থিতির হেতু ও প্রলয়ের নিদান"কে রস কহে। প্রাণই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে আপনার মধ্য হইতে গড়িয়া লয়। আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব অনুসারে, পুংকোষের ও স্ত্রীকোষের অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু (Nucleus) দ্বয় মিলিত হইয়া যে যুক্ত বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমে বিভক্ত হইতে হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ভ্রূণ গঠন করে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের যুক্ত বিন্দু বিভক্ত হইয়া, কি এক অনির্ব্বচনীয় নিয়মাধীনে, বিভিন্ন জীবদেহে পরিণত হয়। যে শক্তি এই বিভাগ-সাধন করে, সেই শক্তিই বিভিন্ন জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির প্রকৃত প্রকাশক। এই শক্তিই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া লয়। ইহাকেই মূলে মুখ্য প্রাণ বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রাণই অঙ্গ সকলের মূল কারণ। এই গুরুতর বিষয় সংক্ষেপে বলা কঠিন। কৌতূহলী পাঠক বর্ত্তমান সনের বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত 'নব্য-ভারতে' 'বস্তু ও অবস্তু' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ঐ প্রবন্ধে অরূপ হইতে রূপের উৎপত্তি বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অরূপ কি ? শক্তি। উহাই রূপবান জগতের মূল কারণ।

(৭) মুখ।

## শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। (২)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের জীবনী লিখিতে সক্ষম হই নাই। এক প্রেমোন্মত্ততা ভিন্ন, বর্ণন করা যাইতে পারে, তাঁহার জীবনে এপ্রকার প্রায় কোন চরিতাখ্যান নাই। মাত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমদনগোপাল সেবা প্রকাশ ও রেমুণাতে গোপীনাথ সন্দর্শন সম্বন্ধে যে একটা মনোরম ইতিহাস আছে, যাহা ভক্তগণের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই আনন্দ প্রসঙ্গ চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে এথানে উদ্ধৃত করা হইল—

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবৰ্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপ-বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লইয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥
পুরী এই দুগ্ধ লইয়া কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান।
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি এই ভাণ্ডটা লইব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি-লয়॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া
এক কুঞ্জে লইয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥
গ্রামের লোক আসি আমা কাঢ় কুঞ্জ হইতে
পৰ্ব্বত উপরে লইয়া রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করহ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবৰ্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥

কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ;
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির ॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥
আমার গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী
কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি ॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দ্বার যে করিতে ॥
শুনি তাঁর সঙ্গে লোক চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে ॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥
আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে ॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত-উপর গেলা ঠাকুর লইয়া ॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লইয়া।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা।
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণ গায় গীত।
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি অনাইল ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে ॥
তুলস্যাদি পুষ্প আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক ॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥
পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া ॥

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গঙ্গোদকে কৈল স্নান সমাপন ॥
শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল ॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল ॥
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বুল অর্পিল ॥
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবত করি কৈল আত্মসমর্পণ ॥
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতে হইতে চড়িল রন্ধন ॥
দশ বিপ্র অন্ন রাঁধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সূপ ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া, বড়ী, কাড়ি করে বিপ্রগণ ॥
জন পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥
তার পাপে রুটী-রাশি উপপর্ব্বত কৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিকে ধখিল ॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মাথনী সর পাশে ধরে আনি ॥
হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইলা সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধবগোসাঞি
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি।

একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল-প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃাটাটী দিয়া চারিদিক্ আবরিল।
উপরেই এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আবালবৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল॥
পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার॥
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবামধ্যে সবা নিয়োজিল॥
পুনঃ দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥
একেক দিন একেক গ্রাম লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া॥
রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকজন॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥
ব্রজবাসীলোকে কৃষ্ণের সহজে পিরীতি।
গোপাল সহজে প্রীত ব্রজবাসীর প্রতি॥

মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ-শোক॥
আশ পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন আসি করে মহামহোৎসব॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লইয়া লোক লাগিল আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার।
অসংখ্য আসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী একেক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
এইমত বৎসর দুই করেন সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন গিয়া নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞামাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লইল যতন করিয়া।
চলিল দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া।
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥

নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তমভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে॥
যৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে যোগাব॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলী নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥
হেনকালে সেই ভোগে ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ যদি অল্পে পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী করি নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর॥
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে॥
গ্রামের শূন্যহাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ।
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী হাটেতে বসিয়া।
তাঁহাকেও এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া॥

স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপী ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লইয়া।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীরে চাহিয়া॥
ক্ষীর লও এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভোজনে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈল শ্রীমাধবপুরী॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ হয় যথোচিত॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্ব্বলোকে শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
এত ভাবি রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
লোক আসি তারে করে বহু ভক্তি স্তুতি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া ।
কৃষ্ণভক্ত প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গড়াইয়া ॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ।
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন ॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত ।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত ॥
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥
রাজ পাত্র সনে যার যার পরিচয় ।
তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে ।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ॥
ঘাটে দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে ।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে ॥
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া ।
কত দিনে রেমুণায় উত্তরিলা সিয়া ॥
গোপীনাথের চরণে কৈলা বহু নমস্কার ।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার ॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল ।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥
সেই রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন ।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহে মাধব ।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥
গোপীনাথের আর আমার এক অঙ্গ হয় ।
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয় ॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে ।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥
এত বলি গোপাল গেলা গোসাই জাগিলা ।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥
ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন ।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥
পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন ।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন ॥
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া ।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত ।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা ।
নীলাচলে চতুর্ম্মাস্যে আনন্দে রহিলা ॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত ।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার ।
পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে কৃপা কৈল ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা ।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা ।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইলা ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল ।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল ।
চন্দন পরি ভক্ত শ্রম করিল সফল ॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন ।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন ॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া ।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥
ভোকে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায় ।
হেন জন চন্দনভার বহি লঞা যায় ॥

মোগেক চন্দনী তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ দূর পথ জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটিদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়য়ে মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝি তেঁহো আমা সবার নাহি অধিকার॥
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরী শ্লোকের সহিতে॥

তথাহি

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হইয়া ভূমিতে পড়িলা॥

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র কৃত এই প্রকার আরও কতকগুলি শ্লোক পদ্যাবলী গ্রন্থে আছে। এই সমস্ত শ্লোক যে প্রকার প্রেমভাবাত্মক, তদ্রূপ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরও পরিচায়ক।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি লোক-লীলা সমাপন করেন। নির্য্যান সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য—

ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিলেন "কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥"
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।

ভাগ্যবান ঈশ্বরপুরী এই গুরুসেবার ফলে, পরবর্ত্তী সময়ে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শিষ্য লাভ করিয়া অশেষ প্রকারে ধন্য হইয়াছিলেন। পুরী গোসাঞি—

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর॥

আর সেই প্রেমবৃক্ষের ছায়ায় অসংখ্য নর-নারী অনন্ত কালের জন্য একেবারে সুশীতল হইল।

সম্প্রতি পুরীগোস্বামীর রচিত বলিয়া যে একটী পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রচিত কিনা, তাঁহার কৃত পদ হইলে এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন সংগ্রহে গৃহীত হয় নাই কেন? ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার বিচার করিতে ইচ্ছা করি না। মাত্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নাম সংযুক্ত দর্শনে ভক্তিপ্রণতঃ চিত্তে শিরো-ধার্য্য পূর্ব্বক পাঠকবর্গের করকমলে উৎসর্গ

করিয়া অন্তকার জন্য এই প্রবন্ধের পরি-সমাপ্তি করিলাম।

সাজল ধনি   চন্দ্র বদনী
শ্যাম দরশ আসে।
সঙ্গিনীগণ   রঙ্গিনী সব
ঘেড়ল চারি পাশে॥
তরুণ অরুণ   যুগল চরণ
মঞ্জির তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী   পুঞ্জে পুঞ্জে
গুঞ্জরে মধু লোভে॥
কুম্ভে কুম্ভ   জিনি নিতম্ব
কেশরী খীনি মাঝে।
পরি নীলাম্বর   পট্ট অম্বর
কিঙ্কিনি তঁহি বাজে॥
বাহু যুগল   থির বিজুরী
করি শাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ   মণি কঙ্কণ
নখরে শশীখণ্ডে॥
হেমাচল   কুচ মণ্ডল
কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত   ধ্বান্ত দমন
কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জাম্বুনদ   হেম যুকত
মুকুতা ফল পাতি।
ফণি মণি যুত   দাম সহিত
দামিনী সম ভাতি॥
বিম্ব ফল   নিন্দি অধর
দাড়িম বীজ দশনা।
বেশর তঁহি   নলকে ঝলকে
মন্দ মন্দ হসনা॥
নাসা তিল—   ফুল তুল
কবরী করবী ছান্দে।
মদন মোহন   মোহিনী ধনি
সাজলী তঁহি রাধে॥
নব যৌবনী   চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্র পুরী   রচিত ভাষ
বর্ণি পূর্ণি পাটে॥

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

---

# আমাদের দলাদলি।

দলাদলিতেই দেশের সর্ব্বনাশ হইল। কথায় বলে "বারো হাঁড়ি তের চুলো", আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। দলাদলি যে আমাদের কত দিকে ও কত বিষয়ে অনিষ্ট করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্ম লইয়া দলাদলি,—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতিতে পরস্পর দা কুমড়া সম্বন্ধ। আবার এক এক সম্প্রদায় বহুধা বিভক্ত; কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। জাতি লইয়া দলাদলি। প্রথমতঃ বর্ণ চতুষ্টয়ই ধরুন, কোন বর্ণই কোন বর্ণের আয়ত্তাধীন নহে। আবার এক একটী বর্ণ এখন অসংখ্য উপবর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের সকলের সহিত সকলের খাওয়া দাওয়া, আদান প্রদান নাই। ধনী দরিদ্রে কেমন দলাদলি, ধনী দরিদ্রকে যেন তেন প্রকারেণ স্ববশে রাখিতে চায়, কিন্তু দরিদ্র তাহাতে নিতান্তই নারাজ। রাজা প্রজায় কিরূপ দলাদলি, তাহা কি আর বলিতে হইবে? প্রজা মাথার ঘাম পায়

ফেলিয়া, না খাইয়া, না পরিয়া, যদি বা কিছু সঞ্চয় করিল, অমনি শ্যেনসম রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তৎপ্রতি নিপতিত হইয়া ছলে বলে কৌশলে তাহার সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিল। পণ্ডিত যিনি, তিনি মূর্খের সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত, সুতরাং উভয়ের মতদ্বৈধ অনিবার্য্য নিবন্ধন দলাদলি। এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা আদৌ কাহারও ভাল বা উন্নতি দেখিতে পারেন না। কষ্টে-সৃষ্টে যদি কেহ আপনার বা সমাজের বা দেশের উন্নতির চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই সকল জীব অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতেও কদাচ কুণ্ঠিত হয়েন।

সহরেও কি কম দলাদলি! সেখানে বড়তে বড়তে মিল নাই, দলাদলি; ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে মিল নাই—দলাদলি; ছোটয় ছোটয় গরমিল, সুতরাং দলাদলি। পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই; পাড়ায় পাড়ায় এক একদল, গ্রামে গ্রামে দুই দশটা দল; এক দলের সহিত আর এক দলের মতভেদ; এমন কি, একজাতীয় হইলেও আহারাদি সম্পর্ক-রহিত। আবার গাঁয়ে গাঁয়ে কতকগুলি করিয়া নিষ্কর্ম্মা লোক আছে, তাহারা দল ভাঙ্গা দূরে থাকুক, দল পাকাইতে বড়ই মজবুত। এই সকল ঘৃণ্য জঘন্য জীবের জন্য পাড়াগাঁয়ে বাস করা এখন এক বিষম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীবাসী যাঁহারা সহরে বাস করেন, তাঁহারা এই দলাদলির জন্যই পল্লীগ্রামে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত। আগে পল্লীগ্রামে সমবেত চেষ্টায়, সমবেত উৎসাহে, সমবেত যত্নে, কত সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, এখন তাহার নাম গন্ধও নাই। যদি বা বারোয়ারি প্রভৃতি সাধারণ আনন্দ-জনক কার্য্য কোথাও অনুষ্ঠিত হয়, দেখিবে সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে না হইতেই দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে এত দলাদলি, এমন মন-কষাকষি, এরূপ মনোমালিন্য, সেখানে কিরূপে ভদ্রস্থতা লাভ সম্ভব?

আজকাল দেশের সকল সৎ ও শুভ কার্য্যের অবলম্বন ও মুখপাত্র—বিলাত-ফেরত ব্যক্তিবৃন্দ। যখনই কোন দেশহিতকর কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই আমরা তাঁহাদের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি; কিন্তু দল বাঁধিয়া ঘরের ছেলেকে পর করিতে, আপনার জনকে অন্যজন ভাবিতে, উপকারীকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইয়াছি কি? সমাজে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য তোমাদের মৃত শাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হইলেও তোমরা পায়ে ঠেলিতে কসুর কর কি?

নাগপুরে কংগ্রেসের বৈঠক বসিল না কেন? রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক মিল হইতেছে না কেন? বলিতে পার কি? অর্থাভাব নিবন্ধন আমার কন্যার ৮ম, ৯ম, বা ১০ম বৎসরে বিবাহ দিতে পারিলাম না, অমনই তোমরা দল বাঁধিয়া আমাকে 'এক ঘরে' করিলে। সে দোষ আমার, না সমাজের? তোমরা এমনই হৃদয়হীন যে, পাপস্রোতে নিমজ্জিত সমাজের দোষ না দেখিয়া আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করতঃ আমার ধোবা নাপিত পর্য্যন্ত রহিত করিলে! হায় হায়! ইহারই নাম সমাজ! এই সমাজের উন্নতির জন্যই আবার আমরা লালায়িত! যে সমাজের প্রাণ নাই, সে সমাজের শুভ কি সম্ভব!

একজনের বাল বিধবা শিশু কন্যা একাদশীর দিন রোগের যন্ত্রণায়, তৎতোধিক পিপা-

সার যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ায়, স্নেহপ্রবণ পিতা, কন্যার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, এক বিন্দু জল যেমন তাহার মুখে দিলেন, অমনই সেই কথাটী রূপান্তরিত, ভাবান্তরিত, সজ্জিত রঞ্জিত হইয়া মেয়ে ও পুরুষ মহলে কতই না তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। দেখা গেল, দুই এক দিন যাইতে না যাইতেই, রোগিনী অন্ন পথ্য করিতে না করিতেই তোমরা, গুণধর সামাজিকেরা, বিপন্ন পিতার অন্য কিছু খাওয়া দূরে থাকুক, হুকার তামাক খাওয়াও বন্ধ করিলে! বলি এই কি সমাজনীতি—না ইহারই নাম ধর্ম্মনীতি!

যাঁহারা দেশের উন্নতির, উপকারের, শিক্ষার গুরুভার মস্তকে লইয়া সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলির প্রকোপ নিতান্ত কম নহে। সাধারণ হিতজনক কার্য্যেও কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। আবার মতানৈক্য কি মনে মনেই থাকে? তাহা নহে, সময় সময় তাহা এত দূর গড়ায় যে, কবির খেউড়ে পরিণত হইয়া ছড়া কাটাকাটী চলিতে থাকে। হায়রে দেশ! হায়রে সমাজ!

ফলতঃ দলাদলিতেই দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দেশে এত শিক্ষার বিস্তৃতি, সমাজে এত শিক্ষিতের সংখ্যাধিক্য, তথাপি দলাদলি মিটিতেছে কৈ? স্থান বিশেষে দলের বাঁধন যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দৃঢ় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, এই জ্ঞান বিজ্ঞানের, সভ্যতা ভব্যতার যুগেও যখন দলাদলি মিটিল না, তখন আর আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই দলাদলির অন্তরায়েই আমাদের অনেক শুভ ও দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন সংঘটিত হইতেছে। এই দলাদলি ও পরস্পর মনোমালিন্যের ভয়ে অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা দেশের কার্য্যে আত্ম নিয়োজন করিতে না পারিয়া মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছেন। এ সকল বিষয় কেহ ভাবিয়া দেখে না, অথবা দেখা আবশ্যক মনে করে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে বাধা বিঘ্ন, অশান্তি অসন্তোষ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদ উৎপাদিত হইয়া আমাদিগকে দূরে পশ্চাতে হটাইয়া দেয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, সকল দেশে, সকল সমাজেই দলাদলি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তদুত্তরে আমরা বলিব, অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য সমাজের তুলনায় আমরা এখন অনেক পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছি এবং শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতেও হীন হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং আমাদের এখন দলাদলিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য। আবার আমাদের দেশের দলাদলি সময় বিশেষে এমনই বদ্ধমূল হয় যে, পরস্পর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হইয়া যায়। এমনও দেখা যায় যে, অনেক দেশের দলাদলি যখনকার তখন এবং যেখানকার সেইখানেই আবদ্ধ থাকে। আমাদের কিন্তু তদ্বিপরীত। আমাদের দলাদলি একবার বাধিয়া গেলে আর তাহার মূলোৎপাটন সহজসাধ্য নহে—ক্রমশঃই তাহা স্ফুলিঙ্গ হইতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়।

দেশের ও নিজেদের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ উহার উন্নতি সাধিত করিতে এখন আমাদের দেশের অনেকেই আন্তরিক যত্নবান। কিন্তু এই দলাদলির জন্যই তাঁহারা অনেক সময় ব্যর্থমনোরথ হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ

হীন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমবেত চেষ্টা, সমবেত শক্তি, সমন্বিত যুক্তি পরামর্শ ভিন্ন কোন রূপেই আমরা আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না। পরস্পর একমত ও একপথাবলম্বী না হইলে আমাদের গত্যন্তর নাই। সেই জন্যই সময় সময় মনে হয়, অন্ততঃ দেশের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, হিতৈষী ও নেতৃবর্গ দলাদলি ভুলিয়া, সকলে একই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া—একই উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া—একই গন্তব্যপথে পদার্পণ করিয়া ও একপ্রাণতা অবলম্বন করতঃ দেশের ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত হউন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত লইয়া কখনও কোন কার্য্যে কৃতকার্য্যত্ব লাভ করিতে পারিবেন না, উপরন্তু দলাদলির সৃষ্টি হইবে। আর সকল কার্য্যে বা সকল সময় নিজের জেদ বজায় রাখিব বা নিজের মত চালাইতে চেষ্টা করিব, অথবা আত্মপ্রাধান্য অক্ষুন্ন হইতে দিব না, এরূপ ইচ্ছা বা অভিলাষ নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও কর্ম্মহানি-জনক।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

---

# স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসু।

বিক্রমপুরে যে সমুদয় কৃতীপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শীর্ষোক্ত বসু মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে ১৮ ৪ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে ইঁহার জন্ম হয়। এই মহাত্মার পিতার নাম ৺শম্ভুচন্দ্র বসু। মালখানগরের বসুবংশ বিক্রমপুরে বিশেষ সম্মানিত এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইঁহারা বিক্রমপুরবাসী। এই বংশের আদি পুরুষ ৺দেবীদাস বসু ঢাকা প্রদেশের নাওয়াড়া মহলের কানুনগো ছিলেন এবং তাঁহার কাছারীর জন্য মালখানগর গ্রামে তিনি এক 'সেঘরা' অর্থাৎ অর্থাৎ তিন কামরাযুক্ত এক ইষ্টক-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সেঘরার মধ্য দ্বারের উপরিভাগে তিনখানা বাঙ্গালা ভাষায় খোদিত ইষ্টক-ফলক ছিল, তাহার একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট দু'খানিতে যাহা লিখিত আছে, আমরা এস্থানে তাহার অবিকল অনুলিপি প্রদান করিলাম।

নং ১

বাদসাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর আমলে নওয়াব আমিরুল ওমরা দেওয়ান বাদসাহ হাজিসফি খাঁ শ্রী * * * * * * *

নং ২

শ্রীগোবিন্দচরণ আসবন্দ শ্রীদেবীদাস বসু কানোনগোই নাওয়াড় এতমাম শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবিশ সন ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র।

এই কৃষ্ণাই খাসনবীশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ সেনের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। কৃষ্ণজীবন প্রথমে দেবীদাস বসু ঠাকুরের বাড়ী মোতালকের গোমস্তা ছিলেন, পরে তাঁহার অধীনে নাওয়াড়া দপ্তরের হেড মুহুরির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বসুগোষ্ঠি দুই শত বৎসরেরও ঊর্দ্ধ কাল মালখা-

নগরে বাস করিতেছেন। দেবীদাস বসু যখন মালখানগরে বাটী নির্ম্মাণ করেন, তখন দিল্লীর তক্তে ঔরঙ্গজেব ও ইংলণ্ডের সিংহাসনে দ্বিতীয় চার্লস অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ সহর সংস্থাপিত হয় নাই। মালখানগরে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে বসুগণ ঢাকা নারান্দিয়াতে বাস করিতেন। ঢাকায় এখনও বসুদের ভূসম্পত্তি আছে এবং তাঁহাদের দ্বারা সংস্থাপিত বাজার বাবুর বাজার নামে পরিচিত। বসু বংশের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গিরিশ বাবুর মাতুল স্বর্গীয় রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও সুবক্তা ৺মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পিতা। রামলোচন বাবু বহুকাল পর্য্যন্ত নদীয়ার সদর-আলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাতুল রামচন্দ্রের অন্নেই গিরিশচন্দ্র প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর বয়স যখন কেবল আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতুল রামলোচন বাবু ভাগিনেয়কে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধাবী গিরিশচন্দ্র স্বকীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে যথাসময়ে হিন্দুস্কুল হইতে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাৎকালীন কলেজের চল্লিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু দৈব দুর্বিপাক বশতঃ তিনি কেবল এক বৎসর কাল এই বৃত্তিভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ এ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সাংসারিক বিপর্য্যায় হেতু অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া ইঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার গিরিশ বাবুর অত্যন্ত মরণাপন্ন পীড়া হয়, হেয়ার সাহেব এ সময়ে অনবরত ষোল রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রায় থাকিয়া বিশেষ স্নেহের সহিত প্রিয়তম ছাত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে গুরু-শিষ্যের মধ্যে এতাদৃশ নৈকট্য সম্বন্ধ অতিশয় বিরল।

গিরিশ বাবু ছাত্রজীবনে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভবিষ্যত জীবনেও তাহার কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় নাই। ছাত্রাবস্থাতেই ইনি ইংরেজীতে ও বাঙ্গালাতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সে সময়ে কলিকাতা হেদুয়ার নিকটস্থ সিমলা-নিবাসী ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে "হিন্দু-ইন্টেলিজেন্সার" নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশে ইহাই সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী সংবাদ পত্র এবং ইহাতেই সর্ব্বাগ্রে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। প্রথিতযশা স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্র ইহার কতিপয় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। গিরিশ বাবু মফঃস্বলে থাকিয়া এই পত্রেরও সহকারী সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশে ইংরাজী পত্রিকার প্রচারক ও সম্পাদক বলিয়াও ইহাঁর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়া উচিত।

তৎকালে ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ইনি যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায়ও তিনি তদ্রূপ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তখন গুপ্ত কবির রাজত্ব, উত্তরকালের প্রসিদ্ধ লেখকগণের

নিবন্ধাদির সহিত ইঁহার বহু প্রবন্ধও ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর" ও "রসরাজ" পত্রে প্রকাশিত হইত।

সে বিপ্লবের যোগে পাঠাবস্থায়ই খ্রীষ্টান-মিশনরীদের সহিত গিরিশ বাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতানৈক্য হয়। তৎকালে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মনিষ্ঠ 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রচারক স্বর্গীয় মহাত্মা রাধাকান্ত দেবকে উদ্দেশ করিয়া একখানা ব্যঙ্গ নাটক প্রণয়ন করেন। গিরিশ বাবু এই নাটকের উত্তর স্বরূপ একখানা সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তদীয় সহোদর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিপ্রদাস বাবুকে উপযুক্ত মুষ্টি যোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিখ্যাত মিশনরী ডফ্ সাহেব তাৎকালীন বিখ্যাত হরকরা পত্রে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করেন যে, "তিনি একজন হিন্দু বালককে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুগণ তাঁহাকে মারধর করিতে চাহে। গিরিশ বাবু এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে "ম্যাক বাম্বু" নাম সহি করিয়া এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইনি পাঠ্যাবস্থার পরে গবর্ণমেণ্টের বহু বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন দেশব্যাপী নীলের গোলমাল এবং চতুর্দ্দিক বিপর্য্যস্ত, তখন ইনি কৃষ্ণনগর এলাকায় দারোগা ছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে সে সময় "কৃষ্ণনগরের চাষা" স্বাক্ষরিত যে সমুদয় চিঠি পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ইঁহারই, লিখিত।

১৮৬০ খ্রীঃ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে কিছুকাল মুর্শিদাবাদের নবাবের 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' ও স্বর্গীয় মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

"নবজীবন" পত্রে ইঁহার লিখিত "সেকালের দারোগার কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতিশয় চিত্তাকর্ষক, ইহাতে তাৎকালীন সামাজিক রীতি নীতির সহিত চোর ডাকাতের ঘটনাগুলি অতিশয় সরল ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত "সিরাজউদ্দৌলা" সম্বন্ধে "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক রূপে ইঁহার কয়েকটী অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর চিকিৎসার্থ যখন ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখান হইতে "শক্তি" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের অনুৎসাহে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি অতি নিরহঙ্কারী ও অমায়িক স্বভাবাপন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও ইঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন অপরাহ্নে ঢাকার 'নর্থব্রুক হলে' গমন করিয়া সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতেন এবং খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তকাদি গৃহে আনিয়া পাঠ করিতেন। নিজকে প্রকাশ করিতে ইনি বড়ই সঙ্কুচিত হইতেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য ইঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই মহাত্মার চেষ্টায় মালখানগর গ্রামে উচ্চ

ইংরেজী বিদ্যালয় ও পোষ্টাফিস এবং বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে ইনি ঢাকা নগরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরিশ বাবুর ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য, তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা সমুদয় রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত। মালখানগর বিদ্যালয়ে ইহাঁর তৈল-চিত্র রক্ষিত আছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

## উচ্ছ্বাস।*

১

হে কবি, কল্পনা-হারা! হে শশাঙ্ক, সুধা-হারা!
হে সুহৃদ্, শোক-ভগ্ন প্রাণ!
তব গৃহাঙ্গন-তলে ধ্বনে কার রুদ্র বলে
দুরাধর্ষ সংহার-বিষাণ?
আলিঙ্গি পাদপে সুখে উঠেছিল ঊর্দ্ধমুখে
পুণ্যময়ী পুষ্পিতা বল্লরী,
কোন্ কাল-বৈশাখের সুনির্ম্মম সান্ধ্য-ঝড়
দিল তারে আজি ছিন্ন করি?
সুধা-স্রাবী সপ্ত-স্বরা মুগ্ধ করি বসুন্ধরা,
দিতেছিল উদাত্ত ঝঙ্কার,
কার বজ্র-কর-স্পর্শ গ্রাসি প্রাণ-মন-হর্ষ,
ছিন্ন করি দিল সর্ব্ব তার?
বসন্ত না ফুরাইতে কে নিষাদ অলক্ষিতে
বসন্ত-সুহৃদে সংহারিল?
কাল-শক্তি কার হায়, গন্ধময় মন্দ বায়
অকস্মাৎ ফিরাইয়ে দিল?
সুবর্ণ পিঞ্জর হতে তস্কর কে কোন্ পথে,
শুক-মুগ্ধা সারী নিল হরি?
এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্প এক, কে দুর্নীত,
দৃপ্ত-পায় গেল পিষ্ট করি?
মুহূর্ত্তেকে দিল থামাইয়া?
না হতে অর্চ্চনা শেষ কে নির্দ্দয় ছদ্ম-বেশ,
প্রতিমারে গেল বিসর্জ্জিয়া?
ভ্রাম্যমান বিশ্ব-গতি কে দুরন্ত ক্ষিপ্ত মতি,
মুহূর্ত্তেকে দিল থামাইয়া।
আঁধার বন্ধুর বীথি না হ'তে অদ্যাপি ইতি,
দীপ্ত দীপ কে নিল কাড়িয়া?
রামের হৃদয়-মণি কোন্ দুষ্ট রক্ষঃ-শনি
শূন্য-পথে ধায় আকর্ষিয়া?
ধূর্জ্জটির শিরঃভূষা সর্ব্ব বিশ্ব-তাপ-নাশা
ভক্তাধীনা দেবী সুরধুনি,
অর্দ্ধপথে আজি তাঁয় করিল গণ্ডূষ হায়
উগ্রতপাঃ কোন্ জহ্নু মুনি?
কার অভিশাপ ফলে আজ দীপ্ত চিতা জ্বলে
ভস্ম করি কবির কুটীর?
চির-ফুল্ল কুঞ্জবনে উচ্ছ্বসিত কি কারণে
মর্ম্মভেদী নয়ন-রুধির?
কৃষ্ণ-অষ্টমীর নিশি অম্বরে রহিতে শশী
অকস্মাৎ লইল বিদায়—
কি দিব সান্ত্বনা তোমা হে জ্ঞানিন্, শুদ্ধমনাঃ!
বজ্রাহত হেরি স্তব্ধপ্রায়!

২

স্নেহময়ি, প্রেমময়ি! দয়াময়ি, হাস্যময়ি!
সতি, সাধ্বি, পতিব্রতা অয়ি!

* পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী আমার অগ্রজ-প্রতিমা স্নেহশীলা ভগ্নী সরলাবালার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

কোন্ সে আনন্দধামে লভিবারে প্রাণারামে
গেলে তীব্র রোগ-জ্বালা সহি !
রোগানল পরীক্ষায় আজি কি উত্তীর্ণা হায়,
বিশুদ্ধা, পবিত্রা, অয়ি সীতা ?
আজি কি অমরবৃন্দ ভুলি সর্ব্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
গাহে তব সুবন্দনা-গীতা ?
প্রীতিময়ী দেববালা ফুল্ল পারিজাত-মালা,
কণ্ঠে তব দিল দোলাইয়া ?
সে আনন্দপুরী মাঝে আজি কি উৎসব রাজে ?
দেব-শিশু ভ্রমে কি নাচিয়া ?
শান্তি-স্নিগ্ধ বক্ষে তব যে অমৃত অভিনব
লভি কবি ছিল আত্মহারা,
সেথা কি অমৃতময়ি ! আজিকে তোমারে পাই,
ছুটে সেই অমৃত-ফোয়ারা ?
পুণ্যময়ী মাতৃ-ক্রোড় পুণ্যবতি ! আজি তোর
হয়েছে কি বিশ্রাম-ভবন ?
নন্দনের মন্দ বায় ওই দিব্য দেব-কায়
স্নেহচ্ছলে করে কি বীজন ?
আজি কি পড়িছে মনে এ সুদূর মর্ত্ত্য-জনে,
পতি সুতা আত্মীয়-আত্মীয়া ?
অভাগ্য কনিষ্ঠে এই সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ নেই ?
অশ্রু তার দিবেনা মুছিয়া ?
তোমার সুষমা * মণি ! চির আদরের খনি
শুভ্র ক্ষুদ্র সুকুমার বেলা,
কোন্ জননীর বুকে তাহারে সমর্পি সুখে
তুমি আজি চলিলে একেলা ?
মোর রচাদর্শ প্রিয় 'কবিগৃহ' † রমণীয়
তুমি ছিলে প্রাণ-লক্ষ্মী তার,
আজি সে যে তোমা বিনা, গাম্ভীর্য্য-সৌন্দর্য্যহীনা
মর্ম্মশোকে করে হাহাকার !
ছন্দময়ি, গীতময়ি ! কবির আরাধ্যা অয়ি !
'ভাই' বলে ডাক একবার !

* কন্যা শ্রীমতী সুষমাময়ী।
† আমার "অঞ্জলি" কাব্যের "কবিরগৃহ" শীর্ষক কবিতা।

বিশ্বময়ী সাথে তোমা সারা বিশ্বে হেরি ভূমা
'দিদি' বলে মুছি অশ্রুধার !

৩

মহা কাল সত্রে প্রিয়া আজিকে আহুতি দিয়া
হে শশাঙ্ক ! হে প্রেম-নির্ঝর !
মহা ভাব-যোগ মাঝ মগ্ন তবে হও আজ,
সতী-হারা যথা দিগম্বর !
'স্বর্গে মর্ত্ত্যে'কি সম্প্রীত'সিন্ধু-শৈল'ব্যোম-গীত *
এতদিন গে'লে কল্পনায়,
নির্ম্মম সত্যের প্রায় বরি' আজি লও তায়,
স্বপ্নময় জীবন-বেলায় !
হোমানল-শুদ্ধ বীণা, নহে আজি নহে দীনা,
নহে শুধু জল্পনা-সম্বল !
গাও আজি হেন গীত বিশ্বের ধারণাতীত
শান্তি তৃপ্তি বিলায়ে কেবল !
তোমার 'প্রেমের জয়ে' † আঁকিয়াছ বনাশ্রয়ে
সাবিত্রীর পতি-প্রাণ-দান !
আঁক এবে ওগো কবি ! রুরু-প্রমদ্বরা-ছবি
প্রাণ দিয়ে প্রাণের আহ্বান !
জান তুমি, জান কবি ! চিরোজ্জ্বল-প্রেম-রবি
অস্তাচলে নাহি যায় কভু,
বিশ্ব যদি পলে পলে মিশে যায় ধূলি তলে
অক্ষয় অজেয় প্রেম তবু !
যে অনন্ত প্রেম-দেশে প্রেমময়ী গেল শেষে
নাহি সেথা বিচ্ছেদ-মিলন !
প্রেমময়ী মাতৃ-বুকে অফুরন্ত প্রেমে সুখে
জ্ঞান-হারা আত্ম-বিসর্জ্জন !
প্রেম যজ্ঞ সিদ্ধ করি সারা প্রাণ-মণ ভরি
উঠিয়াছে পুণ্য চরু আজ !
স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্তর !— ধন্য তুমি কবিবর !
ধন্য তব সুহৃদ সমাজ !

* শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহনের রচিত কাব্য চতুষ্টয়। "ব্যোমসঙ্গীত" এবং "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।
† শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহনের অপ্রকাশিত নাটক।

তপস্যা-নিরত ওগো! যোগের সাধক ওগো!
ওগো মোর সহযাত্রী-সখা!
অতি ঊর্দ্ধ যোগ-স্তরে তোমার সঙ্গীত-স্বরে
আজ তাঁর' পাব যে গো দেখা!
জানি সৌম্য! গা'বে তুমি, ধন্য তুমি! ধন্য তুমি
ধন্য তব মঙ্গল বিধান!
ধন্য তব স্বর্গলোক! ধন্য প্রেম জয়-শ্লোক!
ধন্য তব জন্ম-মৃত্যু-দান!

শ্রীজীবেন্দকুমার দত্ত।

---

## অমর বিদায়।

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!
পোহাইলে সুখ রাতি,
যে হবে অযোধ্যাপতি
যোগীর বল্কল বাস
তারে কি সাজায়?
অভিষেকে নির্ব্বাসন,
বোধনেতে বিসর্জ্জন,
পূর্ণিমায় অমানিশি,
নূতন ধরায়।
শ্রীরাম যায় গো বনে,
সীতা লক্ষণের সনে,
জগত-সজ্ঞান আঁখি
থমকি দাঁড়ায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখি জল
ললিত গাথায়!
অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

২

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূরের সাথে
হরি গেল মথুরাতে,
শ্যাম-সোহাগিনী রাধা
ধূলায় লুটায়,
গাহেনাক শুক সারী,
অধীর যমুনা-বারি,
শ্যামলী ধবলী আহা
তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালাগণে
চাহি তমালের পানে,
ভাসান কলসী কোথা
ফিরিয়া না চায়!
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে যে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়!
অমর বিদায় ওযে,
অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

৩

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!
বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি
লভিতে চলেন আজি
"মৃত্যু জরা, বার্দ্ধক্যের"
প্রশম উপায়,
মায়ার বন্ধন টুটি'
বিশ্ব পানে যান ছুটি'
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'
বুঝাতে সবায়।
কাঁদে রাজা 'শুদ্ধোধন',
কাদে 'গোপা' অনুক্ষণ,
কাঁদিছে 'কপিল বস্তু'
পাষাণ হিয়ায়,

যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়!
অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

৪

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!
কাঁদাইয়া শচী মারে,
আঁধারিয়া নদিয়ারে,
নিমাই সন্ন্যাস লয়
আজি কাটোয়ায়,
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার,
হাত নাহি উঠে তার,
কে দিবে সাজায়ে দণ্ডী
রাজার রাজায়!
গোরার প্রেমাশ্রু জলে
কঠিন পাষাণ গলে,
ডুবু ডুবু শান্তিপুর
'নদে' ভেসে যায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়!
অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

৫

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!
ওই ক্রুশে আরোপিয়া,
বধিছে যন্ত্রণা দিয়া,
নরের যাতনা-হারী
নর-দেবতায়,
বহিছে শোণিত-ধার
নাহি দুখ ক্লেশ তাঁর,
বেদনার সাধ্য কি যে
পশে সে হিয়ায়!
যীশু শুধু উর্দ্ধমুখে,
জগত পিতারে ডেকে,
বলেন "ক্ষমিও পিতা,
অবোধ সবায়"।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।
অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

৬

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়।
'কোরেশের' অত্যাচারে
ওই চলে যায় দূরে
ইরম্মদ 'মহম্মদ'
পূর্ণ মহিমায়,
ওরে ওযে সর্ব্বত্যাগী,
ডরে না প্রাণের লাগি,
ঘুচাতে তোদেরি দুখ,
এসেছে হেতায়।
দিতে এসেছিল ধরা,
তখন চেনেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি
পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি কবি,
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।
অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ।

## জাগরণ।

[Represents the political regeneration that came with the partition of Bengal ]

১

আমার পুরাণ ভাঙ্গা ঘরে
কে আনিলি চাঁদের আলো ;
এত দিনের পরে আবার
কে আমায় বাসিলি ভালো।

২

আকাশ ভরা মেঘে ঘেরা
কোন গোধূলির তিমিরে,
শুয়েছিলাম আপন নিয়ে
আমার বিজন কুটীরে।

৩

কত নিশার শিশির ধারা
বয়ে গেছে মাথার পর ;
জ্বলে গেছে আগুন মাখা
কত দিবার প্রখর কর।

৪

গে'য়ে গে'ছে কত পথিক
কত শোকের রাগিণী ;
আমার কাণে বাজেনি তা',—
আমি ত তায় জাগিনি !

৫

আজকে হঠাৎ জেগে দেখি
চারিদিকে চাঁদের হাসি !
কেরে দীনের কুটীর ভরে
ছড়ালে এ মানিক রাশি !

৬

সুপ্ত ছিলাম দূরে রেখে
বন্ধুবিহীন ধরাতল,
জেগে দেখি কুটীর ঘরে
কোটী ভা'য়ের কোলাহল !

৭

কোটী কণ্ঠে অমর মন্ত্রে
শুনি একি অভয়বাণী !
কাঙ্গালিনী মা কৈ আমার ?
মা যে আমার বিশ্বরাণী।

শ্রীযশোদালাল বণিক্, বি এ।

---

## লক্ষ্মীপূজা।

ভোরের বেলা যাচ্ছি একা বক্রগ্রাম্য পথে,—
দু' ধারেতে বেণুবনে,
ফিস্ ফিস্ ফিস্ মৃদু স্বনে
কইছে কথা কিযে ভাবে জানিনা কার সাথে,
ভোরের বেলা যাচ্ছি একা বক্র গ্রাম্য পথে !
অশোক বকুল গাছের সারি,
ফুলের গন্ধে আমোদ ভারি,
গুনগুনিয়ে খুঁজছে মধু অলি লাখে লাখে,
'বউ কথা কও' ডাকছে পাখী সহকারের শাখে।
গাছের শাখে সোণার আলো,
ঝিকি মিকি শুভছে ভালো,
কালো জলে পুকুরের সোণার পুষ্পরথে,
ভোরের বেলা যাচ্ছি একা বক্র গ্রাম্য পথে।
'সাপলা' ফুল ঠমক করি,
এক ধারেতে আছে সরি,
কমল কিন্তু গরবভরে হাসিভরা মুখে।
হাঁসগুলি সব ভেসে বেড়ায় রাজার মত সুখে।
ডাহুক ঘোরে পানার পরে,
বকটী ব'সে ঝোপের ধারে,
শান্ত সরল শিশুর দল খেল্‌ছে মনের সুখে,
ভোরের বেলা যাচ্ছি একা বক্র গ্রাম্য পথে।
পুকুর পাড়ে বটের ছায়,
ছেলে মেয়ে দৌড়ে ধায়,
কচিমুখে সোণার হাস, কিসের কুতূহলে ?
কিসের এত জাঁকজমক বা কেন দলে দলে ?
ফুলের মালা গলায় পরে
ফুলের মুকুট শিরে ধরে,
সোণার তনু ফুলের সাজে সাজিয়ে কে মেয়ে ?
আকাশ পানে উদাস প্রাণে রহিয়াছে চেয়ে !
এক হাত ভরা সোণার ধানে,
অপর হাতে অভয় দানে
সোণার ধানে পূজছে তারে পাড়ার শিশুদলে,
অবাক হ'য়ে পান্থ আমি দাঁড়িয়ে কুতূহলে।
মনের সুখে শুধাই সবে
"কিসের পূজো হেথায় হবে ?
অজ্ঞান আমি বুঝতে নারি, বুঝিয়ে দেনা তোরা ?
একটী শিশু হেসে বলে,
বুঝতে নারো, বুড়ো ছেলে ?
এযে লক্ষ্মী মায়ের করি পূজা, দুর্ভিক্ষ যাবে চলে,
সোণার ধানে ভরবে যে মাঠ কৃষাণ দলে দলে
দু'মুঠো সবে খেতে পাবে,

অন্নের অভাব ঘুচে যাবে,
ধানের চাষে মাতুবে হেসে দেশের যত ছেলে,
এযে নূতন করে লক্ষ্মীর পূজো এল ধরাতলে!
স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেলো,
নয়ন কোণে জল যে এলো,
কোলে নিয়ে বল্লুম তারে ধন্য তোরা সবে,
সোণার ধানে মায়ের পূজো, সেদিন ফিরে হবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। হিন্দুধর্ম্ম। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য ।৶০। হিন্দুসভা হইতে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্র হইতে এই উপাদেয় গ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিয়াছেন। সাধনার রাজ্যে ইহা অতীব প্রয়োজনে আসিবে। আশা করি, এই পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে। মূল্য অতি সুলভ।

৩৭। মনোজবা। কাব্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী প্রণীত, মূল্য ৸০ : ৮৮টী বিবিধ সন্দর্ভ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পিতৃপদে সমর্পিত। পিতৃভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। লেখিকার ক্ষমতার পরিচয়ে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। বিধাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৩৮। আমিষ ও নিরামিষ আহার। তৃতীয় খণ্ড। আমিষ খণ্ড। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত, মূল্য ৩৲। ৭১৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৫২৬ পৃষ্ঠায় পুস্তক পরিসমাপ্ত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই। গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত। ১৪৯৪ প্রকার রন্ধন-প্রণালী এই সুবৃহৎ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইতে হয়। এরূপ সুবিস্তৃত সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। দেবী প্রজ্ঞাসুন্দরীর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যে অভাব দূর হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নয়। তিনি গৃহিণীদিগকে সুনিপুণা করিবার জন্য কয়েক বৎসর যাবত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তুলনা-রহিত। তাঁহার অতুল যত্ন-প্রসূত গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব। অতি গৌরবের ঠাকুর পরিবারের ইহা অতি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

৩৯। ভারতে যুবরাজ। শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ।০। রাজভক্তির নিদর্শন। কিন্তু গ্রন্থকার সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যথা—

"শুনে! যুবরাজ! ভারত-ভাণ্ডার,
লুটিয়া যদ্যপি সর্ব্বস্ব তাঁহার,
না নিতে তোমরা আপন দেশে,
তাহা হ'লে আজি, আসিয়া হেথায়
রত্ন-প্রসবিনী জননীকে হায়!
দেখিতে হ'তো না এহীন বেশে।"

৪০। বঙ্গবিলাপ। মূল্য ।৶০। উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। অনেক দুঃখের কথা গ্রন্থকার এই কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু আশাহত নহেন;—যথা—

"অবশ্য হইবে, এসো সর্ব্বজন,
হয়ে একপ্রাণ হয়ে একমন,
কর্ত্তব্যের ভার মস্তকে লহি,—
বাক্য আড়ম্বর, করি পরিহার,
আত্মশক্তি সবে করিয়া সঞ্চার
শুধু কর্ম্মময় জীবন বহি।
কেন পারিব না, আমরা সকলে
বাঁচাইতে আজি সাধনার বলে
আমাদের চির স্নেহের মায়?
বিধাতৃ-ন্যায়ের জগতের তলে
জীবশ্রেষ্ঠ এই মানবমণ্ডলে
আমরা কি কেহ নহিকো হায়!

প্রার্থনা করি গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৪১। উদ্বোধন ৵৫। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মলাটে আছে 'আমরা—

শিখিব আপন শাস্ত্র,
পরিব আপন্ বস্ত্র
ধরিব আত্ম অস্ত্র
করিতে আপনা রক্ষা।'

ইহা অতি সুন্দর কথা।

৪২। ছেলেদের গল্প। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। মূল্য।৶০। এই গ্রন্থে দুটী গল্প আছে। একটী গল্প ইংরাজী গল্পের অনুবাদ। অমৃত বাবুর ভাষা সরল এবং মধুর। বালক বালিকাদের বিশেষ উপকার হইবে।

# জাতীয় বিলোপ।*

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানবজাতির কতিপয় শাখা প্রশাখা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক রূপে চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। হাম্‌বোল্ট দক্ষিণ আমেরিকায় একটী টিয়া পাখী দেখিয়াছিলেন, সে এক বিলুপ্ত জাতির ভাষার একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাচীন স্তম্ভ এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল স্থানের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সকল স্তম্ভ এবং দ্রব্যাদি যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও জন-সমাগম-বিরহিত স্থানে এখনও কতিপয় ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন (মানব) জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা কোন কোন প্রাচীন জাতির লুপ্তাবশেষ মাত্র। স্ক্যাফ্‌ হসেন্‌ (Scaffhausen) বলেন, ইউরোপীয় প্রাচীন জাতি সকল বর্ত্তমান অসভ্যতম মানব অপেক্ষাও অনুন্নত ছিল। সুতরাং তাহারা বর্ত্তমান জাতি সকল অপেক্ষা, কোন কোন অংশে, পৃথক ভাবাপন্ন ছিল। অধ্যাপক ব্রোকা লিছ ইজিস্‌ (Les Eyzies) স্থান হইতে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যদিও সম্ভবতঃ একটী পরিবারের দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহা হইতে (প্রায়) মর্কট ভাবাপন্ন অথচ উন্নত অবস্থার মানব জাতির অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। এই লুপ্তজাতি প্রাচীন ও আধুনিক সকল জাতি অপেক্ষাই সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন ছিল। বেল্‌জিয়মের গুহা মধ্যে অতি প্রাচীন কালে সে জাতি বাস করিত, তাহাদিগের অপেক্ষাও ইহারা বিভিন্ন ছিল।

যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থায় মানব বাসের অতীব অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়, মানব সে সকল অবস্থাতেও বহুদিন বাস করিতে পারে, মানব সে সকল অবস্থাকেও বহুদিন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। মানব নিদারুণ শীত-প্রধান উত্তর মেরু দেশে বহু কাল বাস করিতেছে; তথায় তাহার ডিঙ্গী খানি প্রস্তুত করিবার, কি কোনও প্রকার ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী কাষ্ঠ নাই, অগ্নি জ্বালিবার জন্যও, চর্ব্বি ভিন্ন, কাষ্ঠ, কয়লা তৈলাদির সম্পূর্ণ অভাব, এবং বরফ-গলিত জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ও নাই। আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে ফিউজিয়ান্‌রা বাস করে; অথচ তাহাদিগের অঙ্গে বস্ত্র নাই, বাস করিবার কুঁড়ে খানি পর্য্যন্ত নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় শুষ্ক প্রস্তরে ভয়াবহ হিংস্র জন্তু সকলের মধ্যেও মানব স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে তরাই প্রদেশের সাংঘাতিক জল বায়ুর মধ্যে, এবং আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সকলের মহামারির মধ্যেও মানব আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মানবের বিনাশ প্রধানতঃ এক জাতির

---

* ডারুইন-প্রণীত Descent of man (১৯০৬নং) গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৭ অধ্যায়, ২৮১ হইতে ৩০৭ পৃষ্ঠার বঙ্গানুবাদ।

সহিত অপর জাতির কিম্বা এক শাখার সহিত অপর শাখার সংঘর্ষণ হইতেই সাধিত হয়। অসভ্য জাতিগণের জন সংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না; দুর্ভিক্ষ, নিয়ত ভ্রমণশীলতা, (যাহাতে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি করে), অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যদান, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নানাবিধ পীড়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্ত্রী হরণ, শিশুবধ, এবং জনন-শক্তির হীনতা, এই সকল বিবিধ কারণে অসভ্য জাতিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত করে। যদি কোন কারণে এই সকল বিঘ্ন একটুও প্রবল হয়, তাহা হইলেই ঐ জাতীয়গণের সংখ্যা আরও হ্রাস হইতে থাকে। আর, দুই নিকটবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি মধ্যে যদি একটী এইরূপ কারণে কিছু হীনবল ও সংখ্যায় ন্যূন হয়, তবে অপরটী শীঘ্রই তাহাকে যুদ্ধ করিয়া, হত্যা করিয়া, আহার করিয়া, দাসত্বে পরিণত করিয়া অথবা আত্মসাৎ করতঃ শেষ করিয়া ফেলে। আর, এ সকল কারণ না ঘটিলেও, উহাদিগের মধ্যে একটীর সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলেই, উহা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি অসভ্য জাতীয়গণের সহিত কোন সভ্য জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তবে অসভ্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতীব ক্ষণস্থায়ী হয়। যদি উহাদিগের আবাস স্থলে জলবায়ুর উৎপীড়নে ঐ সভ্য জাতি তিষ্ঠিতে অসক্ত হয়, তবে উহাদিগের কথঞ্চিৎ রক্ষা, নতুবা আর রক্ষা নাই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্য জাতীয়গণের বিজয় লাভের হেতু, কখন বা অতি সহজবোধ্য, কখন বা দুর্ব্বোধ্য। তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায় কখন বা সরল, কখন বা জটিল। অসভ্য জাতীয়গণকে সভ্য করিতে হইলে ভূমি কর্ষণ শিখাইতে হয়, কিন্তু উহাই তাহাদিগের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠে, কারণ উহারা নূতন অভ্যাস গ্রহণ করে না, অথবা করিতে সক্ষম হয় না; উহারা জীবিকা নির্ব্বাহের চিরন্তন প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা। নবাগত পীড়া, নবাগত দুরাচার, অনেক স্থলেই অতীব মারাত্মক। যে পর্য্যন্ত, উহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিকতর ব্যাধি-প্রবণ, তাহারা মরিয়া নির্ম্মূল না হয়, সে পর্য্যন্ত, নূতন পীড়া ঐ সমাজ ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়া থাকে। মদ্যের বিষময় ফল ইহাদিগের পক্ষে অতীব সাংঘাতিক, আর সেই মদ্যপান-স্পৃহাই ইহাদিগের প্রবল হইয়া উঠে। অতি দূরবর্ত্তী পৃথক শ্রেণীভুক্ত মানবগণ যখন পরস্পরের সহিত প্রথম মিশিতে আরম্ভ করে, তখন কিছুদিন, কি এক অজ্ঞাত কারণে, উহাদিগের মধ্যে নূতন পীড়া সকল আবির্ভূত হয় (১) মিঃ স্প্রেট ভ্যাং কোবর দ্বীপে এই বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ইউরোপীয়গণের সমাগম জন্য ঐ দেশে অনেক অস্বাস্থ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। আর তিনি এ কথাও অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছেন যে, ঐ দেশবাসিগণ চতুর্দ্দিকে নবাগত ইউরোপীয়গণের নূতন জীবন, নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুৎসাহ হইয়া যায়; (ইউরোপীয়গণের ব্যবহারে) উহাদিগের স্ব-চেষ্টার প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়, (পূর্ব্বানুষ্ঠিত) কর্ম্মেচ্ছা ফুরাইয়া যায়, অথচ উহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রও প্রাপ্ত হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগণের মধ্যে সভ্যতার

(১) আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও প্লেগের উল্লেখ নাই।

ন্যূনাধিক্যের উপর তাহাদিগের জয় পরাজয় নির্ভর করে। কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচ্য জাতীয়গণের (১) আগমন ও আক্রমণ হইতে ইউরোপ ভীত হইয়াছিল; এক্ষণে ওরূপ ভয় নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইবে। (২) একটী অতীব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অসভ্যগণ বর্ত্তমানকালীয় সভ্য জাতিগণের সংঘর্ষে যতদূর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, প্রাচীনকালীয় সভ্য-সমাজের সংঘর্ষে তেমন কিছুই হইত না। মিঃ বেঝট ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে সভ্য ও অসভ্যের সংঘর্ষে অসভ্যগণ যদি বর্ত্তমান কালের মত বিনষ্ট হইয়া যাইত, তবে প্রাচীন নীতিশাস্ত্র-প্রণেতাগণ এ বিষয় অবশ্যই বিশেষ প্রণিধান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। মানবজাতির বিনাশ সাধন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ দুইটী; জন্ম সংখ্যার হ্রাস ও পীড়া। এই কারণদ্বয় শিশুগণকেই অধিক বিনাশ করে। জীবন ব্যাপারের, আচার ব্যবহারের, নূতন পথ অনুকরণ করিতে বাধ্য হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ঐ সকলের পরিবর্ত্তন সাক্ষ্যাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও অনভ্যস্তের পক্ষে উহার পরিণাম ধ্বংস। (৩) মিঃ হোওয়ার্থ এ বিষয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি এ বিষয় আমাকে অনেক সংবাদ দিয়াছেন। আমি নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

ট্যাস্‌ম্যানিয়াতে যখন প্রথম ( ইউরোপীয়দিগের) উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন তদ্দেশবাসিগণের সংখ্যা কেহ ৭০০০, কেহ ২০০০০ গণনা করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাহাদিগের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। ইংরাজদিগের সহিত এবং পরস্পরের সহিত (৪) যুদ্ধ বিগ্রহ ইহার প্রধান কারণ। (নবাগত) উপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, (৫)তাহা একরূপ প্রসিদ্ধ। এই সংহারের পর যখন হতাবশিষ্ট কয়েকজন গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল, তখন তাহারা ১২০ জন মাত্র ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ১২০ জনকে ফ্লিণ্ডার্সদ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দ্বীপ ট্যাস্‌মেনিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী; ইহা দীর্ঘে ৪০ মাইল, প্রস্থে ১২ হইতে ১৮ মাইল। দ্বীপটী ও স্বাস্থ্যকর এবং ঐ ১২০ জনের উপর ব্যবহারও ভালই করা হইয়াছিল; তথাপি তাহাদিগের অত্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে, উহাদিগের সংখ্যা বয়স্থ পুরুষ ৪৭ জন, বয়স্থা স্ত্রীলোক ৪৮ ও শিশু ১৬ জন, মোট ১১১ জন হইয়া গিয়াছে। ১৮১৫ সালে উহারা ১০০ জন মাত্র হইয়া গেল। উহারা ক্রমেই সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছিল। উহারা বিশ্বাস করিত যে অন্যত্র বাস করিলে উহাদিগের দশা এরূপ হইত না; সুতরাং ১৮৪৭ সালে উহাদিগকে ট্যাস্‌ম্যানিয়ার দক্ষিণ দিকে অয়ষ্টার কোভ নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। তখন উহাদিগের সংখ্যা, পুরুষ ১৪ জন, স্ত্রীলোক ২২ জন এবং শিশু ১০ জন, মোট

(১) গ্রন্থকার উহাদিগকে বর্ব্বর জাতি বলিয়াছেন।

(২) রুষজাপান যুদ্ধের পরে লিখিতে হইলে ডারউইন কি লিখিতেন, বলিতে পারি না।

(৩) এই কথাগুলি প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

(৪) এই গৃহবিবাদ কে বাধাইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই।

(৫) ইউরোপীয়গণ মানুষ শিকার করেন।

৪৬ জন মাত্র। কিন্তু স্থানপরিবর্ত্তনেও কোন উপকার হইল না। পীড়া এবং মৃত্যু তাহাদিগকে ছাড়িল না। ১৮৬৪ খ্রীঃ উহাদিগের সংখ্যা, পুরুষ ১, স্ত্রীলোক ৩, জন, মোট ৪ জন মাত্র থাকিল। ঐ পুরুষটীও ১৮৬৯ খ্রীঃ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। ইহাদিগের সমাজে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পীড়া অপেক্ষা জন্ম সংখ্যার হ্রাসই অধিকতর বিস্ময়জনক। নারীদিগের গর্ভধারণ ক্ষমতাই কমিয়া গেল। যখন তাহাদিগের স্ত্রীলোক সংখ্যা ৯টী মাত্র ছিল, তখন তাহারা মিঃ বন উইক্‌কে বলিয়াছিল যে, উহাদিগের মধ্যে কেবল দুইটী স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং এই দুই জনেরও ৩টী মাত্র সন্তান হইয়াছিল।

এই অভূত-পূর্ব্ব ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার ষ্টোরি বলেন যে, উহাদিগকে "সভ্য" করিতে গিয়াই উহারা মরিয়া গেল। "উহারা অপ্রতিহত ভাবে পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিলে অধিকতর সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিতে পারিত, এবং উহাদিগের মৃত্যু সংখ্যাও তত অধিক হইত না।" মিঃ ডেভিস্ নেটিভ্‌দিগকে অর্থাৎ তত্তৎদেশবাসিগণকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "উহাদিগের জন্ম সংখ্যার হ্রাস ও মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। ইহার প্রধান কারণ, আহারের পরিবর্ত্তন এবং জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী পরিবর্ত্তন। ভ্যাণ্ডিমনস্ ল্যাণ্ড্ হইতে ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহারা নিরুৎসাহিত হইয়া গেল। তাহতেই ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।*

অষ্ট্রেলিয়ার দুইটী পৃথক প্রদেশেও এই-রূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মিঃ গ্রেগরি মিঃ বন্‌উইক্‌কে বলিয়াছিলেন যে, "কৃষ্ণবর্ণগণের বংশবৃদ্ধির হানি হইতেছে, যাহারা অল্পকাল হইল বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও বংশ হানি দেখা যাইতেছে। ইহারা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে।" সার্কস্ বে প্রদেশ হইতে যে ১৩ জন আদিম নিবাসী সার্ব্বিসন নদী প্রবাহিত দেশে উপনীত হইয়াছিল, উহাদিগের মধ্যে ১২ জন তিন মাসেই যক্ষা রোগে মরিয়া গেল।

মিঃ ফেণ্টন নিউজিলাণ্ডের মাউরিগণের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া সুন্দর রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা হইতে, একটী বৃত্তান্ত ব্যতীত, নিম্নের সমস্ত বিষয় গৃহীত হইল।

"১৮৩০ খ্রীঃ হইতে তাহাদিগের জনসংখ্যা কমিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তাহারাও বলে। এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের জনসংখ্যা গণনা করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু প্রবাসিগণ বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক নানা স্থানে তাহাদিগের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছেন। অতএব তাহা বিশ্বাস্য। ইহা হইতে জানা যায় যে, ১৮৪৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহারা সংখ্যায় শতকরা ১৯.৪২ জন কমিয়া গিয়াছিল। উহাদিগের কয়েকটী শাখার জনসংখ্যা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, ঐ সকল শাখার ব্যক্তিগণ পরস্পর হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বাস করিত; কেহবা সমুদ্রের উপকূলে, কেহবা তাহা হইতে ব্যবধানে বাস করিত। তাহাদিগের আহার্য্য বস্তু, বিভিন্ন প্রকার চলা ফেরা, আচার

* এই সিদ্ধান্ত বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা উচিত।'

অভ্যাসও কোন কোন অংশে পৃথক্ রূপ ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহাদিগের মোট সংখ্যা ৫৩,৭০০ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৮৭২ খ্রীঃ অর্থাৎ ১৪ বৎসর পর আবার যখন জনসংখ্যা লওয়া যায়, তখন উহারা ৩৬৩৫৯ হইয়া গিয়াছিল। তবেই দেখা গেল যে, এই ১৪ বৎসরে শতকরা ৩২.২৯ জন কমিয়া গিয়াছে। মিঃ ফেণ্টন বিস্তৃত রূপে দেখাইয়াছেন যে, নূতন পীড়া, স্ত্রীগণের ব্যভিচার, পানদোষ, যুদ্ধবিগ্রহে ইত্যাদি যে সকল কারণ উহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের সম্বন্ধে সচরাচর অনুমান করা হয়, তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। তিনি সঙ্গত কারণ বশতঃই বিবেচনা করেন যে, মাউরিগণের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ দুইটী:—স্ত্রীগণের গর্ভধারণ করিবার শক্তিহীনতা এবং শিশুগণের (অসাধারণ) মৃত্যু। ইহার প্রমাণ জন্য তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর সংখ্যানুপাত ২.৫৭:১ ছিল; কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অনুপাত ৩.২৬:১ হইয়া গিয়াছিল। * প্রাপ্ত বয়স্কগণেরও মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। ইহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের আর একটী কারণ তিনি উল্লেখ করেন; তাহা এই যে, ইহাদিগের মধ্যে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তান জন্মেই কম, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যানুপাতের তারতম্য হইয়া পড়ে। ইহার কারণ বোধ হয় পৃথক, তাহা পশ্চাৎ আলোচ্য। আইল্যাণ্ড দেশের সহিত নিউজিল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ্রাসের তুলনা করিয়া মিঃ ফেণ্টন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এতদুভয় দেশের জল বায়ুর বিশেষ প্রভেদ নাই, এবং অধিবাসিগণের আহার নূতন, পরিধেয়ও নূতন, ব্যবহারও প্রায় তুল্যরূপ। মাউরি জাতীয়গণ নিজে বিবেচনা করে যে, নূতন আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াতেই তাহাদিগের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। * অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বংশবৃদ্ধি বা ক্ষয়ের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বিবেচনা করা কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, মাউরিগণের এই বিশ্বাস সম্ভবতঃ যথার্থ। উহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে; আর মিঃ ফেণ্টন দেখাইয়াছেন যে, ঐ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়েই উহাদিগের মধ্যে ভুট্টা দীর্ঘকাল রূপে ডুবাইয়া পচাইবার প্রথা প্রচালিত হয়, †এবং অনেকেই তদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যখন ইউরোপীয়গণ কেবল মাত্র নিউজিল্যাণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রায় তখন হইতেই মাউরিগণের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। যখন আমি ১৮৩৫ সালে বে আইল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম, তখন উহাদিগের পরিচ্ছদ এবং আহার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহারা আলু, ভুট্টা এবং অন্যান্য খাদ্য জন্মাইত; এবং উহা ইংরাজদিগকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও তামাক লইত। বিসপ প্যাটিসনের "জীবন-চরিত" হইতে

* অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কের প্রায় অর্দ্ধেক ছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহারা প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছিল।

* এতদ্দেশীয় বিলাত-ফেরতগণকে প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায় না।

† বঙ্গদেশে জলে ডুবাইয়া পাট পচানের প্রথা স্মরণ করুন। প্রায় ৪০ বৎসর হইল এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবও প্রায় ঐ কালই হইবে।

জানা যায় যে, নিউহেব্রিডিস্ ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জবাসী মিলানেসিয়ানগণকে খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য যখন নিউ-জিল্যাণ্ড, নরফোকদ্বীপ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-কর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতেও তাহাদিগের অত্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক মরিয়াই গিয়াছিল।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসিগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাওয়ার কথা সকলেই জানেন; নিউজিল্যাণ্ডেও যেমন স্যাণ্ডউইচেও তেমনি ঘটিয়াছিল। যাঁহারা এ বিষয় উত্তমরূপ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ১৭৭৯ খ্রীঃ যখন কুক স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তাহার অধিবাসী সংখ্যা মোটামুটি ৩ লক্ষ ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ যখন তাহাদিগকে গণনা করা হয়, তখন তাহারা প্রায় ১৪২০৫০ জন মাত্র হইয়া গিয়াছিল। এই গণনা বিশুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপর পর সময়ে যখন শুদ্ধরূপে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে গণনা করা যায়, তখন দেখা গেল যে, উহাদিগের সংখ্যা নিম্নলিখিত মত কমিয়া গিয়াছিল।

| | জনসংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১৮৩২ | ১৩০,৩১৩ | ১৮৩২ ও ৩৬ |
| ১৮৩৬ | ১০৮,৫৭৯ | সালের গণনা |
| ১৮৫৩ | ৭১,০১৯ | সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ |
| ১৮৬০ | ৬৭,০৮৪ | নহে। |
| ১৮৬৬ | ৫৮,৭৬৫ | |
| ১৮৭২ | ৫১,৫৩১ | |

এই তালিকা হইতে জানা যায় যে, ১৮৩২ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৪০ বৎসরে স্যাণ্ডউইচবাসিগণের সংখ্যা শতকরা ৬৮ জন কমিয়া গিয়াছে! ইহাদিগের স্ত্রীলোকের অসতীত্ব, পূর্ব্ববর্ত্তী মারাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ, বিজিত জাতির প্রতি আরোপিত কঠিন পরিশ্রম, এবং নূতন আমদানি নানাবিধ পীড়া, যাহাতে বহুলোক নষ্ট হয়; অনেক গ্রন্থকার ইহাদিগের বংশক্ষয়ের এই সকল এবং এতদনুরূপ কারণ অনুমান করেন। এই সকল কারণে ইহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং বোধ হয়, ১৮৩২ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, এই ৫ বৎসরের অত্যধিক লোকক্ষয় ঐ সকল কারণেই হইয়াছিল। কিন্তু আমার অনুমান হয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ, স্ত্রীগণের গর্ভধারণের শক্তি হ্রাস হওয়া। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ রণপোত বিভাগের ডাক্তার রুসেন-বার্জার ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই দ্বীপে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, উহার হাওয়াই প্রদেশে ১১৩৪ জন অধিবাসী মধ্যে কেবল ২৫ জন লোকের এবং অপর এক বিভাগে ৬৩৭ জন মধ্যে ১৩ মাত্র লোকের সন্তান সন্ততি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, আর ইহাদিগেরও সন্তান সন্ততি তিনটীর ঊর্দ্ধ ছিল না। ৮০ জন বিবাহিতা নারী মধ্যে কেবল ৩৯ জন গর্ভধারণ করিয়া-ছিল। গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে জানা যায় যে, ঐ দ্বীপে সমস্ত জনসংখ্যার হিসাবে প্রত্যেক দম্পতি গড়ে আধখানা সন্তানের অধিকারী। অরেষ্টার কোভের ট্যাস্মেনিয়নদিগের মধ্যেও অপত্য সংখ্যার গড় অনুপাত ঠিক এইরূপই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্ব্বিস্ স্বরচিত ইতিহাসে প্রকাশ করেন যে, যে পরিবারে তিনটী সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদিগের কোন টেক্স দিতে হইবে না, এবং যে পরিবারের অপত্য সংখ্যা তিনটীর অধিক, তাহাদিগকে জমি দিয়া ও অন্য প্রকারে উৎসাহিত করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এই

অদ্ভুতপূর্ব্ব বিধি হইতেই বুঝা যায় যে, অধি-বাসিগণ কত দূর বন্ধ্যাভাব ও জনন-হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রেভারেণ্ড এ বিসশ্ সাহেব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "স্পেক্টেটার" নামক পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা অনেক বেশী, এবং বিসশ্ ষ্ট্যান্‌লি আমাকে বলিয়াছেন যে, অদ্যাপিও শিশুগণের অবস্থা ঐরূপই আছে। এ অবস্থা নিউজিল্যাণ্ডের তুল্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রতিপালনে যত্ন করে না বলিয়াই এইরূপ হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ এই যে, জননশক্তির হ্রাস হওয়ায় অপত্যের দৈহিক দুর্ব্বলতা স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়; তদ্ধেতুই শিশুগণের মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইয়া থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের সহিত স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ-বাসিগণের আর এক বিষয়ে ঐক্য দেখিতেছি; ইহাদিগের মধ্যেও পুত্র অপেক্ষা কন্যাই অধিক জন্মে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে মোট পুরুষ সংখ্যা ৩১৬৫০ ও স্ত্রী সংখ্যা ২৫২৪৭ পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ১২৫,৩৬ জন পুরুষের স্থলে ১০০ জন মাত্র স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু সকল সভ্যদেশেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক। স্ত্রীলোকের অসতীত্ব এই জননশক্তির হীনতা কতকাংশে উৎপাদন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিবাসিগণের চালচলন, আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন হওয়াই এই অবস্থার প্রবলতার কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা, বিশেষতঃ শিশুর মৃত্যু, এত অধিক হওয়ার হেতুও বুঝা যাইতেছে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কুক এই সকল দ্বীপে গিয়াছিলেন, ১৭৯৪ খ্রীঃ ভ্যাঙ্কোবর গিয়াছিলেন, এবং তৎপর তিনি মৎস্য-শিকারীদিগের নৌকায় অনেকবার গিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ উপস্থিত হন, এবং দেখেন যে, তাঁহাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই দ্বীপবাসিগণের রাজা মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই উহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায় সকল বিষয়েই বিশেষরূপে দ্রুতগতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; উহারা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য হইয়া উঠিল। মিঃ ফোন ঐ দ্বীপেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতি সহস্র বৎসরে যত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দ্বীপবাসিগণ পঞ্চাশ বর্ষ মধ্যেই তদপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিসপ্ ষ্টেলির নিকট হইতে জানা যায় যে, যদিও অনেক নূতন নূতন ফল এই সকল দ্বীপে আমদানী হইয়াছে এবং ইক্ষু সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তথাপি দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের আহারের বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইউরোপীয়গণের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, ইহারা অল্পকাল মধ্যেই পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, এবং মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে।* যদিও এই সকল পরিবর্ত্তন বাহ্যতঃ দেখিতে বড় বেশী বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি, মানবেতর প্রাণিগণের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতেই এই সকল দ্বীপবাসীদিগের জননশক্তি হ্রাস হইবার প্রচুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মিঃ ম্যাক বা মারা বলেন যে, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিগের অনুন্নত ও অসভ্য আণ্ডামান দ্বীপবাসীগণ জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। এমন কি, উহাদিগকে ঐ দ্বীপ হইতে অন্যত্র লইয়া গেলে,

* বিশেষ বিবেচ্য।

আহার ও অন্যান্য অবান্তর অবস্থা ঠিক পূর্ব্ববৎ রাখিলেও উহারা প্রায়ই মরিয়া যায়। তিনি ইহাও বলেন যে, নেপালের উপত্যকা-বাসিগণকে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগণকে সমতল ভূমিতে আনিলে তাহারা আমাশয় ও জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে; এবং সম্পূর্ণ বৎসর উহাদিগকে তথায় রাখিলে উহারা মরিয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য মানবগণের আচার ব্যবহার কিম্বা জীবনধারণ উপযোগী ক্রিয়া কর্ম্মের পরিবর্ত্তন বশতঃ বিশেষ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। কেবল নূতন জলবায়ুর ফলেই যে তদ্রূপ হয়, তাহা নহে। শুধু আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; ঐ প্রাচীন আচারাদির পরিবর্ত্তে নূতন যে সকল আচারাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা আপাততঃ অনিষ্টজনক বলিয়া বোধ না হইলেও, অর্থাৎ ঐ সকল নূতন সাক্ষাৎস্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও, উহা হইতে সকলেরই, বিশেষতঃ শিশুগণের বিশেষরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। অনেকে অনেক বার বলিয়াছেন যে, মানব গুরুতর ঋতু পরিবর্ত্তন এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আত্মরক্ষা করিতে পারে; কিন্তু একথা কেবল সভ্য মানবের পক্ষেই সত্য। অসভ্য মানবগণ, তাহাদিগের নিকট-কুটম্ব মর্কটদিগের মতই (anthropoid apes) ঐ সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে অক্ষম। অসভ্য মানবকে তাহাদিগের জন্মভূমি হইতে স্থানান্তরিত করিলে তাহারা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু অপেক্ষা অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ জন্ম শক্তির হ্রাস হওয়াই অধিকতর কৌতুহলজনক। ট্যাস্ম্যানিয়াক, মাউরি, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী এবং অষ্ট্রেলিয়ানদিগের এইরূপই হইয়াছিল। কারণ অত্যল্প পরিমাণ বন্ধ্যাত্বও, অন্যান্য জনসংখ্যা হ্রাসকারক কারণের সহিত মিলিত হইয়া বিলোপ সাধন করিতে পারে। জননশক্তি স্ত্রীলোকের অসতীত্ব বশতও কখন কখন হ্রাস হয়, যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে টাহিটিয়ানদিগের মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ ফেন্টন দেখাইয়াছেন যে, নিউজিল্যাণ্ডার ও ট্যাসম্যানিয়ানদিগের সংখ্যা হ্রাস এ কারণে হয় নাই।"

উপরে যে প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে মিঃ ম্যাক্‌নামারা কারণ উল্লেখ করতঃ দেখাইয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া পীড়াগ্রস্ত স্থানের অধিবাসীগণ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবার দিকে অগ্রসর হয়। * কিন্তু উপরোক্ত জাতীয়গণের মধ্যে অনেক স্থলে এই কারণ সর্ব্বথা প্রযোজ্য নহে। কোন কোন লেখক বিবেচনা করেন যে, দ্বীপ সকলের আদিম নিবাসিগণের জননশক্তি-হীনতার কারণ তাহাদিগের স্ববংশে সন্তানোৎপাদন করা; কিন্তু উপরে যে সকল জাতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ইউরোপীয়গণ তাহাদিগের দ্বীপে আসিবার সময় হইতেই তাহাদিগের জননশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল; ইহাতে ঐ রূপ কারণ এ সকল স্থলে স্বীকার করা যায় না। মানব স্ববংশে সন্তানোৎপাদন করিল, ঐ রূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ নিউজিল্যাণ্ড কিম্বা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থাপন্ন স্থানের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলে ঐরূপ ফল উৎপন্ন হইবার কোন

* প্রণিধান করুন।

কারণই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ইহা জানা যাইতেছে যে, নরফোক্ দ্বীপসমূহে, ভারতবর্ষের টোডাদিগের মধ্যে, এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোন কোন পশ্চিম দ্বীপে, বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সকলেই নিকট কুটম্ব; তথাপি তাহাদিগের মধ্যে জননশক্তির হ্রাস হওয়া বোধ হয় না। এ সকল অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য কারণ, মানবেতর জীবের তুলনায় অনুমিত হইতে পারে। যে জীব যে অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে দেহস্থ জনন-যন্ত্র সকল বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়, ইহা প্রমাণ করা যায়; আর এই হেতুতে সুফল ও কুফল দুইই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৎপ্রণীত গৃহপালিত অবস্থায় উদ্ভিদ ও জন্তুগণের পরিবর্ত্তন (variation of animals and plants under domestication) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিষয়ক অনেক উদাহরণ সংগৃহীত করা হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে সেই সকলের উল্লেখ করিব। যাঁহারা এই বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ দেখিবেন। কোন কোন অতীব সামান্য পরিবর্ত্তনে সমস্ত অথবা অধিকাংশ উদ্ভিদ ও জীবগণের স্বাস্থ্য,বীর্য্য ও জননশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার, কোন কোন পরিবর্ত্তনে অনেক জন্তুর বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে। ইহার একটী বিশেষ পরিজ্ঞাত উদাহরণ ভারতবর্ষের হস্তীজাতি: ইহাদিগের গৃহপালিত অবস্থায় অপত্য জন্মে না। * আভাতে ইহাদিগের গৃহপালিত অবস্থাতেও অপত্য উৎপন্ন হয়। সেখানে তাহাদিগকে জঙ্গল মধ্যে কতকটা স্বচ্ছন্দ ক্রমে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইয়া থাকে; এ নিমিত্ত স্বাভাবিক স্বাধীন হস্তীর মতই ইহাদিগের অবস্থা। আমেরিকার বানরগণ মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়দিগকেই তাহাদিগের আপন দেশেও "পোষা" করিয়া রাখিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের সন্তান জন্মেই না, অথবা অতি অল্প সংখ্যক জন্মে। ইহাদিগের সহিত মানবের নৈকট্য বশতঃ ইহাদিগের জননহীনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জঙ্গলের স্বাধীন জন্তুকে ধরিয়া আনিলে অতি অল্প পরিমাণ অবস্থা পরিবর্ত্তনেও কেমন জননহীনতা উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিবার স্থল। ইহা আরও বিস্ময়কর, কারণ, স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা গৃহপালিত অবস্থাতে সকল পালিত-পশুই অধিকতর জননশীল হইয়াছে, আর কোন কোন পালিতপশু জননশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থা সহ্য করিতে সক্ষম হয়। জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনিলে কোন কোন শ্রেণীস্থ জীবের বেশী, কাহারও বা কম পরিমাণে জনন-শক্তির হ্রাস হয় এবং এক শ্রেণীস্থ জীব সকলেই তুল্যরূপে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কখন কখন কোন শ্রেণীর মধ্যে একটী মাত্র জাতিই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যে সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে এমতও হইয়া থাকে, যে কোন শ্রেণীর মধ্যে একটী ভিন্ন সকলেই ঐ অবস্থায় বন্ধ্যাত্ব পাইল; কিন্তু ঐটী জননক্ষম রহিয়া গেল। কোন কোন পুরুষ ও স্ত্রীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কিম্বা প্রায় মুক্ত অবস্থায় রাখিলেও, উহারা আপন দেশেও পরস্পরের সহিত সঙ্গত হয় না; আবার কোন কোন জাতীয়গণ ঐরূপ অবস্থায় সংগত হয়, কিন্তু তাহাতে অপত্য জন্মে না; আবার কোন কোন গুলির অপত্য জন্মে, কিন্তু স্বাভাবিক

* বঙ্গদেশের রাজসাহী জেলার পুঁটিয়া গ্রামে দুই বার পালিতা হস্তিনীর প্রসব হইতে দেখা গিয়াছে।

অবস্থায় যে পরিমাণ জন্মে, তদপেক্ষা অল্প-সংখ্যক জাত হয়। এস্থলে ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, এই সকল অপত্য দুর্ব্বল, ও পীড়া-গ্রস্ত অথবা বিকৃত আকারের হইয়া থাকে, আর তাহারা শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপরে যে সকল মানবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগের অবস্থার বিবেচনা করিতে ইহাদিগের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জনন-শক্তির যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ বানর-শ্রেণীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে আদিম অবস্থায় মানবও যে অবস্থা পরিবর্ত্তন বশতঃ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত, সে বিষয় সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং যে কোন জাতীয় মানবই হউক, অসভ্যাবস্থায় তাহার আচার ব্যবহার, চাল চলন পরিবর্ত্তন করিলে সে ন্যূনাধিক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদিগের শিশুগণেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অন্যত্র লইলে ভারতবর্ষে যেমন হস্তীর ও চিতা ব্যাঘ্রের, আমেরিকায় যেমন কোন কোন শ্রেণীর বানরের এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক জন্তুর হইয়া থাকে, অসভ্য মানবেরও তেমনই হয়।

এইরূপ বিবেচনা করিলে ইহা বুঝা যাইতে পারে যে, অসভ্য মানব দীর্ঘ কাল এক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কি যেন কারণ বশতঃ, বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অসভ্যগণ অপেক্ষা সভ্য মানব সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন অধিকতর সহ্য করিতে পারে। এই বিষয়ে সভ্যমানব গৃহপালিত পশুর ন্যায়; কারণ ভারতবর্ষীয় কুকুর ভিন্ন অন্যান্য পশুগণের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও, তাহারা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইবার অত্যল্প সংখ্যক উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইলেও, ইহারা প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় না। সভ্য মানব ও গৃহপালিত পশু পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও যে জনন-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয়, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাহারা জঙ্গলী পশু অপেক্ষা অনেক অধিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং সেই হেতু পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর তাহারা পূর্ব্বকালে এক দেশ হইতে অন্য দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, কিংবা এক স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছিল, অথবা তাহাদিগের বিভিন্ন শাখা ও বংশীয়গণ পরস্পরের সংযোগে অপত্য উৎপাদন করিয়াছিল,—এ সকল কারণ বশতঃও ঐরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে। সভ্য মানবের সহিত অসভ্য মানবের সংযোগে অপত্যজাত হইলে, সেই অপত্য পরিবর্ত্তিত অবস্থার কুফল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইংরাজ ও টাহিটিয়ানদিগের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে পিট্‌কেরণ দ্বীপে আবাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে এত শীঘ্র উহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যেই ঐ দ্বীপ জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাহাদিগকে নরফোক্‌দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়; তখন তাহাদিগের সংখ্যা, বিবাহিত ৬০ জন এবং শিশু ১৩৪ জন, মোটে ১৯৪ জন মাত্র। কিন্তু এত শীঘ্র ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, ১৮৫৯ খ্রীঃ, ১৬ জন পিট্‌কেরণ দ্বীপে ফিরিয়া আসা সত্ত্বেও, ১৮৬৮ খ্রীঃ উহাদিগের সংখ্যা ৩০০ জন হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের

সংখ্যা সমান ছিল। টাস্ম্যানিয়ানদিগের সহিত তুলনায় ইহাদিগের অবস্থা কিরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন দেখা যায়। নরফোক্ দ্বীপবাসীগণ সার্দ্ধ দ্বাদশ বর্ষে ১৯৪ জন হইতে ৩০০ শত হইয়া উঠিল; আর টাস্মেনিয়ান গণ পঞ্চদশবর্ষে ১২০ জন স্থলে মাত্র ৬০টীতে পরিণত হইল, আর তাহার মধ্যেও কেবল ১২টী মাত্র শিশু।

তেমনই,১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপের খাঁটি অধিবাসিগণ গণনায় ৮০৮১ জন কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শঙ্করবর্ণগণ সংখ্যায় ৮৪৭ জন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারা অধিকতর সুস্থকায় ছিল। কিন্তু এই ৮৪৭ জন মধ্যে শঙ্কর জাতীয়গনের অপত্যকেও গণনা করা হইয়াছিল, কি কেবল প্রাথমিক শঙ্করজাতিদিগকেই গণনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

এই স্থলে যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, উহারা সকলেই তত্তৎদেশের আদিম-নিবাসী; আর সকলেই সভ্য মানব-গণের আগমন হেতু অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যদি যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত হইয়া, অথবা অন্য কোন কারণে অসভ্যগণ আপন আবাস পরিত্যাগ করতঃ অন্যবিধ আচার আচরণ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত, তবে সম্ভবতঃ উহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি হইত। অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং বন্ধ্যাত্ব হেতুই জঙ্গলা জন্তুকে গৃহপালিত করার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কারণ গৃহপালিত করিতে হইলেই ইহাদিগের বংশ-বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, আর অসভ্য মানবকেও সভ্যতার সংসর্গে আনিয়া সভ্যজাতি গঠিত করিবার পক্ষেও ঐ একই বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ ইহারাও অবস্থা পরিবর্ত্তনে জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, যদিও মানবীয় জাতি সমূহের ক্রমে ক্রমে সংখ্যা হ্রাস ও পরিণামে বিলোপ হওয়ার বিষয় সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, কারণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে বহু কারণ মিলিত হইয়া এই ফল উৎপাদন করে,—তথাপি, এই বিষয়টী এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণের বিলুপ্তি প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার বিষয় বলিয়া বিবেচনা হয়। দক্ষিণ আমেরি-কার সেই প্রাচীন অশ্বজাতি বিলুপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু অনতিবিলম্বেই তত্তৎ প্রদেশে স্পেনদেশীয় অশ্বজাত বহু বিস্তৃত হইয়া উঠিল। নিউজিল্যাণ্ডারগণ এই কথা অনু-ভব করে ও বুঝিতে পারে; কারণ তাহারা আপন ভাগ্য তদ্দেশীয় প্রাচীন ইঁদুরের সহিত তুলনা করে। ঐ সকল ইঁদুরকে ইউরোপীয় ইঁদুরে প্রায় নির্ব্বংশ ও বিলোপ করিয়া দিয়াছে। এ বিষম সমস্যা; এই বিলোপের প্রকৃত কারণ ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী কল্পনা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। তথাপি আমরা জ্ঞানে বুঝিতে যে, প্রত্যেক জীবশাখা নানাবিধ কারণ বশতঃই বংশ বৃদ্ধি করিতে প্রতিহত হইতেছে; তাহার উপর যদি কোন কারণও নূতন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে উহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইবেই; এবং হ্রাস হইতে হইতে অগ্র পশ্চাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই এক জাতি অপর জাতিকে পরাজিত করিয়া অচিরেই পরাজিতের ধ্বংস সাধন করে, তাই সে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীশশধর রায়।

# শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। (১)

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ বুঝিতে গিয়া অনেকে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, শঙ্কর জগৎকে ও জগতের উপাদান শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। শঙ্কর অনেক স্থলে এ জগৎকে 'অসত্য', 'মিথ্যা' ও 'কল্পিত'—এই সকল শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি অর্থে এবং কি অভিপ্রায়ে তিনি এই সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, লোকে সে দিকে অনুসন্ধান না করিয়াই, কেবল মাত্র ঐ সকল শব্দ দেখিয়াই, ঠিক করিয়া লইয়াছেন যে, "শঙ্কর-দর্শনে জগতের স্থান নাই" এবং "শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করেন নাই"। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর কিছুই উড়াইয়া দেন নাই। আমরা শঙ্করোক্তি দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিব। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিব।

শ্রুতিতে শঙ্কর এইরূপ একটা তত্ত্ব পাইয়াছিলেন—

"বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"।

বিকারমাত্রই কেবল কথার কথা, সুতরাং স্বরূপতঃ অসত্য; কেবল মৃত্তিকাই সত্য। এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের শঙ্কর কিরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই পাঠক নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন বলিয়া, আমরা বিশ্বাস করি। শারীরক ভাষ্যে (২।১।১৪) ইহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। আমরা এস্থলে শঙ্করের সেই মীমাংসাটুকু দেখাইব।

রত্নপ্রভাটীকাকার ১।১।৮ সূত্রের টীকায় এই শ্রুতিবাক্য বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

বিকারোঽয়ং বস্তুতঃ কারণাদ্ ভিন্নো নাস্তি তস্মান্মৃষৈব।*

যাহাকে আমরা 'কার্য্য' বলি, উহা 'কারণ হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং কার্য্য অসত্য। মৃত্তিকা ঘটের কারণ। ঘট মৃত্তিকার কার্য্য। প্রকৃত পক্ষে, ঘট কি মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র? ঘট মৃত্তিকারই অবস্থান্তর,—উহা মৃত্তিকারই প্রকার-ভেদ মাত্র —উহা মৃত্তিকাই। সুতরাং কারণ হইতে যদি ঘটকে স্বতন্ত্র একটা পদার্থ বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাহাই অসত্য। স্বরূপতঃ ঘটের অস্তিত্ব নাই; মৃত্তিকার অস্তিত্বেই ঘটের অস্তিত্ব। সুতরাং ঘট—মৃত্তিকাই। অতএব কার্য্য উহার কারণ হইতে ভিন্ন নহে। টীকাকার ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পরমার্থতঃ ঘটকে যদি মৃত্তিকা বলিয়াই মনে কর, স্বতন্ত্র কোন বস্তুরূপে মনে না কর, তবেই তুমি ঠিক বুঝিলে। আর যদি ঘটকে মৃত্তিকা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু রূপে ধরিয়া লও, তবেই তুমি ভুল করিলে। সুতরাং স্বতন্ত্রবস্তুরূপে ঘট অসত্য। এই অর্থেই কার্য্য বা বিকারকে 'অসত্য' বলা হয়। ইহাতে ঘট উড়িয়া গেল না। মৃত্তিকা রূপে ঘট সত্যই রহিল।' টীকাকার তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই—

"বিকার গুলি যদি স্বতন্ত্ররূপে মিথ্যাই হইল, তবে কারণও মিথ্যা হয় না কেন?

* ঠিক এই কথা শঙ্কর স্বয়ং "বিবেকচূড়ামণি" গ্রন্থের ২১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন।

যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। ইহার উত্তর কি? ইহার উত্তর এই যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে বটে, কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে ভিন্ন। সুতরাং কারণ মিথ্যা নহে।"

পাঠক দেখুন দেখি, এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিনা? এই সিদ্ধান্তে বিকার বা কার্য্য উড়িয়া যায় না। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ কিরূপ? "অত্যন্ত সারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়তে" (শারীরক ভাষ্য, ২।১।৬)। কার্য্য ও কারণ একান্তভাবে এক হইতে পারে না, কেননা উভয়ে এক হইলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কার্য্য ও কারণ বলিয়া কোন কথা থাকে না। সুতরাং কারণ ও কার্য্য এক নহে। কিন্তু কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা কারণই।* কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, উহা স্বতন্ত্ররূপে অসত্য, কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং কারণই সত্য। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে, শক্তিই রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর হওয়াতে শক্তির বিলোপ হয় না। শক্তিই অবস্থাভেদে নানা আকারে জগতে ক্রিয়া করিতেছে। শক্তির এই প্রকার ভেদগুলি শক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে। যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হইয়া একটা 'কার্য্য' উৎপন্ন হইতেছে, কার্য্যে ঠিক ততটুকু শক্তির অস্তিত্ব থাকিতেছে। সুতরাং শক্তিরূপে কার্য্য সত্য। পাঠক পাশ্চাত্যজগতের প্রসিদ্ধ মনীষীর কথা শুনুন্ :—

"In every change force undergoes metamorphosis; and from the new form or forms it assumes, may subsequently result either the previous one or any of the rest, in endless variety of order."

অতএব যাহাকে 'কার্য্য' বলা যাইতেছে, উহা, উহার কারণীভূত শক্তি ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। যাহাকে তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ বলিতেছ;—ইহারা গতিরই (motion) রূপান্তর মাত্র। আবার যাহাকে গতি বলিতেছ, উহা তাপেরই অবস্থান্তর। কিন্তু এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনে, শক্তির পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং শক্তিরূপে সকলই সত্য; শক্তি হইতে স্বতন্ত্ররূপে কেহই সত্য নহে। বিজ্ঞান এই তত্ত্বই উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

শঙ্করাচার্য্যও নিজের ভাষায় তাহাই বলিয়াছেন। ইহাতে শঙ্করের অপরাধ কোথায়? ঘট—মৃত্তিকার বিকার হইলেও, মৃত্তিকা ত নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করে নাই। শঙ্কর এই ভাবে পরমার্থতঃ পরিণামবাদে বিবর্ত্তবাদই দেখিয়াছেন। ইহাতে পরিণাম উড়িয়া যায় না।*

"তেজোবন্নকার্য্যানাং তেজোবন্নব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাব" (২।১।১৪)।

তেজ, অপ্ ও অন্ন—এই তিন শক্তি মিলিত হইয়া 'অগ্নি'রূপে পরিণত হইল।

---

* শারীরক ভাষ্যে ২।১।১৪—২০ শঙ্কর যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে গুলি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কারণ আর কিছুই নহে, উহা কার্য্যেরই অব্যক্তাবস্থা বা পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। যাহা অব্যক্ত ভাবে ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং কার্য্য, কারণেরই ব্যক্তাবস্থা মাত্র। অতএব কার্য্য আর কিছুই নহে,—উহা কারণই। সুতরাং যাহারা কার্য্যকে, কারণ হইতে স্বতন্ত্র একটা বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। কথাটা এই যে, কারণ—কার্য্যরূপে পরিণত হইলে, তাহার নিজের স্বতন্ত্রতা হারায় না। কেন হারায় না? হারায় না এই জন্য যে, কার্য্যধ্বংসেও কারণটী ঠিকই থাকে; কিন্তু কারণের ধ্বংসে কার্য্যও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র।

* শঙ্করশিষ্য বিদ্যারণ্যও "পঞ্চদশী"তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'দ্বৈতকে আমরা উড়াইয়া দি না, কেবল বুদ্ধিদ্বারা দ্বৈতে অদ্বৈত বোধ করি (৬।৪০—৪২)।

অগ্নিতে যে শুক্লবর্ণ দেখিতেছ, উহা জলের রূপ; উহাতে যে লোহিতবর্ণ দেখিতেছ, উহা তেজের রূপ এবং উহার কৃষ্ণবর্ণকে পৃথিবীর রূপ জানিবে। সুতরাং তেজ, অপ্ ও অন্ন শক্তিকে ছাড়িয়া দিলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। "অপাগাৎ অগ্নিত্ব মপগতং কারণমাত্রত্বাৎ" (ব্রহ্মপ্র ভা) অতএব কার্য্যমাত্রই কারণরূপে সত্য; স্বতন্ত্র ভাবে অসত্য। পাঠক দেখুন, এই সিদ্ধান্তে কি কার্য্যগুলি উড়িয়া যায়? কার্য্য বা জগৎকে যদি উড়াইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য হইত, তবে শঙ্করাচার্য্য এরূপ ভাবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন কেন? তিনি এক নিঃশ্বাসেই উড়াইয়া দিতে পারিতেন!

এইরূপে কার্য্যকে অসত্য বলিয়া শঙ্করাচার্য্য দৃষ্টান্ত স্বরূপে "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই সকল শ্রুতিবাক্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, "ব্রহ্মই সকল"— ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, জগৎ উড়িয়া গেল বা পদার্থ গুলি মিথ্যা বা শূন্য হইল। জগতের অস্তিত্ব থাকিল, পদার্থেরও অস্তিত্ব থাকিল। কেবল পরমার্থদৃষ্টিতে জগৎ বা পদার্থগুলির সত্তা ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জগৎ—ব্রহ্মশক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র; ব্রহ্মশক্তিরূপেই জগৎ সত্য; স্বতন্ত্ররূপে জগৎ সত্য নহে। ইহাই তবে শঙ্করের সিদ্ধান্ত। পাঠক দেখুন, শঙ্কর এতদ্দ্বারা নানাত্বকে * উড়াইয়া দেন নাই, জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই। যাহা বৈজ্ঞানিক বা পারমার্থিক তত্ত্ব, কেবল তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।

তৎপরে শঙ্কর এই সূত্রেই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, একত্ব ও নানাত্ব—উভয়ই সমান রূপে সত্য হইতে পারে না। নানাত্বের সত্যতা, একত্বের সত্যতার উপরেই নির্ভর করে। একই কারণ, অবস্থাভেদে নানা কার্য্যে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কারণের উপরেই কার্য্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে, কার্য্যের অস্তিত্বই থাকে না; কেন না কার্য্য যাহা, তাহা কারণেরই রূপান্তর মাত্র। এইজন্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে "স্বরূপেণ অনুপাখ্যত্বাৎ"*,—অর্থাৎ কার্য্যাকারে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে বা পরমার্থদর্শীর চক্ষে, কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কিন্তু যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি জন্মে নাই, তাহারা এভাবে কার্য্যকে দেখে না।

---

* অথচ কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করমতে নানাত্ব একেবারে অলীক বা মিথ্যা। এইরূপে শঙ্করের উপর কত জনে কত অবিচার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই!! "The knowledge of Reality does not exclude differentiation— only defferentiation does not mean separation and isolation.— Paulsen (Introduction to philosophy.

* বিকার গুলির স্বরূপ-সত্তা বা স্থির-সত্তা থাকিতে পারে না। ইহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, পরে দেখা দিয়াছে। যখন দেখা দিয়াছে, তখনও বিকারগুলি নিয়ত আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে। বর্ত্তমানে যে আকারকে যে ভাবে দেখিলে, পরমুহূর্ত্তেই সে আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার পরেও এ গুলির এ আকার থাকিবে না,—প্রলয়ে শক্তিরূপে অবস্থিত রহিবে। অতএব সর্ব্বদা রূপান্তরিত হয় বলিয়াই,—বিকারগুলির স্বরূপসত্তা বা স্থির-সত্তা নাই। কেবল শক্তিরই স্বরূপসত্তা আছে। রূপান্তরের মধ্যেও শক্তি স্থির থাকিয়া যায়। এইজন্যই বিকারগুলির নিজের সত্তা নাই বলা হইয়াছে। অজ্ঞানীরা মনে করে যে, বিকারগুলির স্বরূপসত্তা আছে। কিন্তু ইহা ভ্রম।

তাহারা কার্য্যগুলিকে স্বতন্ত্রভাবেই সত্য বলিয়া মনে করে। কারণশক্তিই যে রূপান্তরিত হইয়া কার্য্যাকারে দেখা দিয়াছে, এ তত্ত্বের তাহারা কোন খবর রাখে না। সুতরাং তাহারা স্বরূপতঃ জগৎকে "সত্য" বলিয়াই ধরিয়া লয়। তাহারা জগৎকে ব্রহ্মশক্তিরূপে সত্য বলিয়া মনে করে না। এই জন্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ"। পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলে তবে লোকে বুঝিতে পারে যে, এ জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই রূপান্তর—এ জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই।

শঙ্করের সিদ্ধান্ত এইরূপ। এ সিদ্ধান্তে জগৎ উড়িয়া গেল না।

কি ভাবে শঙ্কর জগৎকে 'অসত্য' বলিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিলাম। এখন এ জগতের উপাদান 'শক্তি' সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

এ স্থলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। জগৎকে তিনি যে ভাবে অসত্য বলিয়াছেন, শক্তিকেও সেই ভাবে অসত্য বলিয়াছেন। তিনি যেমন জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই; শক্তিকেও তদ্রূপ উড়াইয়া দেন নাই।

আমরা উপরে কার্য্য ও কারণের যেরূপ সম্বন্ধ দেখাইয়াছি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিরও ঠিক্ সেইরূপ সম্বন্ধ।

এই সূত্রেই শঙ্করের সে সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। "নামরূপে চেদীশ্বরস্য আত্মভূতে তর্হি ঈশ্বরো জড় ইত্যত আহ—'তাভ্যামন্য' ইতি।" শক্তি ও ব্রহ্ম এক হইতে পারে না। ব্রহ্ম—শক্তি হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু শক্তি—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা ব্রহ্মই।

অতএব আমরা পাইতেছি যে, স্বতন্ত্র ভাবে শক্তি 'অসত্য'। ব্রহ্মরূপে শক্তি সত্য। যাঁহারা পরমার্থদর্শী, তাঁহারা জানেন যে জগৎ যে শক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সে শক্তি ব্রহ্মেরই আত্মভূত,—উহা ব্রহ্মই। যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি জন্মে নাই, তাহারাই শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ শক্তি ব্রহ্মই। কেন না, সৃষ্টিকালে ব্রহ্মশক্তিরই একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়। কিন্তু এই একটা আগন্তুক পরিণাম হয় বলিয়াই যে * উহা ব্রহ্মশক্তি হইতে একটা কোন অতিরিক্ত পদার্থ হইল, তাহা নহে। কেন না, একটা অবস্থান্তর ঘটিলেই যে বস্তুটী একেবারে একটা স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হইয়া উঠে, তাহা নহে। শঙ্কর এ কথা বারম্বার বলিয়াছেন। "নহি বিশেষদর্শন মাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি" (ভাষ্য, ২।১।১৮)। পরমার্থদর্শীর চক্ষে তখনও উহা ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াশক্তির সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। ঐতরেয় ভাষ্যে (৫।৩) "সর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং"—এস্থলে ব্রহ্মকে মায়ার সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ বলা হইয়াছে। † শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রাণ ও অপানের প্রেরক (রত্নপ্রভা, ১।১।৩১)। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক বা "সামর্থ্য" স্বরূপ (কঠোপনিষদ্

* শঙ্কর-দর্শনের (১।১।৫) রত্নপ্রভাটীকা দেখ।

† জগতে যত প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়াছে; সেই জ্ঞান ও ক্রিয়ায় সাধারণ বীজ 'অব্যক্তশক্তি' (কঠোপনিষদ্ভাষ্য ও টীকা। সুতরাং অব্যক্তশক্তি জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। কিন্তু অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, মায়ার বা বিকারের নিজের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই; ব্রহ্মসত্তাতে উহার সত্তা ও ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিতে ইহার স্ফূর্ত্তি। অতএব ব্রহ্ম সত্তা (জ্ঞান) স্বরূপ এবং স্ফূর্ত্তি (শক্তি) হইতেছেন।

ভাষ্য; ১।২)। আবার শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ (বৃহদারণ্যক, ৪।১)। সুতরাং এই সকল কথা একত্র করিলে, শঙ্করমতে নির্গুণ ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিস্বরূপ হইতেছেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই পূর্ণশক্তিরই সর্গোন্মুখ পরিণাম উপস্থিত হয়। শক্তির এই আগন্তুক পরিণামেরই নাম "মায়াশক্তি।" কিন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে, এই আগন্তুক পরিণাম হইল বলিয়াই যে উহা কোন স্বতন্ত্রশক্তি হইয়া উঠিল, তাহা নহে। উহা তখনও সেই পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্মই। "মায়ায়াঃ আত্মতাদাত্ম্যোক্ত্যা স্বতন্ত্রত্ব-নিরাসঃ"। আর একটা কথা আছে। শক্তির এই পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই, তদধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে "ঈশ্বর" বলা যায়। কিন্তু তখনও উহা সেই নির্গুণ-ব্রহ্মই। যাঁহারা পরমার্থদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে শক্তির সর্গোন্মুখ পরিণাম হওয়াতেই যেমন উহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না,—উহা পরমার্থতঃ সেই শক্তিই থাকে। তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মও, সেই পরিণামিনী শক্তির উপলক্ষে সেই শক্তির অধিষ্ঠাতারূপে 'ঈশ্বর' হইলেও,—পরমার্থতঃ তিনি সেই নির্গুণব্রহ্মই। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। এই ভাবিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "পরমার্থ দৃষ্টিতে "ঈশ্বরও থাকেন না, জগৎ সৃষ্টিও থাকেনা" (২।১।২১ বেদান্ত ভাষ্য)। কেন না, পরমার্থদৃষ্টিতে ত আর মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম হইতে 'পৃথক' বলিয়া বোধ থাকে না।* ঈশ্বরকেও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ থাকে না।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি যে পরিণামবাদকে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা নহে।

এই সকল তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অল্পধী ব্যক্তিরা মনে করেন যে, শঙ্কর পরিণাম-বাদকে অসত্য বলিয়াছেন এবং শক্তিকেও উড়াইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই, শক্তিকেও উড়াইয়া দেন নাই এবং ঈশ্বরকেও 'অসত্য' বা মিথ্যা বলেন নাই। তিনি এ সকলকে রাখিয়াই নির্গুণব্রহ্মের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* এই অংশটার তাৎপর্য্য অনেকেই বুঝেন না। বুঝেন না বলিয়াই শঙ্করের উপরে এত অবিচার ও অপ-সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে পূর্ণ শক্তিস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। এবং যে শক্তি দ্বারা জগতের বিকাশ হয়, তাহাকে তিনি 'মায়াশক্তি' বলিয়াছেন। এই মায়া-শক্তি ব্রহ্মের পূর্ণশক্তির মধ্যেই একাকার হইয়া লীন ছিল, কেবল সৃষ্টির প্রাক্কালে ইহার বিকাশ হয় মাত্র। এই ভাবেই মায়াশক্তিকে 'আগন্তুক' 'কাদাচিৎক' বলা হয়। কার্য্য যেমন অভিব্যক্ত-কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; এই মায়াশক্তিও তদ্রূপ অভিব্যক্ত-পূর্ণশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে মায়াশক্তি ব্রহ্মই। সুতরাং মায়ার বিকাশ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হইতেছে না; নির্গুণব্রহ্ম কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া যাইতেছেন না। ইহাই শঙ্করের হৃদ্গত তাৎপর্য্য। ইহাতে শক্তি অসত্য বা মিথ্যা হয় না; জগৎও উড়িয়া যায় না; নির্গুণব্রহ্মও বিকারী হইয়া উঠেন না। কেন না, যাহাকে তুমি বিকার বা কার্য্য মনে করিতেছ,—উহা ত প্রকৃত পক্ষে কারণই। এই জন্যই শঙ্কর কার্য্য হইতে কারণের স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Hegelএরও সিদ্ধান্ত এইরূপ :—The effect is the cause effected, explicated, manifested. There is nothing in the effect which is not also in the cause; nor is there in the cause that does not assert or realise itself" (Weber's History of Philosophy translated by F. Thilby.)

# হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

( মৃত্যু—৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, শুক্লাদশমী—প্রাতঃকাল )

১

একাকিনী অসহায়া বিধবা রমণী,
একমাত্র শিশু দু'টী আশার সম্বল,
অশ্রু দিয়া দিন গণে দিবস রজনী,
জীবনে বহিবে আর কত অশ্রুজল!

কবে গেছে প্রিয়পতি কোথা কোন্ দেশে,
কবে যাবে তার কাছে ভাবনা কেবল,
নিদ্রা গেছে মনোরথে তাহার উদ্দেশে,
স্মৃতি আছে পথ চেয়ে পল অনুপল!

কল্পনা গড়িলে তাঁরে আঁখিজলে মুছে,
বিশ্বাসে পাইলে কাছে নিঃশ্বাসে উড়ায়,
জীবনের এই স্বপ্ন আজি গেছে ঘুচে,
সে আজি সত্যই পতি পাইয়াছে হায়!

আজি সে অনন্তধামে অনন্ত সন্তোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ!

২

শুভ্রকান্তি শুভ্রবেশ বিশুদ্ধ বিধবা,
জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা শুভ্র সরস্বতী,
যোগমগ্ন তপস্বীর তপ সমুদ্ভবা,
মুমুক্ষুর ভক্তি মুক্তি শান্তি মূর্ত্তিমতী!

কামনা আকাঙ্ক্ষা আশা জ্ঞান কর্ম্মযোগ,
একমাত্র পতিপদে বিশ্বপতি রূপে,
বাক্য মন দেহে দিয়া যা করে সম্ভোগ,
সকলি অর্পিত তার দক্ষিণা স্বরূপে!

উৎপীড়িত উপেক্ষিত দরিদ্র ভিখারী,
ক্ষুধিত আতুর অন্ধ দীন দুঃখী জন,
রোগে শোকে সকলের নিত্য সেবাকারী,
নিঃস্ব রূপে পূজিয়াছে বিশ্ব নারায়ণ!

পবিত্র চরিত্রে তার দেবতা সন্তোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

৩

হেমন্তের হৈমমেঘ কনক কিরণে,
আলো করে বিশ্বরাজ্য—স্বর্গ ধরাতল,
কিন্তু যবে নিদাঘের ঘোর উৎপীড়নে—
অত্যাচারে দগ্ধ করে ধরণী শ্যামল,

তখন সে ক্ষোভে রোষে ভীমা ভয়ঙ্করী,
ধরে সে ভৈরবী মূর্ত্তি করালী কালিকা,
গদাঘাতে ভাঙ্গে ব্যোম, দিক্ দগ্ধ করি
নয়নে জ্বলিয়া উঠে শত বজ্র শিখা!

তেমনি তুমিও দেবি আর্ত্তের রক্ষণে
অবতীর্ণা রণক্ষেত্রে ছিন্নমস্তাবৎ,
পরাজিয়া দৈত্যদল একাকিনী রণে
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিবে জগৎ!

পবিত্র চরিত্র তব নির্ম্মল নির্দ্দোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বীসতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ!

৪

পর্ব্বত প্রান্তরে কিম্বা কানন কান্তারে,
যখন যেখানে থাকি—নিকটে কি দূরে,
না চাহিতে দেয় আলো সতত আমারে,
দিবা নিশি রবি শশী সাথে সাথে ঘুরে!

তুমি থেকে তারো উর্দ্ধে—বৈকুণ্ঠে গোলোকে
জ্বলিতেছ ব্রহ্মতেজে বিশ্বের জীবন,
বরষি স্নেহের সুধা, দুঃখে রোগে শোকে,
দিবা নিশি করিতেছ শান্তি বিতরণ!

রোধিবে তোমার জ্যোতি তোমার কিরণ,
নাহিক এখন মেঘ, হেন কুজ্ঝটিকা,

সর্ব্বভেদী সর্ব্ব-আত্মা সর্ব্ব-দরশন
সর্ব্বরূপে জলে আজি তব রূপ-শিখা!
তোমারি প্রসন্ন হাসি প্রভাত প্রদোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

# পরবশতা। (৪)

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই—মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বলহীন মুক্তির অধিকারী হয় না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে বলিতেছেন, পরবশতার ফল অবসাদ। ইহাকেই ভগবদ্গীতাতে ক্লৈব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ক্লৈব্য পরিহার না করিতে পারিলে ধর্ম্মহানি অনিবার্য্য। মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ * উত্তিষ্ঠ অর্থে কর্ম্ম করা। ক্লৈব্য পরিহারের একমাত্র উপায়ই কর্ম্ম করা। বিধিসম্মত কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্লৈব্য দূর হয়, হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়। তাই বলকে ব্রহ্ম বোধে উপাসনা করিতে হইবে। নতুবা কর্ম্মে একাগ্রতা, তন্ময়তা হয় না। কিন্তু বিধিসম্মত উপায় কি? যাহা চাও, তাহার উপযোগী উপায়ই বিধিসম্মত উপায়। জীব চায় কি? জীবের এক মাত্র লক্ষ্যই মুক্তি। যাহার হৃদয় ক্ষুদ্র, সে অন্তরের অধিকারী হইবে কেমন করিয়া? পরবশতায় হৃদয়ের বিকাশ নাই, তাই হৃদয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। হৃদয়ের ক্ষুদ্রত্ব, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ধ্বংসের পূর্ব্বগামী, ইহাদিগের ফল ধ্বংস। যে পরবশ সে নিরানন্দ, তাহার হৃদয়ে আনন্দ থাকে না, তাহার কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। তাই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে। ট্যাস্‌মানিয়ার আদিম নিবাসিগণ যখন ইউরোপীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করা হইল, তাহাদিগের সহিত কত সদ্ব্যবহার করা হইল, তাহাদিগকে কত স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না। তাহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দেহ ভাঙ্গিবেই ত। প্রথমে তাহাদিগের বংশহানি হইতে আরম্ভ হয়, পরে তাহারা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাহারা স্ববশে থাকিলে ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিত, মৃত্যুর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। আত্মবশতা হারাইয়া তাহারা সব হারাইল। আজি জগতে তাহারা কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে। (১) ইউরোপীয়গণ পশু শিকার করার ন্যায় ট্যাস্‌ম্যানিয়দিগকে শিকার করিয়াছিল;

* ভগবদ্গীতা ২।৩।

(১) After the famous hunt by all the colonists * * * they consisted only of 120 individuals, who were in 1832 transported to Flinders Island. * * * It seems healthy and the natives were well-treated. Nevertheless, they suffered greatly in health. * * * "If left to themselves to roam as they were wont and undisturbed, they would have reared more children and there would have been less mortality. * * * The births have been few and the deaths numerous. This may have been in a great measure owing to their change of living and food; but more so to their banishment * * and *consequent depression of spirit.*

Descent of Man (1906) p 284—286.

কিন্তু তখনও তাহারা নির্ম্মূল হয় নাই। হা ভগবান্, মানুষে কি মানুষ শিকার করে!! কিন্তু তখনও আত্মবশতা ছিল, তাই তাহারা নির্ম্মূল হয় নাই। পরে যখন তাহারা ইউরোপীয়গণের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন আর জগতে তাহাদিগের স্থান হইল না। শিকারাবশিষ্ট ১২০ জন ৩৭ বৎসরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, নিরানন্দ, depression of spirits. আমাদিগের কি হইতেছে? একবার চক্ষু তাকাইয়া দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। নিরানন্দ আমাদিগকে মসিম্লান আবরণে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই সে কালের গ্রাম্য ক্রীড়া কৌতুক কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; সেই নৃত্যগীত, যাত্রা মহোৎসব, আর এতদ্দেশকে নিত্য মুখরিত করে না। উচ্চ হাস্য আজি ক'জনের মুখে শুনা যায়? সকলই যেন নীরব। সকলের মুখেই যেন এক অস্বাভাবিক বিষাদ-রেখাপাত হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল বদন প্রায় কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুগণও প্রথম পাঠ হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবে পত্রলগ্ন-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকে। সেই দৌড়াদৌড়ি, গাছে উঠা, এগুলি যেন শিশুগণও ভুলিয়া যাইতেছে, কারণ তাহাকে 'পড়া করিতে হইবে'। এ সকল দেখিলে কি মনে হয়? আনন্দ গেলে আর থাকে কি? যে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, যে দেশ নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিল, সে আনন্দ কোথায় পাইবে?

পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানব-সংসর্গও একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয়, তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিত স্প্রোট ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপের আদিম নিবাসিগণের বংশ ক্ষয় হইবার কারণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ দ্বীপে ইউরোপীয়গণের নবসমাগমে আদিমবাসীদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তাহাদিগের সমাগম বশতঃ অনেক অস্বাস্থ্য উৎপন্ন হইল; তাহারা নবাগতদিগের সংশ্রবে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কর্ম্মে প্রবৃত্তি-হীন হইয়া উঠিল; পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেল, অথচ নূতন কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল না—এই সকল কারণ বশতঃ তাহারা নির্ম্মূল হইয়া গেল। (১) ডারুইন্ বলেন, দূরবর্ত্তী পৃথক জাতীয় মানবের পরস্পর সম্মিলনে পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহার কারণ সকস্থলে সুবোধ্য নহে, কিন্তু ইহা সত্য। (২) এতদ্দেশে ম্যালেরিয়া কি পূর্ব্বে ছিল? বোধ হয় না। আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া, প্লেগ অথবা কলেরার উল্লেখ নাই। এ সকল সম্ভবতঃ নবাগত পীড়া। কিন্তু নবাগত পীড়াও তাহার মারাত্মক শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত না, যদি দেহে পুষ্টি থাকিত, উদরে অন্ন থাকিত, মনে আনন্দ থাকিত। আমাদিগের এ সকলের সে কিছুই নাই। আমরা বাঁচিব

(১) Mr. Sproat who in Vancouver Island closely attended to the subject of extinction believed that changed habits of life, consequent on the advent of Europeans induces much ill health. He lays also great stress on the apparently trifling cause that natives become bewildered and dull by the new life around them; they lose the motives for exertion and get no new one's in their place.

Descent of Man, p 283.

(২) It further appears mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and seperated people generates disease. Ibid p 283.

কেমন করিয়া? বলিয়াছি ত গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় মানুষ মরিয়া কেমন উজাড় হইয়া গেল; বহুপল্লী কেমন নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইল। হিন্দুর সংখ্যা কেমন নিত্যই ক্ষয় হইয়া উঠিল,—এ সকল কি অকারণ? তাহা কখনই হইতে পারে না। নব সমাগমের ফলই এইরূপ, পরবশতার পরিণামই এই; এ কথা জীববিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে। মনু বলিয়াছেন, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমস্বরে যে তত্ত্ব বিঘোষিত করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। করিলে, তাহার ফল ধ্বংস।

জাতীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন মানবের ধ্বংস সাধনের এক সাংঘাতিক কারণ। যে জাতি চিরাতীত কাল হইতে যেরূপ আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহার দেহ ও মন সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তন হইলে ঐ জাতি তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। ঐ পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে কুফলপ্রদ না হইলেও উহার দূরবর্ত্তী ফল অতীব মারাত্মক। ইহাতে স্বাস্থ্যক্ষয় ও বংশলোপ হইয়া যায়। ডারুইন বলেন, বালকদিগের মধ্যে ইহার বিষময় ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। (১) বালকই ভবিষ্যৎ সমাজ। সুতরাং ইহার ফল ভবিষ্যতে ধ্বংসের পথ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এতদ্দেশে শিশু-মরণ অত্যন্ত অধিক। জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে চিরাগত আচার ব্যবহার সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না। যাহা আপনার তাহা ভাল, যে আপনার সে ভাল—ইহাই এক্ষেত্রে—রক্ষা পাইবার মূলমন্ত্র। কবি বলিতেছেন, নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহা কেবল কবি-কল্পনা নহে, ইহাই কঠোর সত্য। যে জাতি এ মন্ত্র ভুলিয়া যায়, সে সত্যভ্রষ্ট। সুতরাং রক্ষা হইবে কিসে? আহার, পরিচ্ছদ, উৎসব, আনন্দ,—সকল বিষয়েই জাতীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা আয়ুঃক্ষয় হয়, (১) বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়।

আমরা দেখিলাম, পরবশতার ফল অবসাদ। তাহাতে নিরানন্দ আনয়ন করে, অন্নকষ্ট উপস্থিত করে, বিবিধ পীড়া উৎপন্ন করে, শারীর-যন্ত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে পরবশ বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মবশতাই এ পরিণামের একমাত্র প্রতিরোধক। কিন্তু তাহাত কথায় আসে না; উপযোগী কর্ম্ম চাই। কর্ম্মের পূর্ব্বাবস্থা ভাব; সুতরাং ভাবের উত্তেজনা না হইলে এ শ্রেণীর কর্ম্ম হইতেই পারে না। যে জাতি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ভাবের উত্তেজনায় আন্দোলিত হইতে হইবেই। কর্ম্ম তাহার অনিবার্য্য ফল। (২) ভাব যথাযথ রূপে উত্তেজিত হইলে, কর্ম্ম আসিবেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেইকর্ম্ম ক্ষণিক চেষ্টায় পরিণত

(১) The most potent of all the causes of extinction appears in many cases to be lessened fertility and ill health, specially amongst the children, arising from changed conditions of life, *notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves.*
Ibid p. 284.

(১) More alterations in habits which do not appear injurious in themselves seem to have this same effect; and in several cases, chidren are particularly liable to suffer. Ibid p. 201.

(২) Whenever public opinion is roused, it will lead to action.
Nature June, 13, 1907.

না হয়। উহার স্থায়ীত্ব বিধান করা অত্যাবশ্যক। হেকেল্ বলিতেছেন, ভাব সাধারণতঃ বংশগত, কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে উপস্থিত সময়ে নিয়মিত হয়। (১) আমাদিগের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি? এ সময়ের উপযোগী করিয়া ভাবকে নিয়মিত করিতে হইবে। ডারুইন্-প্রমুখ জীবতত্ত্ববিৎগণ বলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্বই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ, হয়ত একমাত্র কারণ। ইহাদিগকে নিবারণ করিতে হইবে। হিন্দুর বংশপরম্পরাগত নিয়ম অনুসারে যত কিছু বিধান প্রচলিত আছে, প্রায় সকলই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল। বিধি-নিয়মের মধ্যে এই বিষয়কে এত প্রাধান্য, বোধ হয় আর কোন জাতিই দেয় নাই। এ সকলকে কদাচ উপেক্ষা করিতে হইবে না। গ্রামে গ্রামে নানাবিধ পীড়ার বীজ যাহা নিহিত আছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। সুস্থ, সবল দেহ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তার পর বংশ। এই ধ্বংসাভিমুখ জাতির বংশবৃদ্ধি হইবার বহু বিঘ্ন রহিয়াছে। ব্যক্তিগত বিঘ্ন ত আছেই, তাহার উপর আবার জাতীয় বিঘ্ন। এই দরিদ্র দেশে ধনগৌরবের উপর বিবাহ-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা বাঁচিব কেমন করিয়া? জানি, বাল্য-বিবাহ বংশক্ষয়কর; (২) জানি, এই সামাজিক কুপ্রথা মরণের খেলা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। জানি, কত পরিবারে বিধবা মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট। জানি, বিবাহ-ক্ষেত্রে এক রক্তমাংস পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত হইলে অপত্যে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; তাই জীবরাজ্যে, অন্ততঃ সময়ে সময়ে, নূতন রক্তমাংসের সহিত মিলিত হওয়া বল সঞ্চয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ সকল বৈজ্ঞানিক কথা জানি। কিন্তু আচরণ করিবার শক্তি কৈ? দুর্ব্বল অধঃপতিত জাতির শক্তিলাভের এক প্রধান উপায়, বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তার। এ সকল বুঝি; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি কৈ? তাই শ্রুতি শিখাইতেছেন, বলকে ব্রহ্মবোধে সাধনা করিবে। পতিত ব্যক্তির উত্থিত হইতে যেমন বলের আবশ্যক হয়, পতিত জাতিরও তাহাই। মানব জীবরাজ্যের বাহিরে নহে; তাই জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল অবগত হইয়া বংশপরম্পরা পুষ্ট ও সুগঠিত করিতে হয়। নতুবা পরবশতার পরিণাম হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। এই পথ কালসাপেক্ষ হইলেও অবশ্য অবলম্বনীয়, আমি এ বিষয় অন্যত্র যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি। (১) এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এতদ্দেশীয় প্রত্যেক নর নারীর মনেই এই একমাত্র কথা বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক যে, পরবশতায় অবসাদ, অবসাদে ধ্বংস। জীববিজ্ঞান এই কথা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেছে। মানবেতর জীবগণের, কি অসভ্য মানবের, অথবা সভ্য মানবের,—সকলের পক্ষেই এই বিধি প্রযোজ্য। এ তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই। ওঁ তৎসৎ। শ্রীশশধর রায়।

(১) The character of the inclination was determined long ago by heredity from parents and ancestors; the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment.
The Riddle of the Universe, 1907 p 47.

(২) Late marriages are far more prolific than early ones
Stark Weathers Law of sex, p 75.

(১) সাহিত্য। কার্ত্তিক ১৩১৪। "ভাব ও কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ।

# যোগীবর সৈয়দ মহীয়ুদ্দীন।

হিন্দু নরপতির অধিকৃত সুদূর কোচিন রাজ্য পরিব্রজন করিতে করিতে এক দিবস আরব্য মহাসাগরের সুরম্য ও সুপ্রশস্ত তটে নীরবে ও নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ও প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করিতে করিতে বিভোর হইয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক পশ্চাদ্দিক হইতে আগমন করিয়া আমার পৃষ্ঠ দেশ স্পর্শ করতঃ কহিল "আপনি কি এই সুন্দর ছবি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন?" প্রশ্নকারীর দেহ ও বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, ইনি একজন ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী বা সাধু পুরুষ। তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের কেশগুচ্ছ, গল দেশে সুশোভন স্ফটিকমালা বিলম্বিত, গাত্রে নীলবর্ণের পরিচ্ছদ এবং হস্তে দাক্ষিণাত্যের সুপরিচিত তেংগাকোণ নামক জল পাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কাহার ছবি? সন্ন্যাসী বলিলেন "যোগীবর পীরসা সৈয়দ মহীয়ুদ্দীনের প্রসিদ্ধ স্মৃতি-মন্দিরের ইহা প্রতিকৃতি, আপনি কি এই মনোহর মন্দির দর্শন করিয়াছেন?" আমি কহিলাম "না"। এই সুবিখ্যাত স্মৃতিমন্দির দর্শন অথবা এই পরম যোগীর নাম এ পর্য্যন্ত আমার নিকট অশ্রুত আছে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব পূর্ব্বক আমাকে ঐ সুরম্য স্থানের এবং ঐ তাপসবরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিজ্ঞাত করিবার জন্য, মোসলমান সাধু সমুদ্র তটে উপবেশন করিলেন এবং অনুকম্পা সহকারে আমাকে ইহাদের বিবরণ শুনাইতে লাগিলেন। আমি সেই সুপণ্ডিত ও সত্ত্বগুণপরায়ণ সাধকের সুমধুর বাণী যতই শ্রবণ করিতে লাগিলাম, ততই শ্রবণের ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিলাম, যতই ক্লেশ বা অসুবিধা হউক, এই মনোহর স্মৃতিমন্দির অবশ্য দর্শন করিতেই হইবে, এবং এই সুপবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া ইসলাম-সমাজ-তিলক যোগীবরের যোগজীবনের মধুময়ী কাহিনী বিশেষ করিয়া তদ্দেশীয় লোকের মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক পিপাসা মিটাইতে হইবে।

কোচিন রাজ্য হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের সময়ে আমি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিনেভেলী (Tinneveliy) জেলার অধীনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উপরিস্থিত কিলাকদায়াম (Kila Kadayam) নামক ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিলাম। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রায় সমস্ত রাত্রিকালে আকাশ হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণে শীতল বায়ু সহ বৃষ্টি পতিত হইতেছিল; সুতরাং বাধ্য হইয়া ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশনে সমুদয় রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, গ্রাম হইতে অনেকটা দূরে ষ্টেশন অবস্থিত। সম্মুখে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহার একদেশে এক সুপ্রশস্ত

সরোবর বা দীর্ঘিকা। গিরিবরের গাত্রনিঃসৃত ঝরণার জলরাশি অনবরতঃ প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বিস্তৃত করিতেছে। এই মনোহর সরোবরের প্রায় চারিদিকে খ্রীষ্টান পুরুষ ও রমণীদিগের মৃত দেহের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান। সরোবরের বিমল জলে স্নাত হইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু গ্রামে গিয়া দেখি, বিদেশীর জন্য কোথাও স্থান নাই। অধিবাসীগণ ধর্ম্মস্পৃহাহীন এবং উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া এরূপ পাশ্চাত্য রীতি নীতিতে অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে যে, এদেশীয় প্রাচীন সাত্বিক প্রথা সমূহ উত্তরোত্তর পরিহার করিয়া এক প্রকার কিম্ভূত কিমাকার জীববৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানকার উচ্চ জাতি অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু অধিকতর ভদ্র ও ধর্ম্মপরায়ণ। যাহা হউক, অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর একজন শূদ্র জাতীয় ব্যক্তির বাসা বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং সেইখানে আমার সামান্য দ্রব্যাদি রাখিয়া দিয়া একটা বলদশকটে আরোহণ পূর্ব্বক দুই মাইল দূরে পুড়ালুপড্ডু নামক গ্রামাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম। এই গ্রামেই যোগীবর পীরসা মহীয়দ্দীনের প্রসিদ্ধ স্মৃতি-মন্দির অবস্থিত। শকটে গমন করিবার সময় দেখিলাম, অসংখ্য লোক নানাবিধ মৃন্ময়পাত্র মস্তকে রাখিয়া রাশি রাশি "গুড়" বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, এদেশে তাল ও খর্জ্জুর গাছের রস হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের লোকের ইহা এক প্রধান জীবিকা।

পুড়ালুপড্ডু গ্রামে শকট খানি উপস্থিত হইবামাত্র মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; তীব্রভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সমুদয় আকাশ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেদেশের বলদ যেমন বলবান, শকটবানগণও তেমনি সুদক্ষ, বিশেষতঃ বলদ-শকট এমন শক্ত ও সুন্দর হয় যে, তাহার ভিতরে দুই জন ভদ্রলোক অনায়াসে শয়ন করিয়া যাইতে পারে; রৌদ্র, হিম বা বৃষ্টির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে স্মৃতি-মন্দিরের প্রথম দ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দূর হইতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, ইহা অতি সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র এবং ইহা এক প্রকার তপোভূম। মনে মনে কহিলাম—

জয়তি জন্মভূমিশ্চ জয়তি জগদীশ্বরঃ।
জয়তি সাধুশাস্ত্রঞ্চ জয়তিধার্ম্মিকোজনঃ॥

প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে আমি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারের পার্শ্বে বহুসংখ্যক অন্ধ, খঞ্জ ও দরিদ্রলোক উপবেশন করিয়া ভিক্ষা-প্রার্থনা করিতেছিল, কেহবা দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষায় প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য মহানন্দে ভক্ষণ করিতেছিল। দরিদ্রদিগের আশ্রয় স্থানের অব্যবহিত পরে মুসলমান বালক-বালিকাদিগের কোরাণ-শিক্ষার ক্ষুদ্র পাঠ-শালা, তাহার পরে রোগগ্রস্ত জনগণের চিকিৎসার স্থান। এই তিনটী স্থান অতিক্রম করিয়া গেলে, ইস্‌লাম সাধুদিগের আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই আশ্রমে দিবারাত্রি সাধুদিগের সমাগম ও সেবা হইয়া থাকে। মুসলমান সন্ন্যাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবর" এবং "পীরসা মহীয়দ্দীন" উচ্চারণ করিয়া দিবানিশি এই পবিত্র

আগুনকে প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকেন, এই দৃশ্য অতীব চিত্তবিনোদক। এই স্থানে উপনীত হইলে মনে হয়—

সিদ্ধাঞ্জনং মোহনিমীলিতানাং
সিদ্ধৌষধং সর্ব্ব বিধামযানাং।
সঞ্জীবনং পাপবিষৈর্মৃতানন
মাং তারকব্রহ্ম পুনাতুনাম॥

অর্থাৎ—মোহান্ধগণের যাহা সিদ্ধাঞ্জন, সর্ব্বরোগের যাহা সিদ্ধৌষধ, পাপ-বিষে মৃতগণের যাহা সঞ্জীবনী সুধা, হে প্রভো! তোমার সেই তারকব্রহ্ম নাম আমাকে পবিত্র করুক। কারণ—

সংসেবতামখিলতীর্থমশেষশাস্ত্রং
লোকঃ শৃণোতু সকলাংশ্চ গুরূপদেশান।
তাবৎ স মূঢ়তম এব ভবে চিদাত্মিন্,
যাবন্ন তে পততি তত্র কৃপা কটাক্ষঃ।

হে প্রভো! লোকেরা সকল তীর্থেই গমন করুক, আর অনেক শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, যেখানে যত গুরু আছে, তাঁহাদের উপদেশই শ্রবণ করুক, যতক্ষণ তোমার কৃপা পতিত না হয়, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি মূঢ়মতি ও হতভাগ্য থাকে।

পডালুপড্ডু গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান। ইহারা "লব্বাই" যবন নামে খ্যাত। এই শ্রেণীর মুসলমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত অন্য কোথাও নাই, এতদঞ্চলেও ইহাদের সংখ্যা কম। এদেশে মোফ্লা (Mophla) ও লব্বাই নামে দুই মুসলমান সম্প্রদায় বহু পূর্ব্ব কাল হইতে বিরাজ করিতেছে। এক সময়ে ইহাদের আদিপুরুষগণ নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল, যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজে মিশিয়া গিয়াছে; এখনও হিন্দু সমাজের অনেক প্রথা ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। উর্দ্দু ভাষা দুই এক জন জানে, সমুদয় লব্বাই জাতি তদ্দেশীয় তামিল ভাষায় কথোপকথন করে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে ইহারা সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে, চাকুরী স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর হয় না। লব্বাই মুসলমানেরা বলবান, ধূর্ত্ত, পরিশ্রমী ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন। ইহারা যে পরিমাণে সাংসারিক, সে পরিমাণে আধ্যাত্মিক নহে, সকলেই ভাত খায় এবং মৎস্য বা মাংস ভিন্ন ভোজনে তৃপ্ত হয় না।

যোগীবর সৈয়দ সাহেবের স্মৃতি-মন্দিরের আকৃতি কোন মশিদের অথবা রাজপ্রাসাদের আকারের সমতুল্য নহে। নাট্টমন্দিরের আকৃতিরও সহিত ইহার তুলনা করা যায় না। স্বচক্ষে পাঠকেরা দর্শন করিলে ইহার আকার ও গঠন প্রণালী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন, লেখনী দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। মন্দিরের দুইটী প্রধান গেট্ অথবা ফটক। প্রথম গেট্টী গ্রামের বাজারের মধ্যে প্রকাণ্ড বর্ত্মের পার্শ্বে অবস্থিত, দ্বিতীয় গেটের সম্মুখে বীরঅম্বা নাম্নী এক বীর রমণী ও সাধিকার ক্ষুদ্র সমাধিস্তূপ আছে। এই অসামান্য রমণীর প্রকৃত নাম কেহ বলিয়া দিতে পারে না, কিন্তু ইনি বীরমাতা বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন। তামিল ভাষায় অম্বা শব্দের অর্থ মাতা। শুনা যায়, ইনি কয়েকটী ধর্ম্ম যুদ্ধে গমন করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন এবং প্রবীণাবস্থায় ঐ স্থানে তপস্বিনীর ন্যায় ভগবৎ উপাসনায় দিন যাপন করিতে থাকেন। এই প্রশস্ত প্রান্তরে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করায় ঐ স্থানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান নরনারী প্রতিদিন ভক্তির সহিত উহাঁর কবরে

ফুল চন্দনাদি সমর্পণ করিয়া থাকে। সৈয়দ সাহেবের স্মৃতি-মন্দির এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় স্থান সুদৃঢ় প্রস্তরে বিনির্ম্মিত; কারুকার্য্যের লক্ষণ বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু এই মন্দির যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে তর্ক করা অনাবশ্যক। মন্দিরের পার্শ্বে সুবৃহৎ মশিদ, তাহার দুই দিকে দুইটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ। সম্মুখে একটী হস্তি ও দুই একটী মূল্যবান অশ্ব রক্ষিত থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু নরপতি এই মাতঙ্গ ও অশ্ব, এই মন্দিরে উপহার দিয়াছেন। মুসলমানের তীর্থ স্থানে হিন্দু রাজার এবম্প্রকার দান নিতান্ত উদারতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন হিন্দু-মন্দিরে কোন মুসলমান নবাব এই প্রকার দান করিয়াছেন, অথবা করিতে স্বীকৃত আছেন, একথা আমি আমার বহু বর্ষ কালব্যাপী ভ্রমণ কালে কখন দেখি নাই অথবা শুনি নাই। যাহা হউক, এদেশের হিন্দু বা মুসলমানেরা সৈয়দ সাহেবের এই প্রসিদ্ধ স্মৃতি মন্দিরকে মশিদ বা মন্দির কহেনা, ইহা গুন্‌বদ্‌ নামে খ্যাত। এই গুন্‌বদ্‌ একটী সুপ্রশস্ত প্রান্তরোপরে প্রতিষ্ঠিত; তাহার অনেক স্থানে ভগ্নরাশি দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে এখানে আরও অনেক গৃহাদি ছিল, কাল প্রভাবে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই স্মৃতি মন্দিরকে মুসলমানেরা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং দাক্ষিণাত্যে ইহা অন্যতম প্রধান যবন-তীর্থ মধ্যে গণ্য। অনেক ইংরাজ পুরুষও ইহা দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে মুসলমানেরা নেমাজ কার্য্য সম্পন্ন করে এবং সমুদয় স্থানটী দিবা রাত্রি নানা শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এই স্থান দেখিবার যোগ্য।

অতঃপর আমি সৈয়দ সাহেবের জীবনচরিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জনপ্রবাদ, পুরাতন পুঁথি, সৈয়দের বংশধর এবং পুরাতন কাগজ পত্রাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন স্মৃতি-মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত শ্লোকাদির সহায়তাতেও অনেক বিষয় সহজে জানা যায়। অনেক অনুসন্ধানের পরে সৈয়দ সাহেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রামাণিক ভাবে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, পাঠকদিগের কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ জন্য এস্থলে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুদূরদেশবর্ত্তী বোগদাদ, বোখারা ও গজনী হইতে মহা পাণ্ডিত্যশালী এক সম্প্রদায় মুসলমান ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। ইসলামীয় ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সৈয়দ মহীয়দ্দীন এই সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন। বোগদাদ নগর তখন ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য আশিয়া মহাদেশে মহা বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই নগরের একটী অতীব ধনবান ও সম্ভ্রান্ত বংশে মহীয়দ্দীনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি সুখের সহিত বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধনবান ও বুদ্ধিমান পিতা আপন পুত্রের সংশিক্ষার জন্য কোন মতে ত্রুটি করেন নাই, তাঁহার সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান শিক্ষকেরা মহীয়দ্দীনের শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে নানা কারণে সৈয়দের পিতার সহিত অনেকের শত্রুতা উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তদ্দেশীয় নরপতিরও কুদৃষ্টিতে তিনি পতিত হয়েন। স্বল্পকাল মধ্যে যুবার জনক

মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন, কিন্তু পুত্রের জন্ম তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। নানা কারণে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে সৈয়দের পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যান। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর কাল মধ্যে জননীরও মৃত্যু ঘটে এবং যুবতী সহধর্ম্মিনী কোন কারণে আত্ম-হত্যা করিয়া সংসারের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। মহীয়দ্দীন এক্ষণে এমন বিপদে পতিত হইলেন যে, দুই বেলা উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিবার জন্ম নিত্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহাও ক্রয় করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। মাতা পিতা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রী এবং বিস্তৃত সম্পত্তি—এই সমুদয় হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি মহাকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ধনাভাব বশতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যকুসুমের সৌরভ বিস্তৃত হইতে পারিল না। কিন্তু তিনি পরমেশ্বরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া-ছিলেন এবং সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি পরমারাধ্য পরমেশ্বরের ধ্যানে সময় কাটাইতে লাগিলেন। অতি সামান্য মাত্র ভোজ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরমানন্দে পরব্রহ্মের পদারবিন্দ চিন্তায় অহোরাত্র যাপন করিতে লাগিলেন। মহা-জনেরা তাঁহার পিতার গৃহীত ঋণের কথা উত্থাপন করিলে তিনি কোন উত্তরই দিতেন না, লোকেরা তাঁহার দেবমূর্ত্তি, অতুলনীয়া ভক্তি ও ব্রহ্মপরায়ণতা দেখিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ভীত হইত। কিন্তু তথাপি নানা কারণে মহীয়দ্দীনের কষ্টের শেষ ছিল না। ভগবানের কঠোর পরীক্ষায় তিনি এক্ষণে পতিত। ভগবান ভাবিলেন "দেখা যাউক, আমার ভক্ত পুত্র মহীয়দ্দীনের ভক্তির সীমা কত দূর " সুপবিত্র হিন্দুশাস্ত্রে ভগবান কহিয়াছেন—

যো মাং ভজতে নিত্যং বিত্তংতস্য হরাম্যহম্।
করোমি বন্দি বিচ্ছেদং শত কষ্টৈঃ স জীবতি।
ইতি তাপেন সংতপ্তো যদি মাং ন পরিত্যজেৎ
দীয়তে স্বীয় পদাব্জং দেবানামপি দুর্লভম্॥

অর্থাৎ—"যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি হরণ করি, তৎপর তাহাদের যত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আছে, তাহাদিগকে নাশ করি এবং শত শত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। যদি এই সকল ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও আমাকে তাহারা ত্যাগ না করে, তখন আমি তাহাদিগকে দেবতাদিগেরও দুর্লভ যে ব্রহ্ম-পদ, তাহা দান করিয়া থাকি।" পাঠক এ কথা বুঝাইবার আর আবশ্যক নাই, পৃথিবীর সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার পুঞ্জ পুঞ্জ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে।

ভক্ত মহীয়দ্দীন যখন এই কঠোর পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুতাশনদগ্ধ বিশুদ্ধ হেমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন, তখন ভক্ত-বৎসল ভগবানের সিংহাসন টলিল, সেই করুণানিধান পরমপিতা যুবক ভক্তের প্রতি পূর্ণরূপে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দেশের রাজা মহীয়দ্দীনের পিতার সমু-দয় ঋণ রাজকোষ হইতে দান করিলেন, পরম সমাদরে যুবককে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া গুরুজনের ন্যায় রক্ষা করিতে লাগিলেন, যথোচিত বৃত্তি ও উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন এবং রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে দেশ-মান্য পুরুষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার দেহে ও মনে নূতন বল আসিয়া উপস্থিত হইল। মহীয়দ্দীন বুঝিল, ভগবান এতদিনে তাহার দুর্দ্দশা মোচন করিলেন, এতদিনে তাহার ধ্যান ধারণায় শুভদৃষ্টি করিয়া কৃপা বর্ষণ

করিলেন। পাঠক! প্রকৃত ভক্তের পরিণাম সর্ব্বত্র এইরূপ সুখকর।

ধত্তে মরুঃ সুরবলী রমণীয় শোভাং
দগ্ধদ্রুমো' পি ফল পল্লব পুষ্প লক্ষ্মীম্
যস্মিন্ নিপাতয়সি দৃষ্টিমচিন্ত্য শক্তে!
কিং তস্য দুর্ল ভমহো ভুবন এয়ে' পি॥

হে অচিন্ত্য-শক্তিশালিন্ পরমেশ! তোমার কটাক্ষমাত্রে মরুভূমিও নন্দনকাননের শোভা ধারণ করে, দগ্ধতরুও ফলপুষ্প পল্লবে সুশোভিত হয়। তুমি যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি কর, ত্রিভুবনে তাহার দুর্ল ভ আর কি কিছু থাকিতে পারে?

ঠিক এই সময়ে বোখারা, বোগদাদ ও গজনীর পণ্ডিতদিগের বৃহতী সভা হইতে যে সকল সুবিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইসলামধর্ম্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, সৈয়দ মহীয়দ্দীন তাঁহাদের অন্যতম। ধর্ম্মপরায়ণ যুবক ধর্ম্মের জন্য রাজার অধীনস্থ উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃভূমির মমতা পরিহার করিয়া, সুদূর ও অজ্ঞাত ভারতাভিমুখে তীব্রক্লেশে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনেক মাস পরে পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব-প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল বিরাম লাভ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরিব্রজন করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের নানা দেশ প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে তিনি এতদ্দেশীয় নানা ভাষা ও বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন। কয়েক বর্ষ কাল মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং এতদ্দেশীয় অনেক ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও মহীয়দ্দীন সাহেব বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক কাল ভ্রমণের পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়েন এবং তদ্দেশের নানা স্থান দর্শন করিয়া পডালুপড্ডু গ্রামে উপনীত হওনান্তর ঐ গ্রামস্থিত প্রান্তরে ক্ষুদ্র আশ্রম বা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থায়ীরূপে অবস্থিত হয়েন। এই স্থানেই তাঁহার পবিত্র জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয় এবং এই প্রান্তর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে তিনি পঞ্চভূতে পঞ্চভৌতিক দেহ মিলাইয়া দেন। ঐ সুরম্য ও সুবৃহৎ স্মৃতিমন্দির ঐ স্থানেই নির্ম্মিত হয়, ইহার অভ্যন্তরে সৈয়দ পীরসা মহীয়দ্দীনের সুন্দর সমাধি বর্ত্তমান।

প্রথিত আছে, ভুবনবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য মহোদয় জ্ঞানোপদেশ উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে পরিব্রজন করিতে করিতে যোগীবর মহীয়দ্দীনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য ইস্লামীয় সাধুর চরিত্রবল, পাণ্ডিত্য, বিনয় ও পরমেশ্বর-পরায়ণতা দর্শন করিয়া বিমোহিত হয়েন। উভয়ে নানা বিষয়ে শাস্ত্রালাপ করিয়া ও ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার করিয়া একদিন এক সঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানের মুখে আমি এই পুরাতন প্রবাদ শ্রবণ করিয়াছি। এই প্রবাদ তদ্দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কালিপদী গ্রাম অঙ্গমালী পরগণার অন্তর্গত, ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত। বাঙ্গালা ১৩১৪ সনের শরত্ ঋতুতে আমি এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পডালুপড্ড গ্রাম হইতে ইহা সেকালের হিসাবে বহুদূরবর্ত্তীও নহে। আমি ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করাচার্য্যের আদি নাম বা

পিতৃপ্রদত্ত নাম শঙ্কর ছিলনা; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও উপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া তামিল ভাষায় "আচারিয়া" (আচার্য্য) উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং শিবভক্ত ও শৈব ছিলেন বলিয়া শঙ্কর শব্দে বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার রূপ ও মূর্ত্তি যথার্থ শিব তুল্য ছিল, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিব (শঙ্কর) কহিত, এই জন্যই তিনি শঙ্করাচার্য্য নামে প্রখ্যাত হন। তাঁহার আদি নাম দেবগিরি। ইহা প্রামাণিক কথা। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত এই কথার সম্পর্ক নাই বলিয়া এস্থলে ইহার অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সৈয়দ মহীয়দ্দীন বাস্তবিক যেমন পণ্ডিত, তেমনি ধার্ম্মিক ছিলেন। পরোপকার, দয়া, ধর্ম্ম, বদান্যতা, জ্ঞানোপদেশ ও ভগবৎ সাধন তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং একজন পূর্ণ যোগী ছিলেন, অথচ সংসারকে বা সংসারী লোকবৃন্দকে উপেক্ষা করিতেন না। তৈল ও জল একত্র থাকিলেও যেমন মিশে না, অথচ একত্র থাকে, তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারের কল্যাণ জন্য অনেক কাজ করিতেন, কিন্তু কমলপত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিতেন। তিনি ভারতবর্ষে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহিত হইয়াও ভবমায়ায় কখন মুগ্ধ হয়েন নাই। তিনি প্রথমেও যোগী, পরিণামেও যোগী ছিলেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথাও শুনা গিয়াছে, কিন্তু এস্থলে তাহা বর্ণনা করার আবশ্যকতা দেখি না। সৈয়দ মহীয়দ্দীন অতি অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ ছিলেন৳ ধার্ম্মিক ও অসাধারণ পরোপকারী সাধু এই মহামহিমান্বিত যোগীবরকে লোকে "আওবর" কহিত, ইহা তদ্দেশীয় মুসলমানদিগের গ্রাম্য ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ "ঈশ্বর তুল্য পুরুষ।" সৈয়দের মৃত্যু হইলে তিনি পীরসাহ অর্থাৎ যোগীবর বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। যাহা হউক, এরূপ দুর্লভ সাধুগণ কৃপা করিয়া যেস্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান পবিত্র হয় এবং তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল উজ্জ্বল হইয়া যায়।

বিনয়েন গুণো যদ্বদ্দানং দম্ভেন বর্জ্জিতং
তন্মতিনা যথা বিদ্যা জ্ঞানং সঙ্কলনং যথা
পূর্ণিমায়াং যথাকাশো বিরাজেত মনস্বিনি
সাধুনা খল্বিদং বিশ্বং তদ্বদ্বাপ্যধিকং তথা।

অর্থাৎ বিনয় দ্বারা যেরূপ গুণের শোভা হয়, দম্ভ বর্জ্জিত হইলে যেরূপ দানের শোভা হয়, ঈশ্বরে মতি হইলে যেরূপ বিদ্যার শোভা হয়, সদ্বিষয়ের সঙ্কলন দ্বারা যেরূপ জ্ঞানের শোভা হয়, পূর্ণিমায় যেরূপ গগনের শোভা হয়, প্রকৃত সাধু দ্বারা সেইরূপ বা ততোধিক এই বিশ্বের শোভা হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান অন্ধকারময়, এই চিরদুঃখময় ও পাপপূর্ণ সংসারক্ষেত্রে সাধুগণ বাস্তবিক আলোক, শান্তি, জ্ঞান, আনন্দ, ধর্ম্মও মোক্ষস্বরূপ। এই মহাপুরুষেরা সংসারের ভরসা এবং সংসারের প্রধান সহায়।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি, সৈয়দ মহীয়দ্দীন ভারতবর্ষে আসিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছিল এবং পুত্রের বংশধরগণ এদেশে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তানের একবিংশ পুরুষ পরবর্ত্তী সৈয়দ আবদর রহমন কদ্‌রীর সমাধিমন্দির, মহীয়দ্দীন সাহেবের সমাধিমন্দির হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে অবস্থিত। এই নাতিবৃহৎ সুন্দর সমাধিমন্দিরের উপরে পারস্য ভাষায় যাহা খোদিত আছে, তাহা এই—

আবদর রহমণ কাদেরী নানূবর।
তদ্‌মীয়া শানশ্‌ নেক্‌বি
শুদ্‌ মুরত্তব্‌ গুনবদে বলি বোথার।
অল্‌বলী আল্লা গোলানে কম্‌তরী।
গরদীষে সয়ে নিষার করতে ফলক্‌।
গুপ্‌ৎ সুদ্‌ নামে উ খুলদে বরী।

আমি এই সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে কয়েক জন মুসলমানী সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়াছিলাম। এই রমণীগণ অবিবাহিতা এবং কোরাণে বিশিষ্টরূপে পণ্ডিতা। পড়লুপড্ডুর এই স্মৃতি-মন্দির, মশিদ ও সমাধি মন্দিরের এক্ষণে যিনি ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক, তিনি সৈয়দ আবদর রহমন কাদেরী সাহেবের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। আমি তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় ও কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি সুন্দর কোরাণ শাস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, এই পুরাতন ও প্রসিদ্ধ স্থানের অনেকাংশ ভগ্ন ও অনেকাংশ ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট বা সাধারণের অর্থ সাহায্য ব্যতীত ইহার পুনঃসংস্কার হওয়া সুকঠিন।

আমি পুনরায় সৈয়দ পীরসাহ মহীয়দ্দীনের সমাধিমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে তাঁহার উদ্দেশে সেলাম করিলাম, এবং কহিলাম—

যথা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেস্তহৃদিশ্রিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।
বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস যোগাদ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

অতঃপর আমি পুনর্ব্বার সেই বলদ-শকটের সহায়তায় কিলাকদায়াম গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং পূর্ব্বপরিচিত শূদ্রের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে নিশিযাপন করিলাম। যে গ্রামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহে দণ্ডায়মান হইবার জন্য একটুও স্থান পাই নাই, সেই গ্রামে এক দরিদ্র শূদ্রের দয়া, ধর্ম্ম, চরিত্রবল ও অতিথিসেবা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া গেলাম। প্রকৃত কথা এই, যে মূর্খ ও দুষ্ট ব্রাহ্মণ কেবল জাত্যাভিমান লইয়াই উৎফুল্ল থাকে, অথচ কোন গুণেরই গুণী নহে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রমতে চণ্ডালাপেক্ষাও অধম; যে ক্ষত্রিয় ঐ ব্রাহ্মণের অনুকারী, সে ব্যক্তি অন্ত্যজ সমতুল্য এবং যে বৈশ্য সর্ব্বপ্রকার সাত্ত্বিকতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, সেই বৈশ্য পুরুষ বেশ্যার মধ্যে গণনীয়। কিন্তু যে শূদ্র (শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও) করুণা, পরোপকার, বিদ্যা, চরিত্র, ধর্ম্ম ও পরমেশ্বর-পরায়ণতা গুণে অলঙ্কৃত, আমি তাহার পবিত্র পদতলের ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকের কেশ-গুচ্ছের উপর সযত্নে ও সানন্দে রাখিতে স্বীকৃত, কিন্তু দস্যু ও দুষ্ট ব্রাহ্মণের ছায়াটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে নির্ভীক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সর্ব্বদা ঘৃণার সহিত অসম্মত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

# যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা।

বাল্যকালে একটী গল্পে শুনিয়াছিলাম যে, কোন রাজধানীতে একটী রজক বাস করিত। ঐ রজকের একটী গর্দ্দভ ছিল। রজক আহ্লাদ করিয়া তাহার গর্দ্দভের নাম গন্ধর্ব্বরাজ রাখিয়াছিল ও ঐ নামে সর্ব্বদাই তাহাকে ডাকিত। হঠাৎ গন্ধর্ব্বরাজ মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। রজক গন্ধর্ব্বরাজের অভাবে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত ও শোকার্ত্ত হইল এবং শোক-চিহ্ন প্রদর্শন জন্য স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিল। ঐ রাজধানীর প্রচলিত রীত্যনুসারে কোন শ্রেষ্ঠ লোক পরলোক গমন করিলে সহৃদয় সকলেই শোক প্রকাশার্থ মস্তকমুণ্ডন করিত। রজকের মস্তক মুণ্ডনে সকলেই কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইল, গন্ধর্ব্বরাজ মরিয়াছে; গন্ধর্ব্বরাজ কে, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া প্রত্যেকেই অপরের নিকট হইতে ঐ সংবাদ লাভ করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিল। ক্রমে এই শোক-সংবাদ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে, সেখানেও পদাতি হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিলেন। ঐ রাজধানীর রাজপথে একটী উন্মাদ বেড়াইত। সে গন্ধর্ব্বরাজের মৃত্যু-সংবাদ লয় নাই; মস্তকও মুণ্ডন করে নাই। রাজা একদিন সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করণার্থ পদব্রজে নগরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঐ উন্মাদটী মস্তক মুণ্ডন করে নাই; সুতরাং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মস্তক অমুণ্ডিত কেন? উত্তরে, উন্মাদ প্রশ্ন করিল, মস্তক মুণ্ডনের হেতু কি? রাজা বলিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ মরিয়াছেন। উন্মাদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, গন্ধর্ব্বরাজ কে? এবং তাহার মৃত্যুতে কেনই বা মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে? তখন রাজা কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ একটী শ্রেষ্ঠ লোক, তাহার মৃত্যুতে রাজধানীর সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে। উন্মাদ কহিল, কে সে শ্রেষ্ঠ লোক এবং তিনি এমন কি সৎকর্ম্ম করিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে? রাজা অবাক্, বলিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ কে, তিনি কি করিয়াছেন, তাহা তিনি (রাজা) জানেন না। তাঁহার মন্ত্রী মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টান্তে তিনিও শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। উন্মাদ কহিল, মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ধর্ব্বরাজের সবিশেষ তত্ত্ব তাহাকে জ্ঞাপন করিলে সে মস্তক মুণ্ডন করিবে। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী কহিল, তিনি গন্ধর্ব্বরাজ কে তাহা জানেন না, তবে নগর-কোতোয়ালের কথা-সূত্রে তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। নগর-কোতোয়াল বলিল, দারোগা তাঁহাকে বলিয়াছে। দারোগা কহিল, বরকন্দাজ বলিয়াছে। বরকন্দাজ কহিল, রজক বলিয়াছে। অবশেষে রজককে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, গন্ধর্ব্বরাজ তাহার গাধার নাম। ঐ গাধা জীবনে তাহার মহোপকার করিয়াছে; গাধাটীর মৃত্যুতে তাহার ব্যবসা প্রায় বন্ধ ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। এমন উপকারী বন্ধুর মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া সে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। অনুসন্ধানের অভাবে

একটী গর্দ্দভের মৃত্যুতে নগরে সামান্য লোক হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলের মস্তক মুণ্ডন!

ভারতবর্ষে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের গৃহে পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু দশা-বৈগুণ্যে আমরা তাহার অনুসন্ধান করি না; বিদেশীর গৃহস্থিত কাচের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সমাদরে তাহা গ্রহণ করি ও ধন্যোহং বিবেচনা করি। হায় রে! এমন দুর্দ্দশা, এমন আত্ম-বঞ্চনা, এমন আত্মনাদর আর কুত্রাপি নাই। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা করিলে,এই অননু-সন্ধিৎসাই আমাদের জাতীয় পতনের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বহু গবেষণার পর স্থির করিলেন, "survival of the fittest" অর্থাৎ যোগ্যতম দ্বারা অযোগ্যের পরাজয় ও অবশেষে যোগ্যতমের অধিকার বিস্তার ও স্থায়িত্ব। ইউরোপ হইতে অগৌণে ভারতে এই তত্ত্বের আমদানি হইল, আর ভারতের আধুনিক শিক্ষাভিমানিগণ সমোচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ধন্য দার্শনিক! ধন্য চিন্তাশীলতা। ধন্য গবেষণা। এতকাল পর কি গভীর ও জগতের মহোপকারী-তত্ত্বই আজ ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করিলেন; ইউরোপীয় দেশ ভিন্ন আর কোন্ দেশ হইতে ইউরোপীয় উর্ব্বর-মস্তিষ্ক ভিন্ন আর কোন্ মস্তিষ্ক হইতে এমন গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে?" ভারতীয় শিক্ষাভিমানীগণ ইউরোপের নিকট কৃতজ্ঞতা রসে একেবারে আপ্লুত হইয়া গেলেন এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট কত যে অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী জ্ঞান করিলেন, তাহারও ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। একবার নিজের গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন না যে, ইউরোপে দর্শন-শাস্ত্র বিকাশের বহুপূর্ব্বে সেই অমিত-তেজা তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন ত্রিলোক-হিতার্থী ত্যাগী ও মুক্ত অস্মদাদির পূর্ব্বপুরুষ কুশাসনোপবিষ্ট হইয়া বংশ-লেখনী দ্বারায় অলক্তক মসীতে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গিয়াছেন "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা।" ভারতীয় পাঠক, এখন দেখ, কোথায় তোমার উনবিংশ শতাব্দীর survival of the fittest আর কোথায় তোমার খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চগুণিত সহস্র বৎসরের প্রকাশিত "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা।" তাই বলি, একবার দেখ তুমি কে? তোমার কি আছে? তুমি কাহারও অপেক্ষায় কোন অংশে ন্যূন নহ। তোমার ভারতে লুণ্ঠনাবশিষ্ট এখনও যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা আর কুত্রাপি নাই। আর আত্ম-বঞ্চনা করিও না; আর পর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, মহাক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বলিয়া বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নিজকে ও পরবর্ত্তীদিগকে সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল করিও না। পর দস্যুবৃত্তি দ্বারা তোমার গৃহের রত্নরাজি অপসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে যশোরশ্মি বিকীরণ করিতেছে, আর তুমি রত্নের বিনিময়ে কাচ গ্রহণানন্তর "বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্ট" হইয়া তাহার পদলেহন করিতেছ। তোমায় ধিক; তোমার বিদ্যায় ধিক্; তোমার বুদ্ধিতে ধিক্; তোমার পরানুগ্রহে উচ্চ পদ-প্রাপ্তিতেও ধিক! "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা" এই মহামূল্য গভীর তত্ত্ব ভারতবর্ষেই প্রথম পঞ্চনদ তীরে জলদনির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়াছিল এবং সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গঙ্গা ও যমুনার পবিত্রতার ভূমিকে কম্পিত করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে অকাট্য ভাবে ভারতেই যেমন পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণিত হইয়াছে, এমন আর কোথায়ও হয় নাই।

আর্য্য হিন্দুগণ ভারতে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, আদিম-নিবাসীগণ অযোগ্য; আর্য্য হিন্দুর যোগ্যতমতার নিকট আদিম-ভারতবাসীর অযোগ্যতা পরাভূত হইল; আর্য্য হিন্দুগণের রাজত্ব সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইল। কালক্রমে হিন্দুগণের বংশবৃদ্ধি সহকারে হিন্দুরাজত্ব দাক্ষিণাত্যেও সম্প্রসারিত হইল; আদিম-নিবাসীগণও "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা" এই সুগভীর তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়াই হিন্দু রাজাগণের নিকট অবনত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করিল। হিন্দু রাজাগণের পুনঃ পুনঃ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানই ইহার বলবৎ প্রমাণ। কিন্তু হায়; তেহি নো দিবসাগতা। হিন্দু-রাজত্ব বহুখণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া ভাবী অবনতির বীজস্বরূপ হইল। খণ্ডেশ্বর রাজ চক্রবর্ত্তীগণ দিন দিন সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃদ্রোহ পাপে নিমগ্ন হইলেন; তদনন্তর একে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন এবং অপরকেও শ্রীভ্রষ্ট করিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে প্রবল এক একটী যুদ্ধসংঘটিত হইয়া ভারত বীরশূন্য হইতে লাগিল। কাপুরুষাঙ্কশায়িনী শ্রী বিশ্রী হইয়া যান; সুতরাং তিনি পুরুষকার বর্জ্জিত হিন্দু রাজাগণের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দু-রাজাগণ শ্রীহীন হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। "একতায় হিন্দুরাজাগণ, সুখে ছিলেন সর্ব্বক্ষণ। সে ভাব থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধুনদী আসিতে কি পারিত যবন ?"

ভারতবর্ষের এই বিপত্তি সময়ে অপর দুর্ঘটনাবলীও আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সহিত সম্মিলিত হইয়া সোণায় সোহাগা বা মনি-কাঞ্চন যোগ হইল। কথায় বলে "Misfortune never comes alone." বিপত্তি একাকী আইসে না। বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসমাজের সহিত প্রবল সংঘর্ষে দিন দিন ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বৌদ্ধ সংঘর্ষ হইতে সমাজকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে না হইতেই হিন্দুগণ আভ্যন্তরিক সাম্প্রদায়িকতায় ক্ষীণতম হইতে লাগিলেন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম হিন্দুদিগের একমাত্র উপাস্য হইলেও আর্য্যঋষি অনন্ত-শক্তির অব্যক্ত বীজরূপী আধার পরব্রহ্মের মহাশক্তি-মাহাত্ম্য সাধারণে কীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন। ব্রহ্মশক্তির বিশ্লেষণে কয়েকটী মহাশক্তির অবলম্বনে, প্রত্যেক শক্তিকে এক একটী স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনা করিয়া ও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া এক একখানি পুরাণের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে "গুণ হ'য়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"। ব্রহ্মের শক্তি বাহুল্যে পুরাণ বাহুল্য প্রণীত হইল এবং এইরূপে হিন্দুসমাজে বহু ঈশ্বর-বাদ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এক, হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার উপাসনার সৃষ্টি হইল এবং হিন্দুসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল; একত্ব-বিহীনতায় সমাজ বহুত্বে পরিণত হইল; ধর্ম্ম লইয়া, ধর্ম্মের মত লইয়া এক হিন্দুসমাজে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, মারামারি, কাটাকাটি চলিতে লাগিল এবং দিন দিন সমাজ বলহীন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এমন সময়ে আবার আর এক দল দার্শনিকের অভ্যুত্থান হইল। ইঁহারা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, পৃথিবী অনিত্য, সংসার নশ্বর। "নলিনী দলগত জলবত্তরলং,

তৎবজ্জীবনমতিশয় চলনং,” ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সংসার মায়া, স্বপ্নবৎ। স্ত্রী পুত্র, কন্যা, সমাজ, দেশ দুদিনের জন্য,সুতরাং ইহসংসারের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করা ভস্মে ঘৃত নিষেক। ‘কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এবম্প্রকারে শিক্ষিত সম্প্রদায় সংসারের ধার ধারিলেন না, তাঁহারা বিবেক-সেবী হইয়া সংসারকে কারাগার মনে করিলেন ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া,পর্ব্বত-কন্দরবাসী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের শিষ্যশাখা বৰ্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ইহ-সংসারের কোন দৃশ্যমান উন্নতি সংসাধিত হইল না। ইঁহাদের মতাবলম্বী হইয়া যাঁহারা সংসারে থাকিলেন, ইহ-সংসার তাঁহাদিগের নিকট হইতেও অতি অল্পই উপকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই শ্রেণীর লোকও পার্থিব উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, কাজেই বলিতে লাগিলেন,

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যোনরঃ
অঋণী চা প্রবাসীচ সঃ বাবিচর মোদতে।

ধর্ম্মের দিকে লোকের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল; আর্য্যঋষিদিগের প্রভাবে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক দর্শন বিজ্ঞান চরমোন্নতি লাভ করিল বটে, কিন্তু সংসারের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি পূর্ব্বোক্ত কারণ পরম্পরায় শ্রদ্ধা না থাকায় পদার্থ-দর্শনের অধিক উন্নতি হইতে পারিল না। কাজেই ইহ-সংসার অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দু-সমাজ-সংসার দিন দিন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত ও শেষোক্ত কারণে হিন্দুরাজগণ ও তাঁহাদের রাজশক্তি এবং হিন্দু প্রজাগণ ও তাহাদের প্রজাশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। সুবিশাল জ্ঞানের আকর সাগরাম্ভ মহোর্ব্বর ভারত-সাম্রাজ্য, একতা ও জাতীয়তা বিহীন হইয়া, হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, কলহের আশ্রয়ীভূত হইয়া ধ্বংসমুখী হইল। সংখ্যাতীত আর্য্য ঋষির অবগাহন সময়োচ্চারিত সামবেদ গাথা যে পুণ্যসলিল পঞ্চনদ এবং পুণ্যতোয়া সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গঙ্গা ও যমুনা কুলু কুলু ধ্বনিতে সাগর পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে বহন করিয়া লইয়া যাইত, কালক্রমে সেই নদ ও নদীর পুণ্যবারি রক্ত রঞ্জিত হইয়া অসংখ্য হিন্দু বীর সৈনিকের শব-দেহ সাগর-বক্ষে বহন করিয়া লইয়া চলিল! কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ ভারতবর্ষের যে অসংখ্য নৈমিষারণ্যে ও বদরিকাশ্রমে অসংখ্য কুলপতি ঋষি অসংখ্য শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া লোকহিতার্থে সমস্ত জগতের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত করিবার জন্য অসংখ্য শাস্ত্রালোচনা করিতেন, তাহা কালক্রমে সিংহ শার্দ্দুল-সেবী বিজন অরণ্যে পরিণত হইল। যে “সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা” ভারতক্ষেত্র অসংখ্য ধন রত্ন দান করিয়া ভারত সন্তানকে কোন কালে সমস্ত জগতের শীর্ষ স্থানীয় করিয়াছিল, কালক্রমে তাহা যুদ্ধ-রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত হইয়া শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইল। এইরূপে ভারতে অলক্ষিতে অযোগ্যতা প্রবেশ করিল। এক দিকে ভারতের ধন, অন্য দিকে ভারতের অযোগ্যতা বিদেশীয় বীরপুরুষকে আহ্বান করিতে লাগিল। বৈদেশিক বীরপুরুষ বহুবার ভারতাক্রমণ করিয়া ভারতের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিল, ক্রিয়া, কীর্ত্তি বিনষ্ট করিল, তথাপি ভারতের চৈতন্যোদয় হইল না, অযোগ্যতা দূর করিতে ভারত আর প্রয়াসী হইল না। ক্রমে ভারত

সকল বিষয়েই ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও হীন হইয়া অযোগ্যতম হইল, সুতরাং আর ভারত বসুন্ধরা অযোগ্য হিন্দুর ভোগ্যা থাকিতে পারিলেন না। সুযোগ বুঝিয়া একেশ্বরবাদী, একধর্ম্মাবলম্বী, এক মহাজাতীয়ত্বের জন্য সর্ব্বোৎসর্গকারী দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ও মোগল-সম্রাট বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য হিন্দু রাজাদিগের হস্ত হইতে সবলে কাড়িয়া লইলেন। মুসলমান সম্রাটগণ বহুদিন অবিচ্ছেদ প্রবল রাজনীতি-কৌশলে ভারতের শাসন দণ্ড পরিচালন করিলেন। মুসলমান রাজত্ব কালে হিন্দুদিগের ভারত-বেষ্টিত কীর্ত্তি-মেখলা অনেক স্থানে ভগ্ন হইল বটে, কিন্তু তাহাদের বীরোচিত প্রজাহিতৈষণা গুণে ও সুশাসন কৌশলে ভারতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল, বাণিজ্য ও শিল্পের মহোন্নতি সংসাধিত হইতে লাগিল; সাহিত্য ও ইতিহাস পুনরায় অবগুণ্ঠন-মুক্ত হইয়া জগতকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। এইরূপ ভারতে সুখ সমৃদ্ধির প্রসার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! "চিরদিন কাহারও সমান না যায়"। সমস্ত ভারতে একাধিপত্য স্থাপিত হইতে না হইতেই কালক্রমে মুসলমান সম্রাটগণের সরলতায় কুটিলতা, বীরত্বে বিলাসিতা, সাহসে দৌর্ব্বল্য, জ্ঞানে অজ্ঞানতা আসিয়া প্রবেশ করিল। অসূয়া-পরবশ হইয়া ভ্রাতা ভ্রাতার রক্তে হস্ত কলুষিত [illegible] প্রবৃত্ত হইলেন। ভারত-সাম্রাজ্য [illegible]ের ও বিশ্বাসঘাতকতার লীলা-ক্ষেত্র হইল। ক্রমে ভুবন-গ্রাস মোগল সম্রাটগণের শেষ বংশধরগণ রাজনীতি ও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কামিনী-কাঞ্চনের [illegible] মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। যে [illegible] বীর [illegible] কামানের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে স্তম্ভিত হয় নাই, তাহা কালে কাম-কামিনীগণের সুবর্ণ-নূপুর-ঝঙ্কার-নিক্কণ-সংমিশ্রিত বীণা-বিনিন্দিত কমনীয় সুকণ্ঠ-লহরীতে কম্পিত হইতে লাগিল। যে মোগল ও পাঠান বীরগণ যুদ্ধান্তে রণ-ক্ষেত্রাবাসস্থিত শিবিরাভ্যন্তরে কঠোর শয্যায় অবাধে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয় নাই, কালে মর্ম্মর-খচিত ত্রিতল হর্ম্ম্যোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যাও তাহাদের আর আরামদায়িনী রহিল না। মোগল ও পাঠান বীরগণ তরলানল মদিরা ও তাহার সঙ্গিনীগণের ক্রীতদাস হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রকে বিলাসক্ষেত্রে পরিণত করিল। এই সময়ে মুসলমান রাজত্বে অর্থনীতি, সমাজনীতি, শাসননীতি ও ধর্ম্মনীতি ভারত হইতে অন্তর্হিতা হইল। এক সম্রাট পরলোক গমন করিলে তাঁহার সিংহাসন ও রাজছত্র লাভের জন্য পরবর্ত্তীগণের প্রত্যেকেই লালায়িত, কিন্তু হায়! কেহই সিংহাসনে উপবেশন করার ও রাজছত্র ধারণ করার যোগ্য রহিলনা। প্রতিদ্বন্দ্বীগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবার জন্য ঘোরতর অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য মোগল ও পাঠান-বীর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হওয়ায় ভারত বসুন্ধরা বীরশূন্যা হইতে লাগিলেন। ক্রমে ভারত সাম্রাজ্য অযোগ্যতমের আশ্রয়ীভূত হইল।

আবার একদিকে ভারতের ধন ও রত্নরাজি, অপর দিকে দুর্ব্বলতা ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতে লাগিল। অবিলম্বে ক্রমে ক্রমে ভারতোপকূলে ৫ দল ইউরোপীয় বণিক ভারতের রত্ন রাজি লুণ্ঠন করিবার জন্য সশস্ত্র উপস্থিত হইল। এই

ক্ষেত্রেও "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা'। অত্যল্প দিন মধ্যেই ৩ দল বণিক প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিল; অবশিষ্ট ২ দল ভারতে থাকিয়া বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিল। জড় জগতে দুইটী জড় পদার্থ যেমন এক সময়ে একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ,রাজনীতি মাত্রেও দেখা যায়, দুইটী জাতি বা স্বতন্ত্র শক্তি এক সময়ে একস্থানে একটী স্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকিতে পারে না। এই শেষোক্ত দুই দল বণিকের মধ্যে প্রতিযোগিতাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিতে লাগিল; প্রত্যেকেই অপরকে তীব্র স্পর্দ্ধা করিয়া ভারত হইতে চির বিদায় করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। এই দুই দলের মধ্যে এক দল অধিক চতুর, কায়দা কানুনে প্রবল ধূর্ত্ত, উপকারীর সর্ব্বনাশ সাধন ইহাদের মূল নীতি মন্ত্র, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দুর্নীতিপরায়ণতা ইহাদের চিরাভ্যস্ত এবং স্বদেশের উন্নতি কল্পে ইহারা ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক, সুতরাং ইহারা জগতের মধ্যে কর্ম্মবীরাগ্রগণ্য। গুটিপোকা শাবক যেমন দুর্লক্ষ্য সূত্রে গুটির মধ্যে অবস্থানান্তর গুটি ছিন্ন করিয়া বহির্গত হয়,ইহারাও তেমনি, দুর্লক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে মুসলমান নবাব ও সম্রাটের রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বহির্গত হওয়ার জন্য নানা ফিকির করিতে লাগিল। নবাব ও সম্রাটের দরবারে নানা কৌশলে ভিক্ষুক বেশে প্রবেশ লাভ করিয়া "জাসুং পাতয়িত্বা" বহুৎ বহুৎ সেলামী দিয়া, কাচ বিনিময় কাঞ্চন লাভের ন্যায়, সেলামীর বিনিময়ে ভারত-ধ্বংসকারিণী বাণিজ্য-শক্তি লাভ করিল। এই বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য শক্তি লাভ করিবার জন্য সময় সময় যে নীচাশয়তার আশ্রয় করিয়াছিল,ইতিহাসে অদ্যাপি তাহা দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। হায়! উদার ও সরল-হৃদয় নির্ব্বোধ নবাব ও সম্রাট কেহই বুঝিল না,এই প্রদত্ত বাণিজ্য-শক্তি তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদেরই বংশধরগণকে অবশেষে রন্ধনশালাধ্যক্ষ (প্রধান বাবুরচী) করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই স্থানেই এই বণিকসম্প্রদায়ের যোগ্যতমতা ও মুসলমান ভারতেশ্বরের অযোগ্যতা। এই বণিক সম্প্রদায় বহু আয়াসে ও যোগ্যতমতার নীতিবিধানে প্রতিদ্বন্দ্বী-দলকে ভারত বহিস্কৃত করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়া সূচ্যাকারে রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুম্ভীরাকারে বহির্গত হইল এবং সসাগরা সমস্ত ভারতকে আপনার গ্রাসে আনিবার জন্য বিকট মুখ-ব্যাদন করিল। দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, সমাজদ্রোহী,বিশ্বাসঘাতক মুসলমান, হিন্দু ও জৈন ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইল। এই ত্রিপাপ-যোগের ফল সোণার বাঙ্গলার ধ্বংস; বাঙ্গলার ধ্বংসে সমস্ত ভারতের ধ্বংস। অযোগ্যতায় মুসলমান রাজত্বের বিনাশ ও পতন; যোগ্যতমতায় সমস্ত ভারতে কৌশলী, কর্ম্মবীর ইংরেজের একাধিপত্য। "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা"; তাই ভারত বসুন্ধরা আজ ইংরাজের ভোগ্যা—হিন্দু ও মুসলমানের ভোগ্যা নহে। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন,ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, বলে ও বিক্রমে কিছুতেই অন্য জাতি অপেক্ষায় ন্যূন নহে; তবুও যে ভারত পরাধীনা এবং হিন্দু মুসলমান অন্যের দাস,তাহা কেবল বিধাতার লীলা ও চক্র। ইহা কি প্রকৃত

কথা ? ভারতবাসী কি বিধাতার অপ্রিয় এবং ইংরেজ কি বিধাতার প্রিয় ? বিধাতা লীলার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাত ধ্রুব সত্য; তিনি ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব নিজ হাতে রাখেন নাই। মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব; স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য কর্ত্তৃত্বটা একদম তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল"। তিনি মানুষকে ক্রোধ দিয়াছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাও প্রদান করিয়াছেন; তিনি মোহ এবং লোভ যেমন প্রদান করিয়াছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যও তেমনি দিয়াছেন। যেমন অজ্ঞানতা প্রদান দ্বারা মানুষকে পশুত্বে উপনীত হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক দান করিয়া দেবত্বে উন্নীত করিয়া স্বর্গ প্রবেশের দ্বারও উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। মানুষকে যেমন দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, তেজ-বিহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি প্রদান করিয়া পরাধীন থাকার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বিক্রম ও পুরুষকার প্রদান করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন। ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান! এখন দেখ, বিধাতার দোষ নাই; "দোষ কারও নয়গো মা।" দোষ তোমার নিজের। তোমার অতুলনীয়, দেববাঞ্ছিত শৌর্য্য, বীর্য্য, বল বিক্রম ও পুরুষকার ছিল, কিন্তু তাহা হারাইয়া দুর্ব্বলতা, তেজবিহীনতা ও কাপুরুষতার আশ্রয় লইয়াছিলে, আর অমনি ইংরাজ তোমাদিগকে পরাধীন করিয়া ফেলিল। "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা।" তবে তোমরা বলিতে পার, ইংরাজ ত শৌর্য্য বীর্য্যে, বল-বিক্রমে, বা পুরুষকারে তোমাদিগকে দখল করে নাই; ইংরাজ চাতুর্য্যে, ছলে ও কৌশলে এবং ষড়যন্ত্রের তন্ত্রে ভারত দখল করিয়াছে, পুরুষকারে নহে। তোমরা বল, ইহা সত্য; আমি বলি, মিথ্যা। চাতুর্য্যে, ছলে ও বলে অতি সহজে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কোটী কোটী টাকার ধ্বংস, তাহার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও কায়-ক্লেশ; তাহার জন্য কোটী কোটী নরহত্যার প্রয়োজন কি ? দেখ, ইংরাজ কেমন অতি সহজে সমস্ত ভারতটা দখল করিয়া বসিয়াছে। যদি তোমাদের মত বোকা ছেলে হইয়া ন্যায়যুদ্ধের আশ্রয় লইত, ধর্ম্মপথে চলিত, সত্যবাদী হইত, জাল জুয়াচুরী না করিত, কথায় কথায় তোমাদের ন্যায় শাস্ত্রের (বাইবেলের) ও শাস্ত্রের দোহাই দিত, তবে কি আজ ইংলণ্ডের এত ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি হইত ? বোকা ছেলে হইয়া অপরের বিনামা-প্রহার অকাতরে সহ্য করাই ভাল ? না, চালাক ছেলে হইয়া পরের প্লীহা ফাটাইয়া অবাধে ঘরে ফিরিয়া আসা ভাল। বিচারের ভার তোমার প্রতি, একবার ভাল করিয়া কালানুসারে চিন্তা করিয়া দেখ, কোন্‌টা ভাল। রাজনীতি পরিবর্ত্তন-শীল, যখন যেমন, তখন তেমন। তোমাদের সেই সত্য যুগের ধর্ম্মনীতি এখন খাটিবে না; কালের পরিবর্ত্তনে, দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনে, নীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে যেমন, তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিতে হয়। তোমাদেরই রাজনীতি-শাস্ত্রে কথিত আছে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" অর্থাৎ যেমন কাস্ত-কামার, তেমন বাঁশের অঙ্গারটী হওয়া চাই। ভারতেই প্রথম কর্ম্মবাদের প্রতিষ্ঠা, ভারতেই কর্ম্মবাদের উন্নতি। ভারত-দার্শনিক অমিততেজা ঋষি "নমস্তে কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি যেভ্যঃ প্রভবতি" বলিয়া বিরাট বিধাতা

পুরুষের উপরেও কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ভারতবাসী আজ অকর্ম্মণ্য; ভারতের কর্ম্মবাদে ইউরোপের সমস্ত দেশ, এসিয়ার সমস্ত দেশ সবাই স্বাধীন; কেবল ভারত পরাধীন। ভারতের অজস্র শস্য বিদেশীর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, ভারতের ধন বিদেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য, ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত বিদেশীর কেরাণীগিরি, বাবুরচি-গিরি, সহিসগিরি ও কোচোয়ানী-গিরি করিবার জন্য। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান! রাজপুত্র ও বাদশাজাদা! তোমরা কর্ম্মবীরের বংশধর, কিন্তু আজ অকর্ম্মণ্য গোলামের জাত; গোলামী শিখিয়া বাবুরচি-রূপে বিদেশীকে অন্নদান করিতেছ। এই অন্নদানের ফল কি, জান? দানের ফল অতি মহৎ; "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" দিন দিন ভারতে বিদেশীর সংখ্যাধিক্যে দেশময় বিদেশী হইবে, আর তোমরাও কেবল বাবুরচি ও কুলী হইয়া (নিজেরা পেটে না খাইয়া) পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অন্নদান করিতে থাকিবে! নিঃস্বার্থ দাসত্বের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কোন দেশের ইতিহাসে নাই। একবার ভাই, দেশের কথাটা ভাব, দেখ কি ছিলে, কি হইয়াছ, আরও বা কি হও। যদি তথাপি বল, তোমাদের দাসত্ব বিধাতার লীলা, ভারতে ইংরাজের আগমন বিধাতার লীলা, তবে আমি নাচার। তোমরা কর্ম্মীর সন্তান, অথচ অকর্ম্মণ্য হইয়াছ, পদার্থতত্ত্ব তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অথচ তোমরা নিতান্ত অপদার্থ হইয়াছ। তোমরা যখন সুযোগ্য ছিলে, ভারত বসুন্ধরা তখন তোমাদেরই ভোগ্যা ছিল, তোমরা অযোগ্য হইয়াছ, ভারত-বসুন্ধরা যোগ্যতমের ভোগ্যা হইয়াছে। বিধাতার দোষ ত কিছুই নাই, তোমাদেরই কৃতকার্য্যের ফল তোমরা ভোগ করিতেছ। "দোষ কারও নয়গো মা।" কর্ম্মহীনতায় তোমরা এমনই মূঢ় হইয়াছিলে যে, সার্দ্ধৈক শতাব্দীর কঠোর নির্য্যাতনে এবং অমানুষিক নিপীড়নেও তোমরা আত্মদুর্দ্দশা বোধগম্য করিতে অক্ষম। কর্ম্মভূমি ভারতক্ষেত্রে তোমাদের জন্ম, তাই বিরাট বিধাতা পুরুষ তোমাদের সহায়। বিধাতা তোমাদের শবদেহে চৈতন্যোৎপাদন, বিনষ্টবীর্য্যে বলসঞ্চার ও বিলুপ্তবিক্রমে সাহস এবং অধিগত কাপুরুষতায় পুরুষকার প্রদান করিবার জন্য বহু চেষ্টায়, বহু রাজনীতিজ্ঞের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণন করিয়া দিয়া ভারতে মহামহিমান্বিত প্রবল পরাক্রান্ত অশেষ বিদ্যাসাগর-তল-পরিমাপকারী পৈতৃকোপাধি-স্বত্ববিহীন লর্ড উপাধিভূষিত শ্রীযুক্ত কুর্জ্জন বাহাদুরকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করাইলেন। তদীয় অতুলনীয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে, কূটরাজনীতি-চক্রাবর্ত্তনে তোমাদের কুহেলিকাবরণ ( hypnotism ) উন্মুক্ত হইয়াছে। তোমরা দিব্যদৃষ্টিতে পূর্ব্বের ভ্রম ও বর্ত্তমান আত্মাবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ। ক্ষেতে গেলে কৃষাণ চেনা যায়। এতদিন পরে তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছ, এখন তাই কর্ম্মকৃষাণকেও বুঝিতে পারিয়াছ। কুর্জ্জন বাহাদুরকে শত শত ধন্যবাদ দেও। যেমনই তোমাদের আত্মদর্শন, অমনিই বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বক্তৃতার বিষয়গুলিও পটাপট জুটিতে লাগিল। ১ম বঙ্গমাতার অঙ্গব্যবচ্ছেদ, ২য় বিদেশীয় পণ্য-বর্জ্জন, ৩য় স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ও দেশীয়শিল্প-বাণিজ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহার, ৪র্থ স্বরাজ। বক্তৃ-

তার চোটে পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমাচল কম্পিত হইল; সাগরমুখী কুমারিকা যায় যায় হইল; পূর্ব্বাপর তোয়নিধির উত্তাল তরঙ্গান্বিত বীচিমালা স্তম্ভিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিধাতা-পুরুষ ভারতবাসীর সহায়; বিধাতাপুরুষ দেখিলেন, ভারতবাসী বক্তৃতায় মাতিয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, স্থানাস্থান নাই, আসনাসন নাই; কেবল বক্তৃতা। ভারতশীর্ষ সুরেন্দ্রনাথ হইতে কৃষক আবদুল্লা পর্য্যন্ত সকলেই বক্তৃতায় মাতোয়ারা। বিরাট বিধাতাপুরুষ দেখিলেন, শুধু বক্তৃতায় ত কর্ম্ম হয় না; ভারতবাসীকে কর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে; তিনি আসরে নামিলেন। সুদর্শন চক্রের প্রভাবে দুষ্টা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া প্রবল রাজনীতি কুশল ভারতগবর্ণমেণ্টের দক্ষিণ হস্ত রিজলীসাহেব বাহাদুরের কণ্ঠে আবির্ভূতা হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। একেত হনুমান্, তাতে রামের আজ্ঞা। এবম্প্রকারাদিষ্টা দুষ্টা সরস্বতী অবিলম্বে রিজলীকণ্ঠে বিরাজমানা হইলেন, আর "অর্ডিনেন্স ও সারকুলার" বাহির হইল এবং "সেকরার টুক্‌টাক্, স্থতারের এক ঘায়" বক্তৃতার দফা রফা হইয়া গেল। অর্ডিনেন্স ও সারকুলার তোমাদেরই উপকারের জন্য বিধাতার লীলা। এখন বেশ হইয়াছে, এখন মৌনী হও, মৌনব্রতাবলম্বী হও, কর্ম্ম কর। কর্ম্ম কর ধ্যান, কর্ম্ম কর জ্ঞান। যে পর্য্যন্ত না কার্য্যসিদ্ধি, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম। সিদ্ধিঃসাধ্যে সতামস্ত প্রসাদাহিত ধূর্জ্জটেঃ। ভাই, আর একটী কথা; কর্ম্মের ও আবার চৌহদ্দী আছে, চৌহদ্দী ছাড়িয়া কর্ম্ম করিলে নিষ্ফল হইবে। উদ্দেশ্যবিহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিলে গন্তব্য স্থানে পৌছান যায় না। শুনিয়াছি, নন্দীর এক প্রিয় শিষ্য গাঁজাখোর মাঝি বাঁধা নৌকা সমস্ত রাত্রি বাহিয়াও গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিয়াছিল না।

"স্বরাজ" আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পৈতৃক স্বত্ব; ইহা আমাদের ন্যায়, ধর্ম্ম ও আইনানুমোদিত দাবি; তবে ইহাত সহজপ্রাপ্য নহে। "মাকে পাওয়া মুখের কথা নয়, পাষাণ হ'তে পাষাণ হলেও হয় কি না হয়।" এস্থলেও ত "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা।" আমাদের স্বত্ব ও দাবি প্রকৃত হইলেও, স্বকার্য্য-জনিত বাধা (Estoppel) ( অর্থাৎ নিজের মূর্খতা, মূঢ়তা, বিশ্বাসঘাতকতা, মাতৃদ্রোহিতা করিয়া একবার ছাড়িয়া দিয়াছি) হেতু পরহস্তগত সম্পত্তি সহজে কেমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া পাইব? ধন যাহাদের হস্তগত, তাহাদের সমকক্ষ বা তাহাদিগ হইতে অধিকতর যোগ্য না হইলে, ভারত-বসুন্ধরা তোমাদের ভোগ্যা হইবে না। ইংরাজ ছলে হউক, কৌশলে হউক, অথবা চাতুরীতে হউক, সমস্ত দেশ নিজগ্রাসে আনিয়াছে। সহস্রজিহ্ব অগ্নি যত আহার করেন, ততই ক্ষুধা বৃদ্ধি। ইংরাজও ভারতের ধন যত শোষণ করিতেছেন, ইংলণ্ডে তাহা আটুক্ আর নাই আটুক, ইংলণ্ডের তাহা প্রয়োজন বা নিষ্প্রয়োজন হউক, ইংরাজের ধন লুণ্ঠন বৃত্তি দিন দিন প্রবলতর হইবেই হইবে। ন জাতু কামঃ কামীনাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে!! ইংরাজ তাহার স্বার্থ তোমাকে অক্লেশে ছাড়িবে কেন? চাকরের চাকরী গেলে যাহা থাকে, ইংরাজের ভারত গেলেও তাহাই থাকিবে। তুমি যখন তোমার স্বার্থ লইয়া টানাটানি

করিবে, ইংরাজ অমনি নিস্পেষণ-যন্ত্র চালাইবে। লাজপৎ রায় ও অজিৎ সিংহের নির্ব্বাসন, ভূপেন্দ্রের কারাদণ্ড, নিবারণের ফাঁসির হুকুম, মঙ্গল সিংহ ও দ্বারকানাথের দ্বীপান্তরিত হওয়ার আজ্ঞা, জামালপুরের মোকর্দ্দমার বিচার, পাঞ্জাবীর মোকর্দ্দমার দণ্ডাদেশ, রাউলপিণ্ডীর মোকর্দ্দমার হুকুম ইত্যাদি সহস্র সহস্র ঘটনা তোমার চক্ষুর সমক্ষে তাণ্ডব নৃত্যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তুমি মনে করিতেছ, মহামান্য হাইকোর্টের প্রতীকারে অত্যাচার ও অবিচার নিবারিত হইবে; ইহা অসম্ভব। স্বাধীনচেতা বাঙ্গালি-কুল-তিলক সারদা চরণের ন্যায় ও ধর্ম্ম ভীরু, ন্যায় মর্য্যাদা-রক্ষণ-তৎপর ইংলণ্ড হইতে নবাগত যুবক ব্যারিষ্টার মহামতি ফ্লেচার সাহেব বাহাদুরের ন্যায় জজ আর কতদিন হাইকোর্টের ফৌজদারী বেঞ্চ অধিকৃত করিয়া থাকিবেন? সিভিলিয়ান জজ দ্বারা ফৌজদারী-বেঞ্চ শোভিত হইলেই তোমাদের আশা ভরসার ওয়াক্কা। বিশ্বাস না হয়, জামালপুরের মোসনের মোকর্দ্দমার রায় গুলি পড়িয়া দেখ। এখানে একটী গল্প পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া আবশ্যক। একটী জেলায় জজ আইন মানিতেন না। সর্ব্বদাই বে-আইনী লম্বা লম্বা হুকুম দিতেন। প্রাচীন ও প্রবীণ সেরেস্তাদার সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, ইহা বে-আইনী, উহা বে-আইনী। সাহেব সেরেস্তাদারের অযাচিত হিতাকাঙ্ক্ষায় কর্ণপাত করিতেন না; সেরেস্তাদার কর্ত্তব্য বোধে তবুও বুঝাইতেন। অবশেষে জজ সাহেব একদিন সক্রোধে বলিলেন "ডেখ সেরেজডার! আইন টোমারা বাপ ডাডা কিয়া, না হামরা বাপ ডাডা কিয়া?" সেরেস্তাদার বলিলেন, "হা হুজুর আপকা বাপ দাদা কিয়া।" জজ অমনি বলিলেন, "তবকা, হাম্ আইন তামিল করেঙ্গে নাই, তোমকো সব্ তামিল করনে হোগা।" এইত বিলাতী আইনের মর্ম্ম; এই রাজ কর্ম্মচারী-তন্ত্র (Bureaucratic) শাসন প্রণালীর বীজ মন্ত্র।

ইংরাজ আবার "স্বরাজের" অর্থ উল্টা সমজে রাম করিয়া মহা গোলে পড়িয়াছেন। ইংরাজ মনে করিয়াছেন "স্বরাজ" অর্থ ইংরাজকে ভারত-বহিষ্কৃত করিয়া ভারতে পুনঃ হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব স্থাপন। হা চতুর ইংরাজ! তুমি বুঝিলেনা যে, ভারতবাসী তোমাকে তাড়াইতে চায় না, যেহেতু ইহা অসম্ভব। অস্ত্র আইনের কৌশলে ভারতবাসী একটী খেপা কুকুর পর্য্যন্ত মারিতে পারে না, আর তোমাকে ভারত-সমুদ্র পার করাইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? ভারতবাসীর হস্তস্থিত বংশ-যষ্ঠী-গর্ভ-নিবাসী সামান্য লৌহছুরিকাও যখন অস্ত্র আইনের অন্তর্গত, তখন ভারতবাসী কি তোমাদিগকে ইনপেনে ব্লুব্লাক্ ইঙ্ক পাউডার ভরিয়া গুলি করিবে, আর মারিবে? ভারতবাসী চিরকাল রাজভক্ত। রাজা তাড়ান, মা-তাড়ান, বাপ-তাড়ান তোমাদেরই পৈতৃক-ব্যবসা, ভারতবাসীর নহে। ভারতবাসী রাজাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, পিতা মাতা অপেক্ষায় অধিক ভক্তি ও সম্মান করে। ভারতবাসী একটু মুখের মিষ্ট কথা পাইলেই বহু কালের পরাধীনতাহেতু প্রভুর বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া সেবা করিয়া থাকে। তোমরা যে ভারতবাসীকে খেপাইয়াছ, ইহাতে ভারতবাসীর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই, দোষ সম্পূর্ণ তোমাদের। এখনও তোমরা চলিলে সব দিক্ রক্ষা পায়। তবে

"স্বরাজের" প্রকৃত অর্থ কি, ইংরাজ তাহা কি শুনিবে? অবহিত হইয়া শুন। আমরা হিন্দু-মুসলমান তোমাদিগকে দেশ বহিস্কৃত করিতে চাহি না, কারণ তাহা অসাধ্য ও অসম্ভব এবং তোমাদের ছাড়া আমাদের এখন চলিবেও না। হিন্দু-মুসলমান সিংহ ও শার্দ্দুল-শাবক বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সার্দ্ধেক শতাব্দী লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছ; তোমরা এমন বাহাদুর যে, এক কথায় সমস্ত ভারতবাসীদ্বারা ভারতবর্ষকে একদম একটা সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ (Zoological Garden) মনুষ্যনামা জীবোদ্যানে পরিণত করিয়াছ। সিংহ ও শার্দ্দুলশাবক এখন খাদ্যাভাবে মেষশাবক অপেক্ষাও দুর্ব্বল এবং কুকুর-শাবক অপেক্ষাও ঘৃণিত। তোমরা যতই স্বাধীন এবং উদার-নৈতিক হওনা কেন, তোমরা যে আমাদিগকে সভ্য করিয়াছ, জ্ঞানী করিয়াছ, দেশশাসনে সক্ষম করিয়াছ, ইত্যাকারজ্ঞানে আমাদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িবে, ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। "শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।" তোমরা রাজা আছ, থাক, তোমাদিগকে রাজা করিয়াই রাখিতে চাই। তোমরা রাজা হইয়া থাকার যোগ্য, রাজ্য শাসন কর, শাসনের জন্য লভ্যাংশ হিস্যানুসারে গ্রহণ কর, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তোমরা ঘরের অর্থাৎ বিলাতের খাইয়া বনের অর্থাৎ ভারতের সিংহ শার্দ্দুল তাড়াইবে, এমন জাতি যে কখনও হইতে পারিবে না, তাহা আমরা জানি। তবে তাই বলিয়া যে তোমরা সাড়ে ষোল আনা খাইবে, আর আমরা উপবাস করিয়া হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া মরিয়া যাইব; তোমরাও ওলাউঠা বা প্লেগের মৃত্যু বলিয়া দুর্ভিক্ষ গোপন করিবে, তাহা হইবে না। তোমরা রাজার ন্যায় রাজা হইয়াই থাক, আমরা আর তোমাদের গোলাম থাকিব না, প্রজা হইয়া থাকিতে চাই। আমরা এদেশে জন্মিয়াছি, আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ এদেশে জন্মিয়াছে; এদেশ আমাদের, তোমাদের নয়। সুতরাং ভারতের অনুকূলে রাজ্য শাসন কর, ভারতবাসীকে প্রকৃত ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত অধিকার দেও। ভারতবর্ষে শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প বাণিজ্য, আইন আদালত সমস্তই ভারতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠা কর। ভারতক্ষেত্র ভারতবাসীর, ভারতক্ষেত্রে ভারতবাসীরাই কর্ষণ করে ও প্রচুর শস্য ও ধন উৎপাদন করে; সে ধন ও শস্য তাহাদিগকে অবাধে ভোগ করিতে দেও। তোমরা খাও এবং খাওয়াও, লুণ্ঠন করিও না। ভারতের উৎপাদিত ধন ও রত্ন দ্বারা ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর; বিলাতের পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের উপর অযথা নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিও না। বিলাতের "cup is full to the brim and cannot hold a single drop." ভারতবর্ষ বিশাল সভ্য দেশ; ভারতবাসীগণ তোমাদের বহু পূর্ব্বে সুসভ্য হইয়া সমস্ত জগতের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগকে আদিম উত্তর আমেরিকাবাসীদের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের বংশ লোপ করিতে বা তাহাদিগকে তোমাদের পদ সেবার সামগ্রী কুলী মজুর করিয়া রাখিতে রাজনীতির কূট কৌশল জাল বিস্তার করিওনা। ভারতবাসী তোমাদের ন্যায় মানুষ, তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্, তোমাদের ন্যায় ক্ষমতা-

শালী, তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক; অতএব সমদর্শী হইয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর, প্রীতি দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে যত্নশীল হও। ত্রিতল, হর্ম্ম্যোপরি বৈদ্যুতিক আলো ও হাওয়ার ঘোরে লক্ষ লক্ষ ভারতবর্ষীয় নরনারীকে অকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত করিয়া যমালয়ে পাঠাইতেছ, আবার ভারতে দুর্ভিক্ষ নাই, ভারতের নরনারী স্বকীয় অসাবধানতা ও অজ্ঞতা বশতঃ ওলাউঠা এবং প্লেগের কবলে পতিত হইতেছে বলিয়া মিথ্যা রিপোর্টে, ভাষার কৌশলে, কলমের এক খোচায় বিলাতবাসী সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে ভুলাইয়া রাখিতেছ। এমন ধারা আর করিওনা; "মোরা ঢের স'য়েছি আর ত সব না"। তোমাদেরই ন্যায় ভারতবাসীর শরীরে রক্ত ও মাংস আছে, তোমাদেরই ন্যায় ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। ভারতে যে দুর্ভিক্ষ নাই, তাহা কি জাননা? "সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা" ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা। ভারতের দুর্ভিক্ষ স্বাভাবিক নহে; ভারতের দুর্ভিক্ষ তোমাদের পরামর্শমূলক অর্থাৎ artificial। ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান, সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তোমরা খ্রীষ্টশিষ্য; বিদেশবাসী রাজপুরুষ; অনায়াসে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অসংখ্য নরনারীর মৃত্যু দেখিয়া ভ্রূক্ষেপ করিতেছ না; রাজনীতির খেলা ভাবিয়া পাপানুভব করিতেছ না; কিন্তু আমাদের উহাত আর সহনীয় নহে, আমাদের দেশে আমাদের জননী ভাই ভগিনী খাইতে না পাইয়া অকালে মরিয়া যাইতেছে, বল দেখি, পাষাণ বুকে বাঁধিয়া আর কত দিন সহিয়া থাকিব? মোরা "ঢের স'য়েছি আরত সবনা"। প্রতীকার করিব না? প্রতীকার করিতে গেলেই "স্বরাজ"; আমরা কুর্জ্জন বাহাদুরের কৃপায় তোমাদের অবারিত অত্যাচারে অনেকটা জড়ত্ব, কাপুরুষত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বে উপনীত হইতেছি, তাই দুঃখ দূর করিতে চাই, সুখ লাভ করিতে চাই। "সর্ব্বমাত্ম বশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"। আমরা আত্মবশে থাকিতে চাই, পরবশে থাকিতে চাইনা, অর্থাৎ নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে চাই, তোমরা যে কাণে ধরিয়া দাঁড় করাইবে, আর বসাইবে, তাহা চাইনা। আত্মচেষ্টা করিতে গেলেই "স্বরাজ"। তোমরা ভারতবর্ষ মন্থন করিয়া কেবল অমৃত খাইতেছ, আর আমাদিগকে কেবলই গরল দিতেছ, আমরাও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কেবল গরল খাইতেছি, এখন তোমাদিগকেও গরলের ভাগ দিতে চাই এবং আমরাও অমৃতের ভাগ পাইতে চাই। প্রতীকার করিতে গেলেই "স্বরাজ"। তোমরা রাজপুরুষ, দেব-পূজ্য হইয়া চিরকালই থাকিতে চাও, আর অস্ত্র বলে আমাদিগকে বিজিত করিয়াছ বোধে আমাদিগকে কুকুরাপেক্ষাও হীন করিতে চাও। তোমরা রাজপুরুষ বলিয়া তোমাদিগকে প্রকৃত সম্মান দিতে আমরা কোন মতেই নারাজ নহি; তোমরা দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছ, তাহাও জানি এবং তজ্জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে কাপুরুষতা করিব না, কিন্তু অস্ত্র বলে দেশ দখল করিয়াছ, ইহাত স্বীকার করিব না। আমাদের বেকুবিতে তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তোমাদের ফাঁদে পড়িয়া এখন ফাঁপর হইতেছি; বেকুবির দণ্ড যথেষ্ট দিয়াছি, তাই

ফাঁদ ছিন্ন করিতে চাই ; মোরা "ঢের সয়েছি আরত সব না।" প্রতীকার করিতে গেলেই "স্বরাজ"। তোমরা দেশে রাজ-কর্ম্মচারী-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী ( Bureaucratic Government) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ ; এই প্রণালী বদ্ধমূল করিতে যত্নশীল ; আমরা তাহার প্রতিকূলে প্রজাতন্ত্রানুসারে শাসিত হইতে চাই, শাসনে আত্মাধিকার বিস্তার করিতে চাই ; প্রতীকার চাহিলেই "স্বরাজ"। এখন ইংরাজ ! স্বরাজের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি কর, "উল্টা সমজেরাম" করিয়া বৃথা গোল বাঁধাইয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিওনা ; বিনা কারণে প্রজা ধ্বংস করিওনা। ভাই হিন্দু মুসলমান, তোমাদের পক্ষে ওকালত-নামা লইয়া ইংরাজকে খুব কয়েকটা বড় বড় সাচ্চা বাত শুনাইয়া দিলাম ; এখন ভাই, আবার তোমরাও দুটা কথা শুন। ভাই, "স্বরাজ" চাও, ভাল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা আমাদের পৈতৃক স্বত্ব, ন্যায়ানুমোদিত দাবি। চাওত বেস্ কথা, আয়োজন কোথায় ? "স্বরাজ" লাভ করিতে চাহিলেও "যোগ্য ভোগ্যা বসুন্ধরা" এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। তোমাদের দেশ, তোমাদের প্রকৃত স্বত্ব ও আসল দাবী বলিয়া "স্বরাজ" আপনা আপনি হাঁটিয়া তোমাদের গৃহে ত আসিবে না। "স্বরাজ" চাহিলে যোগ্য হইতে হইবে, তবে স্বরাজ তোমাদের ভোগ্য হইবে ; ইহা নিশ্চয় জানিও। তোমরাও "স্বরাজের" মালীকের দত্তক পুত্র নও যে, অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিলেই "স্বরাজে" তোমাদের অধিকার বর্ত্তিবে ; আর তোমরাও "স্বরাজের" যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইংরাজ এত উদার ও মহানুভব নহে যে, তাহারা অনায়াসে যে যে বিষয়ে যে যে অধিকার একবার পাইয়াছে, তাহা তোমাদের উপকারার্থ হঠাৎ ছাড়িয়া দিবে। তাহারা প্রাণ দিতে কবুল, স্বার্থ-ত্যাগ করিবে না। আমরা যতই কাঁদি না কেন, যতই সেলাম ঠুকি না কেন, 'ভবী ভুলিবার নয়। অর্থগ্রাহী সন্ন্যাসী দণ্ডবতে তুষ্ট হয় না। তবেই দেখ, দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তির মহা সংঘর্ষ। আমরা কেবলই চাহিব, তাহারা মোটেই কিছু দিবে না। আমাদের চাহিবার শক্তি যদি অধিকতর প্রবলা না হয়, তবে তাহাদের না দিবার শক্তিই বলবতী রহিয়া যাইবে ; তবেই এই প্রবল সংঘর্ষে আমাদের পরাজয় নিশ্চয়। যদি জয়লাভ করিতে চাও, তবে যোগ্যতম হইতে হইবে ; যোগ্যতম হওয়া আবার আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠিন। মনে কর, সমুদ্রবক্ষে এক খানি তরণী হঠাৎ পাহাড়ে লাগিয়া জলমগ্না হইল ; আরোহীগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কূল কিনারা ধরিবার জন্য সন্তরণ করিতে লাগিল। দূরে আর একখানি তরণী অনুকূল বায়ুভরে তীব্র গতিতে মহোল্লাসে সমুদ্র-বক্ষ-বিদীর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময় যদি প্রবল ঝড় বেগে সমুদ্র-বক্ষ আন্দোলিত হয়, তবে প্রাণরক্ষা করা কাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ? যে তরণী খানি জলমগ্না হয় নাই, তাহার আরোহীগণের ভয় অতি সামান্য। একটু সামলে চলিলেই সে তরণীখানির বিপদ নাই, আরোহীদের প্রাণরক্ষার কোন বিঘ্ন নাই, কিন্তু যাহারা পূর্ব্বেই জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, একবার ভাবিয়া দেখ। তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা যে কত বড় কঠিন ব্যাপার, তাহা লেখা যায় না, ভাবিতে পারা যায়। তাহাদিগকে

উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত, সমুদ্র-বাসী অসংখ্য হিংস্র প্রাণীর সহিত প্রবল যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে, তবে প্রাণরক্ষা পাইবে। সময় সময় অদৃষ্টবশতঃ এমন অনুকূল ঘটনাও উপস্থিত হয় যে, জলমগ্ন আরোহীগণের স্বল্পায়াসেই জীবন রক্ষা পায়; সেরূপ ঘটনা বিশেষ সুকৃতির ফল ও অতি বিরল। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও ঠিক উল্লিখিত সমুদ্রমগ্ন আরোহীর ন্যায়। অধিকতর বলশালী ও ক্ষমতাবান না হইলে আমাদের প্রাণরক্ষার আশা নাই। এই বিষম সমস্যায় আমাদিগকে ইংরাজ, ফরাসি, জারমেন, জাপানী, চৈন বা অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। তাহারা প্রফুল্লচিত্তে জাহাজে চড়িয়া অনুকূল বায়ুভরে সমুদ্রে বেড়াইতেছে; আর আমরা পোতভগ্ন জলমগ্ন আরোহী, প্রবল বাত্যাভিঘাতে ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের অপেক্ষা অধিক ধীর, সহিষ্ণু, বলশালী, মনস্বী, নীতিপরায়ণ, ধার্ম্মিক, সুকৌশলী, একতা-সম্বদ্ধ, একভাবে উত্তেজিত এবং দেশের কল্যাণার্থ জীবনের মায়া পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইতে হইবে; তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমুদ্রমগ্ন আরোহীর যেমন বাত্যাঘাতে পুনঃ পুনঃ তরঙ্গাভিঘাত এবং হিংস্রজন্তুর আক্রমণ সহ্য করিতে হয়, আমাদেরও সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বহু বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত লড়াই করিতে হইবে; নচেৎ প্রথম হইতেই বাঁচিব না বলিয়া শরীর ছাড়িয়া দিলে রক্ষার হেতু নাই। শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসারও প্রয়োজন। বর্ত্তমানক্ষেত্রে যোগ্যতম হওয়া অস্মদাদির পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার, কিন্তু তাই বলিয়া শরীর ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; অবিরাম চেষ্টার ফলে কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত। কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া চেষ্টা করিলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী, আর কেন্দ্র-বহির্ভূত হইয়া চেষ্টা করিলে ফললাভ সুদূরপরাহত। আমরা চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, ধা বুঝিয়া ঔষধ দেওয়া হইতেছে না; ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত চেষ্টা সমবেত চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইবে, তাহা আদৌ উদ্ভাবিত হয় নাই। আমার ধারণা, গোড়ায় গলদ আছে। সে গলদ দূরীভূত না হইলে, চিকিৎসা ফলপ্রদায়িনী হইবে না। আমরা মৃত শিশুকে জীবিত দেখিতে রোদন করিতেছি। মৃতকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান্ ব্যাধিগ্রস্তের সুচিকিৎসা ও সুশুশ্রূষা করা একান্ত আবশ্যকীয়। নেতাদের দোষেই গোড়ায় গলদ; কাজেই গলদ দূরীভূত হইতেছে না; গলদ বর্ত্তমানে চিকিৎসা নিষ্ফল। বারান্তরে উপায়গুলি ও গলদ দূর করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

শ্রীকালীগোপাল বিশ্বাস।

# জাতীয় জীবনের উদ্বোধন।

৩০শে আশ্বিন বঙ্গদেশে একটী নূতন পর্ব্বাহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা একটী রাজনৈতিক পর্ব্বাহ। বঙ্গ-বিচ্ছেদের শোকস্মৃতির জন্যই এই রাখী পর্ব্বাহের সৃষ্টি। ইহার রাখীমন্ত্রটী দেশবাসীর চিত্তের বড়ই শিক্ষাপ্রদ। মন্ত্রটী যদি ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে

স্থিরপ্রাণে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। মন্ত্রটী বঙ্গভাষায় কথিত হইয়াছিল "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" ভাই বঙ্গবাসি, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি তোমাদের প্রাণের মন্ত্র? যদি ইহা তোমাদের প্রাণের মন্ত্র হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বঙ্গে নবযুগের আবির্ভাব হইত। কিন্তু আমরা জানিতেছি, ইহা তোমাদের প্রাণের মন্ত্র নয়। ইহা তোমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত নয়। তোমরা রাখীবন্ধনের মন্ত্রে মুখে বলিবে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত। যদি তোমার মুসলমান ভ্রাতা সরকারী চাকুরী পাইল, অমনি তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলে, ইহা কি তোমার সৌভ্রাত্র? ইহা কি তোমার অভেদ-নীতি? তোমার নমঃশূদ্র ভ্রাতা বি-এ পাশ করিয়াও তোমার সম আসন পাইবার অযোগ্য, ইহা কি তোমার স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র পরিণাম? জাতিভেদের ঘোরতর বিকারে তোমার অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত, তুমি কিনা স্বদেশী বীর!! তুমি দেশের অণুমাত্র বলবৃদ্ধি করিতে পার না বা করিবার চেষ্টা করনা। এদিকে ছাপার কাগজে কলমের খোঁচায় তুমি সিডিসনের আসামী!! ভ্রাতৃগণ যদি দেশের প্রকৃত শক্তি চাও, তবে সাম্য নীতির অনুসরণ কর। আগে নিজের দল বল পরিপুষ্ট কর। নমঃশূদ্র ভ্রাতাদিগকে আপনার করিয়া লও। এই নমঃশূদ্র জাতি বঙ্গে জন সংখ্যায় প্রথম স্থানীয়। ইহাদিগের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়া কখন তোমরা শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে না। নমঃশূদ্র জাতি এমন হীনাচার নহে যে, তাহাদিগের প্রতি তোমাদের বর্ত্তমান ব্যবহার শোভা পায়। তোমরা এমনি অসার যে, তোমরা যদি নিজের প্রতিবিম্ব নিজে দর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে লজ্জিত হইতে হইবে। যে তোমাদিগকে পয়জার মারিতে পারে, তাহাদিগের নিকট তোমরা বেশ জব্দ থাক। যে তোমাদের নিকট বিনীত হয়, তোমরা তাহার মস্তকে চড়িয়া বস। মুসলমান খ্রীষ্টানগণকে তোমরা বিধর্ম্মী গোখাদক বলিয়া ঘৃণা করিতে ত্রুটি করনা, তাহাদিগকে তোমরা নিজের নাপিত দিয়া ক্ষৌরী করাইতেছ, কিন্তু নমঃশূদ্র ভ্রাতাকে ক্ষৌরী করিলে তোমরা নাপিতের জাতি ধ্বংস কর। নমঃশূদ্রগণ যাই মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইলেন, অমনি তাহারা নাপিত পাইলেন; অথচ হিন্দু থাকিতে নাপিত পাইলেন না। ইহাতে প্রমাণিত হইল, হিন্দুধর্ম্মে থাকাই দোষের কার্য্য। হিন্দুধর্ম্মই নমঃশূদ্রের অপকর্ষতার কারণ। অথচ তোমরা হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজাইতে বদ্ধপরিকর। এই ভেদ-নীতি লইয়া তুমি জাতি গঠিত করিবে? এইরূপ ঘৃণিত হইয়া নমঃশূদ্রগণ তোমার জাতীয় পতাকার তলে দণ্ডায়মান হইবে? ইহা তুমি কখন মনেও স্থান দিও না। ভাই বঙ্গবাসি, যদি তোমরা জাতি গঠিত করিতে চেষ্টা কর, তবে এই নমঃশূদ্র ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বাগ্রে নিজের নাপিত প্রদান কর, দেখিবে, ইহাতে নমঃশূদ্রগণ তোমার কতদূর আপনার লোক হইয়া যাইবে। তোমরা মৃতবস্ত্র-পরিহিতা, গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থানকারী, ভগ্ন মৃৎপাত্রে উচ্ছিষ্টান্নভোজী চণ্ডাল জাতিকে কখন নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিও না। যদিই বা তোমাদের মনে কুসংস্কারমূলক কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহা স্বদেশ-প্রীতির মন্দাকিনী

প্রবাহে ধৌত করিয়া ফেলা উচিত। নতুবা তোমাদের কখন কোন আশা ভরসা ফলবতী হইবে না। এমন কি, তোমরা যে গোপ, নাপিত, কুরী প্রভৃতির জল অম্লানবদনে পান কর, তাহাদের অপেক্ষা নমঃশূদ্রগণ হীনাচার নহে। এ অবস্থায় স্বদেশের কল্যাণ কামনা থাকিলে ইহাদের জলাচার করিয়া ফেলা অবৈধ নহে।

বঙ্গের শাউ লোকদিগকে শৌণ্ডিক বলিয়া তাহাদিগকে তোমরা নিতান্ত ঘৃণা কর। এই শাউ লোকদিগের কোন্ পুরুষে কে মদ্যের ব্যবসা করিয়াছিল, তাহাতেই ইহারা অস্পৃশ্য জাতি হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ কলসী কলসী মদ্যপান করিয়াও অনাচরণীয় জাতিতে পরিণত হইতেছে না। ইহাদিগকে যদি অনাচরণীয় না কর, তবে শাউ ভ্রাতৃগণের জলপানে তোমাদের অযথা আপত্তি কেন?

বঙ্গের মাহিষ্য জাতি সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ জলাচার জাতি বলিয়া গণ্য। তাহাদের পুরোহিতের জল অসামাজিক ভাবে চলন আছে। মাহিষ্যের বাড়ীতে পুরোহিত আসিলে মাহিষ্যগণ তাঁহাদের পুরোহিতকে তাঁহাদের রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর গুরুদেবের ন্যায়ই ভক্তি করেন ও তাঁহাদের প্রসাদান্ন ভক্ষণ করেন। এ অবস্থায় মাহিষ্য পুরোহিত-গণের জল কেন যে সমাজে অপ্রচলন রাখা হয়, তাহা সমাজধুরন্ধর স্বদেশ-প্রেমিকগণই বলিতে পারেন। আমরা স্বদেশ-নেতৃগণের নিকট প্রার্থনা করি, এই মাহিষ্য-পুরোহিত-গণের জল সমাজে চলন করিয়া লইলে জনসংখ্যায় বঙ্গের দ্বিতীয় স্থানীয় মাহিষ্যগণ সমাজের সঙ্গে একতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইতে পারেন।

অনেকে হয় ত এরূপ মনে করিতে পারেন, জাতিগত বৈষম্য থাকিলেও পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় হানি কি? আমরা কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-তেছি, জাতিগত পার্থক্য হইতে ক্রমে বিদ্বেষ, কলহ, এমন কি, মারামারি পর্য্যন্ত অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। আমরা আমাদের নিজ গ্রামে জাত্যভিমানের বিষময় ফলভোগ করিতেছে। এই গ্রামে আবহমান কাল হইতে কায়স্থ, মাহিষ্য, ও তিলিগণ পরস্পরের বাড়ীতে ফলাহার করিয়া আসিতেছেন, মধ্যে বিগত ১৩১০ সালে কায়স্থগণের জাত্যভিমান প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা মাহিষ্যগণের বাড়ীতে কোন এক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না এবং তিলিগণকেও নিমন্ত্রণ লইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিলি মহোদয়গণ তাঁহাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাহিষ্যের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। মাহিষ্যগণের দ্বিতীয় আর এক ব্যাপারে তিলিগণকে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহারা মাহিষ্যগণের বাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত হইয়া কায়স্থ মহাপ্রভুগণের চক্রান্তে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন, কায়স্থ মহাশয়েরা স্বাধীন ব্যবসায়ী ধনবান তিলি-গণকে নিবারণে অসমর্থ হইয়া কূট নীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভিন্ন গ্রাম-বাসী পুরোহিতের সহিত জোট বান্ধিলেন। এবং পুরোহিত দ্বারা বলাইলেন, "তিলিগণ যদি মাহিষ্যের বাড়ী যান, তবে তাঁহা-দের বাড়ীতে একটী ব্রাহ্মণও যাইবেন না।" সেই ভয়ে তিলিগণ মাহিষ্যের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই অবধি মাহিষ্য-গণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "তিলি ও কায়স্থের বাড়ীতে আমরা কখন আহার করিব না।"

এমন কি, কায়স্থ ও তিলিগণ কখনও বিপদে পড়িলে মাহিষ্যগণ সাহায্য করিবেন না। এমন কি, কায়স্থ ও তিলিগণের বাড়ীতে হরির লুটে পর্য্যন্ত যাইবেন না। অদ্যাবধি সেইরূপ ব্যবহার চলিতেছে। এবং দেখা গিয়াছে, কায়স্থগণের কোন বিপদেই মাহিষ্যগণ কোন সাহায্য করেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছেন।

মাহিষ্যগণের জনবল, শারীরিক বল, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী। এ অবস্থায় দাঙ্গা হাঙ্গামায় মাহিষ্যগণের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। এক গ্রামবাসী ভ্রাতৃগণ কোথায় পরস্পরের সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইবেন, না পরস্পরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ অশান্তি অশিব হইবার একমাত্র হেতু, জাত্যভিমান ও জাতিবিদ্বেষ। এই জাতিবিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখাই এদেশবাসীকে আত্মমরা করিবার একটী শ্রেষ্ঠ উপায়। অজ্ঞ আমরাও সেই বিনাশের পথে শলভের ন্যায় বেগে ধাবমান হইতেছি। এই জাতি-বিদ্বেষের কল্যাণে কত স্থানে যে কত অশান্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা লিখিলে বিজ্ঞ লোকের বিরক্তি উৎপাদন করা হয় মাত্র। তাঁহারা দিব্য চক্ষে সমাজের সকল অবস্থাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এ অবস্থায় বঙ্গীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট জাতির মধ্যে সহানুভূতি কি সুদূরপরাহত নহে? বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতির সংখ্যা ২৫ লক্ষ। ইহাঁদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এক সময় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ও দক্ষিণ সমুদ্রের অধিকাংশ স্থান মোগল সম্রাট ও পাঠানগণেরও অধৃষ্য ছিল। যে জাতির বাহু বলে তমলুক সবডিভিসনে দুরন্ত মারহাট্টাগণ স্বীয় লুণ্ঠন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই, যাঁহাদের বাণিজ্য-পোত যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়া বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, যে সামরিক জাতির অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ তুর্কা, তমলুক, সুজামুঠা, ময়নাগড় প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশীয়গণ দীনভাবে অদ্যাপি স্বীয় স্বীয় দুর্গে অবস্থান করিয়া উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদের স্বজাতিগণ কখন বর্ত্তমান অভিমানী জাতিগণের ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে পারেন না।

—কাকোদর সদা নম্রশির,
কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি কেহ
উর্দ্ধ ফনা ফনী দংশে প্রহারকে!

মাহিষ্যগণ সম্পূর্ণ এই প্রকৃতির লোক, ইহাঁদের সামাজিক বিদ্বেষ পোষণ করিলে কখন বিদ্বেষ্টাগণের সহিত ইহাঁরা মিলিত হইতে পারেন না। স্বদেশী-যজ্ঞ ইহারা অন্য জাতির নিরপেক্ষ ভাবেই চালাইতে সমর্থ। এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠনে কখন কি জাতীয় জীবনের আশা করা যাইতে পারে? দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণের কর্ত্তব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগণের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাসম্ভব তাহাদিগকে সামাজিক আসন প্রদান করা।

রাঢ়দেশে ও পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থানে গোয়ালা জাতির জল ব্যবহার করা হয়না। তাহাদিগকে অনাচরণীয় জাতির মধ্যে গণনা করা হয়। তাহাদিগের পুরোহিতগণের পাতিত্য বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল গোপ জাতির দধি জাল্লাই দুগ্ধ অম্লান বদনে ভোজন করা হইতেছে। তাহাদের প্রস্তুত দধি দুগ্ধ ভোজন করা যায়, জল খাওয়া যায়না, কি আশ্চর্য্য বিচার!! ঐ গোপজাতির জল পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে অচল নহে। নবশাক ও কায়স্থের পুরোহিত ঐ ঐ অঞ্চলে গোপ

জাতিরও যাজন করিয়া পতিত হন না। পক্ষান্তরে ইহাঁদের যৌন সম্পর্কীয় আত্মীয় পশ্চিম বঙ্গে ও রাঢ় দেশে বিদ্যমান আছেন। অথচ সমাজে সচল রহিয়াছেন। এ অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গে ও রাঢ় দেশে কেন যে গোপ জাতি পাতিত্য ভোগ করেন, বুঝিতে পারি না। সমাজ-ধুরন্ধরগণের কি এমন ক্ষমতা নাই যে, এই ঘৃণা-মূলক পাতিত্য দূর করিয়া গোপজাতি ও তৎপুরোহিতগণের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন? যে সমাজের লোকের সমাজ-সংস্কারের এই সামান্য শক্তি টুকু নাই, সেই সমাজের অধীনে কি কোন শক্তিশালী জাতি চলিতে পারে? বরং ঘৃণার সহিত সেই সমাজ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ, যদি জাতীয় মঙ্গল কামনা করেন, তবে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া, বিশ্বপ্রেমে হৃদয় অভিষিক্ত করতঃ আচণ্ডালে হরি-বলে প্রেমালিঙ্গন করুন। ভেদাভেদ দূর করিয়া দিন্। দেখিবেন, জাতীয় বল কতদূর বৃদ্ধি হয়। হিন্দু সমাজ এতদিন মৃত ছিল, তাই এই সকল কথা আলোচ্য ছিল না। এক্ষণে হিন্দুর নব জীবন আরম্ভ হইয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে হিন্দু সমাজের এই অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ, ভট্ট ব্রাহ্মণ প্রভৃতির জল সমাজে প্রচলন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন ব্যবহারে যদিও ইহাঁরা অচল ছিলেন, বর্ত্তমান ব্যবহারে ইহাঁদের অচল থাকিবার কোন কারণ নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ হোটেলের কার্য্য করিয়াও সমাজে চল আছেন। কাঁচা মৎস্য-বিক্রেতা ধীবর জাতি সমাজে পতিত। হোটেলের ব্রাহ্মণ পাককরা মাছ বিক্রয় করিয়া নিরাপদ। শূদ্রান্নপাকোপজীবী, মৎস্য-বিক্রেতা হোটেলের ব্রাহ্মণ যদি সমাজে সচল থাকিতে পারেন, তবে অগ্রদানী, আচার্য্য ও ভট্টব্রাহ্মণের সমাজে অচল থাকা উচিত নহে। এই সকল ব্রাহ্মণের জল সমাজে কার্য্যতঃ ব্যবহার করিতে পারেন, এমন শক্তিশালী পুরুষ কি বঙ্গদেশে জন্মে নাই? আমরা মনে করি, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যদি শিক্ষিত লোক সমবেত হইয়া এই নূতন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন, তবে দেশের যুগান্তরের সূত্রপাত হয়। যদি বিলাত-ফেরত লোক সমাজে স্থান পান, তবে স্বদেশের সদাচারী এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কেন অচল থাকেন? বিলাতফেরত বাবু অপেক্ষা এই সকল ব্রাহ্মণ কি কোটিগুণে সদাচারী নহেন? ভগবান স্বর্গ হইতে বঙ্গীয় পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য আহ্বান প্রেরণ করিয়াছেন। এই আহ্বানে নীরব থাকা সজীবতার লক্ষণ নহে। বিগত প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে পাবনা নগরীতে প্রস্তাবিত বিষয়ের একাংশের আলোচনা হইয়াছিল। নমঃশূদ্র জাতিকে নাপিত ও বেহারা দিবার প্রস্তাব উক্ত মহাসমিতিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি নীচ-জাতির জলচলের প্রস্তাব প্রাইভেট রূপে আলোচিত হইয়াছিল। ইহা দেশের পক্ষে জাতীয় জীবনগঠনের পক্ষে সুবাতাস বলিতে হইবে। কাপুরুষতা ও কুসংস্কার কত দিন আর হিন্দুসমাজের উপর আধিপত্য করিবে, জানি না। অগ্রদানী-ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট ও মন্ত্র-পূত পিণ্ড, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, নবশাকের পিতৃলোক গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হন, অথচ তাঁহাদের ঐ সকল সন্তানগণ তাঁহাদের হাতের জল খাইলে পতিত হন।

এইরূপ ভণ্ডামি এই নবযুগে শোভনীয় নয়। ইহাঁদের জল ব্যবহার করিয়া আমরা একতা ও সৌহার্দ্দ্যের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারি। এইরূপ প্রেম ও বিচার অবলম্বন করিলে আমরা অনেকগুলি জাতিকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে পারি।

হিন্দুসমাজের এই প্রকার স্বধর্ম্মী-বিদ্বেষ হিন্দুসমাজকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য স্বর্গীয় ভূদেব বাবু বলিয়াছেন, ভারতের এই প্রকার স্বধর্ম্মী-বিদ্বেষ জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মী-প্রেমিক মুসলমানের শুভাগমন এদেশে হইয়াছিল। আবার স্বদেশের প্রতি ভক্তিহীনতার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজগণের এদেশে ঈশ্বরেচ্ছায় আগমন হইয়াছে। এখনও কি আমরা স্বধর্ম্মী স্বদেশীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিখিব না? যদি এই দুইটী রাজত্বে আমাদের এই দুইটী মহতী শিক্ষা না হয়, তবে আমাদের সমস্ত স্বদেশী-আন্দোলন পণ্ডশ্রম মাত্র।

ভ্রাতৃগণ, যদি স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণকামনা করেন, যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিয়া ফেলুন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিপ্রজায়তে।

এই শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করিয়া যুক্তিমার্গে অগ্রসর হউন। নিম্নশ্রেণীর হস্তে জল ও ফল গ্রহণ বিষয়ে শাস্ত্রে কোন নিষেধ দেখা যায় না। আর্য্যকবি বাণভট্ট কাদম্বরী গ্রন্থে চণ্ডালকন্যার মুখে যখন ব্রাহ্মণ তনয়কে চণ্ডালের প্রদত্ত জল ও ফল খাইতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে, চণ্ডালের হস্তে ফল ও জল গ্রহণ করা অশাস্ত্রীয় নয়। অধিকন্তু, হিন্দুগণ সকলেই অবগত আছেন, গঙ্গাজল চণ্ডাল, বাগ্দী, মালো, রাজবংশী, ভুঁইমালী, তীবর প্রভৃতি জাতিতে আনিয়া দিলেও অপবিত্র হয় না। এ অবস্থায় অন্য নদীর জল বা কূপোদক ঐ সকল জাতির হস্তে গ্রহণ করিলে যে ধর্ম্মহানি হইবে, ইহা কখন সমাজরক্ষক আর্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। যদিই বা আপনাদের শাস্ত্রে কোন নিষেধ থাকে, তথাপি যুগধর্ম্মের নূতন আহ্বানে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র--ভেদে চিরকালই সামাজিক আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ইহাকে একাকারে রাখা মনুষ্যের সাধ্যের অতীত। হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুগণের শত শত গোঁড়ামী থাকা সত্ত্বেও এই কালস্রোতকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আজি প্রত্যেক নগরে চক্ষু মেলিয়া দেখুন, ময়রা যে হস্তে চামার মুচি, মেথর, মুসলমানকে হাতে হাতে মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছে, সেই হস্তেই ব্রাহ্মণতনয়ের হস্তে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিতেছে। এইরূপ প্রকাশ্য জাতিধ্বংসীব্যাপার অহরহ দেখিয়াও অপেক্ষাকৃত আচারবান হিন্দুজাতির জল কেন অব্যবহার্য্য রাখা হয়, তাহার কারণ বুঝি না। ইহা জড়সমাজের জড়ত্বমাত্র। এতদ্দেশের অতি নিম্নশ্রেণী চূণে-জাতি চূণ প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাতে প্রকাশ্য জলমিশ্রিত করিতেছে, সেই চূণ বাজারে মুচি, মেথর ছত্রিশ জাতি স্পর্শ করিতেছে। সেই চূণ ব্রাহ্মণতনয় অম্লানবদনে তাম্বুল সংযোগে ভোজন করিতেছেন। তখন আর ব্রাহ্মণতনয়ের জাতিবিচার আসে না। কত কথা বলিব, বিস্কুট ও রুটির একই পাক। সেই বিস্কুট সর্ব্বজাতিতে স্পর্শ করিতেছে, ব্রাহ্মণসন্তান অম্লানবদনে হিন্দু-বিস্কুট বলিয়া অনা-

স্নাসে, ভোজন করিতেছেন। তোমার বাড়ীতে মুসলমান চাকর আছে, তাহাকে বাহিরে খাইতে দিলে, তোমার পোষা বিড়াল তাহার পাতের মাছখানি টান দিয়া খাইল, কি তাহার পরিত্যক্ত কাঁটাগুলি খাইয়া মুখে কতকগুলি ঝোল মাখিয়া আসিয়া পরক্ষণেই তোমার পাতে মুখ দিল। বিড়ালের দ্বারা মুসলমান ও তোমার এঁটোর বিনিময় হইল, ইহাতে তোমার জাতি গেল না। এই কথা বলিলে অমনি শাস্ত্র বাহির করিয়া বলিবে, মার্জ্জার মুখ ও মক্ষিকাপাতে দোষ নাই। যাই মুসলমান তোমার বারেন্দার এক পার্শ্বে উঠিল, অমনি তোমার পিতলের কলসীর জল নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা হিন্দুজাতিতেই শোভা পায়; কোন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী জাতির শোভা পায় না। হিন্দুগণ মুসলমানের জলপান করেন না, মুখে বলেন, কিন্তু মুসলমান-ডাক্তারের জল-মিশ্রিত ঔষধ বা মুসলমান-চাকরের দ্বারা আনীত উক্ত প্রকার ঔষধ সেবন করিতে কুণ্ঠিত হন না। তখন যুক্তি দেখাইবেন, ঔষধ নারায়ণ। উহাতে দোষ নাই। এইরূপ যেখানে ঠেকিলেন, সেই খানেই যুক্তি বাহির হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় এক একটী যুক্তির দোহাই না দিয়া ঐ ব্যবহার সার্ব্বজনীন করিয়া ফেলিলেই গোল মিটিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ-সন্তান শূদ্রের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন শূদ্রের পরিবেশন করেন, যখন দাইল বা সূপ ধারারূপে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট পত্রে দেন, তখন ধারাযোগে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট পত্র এবং ব্রাহ্মণের হস্তের পত্রে সংযুক্ত হয়। অতএব ব্রাহ্মণের হস্তের পত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট সহ স্পৃষ্ট। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ পরিবেষ্টার হস্তের দাইল আদি ভোজন করিয়া থাকেন, ইহাতে কি শূদ্রের স্পৃষ্টান্ন ভোজন করা হইল না? এই প্রকার শত শত ব্যবহার দেখান যাইতে পারে, যাহাতে হিন্দু-সমাজের নেতৃগণ নিম্নশ্রেণীর জল ব্যবহারের কোনই যুক্তিযুক্ত প্রতিবন্ধকতা দেখাইতে পারেন না। তাই বলি, যদি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দোষগুলির সংশোধনে বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। নতুবা জাতিগত বিদ্বেষগুলি বর্ত্তমান রাখিয়া যুগান্তরের পথে অগ্রসর হইলে এই সকল অসন্তুষ্ট জাতি দ্বারা জাতীয় ভিত্তি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এই সমস্ত সহানুভূতিশূন্য পৃথক পৃথক জাতি কখনও সমবেত ভাবে কার্য্য করিবে না। শয়তান ভেদনীতিরূপে আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে বসিয়াছে—

কি পাপে ভারতে আসি, প্রবেশিল ভেদনীতি।
নাশিতে ভারতবাসী, শয়তানের কূটনীতি।
যেখানে অদ্বৈতবাদ, শঙ্করের বজ্রনাদ।
সর্ব্বজীবে আত্মারাম, সেখানে এ সাম্যবাদ॥
বর্ত্তমান জাতিভেদ, তাহার কি পরিণাম?
হায়, [illegible] শাস্ত্র আদি, করিলে কি বিসর্জ্জন?
স্বদেশের হিত-ইচ্ছা, যদি থাকে তব প্রাণে।
"আর্য্যসমাজের মতে" অভিষেক করি মনে,
সকল [illegible]
আ[illegible]
বিবা[illegible]
আহ[illegible]দোষ, হি[illegible]
সোপান সোপান পর, উঠ ক্রমে [illegible]
[illegible] যদি, পতিতা [illegible]
বাল-বিধবার [illegible], ভারত শ্মশান,
রাখিতে নারিবে কভু, [illegible]

# বিচ্ছেদ কয় দিন।

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের সময়ে ভীমের অগ্নিচক্ষু ও পরুষ ভাব দেখিয়া দুর্য্যোধন ভাবিয়াছিলেন, পাণ্ডব মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবে। কিন্তু অর্জ্জুন অবস্থা বুঝিয়া ভীমকে মিষ্ট প্রবোধে বুঝাইয়া দিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কদাপি অবহেলার যোগ্য নহেন, ভীম স্থির ভাব ধারণ করিলেন, আর তাহার কৌরবদলে বিশাল বাহু অগ্নিদেবের আহুতি হইল না, পরিশেষে সেই বাহুই কুরুকুল ধ্বংস করিল। যাঁহারা কংগ্রেসের ধ্বংস কামনায় ও জাতীয়-বিরোধে উল্লম্ফন করিয়াছিলেন, আজি তাহারা দেখুন, ধনঞ্জয় বঙ্গদেশ আজি বীর-পুঙ্গব মহারাষ্ট্র ভ্রাতাকে বুঝাইতেছেন, ভ্রাতার আজি ভারতমাতার এই দুর্দ্দিনে কংগ্রেসরূপ ভীমবাহু দগ্ধ করিও না, কারণ তাহাই ভবিষ্যতে অরাতি দমন করিবে, ভারতমাতার অরণ্যবাস দূর করিবে। পাবনায় আজি সেই মহান্ বাক্য ধ্বনিত হইল যে, সহস্র বিচ্ছেদ সত্বেও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার নহে।

আমরা কিন্তু কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ব্যাপারে ভীত কিম্বা দুঃখিত হই নাই, কারণ আমাদের প্রাণগত বিশ্বাস আছে যে, মেঘ ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে, কিন্তু বিনাশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষে কংগ্রেস বিনাশ করিতে পারে, এমন কোন শক্তি নাই। আমার এই ভবিষ্যৎবাণী কার্য্যে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের ভারতীয় জীবনের অন্ধকার-গগনে যে প্রাদেশ পরিমাণ আলোক রেখা উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎ আলোকিত করিতেছিল এবং অচিরে সকল অন্ধকার বিনাশ করিবে, আশা করা গিয়াছিল, সেই কংগ্রেসের শোচনীয় বিয়োগান্ত অভিনয় যে কখনও স্থায়ী হইবে না, একথা ধ্রুব। তাই আজি ঋষি তনয় সংযত যোগী দেবপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সুমধুর আশ্বাস-বাক্য বঙ্গমাতাকে প্রবুদ্ধ করিল। এই বাণী ক্রমশঃ বজ্রনিনাদ শক্তি ধারণ করিয়া মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, অমরাবতী, মান্দ্রাজ, পঞ্চনদে প্রতিধ্বনিত হইবে, আবার সম্বৎসরের মধ্যে এই মহাশক্তি জাগিয়া উঠিবে, এই আশার বাণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যে অগ্নিকণা সামান্য স্ফুলিঙ্গ আকারে প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসরের বিশাল হোমাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ মেঘ বারিপাতে কিয়ৎকাল তাহা নিষ্প্রভ হইলেও, কালে যে ভীষণ আগ্নেয়গিরির অজেয় শক্তিতে দেশ প্লাবিত করিয়া ধাতুনিঃস্রব ও গৈরিক প্রবাহ বিকীর্ণ করিবে, কাহার সাধ্য তাহা বিনাশ করিতে পারে। তাই আজি পাবনা প্রাদেশিক সমিতি ধন্য হউক, রবীন্দ্রনাথের মুখে পুষ্প বর্ষিত হউক, ভারতমাতার দুঃখ নিবারণের জন্য আবার কংগ্রেস-সন্তান জয়যুক্ত হইবে, আমরা এই আশায় আবার লেখনী ধারণ করিলাম। নির্জ্জীববৎ কিছুকাল অবস্থান করিয়া আবার এই অসার লেখনী শক্তি প্রাপ্ত হইল।

প্রান্তগামী ও মধ্যপন্থী যতই ভিন্ন পথা-

বলম্বী হউন না কেন, কেহই মাতার বক্ষে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত নহেন, একথা সত্য। পুরাতন নেতাগণ আত্মশক্তি পরিচালনে সমুৎসুক ও নূতন নেতাগণ তাহাদিগকে পশ্চাৎ অপসারিত করিতে উদ্যোগী, এই উভয় সম্প্রদায় তাই কিছুদিন প্রাধান্য লাভের সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সকলেই যে ভারতমাতার পুত্র, একথা মনে হয় না। এক দল ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, আর একদল আত্মশক্তি অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট ফললাভে অগ্রসর, তাই এক দল ভূমির উপরের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অন্য দল বিনা ব্যোমযানে আকাশে উল্লম্ফন করিতে চাহিতেছেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত শত লাভালাভ ও জননী জন্মভূমির এক বিন্দু মঙ্গল অপেক্ষা অতি হীন। আমরা বাচিতে পারি, কি ধরাবক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারি, কিন্তু কোটী সন্তানের মাতা আমাদের এক কি দুই অথবা দশ জনের স্বার্থ কিম্বা অনর্থের জন্য বিচলিত হইতে পারেন না। সুতরাং আমাদের স্বার্থ অপেক্ষা জননীর মঙ্গলই অধিকতর প্রার্থনীয়। আলেকজাণ্ডার ঠিক বলিয়াছিলেন যে, এন্টিপেটার জানে না যে, আমার জননীর একবিন্দু অশ্রু তাহার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে। তাই নিজের স্বার্থ, প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব ভুলিয়া যাও, মাতার পানে চাও। আমার চক্ষে তিনটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যখন এক এক দল লোক নিজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পুরাতন দলকে প্রথমে সঙ্গে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, পরে যখন দেখিলেন, তাহারা অধিক অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক তখন দল ভাঙ্গিয়া আবার নূতন দল গঠন করিলেন। কংগ্রেসেরও আজি সেই দিন উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের যেন মনে থাকে যে, এখানে তাহারা অগ্নি লইয়া খেলিতে প্রবৃত্ত। রাজনীতি-ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য প্রকাশ আর আগুন লইয়া খেলা সমান। আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হউক, কিন্তু পন্থা যেন সাধ্যাতীত না হয়। আমার স্বর্গসুখ-সম্ভোগ ইচ্ছা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে অকালে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গপথে ধাইব, তাহা নহে। আমাদের আত্মাকে ধীরে ধীরে উন্নত করিতে হইবে, পুণ্য লাভ করিতে হইবে, মধ্যে মৃত্যু-কামনার প্রয়োজন নাই, কারণ বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহা একদিন আসিবেই আসিবে। তাই বলি, আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, শক্তি সঞ্চয় কর, স্বার্থবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও, প্রাণোৎসর্গ কর, তেজের সহিত ভূমি-সংলগ্ন পথেই অগ্রসর হও, দেখিবে, কালে একদিন আশার মন্দিরে আসিতে পারিবে। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না, সেই সাধনা-শক্তি সমন্বয় ব্যতীত হইতে পারিবে না, শক্তি কেন্দ্রাপসারিণী না করিয়া কেন্দ্রাভিকর্ষিণী করিতে হইবে। যখন প্রচুর শক্তি সংগৃহীত হইবে, তখন সাধনারাজ্য দূরে থাকিবে না। ষ্টীমার ঘাটে লাগিয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, এঞ্জিনে কয়লা দেও, বেশ প্রবল অগ্নি কর, দেখিবে ধূমের শক্তি আর অবরোধ করা যায় না, সে শক্তি চঞ্চল হইয়াছে, তখন ষ্টীমার ছাড়িয়া দাও, প্রবলবেগে যাইবে।

তোমরা স্বরাজ চাও, মহাপুরুষমুখে এই বাণী ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা

কোন কবিরাজী তৈল নহে যে, তোমরা আরাম করিয়া বিরাম-চেয়ারে শয়ন করিয়া থাকিবে, ভৃত্য আসিয়া তোমাদের গায়ে "স্বরাজ-তৈল" মাখিয়া দিবে। তাহা নহে। একতা, আত্মনির্ভর, শক্তিসঞ্চার, অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত স্বরাজ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? তোমরা বল, আমরা উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহি না, কিন্তু চাহিলেই বা তোমাদের কে তাহা প্রদান করে, কাহার নিকট তাহা পাইবে, ভাবিয়া দেখ, যদি তাহা পাও, তাহাও এক সোপান। দাসত্ব হইতে কিঞ্চিন্মুক্ত হও, আবার চেষ্টা কর, এই শনৈঃ পন্থাই তোমাদের আদর্শ হউক, মনে করিও না যে, আমরা তোমরা দূরস্থ নয়ন-বিমোহন উজ্জ্বল স্বরাজ দুই দিন দশ দিনে পাইতে পারিব, আবার ইহাও বলি না যে, ঐ উজ্জ্বল চাকচিক্যময় নয়নানন্দদায়ক প্রলোভন তোমাদের আশার অতীত; কিন্তু দুই এক যুগ প্রগাঢ় চেষ্টার ফলে তাহা পাইতে পারিব। এক্ষণেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাক। ইংরাজ তোমাকে তাহা সহজে দিবে, মনে করিয়াছ, রক্তস্রোতের মধ্যে সন্তরণ করিয়া সেই স্বরাজ লাভ করিতে [illegible] কি তোমরা প্রস্তুত আছ? অস্ত্রহীন, [illegible]হীন, শক্তিহীন, উপায়হীন, [illegible] কি হয়? আর তাহাতে [illegible] প্রয়োজন। দুই এক [illegible] কর। ধর্ম্মহীন সাধনায় হইবে না, রাজনৈতিক [illegible]ও হইবে [illegible] এবং [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] জ্ঞান, [illegible] আমাদের দেশের [illegible] করিয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ, সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠার দ্বারা তাহা লাভ করিতে হইবে। চরিত্রে তাহা লাভ করিতে না পারিলে কখনও কৃতকার্য্য হইবে না। জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ, একথা ভুলিও না। আমাদের সমক্ষে প্রবল 'গঠিত-শক্তি, আর আমরা দুর্ব্বল, অস্ত্রহীন, শস্ত্রহীন, আমাদের রক্ষা করিবে কে? দুর্ভিক্ষ,দারিদ্র্য, দৌর্ব্বল্য-পীড়িত জাতি কিসে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে? সেই সর্ব্বশক্তির মূলশক্তির নিকট প্রার্থনা কর, তাহার আশ্রয় ব্যতীত পারিবে না। ধর্ম্ম বিনা এ জাতির উদ্ধার হইবে না। শত শত ভ্রাতাকে তোমরা পদদলিত করিয়া যদি আশা করিতে পার যে, তোমরা জেতাদিগের সহিত সমান অধিকার পাইবে, তোমরা তবে আকাশকুসুমের অনুবর্ত্তী হইয়াছ। কালি নমঃশূদ্র জাতি তোমাদের নিকট তোমাদের সমদর্শীতা প্রার্থনা করিল, সমাজের নিম্নস্থ চর্ম্মকার জেলে ধোপা প্রভৃতি জাতি তোমাদের নিকট সমান অধিকার চাহিতেছে, দিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে, যাহা দিবে, তাহাই আবার পাইবে। মুসলমানকে তোমরা ঘৃণা কর, মুসলমান তোমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে, আবার যদি এসব জাতিকেও তোমরা ঘৃণা কর, বল দেখি, কে তোমাদের সঙ্গে উচ্চ অধিকার পাইবার জন্য অগ্রসর হইবে? সুতরাং জাতিভেদ জাতীয় বিদ্বেষ দূর কর। মুসলমানকেও ভ্রাতা বলিতে শিক্ষা কর ও তাহাদের সহানুভূতি লও। নারী জাতিকে সঙ্গে করিয়া লও, তাহাদের শিক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধি কর। লোক-শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হও, সমগ্র জাতির যদি একতা-সাধন করিতে পার, যদি ভারতীয় উচ্চবর্ণ,

নিম্নশ্রেণী, হিন্দু-মুসলমান, শিখ-মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী এক-প্রাণ ও মিলিত-শক্তি হয়, কার সাধ্য তোমা-দের আকাঙ্ক্ষা দমন করিবে? রাজশক্তি তোমাদের ভয়ে কম্পান্বিত হইবে। স্ব-রাজের জন্য তোমাদের একটা পট্‌কাও আওয়াজ করিতে হইবে না। সে দিকে তোমরা অগ্রসর হইয়াছ কি? শিবজীকে ভবানী বলিয়াছিলেন, হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিও না। আজি পরম পিতা তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, দেশবাসীর সহিত যুদ্ধ করিও না। তাহাদিগকে শত্রু-তার বিনিময়ে প্রেম দিবে; গ্লানির পরি-বর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিবে এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবে। একবার জাতি-ভেদ, বর্ণভেদ ভুলিয়া উচ্চ নিম্ন হিন্দু, নমঃশূদ্র বাগ্দী, চর্ম্মকার ছুতার, আহির মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, পরস্পরের সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হও, দেখিবে কেহ তোমাদের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সেই শিক্ষা, সমদর্শিতা, উদারতা, কুসংস্কার-বিহীনতা ও বিশ্বপ্রেম-শিক্ষিত হইতে তোমরা আর এক পুরুষে যদি সমর্থ হও, অল্পদিনে হইল বলিতে হইবে। মনে করিও না, ব্রাহ্মণ্যের গৌরবে, আভিজাত্যের অহঙ্কারে, স্পর্শভীতিতে, কৃত্রিম আচারে আবার সেই আর্য্যজাতির সমুত্থান হইবে। যেদিন ভারত-মাতার পতাকাতলে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতি সকল স্বার্থ, সকল নীচতা, দ্বেষ, ঘৃণা, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণে প্রাণে আবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আপন স্বার্থরক্ষা করিতে পারিবে, সেই দিন নিশ্চয় জানিবে, সহস্র রাজশক্তি এই নবগঠিত প্রজাশক্তিকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সেই দিন আনয়নে, ভাই প্রাগ্রগামী ও মধ্যপন্থী, সকলে একত্র হও। জননী জন্মভূমির মুখ অতুল আনন্দে রঞ্জিত হইবে। তোমাদের পুরুষ-কার সার্থক হইবে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

# ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

## বিজয়িনী। *

মঙ্গলময়ী বঙ্গ জননি!
  আজিকে তোমার জয়;
ভুলিয়াছে, আজি সন্তান তব
  বাধা বিদ্বেষ ভয়!
দেখগো চাহিয়া অযুত ভক্ত,
বক্ষ হইতে ঢালিয়া রক্ত—
রঞ্জিতেছে তব চরণালক্ত,
  বদন হাস্যময়!
  আজিকে তোমারি জয়!

বিপুল গভীর ভীষণ মন্দ্রে,
বাজিছে সবারি হৃদয় যন্ত্রে,
বিশ্ব-দহন অগ্নি-মন্ত্রে
  মরণের তান লয়!
  আজিকে তোমারি জয়!

আজিকে জননী তোমারি জন্য,
জাগাইয়া তব লুপ্ত পণ্য,
জগতের মাঝে করিতে ধন্য,
  চেষ্টিত সমুদয়!
  আজিকে তোমারি জয়!

* গৌরী—মিশ্র, একতালা।

মুছাইতে তব মলিন আস্য,
ঘুচাইতে তব দীনতা দাস্য,
ফুটাইতে চির-মধুর হাস্য,
কেহ কুণ্ঠিত নয়!
আজিকে তোমারি জয়!

রাজ-রোষানলে হইয়া ভস্ম,
তবু কেহ নাহি মানিছে বশ্য,
অশ্বমেধের বিজয়ী অশ্ব—
করিছে দিগ্বিজয়!
আজিকে তোমারি জয়!

কি যে মহাবলে হইয়া দৃপ্ত,
আজি বাঙ্গালী মত্ত ক্ষিপ্ত,
সর্ব্ব শরীরে শোণিত লিপ্ত
হাস্য বদনে হয়!
আজিকে তোমারি জয়!

আজি আট কোটী ক্ষুধিত ব্যাঘ্র
ব্যাধ-বন্ধনে হইয়া ব্যগ্র;
নাহি বিচারিছে পশ্চাতাগ্র
মুক্তি খুঁজিয়া লয়!
আজিকে তোমারি জয়!

আজি নরনারী—আবাল বৃদ্ধ,
কি মহা সাধনে হইয়া সিদ্ধ,
সবি পবিত্র—অপাপ বিদ্ধ—
সকলি মৃত্যুঞ্জয়!
আজিকে তোমারি জয়!

সাজো মা আজিকে সমর চণ্ডী,
আঁকি অভেদ্য রক্ষা-তাণ্ডী.
দেখিবে সভয়ে যত পাষণ্ডী
মাগিবে পদাশ্রয়!
আজিকে তোমারি জয়!

তুমি মা কালিকা এ রণ-রঙ্গে,
নাচো তাণ্ডবে মোদেরি সঙ্গে,
সমর-সজ্জা ধরি বামাঙ্গে—
দক্ষিণে—বরাভয়!
আজিকে তোমারি জয়!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

---

## ভিক্ষা।

তৃষিত হৃদয় লয়ে কত বারবার
ডেকেছি কাতর প্রাণে, তুমি শোন নাই!
আমি অন্ধ মোহবন্ধ রুধিবে দুয়ার,
প্রবেশের অধিকার ওগো নাহি চাই।
কর মোরে শুভাশীষ, হে অন্তরতম,
সুখ দুখ বাধা বিঘ্ন বিপদের মাঝে,
সংশয় সংক্ষুব্ধচিত্তে বজ্রশিখা-সম
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি চিরদিন রাজে!
হে সুন্দর প্রিয়তম, সৌন্দর্য্য তোমার
রক্তরাগ আঁকা হোক প্রভাত গগন,
সমুজ্জল হিরণ্ময়—বিদারি আঁধার—
পত্রপুষ্প শোভাময় পুলক-মগন!
হেরগো কঙ্কাল মূর্ত্তি কাঙ্গালের ক্ষুধা,
ধরার ধূসর ধূলা—কোথা স্বর্গ সুধা?

---

## প্রকাশ।

ভাষা নাহি খুঁজে পাই করিতে প্রকাশ,
মূক মনোভাব বক্ষে উঠে গুমরিয়া,
স্বচ্ছ এ সরল দিঠি পাওনি আভাষ—
ধ্বনিয়া ওঠেনি গীত তোমারে ঘেরিয়া!
বাঁশীর কাতর সুর বেদনা বিধর,
স্বপ্ন মায়া বিজড়িত সুবর্ণ স্বপন,
অতীতের শত স্মৃতি করুণ-মধুর,
একখানি জীবনের রহস্যে গোপন!
তুমি শুভ্র পুষ্পমালা লাবণ্যের রাণী,
নব বসন্তের পূর্ণ সৌরভ সুষমা—
চন্দ্রকরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ পূর্ণিমা যামিনী,
আলোক মগনা দেবী দেবের মহিমা!
শোভাময়ী স্বপ্ন তুই কল্পনার চক্ষে;
জ্যোতির্ম্ময়ী ধ্রুব সত্য মম রুদ্ধ বক্ষে!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪৩। ইস্‌লাম চিত্র। মৌলবী সেখ আবদুলজব্বার সম্পাদিত, মূল্য।০আনা। গদ্য ও পদ্যময় গ্রন্থ। ১৩টী বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,যথা—ইস্‌লাম চিত্র, প্রার্থনা, স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোরাণ-শরীফ,উত্থান-গীতি; সমাজ-চিত্র, আবেগ, আধুনিক সমাজ, ধর্ম্ম-হীনতাই অবনতির কারণ, আলস্য-পরায়ণতা ও অনুকরণ-প্রিয়তা, আধুনিক শিক্ষা, চাকরী ও ব্যবসায়, স্বার্থপরতা, আদর্শনেতা, স্ত্রীশিক্ষা ও পর্দ্দা এবং উপহার।

এই বিষয়-সকলেই গ্রন্থকারের মনোভাব পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ এবং সরল। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক।

৪৪। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত। প্রথম ভাগ। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ১।০। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি থাকিলেও এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের গভীর গবেষণার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

৪৫। Report of the Chaitanya Library for 1905, 1906, and 1907. চৈতন্য লাইব্রেরী দেশের গৌরব বিশেষ। আমরা এই লাইব্রেরীর কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

৪৬। জাতীয় সঙ্গীত। মূল্য ৵০। গ্রন্থকারের নাম নাই। গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। একটী গান তুলিয়া দিলাম।—

বাউলের সুর।

আমরা সাধ করে কি কাঁদি; পেটে যোটে না হায়!
আমাদের সুখের অন্ন, হ'য়ে পণ্য দেশ বিদেশে
(হায়রে হায়) চালান যায়।
দেশেতে শনির দৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,
নাই তত শস্য সৃষ্টি,তাঁতে পাটের চাষের দায়।
তবু কি ভয় মনে গণি, শস্য-গর্ভা মা জননী,
যত কম হোক্ না কেন, তা'তেই লোকের চলে যায়।
এসে সবে আদর করে,নিয়ে মাল জাহাজ ভরে'
দুর্ভিক্ষ দেশটা জুড়ে' আমরা অন্নাভাবে
(হায়রে হায়) মরি তায়।

৪৭। ধারাপাত। শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস গুপ্ত প্রণীত, ২য় সংস্করণ, মূল্য ৴০। এই ধারাপাত খানি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি ৬১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই পুস্তক আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

৪৮। জালিয়াৎ ক্লাইব। শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে,ইংরাজ-কলঙ্ক অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শাস্ত্রী মহাশয় জালিয়াৎ ক্লাইব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজের প্রতি এখনও যাঁহাদের সম্মোহন রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা আমাদের অক্ষমতা দেখিয়া ভীত, তাঁহারা গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করিবেন—

"ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্লেবনা আক্রমণ কালে, স্কবলফের সহিত ১৮ হাজার রুষ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার সেই ঘোরতর আক্রমণে ৮ হাজার সৈন্য যমলোকের অতিথি হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ৪৫ জন বীরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বজাতির গৌরব অর্জন করা বড় সহজ-সাধ্য নহে। শোণিত-নদী প্রবল ধারায় অকাতরে প্রবাহিত করিতে পারিলে তবে বিজয়শ্রী লাভ করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে কত বৎসর ধরিয়া "মাতাকাটা" তপস্যার পর ইংরেজ জগৎ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্রেসীর দিকে চাহিয়া দেখুন, ইংরেজ কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্য আশ্চর্য্যজনক পরাজয় করিয়াছে। ব্যোংকারহিলে দেখুন ৩ হাজার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, ১ হাজার ৫১ জনবীরগাত প্রাপ্ত হইল। তবুও কাহারও মনে মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল না। ইংরেজের তখন অভ্যুদয়ের সময়, বিলাসিতার নামও তাহারা জানিতনা। কাজেই তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য। ওয়াটারলুতে, ওয়েলিংটনের সহিত ২৩ হাজার ৯ শত ৯০ জন সৈন্য ছিল। যুদ্ধ স্থানে ৬ হাজার ৯ শত ৩২ জন মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত বুয়ার যুদ্ধে জন কতক অশিক্ষিত চাষার সহিত যুদ্ধ পরীক্ষায় ইংরেজ যে স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। সেনানী গ্যাথেকার ২ হাজার ৫ শত সৈন্য লইয়া বুয়ার-

দিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। বুয়ারদের দুর্ব্যবহারে তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাঁহার ৫ শত সেনা বুয়ার হস্তে বন্দী এবং ৮১ জন নিহত হয়। বন্দী বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার শত করা প্রায় তিন জন নিহত হইয়াছিল। কলেঞ্জো যুদ্ধে বুয়ার সৈন্যের শত করা ৫ জনের বেশী হতাহত হয় নাই। মেগার্স ফনটেনে মেথুয়ান ১২ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন, তাহাতে তাঁহার ৯৬৩ জন হতাহত হইয়াছিল। ইহাতে ইংরেজ শত করা ৮ জন হতাহত হয়। বুয়ার যুদ্ধ পরীক্ষা ইংরেজদের শক্তি সামর্থ্য স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী মেকালে যথার্থই বলিয়াছেন, ইংলণ্ডেরও এমন দিন আসিবে,যখন একজন অসভ্য নিউ-জিলাণ্ডবাসী সেণ্টপল গিরজার ভগ্ন স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া লণ্ডনের চিত্র অঙ্কন করিবে।

বাঙ্গালার এই বিপ্লব একটু ভাল আলো-চনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন কয়েক যুবক, যাহাদের বয়স ত্রিশের কোটা পার হয় নাই—এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালার এই বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল ইহাতে তাঁহা-দের বয়স, বেতন এবং এদেশে তাঁহাদের আগমন কালের সময় প্রদত্ত হইল।

| | বৎসর | বেতন | আগমন কাল |
|---|---|---|---|
| ক্লাইব | ৩২ | | |
| বিচার | ৩৫ | ৪০৲ | ১৭৪৩ |
| ওয়াটসন | ৩৮ | ৪০৲ | ১৭৫০ |
| ওয়ারন হেষ্টিং | ২৫ | ১৫৲ | ১৭৫০ |
| স্যামুয়েলমিডিলটন | ২৩ | ৫৲ | ১৭৫৩ |
| লিউক স্ক্রাপটন | ২৬ | ৩০৲ | ১৭৪৬ |
| লুসিংটন * | ১৮ | ৫৲ | ১৭৫৫ |
| কিলপাট্রিক | (বেশী নয়) | ৭৫৲ | ১৭৩৭ |
| কূট | ৩১ | | |
| ওয়াটসন নৌসেনানী | ৪৩ | | |
| ফরাসী ল | ৩৮ | | |
| সিনফ্রে | (বেশীনয়) | | |

ইংরেজ সকল বিষয়ে নগণ্য হইলেও সে মরিতে ভীত হয় নাই। সে নবাবের জনবল বা ধনবল দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। সে বুঝিয়া-ছিল এ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, তাই তাহারা ছলে বলে বা কৌশলে সকল বিষয়েই বীরত্ব দেখাইয়া এই শস্য শ্যামলা বাঙ্গলা হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। চুপ চাপ করিয়া বসিয়া থাকিলে লক্ষ্মী কখন প্রসন্না হন না। যে কয়েক জন মুষ্টিমেয় ইংরেজ, সাহসে বুক বাঁধিয়া পলাশীর দাঙ্গায় অভিনয় করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে লিপ্ত না থাকিলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। তাঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ইংলণ্ডের আজ এত সম্পদ, এত গৌরব এবং এত অভিমান।

কতকগুলি বেণে বুদ্ধির ধারণা যে, প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইতে না পারিলে দেশের আর কল্যাণ নাই। তাঁহারা দেশটাকে সুদ গণিতে নিপুণ অর্থসর্ব্বস্ব বেণেতে পরিণত করিতে ইচ্ছুক। যদি সুদ গণিতে শিখিলে জাতি বড় হইত, তাহা হইলে হতভাগা ইহুদী-গুলাকে আজ রুসের লাথি—কাল তুর্কীর পদাঘাত সহ্য করিতে হইত না। আমাদের দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেহ বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুদ গুণিতে মজবুত হইয়াছেন, কেহ বা কলুর বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তৈলসিঞ্চনবিদ্যায় পারদর্শী হইতেছেন।

ইংলণ্ডের রাজশক্তি লাভের সহিত, পরস্ব দিবসের পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়াছে। এসভ্যতা রোমক সভ্যতাকে অনুকরণ করিয়াছে। রোমক সভ্যতা যাহাকে অনুকরণ করিয়া-ছিল, সে সভ্যতা বহুদিন হইল জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যসভ্যতা যে অচির কাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহার লক্ষণ সকল পাশ্চাত্য সমাজে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, শত ম্যাক্সিম কামান ইহাকে কোন রূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেনা। ব্যভিচার ও মদ্য, পাশ্চাত্য সমাজকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিতেছে। ইহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়। সাধারণের ন্যায়ে কপটতা, স্বার্থ-পরতা, আত্মম্ভরিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি শিক্ষাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিলে বোধ হয় কোন রূপ দূষণীয় হয় না।

জালিয়াৎ ক্লাইব একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে আদৃত হউক। বিলাতী কাগজে পুস্তকখানি ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

# ফরিদপুর জেলা সমিতির

## প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা।

( ৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩১৪ )

আমার জননী এবং ভগিনিগণ, জন্মভূমির সমদুঃখী বন্ধুগণ এবং ভলন্টিয়ারগণ,—

আজ কাল একটী প্রশ্ন সর্ব্বদাই আমার প্রাণকে তোলপাড় করিতেছে, যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন এবং নীচ, কর্ত্তব্যের তাড়নায় অস্থির এবং ম্রিয়মান,সেবায় অপটু এবং অক্ষম, তাহাকে সম্মানিত করিতে বন্ধুরা এত লালায়িত কেন? এই বঙ্গে কত কত লোক আছেন, যাঁহারা জ্ঞানে প্রবীণ এবং ভাবে নবীন, চিন্তায় অতুলনীয় এবং সাধনায় অজেয়, সেবায় দুর্দ্ধর্ষ এবং কর্ত্তব্যে অটল, তাঁহাদিগকে না ডাকিয়া দুঃখী কাঙ্গালকে আহ্বান করা কেন? আমার নয়নে জলধারা বহিয়াছে, কিন্তু এ প্রশ্নের সদুত্তর পাই নাই। লোক-সঙ্ঘের কি অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি!!

আমি বাল্যকাল হইতেই গোপনে থাকিতে ভালবাসি। এই জন্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রথমে,তাহাতে নাম প্রকাশ করিতাম না; যদিও প্রতারণা নিবারণের জন্য শেষে পুস্তকসকলে নাম দিয়াছি,বটে. কিন্তু প্রকাশ্য সভা সমিতিতে ধরা দেই নাই। দিবই বা কেন? আমি যে সামান্য হইতেও সামান্য, অতি সামান্য, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। কাজ করিতে বড় সাধ ছিল, কিন্তু তাহা কিছুতেই সাধন করিতে পারি নাই;—মানুষকে ভালবাসিতে বাসনা ছিল, কিন্তু অসংযত আমি কিছুতেই সেই ব্রত প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা ছিল, নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সেবা করিয়া মানুষ প্রাণ দিতে পারে, আমি কেবল এই কথার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিব, কিন্তু বলিতে কি, আমি তাহাও পারি নাই। তবে আমার ন্যায় সামান্যের মস্তকে অসামান্য সম্মান-মুকুট কেন বন্ধুগণ পরাইয়া দিলেন? কি মহা ভ্রান্তি!

তবে একটা কথা আছে, তাহা এই, বন্ধুদিগের দয়ার পরিসীমা নাই। আমি যখন ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিবার সময়, অগণিত স্থানে পিতৃ মাতৃ স্নেহ পাইয়া আত্মহারা হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতাম, তখন কত সময় ভাবিতাম, মানুষের হৃদয়ে কত দয়া কত প্রেম, কত ভালবাসা! বলিতে কি, মানুষের দয়া দেখিয়া আমি কত সময়ে ভাবিয়াছি, বিধাতা যেন পিতৃ-মাতৃ-সখা রূপ ধারণ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। আমি সকল সময়ে সকলের চরণ-ধূলি মস্তকে লইবার অবসর না পাইয়া থাকিলেও, প্রাণে সকলের সদ্ভাব-রেণু বরণ করিয়া লইয়াছি। আমি এইরূপ অযাচিত সদ্ভাব-রেণু ধারণ করিয়াই বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছি। আমার সম্পত্তি কেবল অগণ্য নরনারীর পূত সদ্ভাব এবং স্নেহ,—আমি সকলের চরণের দাস;—এবং সকলে মায়ের প্রসাদ লইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ

করিতে দণ্ডায়মান। নিত্যই কত, কত, কত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। আজও, তাই, আপনারা এত সদ্ভাব-আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেছেন! আমি আর কি বলিব, আপনারা দেবদূত, আমার মায়ের অপূর্ব্ব প্রকট-লীলা, আপনাদিগকে আজ ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

আর একটা কথা আছে,—আমার নিজের নিজত্ব, স্বামীত্ব বা কৃতীত্ব আমি একদিনও অনুভব করি নাই;—আমি বরাবর বন্ধুদিগের হাতের ক্রীড়নক রূপে চলিয়াছি,—অথবা আমি যেন সমবেত-ইচ্ছা-শক্তি-সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র, প্রজ্জ্বলিত ইচ্ছা-দাবানলের একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কোন কাজ করিবার সময় দেখিয়াছি, সমস্ত ফরিদপুরের শুভ ইচ্ছা আমাকে গ্রাস করিয়াছে, আমার ক্ষীণতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা বিনাশ করিয়াছে, আমি অনাহত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়াছি। ১৩০০ সালে কোটালিপাড়ের দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে আমি মদনপাড়ের এক সভায় বলিয়াছিলাম, ফরিদপুরে আমি আর কিছু দেখিতে চাই না,—দেখিতে চাই কেবল শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ,—যাহাতে পরিশ্রম বা অর্থ লাগে না, কোন কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় না, আমি দেখিতে চাই, ফরিদপুরের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত কেবল সেই শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ। সেই শুভ ইচ্ছা আমাকে ছাইয়া ও গিলিয়া ফেলিয়াছে। আমার ব্যক্তিত্ব দেশ-যজ্ঞে অনেক দিন হইল ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর আমার বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের মত্ততা, প্রৌঢ়ের ক্রীড়া, বার্দ্ধক্যের সুখ। আমি কখনও বালক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছি, কখনও পাগল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছি, কখনও স্বার্থ-প্রণোদিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছি এবং কখনও আশা-প্রমুগ্ধ বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছি! ফরিদপুর আমার উন্নতির সোপান, ফরিদপুর আমার বিনাশের কারণ। ফরিদপুর লইয়াই বাঁচিয়াছি, আমার প্রাণের গভীর বাসনা এই, ফরিদপুর লইয়াই যেন মরিতে পারি। হায়, ফরিদপুরের জন্য খাটিতে খাটিতে যদি মরিতে পারিতাম, সকল সাধ পূর্ণ হইত। ফরিদপুর আমার গৃহ পরিবার, শরীর মন, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, আমার সর্ব্বস্ব। ফরিদপুর যেন আমার সকল সাধ-পূরণের বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র উপায়। ফরিদপুর আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধন ভজন, পূজা অর্চ্চনা। ফরিদপুরের উন্নতিতে আমি উৎফুল্ল, অবনতিতে ম্রিয়মাণ। ফরিদপুর আর আমি, একাত্মক। অথবা আমি কে? আমার সর্ব্বশরীরের অণুতে অণুতে কেবল ফরিদপুর অঙ্কিত। আমি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হনুমানের ন্যায় দেখাইতে পারি, এই বক্ষে ফরিদপুর-রামচন্দ্র-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই অঙ্কিত নাই। ফরিদপুরের জন্য সর্ব্বস্ব দিলেও আমার সাধ মিটে না। ফরিদপুর কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; ভাবিলেও চক্ষে জল আইসে।

কিন্তু আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আমি নিন্দা এবং উপেক্ষারই যোগ্য। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহার জন্য কি করিতে পারিয়াছি? প্রতিদিনই বিশ্বপিতা আমাকে লজ্জা দিয়া বলেন—"তুই কিছুই করিতে পারিস নাই।" প্রতিদিনই কত বন্ধু কত রূপে বলেন—"কিছুই হয় নাই, কিছুই হয় নাই।" এই কথায় আমি লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছি। বুঝিয়াছি, বাস্তবিক আমি কিছুই করিতে

পারি নাই! কই আমার সেই ভালবাসা,যাহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের পদরেণুতে,সমভাবে,আত্ম-বিলুণ্ঠিত করা যায়; কই আমার সেই পুণ্য, যাহাতে সকলকে প্রমত্ত করিয়া তোলা যায়! কার্য্যক্ষেত্র কত বিস্তৃত এবং আমি কত অক্ষম, কত দরিদ্র, কত দুর্ব্বল! আমি লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছি। মৃত ব্যক্তিকে জাগাইবার জন্য আপনাদের এ কি সুকৌশল! আমাকে উদ্বুদ্ধ করিবার কি অমোঘ লীলা! আমি আপনাদের মোহিনী শক্তিতে আজ সত্যই, অবাক্ হইয়া গিয়াছি। আজ আপনাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

আজ আমি দেখিতেছি, আপনারা কি এক স্বর্গীয় মন্ত্রে পূত হইয়া ফরিদপুরকে তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সুদীর্ঘ কাল পরে এই দাসের সমস্ত প্রার্থনা বিশ্বপতি শুনিয়াছেন। ফরিদপুরের ইতিহাস আশ্চর্য্য প্রহেলিকাময়। রাজা রাজবল্লভ এবং সীতারাম রায়ের প্রোথিত যশোরাশিকে উজ্জ্বল শোভায় ভূষিত করিতে আপনারা কত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সুদিন আর কখনও হয় নাই। আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

একদিনে কোন দেশের উন্নতির সূত্রপাত হয় না। বঙ্গদেশে যে স্বর্গীয় যুগের অবতারণা হইয়াছে, পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের নব যুগের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু দুই একদিনে এ যুগের অবতারণা হয় নাই, কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী এই কার্য্যে লাগিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত বঙ্গে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন,তাঁহারা যে কোন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। মহাজনেরা বলেন, ভাষার উন্নতি ভিন্ন দেশের উত্থান অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, প্যারীচাঁদ, রাজনারায়ণ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ভূদেব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুফল ফলিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব্ব নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রাহ্য করিতেছেন। সামাজিক উন্নতির জন্য মহাত্মা রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে অদম্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল আজকাল চতুর্দ্দিকে ফলিতেছে। রাজনীতি-সংস্কারের জন্য মহাত্মা রাজা মোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে বঙ্গে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। বুঝি বা সমস্ত আয়োজন পূর্ব্বেই হইয়াছিল, পার্টিসন কেবল উপলক্ষ মাত্র।

পুণ্যবান্দিগের অশেষ পুণ্যের জোরে আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথের, তৎপর মতিলাল, নরেন্দ্রনাথ, এবং বিপিনচন্দ্রের, চন্দ্রনাথ, অক্ষয় চন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের, গৌরগোবিন্দ এবং শিবনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিরূপে ধারাবাহিক রূপে উন্নতির স্রোত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব; তাহার সহিত অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সমূহের বিশেষ কোন সম্বন্ধও নাই। সাপদ্ধ

যখন বান ডাকে, তখন নদী সকলে তাহার তরঙ্গাভিঘাত হয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা-মহাসমুদ্রে যে বান ডাকিয়াছিল, অল্পাধিক পরিমাণে তাহার তরঙ্গ নিকটবর্ত্তী জেলা সমুহে আঘাত করিয়াছে। ফরিদপুরে সেই আঘাত অল্প পরিমাণে লাগে নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গের সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথের পুর্ব্বপুরুষগণ ফরিদপুরে বাস করিতেন। দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণির বাড়ী এই জেলায়। ৺নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বিপিন বিহারী রায়, মুন্সি কফিলদ্দিন চৌধুরী, মৌলবী আবদুল রহিম চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, প্যারীলাল রায়, গোরাচাঁদ দাস, রেঃ মথুরানাথ বসু, গিরীশচন্দ্র বসু, রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতির অভ্যুদয়ে ফরিদপুরের উন্নতি অজড়িত নহে। এই সকল মহাত্মাদের স্বর্গারোহণে আমাদের প্রাণ অবসন্ন। কত মহাত্মা আজও জীবিত থাকিয়া ফরিদপুরের উন্নতি সাধন করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের সকল চেষ্টা এবং উদ্যম একস্থলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি জীবিত থাকিয়া এখনও ফরিদপুরের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। পুণ্যশ্লোক অম্বিকাচরণের উৎসাহ, উদ্যমের কথা যখন ভাবি, সত্যই, তখন আমার ন্যায় মৃত প্রাণেও নবজীবনের সঞ্চার হয়। আপনারা হয় ত তাঁহার দোষত্রুটি স্মরণে ভ্রুকুঞ্চিত করিতেছেন। দোষ ত্রুটি কাহার নাই,—দেবতাদেরও ছিল। আমি আজ এই পুণ্যময় দিনে কাহারও দোষ ত্রুটি স্মরণ করিব না। অম্বিকাচরণের দ্বারা ফরিদপুর এবং বঙ্গদেশ আজ গৌরবান্বিত, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? আমি ফরিদপুরের অগণ্য বন্ধুবিচ্ছেদে যখন শোকান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া দিশাহারা হই, কিম্বা কার্য্যক্ষেত্রে যখন নিরাশ হই, তখন চাহিয়া দেখি, অম্বিকাচরণ আমার সম্মুখে ধ্রুবতারার ন্যায় পথ প্রদর্শন করিতে উপস্থিত। দেখি, ভাবি এবং মোহিত হই। এক সময়ে আমি এবং ৺বন্ধু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ফরিদপুরের নানাস্থানে সভা সমিতি স্থাপনের জন্য ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাহারই ফলে যে অসংখ্য সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অতি গৌরবের ফরিদপুর-জনসাধারণ সভা অন্যতর। মাইনর স্কুলের সামান্য ঘরে যখন জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইতেছিল, তখন আমি সাধু অম্বিকাচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম, তিনি যেন দেবদুত রূপে আমার সমক্ষে উপস্থিত। আমি মনে মনে সেই দিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত, তাঁহাকে গুরু এবং নেতারূপে অন্তরে পূজা করিয়া আসিতেছি। তিনি ফরিদপুরের উন্নতির ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য্য উপকরণ। আমার মনে হয় যেন,—ফরিদপুরের সকল মহাজনের সকল মহত্ত্ব সেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি জীবিত আছেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সঙ্গত নয়, এজন্য আমি নিরস্ত হইতেছি, কিন্তু একথা বলিবই বলিব যে, ফরিদপুর এহেন রত্ন পাইয়া গৌরবান্বিত এবং ধন্য হইয়াছে।

আপনারা জানেন, আপনাদের এই অধম ভৃত্য প্রায় ত্রিংশ বৎসর এই ফরিদপুরের সেবা করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। ফরিদপুরের এমন কোন ভদ্র পল্লী নাই, যেখানে আমি যাই নাই। গিয়াছিলাম কেবল এই কথা প্রচার

করিতে—"স্বদেশের উন্নতি ভিন্ন আমাদের আর গতি মুক্তি নাই।"

একদিন আমি কলিকাতার মেথডিষ্ট গির্জ্জায় পুণ্যশ্লোক অমিত-শক্তিশালী জেনেরেল বুথের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা শুনিতে নয়—ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উত্তাপ হৃদয়ে সংগ্রহ করিবার জন্য গিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম—সমান্য এবং অসামান্য, সীমা এবং অসীমা, সান্ত এবং অনন্ত সেখানে সম্মিলিত হইয়া কি এক মহা-সাগরের তরঙ্গ সমুত্থিত করিতেছে। সান্ত এবং অনন্তের লীলা প্রতি জীবে এবং প্রতি বস্তুতে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত, কিন্তু তাহার পরিচয় কে লয়, কে পায়? মহাজনের মহত্ত্বেই তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। বুথ বলিয়াছিলেন, —"আমার সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত তন্ত্র কেবল ৪টী অক্ষরে নিবদ্ধ, তাহা এই—"Love". এই কথা বলিবার সময় তাঁহার নয়ন হইতে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, আমার পাষাণ চক্ষু হইতেও অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল। কি শোভা যে দেখিয়াছিলাম, তাহা ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। সেই দিন আমি তাহার "প্রেম" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। ইহারও পূর্ব্বে, বাল্যে, প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ইতালীর দেবতা, ম্যাটসিনির নিকটে। আমি যখন এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখনও ম্যাটসিনি জীবিত ছিলেন। ম্যাটসিনি যে প্রেম-মন্ত্রে ইতালীর উদ্ধার সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং যে প্রেম-মন্ত্রে বুথ অসাধ্য সাধিত করিতেছেন, ঐ প্রেমমন্ত্র ভিন্ন এদেশের রক্ষার আর উপায় নাই। আমি ত্রিংশ বৎসর ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে কেবল এই এক কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছি। প্রেমমন্ত্র প্রচারের সময় ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ ভেদ গণনা করি নাই। যাহাকে পাইয়াছি, তাহারই চরণে প্রণত হইয়াছি এবং বলিয়াছি,"তুমি যে আমার মায়ের সন্তান, তুমি যে আমার প্রাণের ভাই।" কাহারও কষ্টের কথা শুনিলে ঠিক থাকিতে পারি নাই—অযোগ্য হইয়াও সচেষ্ট হইয়াছি, ওলাউঠায় লোক মরিতেছে সংবাদ পাইলে ছুটিয়াছি, অনাহারে লোক মরিতেছে শুনিলেও ধাবিত হইয়াছি। কিন্তু আজীবন সেবা করিয়াও আমার সাধ মিটে নাই, বুঝি বা আজও "প্রেম-মন্ত্র" আমার হৃদয়-ঘরে জাগিয়া উঠে নাই। এই দুঃখে আমি সদা ম্রিয়মাণ, অবসন্ন এবং অস্থির আছি।

দেশকে যদি আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিতাম, এদেশের কেহ কি আমাদের পর থাকিতে পারিতেন? আমরা তাহা হইলে,সকলের সহিত একাত্মক হইয়া যাইতে পারিতাম। চতুর্দ্দিকে কত দরিদ্র অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিয়া সুখে কিরূপে নিদ্রা যাই? কত লোক রোগের সময় এক বিন্দু ঔষধ পায় না, ক্ষুধার সময় অন্ন পায় না, কত লোক অশিক্ষার ঘোরান্ধকারে নিমজ্জিত, আমরা সুখে এবং উল্লাসে দিন কাটাই। হায়, ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়।

দারিদ্র্য-সমস্যা ভারতের, বঙ্গের এবং ফরিদপুরের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার পূরণ না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। দরিদ্রগণ যদি দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে মরিয়াই গেল, তবে কে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে? আমাদের দেশের অসংখ্য লোক ঘোরতর দারিদ্র্যে নিপীড়িত—তাহাদিগকে রক্ষা করার উপায় কেবল কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থা-

পন। এতকাল পরে যদি নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে, দরিদ্ররক্ষার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন।

অনেকের মনে এই উত্তর আছে, আমি জানি,—প্রজা রক্ষা করিবেন রাজা, আমরা তাহার কি ধার ধারি? রাজার কর্ত্তব্য যদি রাজা না করেন, তবে আমরা কি করিব, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কি? রাজা, প্রজার সম্বন্ধ লইয়া ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে বড়ই গোলযোগ চলিয়াছে। "স্বরাজ" প্রশ্ন চতুর্দ্দিকে শোনা যাইতেছে। "স্বরাজের" অর্থ আমি বুঝি, নিজের কাজ নিজেরা, গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া, করিয়া যাওয়া। গবর্ণমেণ্ট অনেক করিয়াছেন, কি কম করিয়াছেন, সে বিচারের বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি না, বুঝি না। বুঝি কেবল এই, বিধাতা আমাকে যত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়াই সৃজন করিয়া থাকুন না কেন, দেশের প্রতি আমারও কিছু কর্ত্তব্য আছে। জল বায়ু অন্ন দিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রদর্শিত কার্য্য সংসাধনের জন্য। আমার কর্ত্তব্য যদি আমি না করি, অন্যকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার বা কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য ভৎসনা করিবার আমার কোনই অধিকার নাই। সব সময়ে ভাবিতে হইবে, আমাদের কাজ আমরা করিতেছি কি না। নিজকে রক্ষা করা, পরিবার প্রতিপালন করা যেমন আমার কর্ত্তব্য, দেশের সেবা পরিচর্য্যা করাও তেমনি আমার কর্ত্তব্য। আমরা নিজেরা যদি কিছু না করি, তবে অন্যকে বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। এই জন্য আমি আবেদন-নিবেদনের চিরবিরোধী। আমি বাল্যকালে ভাবিতাম, আমি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু কাহারও পা ধোয়াইয়া দিতেও কি পারিব না? আমি সামান্য ব্যক্তি, সামান্য লইয়াই থাকিতে ভালবাসি। সামান্য কাজই আমার লক্ষ্য। আমাদের এই যে জেলা-সমিতি—ইহা সামান্য কার্য্য আরম্ভ করিয়া অসামান্যের পথ দেখাইবে। সান্তে আরম্ভ—অনন্তে পরিণতি। আমাদিগকে কিছু সাধন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আমি ১৩১৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারতে "বার্ষিকা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"এখন এমন দিন আসিয়াছে, যখন বঙ্গের মূর্খ ও জ্ঞানী, চাষা ও বণিক, প্রজা ও রাজাকে এক ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। এ দল, সে দল, সকল দলকে এক হইতে হইতে হইবে। এবার বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির পরিণাম যাহা হইল, তাহা দেখিয়া এত অপমানের পর আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের আদরের প্রাদেশিক-সমিতি, প্রধান নেতৃসমাজ রূপে দণ্ডায়মান হউন। প্রতি জেলায় তাহার শাখা সমাজ-প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রতি সব্‌ডিবিসন ও প্রতি থানায় তাহার উপশাখা-সভা গঠিত হউক। সর্ব্বশ্রেণীর লোক—নিরীশ্বরবাদী ও সেশ্বরবাদী, নিরক্ষর ও সাক্ষর, সকলে এই সকল সভায় যোগ দিবেন। প্রতি গ্রামের প্রধানগণ উপশাখা সভার সভ্য হইবেন, প্রতি উপশাখা সভার নেতাগণ শাখাসভার সভ্য হইবেন এবং শাখা সভার নেতাগণ প্রাদেশিক সমিতির সভ্য হইবেন। এইরূপে প্রধান সভার প্রধান ব্যক্তি উপশাখা সভার সর্ব্ব নিম্ন ব্যক্তির সহিত এক যোগে এক সূত্রে গ্রথিত হইবেন। এক ডাকে সকলে আহূত হইবেন; এক মন্ত্রে সকলে মিলিত হইবেন—সে মন্ত্র "স্বদেশের হিত কামনা।" যে উপায়ে যেরূপে দেশের হিত

হইতে পারে, সকলকে কায়মনোবাক্যে কেবল সেই চেষ্টা করিতে হইবে। মতের ঝগড়া সর্ব্বদা পরিহার করিয়া কেবল কাজ লইয়া সকলে আত্মহারা হইবেন। দারিদ্র্য-সমস্যা, রোগ-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, মকর্দ্দমা-সমস্যা, সকল সমস্যার পূরণ এই সকল সমিতি করিবেন।"

বড়ই সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বরিশালে প্রথম জেলা সমিতি গঠিত হয়। তৎপর কলিকাতার কংগ্রেস (১৯০৬ ডিসেম্বর) ও বহরমপুর প্রাদেশিক সমিতি এইরূপ জেলা সমিতি গঠনে বদ্ধপরিকর হন। প্রকৃত কাজ করিবার সময় কাহারও সহিত অসদ্ভাব হয় কি? আমি একথা চিরকাল অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি। অর্থের অভাবে কাজ হয় না, একথাও অস্বীকার করিয়াছি। ইচ্ছা থাকিলেই কাজ আইসে,—প্রকৃত কাজ আসিলে সকল বাধা বিঘ্ন, সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপসরণের ন্যায়, অপসৃত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল, কাজ আর কাজ। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, দেশের অশেষ অভাব দূর হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যতই বিরোধী হউন না কেন, প্রকৃত কাজের সময় তত বিরোধী হন না। দুর্ভিক্ষের সেবা কর, দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপন কর, ব্যাঙ্ক স্থাপিত কর, শিক্ষালয় সংস্থাপন কর, সালিসী-প্রথা প্রবর্ত্তিত কর, সমাজ-সংস্কার কর,—গবর্ণমেণ্ট বিরোধী হইবেন না,—কোথাও বিরোধী হন নাই। স্বদেশী-গ্রহণ ব্রতেরও প্রকাশ্যে খুব বিরোধী হন নাই। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্ট যত গ্রহণ করিতেছেন, এত আর কেহ গ্রহণ করে না। কাপড় বল, কাগজ বল, ছুরি বল, কাচি বল,—গবর্ণমেণ্ট স্বদেশোৎপন্ন সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। আমরা যদি গবর্ণমেণ্টের ন্যায় স্বদেশী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবে এদেশ ধন্য হইয়া যাইত। সমস্ত কাজগুলি যদি ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের নিজ হাতে আনিতে পারি, তবে "স্বরাজ" কি আর দূরে থাকিতে পারে? গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে "প্রতিষ্ঠিত" সভা সকল "স্বরাজ" ভূষণে ভূষিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট থাকিয়াও মৃতবৎ পরিলক্ষিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্টের যে বিভাগ-নীতি এদেশের উন্নতির নব-যুগ (?) আনয়ন করিয়াছে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কখনও সেই বিভাগনীতির পোষকতা করিব না। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক চরিত্র, এক নীতি, এক দেশ এবং এক সমাজ,—আমরা ইহাই চাই। একতাই আমাদের লক্ষ্য। একতা সাধনের পথ—কার্য্যকরী বিভাগ। কর্ম্ম-ব্রত ধরিয়া আমরা একতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। আমাদের লক্ষ্য—একতা-মূলক "স্বরাজ"। "একতা ভিন্ন স্বরাজের আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নাই। আমাদের রাজা—"সমবেত-শক্তি", এবং দুর্দ্ধর্ষ "জাতীয় একতা"।

তাঁহারা আমাদিগকে ছলে বলে কৌশলে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিতে চাহেন। "Utkal for the Oriyas, Behar for the Beharis, Assam for the Assamese"—এই মোহকর কথা প্রচার করিয়া ও ভাষা-বিভাগ করিয়া তাঁহারা কত অনিষ্ট করিয়াছেন! পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গকে বিভাগ করিয়া কত অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাদ তুলিয়া

করত অনাত্মীয়তা জাগাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন! সে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে;—এখন হিন্দু ও মুসলমানকে এবং নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীকে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কেবল তাহা নয়—আমাদের স্বদেশের সকল হিতৈষীকে আবার দুই দলে বিভক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা না বুঝিয়া কত রূপে সম্মোহিত হই! এই অনাত্মীয়তা রূপ মহাশত্রু ভিন্ন আমাদের "স্বরাজ"-সাধনের আর অন্তরায় নাই। সত্যই বলিতেছি, ইংরাজ আমাদের অন্তরায় নয়,—অন্তরায় কেবল "অনাত্মীয়তা"। আমরা এই মহা শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য, সর্ব্ব প্রযত্নে, আসুন চেষ্টায় নিযুক্ত হই।

এই ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৩২৪১-৩৫। ইহাদিগকে বিপথে চালিত করিবার যে আয়োজন হইতেছে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে। তাহারা আমাদের ভাই,—তাহাদিগকে আমাদিগের সহিত সংযুক্ত না করিলে কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। আমাদের দেশে কেরামতআলীর দল দুর্দ্ধর্ষ,—তাহাদিগকে আমাদের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছি,—অগণ্য হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই হইয়া গিয়াছি, আর এই স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে এক হইতে পারিব না? আমরা দেখাইব, অন্য দেশে যাহা অসম্ভব, এই ফরিদপুরে তাহা সম্ভব। এখানে আমরা "ভাই ভাই একঠাঁই" হইয়া হাড়ে হাড়ে মিলিত হইয়া যাইব। পরাধীন জাতির রাজনীতি আর কি? আমাদের এক মাত্র নীতি এই—"আমরা সকল ভাই একঠাঁই"। ভারতবর্ষে যে দলাদলি চলিতেছে, আমরা সামান্য ফরিদপুরবাসী, সে দলাদলি হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাকিয়া কেবল একতা সাধন করিতে থাকিব। মনে জপমালার ন্যায় জপিব —পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ যেমন আমাদের, আধুনিক নেতাগণও তেমনি, আমাদের। আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের কৃষ্ণকুমার, আমাদের অশ্বিনীকুমার, আমাদের বিপিনচন্দ্র, আমাদের তিলক, আমাদের লাজপত রায়—সকলেই আমাদের নেতা, কর্ম্মবীর, সহায় এবং আশ্রয়। পরিত্যাগের শাস্ত্র, পর-তন্ত্র আমরা সর্ব্বদা বর্জ্জন করিব। আমাদের ফরিদপুর-জেলা-সমিতির মূল মন্ত্র হউক—মহাত্মা বুথের "Love", বাস্তবিক এক অঙ্গের কোন্ প্রত্যঙ্গকে বর্জ্জন করা যায়? সকলেরই, আপন আপন কার্য্য সাধনের জন্য, অত্যাবশ্যক। তোমার কাজ আমার দ্বারা হয় না, আমার কাজও তোমার দ্বারা হয় না। বিধাতার বৈচিত্র্যের এক মহাশিক্ষা এই—এ জগতের সকলেরই প্রয়োজন আছে। ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সকলেরই প্রয়োজন আছে। রাজা রাজকার্য্য সাধনের জন্য বড়, প্রজা কৃষিকার্য্য সাধনের জন্য বড়;—আপন আপন বিশেষত্বে সকলেই বড়,—স্বস্ব-প্রধান। এক জনকে পরিত্যাগ করিলেও বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করা হয়। বড় ছোট আমরা সকলে ভাই ভাই;—এক মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃত্ব সাধনই মাতৃত্ব সাধনের মূল মন্ত্র। "বন্দে মাতরম্ মন্ত্র" ততদিন আমাদের রক্ত-মাংসের সহিত জড়িত হইবে না, যতদিন আমরা ভাই ভাই পর-পর থাকিব। অতএব সকলে ভ্রাতৃত্ব সাধনে অগ্রে বদ্ধপরিকর হউন। মাতা ও সন্তান যখন একস্থানে মিলিত—মাতা পুত্র যখন একাকার—তখনই জাতীয় একতা, অথবা "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত। অন্য যে

স্বরাজের কথা, তাহা এযুগের অযোগ্য জল্পনা এবং কল্পনা মাত্র।

আমি বলিয়াছি, একতা সাধনের উপায় —কর্ত্তব্য সাধন। কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন একতা সাধনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রকৃত সেবক যে, সে-ই অন্য সেবকের মহত্ত্ব বুঝে। সেবা-ক্ষেত্রে বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। সেতুবন্ধনের সময় অতি সামান্য কাঠ-বিড়ালের সাহায্যও উপেক্ষিত হয় নাই। বাড়ীতে আগুন লাগিলে—সকলে নিজ নিজ বিশেষত্ব ভুলিয়া প্রাণপণে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে ধাবিত হয়।* যে দাবাগ্নি এই দেশে প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহা নির্ব্বাপিত না হইলে অচিরে দেশ মহাভস্মে পরিণত হইবে। এখন যাহার যে শক্তি থাকে, এই কাজে তাহা নিয়োগ করিতে হইবে। দেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ভাই, তুমি ভেদা-ভেদের তর্ক তুলিয়া তাহা ভুলিয়া যাই-তেছ? ছি, আর সময় নাই—সতর্ক হও। আপন কাজে মনোনিবেশ কর। কত কত ভাই জেলে নিগৃহীত হইতেছেন,* স্মরণ কর; কত কত ভাই স্বদেশের জন্য কত নির্য্যাতন মস্তক পাতিয়া লইতেছেন, স্মরণ কর। কত ভাই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, স্মরণ কর। স্মরণ কর—কাব্য-

* ফরিদপুরে যাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছেন, শুধু তাহাদের নাম এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

১

কেটেল (Cattell) নামক এক সাহেব অনন্তমোহন দাস নামক মাদারিপুর ইংরেজী স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রের নামে নালিশ করে যে, তাহাকে মারিয়াছে, ১৪৭ ধারা অনুসারে তাহার ৬সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রম সহিত জেল হয়। সাং চরমুগরিয়া, মাদারিপুর।

(২)

এক মুসলমান—রাজকুমার দে এবং কুমুদিনীকান্ত দে নামক ২টী ভদ্রলোকের নামে বিলাতী কাপড় কাড়িয়া নেওয়া ও তাহা পোড়ানের নালিশ করে। ৩৭০ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দের ১ মাস ও কুমুদিনীকান্ত দের ১৫ দিনের সপরিশ্রম জেলের হুকুম হয়। আদালতে হুকুম বহাল থাকে।

উভয়ের বাড়ী সাজনপুর, থানা পালং।

(৩)

ব্রজবাসী কাপুড়িয়া নামক এক কাপড়-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটীর নামে নালিশ করে যে, সে তাহার বিলাতী কাপড় লইয়া গিয়াছে। ৩৭৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩ মাস সপরিশ্রম জেল ও ৫০৲টাকা জরিমানা হয়, আপীলে জরিমানা বহাল ও যে ৪দিন জেল খাটিয়া-ছিল, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া খালাস পায়।

(৪)

শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটী, শ্রীযুক্ত মুনসী মজাফের হোসেন, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বিক্রয় বাধা দেওয়ায়—১০৭ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথের ৫০০৲ টাকার জামীন ও ৫০০৲ টাকার মুচলিকা, শ্রীযুত মহেন্দ্র বাবুর ৩০০৲ টাকার জামীন ৩০০৲ টাকার মুচলিকা, মুনসী মজাফর হোসেনের ২০০৲ টাকার জামীন ও ২০০৲ টাকার মুচলিকা হয়। প্রত্যেকেরই জামীন ও মুচলেখা ৬ মাসের জন্য হয়। সকলের নিবাস পালং।

(৫)

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটীর উক্ত জামীনের ৬ মাস অতীত হওয়া মাত্র পুনরায় তাহাকে বিলাতী লবণ বিক্রয় হইতে বাধা দেওয়ার অপরাধে ১০৭ ধারা অনু-যায়ী পুলিশ চালান দেয়—৫০০৲ টাকার জামীন ও ৫০০৲ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। (১ বৎ-সরের জন্য)।

ঐ মোকর্দ্দমায় মহেন্দ্র বাবুর সহিত মৈজদ্দিন নামক পালং হাটের ইজারাদারকেও চালান দেওয়া হয়। তাহারও ২০০৲ টাকার জামীন ও ২০০৲ টাকার মুচ-লিকার আদেশ হইয়াছে। সকলের নিবাস পালং।

(৬)

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে হাটু-

বিশারদের কথা, উপাধ্যায়ের কথা, রমাকান্তের কথা, সর্ব্বোপরি আনন্দমোহনের কথা। এহেন শোকের দিনেও আমরা প্রেম-মন্ত্র জপ করিতে শিখিব না? এহেন দুর্দ্দিনেও বৃথা আমোদে প্রমত্ত হইব?

এই ফরিদপুরের অভাব—ভারতের অগণ্য পল্লীর অভাবের কেন্দ্রস্বরূপ! ভাগীরথীর ন্যায়, ফরিদপুরের নদী সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কুমার গিয়াছে, চন্দনা গিয়াছে, গড়ে নদী যায় যায় হইয়াছে—কত চেষ্টা করিয়াও এ সকলকে বহমান রাখা যায় নাই।* অগণ্য খাল বিল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সকলের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া এদেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। জলাভাবের কষ্টে এদেশের নর-নারী বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস হাহাকার করে। ম্যালেরিয়ার অন্য কারণ পাটের চাষ। আমি বর্ষার প্রাক্কালে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—ফরিদপুরের ধানের ক্ষেত্র সকল দিন দিন পাটের ক্ষেতে পরিণত হইতেছে। খাল বিল, থানা ডোবার জলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাট পচাইয়া, সেই জল উদরসাৎ করিয়া, অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিভূত হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিগত কয়েক বৎসর কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, দশ বৎসরের নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা দেখুন—কেবল জররোগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—মৃত্যু হয় ১৬০২৪।

১৮৮৮—২০,০২৬
১৮৮৯—২২,২৮৭
১৮৯০—২৫,২২০
১৮৯১—৩১,৩৬৮
১৮৯২—৪১,৭৯০
১৮৯৩—৪০,৫৫৮
১৮৯৪—৩৭,৬৩৮
১৮৯৫—৪৩,১৪৪
১৮৯৬—৪৮,০৫৬,
১৮৯৭—৬৮০৬৩
১৮৯৮—৫৮৩৬৮

মোট মৃত্যু—১৮৯৮—৬৬৯১৯
" ১৮৯৯—৪২৮৭৭

মোট জনসংখ্যা—১৮,২৩,৫৪৩

* ইরিগেশন-খালের জন্য সকল নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন।

রিয়ার বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয় করিতে বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারা মতে প্রত্যেকের ১০০৲ টাকার জামীন ও ১০০৲ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে, নিবাস পাঁচকাটি, পোঃ হাটুরিয়া।

(৭)

বাজিতপুর স্বদেশী মোকদ্দমা।

উমেশচন্দ্র বাগচি নামক একব্যক্তির নালিশে—

(১) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বাগচি (বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন) বাজিতপুর ইংরেজি স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ৩মাস সপরিশ্রম কারাগার, ১০০৲ টাকা জরিমানা এবং উক্ত স্কুলের ১ম শ্রেণীর অপর ৩টী ছাত্র

(২) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ২ মাস সপরিশ্রম ৫০৲ টাকা জরিমানা।

(৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১ মাস সপরিশ্রম ও ৫০৲ টাকা জরিমানা।

(৪) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাস সপরিশ্রম ৫০৲ টাকা জরিমানা।

অভিযোগ:—কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর আদেশে উমেশ বাগচির দোকান হইতে বিলাতী চিনির প্রস্তুতীয় /৫। সোয়া পাঁচ সের বাতাসা মূল্য অনুমান ১৲ টাকা, জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়াছে।

১৪৭ ও ৩৭৯ ধারা মতে সাজা হয়। জরিমানার টাকা হইতে ১৲ টাকার বাতাসা নষ্ট করার জন্য বাদীকে ৩০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিক বাবু আজ ৩।৪ দিন হয় জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—বালকগণ পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছে।

গত বৎসর খুব প্লাবন হইয়াছিল। (১৯০৭ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) মোট মৃত্যু সংখ্যা ৫১০৯৫, অর্থাৎ হাজার করা ২৬.৩০। জ্বররোগে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৩৬৫৩৬, অর্থাৎ হাজার করা ১৮.৯। গত দশ বৎসর মধ্যে ১৯০৭ অব্দেই মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম।

জ্বরের তালিকা দিলাম, থানা অনুসারে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ওলাউঠার মৃত্যু-তালিকা দেখুন—

| থানা | জনসংখ্যা | ওলাউঠায় মৃত্যু | গড় ১০০০ প্রতি |
|---|---|---|---|
| ফরিদপুর টাউন | ১০৭৭৪ | ২৯ | ২.৬০ |
| মাদারিপুর „ | ১৩৭৭২ | ১৭৪ | ১২.৬৩ |
| ফরিদপুর থানা | ৮৬২১১ | ২৫০ | ২.৮৯ |
| ভূষণা | ১০১৮২ | ১৬৯ | ১.৭৩ |
| আইনপুর | ১০২৯৪৮ | ১৭৯ | ৩.৮৬ |
| মুকসুদপুর | ১৭৬৪১৮ | ৭০০ | ৬.৫০ |
| ভাঙ্গা | ১৮৭৮৮৯ | ১২২২ | ৮.০৮ |
| মাদারিপুর থানা | ১৭৯৭৭৬ | ১৪৫৩ | ১৩.৯৬ |
| পালং | ২৭৯০৮৪ | ৩৮৯৭ | ৩.০৬ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৬৮৩৪ | ২৯৭ | ৯.৪২ |
| কোটালিপাড় | ৭৯১২৯ | ৫৯১ | ৭.৪৬ |
| শিবচর | ১৩১৮৫২ | ১২৪৩ | ৯.৪২ |
| গোয়ালন্দ | ১২৬০৩৮ | ৬৭৭ | ৫.২৪ |
| পাংসা | ১২৬৬১৫ | ২৫৪ | ২.০০ |
| বালিয়াকান্দি | ৯৭৭৯৯ | ২৫০ | ২.৫৫ |

মোট মৃত্যু-সংখ্যা ১১৩৮৫

অন্যান্য মাস বাদে আগষ্ট ৩৭৫, সেপ্টেম্বর ১৮৬০ ও অক্‌টোবরে মৃত্যু সংখ্যা ৩৫৪৬। ইহাতেই বুঝা যায়—ভাদ্র মাস হইতে কি ভয়ানক অবস্থা হয়। পাটপচা জলই যে ইহার কারণ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার মৃত্যু হ্রাস করিতে হইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং পানীয় জলাশয় সংরক্ষিত করিতে এবং পাটের চাষ কমাইতে হইবে। পাটের চাষ দিন দিন যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, এরূপ চলিলে ফরিদপুরে নিত্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে।

১৩০০ সালে কোটালিপাড়, আইনপুর ও মুকসুদপুরের দুর্ভিক্ষে আমরা সুহৃদ্ সভা হইতে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। ১৩০২ সালে ফরিদপুর, কোতোয়ালি, ভূষণা ও বালিয়াকান্দি সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। ১৩১৩ সালে কোটালিপাড়, গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর ও মাদারিপুরের কোন কোন স্থলে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। এই শেষ বার অনেক সভা সমিতি এবং ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১৩১৩ সালে আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ সমস্ত ফরিদপুরে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। বিগত ১৩ বৎসরের মধ্যে ৩ বার ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইবে, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। এক বৎসর যদি ধান না জন্মে, তবেই হাহাকার উপস্থিত হয়। পাট বেচা টাকা নানা বিলাসিতায়, মহাজনের সুদে ও জমীদারের খাজনা ও আবওয়াবে শেষ হইয়া যায়, কিছুতেই অন্ন-কষ্ট দূর করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা নিবারণের জন্য পাটের চাষ না হ্রাস করিতে পারিলে আর উপায় নাই।

পাটের চাষ বঙ্গে যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে ধানের আমদানিও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

ফরিদপুরে মোট আবাদী ভূমি ৯৭০০০০০ একর, ১৯০৬ সনে পাট চাষ হয় ১১৭০০০

একর জমীতে, ১৯০৭ ১২৫০০০ একর জমীতে। ১৩১৩ সালে সমস্ত জেলা সমূহে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৫৮৫২৪ একর জমীতে বেশী পাট চাষ হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা—কষ্ট হইতেছে—ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর অবস্থা স্মরণ করিলে, কিছুতেই চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। বিগত সেন্সাস রিপোর্টের কয়েকটী জেলার বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, যথা—

| জেলা। | ১৮৭২ | ১৮৮১ |
|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | ১৬০৮২৬ | ১০৭৬৮৪ |
| ২৪ পরগণা | ১২০১০২ | ১১৪৯১১ |
| নদীয়া | ৬০০২৪ | ৫৯৮৯৪ |
| যশোহর | ৫১৯৯৯ | ৩৭৭৫২ |

এইরূপ সকল দেশের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি? জাতীয় বিলোপের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাধীনতাই প্রধান কারণ। দুঃখ দারিদ্র্য মানুষের জনন-শক্তি হ্রাস করিতেছে। তদুপরি, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা আছে। অনাহারে, হায়, দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার উপর মামলা মোকর্দ্দমায় সকলে জেরবার হইয়াছেন। ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ, ঘরে ঘরে হাহাকার!

দারিদ্র্যের প্রধান কারণ অজন্মা, রপ্তানি এবং পাটের চাষ বৃদ্ধি। আমাদিগকে আমদানি এবং রপ্তানি দুইই আপাততঃ বন্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ধার কর্জ্জ নাই, এমন লোক কুত্রাপি পাওয়া যায়। অতি মাত্রায় সুদে বঙ্গ জর্জ্জরিত। ইহার হস্ত হইতে রক্ষার উপায় কি? ফরিদপুরের লোন আফিস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, কৃষিব্যাঙ্কের দ্বারা এদেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায় অচিরে কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে আয়ও যথেষ্ট হইবে এবং দরিদ্র শ্রেণীও সুরক্ষিত হইবে।

আর একটী কথার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই করিয়াছি—নিম্নশ্রেণীকে জাতীয় দলে গ্রহণ করা। নিম্নশ্রেণীই দেশের আশা ভরসা। নিম্নশ্রেণীকে বাদ দিয়া কখনও কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। বঙ্গে ব্রাহ্মণ-যাজিত হিন্দু সংখ্যা—৫৬ লক্ষ।

এই সকল হিন্দুর জলবাহী ২৬ লক্ষ।
যাজন ও স্পর্শের অযোগ্য ১২০ লক্ষ।
একুন হিন্দু সংখ্যা ২০২ লক্ষ।
মুসলমান সংখ্যা ২২৫ লক্ষ।
রাজবংশী, নমঃশূদ্র ও বাগদী প্রভৃতি ৭৫ লক্ষ।

ফরিদপুরে নমঃশূদ্র সংখ্যা ৩২৪১৩৫।

সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা কত অধিক, দেখিলেন। উচ্চশ্রেণীর অবহেলায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতেছেন। এই মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া আমরা কিছুতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিব না। ইহাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় ও চরিত্রে আমাদের প্রাণের জিনিস করিয়া লইতে হইবে। জল-অচলের সংখ্যা ১২০ লক্ষ। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না। বাকী অনাচরণীয় হিন্দু সংখ্যা যদি মুসলমানের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং আমরা যদি মুসলমানদিগকে পরিহার করি, তবে আমাদের দল কত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একবার ভাবিয়া দেখুন। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল না হইলে এক্ষেত্রে

আমাদের আর রক্ষা নাই। উদার, উদার—কত উদার হইয়া চলিতে হইবে, আজ একবার চিন্তা করুন। কার্য্যক্ষেত্রে অতি উদার হইয়া ভাই ভাই সম্মিলিত হইতে হইবে।

ভারতের মাড়োয়ারী এবং পার্শি জাতি আমাদের দারিদ্র্য-নিবারণ-ক্ষেত্রে আদর্শ-স্থানীয়। শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন আমাদিগের আর গত্যন্তর নাই। শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আমাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ভারতকে গোলামীতে, চাকুরীতে নিমগ্ন করিতে ইংরাজের ইচ্ছা,আমরা চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া যদি স্ব-অধীন হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে আর আমাদের পতন নাই। আমরা সোণার ভারতের সব ধনরত্ন বিদেশে পাঠাইয়া, বিলাসিতার উপকরণ সকল বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছি। ২৫ বৎসর হইল, জোলা তাঁতির কাপড়ের কারবার মাটী হইয়াছে, ২০ বৎসর হইল, লবণের কারবার মাটী হইয়াছে; ১৫ বৎসর হইল, চিনির কারবার মাটী হইয়াছে। কৃষকেরা খর্জ্জুর বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া এখন পাটের চাষ করে! আমাদের এই বেলগাছীর চিনির কারবার সেদিন মাটী হইয়াছে। কেশবপুর, কোটচাঁদপুর, গোবরডাঙ্গার চিনির কারবার সেদিন মাটী হইয়াছে। আমরা শিখিতেছি, কেবল চাকুরী আর চাকুরী। এখন আমাদিগকে ফিরিতে হইবে। ফিরিতে হইবে বলিয়াই এই স্বদেশী আন্দোলনকে বিধাতা প্রেরণ করিয়াছেন। বিধাতার বিধান স্পষ্টরূপ বুঝিতে চেষ্টা কর। এই স্বদেশী আন্দোলন এদেশ-বাসীকে পর-প্রত্যাশীর আকর্ষণ ভুলাইয়া "নিজস্বে" আবার যদি দীক্ষিত করিতে পারে এবং স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যে যদি অনুরক্ত করিতে পারে, তবে এদেশের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অসংখ্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছি এবং স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমরা অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি; কিন্তু ইহা ভিন্ন আর আমাদের মঙ্গলের পথ নাই। বিভাগ-নীতি আত্মীয়তার বিরোধী;—আমরা চাই আত্মীয়তা, সুতরাং আমরা প্রতিবাদ না করিয়া পারিনা। আমরা দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণের জন্য চাই "স্বদেশী মন্ত্র";—"স্বদেশী" মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই "বয়কট" আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কাণ টানিলেই যেমন মাথা আইসে, "স্বদেশী" টানিলেই তেমনি "বয়কট" উপস্থিত হয়। বিদেশী দ্রব্যাদি চলিলে, স্বদেশী দ্রব্যাদি কখনও চলিতে পারে না। হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এ নীতি অবলম্বন করি নাই;—স্বদেশ রক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই বলিয়া,শেষ উপায় "বয়কট" ধরিয়াছি। ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য, চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ, অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিরোধ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, আমরাও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য "বয়কট", সেইরূপ, গ্রহণ করিয়াছি। পরিবার পরিপোষণ যেমন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, স্বদেশের সংরক্ষণও তেমনি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। এই মন্ত্র সাধনে যে দণ্ড পাইতে হয়, তজ্জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

কিন্তু বড় দুঃখ হয়,আমরা খাঁটী "স্বদেশী" আজও হই নাই,তাহা হইলে স্বদেশের সকল বস্তু এবং লোক আমার নিজস্ব হইয়া যাইত;

যদি তাহা হইত, ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ যদি "স্বদেশী" গ্রহণ করিতে পারিতাম, এই এক ক্ষেত্রে আমরা "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইয়া যাইতে পারিতাম। এতদিন না পারিয়া থাকিলেও, আমাদিগকে ইহারই জন্য কঠোর সাধনা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

মোট কথা, এতদিন পর আমরা বুঝিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে উপকার করেন,তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিব, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য কখনও বিস্মৃত হইব না। নিজের পায়ের উপর নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট দোহনের জন্যই এদেশে আসিয়াছেন, সর্ব্বদা একথা স্মরণ রাখিতে হইবে,এবং উঠিতে বসিতে, শুইতে, "গোলামীর" মায়ায় প্রমুগ্ধ না হইয়া, একটু একটু নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার জন্য খাটিতে শিখিতে হইবে। খাটিতে শিখিতে হইলে প্রণালীগত শিক্ষা চাই। এজন্য জাতীয় শিক্ষাকে সময়ানুসারিণী করিয়া তুলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা "গোলামী-গিরি" শিক্ষার পন্থা বিশেষ ছিল। ইংরাজ যশোকীর্ত্তন, মুসলমানের দোষ কীর্ত্তন, চাকুরীর আকর্ষণ প্রভৃতিই ঐ শিক্ষার মূল ছিল। এখন শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রভৃতিতে যাহাতে সকলের মনাকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আমাদের ভাবী বংশীয়েরা যাহাতে গোলামী শিক্ষার পথে অগ্রসর না হইয়া, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার বৃত্তি শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। অসংখ্য নরনারীকে "স্বদেশী" মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে, তদনুরূপ শিক্ষা ভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা, আসুন, কায়মনোবাক্যে সে জন্য বদ্ধপরিকর হই। আমরা যেন কদাপি না ভুলি যে, ভিক্ষার কোনই ইষ্ট সাধিত হয় না।

আত্মানুশীলন, সকল শিক্ষার সার শিক্ষা। আত্মানুশীলনে যাহাতে আমাদের পুত্র কন্যাগণের রুচি হয়, চরিত্রোন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে, আমাদের জাতীয়শিক্ষাকে তদনুরূপ প্রণালীতে চালিত করিতে হইবে।

আমি জীবনে সার সত্য বুঝিয়াছি—"খাটিতে এসেছি, খাটিয়া মরিব; পরপদ তলে কভু না লুটাব।"—বাল্যকাল হইতে এই প্রতিজ্ঞা ছিল, কেবল খাটিব;—নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, দেশের জন্য। আকর্ষণ কি, মায়া কি, লক্ষ্য কি? আকর্ষণ, মায়া এবং লক্ষ্য—কেবল "প্রেমসাধন"; বুঝিয়াছি, খাটুনি ভিন্ন প্রেমসাধন হয় না। তাই, চিরকাল কেবল খাটিয়া আসিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া, সকল সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল খাটিতে শিখিয়াছি। খাটুনিতে আমার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই—কিছুই নাই। বিশ্বপতি যেরূপ অবিরত খাটিতেছেন, আমরা সেই অনুকরণে দিবানিশি কেবল খাটিব। কার্য্যের অবিরাম স্রোতে পড়িয়া সকল ভাই মহা মিলনে মিলিয়া যাইব; ইহাই প্রাণের বাসনা। কে পর, কে দূরে?—খাটুনির সুমহান রাজ্যে সকলকেই চাই—একজনকে পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না। এস, সকল ভাই, খাটুনির মহারাজ্যে মিলিয়া যাই।

আমি স্থানান্তরে "বয়কটের" কথা বলিয়াছি; যদি বয়কট করিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে ব্রিটিশ-কোর্টকে "বয়কট" করা উচিত। রাজা ও প্রজা সম্বন্ধ, পিতা ও সন্তানের সহিত তুলিত। পিতার নিকট সন্তান দুঃখ

মর্ম্মবেদনার কথা বলিবে, তাহাতে "কর" না দিলে হয় না; ইহা কি সর্ব্বনাশের কথা! গবর্ণমেণ্টের আয়-কর, লবণ-কর, পথকর, ডাককর, চৌকীদারি-কর, তুলার-কর, লাইসেন্স-কর, দ্রব্যাদির শুল্ক, মিউনিসিপাল-কর, কুত, আবকারী-কর, সকল ভুলিতে পারি, কিন্তু ষ্ট্যাম্প-কর কিছুতেই ভুলিতে পারি না। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন;—হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে, ভাই, ভাইকে দূর করিয়া দিতেছে—রাজা পথের ভিখারী হইতেছেন, দরিদ্র জেরবার হইতেছে, মামলা মকর্দ্দমায় দেশ উচ্ছিন্ন যাইতে বসিয়াছে। যদি দেশকে রক্ষা করিতে হয়, তবে অচিরে চতুর্দ্দিকে "সালিসী-মণ্ডপ" প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

এদেশে নূতন একটী উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে;—তাহা অল্প পরিমাণে রক্ত শোষণ করিতেছে না। ভারতের টাকা-লুণ্ঠনের আর এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্জ্জন, ঘরে ঘরে যাহাতে চা-পান বিস্তৃত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইউল কোম্পানি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া, চিনের ন্যায়, এদেশের আপামর সাধারণকে চায়ের মাদকতায় ডুবাইয়া বিভোর করিতেছেন। * চা শীতপ্রধান দেশে উপকারী হইলেও আমাদের দেশের পক্ষে উপকারী নয়। Dr. H. C. Wood বলেন—

"Tea contains about three percent of theine, or more than fourteen grains to the ounce. Every pound of tea contains enough of this poison to kill fifteen hundred frogs or more than forty cats. One case is on record in which a fine horse belonging to an English army officer was killed by eating accidentally a small quantity of tea."

আফিং তীক্ষ্ণ বিষ, কিন্তু ক্রমাগত সেবনে এই বিষেও মানুষ অভ্যস্ত হইয়া যায়। ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে চা-পানেও লোক অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে শরীরের যে অপকার হয়, তাহা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী ন্যানসেন এবং মহাবীর স্যাণ্ডো ইহার অপকারিতার বিশেষরূপ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। শরীর যদি খারাপ নাও হয়, তবু এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইংরাজের লুণ্ঠনের ইহা একটী প্রশস্ত উপায়। অনাবশ্যকীয় চা-পানে বিরত থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রধান ভরসা ভলণ্টিয়ারগণ। আমি যখন গত বৎসর কোটালিপাড়ে ৬ মাস দরিদ্রের সেবার জন্য ছিলাম, তখন এই ভলণ্টিয়রগণের জীবন্ত পরিচর্য্যার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। এমন কোন ক্লেশকর কার্য্য কল্পনা করা যায় না, যাহা তাঁহারা সুসাধিত করেন নাই। এবার কলিকাতার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় ভলণ্টিয়ারগণ যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। নিজের প্রশংসা বিনাশের কারণ, তাহা জানি, কিন্তু একথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হয় যে, এদেশের ভলণ্টিয়ারগণ বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে, এই শক্তিকে

* Lord Curzon's efforts to create a taste for tea-drinking among the natives of India and encourage home manufacture seems likely to prove successful. A tea-distributing agency has been formed, and Messrs. Andrew Yule & co. have undertaken the work of distribution for three years without any payment except out-of-pocket expences. Once a fashion is created, however, the immense population of India would ensure an enormous return.
St. James Gagette.

প্রণাম না করিয়া থাকা যায় না। আমি বঙ্গের ভলণ্টিয়ার-শক্তিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। এই ভলণ্টিয়ার-শক্তিই এদেশের অশেষ অত্যাচার দমন করিবে, কুসংস্কার বিনাশ করিবে এবং চরিত্র ও ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিবে। আমি আশা করি, আমি আজ যে সকল কথা বলিলাম, আমার সমদুঃখী ভলণ্টিয়ারগণের নিকট তাহা কখনও উপেক্ষিত হইবে না। তাঁহারা বিধাতার কৃপায় ফরিদপুরে অসাধ্য সাধন করিবেন। তাঁহারাই আমাদের আশার উজ্জ্বল আলোক। বিধাতা এই শক্তিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আপনাদিগের বহুমূল্য সময়ের আমি অনেকটা অপহরণ করিলাম, তজ্জন্য বিনীত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমার জন্মভূমির সমদুঃখী ভাই বলিয়া কত কত কত ধৃষ্টতা করিলাম, আশা করি, আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন এবং আমাকে আপনাদের ভৃত্য বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনাদের সদ্ভাব ও শুভ ইচ্ছা-সুপ্রাণিত হইয়াই আমি জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি;—আমাকে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। মহাত্মা হারকোর্ট মহাত্মা গ্লাডোষ্টোনের অশীতি-জন্মোৎসব উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—"এই গ্লাডোষ্টোনশক্তি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন ইঁহার অনুসরণ করিব এবং যখন ইনি থাকিবেন না, তখন ইঁহার পদানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইব।" আমারও শেষ কথা এই—আমাদের দেশের অপূর্ব্বগৌরব অম্বিকাচরণের অনুকরণ করিয়া যেন আমরা চলিতে পারি এবং যখন তিনি থাকিবেন না, তখন যেন তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারি। আমরা ভাই ভাই একঠাঁই হইয়া, প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, দেশের সেবাব্রত পালন করিয়া কৃতার্থ হইব। আজ সকল ভাই প্রাণ ভরিয়া বল—বন্দে মাতরম্। অনেক দুঃখ দারিদ্র্য, হিংসা বিদ্বেষ, জ্বালা যন্ত্রণা, অভাব দুর্নীতি আছে, সব আমরা "ভ্রাতৃত্ব" সাধন-বলে পরাজয় করিব;—এবং স্বদেশকে উন্নতির সিংহাসনে সমুত্থিত করিব। জেলা-সমিতি দুর্দ্ধর্ষ জাতীয় নবশক্তিতে জাগরিত হউক, তৎসহ মৃত ফরিদপুর আবার পূর্ব্ব গৌরবে ভূষিত হউক;—ফরিদপুর অপূর্ব্ব জয়শ্রী মস্তকে ধারণ করিয়া ভারতের আদরের বস্তু হউক। জয় মা আনন্দময়ীর জয়, জয় জাতীয় একতার জয়, জয় "স্বরাজের" জয়।

# উপনিষদের আখ্যায়িকা। ৪

## নচিকেতার উপাখ্যান।

নচিকেতা এইরূপে দুই বর প্রাপ্ত হইল। প্রথম বরটী পিতৃস্নেহ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয় বরটী 'নচিকেতা' নামক যজ্ঞকর্ম্মে ব্রহ্মানুভব। এখনও নচিকেতা,—চিন্ময়, সর্ব্বসংসারাতীত, ক্রিয়া ও ফলের বহির্ভূত,—প্রকৃত আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই। 'অগ্নি-বিদ্যা' বা বিশ্বের তাবৎ পদার্থে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি-লাভ,—ইহা সাধনের উচ্চ অঙ্গ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি ইহাতে দ্বৈত-বোধ একেবারে তিরোহিত হয় না এবং এ সাধনায়, গূঢ়-ভাবে, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির

কামনা চিত্তে জাগরূক থাকে। নচিকেতা তাই প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে উদ্‌যোগী হইয়া যমরাজকে বলিতে লাগিল :—"দেব! আপনি ত মৃত্যু-লোকের অধীশ্বর। আপনাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। মনুষ্যের মৃত্যু হইবার পর, তাহার আত্মাও কি সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়, না এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা অন্য কোথাও অবস্থান করে? মনুষ্য-লোকে এ বিষয়ে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও আর স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না; কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা অবিনাশী, মৃত্যুর পরও আত্মা অবস্থিত থাকেন। এ বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসা কিরূপ, তাহা আপনার ন্যায় আর কেহ অবগত নহে। আমি এই বিষয়টী জানিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। দয়া করিয়া, আপনি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন্"। যমরাজ, বালকের মুখে এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু বালক ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত সংস্কৃত-চিত্ত কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, —"নচিকেতা! আপনি যে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়টী অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল। দেবতারাও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে সন্দিগ্ধ ছিলেন। বিষয়টী এত কঠিন যে, এ বিষয়ে বারংবার উপদেশ দিলেও, মনুষ্যেরা বুঝিতে সমর্থ হয় না। অতএব আপনি অন্য বর প্রার্থনা করুন। এ বিষয়ে আমায় অনুরোধ করিবেন না।" যমের কথা শুনিয়া, নচিকেতা বড়ই দুঃখিত হইল। তাহার চিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই নচিকেতা যমরাজকে বলিল—"দেব! মনুষ্যলোকে এই দুরূহ আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনিই ত বলিতেছেন যে, ইহা দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং আমি আপনার মুখেই এই আত্মজ্ঞান শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি প্রসন্ন হউন; আপনার তুল্য উপদেষ্টা আর আমি পাইব না।" যম বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়! আমি আপনাকে মনুষ্য-লোকের দুর্লভ বিবিধ ভোগের অধিকারী করিয়া দিতেছি। শতবর্ষ পরিমিত কাল দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন, প্রভূত সাম্রাজ্যের অধিপতিত্ব, আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি। আপনি এই গুলি লাভ করিয়া, পুত্রপৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া চিরকাল অতি সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন,—আমি আপনাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। আপনি এ গুলি লইয়া মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া যাউন্। আত্মবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না। মহাশয়! ঐ দেখুন; অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতী রমণীরা আপনার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। আপনি ইচ্ছা করিলেই, ইহারা আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। ঐ দেখুন, বিবিধ গীতবাদিত্র প্রস্তুত রহিয়াছে, ঐ দেখুন মধুরনাদী, ক্ষিপ্রগামী রথ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। এবম্বিধ ভোগ্য পদার্থ মনুষ্য-লোকে পাইবেন না। এই গুলিকে আমি আপনার ভোগার্থে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। আপনি এই গুলি লইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে স্বস্থানে ফিরিয়া যাউন।"

অক্ষুব্ধ মহাহ্রদের ন্যায়, নচিকেতা এই সকল প্রলোভনের পদার্থে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি যমকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—"যমরাজ! আপনি যখন্ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমার আর

অভাব কিসের? দীর্ঘজীবন-লাভ সম্বন্ধেই বা গ্রহাতিশয্যের আবশ্যক কি? আপনি যে জীবের যতদিন পর্য্যন্ত আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সে জীব ততদিন পর্য্যন্তই বাঁচিয়া থাকিবে। আর আপনি ভোগের কথা বলিতেছেন; কিন্তু দেব! বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-শক্তি, দিনের পর দিন, ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে; ইন্দ্রিয়সুখকর পদার্থনিবহ কতদিন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয়? শীঘ্রই ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ও জরা আসিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে! আর দেখুন, বিত্ত-লোভের কি অন্ত আছে? মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করা বড়ই কঠিন! সহস্র ভোগকর সামগ্রী প্রদান করুন না কেন, কামনার উপশম হইবে না! এক প্রকারের বাসনা তৃপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ চিত্তে অন্য প্রকারের সহস্র বাসনা উদিত হইয়া উঠিবে!! আর যদি সমুদয় বাসনা পরিপূর্ণ করা সম্ভবই হয়;—তবে তাহাই বা কতদিন? একশত বৎসরের অধিক কাল ত মনুষ্য বাঁচিবে না! অতএব দেব! আপনি দয়া করুন্। আমি ইন্দ্রিয়-ভোগকর কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি বিষয়-বর্গের নশ্বরতা প্রভৃতি বিবিধ দোষের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। যাহা চির-নিত্য ও সত্য; যাহা পাইলে সমুদয় কামনা পূর্ণ হইয়া যায়;—আপনি সেই নিত্য, সত্য আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন্। ইহাই আমার তৃতীয় বর। যদি দয়াবশে প্রসন্নই হইয়াছেন, তবে আমাকে এই বরটী প্রদান করুন্।” নচিকেতা এই বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে, কর-যোড়ে, যমরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যম, নচিকেতার বৈরাগ্য-সূচক বাক্য ও আকার প্রকার দেখিয়া, আহ্লাদে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন! ভাবিলেন,—‘অহো! মনুষ্য-লোকেও ব্রহ্মবিদ্যার জন্য এমন অকপট ব্যাকুলতা আছে!’ যম অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নচিকেতাকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া উপবেশন করাইলেন। নচিকেতার যোগ্যতা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে অতি গূঢ় ও গম্ভীর উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

যম বলিলেন,—“নচিকেতা! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। মনুষ্য সর্ব্বদাই দুইটী বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। একটীর নাম শ্রেয় এবং অপরটীর নাম প্রেয়। এই শ্রেয় এবং প্রেয়,—এই উভয়ের ফলও ভিন্ন প্রকার। যে ব্যক্তি প্রেয়কেই হিতকারী বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার একরূপ ফল-লাভ হয়। কিন্তু যিনি শ্রেয়কেই হিতকরবোধে আলিঙ্গন করেন, তাঁহার অন্য প্রকারের ফল-লাভ হইয়া থাকে। একই সময়ে, এক ব্যক্তি এই দুইটীকেই যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে না; কেন না, এ উভয়ই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। প্রেয়কে অবিদ্যা এবং শ্রেয়কে বিদ্যা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যিনি বিদ্যাকে অবলম্বন করেন, তাঁহারই প্রকৃত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; তাঁহারই প্রকৃত কল্যাণ হয়। আর যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহারা কল্যাণ-লাভে বঞ্চিত হয় এবং তাহারা পুরুষার্থ হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই একত্রে মনুষ্যের নিকটে উপস্থিত হয় সত্য; কিন্তু হংস যেমন দুগ্ধ-মিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধটুকু তুলিয়া লইয়া, জল পরিত্যাগ করে;—বিবেকবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যও, তদ্রূপ, শুক্ল-লঘু

বিচার করিয়া,—উভয়ের ফলের তারতম্য বুঝিয়া,—আত্মকল্যাণার্থ বিদ্যাকেই গ্রহণ করে। অল্পবুদ্ধি এবং বিবেকভ্রষ্ট ব্যক্তিই, ঐশ্বর্য্যসাধক, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, আপাত-রমণীয় অবিদ্যার বশীভূত হইয়া পড়ে।

মহাশয়! আপনাকে আজ আমি যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আপনি যে আত্ম-কল্যাণার্থী, তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলাম। আমি আপনাকে নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম; কিন্তু আপনি তদ্দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন না। আপনি অবিদ্যাকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যালাভের জন্যই নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন,—দেখিলাম। অধিকাংশ মনুষ্যই আপনার হিত বুঝিতে পারে না; উহারা আপাত-রমণীয় অবিদ্যার মধ্যেই গাঢ়তর রূপে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে! আলোক এবং অন্ধকার যেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী; বিদ্যা ও অবিদ্যাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। অবিদ্যা জীবকে সংসার-পাশে বদ্ধ করে; কিন্তু বিদ্যার অনুগ্রহে জীব, সংসারের নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনাকে এই অবিদ্যা বশীভূত করিতে পারিল না দেখিয়া, আমি আপনার উপরে অতীব প্রীত হইয়াছি। আপনি ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রকৃতই যোগ্য অধিকারী।"

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# মেঘদূত।*

যে অবস্থায় অন্য রোগী রুগ্নশয্যায় হতাশপ্রাণে উদাসমনে অলসভাবে কালাতিপাত করে, সাহিত্যবিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়, সেই অবস্থায়, সিমলাশৈলে অবস্থানকালে, মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত' ইংরাজী কাব্যে, অমিত্রাক্ষার ছন্দে, অনুবাদিত করিয়াছেন। (১) তাঁহার সাহিত্যানুরাগ, বাস্তবিক এতই প্রবল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সিমলাশৈলে আর একবার ঐরূপ রুগ্নাবস্থায়, তিনি কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীরের সমুদয় নাটকগুলি আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। আলোচ্য অনুবাদ উপলক্ষে অবশ্য তাঁহার এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল;—তিনি মুক্ত বাতায়ন-পথে, রবিকর-সম্পাতে সুবর্ণরাগরঞ্জিত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল তুষার-মণ্ডিত, হিমাচলের অভ্রংভেদী শৃঙ্গমালা নগ্ন নেত্রের সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন,—মেঘদূত-বর্ণিত স্থান সকলের সম্পূর্ণ সম্মুখীন না হইলেও, কালিদাসের অমর তুলিকাচিত্রিত গিরি-নদী-উপবন, তরু-গুল্ম-লতা প্রভৃতির আলেখ্যের সঙ্গে চিত্তবিনোদন প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকাংশে মিলাইয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এ সুযোগে,

(১) হাজারিবাগে আসিয়া টীকা টিপ্পনী সংযোগে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করিলেও, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত আছি, সুরেশ বাবু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কার্য্য সিমলাতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

* The Cloud-messenger, or the Exile's message, being a translation into English verse of Kalidasa's "*Meghadutam*" with introduction and notes by S.C. Sarker, M. A., of the Bengal Provincial civil service, published by the City Book Society, Calcutta, 1906.

এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুবাদ কল্পে তিনি মধুমাখা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া কেন ইংরাজি কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে না পারাই কেবল আমাদিগের অসুখের কারণ হইয়াছে। এ অনুবাদে তিনি অবশ্য ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন; অন্যতম সুপণ্ডিত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—

"So remarkable is the mastery over a foreign tongue which he displays that one feels tempted to ask the Anglo-Indian manufacturer of 'Babu English' to try his hand at verse-making in his own mother-tongue and get an impartial critic to judge whether his production can be compared with the work of this Bengali Babu.' (২)

কিন্তু এ পরিচয়ে সরকার মহাশয়ের স্বদেশীয় সাহিত্যের কি লাভ, আমরা ভাবিয়া পাই না। আর অনুবাদ কালে তিনি তাঁহার অবকাশরঞ্জিনী কবিতার অমোঘ বাণী অবশ্যই বিস্মৃত হয়েন নাই—

"Let all the Ends thou aimi'st at
Be thy country's—"

অনুবাদের পূর্ব্বাভাষে ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে যে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পাঠার্থীর উপকারে আসিতে পারে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন যে, অনুবাদ এরূপ মূলানুযায়ী হইয়াছে যে, উহা ছাত্রগণের পক্ষে অর্থপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। (২) কিন্তু ছাত্রগণ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ যে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয়-প্রবর্ত্তিত মেঘদূতের সংস্করণ অপেক্ষা সরকার মহাশয়ের সংস্করণে অধিক উপকৃত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের ভূমিকা সরকার মহাশয়ের অবতরণিকা অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে,—কবিতাগ্রথিত না হইলেও, তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদও যথেষ্ট প্রাঞ্জল ও মূলানুসারী; পরন্তু একাধারে মূল, অন্বয়, সঞ্জীবনী, ধাতুবিবেক, বাচ্যান্তর-বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ পাঠার্থীর পক্ষে পরম উপাদেয় হইয়াছে। এ অবস্থায় ইংরাজি কবিতায় গ্রথিত হইলে মেঘদূতের কি অবস্থা দাঁড়ায়—মাত্র এই অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তি ভিন্ন এই কাব্যানুবাদে পাঠার্থীর বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না।

কিন্তু কেবল শিক্ষানবিশের উপকার-সাধন করাই সরকার মহাশয়ের অনুবাদের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সহিত কোন না কোন সূত্রে জড়িত পাশ্চাত্য পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত কাব্যের ও ভারতীয় ভাবের বোধসৌকর্য্য-সাধনও তৎকৃত অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বহুকাল পূর্ব্বে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—স্বনামখ্যাত পণ্ডিত Horace Hayman Wilson সাহেব সে উদ্দেশ্যও সাধন করিয়া গিয়াছেন। (৩) তবে, সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে, উইল-

(২) The modern Review, Vol, II, No 4.—ইংরাজি পুস্তকের আলোচনা ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য লিখিত বলিয়া উদ্ধৃত অংশ সকলের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

(৩) উইলসন কৃত অনুবাদই মেঘদূতের একমাত্র ইংরাজি অনুবাদ নহে। অধ্যাপক গোস্বামী মহাশয় তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় ইংলণ্ডীয় অধ্যাপক জনসন্ কৃত উহার অন্যতর ইংরাজি অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, অস্মদ্দেশে উইলসন কৃত অনুবাদেরই খ্যাতি অধিক।

সনের অনুবাদ—liberal, আর সরকার মহাশয়ের অনুবাদ—literal। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাশ্চাত্য পাঠকের অন্তরে সংস্কৃত কাব্যের ও ভারতীয় ভাবের রস-সঞ্চার-কল্পে, liberal বা literal, কোন্ অনুবাদের উপযোগিতা অধিক? ইহার উত্তর আমরা, অন্য এক গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে অপর একজন পণ্ডিতের মুখে এই-রূপ শুনিতে পাই :—

"The only answer that one can make to such criticism is that no great poet can ever be translated from one language into another literally and word by word—such a close and servile rendering would fail to convey to the reader the sense and sentiment of the original, much less can it ever impart to him the spirit and depth of the author. The purely elementary learner, whose one anxiety is to master the idiom and the linguistic twists and turns of the original language, may find such a translation of rare service to him—nay it may in a sense be indispensable to him. But to the student of thoughts and ideas such a translation would be no translation at all; it will be a mere transliteration." (১)

সরকার মহাশয় নিশ্চয়ই উল্লিখিত মন্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার করিবেন না—আর তিনি যখন "Indian thought" পাশ্চাত্য পাঠকের সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবারই প্রয়াসী, তখন তাঁহাকে উক্ত মন্তব্য-লেখকের সহিত অবশ্য একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে পক্ষে উইলসন "has had no equal in the past, and one may safely venture to say that he will have none in the future."

Literal ও liberal এর তুলনায় সমালোচনা করিলে কাব্যাংশে অনেক স্থলে শেষোক্তেরই অধিকতর মনোজ্ঞতা অনুভব করা যায়। Literalএ যে স্থলে আমরা দেখিতে পাই—

"* * * the female heart
Like flow'rs is delicate: its Hope
that keeps,
That life from drooping,—as the
stem the flow'r,
When sep'ration comes to the
lovesome heart."

liberalএ সেই ভাব নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে—

"For female hearts, though fragile
as the flower,
Are firm, when closed by hope's
investing power."

সম্পূর্ণ মূলানুযায়ী না হইলেও, ভাবব্যক্তি পক্ষে এই দুই পংক্তি কমপ্রস্ফুট নহে, পরন্তু উহা প্রথমোক্তাপেক্ষা অধিকতর 'কবিতা-রসমাধুর্য্য'-ব্যঞ্জক বোধ হয়। পূর্ব্বমেঘের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদে—

"For who a prey to agonizing grief,
Explores not idlest sources for
relief?
And as to creatures sensible of pain,
To lifeless nature, loves not to
complain?—

উইলসন অতিরিক্ত মাত্রায় liberal হইয়াছেন সত্য, তথাপি পাশ্চাত্য পাঠকের অন্তরে ভাবানুপ্রবেশ কল্পে উহার উপযোগিতা ও উপাদেয়তা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে, অনুবাদে মূলের ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতি সাধন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া, সরকার মহাশয়কেও স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ liberal হইতে হইয়াছে; যথা—"বপ্রক্রীড়াপরিণত" স্থলে "Sporting with muddy tasks" অনুবাদ করিয়াই

(১) Preface to sublime Pessimism of Omar Khayam by B. B. Nagarkar.

তিনি সন্তোষলাভ করিয়াছেন। (৫) কোথাও বা পংক্তি মাত্রের অনুবাদে তিন পংক্তি কবিতা লিখিয়াও তিনি মূলানুসরণে সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েন নাই; যথা—মূলের

"বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা"

অনুবাদে—

"Where temples stand in gardens outside town,
And whence, the moon from Siva's forehead beams,
And buildings high in light divine does bathe."—

রূপে পরিণত হইয়াছে। (৬)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ পাশ্চাত্য পাঠকের পক্ষে literal অপেক্ষা liberalএরই উপযোগিতা অধিক এবং বোধ করি, তাঁহাদিগের নিকটে এখনও সরকার মহাশয়ের অনুবাদ অপেক্ষা উইলসনের অনুবাদেরই অধিকতর গৌরব রহিবে। উইলসন অপেক্ষা এক হিসাবে সরকার মহাশয় সহজ ও প্রকৃষ্টতর পথ অবলম্বন করিয়াছেন;—পয়ারচ্ছন্দে উইলসন মিত্রাক্ষরের নিগড়ে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সে জন্য ও অনুবাদ-কল্পে তাঁহাকে অনেকটা liberal হইতে হইয়াছিল; সরকার মহাশয় সে পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন—তিনি অমিত্রাক্ষরের উন্মুক্ত পথে চারি পংক্তি হইতে নয় পংক্তি পর্য্যন্ত স্থানে বিচরণ করিয়া অনুবাদ যথেষ্ট পরিমাণে literal করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে ছন্দের অনুবন্ধে প্রায় প্রত্যেক শ্লোক হইতে, কোথাও বা একমাত্র ছত্র হইতে, একাধিক অক্ষরের বিলোপ সাধন করিতে হইয়াছে;—উইলসনকে সেরূপ অধিক উৎপাতগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

সুরুচির সম্মানরক্ষার্থ সরকার মহাশয় অনেক শ্লোকের ও শ্লোকাংশের অনুবাদ একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক অপেক্ষা শিক্ষানবিশের খাতিরেই, বোধ হয়, তাঁহাকে এতদূর সতর্ক হইতে হইয়াছে। অধ্যাপক গোস্বামী মহাশয় কিন্তু, অধ্যাপনার হিসাবেও, তদীয় গ্রন্থে অবাধে সকল শ্লোকের ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদানে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আধুনিক রুচির বাজারে 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদ কার্য্য নিতান্তই সঙ্কোচসঙ্কুল;—দয়িতাবিরহবিধুর প্রণয়ীর বিরহগাথা যাহার বিষয়, আদিরসের প্রস্রবণ যাহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত, তাহার কোন্ কবিতা ছাড়িয়া কোন্ কবিতার অনুবাদ শ্লীলতা-সম্মত হইবে, নির্ণয় করা অনুবাদকের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তাই, বিশেষ সতর্ক হয়াও, সরকার মহাশয়

(৫) মল্লিনাথের মতে উহার অর্থ—"পর্ব্বতগাত্রে তির্য্যগ্‌ভাবে দন্তপ্রহারোদ্যত।"

(৬) মূলে 'temples' নাই; মূলের শিব 'বাহ্যোদ্যানস্থিত'—অনুবাদে তাহা প্রস্ফুট হয় নাই; মূলানুসারে 'the moon beams and does bathe' নহে—the moon-beams bathe। ফলতঃ, সরকার মহাশয়ের ভাষায়,—

"Where buildings high in hight divine are bath'd
By the beams of moon from forehead of Siv,
Residing in the gardens outside town.—

এইরূপ অনুবাদ, বোধ হয়, অধিকতর মূলানুযায়ী হইত।

(১) "The joys of sensuous life.

(২) "* * * Love's language is,
With girls, not words but charming gestures soft."

(৩) "The dancing-girls, with waist chains tinkling soft."
At rhythmic move of feet;—

(৪) "As earth's fair breast,—at centre dark
And pale along the widening slopes around."
(৫) "————when thou
* * * makest their wives, * * *, grant embraces to their lords !"
(৬) "* * * Ah ! should thou miss
The glances brisk from lighting starked eyes
Of Ujjain's fair, thou wouldst have lived in vain !

প্রভৃতি ভাবের আলেখ্য তাঁহার সুকুমার মিত্র, বি-এ পাঠার্থী, শিষ্যগণের সমক্ষে ধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মাতৃভাষা বর্জ্জন করিয়া পরকীয় ভাষার আশ্রয় লওয়ার জন্যই 'সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগের এই বিরোধ। নচেৎ কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার এই অভিনব আয়োজন সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়. পরন্তু পরের ভাষা আপন করিয়া অনুবাদে লিপিকুশলতা একান্তই অনবদ্য। সরকার মহাশয় সুকবি, —অতঃপর তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে মা-মাখা মাতৃভাষার মধুরতা আস্বাদন করিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

# ভারতের বহির্রাষ্ট্রনীতি। ৩

পশ্চিম এসিয়ার শক্তি বহু পরিমাণে উপচিতযৌবন পারস্যভূমির হস্তে আরোপিত না থাকিয়া পারে না। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশ প্রায়—সপ্তশত মাইল সমুদ্রবেষ্টিত। যুদ্ধোপযোগী এবং নৌ-রক্ষার জন্য উপযুক্ত বন্দরেরও অভাব নাই, অন্ততঃ তাহা নির্ম্মাণে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যেও পারস্যভূমি সৌভাগ্যবান্, এইজন্য এই প্রদেশের উন্নতি ও অবনতি আমাদিগকে তীক্ষ্ণ নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন তাহা Romanes Lecture এ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা উল্লেখ করিলে ইংরাজের ধূর্ত্ততা এবং আমাদের চৈতন্যও কিঞ্চিৎ প্রস্ফুট হয়। লর্ড কার্জ্জন বলেন :—

"It has been by a policy of protectorates that the Indian Empire has for more than a century pursued and is still pursuing its as yet unexhausted advance. First it surrounded its acquisition with a *bolt of native States* with whom alliances were concluded and treaties made. The enemy to be feared a century ago was the Maratta host and against this danger, the Rajput States and Oudh were maintained as a buffer. On the north west frontier, Sind and the Punjab then under independent rulers, warded off contact or collision with Baluchistan and Afghanistan, while the Sutlej States warded off contact with the Punjab. Gradually one after another these barriers disappeared as the forward movement began; some were annexed others were engulfed in the advancing tide...when the annexation of the Punjab had brought the British Power to the Indes and of Sind to the confines of Beluchistan; when the sale of Kashmir to a protected chief carried the strategical frontier into the heart of the Himalayas; when

the successive absorption of different portions of Burma opened the way to Mandalay, a new frontier problem faced the Indian Government and a new ring of protectorates formed ···Further to the east and north, the chain of protectorates is continued in Nepal, Sikkim and Bhutan; on the extreme north-east the annexation of upper Burma has brought to us the heritage of a fringe of protected states known as the upper Shan States."

ইংরাজের বিপক্ষগণকে যে এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

রুষিয়া ও আমাদের সম্পর্ক বিচারে জল্পনা কল্পনা কম হয় নাই। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। পুরাতন তন্ত্রীগণ ইংরাজের কর্ণ বধির করিয়া বলিয়া আসিতেছে যে, ইংরাজের সহিত রুষ-সংঘর্ষে তাহারা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিবে। ইহার মূল্য যে কতটুকু, তাহা ক্রন্দন-পন্থীরা না বুঝিলেও ইংরাজ বুঝিয়াছিল। রুষিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন ভারতীয় ছাত্রের প্রতি ইংরাজের ব্যবহার তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। চীন ও জাপানের অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়া সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি রুষিয়াকে আবার ভিন্ন নেত্রে দেখিতে হইবে! বিধাতা যেন এসিয়ার পুঞ্জীভূত শক্তিস্তূপকে শাণিত কৃপাণে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া উপাখ্যান-কথিত সুয়োরাণী এবং দুয়োরাণীর স্থলাভিষিক্ত রুষ ও জাপানকে সমভাবে বিভক্ত চক্র ন্যায় দান করিয়াছেন। এই দ্বিধাবিভক্ত শক্তি পরস্পরের বিভীষিকায় সংযত ও শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষেরই লাভ, কারণ উভয়ের দৃষ্টি সমান ভাবেই ভারতের উপর পড়িয়াছে।

সম্প্রতি রুষিয়ার দৃষ্টি ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে সংহৃত হইয়াছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস জাগ্রত হইয়া গিয়াছে। রুষিয়ার দৃষ্টি পারস্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, রুষিয়া সমুদ্র তীর চাহে, এই ধ্বনি উঠিয়াছে। পূর্ব্ব এসিয়ায় ভগ্ন-চেষ্ট রুষিয়ার পক্ষে তাহা অসম্ভব নহে। পারস্যের সহিত সৌহার্দ্দের ভিত্তিপত্তন বহু পূর্ব্ব হইতে সূচিত হইয়াছে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য-গভর্ণমেণ্ট যখন ইংলণ্ড হইতে foreign loan প্রার্থনা করে, তখন বিফল-মনোরথ হইয়াছিল।

"Some time before this the Shah had asked Sir Mortimer Durand to assist and the Persian Governmet now applying to London, expected that the required money would be obtained quickly on easy terms and thus enable the Shah to proceed on his journey to Europe. London capitalits offered to float a loan for £1250,000 at 5 p. c. and on the guarantee of the customs of Tar's and the Persian Gulf Ports and to give £1,025,000 or 82 percent of the nominal capital to the Persian Government, They stipulated for a kind of control over the custom houses by placing their own agents as cashiers in them."

কি সাহসিকতা! বলা আবশ্যক, এই ঋণ গ্রহণ অসম্ভব হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ম্মত্যাগ করিলেন। বলা প্রয়োজন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিনা আয়াসে রুষিয়া হইতে loan গৃহীত হয়। তাহাতে অপমানজনক কোন সর্ত্তও ছিল না।

এই ঘটনার পর লর্ড কর্জ্জনের নির্লজ্জ মিলন এবং উহার বিফলতা, কাহারও বিস্ময় উৎপন্ন করা ঠিক নহে।

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পারস্য ও রুষের মৈত্রী অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পূর্ব্ব এসিয়ায় রুষের পরাজয়ে পারস্যের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইবার সম্ভাবনা। যত দূর বোঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান সম্রাট অত্যন্ত চতুর। তাহার হস্তে বিশেষ আশঙ্কার কথা নাই।

ভারতবর্ষের পক্ষে, পারস্যভূমি প্রণষ্ট-গৌরব না হওয়াই ভাল। প্রথমতঃ, পারস্য-ভূমি কিছু পরিমাণ আয়ত্ত হইলে,রুষ ভারতের বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিবেনা। দ্বিতীয়তঃ, জাপান, পারস্য, চীন প্রভৃতি এসিয়ার রাষ্ট্র-শক্তি যত স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি লাভ করে, ততই আমাদের পক্ষে সুবিধা। তৃতীয়তঃ, পশ্চিম এসিয়ায় পারস্যের প্রাধান্য না থাকিলে, এসিয়াতে Balance of Power ঠিক থাকিবে না, কারণ এ পর্য্যন্ত আফগান-ভূমি কোন বন্দর লাভ করিতে পারে নাই, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা লাভ করিতে পারিবে না,সেই পর্য্যন্ত আফগান-ভূমিকে প্রথম শ্রেণীর (First class power) রাজ্য বলা যাইতে পারেনা।

তিব্বতের আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজও বুঝিয়াছেন, তিব্বতকে জগতের মাঝে একাকীত্বের উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ভাল। উহাদের "প্রার্থনা-চক্র" (prayer-wheel) লইয়া দোকান করা চলেনা—তাহা নির্জ্জন স্রোত-তরঙ্গের তির্য্যক গতির আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হও-য়াই ভাল। পুস্তক বা কৌতুককর শিল্প দ্রব্যাদি ইউরোপীয় ড্রয়িং রুমের উপযোগী হইয়াছে বটে, তবে এত টাকা খরচ করিয়া এত কম সুদ পাওয়ায় বণিক্ জাতি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য, কর্জ্জন সাহেবও ডফারিনের ন্যায় Lord Curzon of Lhas-sa হইতে পারেন নাই।

তবে একথা বলা প্রয়োজন, জাপান, জানিনা, কেন তিব্বতের উপর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে! অবশ্য তিব্বত, নেপাল ও ভুটান প্রভৃতির আনুকূল্যে উত্তর ভারতের একটা বাহিনী যে সংঘঠিত হইতে পারেনা, তাহা নহে, তবে তাহা আত্মরক্ষা বা হৃত-রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সম্ভব—সেই বাহিনী সমতল ভূমিতে কার্য্যকরী হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে বহু সংখ্যক জাপানী, তিব্বতীয় ও নেপালীয় ভাষা শিক্ষা করি-তেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত জাপানী পরিব্রাজক নেপাল হইতে বহু শত হস্ত লিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছে।

তিব্বতের মাঝে বন্য হংসের পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিলেও, তিব্বতকে ইংরাজ হাতে রাখিতে চাহে; Protected States এর ন্যায়, অথচ কম খরচে বা বিনা খরচে।

কিছুকাল পূর্ব্বে, দ্বিতীয় প্রধান লামার কলিকাতায় আগমনে ইংরাজ তাঁহাকে তুষ্ট করিতে কত কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা অনে-কেরই মনে আছে।

সম্প্রতি তিব্বতকে ইংরাজ যতটা মূল্য-বান মনে করেনা, চীন বা জাপান তদপেক্ষা অনেক বেশী মনে করে—কারণ উভয়েরই ভারতের দিকে নজর আছে। সম্প্রতি চীনের নজর না থাকার কারণ চীন চিনকে লইয়াই ব্যস্ত--জাপানের নজর একটু বেশী পরি-মাণেই আছে।

নানা কারণে নেপাল রাজ্য সাধারণের নিকট কুতূহলজনক। সমর-প্রিয় গুর্খাগণ এখানকার অধিবাসী বলিয়া, নেপালী বা

গুর্খা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া ভাল।

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী না হইলে বর্ত্তমান সময়ে কোন স্থানই যুদ্ধ বিগ্রহের কালে খ্যাতিলাভ করিতে পারেনা, ইহাই নেপালের অসুবিধা। অন্যান্য নেপালের ইতিহাস ও অবস্থিতি একান্ত অনুধাবন-যোগ্য। নেপালের দক্ষিণে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, চম্পারণ প্রভৃতি স্থান রহিয়াছে। নেপালে যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম।

Dr Daniel Wright বলেন :—

"There is only one means of access used by Europeans and this indeed is in general resorted to by the natives as the other routes to the capital are longer and far more difficult. The road runs nearly north from Segowli passing through the terai and sal forests to Bichiakori; then through the beds of mountain streams through a pass in the Chiriyagati and through another sal forest to Hetowra; thence by a wide and good road to Bhimphedi at the fort of the Sisaghuri range of hills."

নেপালের সর্ব্বস্থানে ইউরোপীয়গণ যাইতে পারেনা।

গত সিপাহী বিদ্রোহের সময় নেপালে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজের সহায়তা করায় এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ কমিয়া আইসে। ২৬শে জুন (১৮৫৭ খ্রীঃ) নেপাল হইতে চারি সহস্র সৈনিক ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্থান করে। জঙ্গ বাহাদুর স্বয়ং ১০ই ডিসেম্বর, ৮০০০ পদাতিক, ৫০০ গোলন্দাজ এবং ২৪টী কামান সহ ইংরাজের সাহায্যার্থ যায়। পাকা পুতুল-খেলোয়ার ইংরাজ এই কার্য্যের জন্য জঙ্গ বাহাদুরের পুচ্ছে G. C. B. এবং G. C. S. I. এই কয়টী ইংরাজী অক্ষর যোগ করিয়া দেয়।

নেপালে অনেক বাঙ্গালী বাস করিয়াছে। তবে তাহা নবজাগ্রত নব্যতন্ত্রীর চক্ষে বর্ত্তমান সময়ে না দেখিলে দেশ-পর্য্যটন ব্যর্থ হইবে। শৈল-সমাকীর্ণ জনপদের লোক সাধারণত সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, তেজস্বী, নেপাল তাহার প্রমাণ। এই নেপালে আমাদের অব্যাহত প্রতাপ থাকা চাহি। বর্ত্তমান নব্যতন্ত্রীদের দলে দলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া সাধারণের ভক্তি এবং আস্থা সংগ্রহ করিতে হইবে।

পূর্ব্ব ভারতে নেপালের ন্যায় আর একটী রাজ্য আছে। মণিপুরের বীরত্ব ভারত-মাতার গলিত কীরিটে শেষ মণি স্থাপন করিয়াছিল। সম্প্রতি এই রাজ্যের অধীশ্বর বৃত্তিভোগ করিয়া তুচ্ছ জীবন যাপন করিতেছে! টীকেন্দ্রজিতের নাম শুনিলে এখনও ভারতবাসীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কি লজ্জার বিষয়, মণিপুর, মাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ বীর-শিশুর ন্যায় আত্মরক্ষার্থ ক্ষুদ্র হস্তে বাধ্য হইয়া যখন অস্ত্রধারণ করে, তখন প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায়, ভারতের যাবতীয় বীর-জাতি নিশ্চল ছিল! একটী হস্তও তাহার সাহায্যার্থ উঠে নাই!!

মণিপুরীগণ অশ্বারোহণে সুনিপুণ, এই খ্যাতি রহিয়াছে। মণিপুরের আয়তন ৮০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে চিফ্ কমিশনার কুইনটন সাহেব এই যুদ্ধ-প্রিয় জাতির বিরুদ্ধে নেপালের চারি শত গুর্খা লইয়া যাত্রা করে। হায়, এইরূপে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতি চালনা করিয়া ইংরাজ দেশের ঘনবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। সেই হইতে একটী

গুর্খা-পল্টন চিরস্থায়ীভাবে মণিপুরে রহিয়াছে।

মণিপুর হইতে চীন সাম্রাজ্য বিশেষ দুরে নহে, ১৫০ মাইল অপেক্ষা বেশী হইবে না। চীনের পক্ষে এ সীমান্তে সেনাসমাবেশ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। ইয়াং-জি-কিয়াং নদী 'ভামো' পর্য্যন্ত স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র চীন সাম্রাজ্যকে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। "ভামো" হইতে ইরাবতী, মিকং এবং সলুইন নদী বক্ষে পূর্ব্ব ভারতে সৈন্য পুঞ্জীকৃত করা চীনের পক্ষে ছেলে-খেলার ন্যায় সহজ ব্যাপার হইবে।

এই প্রবন্ধের সূচনায় আমি বলিয়াছি, ভারত এবং চীনের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য সমূহ দক্ষিণ এসিয়াতে বিপ্লবে অসাধারণ স্থান গ্রহণ করিবে। পশ্চিমে আবগানিস্থান, পশ্চিম পঞ্জাব এবং করাচী বন্দর লইয়া যেমন একটা বৈপ্লবী ভূমি সৃষ্টি হইবে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা, আসাম এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে লইয়া ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে একটা অস্থির, চপল অস্ত্রশস্ত্রপুঞ্জের আড্ডা হওয়া বিচিত্র নহে। তাহার কারণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজাগণ এবং মণিপুর রাজাধিপতি, Shan statesএর কর্ণধারগণকে এই হট্টগোলে পড়িতে হইবে। উদিকে চীনের সহিত দ্বন্দ্ব বা সামঞ্জস্য স্থাপনও এই স্থানে হইবে। বিধাতা, বোধ হয়, এই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে অত্যাচার-সহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছেন।

এসিয়াস্থ ব্রিটীশ অধিকৃত রাজ্যে ব্রহ্মরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। ইংরাজের সৈন্য সমাবেশও অপ্রতুল, কমিশারিয়টও (commissariat) অন্তঃসারশূন্য—চীন কিম্বা জাপানের পক্ষে সহজে এবং সহসা এই স্থান অধিকার করা দুঃসাধ্য হইবে না। যতদূর বোঝা যাইতেছে, ফরাসী দক্ষিণ এসিয়ার বিপ্লবে, নিশ্চল নির্ব্বিকার ভাবে neutral থাকিবে, হয়ত গোপনে ইংরাজের আনুকূল্যও করিতে পারে। কিন্তু বিধাতা সেই পথেও কণ্টক রাখিয়াছেন।

ভারতের বহির্রাষ্ট্রনীতি আলোচনার সূচনামাত্র এই প্রবন্ধে করা গেল। এতৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে এবং অনেক কাজ করিবারও বাকী রহিয়াছে। নবজাগ্রত বাঙ্গালা দেশের সম্মুখে সাহিত্যে অনালোচিত এই অধ্যায় উন্মুক্ত করা গেল মাত্র।

মুক্তির আলোক-রেখা যখন দেখা যায়, তখন বন্ধনের কঠোরতাও শ্লথ হইয়া আইসে, তীক্ষ্ণ স্মৃতি অঙ্কুরিয়া উঠে, অবহেলার আলস্য দূরে যায়, তারপর যাহা দেখা যায়, তাহা অপূর্ব্ব, বিচিত্র, বিস্ময়জনক! এই দৃশ্য দেখিবার সময় আসিয়াছে। মুক্ত ভারতের বলিবার সময় আসিতেছে:—

"আজ, নয়ন মেলিয়া একি হেরিলাম!
বাধা নাই কোন বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই!
ওগো, যে আঁধার ছিল নয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই
আমি বাঁধা নাই!"

এই মুক্তি জয়যুক্ত হউক।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

## বৎসরান্তে।

হে চৈত্র! বর্ষের শেষ!—বাসন্তী উষায়
নব নিদাঘের কান্তি ঝলে কি উজ্জ্বল!
হে বর্ষ! লভিছ আজ কি মহা বিদায়
অনন্ত সৌন্দর্য্যে ভরি শূন্য জল স্থল!
রক্তিম-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত অধরে,
হাস কি অন্তিম হাসি এ মুখ চাহিয়া!
মদির মঞ্জরী গন্ধে মন প্রাণ হরে,
মুছ কি ধরার স্মৃতি অতীতে ঢলিয়া?
ডুবে কি সৌন্দর্য্য-নীরে জীবনের দুঃখ?
নানা রঙে স্মৃতি-চিত্র ঢাকে কি প্রকৃতি?
ফুটে কি কোরক পুনঃ লয়ে নব সুখ,
শোভা কি জাগায় চির উন্মনের গীতি!
এ বিশ্বে সঞ্চারি কোন্ শক্তি সুমহান্,
হে বর্ষ! বিস্মৃতি গর্ভে লভিছ নির্ব্বাণ!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

---

## ভারত শাসনে ব্রিটিশ রাজ-শক্তির স্থান।

উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে যে, দেবাসুরের সংগ্রামে ব্রহ্মদেবতাদিগকে জয় প্রদান করিলেন। দেবতারা তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই জয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই।" তাঁহাদের এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য ব্রহ্ম জ্যোতি রূপে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ইঁহার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহারা সকলে অগ্নিকে অনুরোধ করিলেন। অগ্নি সেই 'যক্ষের' নিকট উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' অগ্নি বলিলেন "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।" ব্রহ্ম বলিলেন "তোমার কি শক্তি।" অগ্নি উত্তর করিলেন "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সব দগ্ধ করিতে পারি।" "এই তৃণ খণ্ড দগ্ধ কর দেখি।" অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন দেবতাদিগের অনুরোধ ঐ জ্যোতি-স্বরূপের বিষয় অবগত হইবার জন্য বায়ু তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা, আমাকে পরিচয় প্রদান কর।" তখন ঐ জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কি শক্তি!" "আমি ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ সকল বস্তু উড়াইয়া দিতে পারি।" এই তৃণখণ্ডকে আগে উড়াও দেখি।" এই বলিয়া তিনি এক খণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণ খণ্ডকে এক চুল নড়াইতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বায়ুও ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন ইন্দ্র স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া ঐ অপরিচিত পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু সে স্থানে ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রকে উপদেশ

করিলেন, "হে ইন্দ্র, তোমাদের যাঁহার যা কিছু শক্তি, সকলই ব্রহ্মের। তোমরা ব্রহ্ম-শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই অসুরদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ। কিন্তু তোমরা সে কথা ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিলে, তাই তোমাদিগকে জ্ঞান দান করিবার জন্য ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা অহঙ্কারে এমন অন্ধ হইয়া গিয়াছ যে, চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাও না, তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিলে না। আর কখনও এরূপ ভ্রম করিও না, নতুবা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

এখন দেখা যাক, বর্ত্তমান্ ভারতক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে। ভারতে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান দেখিয়া বিলাতের Times গর্জ্জিয়া উঠিয়াছেন, সব পোড়াইয়া মারিবেন—"আমরা অস্ত্রবলে ভারত জয় করিয়াছি, অস্ত্রবলে শাসন করিতেছি এবং অস্ত্রবলেই রক্ষা করিব।" ঐ এলাহাবাদের Pioneer শোঁ শোঁ করিয়া উঠিয়াছেন, সব উড়াইয়া লইবেন—"মনে রাখিও, বিজেতৃ জাতির দংশন করিবার ক্ষমতা চলিয়া যায় নাই, ঘুমাইয়াছে মাত্র।" তাই একবার বিচার করিবার সময় আসিয়াছে, ভারত বিজয়ে, ভারতশাসনে ও ভারত রক্ষায় ব্রিটিশ রাজশক্তি কি করিয়াছে, কি করিতেছে, এবং কি করিতে পারে। সেই পলাশীর যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যেদিন ভারতে ব্রিটিশরাজত্বের প্রথম পত্তন হইল। কাহার হস্তে এই বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল? ব্রিটিস শক্তির হস্তে নহে। Timesএর তরবারী আর Pioneerএর দাঁত-খিচুনি তখন কোথায় ছিল? যদি মীরজাফর যুদ্ধে যোগ দিত, আর জগৎশেঠ প্রভৃতি বাঙ্গালার বিশ্বাস-ঘাতক নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্র না করিত, তবে ফোর্ট উইলিয়মের কেরাণী-বাবু ক্লাইব আফিংএর ঝোঁকে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিলেও, ভারতে বাস্তব সাম্রাজ্য স্থাপিত হইত না। ভারতেরই প্রজা-শক্তি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্বোধন করিয়াছিল। আবার যখন অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, এক কোণে, প্রজাশক্তির এক অংশের অঙ্গ সঞ্চালনে, ঐ অট্টালিকা ভগ্নোন্মুখ হইয়াছিল, তখনও, প্রজাশক্তির অপর অংশের সাহায্যেই ঐ সাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। সেদিন যদি প্রজামণ্ডলী সাধারণ ভাবে এবং শিখশক্তি বিশেষভাবে রাজশক্তিকে সহায়তা না করিত, তবে নিশ্চয়ই Pioneer আজ দন্ত বাহির করিবার সুযোগ পাইতেন না। তার পর, আজ যে এই রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, তাহা কোন্ শক্তির বলে? এই যে ভারতে ইংরাজ শান্তির বড়াই করে, সে শান্তির রক্ষক কে? আমাদেরই চৌকীদার, আমাদেরই কন্‌ষ্টেবল্, আমাদেরই সব-ইন্‌স্পেক্টর এই শান্তিরক্ষক। ইহারা পুলীশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে যে পথে চালাইতেছে, সেই পথেই তিনি চলিতেছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে যখন ইচ্ছা, তখন গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে পারে। তিনি যখন রাস্তায় বাহির হন, কে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়? কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে কে তাঁহাকে খবর দেয়? দেশে সিদিশান আছে কি না, কে তাঁহার গোচরে আনে? Times যে বেয়নেট্ বাহির করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, ভারতের কোন্ গ্রামে কয় খানা সেই বেয়নেট্ আছে? যে ক'জন শ্বেত-সৈন্য

ভারতে আছে, তাহারা কি ভারতের ৩০ কোটী প্রজা শাসনে রাখিতে পারে? এক এক গ্রামে এক একজন সৈন্য রাখিতে হইলে একজন সৈন্যকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিতে হয় না কি? তবে সৈন্য-বলে ভারত শাসনের কথাটা নিতান্তই কি উপহাসাস্পদ নহে? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্, আজ যদি বঙ্গের জমিদারবর্গ "আর খাজানা দিব না" প্রজাশক্তির প্রতিজ্ঞারূপ এই যক্ষকে ভারতক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া দেন, তবে দেবতাগণের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে, তাঁহারা প্রথমে বুঝিতে পারিবেন না, এই অজ্ঞাতকুল-শীল লোকটী কে? "তন্ন-ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।" তখন নিশ্চয়ই মিণ্টো-অগ্নি ordinance এর তেজে এ যক্ষকে ভস্মীভূত করিতে অগ্রসর হইবেন, রিস্‌লি-বায়ু ইঁহাকে circular প্রতাপে উড়াইতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতেও যক্ষের তৃণগাছটীও কেহ অপচয় করিতে পারিবেন না। সৈন্য পাঠাইয়া শাসন করিবেন? কে তাহাদিগের রসদ জোগায়? কে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়? কে তাহাদের মোট বহন করে? কেই বা জমিদারদিগকে চিনাইয়া দেয়? গ্রাম্য চৌকীদার হইতে সৈন্যের হাবিলদার পর্য্যন্ত সবই যে ঐ যক্ষেরই অমূর্ত্ত শরীর! হাত পা যদি না থাকে, তবে ঐ মাথাটা হাঁটিয়া হাঁটিয়া গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইবে কি? সেটা একটা মজার দৃশ্য হয় বটে, বায়োস্কোপিক দৃশ্য, বাস্তব নহে। জমিদারী নীলাম করিবে? হিসাব পত্র ঠিক করে কে? জমিদারেরা যে বাস্তবিকই খাজানা দেয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? গ্রাম্য চৌকীদার হইতে জজের সেরেস্তাদার পর্য্যন্ত, গ্রামের মোড়ল হইতে কালেক্টর বাহাদুরের মহাফেজ পর্য্যন্ত, সবই যে ঐ যক্ষের শক্তির এক এক বিন্দু মাত্র, যক্ষ স্বীয় শক্তি সংবরণ করিলে যে এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের তৃণ গাছটীও নড়িবে না, সে কথা ভুলিয়াই তো দেবতারা মনে করিতেছেন—"অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবাং মহিমেতি।" জজ বাহাদুর, কালেক্টর বাহাদুর, মোটা মোটা মাহিয়ানা পান বটে, কিন্তু বিপুল সংসারটা তো চালাই আমরা, একটু যদি এদিক্ ওদিক্ করি, এক মুহূর্ত্তে সব এলোমেলো হইয়া যাইবে, অগ্নির পোড়াইবার শক্তি থাকিবে না, বায়ুর উড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইবে। এক বৃহৎ গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারের বৃদ্ধ কর্ত্তা সংসারের সুশৃঙ্খলা দেখাইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, আমার কি বুদ্ধির জোর, এমন বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন বহুলোক পরিপূর্ণ এই সুবৃহৎ সংসার কেমন নির্বিঘ্নে চালাইতেছি।" গৃহিণী কোন উত্তর দিলেন না। পরদিন সকালে কর্ত্তা শুনিলেন যে, ছোট বৌ ঘরের তিন পুরুষের প্রাচীন একটী আসবাব অবহেলায় নষ্ট করিয়াছে; দুপুরবেলা শুনিলেন, ছেলের দুধ লইয়া অন্য দুই বৌতে প্রায় দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইয়াছিল; সন্ধ্যাবেলা শুনিলেন যে, নাতিবৌ গৃহিণীকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে। দু চার দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ খবর পাইলেন, বিদেশ হইতে এক ভ্রাতা স্ত্রীর নিকট অলঙ্কার পাঠাইয়াছে, বৌ তাহা কর্ত্তা ও গৃহিণীকে না দেখাইয়াই ব্যবহার করিতেছে। এইরূপে এক মাসের মধ্যে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন, আর একান্নভুক্ত থাকা যাইতে পারে না, কেন না, তাহা হইলে আর এই বৃদ্ধ বয়সে মান সম্ভ্রম থাকিবে না। বৃদ্ধও এই এক মাসের মধ্যে ইহার

যথেষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন। সুতরাং স্বতন্ত্র হইবার দিন স্থির করিয়া, ভাইদিগকে, গৃহিণীর পরামর্শে, কোনও জরুরি কাজে বাড়ী আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে সকলে যখন সমবেত হইল, বৃদ্ধ তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া লইয়া আসিলেন এবং সকলকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা সংসারের একটা ব্যবস্থা করুন এবং ন্যায্য-প্রাপ্য প্রদান করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিউন। কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্, ভাইয়েরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবস্থাটা বুঝাইবার জন্য গৃহিণীর ডাক পড়িল। গৃহিণীও কিছু মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না!!! তিনি কেবল বলিলেন যে, বৃদ্ধবয়সে বুড়ার ভীমরতি হইয়াছে, নতুবা এমন সুখের সংসার নষ্ট করিতে বসিবে কেন? বৃদ্ধের পক্ষে তখন গৃহিণীর কথা বুঝা অসম্ভব! যিনি একমাস ধরিয়া বুঝাইয়াছেন যে, সংসারটা ছারে খারে গিয়াছে, আর ইহার মধ্যে থাকা যায় না এবং যাহার প্ররোচনাতেই আজ স্বতন্ত্র হইবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহার এই ভাব বৃদ্ধের হৃদয়ঙ্গম হইল না— তন্নব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি। তখন ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী গৃহিণী বৃদ্ধকে বলিলেন, এই যে সংসার শান্তিতে চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে তোমার গরব করিবার কিছুই নাই। সংসারে শান্তি আছে, কি অশান্তি আছে, তাহাও তুমি জান না। তোমার আমার মধ্যে এই এক মায়া ধরিয়া যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহার খবর তৃতীয় ব্যক্তি জানে না এবং এই যে পারিবারিক অশান্তি, ইহা তোমার মস্তিষ্কে ছাড়া আর কোথায়ও নাই। আমিই তোমার মাথায় উহা ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম, এবং আমিই উহা বাহির করিয়া লইলাম, তুমি সাক্ষী গোপাল মাত্র। এই বৃহৎ ভারত-সংসারেরও ঐ দশা। কর্ত্তা তো সাক্ষী গোপাল মাত্র, আমরা যে দিকে চালাই, সংসার সেই দিকে চলে।

যাহা হউক, এখন যে কথা বলিতেছিলাম। না হয় মনে করিলাম, জমিদারদের জমিদারী নীলাম করিবে। কিন্তু কিনিবে কে? সরকারের খাস হইবে? চাষবাস করিবে কে? ভারতের ২০ কোটী চাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এমন জনবল ইংলণ্ডের আছে কি? আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ যক্ষেরই শরণাপন্ন হইতে হইল, আর উপায় নাই। এইরূপে যে কোন বিষয় লইয়া বিচার করা যাক্ না কেন, দেখা যাইবে যে, ঐ প্রজাশক্তি ছাড়া, ঐ যক্ষ ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজশক্তি বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র জিনিষ নাই, আছে কেবল একটা নাম মাত্র। অগ্নি যেমন কেবল নাম মাত্র, দাহন করিবার শক্তি ঐ যক্ষের, তেমনি, ভারতে ব্রিটিশ শক্তি একটা নাম মাত্র, কার্য্যশক্তি এই ভারত প্রজারই হাতে, ইচ্ছা করিলে, আত্মজ্ঞান পাইলে সে এক মুহূর্ত্তে সকল বিগ্‌ড়াইয়া দিতে পারে, তৃণখণ্ড নাড়িবার শক্তিও কাহার থাকিবে না। তিন লক্ষ লোকের দ্বারা যে ত্রিশ কোটী লোক শাসিত হইতেছে, সে কেবল এক ভেল্কী বাজীর জোরে। "ত্রিশ কোটী তিন লাখ্, লাগ্ ভেল্কী লাগ্" বলিয়া এবার উল্টা ভেল্কী লাগাও, দেখিবে, প্রজাশক্তির যে অশরীরী মূর্ত্তি আজ ভারতখণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। ভারতে প্রজা-শক্তির অভ্যুত্থান দেখিয়া যে দেবতাদের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, এত কাল "অম্মা-

কমেবায়ং মহিমেতি” বলিয়া যে আস্ফালন করিতেছিলেন,সেটা যে ভুয়ো প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে! যার শক্তিতে শক্তিমান্, তাহাকে যে আর অগ্রাহ্য করা চলিতেছে না, অথচ তাহাকে স্বীকার করিবার বুদ্ধিও ঘটে আসিতেছে না। এই যে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান, ইহা একটা সত্যিকার জিনিষ, ইহাকে অস্বীকার করা যায় না, কেন না, ইহা রহিয়াছে। আবার ইহাকে স্বীকার করিলেও অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না, বায়ুর বায়ুত্ব থাকে না। তাই দেবতারা মহা গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছেন। কখনও বা ইহাকে স্বীকার করিয়া Fullerএর কীর্ত্তি লোপ করিতেছেন, কখনও বা ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া লাজপতের নির্ব্বাসন করিতেছেন। এমনই শক্ত ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়াছে, কর্ত্তারা কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। দেবলোকে হুলস্থুল কাণ্ড। কেহই যক্ষের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন—“নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি”। এখনও ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয় নাই এবং দেবতাদের মধ্যে কে ইহার বাস্তব প্রকৃতি নিদ্ধারণ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন, তাহাও এখন নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। তবে একথা বলা যায় যে, যিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া মেকলের স্বপ্নকে জাগ্রত সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইবেন।

একদিকে যেমন দেবতারা মিথ্যা অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া বেয়নেট সেখাইতেছেন, দাঁত খিঁচাইতেছেন, অন্য দিকে, আবার যাহার মধ্যে প্রকৃত শক্তি বর্ত্তমান, তিনি সেই শক্তির জ্ঞানের অভাবে আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিতেছেন। “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ” —ঐ ডেপুটী বাবু জানেন না, তাহার কি শক্তি, ঐ পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর জানেন না, এই বিশাল ভারত-যন্ত্রের কি শক্তিশালী চক্র তিনি। তিনি ভাবেন, আপনার ঐ মাহিয়ানার কথা আর মুহ্যমান হন—‘অজ্ঞানেনা বৃতং জ্ঞানম্’। ভারতের প্রজা শক্তিকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ প্রাচীন যক্ষ রূপে এই অজ্ঞানতার বিনাশ প্রয়োজন। আমরা যে অসহায় নই, বরং আমরাই যে সব, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া চাই। এখনও আমরা চালাইতেছি, তখনও আমরা চালাইব, কেবল মাঝখান হইতে আমাদের অজ্ঞানতা দূর হইবে, আমাদের মোক্ষ লাভ হইবে। এই যক্ষের শরীর হইতে ভারতবাসীর একতা। এখানেও মূর্ত্তি গ্রহণের অন্তরায় অজ্ঞানতা। ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে এক, তাহা একটী ধ্রুব সত্য, অথচ আমরা মনে করি, তাহা নয়, তাই মুহ্যমান হই—‘অজ্ঞানেনা বৃতং জ্ঞানম্’। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের একটা কাল্পনিক ছায়া ভূত রূপে অনেককে পীড়ন করিতেছে। কিন্তু ভারতেরই ইতিহাস যে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, সে কথা কেহ গ্রাহ্য করিবে না, এমনই মোহ, এমনই ভেল্কা, এমনই ইন্দ্রজাল! স্বার্থের একতা থাকিলে যে সব বিবাদ মিটিয়া যায়, ইউরোপের কত জাতির ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ভারতে হিন্দু মুসলমান ইতিহাসই কি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে না? মুসলমান সিরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিলেন হিন্দু মোহনলাল, মুসলমান মিরজাফর সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান আক্‌বরের হিন্দু সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, হিন্দু প্রতাপাদিত্য তাহার পার্শ্বে দাঁড়াই-

লেন মুসলমান ঈশা খাঁ। স্বার্থের একতা দেখাইয়া দাও, একপ্রাণতা আপনা হইতেই আসিবে। কল্পনার ভূতের ভয়ে আগে হইতেই মরিও না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া দাও, এই যে প্রজা-শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে, ইহাকে হিন্দু মুসলমান, সরকারী বেসরকারী প্রভৃতি ভেদবুদ্ধির জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া মহা একতার ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান কর, সকল দুঃখ, সকল দৈন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে তিরোহিত হইবে। তখন দেবতারা ভীত ও সন্ত্রস্তমনে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিমেতদ্ যক্ষমিতি"॥ এবং ধীরে ধীরে সকলে ইঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িবেন। তখন Timesও swordএর কথা তুলিবেন না, Pioneerও Tiger qualities সম্বরণ করিয়া লোহিত-সাগর পার হইয়া যাইবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

# হিন্দু বিধবার প্রতি।

জীবনের প্রভাত হইতে
দেখি শত শোক অভিনয়,
কাঁদিতাম দুঃখ-মগ্ন চিতে
তব লাগি দহিত হৃদয়।

আহা কত মোহিনী ললনা,
সরলতা মধুরতা মাখা,
সংসারের কেহই হ'ল না,
জীবনের সব হল ফাকা!

কেহ দুঃখে হইয়া মগন
বিষ পানে ত্যজিল পরাণ,
কেহ দিয়া পাপেরই ইন্ধন
শত মৃত্যু হইল সমান।

জাতিকুল করি পরিহার
কেহ বা হইল কলঙ্কিনী,
পাপাসক্ত প্রেমিক দুর্ব্বার
ডুবাইল কত সীমন্তিনী!

কেহ থাকি কুলের সীমায়,
শুকাইল জীবন যৌবন,
হস্তপদ আবদ্ধ দশায়
উপবাসে শীর্ণ দেহ মন।

হরিভক্তি অতি মধুময়
জোর করি কে শিখাতে পারে?
ব্রহ্মচর্য্য পূত নিঃসংশয়
লও যদি ভক্তি সহকারে।

কিন্তু হায় হস্তপদ বেন্ধে
কে পারে যাইতে স্বর্গধাম,
দিবানিশি নিরাশায় কেন্দে
কেবা পারে লভিতে বিরাম?

মানবের বৃথা অহঙ্কার
বৃথা দম্ভ পাপ তাপ সনে,
সকলেই দহে অনিবার
তৃপ্তিহীন পাপের দাহনে।

তৃপ্তি? কোথা সুখ তার মাঝে,
আরও তৃষ্ণা সে বৃক্ষের ফল,
জানি সেই দিল্লীলাড্ডু আছে,
পস্তাইতে মানব সকল।

আমি যেন বহুদর্শীতায়
বুঝি তাহা প্রাচীন জীবনে,
কে বুঝিবে সেই কথা হায়,
দহে যায় প্রবৃত্তি ইন্ধনে।

সোজা কথা "এক বেলা খাও,
চোক বুজে কর একাদশী,
বাসনা কামনা ছেড়ে দাও
বড় ভাল নিত্য উপবাসী।"

পাই যদি শাস্ত্রকারে আজি
এই ব্রত করা'য়ে গ্রহণ,
দেখাতেম ব্রহ্মচর্য্যে মজি
থাকা ভবে সহজ কেমন।

তাই বলি, তোমাদের তরে
কাঁদিয়াছি হায় কতবার,
তাই বড় বাসনা অন্তরে
এক জনে করিতে উদ্ধার।

কাঁদে হৃদি তোমাদের তরে,
কাঁদিয়াছি কাপুরুষ প্রায়,
আজি ইচ্ছা পৌরুষের করে,
বিসর্জ্জিতে ভীতি নীচতায়।

যাহা দেখি আমার মতন,
তোমাদের শোকে মগ্ন যারা,
আর জনে করিয়া গ্রহণ,
কমাবেন দুঃখিনীর ভরা।

তাই ত্যজি লাজ অভিমান,
লোক নিন্দা সমাজের ভয়,
ইচ্ছা হয় একজন প্রাণ
তিরপিতে দুঃখিত হৃদয়।

ফলাফল বিধাতার হাতে,
ইচ্ছা জাগে হৃদয়ে আমার,
যদি কেহ চাহ মোর হ'তে
লও তবে মম উপহার।

ভারতের বন্ধনের দিনে
সবে চায় করিতে উত্থান,
কিন্তু শুয়ে কোণে শুষ্ক মনে
একি দৃশ্য হায় ভগবান!

উঠ যদি বাঙ্গালী সন্তান,
উঠ তবে এক সঙ্গে উঠি,
কুসংস্কার তিমির অজ্ঞান
একেবারে যাক সব ছুটী।

ভুলে যাও লোক-লাজ-ভয়,
সমাজের ভীষণ গর্জ্জন,
উঠ করি সাহসে আশ্রয়
কুসংস্কার হোক নিমগন।

বগুড়া। শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

# আবার বিধবা বিবাহ কেন?

আবার বিধবা বিবাহ হইতে চলিল!? ইহা কি ঐরূপ বিবাহের জন্য একটী মৌলিক উত্তেজনা, অথবা স্বদেশী আন্দোলনের ফল? ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় একবার বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার চেষ্টার পর হইতে হিন্দু সমাজে মোটের উপর বিধবা বিবাহ সংখ্যায় বাড়িয়াছে না কমিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আমাদের বরং বিশ্বাস, তাঁহার সময় হইতে বিধবা বিবাহ কমিয়া আসিতেছে।

সত্য বটে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টার ফলে প্রত্যেক বৎসরই ২।৪টী বিধবা বিবাহ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু হিন্দু সমাজ মধ্যে অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী হিন্দুদিগের মধ্যে শত শত বিধবা বিবাহ তদবধি বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নশ্রেণী হিন্দুর জন্য এক গণ্ডূষও চিন্তা করেন নাই; তাঁহার লক্ষ্যস্থল কেবল ব্রাহ্মণই ছিল। দুই চারিটী বিধবার বিবাহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে হইলেও, তাঁহার চেষ্টায় নিম্নশ্রেণী হিন্দুরা কোন ফল পায় নাই। বরঞ্চ কৈবর্ত্ত, রাজবংশী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য সমগ্র হিন্দুসমাজে মোটের উপর বিধবা বিবাহ কমিয়া গিয়াছে; আর যে পরিমাণে এই কমতি ঘটিয়াছে, সেই পরিমাণে পাপের স্রোত প্রবলতর হইয়াছে।

তবে আবার বিধবার বিবাহ কেন? আমাদের বিশ্বাস, ইহা স্বদেশী আন্দোলনের ফল। গত অর্দ্ধ শতাব্দী, বিশেষতঃ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, হিন্দুজাতি কংগ্রেস আদি করিয়া অনবরত দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যত্ন করিয়া আসিতেছেন। অতি সুবিধাজনক যত্ন বটে রাজনৈতিক; আবেদন নিবেদনই ইহার আদ্যন্ত। ইহা ছিল, গায়ে কাদা না লাগাইয়া মাছ ধরার চেষ্টা। যখন দেখা গেল যে, এ চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম, তখন ত একটা কিছু করা চাই। এত অর্থ, এত আগ্রহ, এত বক্তৃতা, সকলই শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, হায় কি আর একটা করিলে ইহা কিঞ্চিৎ দেশের উপকারে আইসে, এজন্য যেই চিন্তা উদিত হইল, তখন মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বলিয়া ফেলিলেন, বিদেশী পণ্য 'বয়কট' কর। কথাটা অমনি লাগিয়া গেল। ব্রাহ্মণের পাতে দধি চিনি পড়ার ন্যায় লোকে উহা উপদেয় বিবেচনা করিয়া দুই হাতে খাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, এই যে একটা কার্য্যরেখা-পাত হইল, ইহাতেও গায়ে কাদা লাগাইতে হয়। অনেকগুলি লোক আর তাহা লাগাইতে চাহিল না। এমন কি, বেগতিক দেখিয়া স্বয়ং মহারাজ বাহাদুর পশ্চাদ্পদ হইয়া পড়িলেন! কিন্তু পূর্ব্বে বঙ্গের কতকগুলি জেদী লোক মরিয়া হইয়া বয়কটের জোয়ালা কাঁধে বহিতে লাগিল। তন্মধ্যে বরিশালের উকীল ও মোক্তারগণ প্রধান।

দেখিতে দেখিতে "বয়কট" এমন বাড়িয়া গেল যে, রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাড়াপড়শীরা ভাবিতে লাগিল। মুসলমানেরাই আমাদের পাড়াপড়শী। তাহারা দেখিল, হিন্দুরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অমনি তরবারি লইয়া বাহির হইল, কাটাকাটি করিল, লুটপাট করিল, হিন্দু-দেবতা-মন্দির ভাঙ্গিল এবং ২।৪টী হিন্দু বিধবাকে জোর করিয়া বিবাহ করিল।

প্রত্যেক ১০ বৎসরে ভারতবর্ষে ৭৫০০০ হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করে বলিয়া আমি একখানি ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। আমি কথাটা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়াছিলাম না; কিন্তু একটী সমসংখ্যাযুক্ত-হিন্দু-মুসলমান মহকুমায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, প্রত্যেক ১০ বৎসরে তথায় ৫০।৬০ জন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু বিধবাগণের অবৈধ প্রণয় হইতেই এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কেবল যে নিম্নশ্রেণী হিন্দু হইতেই এইরূপ জাত্যন্তর হইতেছে, এমন নহে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির বিধবাগণও কেহ কেহ এই পথের পথিক হইয়াছে। এই প্রকারে, নদীতীর ভাঙ্গার ন্যায়, প্রতিনিয়ত হিন্দু-গৃহ ভাঙ্গিয়া মুসলমান সমাজ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এই সকল ঘটনার প্রতি পূর্ব্বে লোকের নজর আকৃষ্ট হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনে যখন হিন্দু মুসলমান বিবাদ খাড়া হইয়া উঠিল,

তখন ২১৪টী হিন্দু বিধবা মুসলমানের হস্তে পড়িয়া গেল। যাঁহারা নির্ব্বোধের স্বর্গবাসের ন্যায় নিতান্ত উদাসীন নহেন, তাঁহারা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিলেন, বিধবা-বহুল হিন্দুগৃহগুলি পাড়াপড়শী মুসলমানের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। একটুকু অশান্তির বাতাস বহিলেই, ভাঙ্গিয়া গিয়া মুসলমান, গৃহ নির্ম্মানের উপকরণ হইবে। যে সকল বিবেচক ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইল, তন্মধ্যে উদীয়মানা পাবনা নবনগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধান। তাঁহারা একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, বিধবা বিবাহ হওয়াই সঙ্গত। যে পণ্ডিতমণ্ডলী ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় বিধবা বিবাহের নিদারুণ শত্রু ছিলেন, তাঁহারা সহজে এরূপ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া সহাস্য-বদনে আমাদের বিধবাদিগের প্রতি সুদৃষ্টি করিলেন। কেবল ইহা নহে, তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, আমরা যতই অহঙ্কার করি না কেন, যতই শাস্ত্রাস্ফালন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিনা কেন, আমাদের অবস্থা বড় অরক্ষণীয় এবং আমাদের বর্ত্তমান সমাজনীতি অশাস্ত্রীয় ও নিন্দনীয়। এজন্য তাঁহারা হলচালনা সঙ্গত মনে করিলেন এবং ইহা প্রদর্শন জন্য নিজেরা লাঙ্গল ধরিলেন; ইহা বেদবিধি-সঙ্গত, লোককে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপরে ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াই পাবনা কন্‌ফারেন্সে কংগ্রেসী বাবুরা নমঃশূদ্রের অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। প্রায় বিশ বৎসর হইল Elevation of low castes নামে একটী প্রস্তাব কংগ্রেস-মণ্ডলে গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং লর্ড কর্জ্জনের কথা যেন সফল করিবার জন্য উক্ত বাবুদের উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি মিথ্যাবাদে পরিণত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান বিবাদ, সেই একছিটা অশান্তি, কংগ্রেস ওয়ালাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্যোন্মুখ করিয়া দিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনে আর কেমন ফল হউক আর না হউক, এই ফল হইয়াছে যে কাজে হাত দিতে গেলে আমাদের কি কি সংস্কার অত্যাবশ্যক, তাহা জাতীয় হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছে। আশু বাবুর বিধবা কন্যার বিবাহ এতাদৃশ আবশ্যকতাজ্ঞানের ফল, ইহা স্বদেশীয় আন্দোলনের সুধাবৃষ্টির প্রথম বিন্দুপাত।

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, এ তর্ক তুলিয়া কি হইবে? হিন্দু কি শাস্ত্রানুসারে চলে? কি তাহার শাস্ত্র? বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভট কবিতা গুলি পর্য্যন্ত সকলই তাহার শাস্ত্র, আর সকলই তাহার অশাস্ত্র। যখন লোকাচারের সঙ্গে না মিলিল, তখন বেদও তাহার শাস্ত্র নয়। কোন্ শাস্ত্রে কৌলীন্য আছে? কত বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ ধ্বনি তুলিয়া হিন্দু-গৃহের পবিত্রতার আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা কি বহু বিবাহকারী কুলীন গৃহ স্বচক্ষে দেখেন নাই? বিবাহাভাবে বর্ষিয়সী কুমারী কুলীনাদিগের পদস্খলন কি তাহাদের জ্ঞাননেত্রের গোচরে আইসে নাই? তবে শাস্ত্রের কথা তোল কেন? আর যদি বা তোল, তবে আগে স্থির কর, অবশ্য-প্রতিপাল্য শাস্ত্র কি? ইহা যদি বেদ হয়, ইহা যদি সেই অপৌরুষেয় মহামান্য গ্রন্থ হয়, তবে

উদীর্ষ্ব নার্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপে শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।

ঋগ্বেদ, ১০।১৮।৮

বঙ্গানুবাদ

উঠিয়া চল সংসারে যাও, যায় সহকারে
করিতে শয়ন, তিনি গতাসু এখন।

গ্রহণ করিয়া পাণি দিধিষু হবেন যিনি,
হয়ে পত্নী তার কর কর্ত্তব্য সাধন ॥

মংকৃত বেদসংহিতা ১ম ভাগ ১২১ পৃষ্ঠা। এই মন্ত্র গ্রহণ কর। যদি পরবর্ত্তী শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ মত থাকে, তাহা গ্রাহ্য নহে। কেননা, ইহাও শাস্ত্রে আছে যে, যদি শাস্ত্রে বিরোধ ঘটে, তবে শ্রুতি অর্থাৎ বেদই মান্য। যদি এসব কথার মূল্য থাকে, প্রকৃত শাস্ত্রে আস্থা থাকে, তবে আশু বাবুকে নিন্দা করিতেছ কেন?

আমাদের পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ভিন্ন দেশের স্বস্তি নাই। এক্ষণত কাজে হাত দিয়াছ, দেখিবে কথাটা কত সত্য। ১৮৯১ সনের সেন্‌সাসের পূর্ব্বে আমরা জল-চল নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া তাহার ৩০০০ কাপি অনাচরণীয় হিন্দু বিশেষতঃ নমঃশূদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলাম। দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি যে, শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি গত মাসের নব্যভারতে অনাচরণীয় হিন্দুর জলাচার সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ জাতি বৃন্দের উন্নতিকামী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে দেখিলাম, তিনি নমঃশূদ্রাদি জাতির সদাচারের কথা বারম্বার বলিয়া জলাচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি যদি সদাচার অর্থে বিধবা বিবাহের রাহিত্য ভাবিয়া থাকেন, তবে ভ্রম করিয়াছেন। বিধবা বিবাহই সদাচার, ইহার রাহিত্যই কদাচার বা ব্যভিচার।

উপসংহারে বলিতে চাই, যেমন আশুবাবু স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া একটী অত্যুৎকৃষ্ট স্বদেশীয় কার্য্য করিয়াছেন, সেইরূপ অন্য কোন পদস্থ ব্যক্তি অনাচরণীয় হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহারে আসিয়া আর একটী স্বদেশীয় কার্য্য করুন। আমি অবগত আছি, স্বদেশী আন্দোলন-প্রধান বরিশাল জেলায় জুলুহার নামক একখানি গ্রামে এই স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বোধিত হইয়া, শেষে হিন্দুধর্ম্মে ধিক্কার দিয়া, ১০।১২ ঘর নমঃশূদ্র খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আমি স্বদেশী নেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, দুখানা বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনে বেশী স্বদেশী কার্য্য, না এই নমঃশূদ্রমণ্ডলীকে স্বধর্ম্মে রাখা বেশী স্বদেশী কার্য্য? এক্ষেত্রে কি কোন আশুতোষের আবির্ভাব হইবে না?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

---

# আবেদন।

১

হৃদয়ের তপ্ত-রক্ত ঢালি
নিত্য মোরা দেই রাজ-কর,
পুষ্প-অর্ঘ্য-প্রদানি উদ্দেশে
কিন্তু কোথা রাজ-রাজেশ্বর?

২

বক্ষে বক্ষে স্বর্ণ সিংহাসন
পাতিয়াছে ভারত-সন্তান,
মানি মোরা ভক্তিনত শিরে
রাজ-দেহে দেব বিদ্যমান!

৩

দেবতার প্রতিরূপে যিনি
বিরাজিত বিচার আসনে,
প্রজাদের পুঞ্জীকৃত প্রাণ
অবস্থিত তাঁহারি জীবনে।

৪

প্রজা তাঁর ধন, মান, আয়ু,
প্রজা চির বিশ্বাসের স্থল,
তিনি যথা রাজর্ষি জনক
কর্ম্মযোগী—সাধনা মঙ্গল!

৫

রাজা সেই—প্রাণ সমা জায়া,
প্রাণাধিক তনয় রতনে,
বিকাইলা ধর্ম্ম রক্ষা লাগি,
নিজে দাস, চণ্ডাল-ভবনে!

৬

রাজা সেই—ভ্রাতৃ-প্রেম তরে,
ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জ্জন করি,
পাদুকা রাখিয়া রাজাসনে,
রাজ-কার্য্য করিলা আমরি!

৭

রাজা সেই—মেঘ মন্দ্র রবে
শুনাইলা "প্রজার রঞ্জনে,
স্নেহ, দয়া, সুখ, প্রিয় নারী,
ত্যজি যদি ব্যথা নাহি মনে।"

৮

সত্য সেই, নিষ্পাপ নির্ম্মলা
ভার্য্যা-রত্ন প্রাণের সম্বল,
অনায়াসে দিলা বনবাস,
প্রজা-তৃপ্তি কামনা কেবল!

৯

রাজা সেই—মানব-মঙ্গলে
"জরাসন্ধে" বিনাশিলা রণে,
নাশি আরো কত দুরাচারে,
নিস্তারিলা সাধু-জন-গণে।

১০

বধি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী
ধর্ম্ম-রাজ্য করিলা স্থাপন,
প্রচারিলা "ধর্ম্ম লোক-হিতে,
শ্রেষ্ঠ-তপ আত্ম বিসর্জ্জন!"

১১

সাধুগণে রক্ষিবার তরে,
করিবারে দুষ্টের দমন,
সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার হেতু
যুগে যুগে রাজ আগমন।

১২

তাই সে বাবর, আকবর,
কিম্বা রাণা প্রতাপ, কুমার,
বরণীয় রাজপুত রাজ,
রণজিত, সীতারাম আর,

১৩

যেইরূপে যেই স্থানে যেবা
দাঁড়াইলা রাজ-দণ্ড ধরি,
ভক্তিমান ভারত-সন্তান,
পুষ্পাঞ্জলি দেছে শ্রদ্ধা ভরি।

১৪

আজি তুমি কে গো নরপতে!
কোথা সে মহতী উদারতা?—
"প্রজাহিতে রাজ-হিত" জ্ঞান
কই সেই প্রজা-বৎসলতা?

১৫

চিরদিন 'রাজভক্ত' জাতি,
আজি তারা 'রাজদ্রোহী' কিসে,
'লাল টুপী কাল কোর্ত্তা' ধারী
রক্ত পিয়ে নিমেষে নিমেষে!

১৬

প্রজাদের জাতীয় উন্নতি
মাতৃ-সেবা, স্বদেশ পূজন,
তারি নাম 'রাজদ্রোহ' যদি,
'রাজভক্তি' নীরবে মরণ?

১৭

স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দল
মর্ম্ম-গ্রন্থি ফেলিবে ছিঁড়িয়া,

অর্দ্ধাশন অনশনে মোরা
মৃতবৎ রহিব পড়িয়া ?

১৮

জননীর ধন রত্ন লুটি
যাবে চলি বিদেশী বণিক,
নিবারিতে পদাঘাত স'ব,
আমরা কি পশু বাস্তবিক ?

১৯

যাহা কিছু মরমের কথা
যাহা কিছু প্রাণের বেদনা,
প্রকাশিলে কারাবাসী হ'ব
অনুভূতি কোথাও পাব না ?

২০

প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, ভারত-গৌরব,
কিম্বা শিশু, পুরাঙ্গনাগণ,
আজি খিন্ন, লাঞ্ছিত, দলিত,
এরি নাম "রাজার শাসন" ?

২১

এ দুর্দ্দিনে আছ নাকি তুমি
মহারাজ ! রাজ রাজেশ্বর !
হরিশ্চন্দ্র, ভরত, শ্রীরাম,
কৃষ্ণচন্দ্র—আসন-উপর ?

২২

আছ কি সমষ্টীভূত প্রাণ
এই ত্রিশ কোটী মানবের ?
আছ কিগো দুর্ব্বলের বল,
ধর্ম্ম, ন্যায়, আশ্রয়, দেশের ?

২৩

থাক যদি—এই দুঃসময়ে,
অবিচার, অরাজক-ভয়,
দূর কর আত্ম প্রকাশিয়া
দেখি হোক কৃতার্থ হৃদয়।

২৪

বাজুক বিজয় শঙ্খ শত
আজি তব শুভ-আগমনে,
এস ! দৃপ্ত আত্মত্যাগী বীর।
প্রজাগণ নমিবে চরণে।

২৫

দিতে এস মঙ্গল বিশ্বাস,
নিতে এস প্রেমের বন্ধন,
মরে যাক ঘৃণ্য অত্যাচার,
প্রাণে প্রাণে হউক মিলন।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

---

# উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

## ছান্দোগ্যোপনিষদ।

যে আদিত্য করিছেন তাপ বিতরণ,
উদ্গীথ ভাবিয়া তাঁরে করিবে মনন।
প্রজাগণ পায় অন্ন তাঁহার কৃপায়,
তাঁহা হ'তে অন্ধকার দূরে চলি যায়।
তিনিই করেন জীবে তমোভয় নাশ,
তাঁরে জানি ছিন্ন হয় জন্ম-মৃত্যু-পাশ।১।
আদিত্য ও প্রাণ, দুইএ অপ্রভেদ জান,
অন্তরিত উষ্ণ গুণে উভয়ই সমান।
উভয়েরই নাম স্বর বলে সর্ব্বজনে,
আদিত্যের উদয়াস্ত, জন্ম মৃত্যু প্রাণে।*
নামে গুণে তুল্য দুই-ই ; তাই উভয়েরই
উপাসনা কর, উৎ-গীথ জ্ঞান করি।২।

* আদিত্যের যেমন উদয় এবং অস্ত আছে, প্রাণেরও তেমনি জন্ম ও মৃত্যু আছে।

উপাসনা কর প্রাণে, উদ্গীথ জানি।
নিশ্বাস অপান, আর প্রশ্বাস প্রাণ-ই।
উভয়ের সন্ধি ব্যান; ব্যানই বাক্য হয়,
বাক্য উচ্চারণ কালে দুই-ই ১ স্তব্ধ হয়।৩।
বাক্যই ঋক্; প্রাণ ও অপান পরিহরি
বাক্য উচ্চারিত হয়। ঋক্ হ'তে সাম;
সামগান কর উৎগীথ জ্ঞান করি।
প্রাণ ও অপান রোধি' কর সাম গান।৪।
যত বীর্য্যবান কর্ম্ম, সকলই ব্যানের।
অগ্নির মন্থন, কিম্বা দৃঢ় ধনুকের
আকর্ষণ, মর্য্যাদার পথে বিচরণ,—
ব্যান-কার্য্য কালে তাহা না হয় কখন।
উদ্গীথ কীর্ত্তন কর বাক্য উচ্চারণে,
ব্যানে কর উপাসনা, উৎ-গীথ জ্ঞানে।৫।
উৎ-গীথ অক্ষরত্রয়ে কর উপাসনা।
"উৎ" প্রাণ, তাহে উঠা, করহ ধারণ।
"গী" বাক্য, "থ" অন্ন, সকলি অন্নেতে স্থিত;
তাই ব্রহ্মে জ্ঞানিগণ কহেন উদ্গীথ।৬।
উদ্গীথ বিবিধ ভাবে ব্রহ্মেই বুঝায়।
"উৎ" স্বর্গ, "থ" পৃথ্বী, "গী" অন্তরীক্ষ হয়।
"উৎ" আদিত্য, "গী" বায়ু, "থ" অগ্নির নাম।
"উৎ" সাম, "গী" যজু "থ" ঋগ্বেদ পরিণাম।
উদ্গীথ অক্ষর ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে যিনি
করে উপাসনা, তিনি সিদ্ধকাম জ্ঞানী।
বাক্‌দেবী বাক্‌সিদ্ধি ২ করেন প্রদান,
অন্ন ভোক্তা হন তিনি, তিনি অন্নবান্ ৩।৭।
ঋক্-এ সাম প্রতিষ্ঠিত, ঋকে ধ্যান কর;
ঋকের দেবতা ঋষি করহ মনন;
যে দেবে করিলে স্তুতি লোক চরাচর
বেদবিৎ হয়, তাঁরে করহ সাধন।৯।

১ প্রাণ ও অপান।
২ যাহার বাক্য সফল হয়, কখন নিষ্ফল হয় না।
৩ প্রচুর অন্নশালী।

যে গায়ত্রি ধ্যান করি ব্রহ্মবিৎ হয়,
তাঁহারে মনন কর হইয়া তন্ময়।
যেই স্তোমে স্তুতি করি হয় তত্ত্বজ্ঞানী,
তাহার চিন্তন কর, অন্ত নাহি জানি।১০।
যে দিক্-এ করিলে স্তব হয় দিক-জ্ঞান,
সেই দশদিক ব্রহ্ম. সদা কর ধ্যান।১১।
অপ্রমত্ত ভাবে ৪ অভ্যাস যোগেতে
যেই করে আত্ম-ধ্যান,
সর্ব্ব কামনা পরিপূর্ণ হয়,
হয় তা'র ব্রহ্মজ্ঞান।
হয় তা'র ব্রহ্মজ্ঞান।১২।
ইতি তৃতীয় খণ্ড।

---

উদ্গীথের উপাসনা হইল প্রচার,
অক্ষর ওঁকার ব্যাখ্যা কহিব এবার।
ওঁ এ অক্ষর কর উপাসনা,
এ হ'তে ৫ আরম্ভ গান,
উদ্গীথও যেমন, ওঁ-এরও তেমন,
সাধনে দুই-ই সমান।১।
মৃত্যু ভয়ে দেব হইয়া শঙ্কিত
বেদত্রয়ে প্রবেশিলা,
বৈদিক কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান
মৃত্যু ভয় পাশরিলা।
ছন্দোগান করি, করি জপ হোম
হৈলা কর্ম্মে আচ্ছাদিত;
বৈদিক মন্ত্রে তাই সবে ছন্দ ৬
নামে করে অভিহিত।২।
ধীবর যেমতি অগভীর জলে
মৎস্য হেরে ধরিবারে,
ঋক্ সাম যজু কর্ম্মী দেবগণে
মৃত্যু হেরে লইবারে।

৪ স্বর ব্যঞ্জনাদি বিষয়ে ভ্রম না করিয়া।
৫ ইহা হইতে।
৬ আচ্ছাদন করিয়াছিল, বলিয়া ছন্দ নাম হইল।

কর্ম্মে মৃত্যুভয় দূর নাহি হয়,
এত ভাবি দেবগণ,
ওঁকার স্বরে প্রবেশিলা সবে,
ওঁকার ব্রহ্ম-সাধন*।
ঋগ্বেদ যবে হইবে আয়ত্ত
ওম্ স্বর কর গান,
ইহাইত ঋক, যজু সাম ইহা;
নাহি ওঁ-এর সমান। †
ওঁ এ অক্ষরে, নাহি মৃত্যুভয়
অমৃত অভয় স্বর,
এ স্বর সাধনে দেবতা সকলে
অভয়, নিত্য, অমর।৪।
ওঁকার অক্ষরে জানি এই ভাবে
সাধনা করেন যিনি,
দেবের সমান হয় ব্রহ্মজ্ঞান,
অমৃত অভয় তিনি,
অমৃত অভয় তিনি।৫

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীশশধর রায়।

---

# আশুবাবুর কন্যা-বিবাহে 'বঙ্গবাসী।'

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্"
—কালিদাস।

ভারতের সর্ব্বপ্রধান মহাকবি উপরি-উদ্ধৃত উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া, হিন্দু-জাতিকে পরনিন্দারূপ পাতক হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু সংহিতাকারগণও বারম্বার বলিয়াছেন যে, কুলে, মানে, বিদ্যায়, জ্ঞানে যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের প্রতি অপভাষা প্রয়োগ করিতে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানকালে হিন্দুজাতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে;—তাই তাহারা আর এই মহোপদেশ অনুসারে আপনার জিহ্বা-শাসনে অভিলাষী নহে। "বঙ্গবাসীর" কলেবরে বিগত তিন চারি সপ্তাহ হইতে যে সকল অপবিত্র শব্দরাশি বহির্গত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা অতি ক্ষুব্ধচিত্তে এই সকল অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

বঙ্গবাসী কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। আমরা ত দেখিতেছি, গড্ডলিকা-প্রবাহের অনুবর্ত্তনের নামই "বঙ্গবাসীর" শাস্ত্র। আশুবাবু স্বীয় অতি অল্প-বয়স্কা বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়াছেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কিনা? হিন্দুর শাস্ত্রে বিধবা কন্যার প্রতি তিন প্রকারের ব্যবস্থা

---

* পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলেন, ঋক্ যজু সাম সম্বন্ধীয় কর্ম্মে মৃত্যুভয় দূর করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া দেবগণ কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ওঁকার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জানিলেন যে, কর্ম্মে অমৃতত্ব লাভের আশা নাই; তখন উপাসনা-তৎপর হইলেন। ওঁকার সাধনাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, সুতরাং মৃত্যুর হেতু।

† ওঁ-এর সমান কিছুই নাহি।

অনুমোদিত হইয়াছে। প্রথম ব্যবস্থা—ব্রহ্মচর্য্য-পালন; দ্বিতীয় ব্যবস্থা—সহমরণ; তৃতীয় ব্যবস্থা—অত্যল্প বয়স্কা হইলে পুনর্বিবাহ। হিন্দুশাস্ত্রের এই উদার ব্যবস্থা আমরা প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মসংহিতায় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। সংহিতাকারগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল গ্রন্থ অনায়াসে দেখিয়া লইতে পারিবেন। শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত বিধবার যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য—অতীব মুখ্যকল্প, সন্দেহ নাই। যে সকল বিধবা অধিকবয়স্কা এবং ধর্ম্মচর্য্যাপরায়ণা ও সংযতচরিত্রা, ঈদৃশ একনিষ্ঠ বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকার নিষ্কামা বিধবার সংখ্যা অতীব বিরল হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের যে সকল কঠোর নিয়ম উপদিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের কয়টী গৃহে ঠিক সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ব্রহ্মচর্য্য পালিত হইয়া থাকে? কেবল চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয় না। যদি শাস্ত্রানুসারেই চলিতে হয়, তবে শাস্ত্রে যত প্রকার নিয়ম ও বিধানের উল্লেখ আছে, সকল গুলিই যথাযথ পালন করিতে হইবে। যদি তাহার একটীও অপ্রতিপালিত হয়, তবে তাহাকে শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা বলা যায় না। শাস্ত্রে পুরুষের প্রতিও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন্ পুরুষ সেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন? বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন ব্যতীত আমরা আর কোন্ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি? যদি অন্যান্য নিয়ম পালন না করাতেও, পুরুষদিগের শাস্ত্রানুশাসিত ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যাঘাত না হয়, তবে স্ত্রীদিগেরই বা হইবে কেন? শাস্ত্রে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ত ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে, পুরুষকে অব্যাহতি দিয়া, কেবল স্ত্রীজাতির প্রতিই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা যদি রাখিতে চাও, তবে আমি ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তুমি হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন মানিতেছ না! অথচ মুখে বলিতেছ যে, "শাস্ত্র-শাসন মানিয়াই ত আমি চলিতেছি" !!

যে সকল বিধবা পরলোকের সুখার্থিনী, হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাদিগের প্রতি সহমরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা অবশ্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কিন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এ প্রথাটীকেও অনেকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। এমন কি, মহাকবি কালিদাস এবং বাণভট্ট—এই সকাম সহমরণপ্রথার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তথাপি ইহা সমাজে প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি রাজশাসনে উহা উঠিয়া গিয়াছে। মনুষ্যের চিত্ত বৃত্তির বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই, হিন্দুশাস্ত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সকল স্ত্রীলোকের চিত্তের ধর্ম্মভাবের বিকাশ ঠিক্ সমান হইতে পারে না। এই জন্যই, হিন্দুশাস্ত্র সকলের পক্ষে কেবল এক প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন নাই। যে সকল বিধবা অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তত প্রস্ফুট হয় নাই; যাঁহারা সংসারের সুখে লালিত পালিত;—হিন্দু শাস্ত্র তাঁহাদের কথাও ভুলেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্র পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রের সমদর্শিতাই প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল অত্যল্পবয়স্কা বালিকার হৃদয়ে পতিপ্রেম জন্মে নাই এবং যাঁহারা যাবজ্জীবন

ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ,—হিন্দুশাস্ত্র এমন নির্দ্দয় হইতে পারেনা যে, তাহাদিগকে সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিবেন। তাই, পরমদয়ালু শাস্ত্র, ঈদৃশ বালিকা স্ত্রীর প্রতি পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"বঙ্গবাসী" শাস্ত্রের এই উদার নীতির কথা ভুলিয়া, সকলের পক্ষেই একবিধ ব্যবস্থা দিতে সমুদ্যত হইয়াছেন! ইহাকে শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা বলা যায় না; ইহাকে গড্ডলিকা-প্রবাহের অন্ধ-অনুবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে অনেক তথাকথিত হিন্দু শাস্ত্রের তত্ত্ব ভুলিতে বসিয়াছেন। কি অভিপ্রায়ে এবং কাহার প্রতি শাস্ত্র কি ব্যবস্থা করিয়াছেন;—তাহা কেহ বড় অনুসন্ধান করেন না। হিন্দুর সেই সুপ্রসিদ্ধ "অধিকার ভেদের" তত্ত্বটা ভুলিয়া গিয়া, সকলের প্রতিই সমান ব্যবস্থা দিতে অনেকেই অগ্রসর!! যদি সকলের পক্ষেই সমান ব্যবস্থা হয়, তবে একটা নিরক্ষর কৃষককে ধরিয়া, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিতেই বা এত তুমি নারাজ কেন?

আমাদের মতে, আশুবাবু তাঁহার অত্যল্প বয়স্কা কন্যার পুনর্ব্বিবাহের বিধান করিয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই। বরং শাস্ত্রের মর্য্যাদাই পালন করিয়াছেন। সংসারের সর্ব্ববিধ সুখে লালিত পালিত, অতি অল্পবয়স্কা কন্যা—যে পতি কাহাকে বলে তাহা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া জানে না;—যদি আশু বাবু ঈদৃশ কন্যার প্রতি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিতেন, তবেই বরং আমরা বলিতাম যে, তিনি শাস্ত্রের বিধান রাখিলেন না।

আমরা দেখিতেছি "বঙ্গবাসী" সপ্তাহের পর সপ্তাহে, ভদ্রলোকের অবাচ্য ভাষায় আশুবাবুকে আক্রমণ করিতেছেন। বিশেষতঃ "বঙ্গবাসী", তাঁহার নিরপরাধা, পবিত্রা কন্যার প্রতি যে সকল অপভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি নিতান্তই ইতর-জনোচিত হইতেছে। "আশুবাবুর কন্যার পর-পুরুষান্তর গ্রহণ" —প্রভৃতি শব্দ কোন ভদ্রলোক কি অপর ভদ্রলোকের কন্যার উপরে প্রয়োগ করিতে পারেন? যদি বঙ্গবাসী, ধীর ও সংযত ভাবে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবা বিবাহের অবৈধতা প্রমাণ করিতে পারিতেন, তবে আমরা কোন কথা বলিতাম না। বরং বঙ্গবাসীকে প্রশংসাই করিতে পারিতাম। কিন্তু বঙ্গবাসী সে পথে যান নাই। মহাজন-নিষেবিত সাধু পথ পরিত্যাগ করিয়া, গালাগালি নামক বাঙ্গালীর আগ্নেয়াস্ত্রটী মাত্র ধারণ করিয়া, বঙ্গবাসী আসরে নামিয়াছেন। ইহা কোন ভদ্রলোকই অনুমোদন করিতে পারিবেন না। লোকে মনে করিবে যে, বঙ্গবাসীর এ প্রকার আক্রমণ কেবলই ঈর্ষামূলক!! ইহা নিতান্তই কাপুরুষোচিত পন্থা। যদি শক্তি থাকে, শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, বিচার-বিতর্ক পূর্ব্বক, বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ কর। বঙ্গবাসী যে তাহা করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি মনে বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাই তিনি কেবল মাত্র গরল উদ্গীরণ করিতেছেন!! লোককে গালাগালি দিলেই কোন একটা বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না। বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ এইরূপে গালাগালিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। শাস্ত্রীয় বিষয়ে সংযম আবশ্যক। বঙ্গবাসীর সেই সংযমের অভাব দেখিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধিত হইয়াছি। আমরা বলিতেছি এই, যদি শক্তি

থাকে, তবে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত কর; দেখা যাউক্, শাস্ত্র বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী কিনা। বঙ্গবাসী তাহা পারিবেন না বলিয়াই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

পরাশর সংহিতার সর্ব্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, কলিযুগের জন্য পরাশর সংহিতায় যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংহিতাকেই তবে, কলিযুগের নিমিত্ত ব্যবস্থা শাস্ত্র বলিয়া, হিন্দুদিগকে অবশ্যই মানিতে হইবে। এই সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোকে বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ এবং ব্রহ্মচর্য্য—এই উভয় প্রকারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যিনি মানিতে দ্বিধা করিবেন, তাঁহাকে আমরা হিন্দু বলিতে প্রস্তুত নহি। আদি পুরাণের একটী বচনের দ্বারা, পরাশর সংহিতার এই বচনটীর সংকোচ করিবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। আদি পুরাণের বচনে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, "দত্তা কন্যাকে প্রদান করা কলিতে নিষিদ্ধ।" আমরা ইহার ইহাই সরলার্থ বুঝি যে, কন্যা নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ংদত্তা হইবেন, পিতা কর্ত্তৃক পুনরায় কন্যার দানটী কেবল বিধেয় নহে। * এতদ্ দ্বারা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে না। যদি পুনর্ব্বিবাহই নিষিদ্ধ হয়, তবে বশিষ্ঠ সংহিতার ১৭ অধ্যায়োক্ত বচনগুলির সঙ্গে নিতান্ত বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, বাগদত্তা কন্যা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায় এবং যে বালিকা মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অথচ নিতান্ত বালিকা বা পতিসমাগমানভিজ্ঞা, তাহার পতির মৃত্যুর পর পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে। পরাশর এবং বশিষ্ঠ উভয়ই বিধবা বালিকার পুনর্ব্বিবাহে সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য—উভয়ই হিন্দুজাতির অতিশয় শ্রদ্ধেয় সংহিতাকার। আমরা এই দুই সংহিতায় "পৌনর্ভব পুত্রের" কথা দেখিতে পাই। বিধবা পুনরায় পরিণীতা হইলে, তাঁহার গর্ভজাত পুত্রের নাম "পৌনর্ভব" পুত্র। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে, সংহিতাকারগণ পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ ও অনুমোদন করিলেন কেন? কুণ্ড এবং গোলক নামক পুত্রই হিন্দুশাস্ত্রে অতিশয় নিন্দিত হইয়াছে; কিন্তু পৌনর্ভব পুত্রের নিন্দা কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই নিন্দা না থাকা দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্তের বহু নিদর্শন আছে। দময়ন্তী যখন পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিয়া অযোধ্যারাজ্যের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাবটীকে তাঁহার পিতা কোন প্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই; অযোধ্যায় সে সংবাদ পৌঁছিলেও কেহই তাহাতে কোন বিস্ময় প্রকাশ করে নাই। যদি উহা নিতান্ত দূষণীয় কার্য্যই হইত, তবে আমরা নিশ্চয়ই উহার নিন্দাসূচক সমালোচনা মহাভারতে উল্লিখিত দেখিতে পাইতাম। অর্জ্জুন উলূপীকে যথা-

* বশিষ্ঠ সংহিতায় এই স্থলেই আছে যে, "বাগ্দত্তা কন্যার বৈধব্য হইলে, পিতা পুনরায় দান করিবেন এবং মন্ত্রসংস্কৃতা কন্যা বিধবা হইলেও তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে"। সুতরাং বশিষ্ঠ-মতে পিতাই পুনরায় দান করিতে পারিবেন। আদি পুরাণ মতে, পিতার দানে অধিকার নাই। এইটুকু মাত্র উভয় মতে পার্থক্য। কিন্তু উভয় মতেই বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে না।

শাস্ত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। এই উলূপী বিধবা কন্যা। ইঁহার গর্ভজাত সন্তানও, অর্জ্জুনের অন্যান্য সন্তানের সহিত সমান সম্মানেই গৃহীত হইয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধান আছে। তবে একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানই মুখ্য কল্প। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সকল স্ত্রীলোকের জন্যই যে কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, একথা মনে করা নিতান্তই ভুল। মানসিক বিকাশের তারতম্যানুসারেই হিন্দুর সকল প্রকার ব্যবস্থা। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে "অধিকারী" ভেদের কথা দৃষ্ট হয়। হিন্দুশাস্ত্র কোথাও সকলেরই পক্ষে ঠিক্ একরূপ বিধি দেন নাই। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রশংসার ও গৌরবের কথা।

হিন্দুর সংহিতায় যে বিধির সুস্পষ্ট ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই বিধি প্রতিপালন করিয়া, আশুবাবু হিন্দু সমাজে "পতিত" হইলেন কি প্রকারে, ইহা আমরা বুঝিতে সমর্থ নহি। বরং বর্ত্তমানকালে সমগ্র হিন্দু সমাজকেই পতিত বলা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজে, হিন্দুশাস্ত্রোপদিষ্ট প্রায় অনেক বিধিরই উল্লঙ্ঘন দেখিতে পাওয়া যায়! অথচ তদ্দ্বারা ত কোন ব্যক্তিবিশেষকে 'পতিত' প্রমাণ করিবার জন্য "বঙ্গবাসীর" আমরা ত কোন আগ্রহ দেখিতে পাই না! হিন্দুসমাজে এরূপ অনেক "হিন্দুই" ত আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা রেলপথে বা বড়লোকের বাড়ীতে, একরূপ দশজনের চক্ষের সমক্ষে, ম্লেচ্ছনিষেবিত কুক্কুটাদির মাংসযুক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়া, আবার পরদিনই সমাজের পংক্তিতে বিবাহাদির ভোজে বসিয়া গিয়াছেন! কৈ কেহই ত তাঁহাকে 'পতিত' বলিতে সাহস করিতেছেন না!! ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা-সেবন ত হিন্দুশাস্ত্রে একটী পাতিত্যজনক কার্য্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কয়জন প্রকাশ্য সুরা-সেবী ব্রাহ্মণকে, বিবাহ-ভোজের পংক্তি হইতে, বর্ত্তমানকালে, 'পতিত' বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে? প্রত্যহ যিনি বেদ পাঠ বা অগ্নিহোত্র বা সন্ধ্যা করেন না, এরূপ ব্রাহ্মণকে ত হিন্দুশাস্ত্র পতিত বলিয়াই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানকালে বেদ জানেন বা সন্ধ্যা করিয়া থাকেন? যাঁহারা নিত্য বেদপাঠ করেন না বা ঋগ্বেদাদির একটীমাত্রও সূক্ত উচ্চারণ করিতে পারেন না,—এরূপ ব্রাহ্মণকে কি বঙ্গবাসী পতিত বলিতে প্রস্তুত আছেন? যদি বিনা বাধায় এই প্রকার পতিত হিন্দুগণ সমাজে চলিয়া যাইতে পারেন, তবে হিন্দুশাস্ত্রে যে কার্য্যের সুস্পষ্ট বিধান আছে, সেই কার্য্য করিয়া আশুবাবু 'পতিত' হইলেন কিরূপে? অথচ বঙ্গবাসী অন্যের সম্বন্ধে ত কোন কথাই বলেন না! তিনি কেবল আশুবাবুর উপরেই এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন কেন? বঙ্গবাসী বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া বড়ই উচ্চ চীৎকার করিতেছেন এবং "ধর্ম্ম রসাতলে গেল" বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানকালে পুরুষেরা যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন না, বেদপাঠ করিতেছেন না, সে সম্বন্ধে বঙ্গবাসী কেন ক্রন্দন করেন না? "যস্ত্ব অনধীতবেদঃঅত্রন্যত্র শ্রমংকুর্য্যাৎ অসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি" (বিষ্ণু সংহিতা, ১৮। ৩৪—৩৬) বিষ্ণুসংহিতা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "এক বা দুই বা তিন বেদ যিনি আয়ত্ত করেন না এবং বেদাঙ্গও পড়েন না, তিনি সসন্তান শূদ্রবৎ হইয়া যান,—শূদ্রতা প্রাপ্ত হন।"

এ হিসাবে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কি "শূদ্র" হইয়া যান নাই?- আমাদের মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মণ বেদাঙ্গ সহ ঋগ্বেদাদি পাঠ করেন বা ঋগ্বেদাদির একটী মন্ত্রও অবগত আছেন? ইহাও হিন্দু সংহিতারই কথা। তবে ত হিন্দুশাস্ত্রমতে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণই শূদ্র পদবাচ্য! কিন্তু "বঙ্গবাসী" তাঁহাদের কথা বলেন না কেন? এই যে অহরহঃ কন্যাগুলি গো বিক্রয়ের ন্যায় বিক্রীত হইতেছে, ইহা কি হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত? অথচ বঙ্গবাসী তৎসম্বন্ধে কোনই আন্দোলন করিতেছেন না। যে সকল প্রথা ও আচরণ পূর্ণরূপে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের নিতান্ত বিরোধী, তৎসম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, যে প্রথা হিন্দুসংহিতায় ও হিন্দুশাস্ত্রে সুস্পষ্ট বচন দ্বারা ব্যবস্থাপিত, সেই প্রথানুসারে আশুবাবু অল্প বয়স্কা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া, বঙ্গবাসী তাঁহাকে "পতিত" বলিতেছেন এবং ভদ্রলোকেরও অবাচ্য ভাষায় সেই নিরপরাধা পবিত্রা কন্যার প্রতি অপভাষা প্রয়োগ করিতেছেন!!! বঙ্গবাসী যে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, আমাদের বোধ হয়, সে অপরাধের ক্ষমা নাই। হিন্দু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ধীরচিত্ত ব্যক্তিগণ, বঙ্গবাসীর এই প্রকার অনুচিত ব্যবহারের যথাযথ শাসন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম্-এ।

# ধর্ম্ম যুগ ও জড়যুগ।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বসমাজেই কখন কখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায়, যখন সমাজের কল্যাণ কামনায় দেশের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা, ব্যবসায় শিল্প প্রভৃতির একটী নিয়ন্ত্রিত সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন কোথাও প্রাচীনের ধ্বংস করিয়া নূতনের আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, কোথাও প্রাচীনের দৃঢ় ভিত্তির উপর নূতনের আদর্শ গঠন করিয়া তোলা হয়, সমাজকে দেশ-কালোপযোগী করিতে—সর্ব্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার অনুকূল ভাবে গঠন করিতে যত কিছু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তাহার বিধান অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ভারতের সর্ব্বত্র যে একটা আন্দোলনের স্রোত দেখা দিয়াছে, তাহাও ঐ নিয়ন্ত্রিত সংস্কারের প্রচেষ্টাভিলাষ হইতে জাত। এই সংস্কারের আয়োজন গত তিন চারি বৎসর হইতে ভারতে চলিতেছে।

সংস্কারের পথে চলিবার সময় আমাদের একটা কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, আমরা প্রাচীনের কোন্ ভিত্তি হইতে পা তুলিয়া নূতনের কোন্‌টীকে লক্ষ্য-পথে রাখিয়া পা বাড়াইতেছি। আমাদের কোন্ অঙ্গ দুর্ব্বল ছিল—যাহার কারণে আমাদের সমাজ-অঙ্গে একটা শোচনীয় অভাব জাগিয়া উঠিতে পারিল।

১

মানবজাতির দুইটা দিক আছে, একটা তার অন্তরের পরিতৃপ্তির সামগ্রী বা ধর্ম্মভাব, আর একটী তার জীবন-ধারণোপযোগী ভোগ-বৃত্তি পরিতৃপ্তির সামগ্রী বা জড়ের বিভিন্ন সুগঠিত মূর্ত্তি। প্রত্যেক সমাজই এই দুইভাবে পরিপুষ্ট থাকা আবশ্যক;

কোনও সমাজ ইহার একটীতে অধিক আগ্রহ রাখিয়া অপরটীকে হেলার চক্ষে দেখিলে, একদিন না একদিন ঐ অকর্ত্তব্য-তায়—ঐ হেলার ফলে সমাজ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। মানবের বিহার-ক্ষেত্র সমাজ-রাজ্যের ইহা চিরন্তন পদ্ধতি। যেমন শুধু মাংসপিণ্ড বা শুধু পঞ্জরে একটী উন্নত জীব গঠিত হইতে পারে না, তেমনি, শুধু ধর্ম্ম-ভাব-মগ্ন বা শুধু জড়ভাব-মগ্ন কোনও সমাজ দশের মাঝের এক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। ধর্ম্ম ও জড় ভাবের রাসায়নিক সংযোগে যে সমাজ গঠিত, তাহাতেই মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়, মানবত্বের পূর্ণ আদর্শ তাহাতেই ফুটিতে পারে। ভারতের, আদি সমাজ ইহার প্রথমটীকে লাভ করাই মানব-জীবনের চরিতার্থতা ভাবিয়াছিল, শেষোক্ত-টীকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিল, তাই অন্তর্জ্জগতের পরিপুষ্টি সাধনে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করিয়া, জীবন-যাত্রার উপকরণের উন্নতি-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল—জড়জগতের উন্নতির জন্য মানবশক্তির ব্যবহার করিতে সেকালে কর্ত্তব্যবোধ জাগে নাই। তাই ধর্ম্মে ভারত আপনাকে যতটুকু গরীয়ান করিতে পারিয়াছিলেন—আমাদেরে যতটুকু পবিত্রতা দিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, জড় সম্বন্ধে আমরা, সেইরূপ. হীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি।

জড় আমাদের কাছেও আদি-সমাজের ন্যায় হেলার চক্ষে উপেক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে পতিত হওয়ায়, আমাদের ঐ মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, জড়ও আমাদের জীবনোন্নতির সঙ্গের সঙ্গী।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সাক্ষাতে জড়প্রকৃতির একটা মনোমোহন আদর্শ খাড়া করিয়াছে,—জড়ের চরমোন্নতির বিকাশ-চিত্র আমাদের চক্ষের সাক্ষাতে ধরিয়াছে। জড়ের সৌন্দর্য্যে চক্ষুকে শিক্ষিত ও মুগ্ধ করিয়া তোলায় এখন আমাদের সমাজ, জড়ের উন্নতি বিধানের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের প্রবৃত্তি জড়ের যে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা আমাদের নাই; তাই আমাদের জড়ের বিকাশের চেষ্টায় এদিক ওদিক হইতে শক্তি আহরণ করিতে সমস্ত সমাজ-ব্যাপী এক তীব্র সাধনা জাগিয়াছে। জড়যুগের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

কিন্তু এই যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন একাগ্রতা ঐ এক জড়কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে, তাহাতে একথা যেন সমাজ ভুলিয়া না যায়, সে কোথা হইতে পা তুলিতেছে, এই সমাজের আদি বিহার-ক্ষেত্র কি ছিল, অন্তর্জ্জগতের কি রত্ন তাহার গলায় উজ্জ্বল আভা ফলাইতেছে। এই ধর্ম্ম-রত্নের প্রতি যেন সমাজ হীন-লক্ষ্য না হয়। আমাদের এই প্রাচীন-ভিত্তির উপর নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি যে ধর্ম্ম ভাব ছিল, তাহা আগে যেমন হৃদয়ের পূজায় বর্দ্ধিত ও সম্মানিত ছিল, তাহা আজও থাকিবে, তাহা আমাদের হৃদয়-রাজ্যে থাকিয়া শান্তির পথ দেখাইবে। আর বাহিরের সুখ সম্পাদনের জন্য নিজকে খাটাইয়া লইতে হইবে। জড়কে ঐ পাশ্চাত্য আদর্শের তুল্য প্রতিযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের প্রতি কার্য্য, প্রতি চেষ্টা, হৃদয়ের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ও পরি-

পুষ্ট রাখা আবশ্যক। হৃদয়ের ধর্ম্মভাবকে তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যে বিচরণ করিলে জগতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু মনের আস্বাদন-যোগ্য কিছু ফলিতে পারে না। তাই আমরা কোন্ ভিত্তি হইতে পা তুলিতেছি, এ কথা মুহূর্ত্তের তরেও ভুলিলে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্টতা আসিয়া পড়িবে। ধর্ম্ম ও জড়যুগের সংযোগে মণিকাঞ্চন যোগই আমাদের সাধনার লক্ষ্য থাকিবে। আমরা জড়ের পূর্ণাবয়ব দিতে গিয়া যেন হৃদয়ের মহান্ ভাবকে হারাইয়া না ফেলি; জড়কে লাভ করিবার জন্য যেন জড়ের অতীত অমৃত ভাবের ভিখারী না সাজি।

আদি-সমাজ জড়কে ছাড়িয়া শুধু জড়াতীত পদার্থের উৎকর্ষতায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, একালে যেমন সমাজে একটা পূর্ণ অভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ যদি জড়াতীত তত্ত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়া শুধু জড়ের পথে ছুটি, তবে কালে এমন একটা ভীষণ অশান্তি জাত হইতে পারে, যাহাতে ততোধিক দুঃখ ভোগ করা অনিবার্য্য হইবে। তাই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের পূর্ণ বিকাশকে আদর্শ রাখিয়া আমাদের জাতীয় জীবনতরীকে পরিচালিত করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের সমাজ ধর্ম্মভাবের অসীম ও অমৃত বন্ধনীতে সুগঠিত নহে, সে সমাজের ধর্ম্মও জড়ত্বকে আশ্রয় করিয়া জীবিত; সমাজ-অঙ্গে ধর্ম্মের প্রসন্নতা অপেক্ষা জড়ের আধিপত্য আদরণীয়; তাই ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে আজকাল এমনতর একটা উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিয়াছে, যাহাতে সমাজ-অঙ্গের শান্তির বিলোপ ঘটিয়া যাইতেছে। জড়ের সৌন্দর্য্য যখন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে মনকে টানিয়া লইতে চাহে, তখন ধর্ম্মের অমৃত আকর্ষণ মানবকে সংযত পথে চলিতে আহ্বান করে। ইংলণ্ড শুধু জড়কে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া অন্তর্জ্জগতকে হারাইয়াছে, সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জড়ের বিকাশ যখন ধর্ম্মের ভাবে অনুলিপ্ত হইয়া পূর্ণাবয়বে আমাদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে, যখন জড়ের সৌন্দর্য্যে ধর্ম্ম, ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে জড় অনুরঞ্জিত হইয়া পরস্পরকে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন দিয়া দাঁড়াইবে, তখন ভারতে মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিবে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪৯। বঙ্গীয় কবি।—অম্বষ্ঠ খণ্ড, শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল ২৷৹; স্বাধীন ত্রিপুরা। ১০৪ জন বৈদ্য কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা ভিন্ন ২৮ জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনচরিত পাওয়া যায় নাই বলিয়া সংগৃহীত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি ৬৭৬ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে; আগরতলার মহা সম্মানিত মহারাজ এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন দরিদ্র ব্যক্তি, মহারাজ এইরূপ অর্থানুকুল্য না করিলে এ পুস্তক প্রকাশিত হইত

। আগরতলার রাজবংশ বাঙ্গালা ভাষার রিপোষক, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ৺বীরচন্দ্র ণিক্যবাহাদুর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। হার উপযুক্ত গুণধর পুত্রের এই দয়ার রিচয়ে আমরা যারপর নাই আনন্দিত ইয়াছি।

বঙ্গীয় কবির "নিবেদন" এবং "ভূমিকায়" গ্রন্থকারের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অসাধ্য সাধিত করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ যেরূপ অমর হইয়াছেন, এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিতে পারিলে, সেইরূপ কালীপ্রসন্ন বাবু অমর হইবেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর সাহিত্যানুরাগ দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি।

গ্রন্থকারের লিপি-চাতুর্য্য অসাধারণ। অনেক গ্রন্থকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প কথাকে বাহুল্য করিয়া বর্ণন করেন; কেহ বা বহু কথাকে সংযত ও সংক্ষেপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। বহুকে সীমবদ্ধ করিবার ক্ষমতার তুলনা নাই। বিশেষ কৃতী ব্যক্তি ভিন্ন একাজ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। এই ক্ষমতায় কালীপ্রসন্ন বাবু অজেয়। "বঙ্গীয়-সাহিত্য সেবক" পুস্তক-লেখক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের উদারতা যদি কালীপ্রসন্ন বাবুর থাকিত, তবে তিনি এক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হইতেন। শিবরতন বাবু আজীবন এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া যে "রত্ন" সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সর্ব্ব শ্রেণীর স্বর্গগত গদ্য-পদ্য লেখকদের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু "স্বশ্রেণীর" মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যাপৃত, শিবরতন বাবু সর্ব্ব শ্রেণীর মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। উভয়ই আমাদের পূজ্য, উভয়ই বাঙ্গালা ভাষার অকৃত্রিম বন্ধু। উভয় গ্রন্থই বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন বিশেষ, সন্দেহ নাই। তবে একথা বলিতেই হইবে যে, কালীপ্রসন্ন বাবু কিছু অনুদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই বঙ্গীয় কবি গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, স্বদেশের পুণ্যশ্লোক কৃতী-ব্যক্তিগণের বিবরণ জানিতে যদি লোকের আগ্রহ না হয়, তবে বুঝিব, স্বদেশী আন্দোলন কেবল হুজুগ মাত্র। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যাঁহারা রক্ত জল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর স্বদেশ-প্রেমিক কে? তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পথ। কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক, তাঁহার নাম অক্ষয় হউক।

৫০। ধ্রুবতারা।—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত, মূল্য ১৷৽।

যতীন্দ্র মোহন একজন সাধু ব্যক্তি, তিনি বাঙ্গালা ভাষার অকৃত্রিম বন্ধু এবং সেবক। এই সব কারণে আমরা পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, পরিশ্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। বনলতা, চারুলতা, এবং অরুণ ও উপেনের কাহিনী বিবৃত করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থকার অনেক অবাস্তরিক বিষয় ও ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক রূপে, সাবেকীকরণ, স্ত্রীশিক্ষা এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা উপস্থিত করিয়াছেন। ঘটনা-পরম্পরায়, গ্রন্থকার, প্রকারান্তরে "অশিক্ষা" এবং "বাল্য-বিবাহের" জয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সমাজের গুণের প্রতি গ্রন্থকার অন্ধ, সেই শিশু-সমাজের দোষ কীর্ত্তনে গ্রন্থকারের অধিকার আছে কিনা, আমাদের সন্দেহ আছে। এইরূপ করায় কিছু কিছু পূতিগন্ধময় বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট ইহা প্রত্যাশা করি নাই। "স্ত্রীশিক্ষার" অভাবে এবং "বাল্য বিবাহের" কারণে কত গৃহ যে অশান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। গ্রন্থকার সহৃদয় ব্যক্তি, তাহা জানেন, আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তবুও তিনি একদেশদর্শী হইলেন কেন, বুঝি না। স্ত্রীশিক্ষার দরুণ "চারুলতার" পরিবর্ত্তে কত "বনলতা"র অভ্যুদয় হইতেছে, তাহা যদি তিনি জানিতেন, তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি হইত না। আমাদের বিশ্বাস, সব সমাজেই "বনলতা" আছে, সব সমাজেই

"চারুলতা" আছে; সব সমাজেই "অরুণ" আছে, সব সমাজেই "উপেন" আছে। কলঙ্কিত "অরুণ" ও "চারুলতা"কে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্কে রচনা করিয়া গ্রন্থকার অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন। এই অনুদারতার জন্য তাঁহাকে একদিন অনুতাপ করিতে হইবে।

এই পুস্তকে বহু অবান্তরিক কথা সমাবিষ্ট হইয়াছে। চেষ্টা করিলে তাহা অনেক সংক্ষেপে শেষ করা যাইত। আমাদের বিশ্বাস, অযথা পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অরুণ এবং চারুলতার প্রণয়-বিভ্রাট পাঠের সময় বহুবার শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবীর "কাহিনী" মনে জাগিয়াছে। জানিনা, গ্রন্থকার সরোজকুমারীর গ্রন্থ পড়িয়াছেন কি না, সরোজকুমারী এরূপ ঘটনা বহু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাতন কথা নূতন ছাঁচে ঢালিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে সরোজকুমারীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সরোজকুমারীর উদারতা বিশেষ সম্মানের যোগ্য।

যতীন্দ্র মোহন যতই চেষ্টা করুন না কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত কিছুতেই রোধ করিতে পারিবেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, স্ত্রীশিক্ষার স্রোত কিছুতেই বন্ধ হইবে না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, দেশ কালের উন্নতির সহিত, ঘটনা-পরম্পরায়, "যৌবন-বিবাহের" স্রোত প্রবাহিত হইবেই। আমরা বন্ধুবরকে একটু সংযত, একটু উদার এবং একটু সহৃদয়তায় ভূষিত হইতে দেখিতে চাই। সেশ্বরবাদী সব লোক এক-দলভুক্ত নয় কি?

আর একটী কথা। যতীন্দ্র মোহনের ভাষা প্রাঞ্জল এবং কবিত্বপূর্ণ, চরিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা অসাধারণ। আমরা তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের নিকট অনেক প্রত্যাশা রাখি বলিয়াই এত দোষের উল্লেখ করিয়াছি, এজন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা চাই। তিনি অতি শিশু ব্রাহ্মসমাজের "কালিমা" ফুটাইবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যদি দত্ত পরিবারের মহত্ত্ব প্রস্ফুটনে ব্যয়িত হইত, কত আনন্দের কারণ হইত। বিধাতা তাঁহার অমানুষী ক্ষমতাকে একটু উদারতার পথে চালিত করুন, ইহাই প্রার্থনা। গ্রন্থকার চা পান করাকে "কুলি-রক্ত"পান করার সমতুল্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহা ঠিক। তিনি চাপানের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। আর অতি সুন্দর হইয়াছে, বনলতার বৈচিত্র্যহীন অস্ফুট এবং উপেনের জীবন্ত চরিত্র।

৫১। মা ও আহুতি।—জাতীয় গীতি কাব্য। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। খাঁটী স্বদেশী কাগজে, স্বদেশী ভাবে এই পুস্তক লিখিত; ইহা এই পুস্তকের কম গৌরব নহে। গ্রন্থকারের লেখা কেমন স্বদেশানুরাগ-দীপ্ত—পাঠক দেখুন,—

"অয়ি মোর পূত জন্মভূমি!—
অয়ি মোর প্রাণারাধ্যা অয়ি মোর অতুলা
জননি!
কি দিয়া সাজা'ব তোরে, মাগো কোন্
উপচারে,
পূজা তোর করিব ভুবনে!
প্রাণ মন সব ছিঁড়ি' সর্ব্বস্ব, মা, শূন্য করি,
সমস্ত সংসার ঢালি' কোটি কোটি জন্ম ভরি'
তবু সে, মা, [illegible] পূজা তো, মা!
নহে উদ্‌যাপনে!—
কি আছে, কি দিয়া তোরে পূজি প্রাণমনে?
কাটিয়া সকল ডোর, সর্ব্বস্ব [illegible] তো-
চরণ-কমলে,
এ দেহ মরম প্রাণ ধর্ম্ম কর্ম্ম অভিমান
গলি' অশ্রুজলে,
আশা সাধ পিয়াসা মা, পিপাসা তিয়াসা, [illegible]
ঢালি' গঙ্গাজলে
সকল অর্পিয়া শেষ তবু নাহি মিটে ক্লেশ—
প্রাণ তৃপ্ত তবু না [illegible]!
বল্ বল্ কোন্ সাধে [illegible] এ পরাণ কাঁদে
সে যে সাধ আকাশ-গরাসী!—
আকাশের পথ চে'য়ে সমস্ত ধরারে ছু'য়ে
বিকাশি' ব্রহ্মাণ্ড ভরি' জ্যোৎস্না, জ্যোতিরাশি
উঠিবি অনন্তময়ি— মম জন্মভূমি অয়ি,—
বিজলী-চমকে তুই উঠিবি মা হাসি'!
মা আমার!—আয় শ্যামা সুধাছায়াময়ি!

…ণ-আলা সাধনার দীপ জ্বালা
…বন হ'তে বুকে ঢাকি' লয়ি'
নরজনে কখনো দারুণ দনে
…স্থানে ডাকি' কভু রয়ি' …
…না ভাই ! শুধু … ভয় নাই,—
…ন, তুই … …—পরম !
তুচ্ছ এ পরাণ ভারি'
… !—সকল সাধন !
…গো কেন ধরা এ জীবন !
…! কি আশায় প্রাণে বহে শ্বাস ?
…ঞ্চল তলে … নীর-কুলুকলে
…ত তটে—পিতৃপদতীর্থ-কূলে
…হীয়ান অম্বর-কম্পন গান
—শিহরণে তোরি তরে শুভক্ষণে
…সেতে মিশিবে বাতাস !
শুধু প্রাণে বহে শ্বাস !
অয়ি মা !
… উঠে' জেগে' দীন-নয়নের'পরে
…মহীয়সী অরূপা মূরতি হাসি'
ঢাকা যাহা রেণুকার স্তরে !
…-দাপ পুণ্য দীপ্তি প্রতিভাত
অয়ি,—অয়ি ! —)
…স মুক্তিমাঝে উজল অম্বরে !
মা—মা !—
টুটে' নিত্য যেই চিন্তা …টে,
নিত্য যে মোর কামনা ছুটে—
হ'ব— অনন্ত কল্যাণ পা'ব—
তোর নামে পুষ্প মম বক্ষ-পুটে !
…য় মা গো !—
… হ'ব তোর স্বর্গ-উরসে লুটিয়া,
…সাজে তুই যবে বক্ষোমাঝে
… দিবি এ প্রাণ মুড়িয়া !
…ব কি মা ?—অয়ি বঙ্গ !
…ধে বল্, তুই যবে জননী আমার !
…ই— অয়ি বিশ্বময়ি !
যে সন্তান তোমার !
…ত দাও, আজি পুণ্যে ল'য়ে যাও
…'র মত মায়ের মতন !—
…নের— কর কামনার শেষ
…য়ের ক্ষুদ্র নগণ্য তর্পণ।"
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।
…ঘদূত।—শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত,

১৯০৮, মূল্য ১৲। কোন্ দেশে কোন গ্রন্থের এত অনুবাদ বোধ করি আর হয় নাই। এক বাঙ্গালা ভাষায় মেঘদূতের কত অনুবাদ পড়িয়াছি ;—সকলই সরল এবং মধুর। এই অনুবাদখানিও বেশ হইয়াছে। কিন্তু বরদা চরণের অনুবাদের ন্যায় আর কোন অনুবাদ সুধাবর্ষী হয় নাই।

৫৩। হত্যাকারী কে ?—শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। মূল্য ॥৵০। সচিত্র। ডিটেকটিভ গল্প লিখিয়া যাহারা এদেশে অমর হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রিয়নাথ এবং শরচ্চন্দ্র প্রধান। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের লেখাও প্রাঞ্জল এবং সরস।

৫৪। মহেশ বাবুর প্রশ্নোত্তর ঠিক হইল কিনা ? উত্তর-দাতা ও বিচারপ্রার্থী শ্রীরাধা কান্ত রায়। এই পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র সেনের উত্তর শুনিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

৫৫। অশ্রু-হার। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ।৵০ গ্রন্থকারের কবিতা সুমিষ্ট। একটু নমুনা দিলাম—

১

"সত্য কি প্রেয়সি ! তুমি এজগতে নাই ?
আমি দেখি এই ধরা, তোমারি রূপেতে ভরা,
জল—স্থল—ব্যোম—যথা নয়ন ফিরাই !!

২

ধরি ধরি করি কিন্তু ধরা নাহি যায় !
শরতে চন্দ্রমা কোলে, তোমারি প্রতিমা দোলে,
হেমন্ত—বসন্ত—শীত ঘন বরষায় !!

৩

বসি নিরজনে দেখি শ্যামল সন্ধ্যায় !
সেই মুখ সেই দেহ, সেই অপার্থিব স্নেহ !
ব্যাপিত অনন্তবিশ্ব তোমারি আত্মায় !!

৪

তোমারি মূরতি হাসে নিদাঘ উষায় !
নব প্রভাতের রবি, তোমারি মোহিনী ছবি।
উজলা চপলা তুমি নীরদমালায় !!

৫

তারা-রত্নহারা নিশা তব প্রতিমায় !
চন্দ্রিকা তোমার হাসি, সে অপূর্ব্ব রূপরাশি !
ভাস্বর সমগ্র-বিশ্ব তব প্রতিভায় !!